দেশ ও জাতির স্বার্থে চাই

- মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা
- শিশুদের সুষ্ঠু লালন পালন
- সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদান
- পরিবার পরিকল্পনা

S.D

MASS MEDIA
S.F.P.B

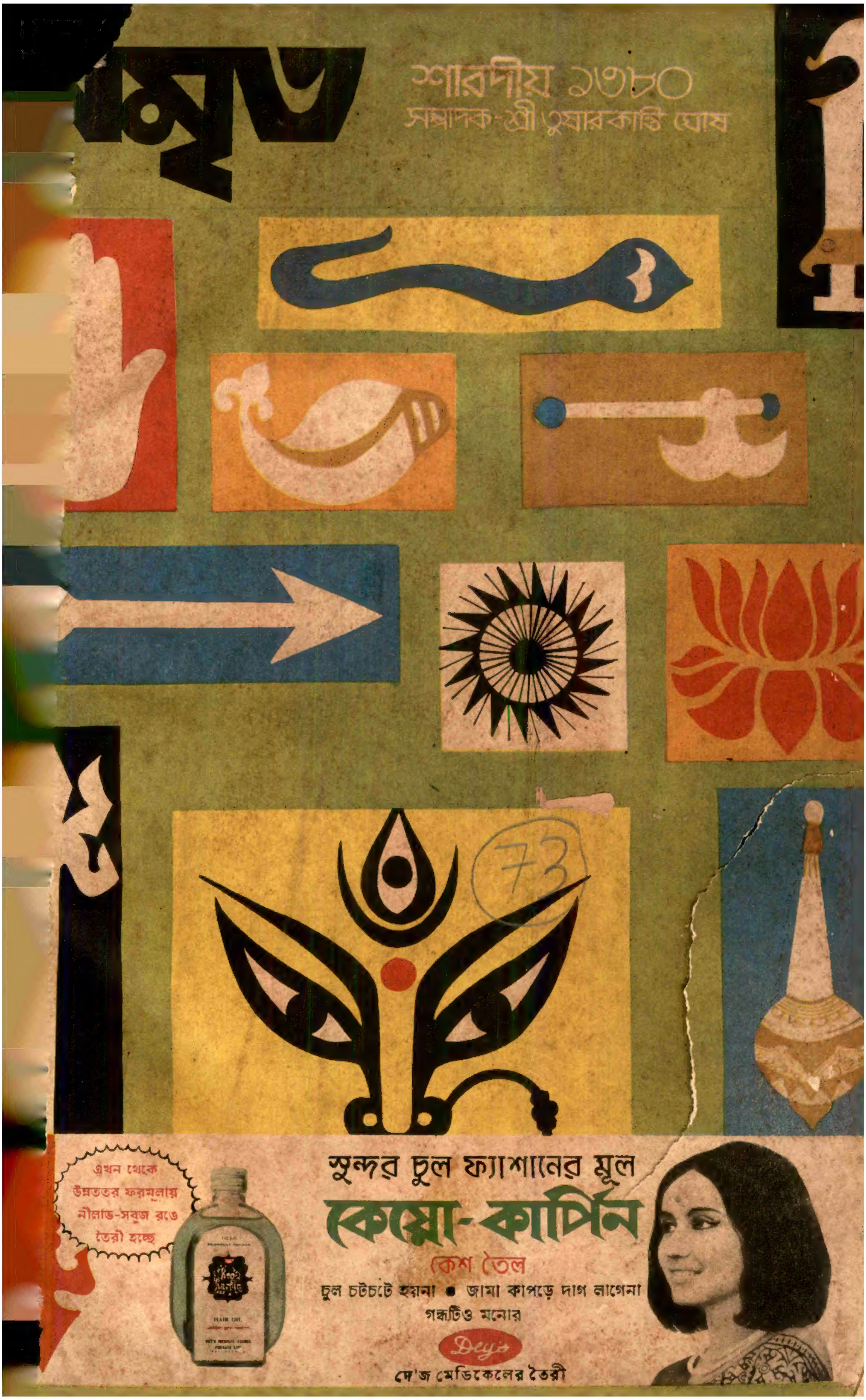
মৃত
শারদীয় ১৩৮০
সম্পাদক-শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ
73
এখন থেকে
উন্নততর ফরমুলায়
নীলাভ-সবুজ রঙে
তৈরী হচ্ছে
HAIR OIL
সুন্দর চুল ফ্যাশানের মূল
কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল
চুল চটচটে হয়না • জামা কাপড়ে দাগ লাগেনা
গন্ধটিও মনোর
Dey's
দে'জ মেডিকেলের তৈরী

(শারদীয় অমৃত ১৩৮০)

756.3
001/66
288717
CU6 – H04783 – 9 – 288717

মা আসছেন

73

কাছে এল উৎসবের দিন। বাতাসে আগমনীর সুর। সারা বছরের প্রতীক্ষার পর আনন্দের মেলা, দেখাশোনা, সবার সঙ্গে মেলামেশা। এখনই তো সাজগোজ আর বেড়ানোর মরশুম। উৎসব সম্পূর্ণ করে তোলে বেঙ্গল কেমিক্যালের অনবদ্য প্রসাধনী সম্ভার।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

BC/PA/1-73

এমন দিনও গেছে যখন কলকাতায় বিদ্যুৎ সমস্যা বলতে কিছুই ছিল না।

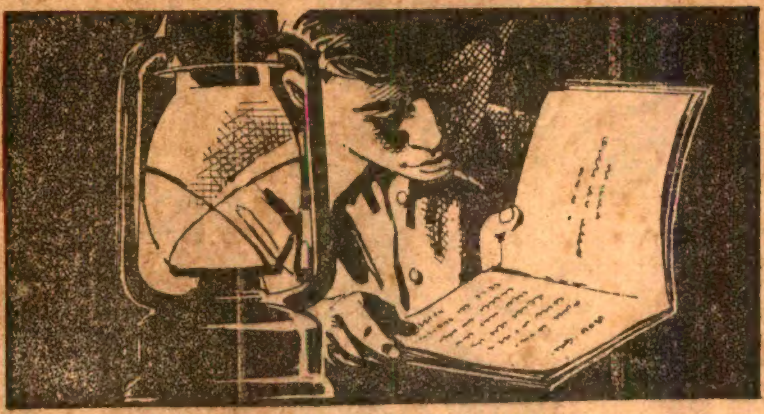

আজ এই দুরবস্থা কেন?

এই মহানগরীর অধিবাসীদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই শতকের গোড়া থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত শহরে বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা কেউ ভাবতেও পারতেন না। সে সময় সস্তায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেত বলেই, কলকাতা ও শহরতলীতে শিল্প সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিলো।

আজ তাহলে এই সমস্যা কেন?

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি-ই-এস্-সি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রসার পরিকল্পনা বন্ধ করে দেওয়া হল। এ হল পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকের কথা…। সে সময় গার্ডেনরীচে জমি নিয়ে সুইচ স্টেশন সম্পূর্ণ করা সত্ত্বেও, নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর কাজ বন্ধ করে দিতে হয়…। হতে-গিয়ে-হয়নি সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র—যে কেন্দ্র স্থাপিত হলে ৬০ দশকের গোড়ার দিকের আর বর্তমানের এই বিদ্যুৎ সঙ্কট হয়তো এড়ানো যেতো।

তারপর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সি-ই-এস্-সি'র ভূমিকা গৌণ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারই ১৯৪৮ সালের ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) এ্যাক্টের বিধান অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব ক্রমবর্ধিত হারে নিজেরা নিলেন। এছাড়া এই আইন সি-ই-এস্-সি'র মতো লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার নিজেদের থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির পরিবর্তন বা নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার অধিকার সীমিত করেছে।

এই সরকারী নীতির ফলে, ডিভিসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মতো সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। এবং এই কারণেই সি-ই-এস্-সি নিজের উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়িয়ে, ডিভিসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ আমদানী করার জন্যে নতুন নতুন বিদ্যুৎ গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে।
বর্তমানে সি-ই-এস্-সি প্রতি বছর শুধু বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্যেই প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচ করে।

তবে, বাধা কোথায়?

বর্তমানে সি-ই-এস্-সি তার মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের জন্যেই ডিভিসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উপর নির্ভরশী[l] এর মধ্যে ডিভিসি'র মোট সরবরাহের পরিমাণ ১০৫ মেগা-ভে[াল্ট] এম্পিয়ারে সীমিত, কাজেই প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে সি-ই-এস্-সি পুরোপুরিভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে[র] উপর নির্ভরশীল।

সি-ই-এস্-সি তবে কী কর[ে]

সি-ই-এস্-সি উপলব্ধি করে যে বিভিন্ন কারণের জন্যে ডিভিসি ব[া] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাঁদের চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছেন না। এই দুই সংস্থাকে সাহায্য করতে তাই সি-ই-এস্-সি নিজেদের পুরানো যন্ত্রপাতি আর খারাপ কয়লার অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও, সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের উৎপাদন যথাসম্ভব সর্বোচ্চ স্তরে [রেখে] যাচ্ছেন।

ভবিষ্যৎ কী?

রাজ্য সরকার বর্তমানে এই বিদ্যুৎ সংকটের সুরাহা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সি-ই-এস্-সি এই প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছে এবং প্রয়োজন মতো সংস্থা ও উৎসাহ পেলে সি-ই-এস্-সি এই ব্যাপারে আরও সার্থক ভূমিকা নিতে পারে।

CESC দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১	সম্পাদকীয়		
	শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব ও মনুষ্যত্বের সাধনা		—শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন
	সহযাত্রী	(গল্প)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
	পুনর্নবা	(গল্প)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১	দুই জগতের মাঝখানে	(গল্প)	—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়
৫	এক্সপ্লয়টেশন	(গল্প)	—শ্রী শ্রীলেখা বসু
৯	অসম্পূর্ণ চিত্র	(একাঙ্কিকা)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৪	ভালবাসার মুখ	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
২	রসরঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র		—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
৭	রাণীদর্শন	(গল্প)	—শ্রীমনোজ বসু
২	পাঁচ অধ্যায়, প্লাস	(গল্প)	—শ্রীপরিমল গোস্বামী

৭৫-৭৮ কবিতাগুচ্ছ ॥

বুদ্ধদেব বসু দে অরুণ মিত্র দিনেশ দাস কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সামসুল হক
মা দেবী শংকর চট্টোপাধ্যায় শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রাম বসু গোপাল
ভৌমিক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তুষার রায় শঙ্খ ঘোষ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সারদা-রামকৃষ্ণ

যুগান্তর :—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥ বহুচিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ— ৮

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত। আনন্দবাজার পত্রিকা :—ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥ বহুচিত্রসহ পঞ্চম মুদ্রণ—৫

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা। বেতার জগৎ :—অপরূপ তাঁর জীবন-লেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা॥ বহুচিত্রসহ— ৮

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামীজী-সহোদর মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মনোজ্ঞ রচনা॥ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১·২৫

সাধনা

বসুমতী :—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাংলায় আর দেখি নাই॥ পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ— ৬

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

লং প্লে রেকর্ড
FOLK SONGS OF BENGAL
শচীন দেববর্মন পল্লীগীতি
THE BEST OF K. L. SAIGAL
কে, এল, সাইগল
আধুনিক ও ফিল্ম সঙ্গীত

এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড
অমর পাল প্রভাতী সঙ্গীত
হীরালাল সরখেল শ্যামা সঙ্গীত
অংশুমান রায় লোকসঙ্গীত
পূর্ণদাস (বাউল) বাউল
শ্রীমতী রাধারাণী
নৌকাবিলাস (পালা কীর্তন)
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
পুরাতনী
অমর পাল
দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালী, সারী

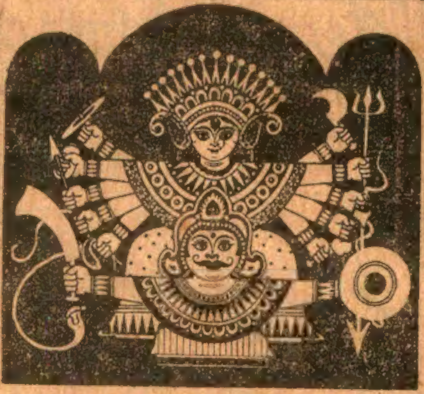

পূজার গান

HINDUSTHAN RECORD

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
কলিকাতা-১২

স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড
মহঃ আবদুল জব্বার আধুনিক
দিনেন্দ্র চৌধুরী পল্লীগীতি
হীরালাল সরখেল শ্যামাসঙ্গীত
জোনাকী. হৈমন্তী ও জ্যোৎস্না
ছড়াগান
অংশুমান রায় আধুনিক
বিদ্যুৎ বসু গীটার (ফিল্ম)
প্রোঃ নন্দলাল ও সম্প্রদায় সানাই
হৈমন্তী শুক্লা আধুনিক
নিতাই গোস্বামী আধুনিক
দীপেন মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গগীতি
অভিজিৎ নাথ গীটার (ফিল্ম)

এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড
গোপাল ভাঁড় গীতি-কৌতুক নাটিকা
রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, নিৰ্ম্মল ঘোষ,
ভোলা দত্ত, অংশুমান রায়,
ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

EEI
GET THE BEST OUT OF YOUR RECORDS
• Make sure your pick-up cartridge and stylus are in good condition.
• For best results and performance always insist on using E. E. I CARTRIDGES & STYLUS. • ASK YOUR RECORD DEALER FOR DETAILS.

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

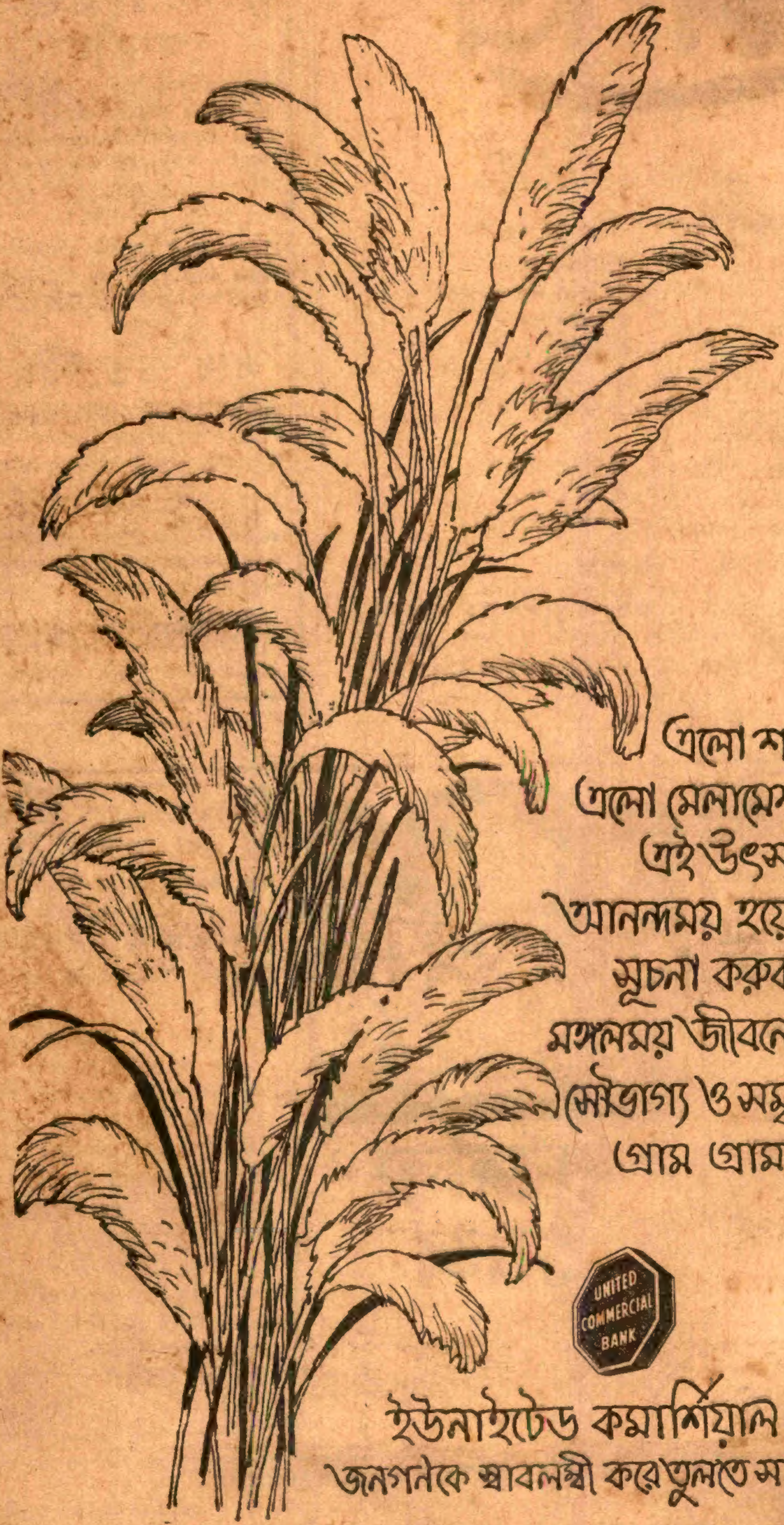

এলো শরৎ।
এলো মেলামেশার মহোৎস
এই উৎসব
আনন্দময় হয়ে উঠুক।
সূচনা করুক
মঙ্গলময় জীবনের।
সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি ভরে তুলু
গ্রাম গ্রামান্তর।

UNITED COMMERCIAL BANK

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

৭৫—৭৮ ॥ কবিতা গুচ্ছ ॥

হেনা হালদার তরুণ সান্যাল নমিতা চক্রবর্তী।

৭৯ সাংবাদিকের ডাইরি (গল্প)—শ্রীলীলা মজুমদার

৮২ দ্বিতীয় সীতা (গল্প)—শ্রীসতীকান্ত গুহ

৯০ একটি দৈত্য একটি লাল গোলাপ (উপন্যাস)—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৯—১৩৩ ॥ কবিতাগুচ্ছ ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায় হরপ্রসাদ মিত্র শিশির ভট্টাচার্য অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত জগন্নাথ চক্রবর্তী গৌরাংগ ভৌমিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রতিমা সেনগুপ্ত পবিত্র মুখোপাধ্যায় অনিলবরণ গংগোপাধ্যায় আশিস সান্যাল মৃগাঙ্ক রায় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নবনীতা দেব সেন গণেশ বসু শুভ মুখোপাধ্যায় ‘কবিরুল ইসলাম শ্যামলেন্দু রায় দেবারতি মিত্র।

১৩৫ রবীন্দ্রনাথ ও অন্য ভুবন —শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

১৩৮ বাবা তেঁতুল (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৪৩ সামাজিক (গল্প)—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৫৩ সখের দলের অভিনেত্রী (গল্প)—শ্রীসমথনাথ ঘোষ

১৫৯ ফেরারী অতীত (গল্প)—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে

সুনির্মল রচনাসম্ভার

(১ম খণ্ড)

মূল্য : ১৫্ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১০্ টাকায়।

যাঁরা এই বইটি পেতে চান তাঁরা স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতার কাছে বা সরাসরি গ্রাহক কেন্দ্রে খোঁজ করুন।

পূজার পরেই প্রকাশিত হবে

নবীনচন্দ্র রচনাবলী

১ম খণ্ড/গ্রাহক মূল্য : ১০্ টাকা।

ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী

৩ খণ্ড। গ্রাহক মূল্য : ২৫্ টাকা

রঙ্গলাল রচনাবলী

১ খণ্ড। গ্রাহক মূল্য : ৯্ টাকা।

দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

শারদীয়ার

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

হিণ্ডালিয়াম®

বাসণপত্র সচ্ছল গৃহস্থালির মস্ত সহায়

হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিঃ

পোঃ অঃ রেণুকুট, জেলা মির্জাপুর (ইউ পি)

ভুবনেশ্বর বেড়াতে গেলে ক্যাজিনো এয়ার কন্ডিশনড্ রেস্টুরেন্টে যেতে ভুলবেন না!

ভ্রমণের শান্তি পেতে হ'লে চাই এই সঙ্গীতমুখর রেস্টুরেন্টে সুপরিবেশিত খাদ্যের স্বাদ, যা আপনি কখনও ভুলবেন না! চাইনীজ, কন্টিনেন্টাল, ভারতীয় মোগলাই ও তন্দুরী, আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন। পরিবেশ ও পরিবেশন অত্যন্ত মনোরম।

Casino

এয়ার-কন্ডিশন্ড্ রেস্টুরেন্ট

ভুবনেশ্বর

CSM 73-562

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৬—১৯৯	সুন্দর বিষাক্ত ফল	(উপন্যাস)	—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
২০০	পিণ্ডদান	(গল্প)	—শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
২০৩	স্ত্রী	(গল্প)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২০৬	গদ্যপদ্য ও একালের জীবন		—শ্রীকৃষ্ণ ধর
২০৮	যেখানে মন	(গল্প)	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
২১৩	আলেকজাণ্ডার ডাফ ও বাঙালী সমাজ		—শ্রীঅলোক রায়
২১৬	বাঁশের বোমা	(গল্প)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২২০	সেরা	(গল্প)	—শ্রীসুশীল রায়
২২৩	অনীশের জন্মদিন	(গল্প)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
২২৭	নামচেবাজারের পথে		—শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২৪৮	শেষ অশ্বারোহী	(গল্প)	—শ্রীতারাপদ রায়
২৫১	গারো পাহাড়ের ফুলেশ্বরী		—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
২৫৪	বঙ্গযামিনী	(ফরাসী উপন্যাস)	—ফাদার দ্যতিয়েন
২৬৩	আত্মহত্যার পর	(গল্প)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
২৬৬	আবরণ	(গল্প)	—শ্রীশেফালী চট্টোপাধ্যায়
২৬৮	মা বড় জঞ্জাল	(গল্প)	—শ্রীসবিতা সেনগুপ্ত
২৭০	গৃহিণীদের মনের মতো		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। মূল্য ৫·০০

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শ্রীমনোমোহন বসু। মূল্য ৭·০০

ছান্দসিকী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। মূল্য ৭·৫০

ছন্দ—তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন—ডাঃ তারাপদ ভট্টাচার্য। মূল্য ১৫·০০

দাশরথি রায়ের পাঁচালী— ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী। মূল্য ১৫·০০

গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার। মূল্য ১৫·০০

জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (ভগবদ্ গীতা ও Praxiology) হরিচরণ ঘোষ। মূল্য ৫·০০

শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি—(কমলা বক্তৃতামালা) — শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী। মূল্য ১২·০০

মহাভারত—কবি সঞ্জয় বিরচিত—ডাঃ মুণীন্দ্রকুমার ঘোষ। মূল্য ৪০·০০

শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীত—শ্রীগুরুসদয় দত্ত ও ডাঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৫·০০

মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীদিলীপকুমার রায়। মূল্য ৫·০০

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রকাশন বিভাগ। ৪৮নং হাজরা রোড কলিকাতা—২৫

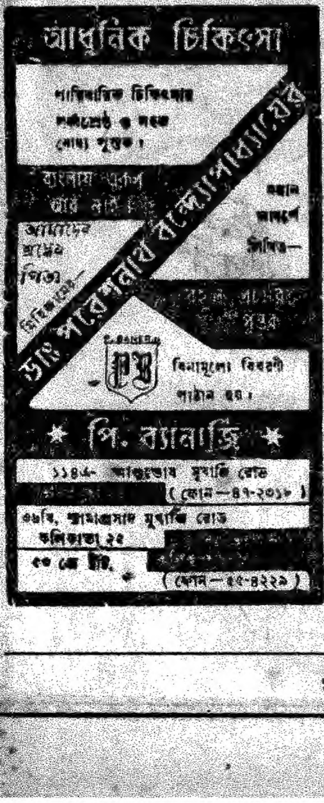

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও চিকিৎসা
বই মূল্য ৭

মুখ্য বিক্রয়কেন্দ্র আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ঃ

১১৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ ফোন ৪৭২৩১৮
৫৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন ৫৫৪২২৯
হেড অফিস ঃ ৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ ফোন ৪৭৫০৮১

পাইকারী ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করুন।

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।
ডাটা
গুঁড়া মশলা
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৭৪	উৎসর্গ মহিমা	—শ্রীবিন্দু মুখোপাধ্যায়
২৭৯	জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রসঙ্গে	—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি)
২৮৩	বাংলা রঙ্গালয়ে মঞ্চরীতির বিবর্তন	—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
২৮৫	রবীন্দ্র সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধানে	—শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৮৬	শিকারি শিল্পী জিম করবেট	—শ্রীবিশ্বনাথ বসু
২৯৪	খেলাধুলায় ছোট ও বড়দের ভূমিকা	—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
২৯৬	জটিল জলস্রোত (উপন্যাস)	—শ্রীসমীর রক্ষিত
৩২৪	মধ্যম আলো (গল্প)	—শ্রীনির্মল সরকার
৩২৭	একটি অদ্ভুত কাহিনী (গল্প)	—শ্রীশৈলেশ রায়

চিত্রতারকাদের অফসেট ছবি : সুকুমার রায়
অলংকরণ : ধ্রুব রায় : নিতাই ঘোষ,
কাশীনাথ অধিকারিক, প্রদীপ দাস, শংকর সেন।

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্নিদূত
নক্ষত্রের জন্ম ৩.০০

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
লাজার্স লেন ৩-২৫

মনোজ মিত্রের
চাক ভাঙা মধু ৩-৫০

সমর মুখোপাধ্যায়
মৃতদেহ ৩.২৫

দিলীপ মৌলিক ও শান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত
আজকের একাঙ্ক ৫.০০
(৬টি একাঙ্কের সংকলন)

নতুন রাতের একাঙ্ক ৬-০০
(৬টি নতুন একাঙ্ক)
(ক্যাটালগের জন্য লিখুন)

লিপিকা
৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

শেকসপীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে যা থাকছে:—সমগ্র সনেট অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, দি রেপ অফ লিউক্রিস টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা, কমেডি অব এরর্স টেমিং অফ দি শ্রু, লাভস লেবারস লস্ট এ মিডসামার নাইট ড্রীম, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, অ্যাজ ইউ লাইক ইট রোমিও জুলিয়েট। প্রত্যেকটি নাটকের নাট্যরূপ (আক্ষরিক বাংলায় অনুবাদ) দিয়েছেন বাংলার বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। তিন খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০.। রেক্সিনে বাঁধাই। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

মোপাঁসা রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা

টলস্টয় রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা।

গিরিশ রচনাবলী

সম্পাদনায় — দেবনারায়ণ গুপ্ত ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০.৫০

সমগ্র বঙ্গদর্শন

অক্ষয় শ্রীশচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা।

দামোদর রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা

রাজনারায়ণ রচনাবলী

এক খণ্ডের দাম ১০. টাকা।

ভূদেব রচনাবলী

সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ২ খণ্ডে, প্রতি খণ্ড ১০ টাকা।

হেমচন্দ্র রচনাবলী

সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ৫. টাকা। গ্রাহক হবার মনি অর্ডার পাঠাবার মূল কেন্দ্র :—জ্যোতি প্রকাশন, ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯। অন্যান্য কেন্দ্র :—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি:-১২, ফোন : ৩৪-৪৩৫৬। পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলি:-৯, ফোন : ৩৪-৯৫৯২ ॥ টাউন লাইব্রেরী, বনগাঁ ॥ গ্রন্থভারতী, জলপাইগুড়ি ॥ জোনাকি, কুচবিহার ॥ বইঘর, আলিপুরদুয়ার ॥ বোলপুর পুস্তকালয়, বোলপুর ॥

SISTA'S-DIL-1096 BEN
প্রত্যেকটি সুন্দর মুখের
আড়ালে সবসময়ে
রয়েছে একটি
সুন্দর রহস্য—
উপহার
ল্যাক্টো-ক্যালামাইন
ডুফার-ইন্টারন্যাশান লিঃ
পোস্ট বক্স নং ৬৫৮২, বোম্বাই ৪০০০১৬
মুখশ্রী পরিচর্যার গোপন রহস্য

আজি এ শারদ প্রাতে

বর্ষণক্লান্ত আকাশ শরতের হালকা মেঘের পতাকা উড়িয়ে জানিয়ে দিল, শারদোৎসবের পুণ্যলগ্ন সমাগত। এই আনন্দোৎসবের প্রতীক্ষায় আমাদের দিন কেটেছে। এবার মানুষের মন দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত। খরা এবং প্লাবনে ধরিত্রী তার অন্তরের সুধারস তুলে দিতে পারেনি প্রত্যাশিত মানুষের মুখে। এ আমাদের দুঃখের বৎসর। তবু এই ম্লান গৃহকোণেই আমরা এবার আনন্দরূপা জগজ্জননীর আসন পেতে রেখেছি। তিনি আমাদের হৃদয়ে দেবেন শান্তি ও স্বস্তি। তাঁর কল্যাণস্পর্শে সংসারের দুঃখতাপিত জনের সমস্ত গ্লানি যাবে দূর হয়ে। শরত তার সম্ভার নিয়ে আবার ভরিয়ে দেবে বঞ্চিতের গৃহাঙ্গন।

আত্মশক্তির আবাহনই এই উৎসবের মূল মন্ত্র। সমস্ত ভীরুতা, দুর্বলতা এবং দ্বিধা দূর করে কঠিন ও কঠোরের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস এনে দেন তিনি যাঁর জন্য মঙ্গলঘট পাতা হয়েছে ঘরে ঘরে। বাংলার এই উৎসব মানবিকতার বিজয়োৎসব। অকল্যাণের বিরুদ্ধে কল্যাণশ্রীর প্রতিষ্ঠা, অশুভকে পরাহত করে শুভবুদ্ধির জাগরণ এই উৎসবকে দিয়েছে এক চিরকালীন মহিমা।

বাংলার ঘরে তিনি জননী ও কন্যা দুই-ই। তাঁর পিতৃগৃহে আগমনের রূপকটি সামাজিক সত্যেরই সুন্দরতম বিকাশ। বাংলার মানুষ তাঁকে একান্ত আপন করে পেতে চায় বলেই তিনি দেবী হয়েও লোকায়ত কল্পনার কল্যাণী কন্যার রূপ ধরে আসেন পিতৃগৃহে। ধ্যানে যাঁর গরীয়সী রূপ, লোকভাবনায় তিনিই শান্তশ্রী অপরূপা। প্রতিদিনের জীবনসত্যে, মানবহৃদয়ের স্নেহকোমলতায় তাঁর অভিষেক। এই লোকায়ত বন্ধনেই তিনি যেন চিরকালের জন্য আমাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী।

শারদোৎসবে আমরা সেই সত্যকে নতুন করে পাই। আমরা কেউ একা নই। সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই শুভকে আমরা অর্জন করি, অশুভের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াই। দুঃখের তিমির রাত্রিতেও তাঁরই মঙ্গলালোক আমাদের পথ দেখায়। সুখের দিনেও তিনি আমাদের দেন সংযম ও কল্যাণবুদ্ধি। আজকের দিনে হতাশা বা সংকট যেন আমাদের সেই সত্য থেকে বিচ্যুত না করে; যা ধ্রুব, যা চিরসত্য, যার ভাস্বরজ্যোতি চিরঅম্লান তাকে লক্ষ্য করেই যেন আমরা সাময়িক সংকট উত্তীর্ণ হতে পারি। শারদোৎসব আমাদের প্রাণের আনন্দোৎসবে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। বহুজনের সুখ ও বহুজনের হিতের জন্য যে উৎসবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, জগজ্জননীর আশীর্বাদে তার আলোক আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর করে দিক। এই প্রার্থনা জানিয়েই আমরা উৎসব অঙ্গনে বিশ্বজনের কাছে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব ও মনুষ্যত্বের সাধনা

ত্রিপুরা শঙ্কর সেন

শক্তিসাধনা ভারতীয় সাধনার একটি প্রধান ধারা হলেও অঞ্চলভেদে এই সাধনার বিচিত্র রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন,—রুচিভেদে ও প্রকৃতিভেদে মানুষের সাধন-পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র এই অধিকার-ভেদের কথা তো স্বীকার করেনই, পরন্তু তন্ত্রাচার্যগণ বলেন, অঞ্চলভেদে ভৌগোলিক পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার ভিন্নতার জন্যেও সাধকগণকে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এই জন্য আমরা বাংলা, আসাম দাক্ষিণাত্য, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ভারতের বাইরে শক্তিসাধনার বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। আর এইজন্যই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্গতিহারিণী দেবী দুর্গা পূজিতা হলেও বাঙালীর শারদীয়া পূজা বা দুর্গোৎসবে বঙ্গসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট রূপ প্রতিফলিত হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দেবতার পূজা ও ধর্মীয় উৎসব এক জিনিস নয়। পূজার ভিতর দিয়ে উপাসক উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হন, তাঁকে নমস্কার করেন, তাঁর গুণগান করেন, তাঁর কাছে অন্তরের আকুতি নিবেদন করেন, আর উৎসবের ভেতর দিয়ে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতাকে 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানিকে' অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়। উৎসবের এই সামাজিক দিকটার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন। বাস্তবিক উৎসবের ভিতর দিয়েই আমরা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আনন্দ-যজ্ঞে আমন্ত্রিত হই।

কিন্তু শারদীয়া পূজা বাঙালীর জীবনে শুধু দুর্গতিহারিণী দেবীর আরাধনা নয়, ইহা বাঙালীর জীবনে বৃহত্তম উৎসব। তাই এই দুর্গাপূজাকে বলা হয়েছে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ।

আমরা জানি, মূল রামায়ণে অর্থাৎ বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক দেবী দুর্গার অকাল-বোধনের কাহিনী নেই, সেই কাহিনী আমরা দেখতে পাই একাধিক পুরাণে। সম্ভবত মহাকবি কৃত্তিবাস পুরাণ থেকে এই কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন।* কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের কাহিনী না থাকলেও ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতে অর্জুনকৃত দুর্গাস্তব রয়েছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে সমরে জয়লাভের জন্যে দুর্গাদেবীর আরাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও অর্গলা স্তোত্রে মহাশক্তির নিকট শত্রু সংহারের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে—

'রূপং দেহি জয়ং দেহি
যশো দেহি দ্বিষো জহি'

'দ্বিষো জহি', অর্থাৎ শত্রুদের সংহার কর। দিব্য ভাবের সাধকরা, অবশ্য বলবেন—এখানে 'দ্বিষঃ' বলতে কামক্রোধাদি রিপুগণকেই বোঝাচ্ছে। শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবে আমরা পাই—

'অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার হেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে'।।

হে দেবি, অরণ্যে, দারুণ রণে, শত্রুমধ্যে, অনলে, সাগরে, প্রান্তরে ও

* দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও শ্রীমহাভাগবত পুরাণ দ্রষ্টব্য।

রাজস্থানে তুমিই একমাত্র গতি ও নিত্যাশ্রয়ী হে জগত্তারিণি, তোমায় নমস্কার, হে দুর্গে, তুমি আমাদিগকে ত্রাণ কর।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে, দেবী অম্বিকা যা দুর্গা নিখিল দেবতার শক্তিসমষ্টিরূপা,—মহিষাসুর-বধের জন্যে যখন দেবগণের দেহ থেকে সুবিপুল তেজ নির্গত হয়েছিল, তখন সেই ত্রিভুবনব্যাপী অনুপম তেজোরাশি মিলিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করেছিল। তারপর নিখিল দেবতার তেজঃপুঞ্জসম্ভূতা সেই দেবীকে দেবতাগণ নিজেদের অস্ত্রসমূহ প্রদান করেছিলেন। কুপিতা দেবী যখন গর্জন করেছিলেন, তখন—

চুক্ষুভুঃ সকলা লোকা
সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ
সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥

সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ হয়েছিল, সাগরসকল কম্পিত হয়েছিল এবং পৃথিবী ও ভূধরসকল বিচলিত হয়েছিল।

তারপর সিংহবাহিনী দেবী মহিষাসুরের সৈন্যগণকে ও মহিষাসুরকে বধ করলে দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন।

মহিষাসুর-বধ ভিন্নও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মধুকৈটভ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভবধের কাহিনী অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গা অসুরদলনী, ভক্তদের দুর্গতিহারিণী, বরাভয়দায়িনী, ভোগমোক্ষবিধায়িনী, তিনি ক্রোধহীনা ও ক্রোধশীলা, তিনি চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী, মঙ্গলস্বরূপিণী, সর্বসিদ্ধিদায়িনী, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তিনি মূলা শাশ্বতী প্রকৃতি, তিনিই ত্রিলোকে কর্মফলবিধায়িনী, নিখিল বিশ্বের রক্ষার জন্যেই তিনি শত্রু সংহার করেন আবার উদ্ধত অসুরদের স্বয়ং নিহত করে স্বর্গে প্রেরণ করেন। দেবী যে ভোগমোক্ষদায়িনী, শ্রীশ্রীচণ্ডী বা শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীতে তার প্রমাণ আছে। রাজ্যভ্রষ্ট নৃপতি সুরথ ও স্বজন-বঞ্চিত সমাধি নামক বৈশ্য—এঁরা দুজনেই মেধস মুনির নিকট দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু এর ফলশ্রুতি কি হয়েছিল? রাজা সুরথ চেয়েছিলেন হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে আর সমাধি চেয়েছিলেন সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে। তাঁরা দুজনেই দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করেছিলেন আর বরদা দেবী উভয়েরই মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন।

কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রাদিতে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য যে ভাবেই কীর্তিত

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

১৯৭৩-৭৪-৭৫

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন ১ম খণ্ড—৩য় সংস্করণ (Indian Philosophy)	9.00
ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ (Indian Philosophy)	3.50
পাশ্চাত্য দর্শন—১ম সংস্করণ (Western Philosophy)	9.00
পাশ্চাত্য দর্শন (দর্শনের ইতিহাসসহ)—৩য় সংস্করণ	12.00
নীতিবিজ্ঞান —৮ম সংস্করণ (Ethics)	9.00
সমাজদর্শন—৮ম সংস্করণ (Social Philosophy)	9.00
মনোবিদ্যা —৬ষ্ঠ সংস্করণ (Psychology)	18.00
Handbook of Social Philosophy — 2nd edition	13.00
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— ২য় সংস্করণ (বেকন হিউম)	9.00
ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion)	14.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক শুভেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—২য় সংস্করণ (Principles of Education)	10.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সংস্করণ (Edu. Problems)	12.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৩য় সংস্করণ (Edu. Psychology)	16.00

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ভারতের সংবিধান (Indian Constitution)	5.00
আধুনিক সংবিধান (Modern Constitution)	6.00

বাংলা সাহিত্য (Bengali Literature)

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

কুলীন কুলসর্বস্ব (নাটক)	10.00

ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা	8.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B. Ed., P.G. Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ (General Methods)	15.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Eco. & Civics)	10.00
ভারতের শিক্ষা-সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)	3.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস ......y Method)	12.00

অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস (History of Education)	15.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব (Principles and Practice)	(যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান (Psychology)	20.00

শ্রীমতী দীপিকা পাল প্রণীত

শিশুদের সহজ কথা (Pre-Primary)	3.00

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯। ফোন ৩৪-৭২৩৪

হোক, বাঙালীর দুর্গোৎসব তার নিজস্ব। শরৎকালে যখন মেঘমুক্ত আকাশ আমাদের অন্তরে পুলক জাগায়, শিউলি ফুলের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়, যখন 'পারে না বহিতে নদী জলভার, মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর', সেই সময়ে আনন্দময়ীর আগমন ঘটে এই বঙ্গভূমিতে, সঙ্গে আসেন কমলবন বিহারিণী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী বাণী, মদনরূপী কার্তিকেয় ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। এই সময়ে একদিকে প্রতিটি পূজামণ্ডপ চণ্ডীপাঠে মুখরিত হয়, অপরদিকে আগমনী ও বিজয়ার গান বিষাদমিশ্রিত আনন্দের অশ্রুতে আমাদের চক্ষু সিক্ত করে, আকাশে-বাতাসে ভেসে আসে একটা করুণ রাগিণী। অথচ এই যে বাংলা-রসাশ্রিত আগমনী ও বিজয়ার গান, এ তো বেশী দিনের পুরানো নয়, ভক্ত কবি রামপ্রসাদই এর প্রবর্তক। রামপ্রসাদের সময়ে হিন্দু সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই, গৌরীদানের প্রথা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে, তবু বাঙালী হিন্দুর কাছে আগমনী ও বিজয়ার গানের আবেদন চিরন্তন। এমন কি, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় দীক্ষিত মধুসূদন তাঁর প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে মেঘনাদ-বধ ও প্রমীলার চিতারোহণের পর লঙ্কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

'বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে'।

বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব অবদান।
বিশ্ব পুরী জ্ঞানী মনীষীদের সমাদৃত লেখক ভারতের ডক্টর রাধাকৃষ্ণান যুক্তরাষ্ট্রের রাজ কবি জন ম্যানফিল্ড ও যুক্ত স্টেটের পুলিটজার পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ।

এন মুখোপাধ্যায়ের

জগদ্গীতা। বড় উপন্যাস। মূল্য ১৮ টাকা। ৯৪৮ পৃষ্ঠা
বৃহৎ চিন্তাধর্মী সামাজিক উপন্যাস। প্রেম ও প্রাণের মহান প্রকাশ। **যুগান্তর**—এ যেন এক বিরাট মহাভারত। **আনন্দবাজার**—তত্ত্বজ্ঞ লেখক তাঁর উপলব্ধ এক জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত ও চরিত্রগুলি আলোকিত।

অঞ্জলি। গীতিকাব্য। মূল্য ৫৲। ৩৫৪টি গানের সমাবেশ। রবীন্দ্র প্রতিভাদীপ্ত সঙ্গীতের ধারা। সঙ্গীত সাধকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের পরে এ ধরণের পুস্তক আর বাহির হয় নাই। **যুগান্তর**—অঞ্জলি বইখানির নাম। প্রত্যেকটিতেই তাহা সার্থক হয়ে উঠেছে। এই ডালিখানি স্নিগ্ধতা শুচিতা আর আত্মিক প্রেরণায় উদ্ধৃদ্ধ। **আনন্দবাজার**— বইখানি গীতিধর্মী, সুরে ও ছন্দে ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ডবল ডিমাই ১৬ পেজি এণ্টিক ছাপাই ও বাঁধাই সুন্দর।

দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

আর সুদূরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান কালে তিনি বিজয়া সম্পর্কে একটি সনেট রচনা করেছেন। শুধু মধুসূদন নয়, শ্রীরামপ্রসাদের পরবর্তী বহু কবি ও সাধকই আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করেছেন।

আমরা প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করে থাকি কিন্তু এই পূজার যথার্থ তাৎপর্য আমরা ভুলে গেছি। তাই শক্তিপূজা করেও আমরা শক্তিহীন, জগন্মাতার আরাধনা করেও আমরা ভেদবুদ্ধিতে জর্জরিত। 'আমরা কি মানুষ'? এই আত্মজিজ্ঞাসাও আমাদের নেই।

●

মহালয়ার অমাবস্যা তিথিতে দুর্গোৎসবের সূত্রপাত। কিন্তু এই মহালয়া কি? সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা বা সবিকল্প-সমাধিতে চিত্তের যে লয় হয়, তা নৈমিত্তিক বা সাময়িক, কিন্তু মহেশ্বরীর ইচ্ছায় সাধক যখন তাঁর চরণে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে শান্ত ও সুখী হন, তখন তাঁর সেই লয়ই হয় সত্যিকারের মহালয়। মহালয়া মহা লয়ও বটে আবার মহা আলয়ও বটে। মাতৃক্রোড় আমাদের পক্ষে পরম বিশ্রামের স্থান তাই, জগন্মাতা যখন আমাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দেন, আমরা যখন সকল ভয় ও ভাবনা থেকে মুক্তিলাভ করি, তখন থেকেই আমাদের জীবনে দেবীপক্ষের আরম্ভ হয়। যখন আমরা মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখনই মাতৃপূজার আমরা যথার্থ অধিকারী হই।' এইজন্যে, জগজ্জননীর পূজার প্রস্তুতি হিসাবে আমরা পিতৃপক্ষে তর্পণের মন্ত্র পাঠ করি। এই তর্পণের মন্ত্রের চাইতে উদারতর মন্ত্র কস্মিন্ কালে কোনো ঋষি বা মহামানবের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়নি। আমাদের এই পিতৃযজ্ঞের মূলে রয়েছে সর্বভূতে মৈত্রী-ভাবনা, মানবতার আদর্শও এর কাছে তুচ্ছ। তর্পণকালে আমরা প্রতিদিন উচ্চারণ করি,—'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত জগৎ তৃপ্যতাম্'। যাঁরা জানতেন—'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্', একমাত্র তাঁরাই ছিলেন এইসব মন্ত্রের দ্রষ্টা।

উপনিষদ বলেছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি সমদর্শী হয়ে থাকেন, কেননা, তিনি সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন। ঈশোপনিষদে তাই বলা হয়েছে—

'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং
ততো ন বিজুগুপ্সতে'।।

যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত ভূতকে নিজের আত্মাতে দর্শন করেন, এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সমদর্শিতা-হেতু কাউকে ঘৃণা করেন না অথবা কারো কাছ থেকে নিজেকে গোপন করতে ইচ্ছা করেন না।

বাস্তবিক, পিতৃ-তর্পণ মন্ত্রের অর্থ-ভাবনার ভিতর দিয়ে আমরা সমদর্শিতা লাভ করতে পারি। আর যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, একমাত্র তিনিই তো মাতৃ-পূজার অধিকারী।

তারপর, পঞ্চমী তিথিতে বিল্ববৃক্ষ-মূলে দেবীর বোধন হয়ে থাকে। একটি প্রাচীন গানে আছে—

'গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষ-মূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন
ঘরে আসবেন চণ্ডী
শুনবো কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী,
যোগী জটাধারী'।

আমাদের ভিতর কুণ্ডলিনীরূপে যে মহাশক্তি নিদ্রিতা আছেন, তাঁকে জাগ্রত করতে না পারলে শক্তিসাধনায় আমাদের অধিকার জন্মে না। ইহাই বোধনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ,' অর্থাৎ, স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করবে।

অবশ্য একদিক থেকে বলা যায় যে, ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা মানেই দিব্য রূপান্তরের সাধনা। সাধকরা সাধনার দ্বারাই পঞ্চ দেহ, সিদ্ধ দেহ বা ভাগবতী তনু লাভ করে থাকেন। ভগবান খৃষ্টের মতেও আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম লাভ না করে কেউ স্বর্গরাজ্য-প্রবেশের অধিকারী হন না।

বর্ষে বর্ষে বাঙালী যে দুর্গোৎসব করে থাকে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের সাধনা। আমরা জানি, সিংহবাহিনী জননীর সঙ্গে যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের আগমন হয়, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও গণশক্তির প্রতীক। লক্ষ্মী শুধু ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন,—যেখানে সম্পদ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেখানেই লক্ষ্মী বিরাজ করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বহুলরূপে ধনসম্পদ্ যাদের জীবনের লক্ষ্য তারা লক্ষ্মীর উপাসক নয়। কারণ, লক্ষ্মীর অন্তর্নিহিত ভাবটি হচ্ছে কল্যাণ, অর কুবেরের হচ্ছে বহুলতা। আবার সরস্বতী হচ্ছেন পরা ও অপরা বিদ্যার (চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা এর অন্তর্গত) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেশে যখন ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও গণশক্তির মিলন ঘটে, তখনই দেশের অভ্যুদয় বা সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা চাই সম্পদ, চাই পরা ও অপরা বিদ্যা, চাই দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বল, চাই সকল কর্মে সিদ্ধি।

পরিণাম যা কিছু হোক এক, সুরথকে তার মওকা নিতে সে দেবে না।

ভ্যাইভিং দরজাটা ঠেলে বাইরে মুখ বাড়িয়েই লোকটাকে দেখতে পেয়েছে সুরথ।

চেহারাটাই অস্বস্তি জাগাবার মত। পোষাকটাও তাই।

লম্বা পাকানো গোছের শরীর। বয়স ত্রিশ পঁইত্রিশের কাছাকাছি বলে মনে হয়। পরণে একটা আঁটসাট তলায় বুটের মধ্যে ঢোকানো প্যান্ট, হাত কাটা শার্টটাও গায়ে যেন লেপ্টানো। পোষাক বা চেহারা কোনটাতেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর ছাপ আছে বলে সুরথের মনে হয় নি।

সে স্পষ্টই বেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়েছে। লোকটাও তাকিয়েছে তার দিকে। সে দৃষ্টিতে একটা যেন কৌতুক মেশানো তাচ্ছিল্য সুরথকে ক্ষুব্ধ করেছে সবচেয়ে বেশী।

ভেতর থেকে অলকা তখনও তাকে টানছে কিন্তু সুরথ তা গ্রাহ্য না করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবার। আসবার সময় নিজের অজান্তেই করিডোরের সামনের জানলার ওপর ঝোলানো লাল অ্যালার্ম চেনের হ্যান্ডেলটা তার চোখে পড়েছে। দরকার হলে নিশ্চয় সেটা টানবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার একটু অসুবিধাও আছে।

লোকটা ঠিক চেনটার তলাতেই দাঁড়িয়ে রীতিমত লম্বা বলে তার মাথাটা প্রায় হাতলটার কাছাকাছি। দূরে অন্য যে চেনের হাতলটা আছে সেটাও টানার চেষ্টা করা যায় কিন্তু বাধা দেবার মতলব থাকলে লোকটা সে চেন পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এ সব ভাবনা এমন গুছিয়ে ধাপে-ধাপে যান্ত্রিকভাবে সুরথের মনের ভেতর দিয়ে অবশ্য বয়ে যায় নি। দু-এক মুহূর্তের একটা আবছা চমক দিয়ে গেছে মাত্র।

উত্তেজনার মাথায় সে প্রথম নিজেকে আর সামলাতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছে,—আপনি! আপনি দরজায় বা দিয়েছিলেন! এখানে ঢুকলেন কি করে?

সুরথের কথাগুলো ঠিক প্রশ্নের মত শোনায়নি। তার কিছুটা যেন অবিশ্বাস আর বাকিটা অভিযোগ। সে অবিশ্বাস আর অভিযোগ তার চোখের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্ট। অলকা তখনও সুরথের হাতটা ছাড়ে নি। সেটা জড়িয়ে ধরে এক সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে। তার চোখের দৃষ্টিতেও অবিশ্বাস কিন্তু তার সঙ্গে অভিযোগ নয় একটা আতঙ্কের আভাসই মেশানো। লোকটা যেন তার চোখের সামনেই হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে।

মিলিয়ে সে অবশ্য যায় নি। সুরথের প্রশ্নটা শোনার পর বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অলকাকেই এমন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে যে অস্বস্তির সঙ্গে অলকার আতঙ্কটা আরো বেড়ে গেছে।

কি উত্তর দিচ্ছেন না কেন? সুরথের কণ্ঠস্বরও তীব্র হয়ে উঠেছে সেই মাত্রায়।

উত্তর আপনাকে কি দিতেই হবে! —এবার সরব হয়েছে লোকটি। গলার স্বরের অবজ্ঞাটা বেশ স্পষ্ট।

নিশ্চয় দিতে হবে! —সুরথ রূঢ় হয়ে উঠেছে আরো—রাত্রে সমস্ত দরজা আমি নিজের হাতে লক করেছি। কোন দিক দিয়ে কারুর পক্ষে ঢোকা অসম্ভব।

তবু ত আমি ঢুকেছি দেখতে পাচ্ছেন। ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই তাহলে ধরে নিন।

কথাটার বিদ্রূপের সুর থাকলেও লোকটিকে কেমন যেন অস্থির মনে হয়েছে। কথাটা শেষ সে যেন চলে যাবার জন্য ব্যস্ত।

এ অস্থিরতাটা লোকটার অপরাধী মনেরই প্রকাশ মনে করে সুরথ এবার প্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করেছে অভদ্রভাবে, এ ক্লাসের টিকিট আছে আপনার।

সে জবাবটাও আপনাকে দেবার নয়, তবু বলছি শুনুন। টিকিট আমার নেই। আর আপনার টিকিট থাকলেও এ রকম কামরায় কখনো চড়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।

বেশ দুপাজরে কথাগুলো বলে লোকটা ওদিকের কামরাটার দরজাই খুলতে যাচ্ছিল।

দাঁড়ান। তীব্র শাসনের স্বরে সুরথ তাকে থামিয়ে দিয়েছে। তারপর লোকটার শেষ অপমানকর ইঙ্গিতে এক রকম ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছে,—আমি এক্ষুনি চেন টেনে গাড়ি থামাতে পারি জানেন?

জানি! —লোকটির গলা এবার অনেক যেন শান্ত মনে হয়েছে,—থামানোতে লাভ হলে আমিই এখুনি থামাতাম। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তাই আপনাকেও চেন টানতে আমি দেব না। সে চেষ্টা করা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়।

শেষ দিকটায় লোকটির গলাটা শান্ত হলেও যেন বজ্রকঠিন মনে হয়েছে অলকার। মুখে কিছু সে বলতে পারে নি কিন্তু সভয়ে স্বামীকে নিজেদের কামরায় টেনে নেবার চেষ্টা করেছে।

লোকটির গলাই শোনা গেছে আবার। স্বরটা তখনও শান্ত কিন্তু একটা অধৈর্য যেন তার মধ্যে পুরোপুরি চাপা থাকছে না।

খুব বেশী গরজ যদি থাকে,— লোকটি বলেছে, — তাহলে এ দিকের মাঝখানের দরজাটা টেনে খুলে ও ধারের থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে যেতে পারেন। টি টি আই সেখানে একজন আছেন দেখে এসেছি।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছে সুরথ। লোকটির অলৌকিকভাবে এ কামরায় আবির্ভাবের রহস্যটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই সহজ ব্যাখ্যাটা তার মাথায় যে আসে নি এটাই আশ্চর্য।

লোকটির এ কামরায় উপস্থিতির রহস্যটা বুঝতে পারলেও সুরথের রাগ কিন্তু পড়ে নি। উত্তেজিতভাবে ওদিক থেকে টি টি আইকে ডেকে আনবার জন্যেই সে পা বাড়িয়েছে।

লোকটি কিন্তু সুরথের দিকে আর দৃষ্টিই দেয় নি। সুরথকে যেতে দেখে সভয়ে অলকাও তার পিছনে যাবার জন্যে অগ্রসর হতে যাচ্ছিল। বাধা পেয়েছে লোকটির কাছে। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে অলকাকে আটকে দিয়ে লোকটি বলেছে,—মাপ করবেন। আপনার যাওয়া হবে না। আপনাকে একবার এই কামরায় যেতে হবে।

প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেছে অলকা। সমস্ত মুখ তার ভয়ে তখন পাণ্ডুর। একটা আর্ত চিৎকার তার শুকনো গলায় আটকে গিয়েছে।

ওদিকে সুরথও তখন ফিরে দাঁড়িয়েছে।

কামরার দরজাটা সেই মুহূর্তে খুলে দিয়েছে লোকটি। অলকা ফিরে তাকিয়েছে। দেখেছে তারই বয়সী একটি মেয়ে যন্ত্রণায় দু ভাঁজ হয়ে সেখানে সীট ছেড়ে মেঝের ওপর পড়ে কাৎরাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটা এক মুহূর্তে ছবির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে অলকার কাছে। তাদের কামরার দরজায় লোকটির বা দেওয়া, অলকাকে বিশেষ ও একটু অভদ্রভাবেই লক্ষ্য করা, আর ওদিকের তৃতীয় শ্রেণী থেকে বিনা টিকিটে এ দিকে এসে ঢোকার কারণগুলোর কোনটিই আর তার কাছে অস্পষ্ট থাকে নি।

কিছু সে করতে পারবে কি না জানে না। কিন্তু সুরথের সম্মতির জন্যে অপেক্ষা না করেই সে কামরার ভেতরে ঢুকে গিয়েছে এবার।

পুনর্নবা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ডাক্তার কী বলে?'

'রিপোর্ট এখনো আসেনি।'

'কবে আসবে?' কঙ্কনা দুর্বল চোখে তাকাল।

'দু-একদিনের মধ্যেই আসবে হয়তো।' সঞ্জয় দৃঢ়স্বরে বললে, 'রিপোর্টে থাকবেটাই বা কী! ডাক্তার বলেছে, আমার কোনো দোষ নেই।'

অপরাধীর মত মুখ করল কঙ্কনা। তবে দোষ কী তার?

পরিহাসের সুরে সঞ্জয় বললে, 'ইচ্ছে করে প্রমাণ করে তোমাকে দেখাই। আগের দিনে হলে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে আরেকটা বিয়ে দেওয়াত।'

'ঘরে সতীন আনত?'

'আর স্বামী সেই দ্বিতীয়ার কোলে ছেলে এনে তার পৌরুষের প্রমাণ দিত।'

তেমনি স্ত্রীকে অন্য পুরুষে রত হয়ে প্রমাণ করতে দাও না সে মা হবার যোগ্য, সে অফলা নয়। কথাটা জিভের ডগায় এসেছিল, কঙ্কনা দ্রুত ফিরিয়ে নিল। ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'যাও না, আরেকটা বিয়ে করো না। দেখি তোমার মুরোদ।'

সঞ্জয় হাসল। বললে, 'আইনে সে সুযোগ আর নেই। কী সুখ-সুবিধের দিনই গেছে! এখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গেলেই শ্রীঘর।'

শুধু রিপোর্টটা আসেনি, তাই মন লাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে না কঙ্কনা। কে জানে ডাক্তার যদি তাকে দোষী করে!

তবু সতীনের কথা তোলাটা দারুণ নিষ্ঠুরতা।

কঙ্কনা বললে, 'বিয়ে ছাড়া এমনিতেই তোমার জেল হওয়া উচিত।'

'আমি জেলে থাকলে তুমি মা হবে কী করে?'

কথাটা অন্যভাবে লাগল কঙ্কনাকে। যদি ত্রুটিটা সত্যি তার হয়!

কঙ্কনা হঠাৎ স্বামীর কাছাকাছি সরে এল। গম্ভীর মুখে বলল, 'যদি ডাক্তার বলে দোষটা সত্যি আমার?'

'তা হলে চিকিৎসা করতে হবে। অপারেশন দরকার হলে অপারেশন।'

তবু যেন অন্ধকার দেখল কঙ্কনা। বললে, 'তাতেও যদি না সারে?'

'কত অসুখই তো সারে না। সেটা আবার একটা সমস্যা কী!' সঞ্জয় উড়িয়ে দিতে চাইল : 'এ তো কোনো

জীবনসংশয় ব্যাধি নয়। বেঁচে তো থাকবে।'

'বেঁচে তো থাকবে! কিন্তু এ বাঁচায় পূর্ণতা কই?'

'সন্তান না হলে কোনো মেয়ে আর ব্যর্থ হয়ে যায় না।' সঞ্জয় আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তোমার ভাবনা কী. তোমার কাজ আছে, বই আছে, গান আছে, সেলাই আছে, কত কী আছে—সব চেয়ে বড় কথা, তোমার আমি আছি।'

এতেও যেন ভরাট লাগে না কল্পনার। বই—অনুবাদের ছড়া বই, গান—অনুরোধের আসর বই, সেলাই—কাঁথা সেলাই বই, কাজ—বই সেই বিস্তারিত ধোয়া-পাখলা?

'আমার রিপোর্টটা পাওয়া গেল?' দিনকয়েক বাদে কল্পনার যেন আর কৌতূহল নেই।

'পাওয়া গেছে।' একদিন বললে ঠিক সঞ্জয়।

'কী বলে?'

'তুমিও নির্দোষ।'

'সত্যি?' ওটাই যেন কত বড় তৃপ্তি তেমনি প্রশান্ত নিশ্বাস ফেলল কল্পনা।

তবে নিশ্চয়ই এবার আকাশ জুড়ে দিগ্বিদিক মেঘ করবে, হবে অঝোর বর্ষণ আর কর্ষিত উর্বর মাটিতে বাঞ্ছিত ফসল ফলবে।

কিন্তু কই, দিন যায় মাস যায় সেই শুভক্ষণ সঞ্চার কই?

অতিষ্ঠ হয়ে উঠল কল্পনা, সঞ্জয়কে অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। কিন্তু দৈবের কাছে পুরুষকার কী করবে?

তারপর সত্যি সত্যি কল্পনা দৈবের দুয়ার ধরল। শুরু করল মানত করা। টোটকা-টোটকা, ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র পুরোহিত-গণক।

'কেলেঙ্কারির একশেষ করে ছাড়লে। লোকে বলে কী!'

'লোকে বলে বলেই তো এত। মেয়ে মহলে যেখানেই যাই সেখানেই গঞ্জনার সুরে শুনি—ও মা, ছ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো কিছু হল না? কী রকম পরাজিতের মত মনে হয় নিজেকে।'

'লোকের কথায় কী আসে-যায়?' সঞ্জয় উদাসীনের ভাব করল।

'শুধু লোকের কথাই হতে যাবে কেন?' কল্পনা চোখ নামাল।

'সন্তান হয়েই বা কেন কত শান্তি। জানো তো পুত্র—হলে দুঃখ, না হলেও দুঃখ। ও এমনি শত্রু। হলে দুঃখ, আবার ম'লে দুঃখ। না হয়েছে বেশ হয়েছে। কাঁদা-ঘামার চেয়ে নেই-মামাতে অনেক শান্তি। ছেলের অমানুষ হবার ভয় নেই, মেয়ের অপাত্রে পড়বার কষ্ট নেই। এই সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট আছি।'

কিন্তু যতই কেননা বোঝাক, ভবী ভোলবার নয়। কল্পনার এক গান, এক ধ্যান—সন্তান।

শেষে একদিন সঞ্জয় বললে, 'তুমি ভীষণ সেকেলে।'

'আর সন্তান বুঝি একালের?'

কত লাস্য-লীলা ছিল কল্পনার, কত ভালোবাসার প্রসাধন, কত ভাব-ভঙ্গির কারুকলা। সেই সব লাবণ্যের প্রান্তরগুণ চলে গিয়েছে—এখন শুধু মোটা বিছানার চাদর।

শেষে একদিন কল্পনা বললে, 'ডাক্তার তোমার সম্পর্কে ঠিক কী বলেছে কে জানে, আমার বিশ্বাস দোষ তোমারই।'

'তা হলেই বা কী করা যাবে! মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'দোষ তোমারই।'

জয়ন্তীও না শেষে এমনিধারা অভিযোগ করে তাই আগে থেকেই সঞ্জয় খোলসা হল: 'তোমাকে বলে রাখি আমি কিন্তু বিবাহিত। শেষকালে যে বলবে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি তা চলবে না।'

'সে আমি আগে থেকেই জানি।' এতটুকু নিস্তেজ হল না জয়ন্তী।

'আগে থেকেই জানো?'

'বা, যে লোকটির প্রতি আমি আকৃষ্ট তার মোটামুটি পরিচয় আমি নেব না? আমি সব জানি।'

'সব জেনেও তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'তোমার কী মনে হয়?'

মনে হয়, ভালোবাসার শেষ তো বিয়েতেই—আর এ ক্ষেত্রে আমি যখন বিবাহিত—'

সশব্দে হেসে উঠল জয়ন্তী: 'সুন্দর বলেছ কিন্তু—ভালোবাসার শেষ বিয়েতেই। বিয়েতেই ভালোবাসার শেষ। কিন্তু এ আমার ভালো লাগা—ভালো লাগার শেষ নেই।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমি ভালোবাসা-টাসায় বিশ্বাস করি না। ও সব শুধু কথার প্যাতাবাহার।'

'তবে?'

'তবে তোমাকে আমার দারুণ ভালো লাগে। সে ভালো লাগায় তুমি বিবাহিত কি অবিবাহিত এ প্রশ্নের স্থান নেই। তোমার কায়িক অস্তিত্বটাই আমার কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণ। চলো পাশের ঘরে চলো।'

'পাশের ঘর মানে?'

'আমার ঘর।' জয়ন্তী সুস্পষ্ট করে হাসল: 'আমার একলার ঘর।'

দিদির ফ্ল্যাটে থাকে জয়ন্তী। তিন-ঘরী ফ্ল্যাট—মাঝের ঘরটা বসবার, দু প্রান্তের দুই ঘর দু বোনের থাকবার। দিদি কোন মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা আর বোন কোন মার্চেণ্ট অফিসের কেরানি। দুজনেই একাকিনী।

সঞ্জয়ের ভয় করতে লাগল। কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়বে না তো? কে জানে ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে? ভাবল ফিরে যাই। ফ্যাসাদ-ঝামেলার চেয়ে পলায়ন ভালো।

কিন্তু কী আশ্চর্য, জয়ন্তীর চোখে-মুখে ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে ভয়ের বিন্দু-বিসর্গও নেই।

প্রেমের ব্যাপারে সচরাচর পুরুষই অগ্রণী হয়, সে-ই নারীকে ঘরে চিত করে। সে-ই পথ দেখায়। ঘুম ভাঙায়। আর একবার ঘুম ভাঙাতে পারলে মেয়েই বহ্নিশিখা।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে জয়ন্তীই অগ্রনায়িকা। আপন তেজে আপনিই জ্যোতির্ময়ী।

'তুমি বিয়ে করবে না?' ভুক্তভোগী লোকের মত জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়।

'বিয়ে? বিয়েটা ভীষণ সেকেলে। জাতিভেদের মত এ প্রথাটাও উঠে যাবে। কেন, বিয়ের দরকারটা কী! এই তো সুন্দর। স্বাধীনতার মত জিনিস আর কী আছে!'

'কিন্তু যদি বিপদ হয়?'

'বিপদ আবার কী! বিপদ কোথায়?'

'তুমি কিছুই বলতে পারো না।'

'পারি। বিপদ হবে না। হলে তার ব্যবস্থা আছে।'

তবু যেন সঞ্জয়ের কুণ্ঠা যেতে চায় না। তার ইচ্ছে করে জয়ন্তীকে সে শুধু আদরে-মধুরে ডুবিয়ে রাখে, কথা গেঁথে গেঁথে তাকে কবিতার প্রতিমা করে তোলে। জয়ন্তীর ও সব গদগদে-পনা মোটেই পছন্দ নয়, সে নিছক রূপ্য, ক্ষুরধার ক্ষিপ্রতা দিয়ে তৈরি। তার মতে তারিয়ে-তারিয়ে খেতে গেলে পানীয়ই উড়ে যাবে, ঝাঁজ থাকতে-থাকতেই তার এক ঢোকে খাওয়া ও মুখ মুছে ফেলা।

মুখ ঠিক মোছা যাবে কিনা কে জানে।'

'তোমার যদি এত ভয়, তুমি চলে যাও। আমি আমার দোকানদানি তুলে ফেলি।'

কে চলে যেতে পেরেছে? মুনি-ঋষিরাই তাদের তপস্যার ফল দিয়ে দিছে আর এ তো সঞ্জয়ের মধ্যবিত্ত ইতস্তত! আর ভয়? ভয়ও একটা বিশাল রোমাঞ্চ।

ভালো-লাগার মধ্যে কোনো অপেক্ষা নেই, সে এক নিরঙ্কুশ ভালো লাগা।

কে জানে কল্পনা যা বলেছিল সে-ই অকার্যকর, তাই সঞ্জয় নিশ্চিন্ত হতে চাইল। আর যদি বিপরীতটাই ঘটে, তা হলে তার পুরুষত্ব যে প্রমাণিত হবে এ তার নিজের কাছে—হ্যাঁ, তার নিজেরই কাছে—কম তৃপ্তি নয়।

নিয়তির হাসি কখন ফুটে ওঠে কেউ বলতে পারে না।

বেশ প্রফুল্ল মুখেই কথাটা সঞ্জয়ের কাছে ভাঙলে জয়ন্তী। আশ্চর্য, মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার এতটুকু একটা রেখা নেই।

'ভীষণ ঘাবড়ে গেল সঞ্জয়। প্রশ্ন করল: 'এখন কী করবে?'

'কী আর করব। ফেলে দেব।'

'আমি বলি কী, ডাক্তারের কাছে চলো।'

ইঙ্গিতটা বুঝল জয়তী। মৃদুস্বরে বললে 'না আমি কারো প্রাণনাশ করতে পারব না। আমি অস্তিত্ববাদী। কারো অস্তিত্বে বাদ সাধব না।'

'কী করে ম্যানেজ করবে?'

'সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে অফিস যাব। বলব হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেছে। পয়েন্ট পরিচ্ছেদগুলি তাই আর থাপ-ছাড়া ঠেকবে না।'

'যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, স্বামী কে? অথবা কে?'

'ভয় নেই, তোমার নাম বলব না। বানিয়ে অন্য নাম বলব। তোমাকে বিপদে পড়তে দেখলে আমার একটুও ভালো লাগবে না।'

'তখনই বলেছিলাম—'

'তোমার নাম উঠলেও তুমি তা মানবে কেন? প্রমাণ কী? মাতৃত্বই প্রমাণ করা যায়, পিতৃত্ব নয়। আর যা বাস্তবে প্রমাণ করা যাবে না, আমি কোথাও তা পেশ করার হাঙ্গামা পোয়াবো না। তুমি আমার ভালোবাসার জন হলে এখানেই কেটে পড়তে, কিন্তু তুমি আমার ভালো-লাগার মানুষ বলে পালিয়ে যাবে না, আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। কি, তাই নয়?'

'কিন্তু তোমার দিদি?'

'ভাবনা করবেন না। যখন লক্ষ্মীর মত হব তখন ফ্ল্যাট বদলাব। তুমি সাহায্য করবে। কি, ঠিক তো?'

কী সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারল না সঞ্জয়। তবু মুখে সাহস দেখিয়ে বললে, 'নিশ্চয়। কিন্তু—' আসল প্রশ্নটা এবার উচ্চারণ করলে, 'বাচ্চা কী করবে?'

'স্টেটকে দিয়ে দেব।'

'স্টেট। স্টেট কে? স্টেট আসে কোত্থেকে?'

'ঐ তাই হল। কোনো হোম বা অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেব। সমাজে এখনো এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে কুমারী মায়ের ছেলে কুমারী মায়ের কাছেই মানুষ হয়। তাই ও ঐ হোমেই মানুষ হোক। সেটাই ভালো হবে।'

'নাম-পরিচয় কী দেবে?'

'ডিসকার্ডেড বেবির আবার পরিচয় কী। দেখব আউট অব ওয়েডলক ছেলে ভবিষ্যতে কেমন শাইন করে।'

'ডিসকার্ডেডকে আবার দেখবার কী দরকার।'

'তাও ঠিক।' করুণ মুখে হাসল জয়তী: 'ও ওর অস্তিত্বের মূল্যেই জন্মের মর্যাদা পাক।'

কালক্রমে নার্সিং হোমে জয়তী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।

পরোপকারী বন্ধু হিসেবে সঞ্জয়ই সব দেখল-শুনল। রিলিজ হবার দিন সেই ট্যাক্সি নিয়ে এল। আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রেখেছে, সপুত্র জয়তীকে নিয়ে গেল অনাথ-আশ্রমে।

'কেমন সুন্দর সুস্থ ছেলে হয়েছে দেখেছ?' আনন্দে উথলে উঠল জয়তী।

'ওজন ন পাউন্ড।' সঞ্জয়ও যেন গর্ববোধ করল।

'আর দেখেছ এই ডান কানের পাশে ছোট্ট একটা তিল—তোমার আছে?'

'না।'

'আমার আছে। তোমাকে দেখাব।'

অনেক দেখেছে সঞ্জয়। এখন বোঝাটা কোনোরকমে নামিয়ে দিতে পারলেই শান্তি।

অনাথ আশ্রমে শিশুটাকে জমা করে দেবার আগে জয়তী তাকে কোল থেকে বুকে তুলে নিল ও ডান কানের পাশে ঠোঁট ডুবিয়ে আদর করল।

এটা কেমনতরো আচরণ? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সঞ্জয়।

এদিকে কঙ্কনা বিধাতার প্রতি-মূর্তি। এতদিনে বুঝি তার মানত উপবাসেও ক্লান্তি এসে গেছে, শুরু করেছে পুতুলখেলা।

সত্যি-সত্যি পুতুলখেলা। বড় একটা ডল কিনে এনেছে কঙ্কনা। সেইটেকে নিয়েই ছেলে-মেয়ে খেলা খেলে। সেটাকেই সাজায় গোছায় খাওয়ায় দাওয়ায় ঘুম পাড়ায়।

'এর চেয়ে একটা জ্যান্ত পুতুলের সেবা করা ভালো।'

'জ্যান্ত পুতুল। পাব কোথায়?'

'অনাথ আশ্রমে পরিত্যক্ত ছেলে পাওয়া যায় শুনেছি। তুমি ইচ্ছে করলে তাদের থেকে একটিকে পুষ্যি নিতে পারো।'

'সত্যি? এতদিন বলো নি কেন?'

বলেনি পোষ্য নেবার মত ছেলে মেলেনি বলে। কিন্তু সে কথা কি কঙ্কনাকে বলা যায়।

মুখে বললে 'এতদিন জানতাম না। এই সেদিন এক অনাথ-আশ্রমের এক কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল। জানলাম সব নিয়মকানুন। চলো দেখবে। তোমার পছন্দ হয় কিনা—'

কঙ্কনাকে নিয়ে অনাথ আশ্রমে হাজির হল সঞ্জয়।

ছেলেতে-মেয়েতে মিলে একদঙ্গল শিশু, যাকে দেখে তাকেই খুশি হয়ে আদর করতে হাত বাড়ায় কঙ্কনা। কোনটাকে যে ঠিক বাছবে ঠিক করতে পারে না। শেষকালে সঞ্জয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলে, বললে 'তুমি ঠিক করো।'

বেছে-বেছে করে সঞ্জয় জয়তীর শিশুকেই নির্বাচন করল।

আর কী আশ্চর্য, দেখামাত্রই আনন্দে উথলে উঠল কঙ্কনা। বললে 'ঠিক হয়েছে। সুন্দর ছেলে।'

'কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের হবে হয়তো।'

'সব শিশুই সম্ভ্রান্ত।' কঙ্কনা ছেলেটাকে বুকে তুলে নিল।

এনকোয়ারি হল। লেখাপড়া হল। ছেলে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরল কঙ্কনা।

অভুক্ত প্রাণের হত ক্ষুধা দিয়ে সব দিয়ে গ্রাস করল ছেলেটাকে। কোথায় রইল পুতুল, কোথায় সব খেলনার সরঞ্জাম, কোথায় বা তন্ত্রমন্ত্রের জাড়ি-ফাঁক। এখন এই ন-দশ মাসের অজানা শিশুটাই তার সমস্ত সম্পদ। তার সমস্ত সংসার—তার অহোরাত্র।

'কী নাম রাখবে ছেলের?' জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়।

'ওর একটাই শুধু নাম হয়। তাই রাখব।'

'কী?'

'রাজা।'

কদিন পর ছেলের আধো-আধো মুখে যখন 'মা' ডাক ফুটল তখন আনন্দে ঝলমল করে উঠল কঙ্কনা: আমি এখন রাজার মা।

নিয়তির হাসি এখনো শেষ হয়নি—কঙ্কনার গর্ভে সন্তান এল।

একেই বলে অভাবনীয়ের আবির্ভাব। অঘটনঘটনপটীয়ান অদৃষ্টের উপহার।

কঙ্কনার আনন্দ দেখে কে। বলে, 'আমি আর শুধু মা নই, আমি প্রমাণিত মা।'

দেখতে-দেখতে সমস্ত বাড়ি মন্দির হয়ে উঠল। সঞ্জয় ইঙ্গিত করল এ মন্দিরে আর অশুচির স্থান নেই।

কঙ্কনা জিজ্ঞেস করলে, 'ছেলের কী নাম রাখবে?'

'বেশ ভালো নামটা কোথাকার কে এক অজাত-কুজাতের ছেলে কেড়ে নিয়ে গেল—'সঞ্জয় অনুতাপ করে উঠল।

'তা নিক। এর নাম রাখো রানা। রাজার ছোট ভাই রানা—বেশ হবে।'

'না না কোনো ইনফিরিয়র নাম দিলে চলবে না।' সঞ্জয় রুখে উঠল: 'আমাদের ছেলের নাম হবে অধিরাজ। অধিরাজ রাজার চেয়ে বড়।'

'কিন্তু নামে তো সেই রাজ-ই থেকে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ। ঐ দুর্গন্ধ রাখা চলবে না, না নামেও চলবে না। ছেলের নাম হবে বিশ্বেশ্বর।' সঞ্জয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল: 'একটা সামান্য রাজ্যের নয় এ হবে সমস্ত বিশ্বের রাজা।'

রাজা মানুষ হতে লাগল ঠাকুর-ঝিয়ের এলাকায়—কঙ্কনার প্রায় পনেরো আনা মনোযোগ এখন একলা বিশ্বেশ্বরের উপর। রাজা অবুঝের মত কাছে আসতে চাইলে কঙ্কনা তাকে ফিরিয়ে দেয়, বলে 'তুমি দাদা, একটু কষ্ট করে থাকো। ছোট ভাইয়ের জন্যে দাদা কত কষ্ট স্বীকার করে। কত অধিকার ছেড়ে দেয়।' বলেই ঝিয়ের উদ্দেশে হাঁক পাড়ে : 'ওকে নিয়ে যাও কমলা।'

কমলা ছুটে এসে রাজাকে সরিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

সঞ্জয় বললে 'রাজাকে বিশ্বেশ্বরের কাছে ঘেঁসতে দিও না কিন্তু।'

'না. ও আসে না তো। যা বলি ঠিক কথা শোনে।'

'কতদিন শোনে তার ঠিক কী।' সঞ্জয়ের কণ্ঠে ঘৃণা ঝরতে লাগল : 'কোথাকার না কোথাকার ছেলে কখন কী দুষ্প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কেউ বলতে পারে না। একলা পেয়ে হঠাৎ কোন দিন বিশ্বেশ্বরকে হয়তো আঘাত করে বসল।'

'কী সর্বনাশ।' আতঙ্কে শিউরে উঠল কঙ্কনা।

'ছোটবেলায় না মারুক বড় হয়ে যে মারবে তাতে সন্দেহ নেই।'

'কেন কেন?' কঙ্কনা আকুল হয়ে উঠল।

'তখন সম্পত্তির ভাগ চাইবে। আমাদের ইচ্ছে হবে ষোল আনা সম্পত্তি বিশ্বেশ্বরই পাক, ঐ ছোঁড়া এসে তাতে বাদ সাধবে। মামলা-মোকদ্দমা দাংগা-হাঙ্গামা— অশান্তির একশেষ করে ছাড়বে।'

'তা—সম্পত্তি কোথায়?'

'এখন না হোক পরে তো একদিন হতে পারে। ব্যাংকে কটা টাকা পড়ে থাকলেও তো সম্পত্তি। ছোঁড়াটার শরীরে কার না কার রক্ত আছে, পরে কী মূর্তি ধরে, খুনে না ডাকাত কেউ জানে না। বড় হয়ে একদিন তো বুঝবে ও এ বাড়ির কেউ নয়, ও আগন্তুক, তখনই ফণা তুলবে। এখুনি বিহিত করা দরকার।'

'কী করবে শুনি?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। যদি কোনো যোগ্য প্রার্থী এসে ওকে পুষ্যি নেয়।'

'যদি কেউ না আসে?'

'তাহলে সেই অনাথ আশ্রমেই ওকে আবার ফিরিয়ে দেব।'

'তারা নেবে কেন?'

'না নেয় তো গেটের সামনে ছেড়ে দিয়ে আসব। পরিত্যক্ত দেখলে না নিয়ে করবে কী। তাদের নিতেই হবে।'

'আর আগে দেখে নাও বিজ্ঞাপনে কোনো কাজ হয় কিনা।'

বিশ্বেশ্বরের জন্মাবার পর থেকেই সঞ্জয়ের মনে হয়েছে রাজাকে দিয়ে জয়তীর সঙ্গে ফের সেতু বাঁধা যায় কিনা। ছেলেকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়েই সঞ্জয়ের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ভালোলাগার সম্পর্কটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে জয়তী। বেঁচে গিয়েছে, রেহাই পেয়েছে, কেলেঙ্কারিতে পড়তে হয়নি। এই ভেবে সঞ্জয়ও আর সম্পর্কটা ঝালাতে চায় নি। পরে যে সে পুষ্যি নিতে এগিয়েছিল সেটা শুধু কঙ্কনার পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে। আর জয়তীর ছেলেকেই যে সে মনোনীত করেছে সে জয়তীর প্রতি কোনো মমতায় নয়, একান্ত তারই আত্মজ এই বিবেচনায়। কিন্তু কল্পনাও করেনি যে সেই ছেলে রাজা-ছেলে গদি-চ্যুত হবে। তারপর যখন বিশ্বেশ্বর এসে কঙ্কনাকে আদ্যোপান্ত ভরপুর করে দিল তখন সঞ্জয়ের মনে হল রাজা যার ছেলে তার হাতে রাজাকে ফেরত দেওয়া যায় কিনা। ফেরত দিয়ে আবার জয়তীর সঙ্গে জোট বাঁধা যায় কিনা। সেই দু-দণ্ডের ভালোলাগাকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা অখণ্ডের ভালোবাসায়। পুনর্বারের নবীনতায়।

কে জানে জয়তী কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে সঞ্জয় কিছুই খোঁজ রাখে নি, ঘাটাতে চায় নি—সময়কে অবাধ স্রোতে চলে যেতে দিয়েছে। আজ, এত দিন পরে দেখা যাক, দৈব কী বলে, বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে কিনা, দৌড়ে আসে কিনা নিজের থেকে।

পলাতক খুনী যেমন চুপি চুপি খুনের জায়গাটা দেখতে আসে সঞ্জয়ের বাড়িতে জয়তী তেমনি এসেছে নিঃশব্দে।

বাইরের ঘরে সঞ্জয় একা বসে, জয়তী সামনে এসে দাঁড়াল।

এ আরেক অভাবনীয়। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর অনেক সাচ্ছল হয়েছে জয়তী। অনেক সাহসী।

বললে 'আমি জানতাম ছেলে তোমার কাছে আছে। কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'এ বাড়িতে ষোলো-আনা ছেলের আবির্ভাব হয়েছে। তাই তোমার ছেলের আর কদর নেই।'

'ও! বুঝেছি। কই ছেলেকে আনো দেখি।'

'ছেলেকে রাখতে পারবে?'

'পারব। নইলে এসেছি কেন?' জয়তী স্বচ্ছ কণ্ঠে বললে, 'আমি এখন অন্য ফ্ল্যাটে আছি, বড় ফ্ল্যাট। আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকরি নিয়েছি, ভালো চাকরি। সঙ্গে দিদি নেই, এক বান্ধবী আছে।' জয়তী মৃদু হাসল : 'বান্ধবীও আমার মত অস্তিত্ববাদী।'

'কিন্তু ছেলেকে পালতে পারবে?' সঞ্জয় তাকাল স্নিগ্ধ চোখে : 'দিন-দিনই তো খরচ বাড়বে।'

'পারব। না পারি তো তুমি আছ।'

সেতু বুঝি আবার তৈরি হল।

অন্দরে গিয়ে সঞ্জয় কঙ্কনাকে বললে 'জানো বিজ্ঞাপন দেখে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। বলছেন তিনি নাকি রাজার মা। দেখে-শুনে মনে হল বেশ রেসপেকটেবল, অবস্থাও ভালো। যখন চাইছে ঝামেলা না বাড়িয়ে ওর হাতেই সঁপে দিই ছেলেটাকে।'

'রাজার মা এসেছে? কই দেখি!' কঙ্কনা বাইরের ঘরে ছুটে এল।

জয়তীকে দেখে এক মুহূর্ত থমকাল কঙ্কনা। দেখল জয়তীর সিঁথিতে সিঁদুরের লুপ্তাবশেষও নেই। বললে 'আপনার তো বিয়ে হয়নি।'

'না করিনি। তার জন্যেই তো—'

'বুঝেছি। কিন্তু আপনি ছেলেকে পালবেন কী করে? আপনার যোগ্যতা কী?'

'ছেলেকে পালবার মত সুবিধে আর সম্পত্তি দুইই এখন আমার হয়েছে। তা নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। কই ছেলে কই?'

কমলার হাত ধরে রাজা এসে দাঁড়াল।

ছেলের দিকে জয়তী হাত বাড়িয়েছে, কঙ্কনা বাধা দিল। বললে সুবিধে আর সম্পত্তি আছে শুধু এই দাবিতেই আপনি ছেলে নেবেন? আর কোনো যোগ্যতা আছে?'

'আছে। আমি ওর মা।'

কঙ্কনার কিছু বলবার আগে সঞ্জয় এগিয়ে এল। বললে, 'আপনার ছেলের কোনো আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আছে? কোনো বার্থ মার্ক?'

'আছে।' জয়তী সরল মুখে বললে, 'ওর বাঁ কানের পাশে ছোট একটা তিল আছে।'

সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে বললে, 'বাঁ কান নয়, ডান কানের পাশে।'

কঙ্কনা ঝলসে উঠল : 'বা, তুমি সাহায্য করছ কেন? উনি বলুন।'

'ডান না হয়ে বাঁ, তাতে কী এসে যায়?' সঞ্জয় চাইল মিটিয়ে দিতে। বললে, 'তাই যথেষ্ট।'

না, কঙ্কনার কাছে বুঝি তা যথেষ্ট নয়। তাই সে জয়তীকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'আপনার আর কোনো প্রমাণ আছে?'

প্রমাণ? জয়তী অসহায়ের মত তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। বললে 'আমি মা—এর আবার প্রমাণ কী?' ঝি-এর হাতে-ধরা রাজাকে লক্ষ্য করে বললে, 'ঐ দেখুন, ছেলে কেমন আমার দিকে হেঁটে আসছে।'

'কক্ষনো না।' রাজাকে দুই হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরল কঙ্কনা। জয়তীকে বললে, 'আপনি ফিরে যান। আপনি মা হতে পারেন, আমি তার চেয়ে বেশি—আমি প্রমাণিত মা।'

দুই জগতের মাঝখানে

অন্নদাশঙ্কর রায়

রায়বাহাদুর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'এস, ভাই, এস। স্বাগতম্। সুস্বাগতম্।' আর তাঁর সহধর্মিণী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলেন, 'বোস, বাবা, বোস।'

হাঁ, একজন বলতেন 'ভাই'। যদিও বয়সের ব্যবধান চোদ্দ কি পনেরো সওল। অপরজন বলতেন, 'বাবা'। কারণ, পর্দার বাঁধন তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

গৃহিণী যান চা আনতে। কর্তা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন সোফার উপর নিজের একপাশে। আর সমস্তক্ষণ ধরে থাকেন আমার একটা হাত। পাছে পালিয়ে যাই।

বলেন, জানো, রিটায়ারমেন্টের পরের দিন থেকে জনমানব আসেনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তুমিই প্রথম। তাও তো এলে সেই সুদূর বীরভূম থেকে। কিন্তু যাঁরা এই বালীগঞ্জে বাস করেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে তাঁদের বাড়ী যেতে হবে। তাঁরা কষ্ট করে আসবেন না। এই সেদিনও যারা আমার চারদিকে ঘুরঘুর করত তারাও আমাকে দেখলে পাশ কাটিয়ে যায়। চাপরাশিরা সেলাম করে না। কেরানীরা উঠে দাঁড়ায় না। অফিসাররা বসতে চেয়ার অফার করেন না। গোটা সরকারী মহলটাই আমার দিকে এমন করে তাকায় আমি যেন একটা ভূত। না, ভূতকেও তো লোকে ভয় করে। আমাকে কেউ ভয় করে না। অথচ এককালে কে না করত!'

আমি সহানুভূতির সঙ্গে বলি, 'আপনি বড্ড সেনসিটিভ। রিটায়ার যাঁরা করেন তাঁরা কেনই বা প্রত্যাশা করেন যে লোকে তাঁদের পূর্বপরিচয় মনে রাখবে? একজন রিটায়ার্ড বাঘ ও একজন রিটায়ার্ড ছাগ দুজনেই ওদের চোখে সমান।'

'সাধারণ লোক তা মনে করতে পারে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা তো জানে আমি রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বহাদুর। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসনস জজ। আমি কি একজন রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার কি পেশকারের সঙ্গে সমান!' রায়বাহাদুর গর্জন করতে গিয়ে আর্ত স্বরে বলেন

'সমান। সমান। সম্পূর্ণ সমান। চাকরির আগে যেমনটি ছিলেন। মনে করুন চাকরির আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। তাহলে শুধু একটু শিষ্টাচারই প্রত্যাশা করবেন। তার বেশী নয়। সেটুকু যে-কোনো একজন ভদ্রলোকের পাওনা।' আমি আশ্বাস দিই।

রায়বাহাদুর ফণা নত করে বলেন, 'সত্যি বলছি, ভাই। ত্রিশ বছরের দর্প চূর্ণ হতে তিনটে মাসও লাগল না। চাপরাশিহীন জীবন কখনো কল্পনা করতে পারি নি। ওরাই তো রোজ বাজার করে আনত। নাজির এসে দুবেলা খবর নিত কিছু দরকার আছে কিনা। স্টেনো এসে ডিক্টেশন নিয়ে যেত। এমন অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে গেছে যে নিজের হাতে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারিনে। একজন টাইপিস্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, সে এসে টাইপ করে দিয়ে যায়।'

আমি দুঃখ প্রকাশ করি। বলি, 'সময়ে সয়ে যাবে।'

'আরো সর্বনেশে কথা আয় অর্ধেকের নিচে। ব্যয় যেমনকে তেমন। স্টাইল একবার বাড়িয়ে দিলে নামে না, এ শিক্ষা আমার হয়নি। এখন আমি শিক্ষানবীশ। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, ভাই। কোনোমতেই ঠাট বজায় রাখতে পারছিনে। অথচ তুমি যে বললে চাকরির আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে সেটাই বা কেমন করে সম্ভব? এ বয়সে কি তেমন কষ্ট সইতে পারব?' রায়বাহাদুর আক্ষেপ করেন।

তাঁর সার্ভিসের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে তফাৎ ছিল যে তিনি থাকতেন ইউরোপীয় স্টাইলে। এটা চাকরির গোড়া থেকেই। যখন তাঁর সঙ্গে এক স্টেশনে কাজ করতুম তখন লক্ষ্য করেছি যে তিনি বাড়ীতে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন না কিংবা আদালতে চাপকান পায়জামা। টেবিল চেয়ার না হলে তাঁর খাওয়া হতো না। তবে আহারটা ছিল দেশী। তাঁর স্ত্রীর স্বহস্তের পাক।

'দাখ হে, সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হাতে কাজ নেই। কোর্টে যাবার জন্যে পা ছটফট করে। মামলার শুনানীর জন্যে প্রাণ আইঢাই করে। অফিসের ফাইল দেখার জন্যে চোখভরা কৌতূহল। কিন্তু কেউ ভুলেও আমাকে স্মরণ করে না। স্মরণ যা কিছু [illegible] দিয়েছি

সব আমার মুখস্থ। একটু শোনাব নাকি?' রায়বাহাদুর সতৃষ্ণনয়নে তাকান।

পুরো মিনিট দশেক। 'অপূর্ব! অপূর্ব ইংরেজী!' আমি তারিফ করি। ইংরেজী তিনি এত ভালো শিখিয়েছিলেন যে তাঁর বড়ো দুটি ছেলে [illegible] বিলেত গিয়ে সেদেশেও নাম করে। তিনি নাকি স্বপ্নও দেখতেন ইংরেজীতে।

'কিন্তু কেমন করে লাগছে সেই ইংরেজী! রিটায়ার্ড হলে আমি কি সব কাজের অযোগ্য? কী নিয়ে আমি বাঁচব? কেন আমি বাঁচব? সেটা কি শুধু এইজন্যে যে আমার পেনসনটা এদের কাজে লাগছে?' তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন।

আমি বলি, 'জীবন আরম্ভ হয় পঞ্চান্ন বছর বয়সে। মনে করুন এটা আপনার নবজন্ম। জগতে কি কাজের অভাব!'

'দ্বিজ কথাটার মানে জানো তো? যে দুবার জন্মায়। তেমনি আরো একটা [illegible] বানাতে পারো। তার অর্থ যে দুবার মরে। দ্বিমর। আমরা সরকারী কর্মচারীরা [illegible]। [illegible] রিটায়ারমেন্টের সময়, আরেকবার তার কিছুদিন বাদে। অনেকেই [illegible] আগে মারা যায়। আমিও যে ততদিন বাঁচব তার স্থিরতা কী? একেই কি তুমি বলবে নবজন্ম? তবে হতুম যদি উকীল তাহলে আশি বছর বয়স অবধি চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতুম। গোড়ায় তো সেই ইচ্ছাই ছিল, ভাই। প্রথম কয়েক বছর স্ট্রাগল করতে হয়। সেটার জন্যে কিন্তু অর্থসাহায্যেরও প্রয়োজন। কারো কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব না বলেই তো মুনসেফী নিই। না বাপের কাছ থেকে, না শ্বশুরের কাছ থেকে। আমি সেল্‌ফ-মেড ম্যান। বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছি।' তিনি স্মৃতিচারণ করেন।

'তা আপনি তো এখনো প্র্যাকটিসে নামতে পারেন। স্যর আশুতোষকেও [illegible] হাইকোর্টে মামলা লড়তে দেখেছি।' আমিও করি স্মৃতিচারণ।

'কার সঙ্গে তুলনা!' রায়বাহাদুর [illegible] বলেন, 'না, ভাই, ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। আমার সাবর্ডিনেটদের ইওর অনার বলে সম্বোধন করা। হাই-কোর্টের জজদের বেলা অন্য কথা। কিন্তু [illegible] তো বেশী [illegible] না। ওইসব সাবর্ডিনেটদের সামনেই দাঁড়াতে হবে আমাকে! যে আমি জজের আসনে বসেছি! সে আমি রিটায়ার্ড জজ [illegible] করছি! ছি ছি ছি!'

[illegible] বছর বাদে আবার [illegible] করতে নাই। রায়বাহাদুর বলতেই [illegible] উঠে [illegible] নিষেধ করেন।

'ভূত! ভূত! আমি এখন রায়বাহাদুরের [illegible] রায়বাহাদুরের ভূত! জানো না, ইংরেজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আমলের খেতাবগুলো বাতিল হয়ে গেছে। আমি ছিলুম [illegible], এখন হয়েছি ত্রিশঙ্কু। [illegible] গেল।

তুমি বুঝবে না সে কী যন্ত্রণা। জানতেন তোমার গুরুদেব। পরতে গেলে লাগে এবং ছিঁড়তে গেলে বাজে। লোকে ভাবে রায়বাহাদুর যখন খয়ের খাঁ নিশ্চয়। কী করে জানবে যে হাইকোর্টের জজদের যেমন নাইট উপাধি দেওয়া হতো জেলা ও দায়রা জজদেরও তেমনি রায়বাহাদুর খেতাব! তাঁদের রেকর্ড দেখে। অবশ্য আমার সার্ভিসের কথাই বলছি। এর জন্যে কারো দ্বারস্থ হতে হয়নি আমাকে। কারো ফরমাসও খাটতে হয়নি।' তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন।

'কিন্তু আপনি খুব কড়া হাকিম ছিলেন মনে আছে।' আমি উসকে দিই।

'হাঁ, কোর্টে আমি ভয়ানক কড়া ছিলুম। কারো মুখ দেখে বিচার করতুম না। কী জমিদার, কী মহাজন, কী স্বামীজী, কী ব্রাহ্মণ!' তিনি দেখতেন শুধু আইন।

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম করেন যাঁর জমিদারি এস্টেটের বাকী খাজনার নালিশটা ছিল মিথ্যা। প্রজাকে অকারণে নাজেহাল হতে হয়।

'ওটা বোধহয় ওঁর জ্ঞাতসারে হয়নি। অন্যান্য শরিকের মতো উনিও সই করে [illegible] নায়েবের গোমস্তাদের কারসাজি।' আমি ওঁর হয়ে কৈফিয়ৎ দিই।

'এমনি করেই তো জমিদারবাবুরা প্রজাদের হৃদয় থেকে মুছে গেলেন। থাকবেন কলকাতায়, করবেন অধ্যাপনা, লিখবেন গ্রন্থ, রাখবেন জমিদারি, মারবেন প্রজাদের অন্ন। ধর্মাধিকরণে বসে আমি এঁদের ক্ষমা করতে পারি কখনো? কড়া স্ট্রিকচার দিই। ও [illegible] নয়। তাই তো জমিদারি উঠে যাচ্ছে।' তিনি বলেন খেদের সঙ্গে।

'ওটা ইংরেজের সৃষ্টি। ইংরেজ গেলে জমিদারিও যায়।' আমি মন্তব্য করি।

'দেখলুম কেউ চিরস্থায়ী নয়, কিছু চিরস্থায়ী নয়। ইংরেজও নয়, তার সাম্রাজ্যও নয়, তার করদ রাজা বা জমিদারও নয়, তার আমলের নাইটহুডও নয়, রাজা উপাধিও নয়। এতদিন আমি আমার নিজের দুঃখেই কাতর হয়েছি। এখন চোখে জল আসে হতভাগ্য রাজন্যদের দশা দেখে। অভিজাতদের দশা দেখে। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় পুরাতন জগতের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু নূতন জগতের জন্ম হয়নি। আমরা বাস করছি দুই জগতের মাঝখানে।' তিনি বলেন দার্শনিকের মতো।

আমিও দার্শনিকতা করি। 'এটা একটা গোধূলিকাল। বলা যেতে পারে উদয়গোধূলি। রাতের আঁধার গেছে, [illegible] দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি।'

তিনি মাথা নাড়েন। 'রাতের আঁধার যেটাকে বলছ সেইটেই ছিল দিনের আলো। সেই আলোর পরশ লেগে শতদলের এক একটি দল চোখ মেলে। কারো নাম রামমোহন, কারো নাম বিদ্যাসাগর, কারো নাম বঙ্কিম, কারো নাম রবীন্দ্র, কারো নাম বিবেকানন্দ, কারো নাম অরবিন্দ। হাঁ, কারো নাম গান্ধী, কারো নাম সুভাষ। এঁরা কেউ আঁধারের শিশু নন, সকলেই আলোর শিশু।'

আমি তাকে আশ্বাস দিই যে ওর চেয়েও শক্তিশালী আলোকের স্পর্শে সহস্রদলের সহস্রটি দল খুলে যাবে। জনগণের উপর প্রত্যয় রাখতে হবে।

তাঁর বিশ্বাস হয় না। 'ভাই, তোমার বয়স কম। তুমি আশাবাদী। আমি কিন্তু নৈরাশ্যবাদী। সার্ভিস ট্র্যাডিশন দুই শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, এত শীগগির পড়ে যাবে না। কিন্তু পোড়ো বাড়ীর মতো পড়ে যাবেই। এরা শুধু [illegible] গড়তেই শিখেছে, আর কিছু গড়তে শেখেনি। অথচ ভাঙতে ওস্তাদ। যাক, আমার কী! আমি ততদিন বাঁচলে তো? আমিও এখন দুই জগতের মাঝখানে। ইহলোক আর পরলোক। অথচ পরলোক আছে কিনা তাও নিশ্চিত জানিনে। প্রমাণাভাব। পুজো আর্চাও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, মঠবাড়ীতেও না। গীতা চণ্ডীও পড়িনে। পড়ি ইতিহাস।'

ইহলোক ও পরলোক নিয়ে আমার মনে কোনো সমস্যা ছিল না। আমি জানতুম যে যখন যেখানেই যাব তখন সেইখানটাই হবে ইহলোক। তেমনি সেই কালটাই হবে ইহকাল। একে একে সবাই তো আমরা সে অভিমুখে যাচ্ছি। কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। তবে যাদের এপারের কাজ ফুরিয়েছে, [illegible]বার কিছু করবার নেই, তাদের মনে হতে পারে যে তারা এপারেরও নন, ওপারেরও নন। দুই জগতের মাঝখানে।

কিন্তু ওর আরো একটা অর্থও তো আছে। ব্যক্তির বেলা নয়, সমাজের বেলা। এটা যদি একটা গোধূলিকাল হয়ে থাকে তবে অস্তগোধূলি না উদয়গোধূলি? এটা কি 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,' না 'হরি, দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমায়'? সন্ধ্যা বলতে একটা যুগের সন্ধ্যা।

'পশ্চিমের মনীষীরাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে সামনে আসছে একটা অন্ধকার যুগ। যে প্রদীপটার উপর তাঁদের ভরসা ছিল সেই প্রদীপটার নিচেই অন্ধকার। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এক বিভীষিকা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তবে এবার আসছে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। ভারতের স্বাধীনতা যদি ভরে থাকে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা তাহলে এটি একটি অমূল্য রত্ন। ওকে অতি যত্নে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমের ওঁরা যে পথ নিয়েছেন সেটা সরে দাঁড়ানোর নয়। প্রতিরোধের। অন্ধকারকে প্রতিরোধ করতে হলে আলো জ্বালাতে হয়। সেটা কিসের আলো? বিজ্ঞানের আলো না ধর্মের আলো? অনুমান করে অনেকেই ধর্মের শরণ নিয়েছেন। খৃষ্টের শরণ নিচ্ছেন। সংঘের শরণ নিচ্ছেন। এটার মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? তাঁরাও প্রতিরোধ করবেন অস্ত্র দিয়ে

অস্ত্রের। পরমাণু অস্ত্র দিয়ে পরমাণু অস্ত্রের। ব্যাধিবীজ দিয়ে ব্যাধিবীজের। তাহলে তো পুরোনো পিদমটার তলায়ও অন্ধকার।' আমি স্বগতভাবেই বলি।

'আমি কিন্তু ইউরোপের কথা ভাবছিনে। ভাবছি আমার এই সনাতন স্বদেশের কথা। এই সনাতন অচলায়তনটিকে সচল করেছিল যে শক্তি সে শক্তি স্বেচ্ছায় অপসরণ করেছে। এ'দের বিশ্বাস এ'রাই সেটা ঘুটিয়েছেন। সেটা সত্য হলেও অর্ধসত্য। সেইজন্যে অর্থং অর্জিত পাণ্ডিত্য। ইতি কথাহরণাকাঃ।' তিনি হাসলেন। তাঁর হাসিটিও পরিমিত।

'আপনার কি আশঙ্কা মধ্যযুগ ফিরে আসবে?' আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করি।

'মধ্যযুগ গেল কবে যে ফিরে আসবে! বলতে পারো চাপা পড়েছিল, এখন মাথা তুলবে। তুমি মনে করেছ তোমার সাধের জনগণ তার সঙ্গে লড়বে? না, সে কাজ রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীদের। তাঁরা লড়বেন কি? লড়বার শক্তি আছে কি? ইচ্ছা আছে কি? লড়াইটা অচলায়তন বনাম সচলায়তন নয়। অচলায়তন বনাম অর্ধচলায়তন। তথা নাগরে বিজয়ায় সন্ধয়।' তিনি নৈরাশ্যবাদী।

গৃহকর্ত্রী আমাকে ভিতরে নিয়ে যান। বলেন, 'ও'র কী হয়েছে, জানো? সারাজীবন ভূতের মতো খেটেছেন। বেশীর ভাগ মফস্বলের চৌকিতে। পটিয়া আর রাউজান, হাজিগঞ্জ আর খাতড়া, এমনি কত জায়গায়। কোথায় দুদণ্ড বিশ্রাম করবেন দার্জিলিং কি শিলং যাবেন, বেনারস কি হরিদ্বার, আগ্রা কি দিল্লী, তা তো নয়। তাঁরই মতো অনাকয়েক রিটায়ার্ড জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অতীতের জাবর কাটবেন। এ'রা ধর্মপ্রাণ নন। কর্মপ্রাণ। কাজ না থাকলে ভাতাব যান। সমস্তক্ষণ ছটফট করেন। কিন্তু কাজ কোথায় যে করবেন! নতুন সরকার অনেকলোককে ট্রাইব্যুনালে নিচ্ছে, কিন্তু ইনি তো কোনোদিন কুর্নিশ করেন নি, করবেনও না। চাকরি যতদিন ছিল দাবী ছিল। চাকরিও নেই, দাবীও নেই। ও'র মতন সরকারী লোকই দরকারী লোক। উনি সরকারী নন বলে দরকারী নন। একটা কিছু সরকারী কাজে ও'কে লাগিয়ে দেওয়া যায় না? টাকার জন্যে না। উনি যে একরকম সরকারী লোক এই মানসটার জন্যে।'

আমি এর কী উত্তর দিতে পারি? বলি ভেবে দেখব।

এর পরে একদিন আমিও অকালে অবসর নিয়ে সরে পড়ি। আবার যখন দেখা মিস্টার চ্যাটার্জি—রোহিণীবাবু, বলেন তিনি করে হন—আমার সঙ্গে কোলাকুলি করেন।

বলেন, 'তুমিও শিকার হয়ে আমাদের দলে ভিড়লে? কিন্তু আরো কিছু দিন থাকলে ভালো করতে। তোমার তো কাঁচ বয়স। বানপ্রস্থের তাড়া কিসের?'

আমাকে আমার জীবনের কাজ সারা করে যেতে হবে। জীবিকার জন্যে কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে তারপরে আর এনার্জি থাকত না। তাছাড়া আপনি যেমন দুই জগতের মাঝখানে আমিও ছিলুম তেমনি। কিন্তু আরেক অর্থে। সাবেক আমলের কর্মচারী হাল আমলে মানিয়ে চলতে জানে না। মানে মানে সরে যাওয়াই শ্রেয়। সময় থাকতে সরে যাওয়াই বিজ্ঞতা।' আমি কৈফিয়ৎ দিই।

'কিন্তু তোমার মতো লোকের জনগণের প্রতিও তো একটা কর্তব্য ছিল। তারা চায় সুবিচার, তারা চায় সুশাসন। এটাও একপ্রকার বিশ্বাসঘাত।' তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করেন।

'কই, আমাকে তো ওরা জানতে দেননি যে আমি একজন দরকারী লোক? সরকারকেও তো জানাননি। তাছাড়া জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তো আমি চুকিয়ে দিচ্ছিনে। ছিঁড়ছি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক। জনগণের সেবা অন্যভাবে করব।' তাঁকে আশ্বাস দিই।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারী বা শিকার রূপে নয়। সারস্বত রূপে। আমরা একসঙ্গে সভাসমিতিতে যাই। আলাপ-আলোচনায় যোগ দিই। তাঁর উপন্যাসের জোয়ার আসে। নৈরাশ্যবাদ চাপা পড়ে

সদ্য প্রকাশিত বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ

মূল রচনা : এগন লার্সেন

আবিষ্কারের কাহিনী

(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

শক্তি ৫্ পরিবহণ ৮্ যোগাযোগ ৮্

বিজ্ঞানভিত্তিক অতি মূল্যবান আলোচনা। অসংখ্য আর্ট-প্লেটে সজ্জিত হয়ে বইটি আরও লোভনীয় হয়েছে। প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারে রাখা বিশেষ দরকার। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। সমালোচকদের মতে বাংলায় এত উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি।

এইমাত্র প্রকাশিত হল

একাকী জোনাকি ৫্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্নামধন্য লেখকের আলোড়নসৃষ্টিকারী কালজয়ী ও নতুন উপন্যাস।

অনেক দূরের পথ
বিশ্বনাথ রায় ৫্

দুর্জয় দুর্গ
শ্রীপারাবত ৬্

নিভৃত আকাশ
আশাপূর্ণা দেবী ৫্

কুবেরের অভিশাপ
সরোজকুমার মিত্র ৫্

বিচার চাই
বেদুইন ৮্

আরেক ফাল্গুন
জহির রায়হান ৫্

লেন বাই লেন
কাঁকন ৭্

ইষ্টিশান রামরাপুর
সমরেশ মুখোপাধ্যায় ৬্

গোপা প্রকাশনী ॥ ১১ [illegible]

যান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সভাপতিত্বের আহ্বান পান। কিংবা উপ-সভাপতিত্বের। সরকারী না হলেও তিনি হন একজন দরকারী লোক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর স্বীকৃতি দেয়। কমিটির মেম্বর করে। তিনি আর পুরোনো দিনের জাবর কাটেন না।

আমি তো ভেবেছিলুম নতুন জমানার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়ে গেছে। তা নয়। বছর কয়েক বাদে একবার তাঁর অতিথি হতে হয়। তখন কথাবার্তার অখন্ড অবসর মেলে। জিজ্ঞাসা করি আশা করবার মতো কিছু দেখছেন কিনা।

'জানি তোমার মনে কষ্ট হবে। নইলে এ প্রসঙ্গ তুলতে। কিন্তু তুমি যখন নিজেই তুলছ তখন আমার কথাটা আমি খুলেই বলি।' তিনি চুপ করে থাকেন। [illegible] 'নতুন জগতের কিছুমাত্র পূর্বাভাষ পাচ্ছি না। শুধু পুরোনো জগৎটাই একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।'

আমি তাঁকে বাধা দিইনে। প্রাণ খুলতে দিই।

'দেউটি আরো নিববে। দেউটি সব নিবে যাবে। বয়স তো বাড়ছে। মানুষ তো অমর নয়। তার জন্যে আপসোস করে কী হবে? ওটা আমি সভাসমিতির জন্যে তুলে রেখে দিয়েছি। অপূরণীয় ক্ষতি। মন্মথ সরকার, রাজশেখর বসু এঁদের স্থান শূন্যই থেকে যাবে। শতবার্ষিকীর হিড়িক পড়ে গেছে। সেখানেও আরেক দফা কাঁদুনি গেয়ে আসি। শতবার্ষিকী ঘুরেফিরে আসবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর একটিবারও আসবেন না। লোকের ভালো লাগে শুনতে। আমারও ভালো লাগে বলতে। কিন্তু নবাগত যাঁরা তাঁদের নতুন জগতের অগ্রদূত বলে চিনতেই পারিনে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে তাঁরাও কাঁচোরা পুরোনো। তাঁদের নতুনত্ব কেবল শব্দে আর ভঙ্গীতে আর পোশাকে আর মেজাজে। সেটা বাসি হতে কতক্ষণ! খবরের কাগজ কে দুবার পড়ে!' তিনি বকবক করেন।

আমি এবার একটু অস্ফুট প্রতিবাদ করি। 'তবু নতুনত্ব কি একেবারে নেই?'

'থাকবে না কেন? দেশে শিল্পবিপ্লব হলে বিস্তর নতুন সমস্যা ওঠে। তেমনি কমিউনিজম হলে বিস্তর নতুন মুখ দেখা যায়। একেই যদি তুমি বল নতুনত্ব তবে তুমিই ঠিক। আমিই বেঠিক। কিন্তু এটাও তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি এদের কারো শতবার্ষিকী কোনোদিন অনুষ্ঠিত হবে না। এমনকি অর্ধশতবার্ষিকীও না। সিকি শতবার্ষিকীও হয় কি না দেখো। তুমি তো ততদিন বেঁচে থাকবেই।' তিনি সহাস্যে বলেন।

আমি আর কথা বাড়াইনে। অন্দরে গিয়ে দিদির সঙ্গে গল্প করি। তিনি বলেন, 'ওঁর দুজন বন্ধু আছেন। রায়সাহেব আর এম-বি-ই। তিনজনে মিলে রোজ লেকের ধারে বেড়ান আর আড্ডা দেন। ওঁরা বলেন, 'রায়বাহাদুর'। ইনি বলেন, 'রায়সাহেব' বা 'মিস্টার'। [illegible] মতো। আর ওদিকে ওঁর যে ভাইটি তিনি তো এখন থেকেই একটা [illegible] করে লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেদেরও তালিম দিচ্ছেন চ্যাটার্জির বদলে চট্টিক বলে পরিচয় দিতে।'

'হা হা হা!' আমি হেসে বলি, 'তা এতে দোষের কী আছে? চাটুজ্যে যদি চ্যাটার্জি হতে পারল তবে চ্যাটার্জি কেন চট্টিক হবে না?'

'তুমি তো হাসছ। ওঁর কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ওঁকেও কি শেষ বয়সে চট্টিক সাজতে হবে? আর ওই যে লাল ঝান্ডা ওটা যেন ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া। বাড়ীটা কোনদিন না বাজেয়াপ্ত করে! সারাজীবনের সঞ্চয়। চোরবাজারের টাকা তো নয়। তফাৎটা কি ওরা বুঝবে? স্বর্গে গিয়েও উনি শান্তি পাবেন না। যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে। বলেন তো স্বর্গ নরক উনি মানেন না। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। কিন্তু শ্রাদ্ধ না করলে ওঁর আত্মার তৃপ্তি হবে না এটাও জানিয়ে রেখেছেন।' দিদির মুখে স্মিত হাসি।

মানুষমাত্রেই জটিল। অসঙ্গতিতে ভরা। আমি এর জন্যে কাউকে দোষ দিইনে। কিন্তু কথাটি কি সত্য? নতুন জগতের কি পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে না? কোথায় গেলে পূর্বাভাষ পাব? ভিলাইতে না মাইথনে, চন্ডীগড়ে না ভাকরা নাঙ্গালে? দিল্লীতে না কেরলে? গ্রামে না বস্তিতে? কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পাব? যারা হঠাৎ বড়লোক না রাতারাতি গরিব? আঙুল ফুলে কলাগাছ না কলাগাছ শুকিয়ে সলতে? ছাত্ররা যদি একটা শ্রেণী বলে গণ্য হয় তো তারা একই কালে ইংরেজী উঠিয়ে দিচ্ছে ও সাহেবী পোশাক পরছে। এর মধ্যে কোন্টা নতুন? মেয়েরা যদি একটা শ্রেণী বলে মান্য হয় তবে ওরা একই কালে পর্দা ছেড়ে দিচ্ছে ও নাকছাবি বা নথ পরছে। দিকে দিকে কালীপুজার ধুম পড়ে গেছে। শীতলা, শনি কেই বা পুজো না পাচ্ছেন! অপর পক্ষে আজ ধর্মঘট কাল ঘেরাও পরশু মিছিল। লাল ঝান্ডার ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হবে কলকাতা নয় মস্কো।

পরের বার যখন দেখা করতে যাই লক্ষ্য করি যে একতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনের মুখে দুর্দিনের ছায়া। টাকার দাম পড়ে গেছে, পেনসনে কুলয় না। মিস্টার চ্যাটার্জি এই ভেবে অস্থির যে তিনি যদি হঠাৎ চোখ বোজেন পেনসনটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভাবনার কথা তাঁর গৃহিণীকে বলা হবে ল্যান্ডলেডী। ভাড়াটেরা ওছাড়া আর কী বলবে! ছি ছি ছি!

একদিন আমার স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গেটের ফলকে খোদাই ছিল রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বাহাদুর। সে ফলক কোথায়? তার জায়গায় নতুন ফলকে খোদাই পি কে চ্যাটার্জি। এটা কি ল্যান্ডলেডী সমস্যার সমাধান?

এরপর দেখি দিদির মুখে হাসি নেই। যে মুখে হাসি সব সময় লেগে থাকত। দারুণ দুর্যোগের দিনেও। তাঁর নিগূঢ় বেদনা তিনি কাউকে জানতে দিতেন না। এবার কিন্তু আমাকে বলেন আর বইতে পারছেন না। ছোট মেয়েটির দুরারোগ্য ব্যাধি। নিজেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। সংসারে অশান্তি। [illegible] বিরুদ্ধেও গুরু অভিযোগ। এই [illegible] বিদ্রোহ।

পরে একদিন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই দুপুরবেলা তিনি সেই যে শুতে গেলেন তার পরে আর ওঠেন না। ঘুমের মধ্যেই চলে যান। তাঁর স্বামী টের পান না। যদিও পাশের খাটেই শুয়ে [illegible] ছিলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

গভীর সমবেদনায় [illegible] ভদ্রলোক টেলিফোনে [illegible] করেন। মুখে হাসি কোথায় [illegible] বলেন, 'চলে গেল। বলে গেল না। এত অভিমান!'

তিনি সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেন। অথচ গীতা উপনিষদ নিয়েও বসেন না। আমি তাঁকে ধর্মগ্রন্থে সান্ত্বনা খুঁজতে পরামর্শ দিই। তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'শোক কি আমার জীবনে এই প্রথম? মনে নেই সেবারকার দুর্ঘটনা? [illegible] দেখি। অমন কৃতী ছেলে যশস্বী ছেলে কেমন করে চলে যায়! ঈশ্বর থাকলে সমস্তই তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। কিংবা তাঁরই অমোঘ নিয়মে। আর যদি কর্মে বিশ্বাস করি যে যার কর্মফল ভোগ করতে এসেছে, ভোগের শেষে দেহ রেখে যাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? এর ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি ও পারবে না। ওপার থেকে তো কেউ ফিরে আসেনি।'

মাঝে মাঝে যাই। দেখা করি। অন্যদিনে শুকনো হাসি হেসে বলেন, 'দুই জগতের মাঝখানে আর কদ্দিন পড়ে থাকি! ঘরেরও নই ঘাটেরও নই।'

'আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। নতুন জগতের পূর্বাভাষ দেখে যাবেন। দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বী।' আমি ব্রাউনিং থেকে উদ্ধার করি।

'না, ভাই। এ আঁধার [illegible] হবে। দ্য ওয়ারস্ট ইজ ইয়েট টু বী। তখন আমার কথা মনে থাকবে তো?' তিনি হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় দেন।

একদিন শুনি তাঁর প্রয়াণ। [illegible] মৃত্যুর খবরটাই আমার অজানা। যাবার সময় নাকি বড়ো নাতির হাতে একটা উপহার দিয়ে বিলিতী কায়দায় হ্যান্ডশেক করে বলেন, 'গুডবাই। ভালো ছেলে হয়ো। কেমন?'

এক্সপ্লয়টেশন

শ্রীলেখা বসু

দিদার ভাড়ার ঘরের সামনে একটা চেয়ার পেতে বসে রমি বললো, 'এটা এক ধরনের এক্সপ্লয়টেশন।'

রমির দিদা সম্মুখে উপবিষ্ট বিশালদেহী রামনাথ দরোয়ানকে বললেন, কেইসা লেবু লায়া হয়? আধেক পচ গিয়া। একদম যাচ্ছেতাই লেবু।'

রামনাথের অভ্যাস সে প্রতি কথার প্রতিধ্বনি করবেই। তাছাড়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বাজারের হিসেব দিতে মেজাজও তার খাপ্পা। সে একটা বিচিত্র সুরে বললো, 'হাঁ—যাচ্ছেতাই লেবু! ইসসে আচ্ছা নিম্বু মিলনা মুশকিল হায়।'

রমি বললে, 'দেড় ঘণ্টা ধরে ভাড়ার ঘরে বসে আছে অথচ এই সময়টা কত কি করতে পারবো। সমাজ মেয়েদের এক্সপ্লয়েট করে এসেছে বরাবর।'

রমির দিদা বললেন, 'কে বলেছে লেবু নেই মিলতা? কালকেই তো গণুবাবু বড়ো বড়ো চমৎকার লেবু এনে দিয়েছে। সস্তা ভী হায়।'

'সস্তা ভী হায়,' অদৃশ্য গণুবাবুকে একবার চোখ পাকিয়ে দেখে নিয়ে রামনাথ বললো, ইস্‌সে সস্তা নহী মিলতা।'

ইতিমধ্যে বনমালী ঠাকুর ব্যাঘ্রঝম্প দিয়ে এসে বললো, 'দিন দিকিনি আর এক ফোঁটা তেল-অ, চচ্চড়ি পুড়ে যাচ্ছেন।'

রমির দিদা সাময়িকভাবে লেবু-প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে ঠাকুরের দিকে ফিরলেন, 'আর একটুও না! তুমি ভেবেছো কি বলো তো ওই অতখানি তেল—'

রমি বললো, 'দাও না বাপু, বেচারী চাইছে যখন।'

রমির দিদা কর্ণপাত না করে বললেন, 'কি রেঁধেছো শুনি, মাছের ঝাল হয়েছে?'

ঠাকুর তেলের বাটি ভরতে ভরতে বললো, 'ওই তো, ভাত—অ রাঁধলুম।'

'ভাত! সব রান্না ফেলে ভাত! বলেছি না গরম গরম ভাত পাতে দেবে? তেল কি হলো তাহলে?'

বনমালী ইতিউতি চেয়ে বললে, 'ও—ই'।

রমি বললো, 'আহা বেচারা, ছেড়ে দাও না ওকে।'

বনমালী এক গাল হেসে বললো, 'রমিমা বড়ো ভালো—এমনটি আর হয় না।'

'তেল কি হলো?' রমির দিদা নাছোড়বান্দা।

'আলুভাতে মাখলুম না' বলতে বলতে সবেগে রান্নাঘরের দিকে পদচালনা করলো ঠাকুর।

অতঃপর কিছুক্ষণ বনমালীর উদ্দেশ্যে বকাবকি করে রমির দিদা রামনাথের দিকে ফিরলেন। রামনাথ এতক্ষণ নির্বিকার মুখে কান চুলকোচ্ছিল, এবারে বললো, 'মুলী আঠ আনা।'

'আঠ আনা! সে কি! ঠিক করে দেখকে বলো।'

'আঃ দিদা,' রমি বিরক্ত হলো, 'ও কি মিথ্যে কথা বলছে?'

'দেখিয়ে তো রমিমা, আপ হিসাব লেনে সে পাঁচ মিনিট মে কাম হো যাতা, আউর মাইজী কা—কা বোলী।'

রামনাথের আক্ষেপোক্তি বিলীন হতে না হতে বনমালী পুনর্বার সবেগে প্রবেশ করে বললো, 'দেন দিকিনি এক-ছিটে মশলা।'

'জ্বের মশলা!' রঞ্জির দিদা এবারে বর্ণটি ছেড়ে উঠলেন, 'তুমি দিন দিন কি আরম্ভ করেছো ঠাকুর?'

অবুঝ শিশুকে ভোলানোর মত করে রামনাথ বললো, 'সে সব পরে হবে বাবু, আমার কত্তাই জেনে গাচ্ছেন।' মশলাটুকু হাতিয়ে নিয়ে রমির দিকে চেয়ে একটু মিষ্ট হাসি হাসলো ঠাকুর, 'খেতে যখন মায়নী বসিবেনী তখন রান্না খারাপ হলে আমাকেই বলিবেনী তো!'

ঠাকুর অন্তর্ধান করলো, রামনাথ কান চুলকোনো থামিয়ে বললো, 'ভিণ্ডি দশ আনা!'

'ধত্তোরি ভিণ্ডি,' রমি বিরক্ত হয়ে বললো, 'ওরা যা চায় দিয়ে দিলেই পারো। কতো হাঙ্গামা বাঁচে তাতে। দেখ তো পিসী কেমন সুন্দর সংসার করছে। ভাঁড়ার ঘরে কিছু নেই, সব খোলামেলা—লোকজনও টিকে থাকে।'

রমির দিদা শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না তিনি রামনাথকে বললেন, 'তোমার বড্ড বাড় বাড়া হয়! খালি মুখে মুখে তক্ক!'

রমি হতাশ হয়ে উঠে পড়লো।

আপনারা যারা রমিকে কয়েক বছর আগে দেখেছিলেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলা দরকার রমি আর সে রমি নেই। সে এখন দস্তুরমতো তরুণীপদবাচ্য। কাজল কাউন্ট্রে ও এলভিস প্রেসলি আর তার মনোরাজ্যে বিচরণ করে না। তার এখন অন্য জগৎ, অন্য আকর্ষণ।

পরদা সরিয়ে বাইরে পা দিয়েই রমি অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হলো, 'আরে চাঁদুকা, তুমি? তোমার নাকি মন-মেজাজ বড্ডোই খারাপ, ব্যাপার কি?'

চাঁদুকা করুণ মুখে সামনের গোলাপ ফুলটার দিকে চেয়েছিলেন, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'শান্তিতে আর থাকতে দিলে না, বুঝলি? এতোদিনের আপিশ আমার...'

'তোমার আপিশে আবার কি হলো?' রমি প্রশ্ন করলো, 'লক-আউট নাকি?'

'নাঃ—' চাঁদুকা আরেকটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'বলোই না,' রমির স্নিগ্ধ স্বরে আন্তরিকতা ফুটলো।

'নতুন এক ম্যানেজার সাহেব এসেছে। সে ব্যাটা বলে কি জানিস? বলে কি না সাড়ে ন'টার মধ্যে সবাইকে আপিশে আসতে হবে। মগের মুলুক আর কি!'

'এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না, চাঁদুকা, কাজের সময় নষ্ট করলে কত-খানি ক্ষতি, উৎপাদনে কতখানি ঘাটতি...'

'থাক তোর ঘাটতি,' চাঁদুকা প্রজ্বলিত হলেন, 'কত করে কাজে গেলুম সাহেবকে, এতোদিনের একটা ট্র্যাডিশান, ওয়ান ফাইন মর্ণিং আপনি একটা সার্কুলার ইস্যু করলেই তো যাবে না!...কানই দিল না।'

'কি বললো?'

'বললো, ইফ আই ক্যান মেক ইট অ্যাট নাইন ফর্টিফাইভ ..!' কে বলেছে তোকে নাইন-ফর্টিফাইভে আসতে! লোকের অসুখ-বিসুখ আছে, বাজার-হাট আছে, কাগজটা পড়া, ট্রাম-বাস, গিন্নীর মেজাজ, সব সেরেটেরে তবে না আপিশ। বেশ ছিলো এতোদিন হঠাৎ ওয়ান ফাইন মর্ণিং...'

রমির ফুটফুটে বৌদিটি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি। একটু হেসে সে বললো, 'চা খাবেন চাঁদুকা?'

'চা?' উদাসভাবে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন চাঁদুকা তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, 'তা দেবে দাও। আর শোনো', প্রস্থানোদ্যতা বধূকে ডেকে আনালেন তিনি, 'শুধু মিষ্টি আমি পছন্দ করি না, অমনি একটু নোনতা--'

চা মিষ্টি নোনতা সব হাতের কাছে পেয়ে চাঁদুকার মুখে একটু হাসি ফুটলো। নিমকিতে কামড় দিয়ে রমির দিকে ফিরে বললেন, 'একসপ্লয়টেশন সম্বন্ধে খুব তো লেকচার দিচ্ছিস তোর দিদাকে। যে ভদ্রমহিলাকে যে একসপ্লয়েট করবে সে এখনো মাতৃ-গর্ভে। একসপ্লয়েট করার জন্যে আলাদা মেটিরিয়াল চাই, যেমন আমাদের হারাধনবাবু।

'বড়ো সৎ, বড়ো ভালোমানুষ ছিলেন ভদ্রলোক। ফর্সা মুখখানি কথায় কথায় লাল হয়ে যেত। কতরকম আলোচনা হতো আপিশে,' মুগুর দিকে চেয়ে ঢোক গিললেন চাঁদুকা, 'মানে তখন আমরা সব ইয়াং ছিলুম তো, হারাধনবাবু কখনো একটি বাজে রসিকতা করতেন না। বিকেল পৌনে পাঁচটায় আর্জেণ্ট লেখা ফাইল টেবিলে পৌঁছলেও একদিনও মুখখারাপ করতেন না। কেমন যেন একটা করুণ করুণ ভাবে তাকাতেন আমাদের দিকে, কেমন একটা যীশুখ্রীস্টের মত চাউনি 'ফাদার ফরগিভ দেম' গোছের। তখন তো মানুষটির মূল্য বুঝি নি—কত হাসিঠাট্টা করেছি। আমরা তখন—'

'—ইয়াং ছিলে তো?' রমি হাসলো।

'আবার পাস্ট টেন্স কেন?' বধূ যোগান দিল।

দারুণ খুশি হয়ে চাঁদুকা বললেন, 'পাস্ট টেন্স নয় বলছিস? হবেও বা। এই ম্যানেজারটা এসে অবধি পাস্ট-প্রেজেণ্ট গুলিয়ে গেছে। যা হোক তখন তো এত নিয়মের এতো কড়াকড়ি ছিলো না। তবু হারাধনবাবু সাত সকালে এসে আপিশ আলো করে বসতেন, আর চারটে বাজতে-না-বাজতে আমরা যখন বাড়ী ফেরার জন্যে উসখুস করতুম তখন নির্বিকার চিত্তে ভদ্রলোক ফাইলের স্তূপ কাবার করতেন। আমরা একটু চন্মন করতুম, মানে বুঝলি না, তখন তোদের কাকীমা এতো মোটা ছিলো না, আর মেজাজটাও এইরকম চড়া—' বধূর দিকে চেয়ে একটু সলজ্জ হাসলেন চাঁদুকা। 'সেইসব ক্রিটিক্যাল সময়ে হারাধনবাবু যে কত সাহায্য করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

'বেশ চলছিল, সুবিধে মত আপিশে যাই। টি ব্রেক সারকতক প্রলম্বিত লাঞ্চ আওয়ার...কোনো টেনশান ছিলো না। সাহেব ওপরওলারা ছিলো, আমাদের সম্বন্ধে তাদের কি ইম্প্রেশন ছিলো তা তো জানিসই। তাই কোনোদিন হ্যান করো ত্যান করো বলে জ্বালাতন করে নি। হারাধনবাবুকে কিন্তু তারাও খুব রেসপেক্ট করতো আর তাই নিয়ে আমরা একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করতুম, স্লেভ মেন্টালিটি বলতুম, আরো কতো কি! তিনি কিন্তু শরচ্চন্দ্র একটু হাসতেন আর বলতেন 'কাজটা না করে রাখলে আপিশটা যে সাফার করে ভাই।' ওই আপিশই ছিলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

'ইতিমধ্যে দেশ জুড়ে মহা গন্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেল। এক এক করে লাল-মুখোরা চলে যেতে লাগলো আর আমরা চাঁদা তুলে তুলে ফেয়ারওয়েল পার্টি দিতে লাগলুম। সে কি সিগারেট দরবেশ, সে কি স্পীচ সব। সাহেব-গুলো এতোদিন এদেশে থেকেও স্পীচ শুনে হতবাক। প্রত্যেককে আমরা বললুম, 'ইউ ওয়ের আওয়ার ফাদার। ইট ওয়াজ দি লাক অভ আওয়ার ফোর্টিন জেনারেশানস টু হ্যাভ ইউ উইথ আস।' কাউকে কাউকে আমরা টাইটেলও দিলুম, 'দি ফাদার অভ জনসন অ্যান্ড অ্যান্ড্রুজ,' 'দি লাভার অভ জনসন অ্যান্ড অ্যান্ড্রুজ...দেশে তখন একটা টাইটেল দেবার জোয়ার এসে-ছিল, 'দেশবন্ধু', 'দেশপ্রিয়'। বুড়ো জেনকিনস সাহেবকে যখন 'দি গ্রেট লাইফ জেনকিনস' বলা হলো বুড়ো তো কেঁদেই ফেললো।'

চাঁদুকা চোখ বুজে দৃশ্যটা দেখে নিলেন, বললেন, 'স্রেফ কেঁদে ফেললো, বুঝলি। আমরা ভীষণভাবে মুষড়ে গেলুম। বুড়ো ইংরিজি শেখাবার নাম করে আমাদের কম জ্বালায় নি তো। তারপর মিসেস জেনকিনস-এর দিকে ফিরে বলরামবাবু যেই আরম্ভ করেছেন, 'মাদার চন্ডী', ভদ্রমহিলা দু হাত নেড়ে বললেন, 'এনাফ এনাফ!'...অভিভূত হয়ে পড়েছিল আর কি।'

রমি টুকটুকে লাল হয়ে গিয়ে বললো, লজ্জা করলো না তোমাদের! গোটায় কোথাকার!'

'কে মেটার?' চাঁদুকাও গরম হলেন, 'আমরা টাইটেল দিলেই যত্ত দোষ, আর এই যে তোরা কতকগুলো মেলচ্ছকে ধরে 'ভারতের মুক্তিপথিক' আর 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' চালাচ্ছিস তাতে দোষ হয় না?'

'সে কথা আলাদা, সেটা একটা ইডিওলজিক্যাল বন্ধন।'

'আমাদেরও ইডিওলজি কিছু কম ছিলো না রে বাপু। বিদেশী জিনিস বরাবর বর্জন করে এসেছি, সে আমাদের ইংরিজি শুনলেই বুঝতে পারবি। আর তোরা দিবারাত্র ইংরিজিতে কড়মড় করছিস। আর শুধু কি ইংরিজি। চীনে পলিটিক্স, জাপানী ইকেবানা, ফরাসী পোষাক বার্লিনের হাস্যুক, কি না নিয়ে মাচাচ্ছিস তোরা। বলে কিনা ইডিওলজি—'

গনগনে মুখে বিশালাকায় পেট-ফোড়া হ্যানডিউটাকে আক্রমণ করলেন চাঁদুকা, আর রুণুরে বিস্ফারিত চোখের সামনে পূর্ণিমার চাঁদটিকে আধ মিনিটের মধ্যে অমাবস্যায় বিলীন করে দিলেন। অর্ধেকাধ জল পান করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'সাহেবরা বিদায় নেবার পর আমাদের বড়োসাহেব হয়ে এলেন এক বঙ্গসন্তান। ভদ্রলোক মুখে বেজায় মিষ্টি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে আর কি বলবো তোদের! ওভারটাইম-ফাইম বন্ধ করে দিল।' বলতে গেলে মিষ্টি হেসে বললো, 'এই কাজটুকু যদি কেউ নর্মাল আওয়ার্সের মধ্যে না করতে পারেন তবে তাঁর চেয়ারে বসার যোগ্যতা আছে কি?' এই তো পিত্তি চটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট তার ওপরে তিনি আবার 'বাণী' দিতেন—'দেশের সন্তান', 'শ্রমের মর্যাদা', 'জাতি গঠন' এইসব নানাবিধ বোলচাল। তবে হ্যাঁ, আপিশটার চেহারা বদলে দিলে বটে। এতোদিন অবধি যা কিছু উড প্যানেলিং যা কিছু ফুলদানি, সব বড়ো, মেজো, ছোটো সাহেবের ঘরে ছিলো। আর আমাদের কপালে দেওয়াল চটা ঘর আর পেরেক-ওঠা ডেস্ক। সান্যালসাহেব আসার পর জুট কার্পেট এলো, এলো খদ্দরের নকশাদার পরদা, রিসেপশনিস্টের মাথার ওপর যামিনী রায় আর—আর একটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

'বুঝলি, সেই তিরিশ বছর আগে এরকম দু-কূল প্লাবিত করে বঙ্গললনারা ঘর ছেড়ে বেরোননি। আমরা তখন তাদের অবাক হয়ে দেখতুম আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতুম। এখনকার দিনকাল তো তোদের জমানার মত ছিলো না যে ছেলেমেয়েরা একে অন্যকে দেখে দেখে বিয়ের আগেই ফেডআপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সময়ে জীবনে একটা রোমান্স ছিলো।'

রমি সহানুভূতির স্বরে বললো, 'শুনেছি ওই ধরনের রুজোয়া কম-প্লেকসে বেশীর ভাগ লোকেই ভুগতো। কাজকর্ম বেশী ছিলো না তো!'

চাঁদুকা কর্ণপাত না করে বললেন, 'সাহেবদের আমলে তিনটি কালো কালো মেমসাহেব আমাদের আপিসে ছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে কালোটি পাত্তাড়ি গুটিয়ে ইন্ডিয়া ছেড়ে হেসে চলে গেল, আর তার জায়গায় এলো একটি আন-কোরা বাঙালী মেয়ে। আহা হা সে কি ডাগর চোখ, আর কি তার অবাক চাহনি! কাজকর্ম কিছুই বুঝতে পারে না, মানে বুঝবে না বলে পণ করেছে আর কি। আমরাই কাজগুলো তুলে দিতুম। তাকে ঘিরে স্বপ্নের কত জাল বুনতুম।

'কিন্তু ওই এক উৎপাত স্বপ্নের মধ্যে হানা দিয়ে সব গণ্ডগোল করে ফেললো। বড়োসাহেবটি বড়োই বাড়িয়ে তুললো। বলবো কি তোদের, কে ক'বার চা খাবে, কতক্ষণ বাথরুমে থাকবে এইসব ফান্ডা-মেন্টাল রাইট নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলো। আর আশ্চর্য লোকটার দিব্য-চক্ষু আছে নাকি? নইলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরগুলো অবধি পায় কোত্থেকে? অনিমেষের একটু খেলাধুলোর বাতিক আছে। মাঠে খেলা থাকলেই তার মাতৃ-দেবীর এখন-তখন অবস্থা হয়, বলরাম-বাবু হবু জামাইয়ের জন্যে অ্যাকাউন্টস সেকশানে তাম্বির করছেন—এইসব খবরই গিয়ে পৌঁছয় বড়োসাহেবের কানে। আমরা গজগজ করি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারি না। শেষে অনিমেষই যাকে বলে আসামী পাকড়ালো।

'পরদিন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা মাঠে, অনিমেষের মাতৃদেবী এবার সুস্থই আছেন। তাই অনিমেষ সের-পাঁচেক রসোগোল্লা নিয়ে সোজা বড়ো-সাহেবের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। খানিই সান্যালগৃহিণীকে রসে ভিজোনো যায়—এই উদ্দেশ্য আর কি। গিয়ে দেখে কি, স্বয়ং বড়োসাহেব বসে আছেন বেশ হাসি হাসি মুখ, আর তাঁর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আমাদের হারাধনবাবু। আর কি তাঁর খাতির, কি তাঁর যত্ন! সান্যাল-গৃহিণী নিজে ওঁকে রসোগোল্লা তুলে তুলে দিলেন। দেখেশুনে অনিমেষের তো চোখ কপালে উঠে গেল।

'বড়োসাহেবের 'দিব্যচক্ষু'টি যে কে সে আর জানতে বাকি রইলো না। পরের দিন আপিসে হারাধনবাবুকে আমরা 'মীরজাফর', 'উমিচাঁদ' কিছু আর বলতে বাকি রাখলুম না। কিন্তু হলে হবে কি, ভদ্রলোক সমান নির্বিকার। কেমন একটা মহাত্মা গান্ধী-মার্কা হাসি, কেমন একটা বাধাবিঘ্ন ক্ষমাশীল একসপ্রেশান। সেই হাসি আর একসপ্রেশান ফুটিয়ে বসে রইলেন।'

রুণু বললো, 'হয়তো ভদ্রলোকের ভালোমানুষীর সুযোগ নিত।'

রমি বললো, 'হ্যাঁ, যেমন আমাদের বনমালীঠাকুর। খুব বিশ্বাসী বলে দুধ দুইবার সময় দিদা ওকেই পাঠাবে গার্ড দিতে। যতক্ষণ গয়লা বালতি দোব ততক্ষণ ঠাকুর ঠায় বসে পাহারা দেয়। দুধ দুইবার ঠিক আগেই গয়লা ওকে ধমক দিয়ে বলে, ঠিক সে পুছকে আও কিতনা দুধ চাহিয়ে। ঠাকুর ঊর্ধ্বশ্বাসে পুছতে আসে, ফিরে যেতে যেতে দুধ দোয়া কমপ্লিট।'

'আরে তা হলেও তো ভালো ছিলে', চাঁদুকা অধৈর্য হয়ে বললেন, 'এ যে সাজা পাগল, বনমালীর মত জেনুইন নয়। গ্রামদের গালাগালি শুনে কি বললো জানিস? বললে, 'আপিশটা যে সাফার করে ভাই। বড়োসাহেব তো অর্পিশের মঙ্গলই করতে চান তাই তিনি আমার কো-অপারেশান চাইলে কি করে না বলি বল্?'

'বোঝ তোরা রক্ত মাথায় চড়ে যায় কিনা। অনিমেষ খিঁচিয়ে বললো, 'কি লাভ হচ্ছে কি লাভ হচ্ছে শুনি ওর পায়ে তেল দিয়ে। যেখানে ছিলেন সেখানেই তো পড়ে আছেন, এক পয়সাও মাইনে বেড়েছে কি? ও ব্যাটা যে আপনাকে একসপ্লয়েট করছে তাও বোঝেন না?' আমরাও অনেকরকম বোঝালুম, ধিক্কার দিলুম, তবু কিন্তু নির্বিকার। শেষে আমরা ওঁকে বয়কট করলুম কারণ ক্রমেই উনি বড়োসাহেবের ডানহাত হয়ে উঠছিলেন। হারাধনবাবুর কিন্তু সেই একইরকম আন্তরিক ভাব, আর কেমন যেন একটা নিত্যানন্দ প্রভুর মত হাসি। মানে আমরা ওঁকে কসাই কাটা বাই মারি না কেন উনি আমাদের প্রেম বিলোচ্ছেন বলে বন্ধ-পরিকর।' গল্প থামিয়ে চাঁদুকা হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে বসলেন, 'এই এই রাম-নাথ, বাজার যাও হায়? আণ্ডার কয়েকঠো লেইডউ...'

রামনাথ দূর থেকেই ধমক দিয়ে বললো, 'বাজার যাতা হায়। নহী যাতা বাজার। কুছ লানা হায় তো বোলিয়ে না পহলে বাবুকো, হাম অব কুছ না লাওব।' বিশুদ্ধ দেহাতী বুলিতেই রামনাথের উষ্মার পরিচয় পাওয়া গেল।

চাঁদুকা একটু দমে গিয়ে বললেন, 'কি হলো রে? ও অমন চটছে কেন?'

রুণু নিশ্চিন্তভাবে বললো, 'ও কিছু না, হিসেব দেওয়ার আগে-পরে ওর একটু মেজাজ খারাপ হয়।'

রমি বললো, 'দোষ দেওয়া যায় না, দিদার হিসেব নেওয়া ঘণ্টাখানেক ধরে চলে তো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বনমালী-দের নেপথ্য কোরাস।'

চাঁদুকার দমে যাওয়া মুখটা দেখে রুণু বললো, 'ওর বকুনি কেউ মাইণ্ড করে না চাঁদুকা, খুব সরল লোক। এই তো সেদিন ওর জামাই মেয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না শুনে দিদা বলেছিলেন, 'ওইটুকু মেয়ে অমন দুষ্টু? দুটো চড় মারলে তবে ঠিক হয়।' ক্ষি-

মাত্র রামনাথ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে জামাইকে ধরে দুই রামচড়। গিন্নী শুনে লজ্জায় মরে গিয়ে ছি-ছি করতে লাগলেন বটে কিন্তু জামাই সুড়সুড় করে এসে মেয়েকে তোয়াজ করে বাড়ী নিয়ে গেল। থাক ও-কথা, আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

চাঁদুকা বিমর্ষচিত্তে হার্নিভউয়ের খালি প্লেটটাকে অবলোকন করে বললেন, 'কি বলছিলুম, সান্যালসাহেবের অত্যাচারে আমাদের তো জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। কোথায় চারটে সাড়ে চারটের থেকে উসখুশ করা আর এখন কিনা বেরুতে পৌনে ছটাও হয়ে যায়। আমাদের সঞ্চারিণী-পল্লবিনী-লতারও তেমন আর জৌলুষ নেই। মুখখানিতে বিষণ্ণতা, চোখদুটিতে ক্লান্তি হাসিটুকুতে—'

'হয়েছে, হয়েছে,' রমি ধমকে দিল, 'কাব্যি রাখো তো!'

চাঁদুকা বললেন, 'কি আশ্চর্য! সেটেই তো সারছি। তোদের যেন সবই চাঁচাছোলা। আমাদের সময় নায়িকার রূপবর্ণনা ছিল দেড় পাতা জোড়া, রূপাজীবার বর্ণনা আরো তিনপাতা—ব্যস, গল্পটা দাঁড়িয়ে যেত। আর তোদের গল্প হলো, 'নায়ক উঠলো সে ধড়ো, বিশ্রী বদজাৎ। আয়নার সামনে দাঁড়ালো, আয়নাটা ফাটা দাগধরা। ভেজা শার্ট, গায়ে দুর্গন্ধ। শার্ট পরলো, কলার ছেঁড়া। বাস এলো, ভীড়, গরম উঠে পড়লো। চললো সে অনন্তকাল ধরে এই পথ বেয়ে চললো—কেউ তার কথা জানে না।' —আচ্ছা তোরাই বল ভাবতে [illegible] পারিস না, [illegible] একটা সুন্দর সুন্দর জিনিসের কথা ভাবাতে দোষ কি?

যাই হোক, আমাদের সঞ্চারিণী বললো তাকে নাকি ছটা-সাতটা অবধি অফিসে থাকতে হয়। সান্যালসাহেবের নাকি তার আগে কাজ শেষ হয় না। যখন সে বেরোয় বেরোয় তখন অফিস ফাঁকা হয়ে যায়, কেবল হারাধনবাবু তাঁর চেয়ারটিতে বসে কাজ করে যান। সান্যালসাহেবের নাম শুনলেই আমাদের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি কঠিন হল।

কিছুদিন পরে খবর এলো চুঁচড়ো অফিসের বড়োসাহেব নাকি হঠাৎ হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন। শুনেই আমরা হারাধনবাবুর কাছে গিয়ে বললুম, 'দেখছেন তো খেটে খেটে লোকটা মরেই গেল। আপনিও এই রকমই যাবেন, তখন কোম্পানী যেন আপনার মূর্তি স্থাপনা করে পুজো করে।' বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই বললুম কিন্তু হারাধনবাবু আজ যেন কিছু অন্যমনস্ক, কথাটা বোধহয় ও'রও মনে হয়েছে। তারপর আমরা দলবেঁধে ম্যানেজার-সাহেবের কাছে গেলুম। শোকসভা করবো আর অমনি পরের দিনটা যাতে ছুটি দেওয়া হয়। এমন কিছু অন্যায় কথা নয়। কিন্তু শুনে সেই যে ব্যাটা হাঁ করলো সে হাঁ আর বুজতে চায় না। তারপর একটা হাড়জ্বালানো প্রশ্ন করলো, 'চুঁচড়োর বড়োসাহেবকে আপনারা চিনতেন?' কি রকম রাগ হয় বলতো? আমরা একটা রেজোলিউশান নিলুম যে সান্যালসাহেব মরলে আমরা শোকসভা-টভা কিছু করবো না। ছুটি অবিশ্যি নেব আর সেদিন একটা গ্র্যান্ড ফীস্ট লাগাবো।

'পরের দিন কিন্তু আপিসে হৈ-হৈ ব্যাপার। আনফর্চুনেটলি আমরা কেউ তখন ছিলুম না, কিন্তু অনিমেষ আটকে ছিলো। সে বললো, সন্ধ্যেটা যখন বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ চারিদিক সচকিত করে সান্যালগৃহিণী আপিসে প্রবেশ করলেন। করেই আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা গিয়ে ঢুকলেন সান্যালসাহেবের ঘরে। ... তারপর ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো আমাদের সঞ্চারিণী লতা। আর ছিটকে আসতে লাগলো তর্জন গর্জন, বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি—প্রলয়ংকর কাণ্ড আর কি? অনিমেষ বেচারা একটু কান পাততে গেছলো, তাতে তার এইটুকু বোধগম্য হলো যে কোনো এক শুভার্থী নাকি টেলিফোনে সান্যালগৃহিণীকে বলেছেন তাঁর স্বামীকে যদি তিনি হাতে-নাতে ধরতে চান তবে যেন সন্ধ্যে ছটা নাগাদ আপিসে আসেন। তারপর বুঝতেই পারছিস্! এই এতো কাণ্ডের মধ্যে হারাধনবাবু অবিচলিতভাবে বসে-ছিলেন তাঁর ডেস্কটিতে। সেই ক্ষমা-সুন্দর এক্সপ্রেশান, সেই শুচিস্মিত হাসি। ......কিছুক্ষণ পরে যেমন এসেছিলেন তেমনি আগুনের হল্কার মত গন গন করতে করতে বেরিয়ে গেলেন সান্যাল-গৃহিণী, আর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মত গনগন করতে করতে বেরিয়ে এলেন সান্যালসাহেব। সোজা হারাধন-বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, গমগমে গলায় ডাকলেন, 'হারাধনবাবু!'

মৃদু মধুর হেসে হারাধনবাবু বললেন, 'বলুন স্যার।'

'এই অবধি শুনেই অনিমেষ হাওয়া। অর্বাচীন ছোকরা বৃথাই খেলাধুলো করে। রেফারী ঠ্যাঙানো ছাড়া আর কোনো সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না। যাইহোক যতটা দেখেছে তাই বা কম কি? এমন রসালো কথাটা পরদিনই ছড়িয়ে পড়লো আপিসে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিলো আমাদের জন্যে। লাঞ্চের আগেই খবর পেলুম চুঁচড়োর বড়োসাহেবের খালি পোস্টে যাচ্ছেন আমাদের হারাধনবাবু। সান্যালসাহেব নিজে রেকমেণ্ড করেছেন। দু' দিনের মধ্যেই উনি গিয়ে টেক্‌-ওভার করলেন।

'বিস্ময়বিমূঢ় আমরা গিয়ে হারাধন-বাবুর চারপাশে ভীড় করলুম। অনিমেষ বললো, 'কি করে ম্যানেজ করলেন দাদা? একটু বলুন, দোহাই আপনার।'

'হারাধনবাবু বললেন, 'ম্যানেজ করা-করির কি আছে? কাল বিকেলে সান্যালগিন্নীকে ফোন করার পর তিনি ডিটেল খবরের জন্যে আমাকে সন্ধ্যের পর বাড়ী যেতে বলেছিলেন। সেইটা বন্ধ করার জন্যে সাহেব বললো কি চাও। তারপর বুঝতেই পারছো ভাই।'

'আপনি—আপনি প্রাথমিক বাক্‌-রোধের পর আমরা বললুম, ভদ্রলোকের দুর্বলতাটা এভাবে এক্সপ্লয়েট করলেন?'

'হারাধনবাবু হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়েই দিলেন, বললেন, 'নইলে আপিসটা যে সাফার করে ভাই' বলে খাঁক করে একটু হাসলেন, কেন্টমেনন-মার্কা একটু হাসি।'

'কৃষ্ণমেনন!' মৃদু, রমি বললো।

'হ্যাঁ অবিকল কেন্টমেনন, সেই হাসি, সেই চাউনি, কেমন একটা শেয়াল-শেয়াল ভাব। ভদ্রলোককে দেখে আমেরিকানদের যা রিঅ্যাকশন হত, আমাদেরও তাই হলো। আর সান্যালসাহেবের কথা আর কি বলবো। একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন, কোথায় গেল সেই বোলচাল, কোথায় বা সেই কর্মবীর কর্মবীর ভঙ্গী। মাসদুয়েকের মধ্যে বম্বে আপিসে ট্রান্সফার নিয়ে বাঁচলেন ভদ্রলোক। তার জায়গায় এলেন মেহতা-সাহেব। ফাটকাবাজার নিয়েই মগ্ন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, সেই রামরাজত্ব ফিরে এলো আবার।'

একটু চুপ করে থেকে মৃদু বললো, 'আর সেই সঞ্চারিণী? তার কি হলো?'

'তাকে তো হারাধনবাবু চুঁচুড়োর আপিসে নিয়ে গেলেন যে। সেখানে তার পিসী না কে থাকে। 'এখানে বেচারা এমব্যারাসড্ ফীল করবে, আমার সঙ্গেই চলুক', বলে বিদ্যাসাগরীয় একটা এক্সপ্রেশন ফুটিয়ে তিনি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। সেখানে বাড়ী, গাড়ী, অমন একখানি সেক্রেটারী, আর কি চাই! আর কি চায় লোকে?

'তাই বলছিলুম, এক্সপ্লয়টেশনের জন্যে আলাদা মেটিরিয়্যাল চাই। আহা আজ যদি হারাধনবাবু থাকতেন রে।—বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল, রমি, আর এক কাপ চা ঢালতো, আর মৃদু, তুমি একটু নিমকির খোঁজে যাও মা', বলে চাঁদুকা চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অসম্পূর্ণ চিত্র

প্রমথনাথ বিশী

[শ্রাবস্তীনগরের রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত উদ্যান। উদ্যানে সমস্তই ফুলের গাছ, বড় গাছ আছে যেমন মুচকুন্দ, চাঁপা, শেফালি, আবার ছোট গাছ যেমন মল্লিকা, জুঁই, করবী, কামিনী ইত্যাদি। উদ্যানের যেন দুটি অংশ, পিছনের দিকে একটি নবনির্মিত চারিদিক খোলা মণ্ডপ, মাথার উপরে কেবল একটি ছাদ তার পিছনে একটি দেয়াল। উদ্যানের সম্মুখ ভাগে ওসব কিছু নাই, কেবল ইতস্তত উপবেশনের জন্য ছোট বড় অনেকগুলি শ্বেতপাথরের বেদী। পিছনের দেয়ালে সদ্য অঙ্কিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটি এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, তবে অল্পই বাকি আছে, মুখমণ্ডলে চক্ষু দুটি অঙ্কিত হয় নি। উদ্যান সম্পূর্ণ নির্জন। সময় অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নের সীমান্ত। আজকে বৈশাখী পূর্ণিমা, আকাশ ইতিমধ্যেই প্রভাময় হয়েছে, তবে পঞ্জিকার গণনানুসারে পূর্ণিমা লাগতে এখনো কয়েক দণ্ড বাকি আছে। অভিনয় কালে সমস্ত উদ্যানটিকে প্রয়োজন ভেদে রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগ এবং পশ্চাদভাগ রূপে ব্যবহার করতে হবে। আলোক নিক্ষেপের তারতম্য দ্বারা পুরোভাগ ও পশ্চাদভাগের প্রভেদ বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। উদ্যানের মাঝখানটা ফাঁকা, কাজেই দর্শকদের পক্ষে মণ্ডপ ও বুদ্ধমূর্তি দেখতে বাধা নেই। চাঁদের আলোয় চারদিকের গাছপালা বিচিত্র ছায়া নিক্ষেপ করেছে, সন্ধ্যা-বেলাকার হাওয়ার দোলায় ছায়াগুলি বিচিত্রতর ভঙ্গিমা। দূরে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে, ছয় ঘড়ি বাজলো, সঙ্গে ডংকারধ্বনি, প্রহরে প্রহরে ডঙ্কাধ্বনি প্রহরান্ত জানিয়ে দেয় নাগরিকগণকে।

রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদভাগের বামদিক থেকে কাষায় বস্ত্রধারী দুইজন শ্রমণ প্রবেশ করে অসম্পূর্ণ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রণত হল আর সেই সঙ্গে দুজনে সমস্বরে আবৃত্তি করলো

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।।

শ্রমণদের একজন প্রবীণ, অপরজন নবীন।

নবীন শ্রমণ ।। ভদন্ত, চিত্র তো সম্পূর্ণ হল না।

প্রবীণ শ্রমণ ।। কেবল আঁখিপদ্ম দুটি বাকি, আজই হবে। আচার্য দিবাকর মিত্রের আদেশ পূর্ণিমা আরম্ভ হলেই অঙ্কন করতে হবে।

নবীন ।। তিনি কি এখন আসবেন।

প্রবীণ ।। নিশ্চয়, তাঁকে আনবার জন্যে রাজরথ গিয়েছে বলে শুনেছি। তিনি এসে মহারাজকে কাষায় বস্ত্র দান করবেন।

[তারপরে দুজনে চিত্রটি নিরীক্ষণ করতে লাগলো, রঙের পাত্র ও তুলি হাতে নিয়ে এখানে ওখানে এক আধ পোঁচ রঙ লাগাতে থাকলো।

এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগের দক্ষিণ দিক থেকে প্রবেশ করলো মহামাত্য অবন্তী এবং অশ্ব-বাহিনীর সেনাপতি কুন্তল]

মহামাত্য ।। কুন্তল, আচার্য দিবাকর মিত্রকে আনবার জন্যে রাজরথ পাঠানো হয়েছে তো।

কুন্তল ।। মহামাত্য, তিনদিন আগে পাঠিয়েছি, বিন্ধ্যারণ্য তো কাছে নয়।

মহামাত্য ।। আর তাঁকে প্রত্যুদগমন করে আনবার কি ব্যবস্থা করেছ?

কুন্তল ।। চামর, ছত্র প্রভৃতি নিয়ে একদল অশ্বারোহী এগিয়ে গিয়েছে। রাজধানী থেকে একদিনের পথের মাথায় তাঁকে অভ্যাগম করে স্বাগত জানাবে।

মহামাত্য ।। পূর্ণিমা লাগবার আগেই তাহলে এসে পৌঁছবেন।

কুন্তল ।। যদি না পথে কোন বিপদ ঘটে।

মহামাত্য ।। বিপদের কথা মনে হল কেন?

কুন্তল ।। সে কথা আমার চেয়ে বেশি জানবার স্বয়ং মহামাত্যর। প্রধান সেনাপতি বলছিল মহারাজ কাষায় গ্রহণ করে বৈরাগী হলে সৈন্যবাহিনী অনাবশ্যক হয়ে পড়বে, এমনিতেই অনেক দিনের বৃত্তি বাকি পড়েছে, তাদের 'কার্পাস সব অর্থ' এখন যাচ্ছে শ্রমণ ভিক্ষু প্রভৃতির পেটে।

মহামাত্য ।। আরে চুপ চুপ।

কুন্তল ।। আমি না হয় চুপ করলাম। ঐ যে নগরে কোলাহল উঠেছে তাকে চুপ করাবার উপায় কি?

মহামাত্য ।। সত্যই তো দারুণ কোলাহল।

[একজন দূতের দ্রুত প্রবেশ]

দূত ।। মহামাত্য, নাগরিকরা আর্য হুয়েন সাংকে ঘেরাও করে ধরেছে।

মহামাত্য ।। ঘেরাও করে ধরেছে কেন? তাঁর আশীর্বাদ চায় বুঝি।

দূত ।। তাঁর মুণ্ডিত মুণ্ডটি ভাঙতে চায়। তাদের বিশ্বাস ঐ ক্ষপণকটা মহারাজাকে জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে বৈরাগী বানাতে চায়।

মহামাত্য ।। কুন্তল তুমি এখনি যাও, দিগ্বিজয়কে বলো সৈন্যদের দিয়ে, আর্য হুয়েন সাংকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে।

দূত ।। তারাই তো ঘেরাও করেছে।

মহামাত্য ।। কি সর্বনাশ! এ যে দেখছি রাষ্ট্রবিপ্লব। দূত, তুমি যাও। আমি আসছি।

[দূতের প্রস্থান]

কুন্তল, এত বড় দুঃসাহসের কাজ তো কতকগুলো গাঁওয়ার সৈনিকের কর্ম নয়। এর মূলে কে আছে জানো?

কুন্তল ।। জানি তবে বলতে ভয় পাই।

মহামাত্য ।। এখানে শুধু তুমি আর আমি, ভয় কাকে! কে আছে এর মূলে?

কুন্তল ।। স্বয়ং মহারাণী।

মহামাত্য ।। স্বয়ং মহারাণী। বলো কি? আমি তো কিছুই জানতাম না।

কুন্তল ।। আগে থেকে বিজ্ঞাপিত করে বিপ্লব হয়েছে কবে।

মহামাত্য ।। এসো আর বিলম্ব নয়।

[দুইজনের দ্রুত প্রস্থান]

[পশ্চাৎ রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণ দিক থেকে কাষায় বস্ত্র-ধারিণী রাজকুমারী রাজশ্রীর প্রবেশ। বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রণত হয়ে আবৃত্তি করলেন]

রাজশ্রী ।। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং
বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু মে জয়মঙ্গলং।।

[রাজকুমারী উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময়ে দক্ষিণ দিকে মহারাণী প্রবিষ্ট হলেন]

মহারাণী ।। রাজকুমারী, তোমার বসন বুঝি পতিহন্তার রক্তে রঞ্জিত। এই তো ক্ষত্রিয় নারীর যোগ্য বস্ত্র।

রাজশ্রী ।। মহারাণী, জানো সমস্তই। তাকে ক্ষমা করেছেন মহারাজ হর্ষবর্ধন।

মহারাণী ।। কেন শুনি।

রাজশ্রী ।। মালবরাজ দেবগুপ্ত সামান্য একটা পতঙ্গ।

মহারাণী ।। পতঙ্গটা উড়ে পালিয়ে গেল কাজেই ক্ষমা না করে উপায় কি? আর সেই ভ্রাতৃহন্তা নরাধম গৌড়েশ্বর?

রাজশ্রী ।। তাকেও ক্ষমা করেছেন মহারাজ।

মহারাণী ।। আর দাক্ষিণাত্যাধিপতি পুলকেশিনের কাছে বারে বারে পরাজিত হয়ে তাকেও ক্ষমা করেছেন মহারাজ। কি বলো? ভ্রাতা-ভগ্নীতে মনে ক্ষমার দানসত্র খুলে বসেছ। তোমাদের ক্ষমার বহর দেখে আর্যাবর্তের রাজন্যগণ অনেক দিন পরে একটা হাসবার বিষয় পেয়েছে।

রাজশ্রী ।। মহারাণী, বৃথা আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ। তুমি তো জানো আমি অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করতে উদ্যত হয়েছিলাম।

মহারাণী ।। আর্য নারীর যোগ্য কাজ।

রাজশ্রী ।। এমন সময়ে মহারাজ উপস্থিত হয়ে

মহারাণী ।। তোমাকে নিরস্ত করলেন—অন্যায় করেছিলেন।

রাজশ্রী ।। মহারাজার দোষ নেই, আমাকে নিরস্ত করেছিলেন আচার্য দিবাকর মিত্র।

মহারাণী ।। ও সেই স্বধর্মত্যাগী ভণ্ডটা।

রাজশ্রী ।। তিনি মহারাজকে বোঝালেন বৈর দিয়ে বৈর শান্ত হয় না, ক্রোধের দ্বারা ক্রোধের শান্তি হয় না, ক্ষমার প্রলেপ সমস্ত ক্ষতের মহৌষধ।

মহারাণী ।। থাক থাক আর বলতে হবে না। শুনতে শুনতে ক্ষমার ঢেউ উথলে উঠতে শুরু করেছে।

রাজশ্রী ।। পরিহাস নয় মহারাণী। তাঁর মুখে অমৃত তত্ত্ব শুনে মহারাজ তখনি কাষায় গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আচার্য বললেন না, এখনো সময় হয়নি।

মহারাণী ।। তাই বুঝি আজ আসছেন কাষায় দান করতে। ভণ্ডটা জানে আমটি পাকিয়ে তবে আত্মসাৎ করতে হয়। আর তাকেই বা দোষ কি? রাজবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে একটা ক্ষপণক, দুবেলা মহারাজার কানে শান্তিমন্ত্র পড়ছে। দক্ষিণে দুর্ধর্ষ পুলকেশিন, পূর্বে দুর্বিনয় গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক, এরই মধ্যে বিদেশী ক্ষপণক শান্তিমন্ত্রে বসেছে। মহারাজ ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হয়েছেন। হায় আজ যদি আমার উপযুক্ত পুত্র থাকতো।

রাজশ্রী ।। মহারাণী, তুমি বৃথাই উদ্বিগ্ন হয়েছ।

মহারাণী ।। উদ্বেগ। তোমরা সকলে মিলে রাজপুরীতে ধর্মঘরের বাসা তৈরি করবে আর আমি নিরুদ্বিগ্ন বসে থাকবো। মনে রেখো রাজকুমারী, আমিও রাজকুমারী, আমিও রাজমহিষী। আর সর্বোপরি ক্ষত্রিয় কন্যা। এই কে আছ, একবার আচার্য বাণভট্টকে জানিয়ে এসো যে মহারাণী প্রণাম জানিয়েছেন।

[ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চ নীরব। বাহিরে জনতার কোলাহল। এমন সময় বাণভট্টের প্রবেশ। মহারাণী তাঁকে প্রণাম করলেন।]

মহারাণী ।। আচার্য, সনাতন ধর্ম যে যায়, রক্ষা করো।

বাণভট্ট ।। মহারাণী, আমার মতো সামান্য লোকের দ্বারা রক্ষিত হওয়ার যদি অপেক্ষা রাখে তবে বুঝতে হবে এ ধর্ম সনাতন নয়। স্বধর্ম কেউ কখনো ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

মহারাণী ।। আর বাকী কি? ক্ষত্রিয় অস্ত্র পরিত্যাগ করে কাষায় গ্রহণ করছে, ব্রাহ্মণ উপবীত ত্যাগ করে মস্তক মুণ্ডন করছে, বৈশ্য মানদণ্ড ত্যাগ করছে, শূদ্র সেবা-ধর্ম। তবে আর স্বধর্মের কি রইলো অবশিষ্ট?

বাণভট্ট ।। তোমার মনে পড়েছে শ্রীমদভগবদগীতার উক্তি। কিন্তু মনে রেখো ভগবানের মতো ভগবানের বাণীরও অসংখ্য বিভূতি। কাষায় গ্রহণে স্বধর্মচ্যুতি হয় না, যথার্থ স্বধর্মের আশ্রয় একেবারে ভিতরে।

মহারাণী ।। কোথায় প্রভু?

বাণভট্ট ।। একেবারে রক্তের মধ্যে। মহারাজ কাষায় গ্রহণ করুন আর মস্তক মুণ্ডন করুন আর আর যাই করুন না কেন যেদিন ক্ষত্রিয়ের আহবান আসবে সেদিন কোষগত তরবারি আর ধমনীগত রক্ত স্বধর্মের পথে চালনা করবে তাঁকে—কারো সাধ্য নেই প্রতিরোধ করতে।

মহারাণী ।। তাই যেন হয় প্রভু, তাই যেন হয়। মনে বল ভরসা দাও।

বাণভট্ট ।। আমি মনে বল দেওয়ার কে? মনোবল ক্ষত্রিয় কন্যার স্বধর্ম।

[হর্ষবর্ধনের প্রবেশ, সঙ্গে রক্তাপ্লুত দেহ, ছিন্নবাস হুয়েন সাং, পশ্চাতে মহামাত্য, কুন্তল ও প্রধান সেনাপতি সিংহনাদ।]

হর্ষবর্ধন ।। মহামাত্য, অপরাধীর দণ্ড চাই।

মহামাত্য ।। যে আদেশ মহারাজ:

হর্ষবর্ধন ।। শুধু মুখের কথায় চলবে না। রাজপুরুষদের প্রকৃতি আমার অজ্ঞাত নয়। অপরাধীদের চরম দণ্ড চাই।

মহামাত্য ।। তাই হবে মহারাজ।

হুয়েন সাং ।। মহারাজ ওদের ক্ষমা করুন।

হর্ষবর্ধন ।। আর্য, এমন আদেশ করবেন না।

হুয়েন সাং ।। ক্রোধ দিয়ে ক্রোধের উপশম হয় না।

হর্ষবর্ধন ।। এ ক্রোধ নয়, রাজকর্তব্য।

হুয়েন সাং ।। কর্তব্যের উপরে ধর্ম।

হর্ষবর্ধন ।। এক্ষেত্রে কর্তব্যই ধর্ম। আপনি কি বলেন আচার্য।

বাণভট্ট ।। মহারাজ, দোষযুক্ত হলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা এমন কোন্ ধর্ম আছে যা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত।

হর্ষবর্ধন ।। যথার্থ বলেছেন আচার্য। আসুন আর্য, (হুয়েন সাং-এর প্রতি) তথাগতের মূর্তি দর্শন করে মন শান্ত করিগে।

[হর্ষবর্ধন ও হুয়েন সাং ও বাণভট্টের পশ্চাৎ রঙ্গমঞ্চে গমন। পুরো ভাগে রইলো রাজপুরুষগণ।]

কুন্তল ।। মহামাত্য, মহারাজকে তো বললেন অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা করবেন। তা হলে যে নগরশুদ্ধ সকল লোককে দণ্ডিত করতে হয়।

মহামাত্য ।। সেই তো সুযোগ, বনের আড়ালে গাছ হারিয়ে যাবে।

কুন্তল । তার মানে সন্ধান করে পাওয়া যাবে না।

মহামাত্য ।। না, তার মানে সন্ধানের শেষ নেই, অপরাধীকে পাওয়া গেলেই দণ্ডদান করা হবে।

হুয়েন সাং ।। [তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে], মহারাজ, এই বৈশাখী পূর্ণিমা পরম পবিত্র তিথি, আজ তথাগতের আবির্ভাব, বোধিলাভ, আর মহাপরিনির্বাণ। আর আপনারও আজ পরম সৌভাগ্য স্বয়ং আচার্য দিবাকর মিত্রের হাতে কাষায় গ্রহণ উৎসব।

হর্ষ ।। পূর্ণিমা কি লেগেছে?

বাণভট্ট ।। না মহারাজ, মাত্র না কয়েক পল বাকি।

হর্ষ ।। চিত্র সম্পূর্ণ হল না এখনো।

প্রবীণ শ্রমণ ।। মহারাজ, আচার্য দিবাকর মিত্রের আদেশ পূর্ণিমা লাগামাত্র তথাগতের আঁখিপদ্ম দুটি অঙ্কিত হয়ে চিত্র সম্পূর্ণ হবে।

হর্ষ ।। আচার্যের শুভাগমন কখন হবে।

প্রবীণ শ্রমণ ।। তিনি দূত মুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন পূর্ণিমা আরম্ভ হওয়া মাত্র তিনি এসে পৌঁছবেন।

হর্ষ ।। ঐ বোধ করি তাঁর দূত এলো।

[ঠিক দূত নয়। হংসবেগ নামে রাজার গুপ্তচর রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে প্রবেশ করে রাজপুরুষগণের সঙ্গে গোপনে বাক্যালাপ করতে লাগলো।]

মহামাত্য ।। কি দুঃসংবাদ!

কুন্তল ।। একে দুঃসংবাদ বলছ, এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারতো।

মহামাত্য ।। তা কি জানি না! তবে বলবার ভাষাটা ওই। চলো মহারাজকে নিবেদন করা যাক।

[সকলে এগিয়ে গেল]

মহামাত্য ।। মহারাজ, রাজানুচর এসে পৌঁছেছে।

হর্ষ ।। আচার্য দিবাকর মিত্রের পৌঁছানোর সংবাদ নিয়ে?

মহামাত্য ।। না মহারাজ, মহারাজা রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক......

হর্ষ ।। মারা গিয়েছে?

মহামাত্য ।। না মহারাজ, কাশ্মীর থেকে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পথে মহারাজের রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করেছে।

হর্ষ ।। এত বড় দুঃসাহস সেই নরাধমের।

মহারাণী ।। দুঃসাহস নয় মহারাজ সৎসাহস।

হর্ষ ।। কেমন?

মহারাণী ।। সমস্ত আর্যাবর্তে জানাজানি হয়ে গিয়েছে কিনা যে মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন কাষায় গ্রহণান্তে অস্ত্রত্যাগ অবলম্বন করেছেন।

হর্ষ ।। মহারাণী, আমি তো এখনো কাষায় গ্রহণ করি নি, আমি এখনো অসিচর্মধারী।

মহারাণী ।। লোকের ধারণা মহারাজের অসি কলঙ্কিত।

হর্ষ ।। কলঙ্কিত!

মহারাণী ।। কলঙ্কিত বইকি, ভায়ার খাকে বলে মরচে পড়া।

হর্ষ ।। আমার অস্ত্রে মরচে পড়েছে। বেশ, এবারে তার পরীক্ষা হবে। সেনাপতি সিংহনাদ।

সিংহনাদ । মহারাজ।

হুয়েন সাং ।। আজ পরম শুভক্ষণে আপনার চরম পরীক্ষা; ক্ষমা করুন হতভাগ্য ব্যক্তিকে।

হর্ষ ।। আর্য, আপনি কি বলছেন জানেন না। আমার কলঙ্কিত অস্ত্র তথাগতের চরণে দান করলে সে দান তিনি গ্রহণ করবেন কেন!

হুয়েন সাং ।। রক্তও যে অস্ত্রের কলঙ্ক।

হর্ষ ।। না, রক্ত অস্ত্রের অলঙ্কার। থাক তর্ক।

[হঠাৎ বুদ্ধ চিত্রের সম্মুখে নতজানু হয়ে বলে উঠলেন] আজ পরম লগ্নে এ কি চরম পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলে আমাকে ভগবান তথাগত। এ কেমন তোমার লীলা।
দমহীন, সত্যহীন, অন্তরে কামনা,
গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা।'

[প্রণামান্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন]

আপনারা ক্ষণকাল আমাকে চিন্তার অবকাশ দিন, এ পরীক্ষায় আমাকে জয়ী হতেই হবে।

[দ্রুত প্রস্থান]

[রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে]

মহামাত্য ।। ওহে সিংহনাদ, কুন্তল সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করো।

সিংহনাদ ।। কি বলছ মহামাত্য।

মহামাত্য ।। যা বলছি যথার্থ। মহারাজা প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে তিন তিনটে রাজা চলিয়ে এলাম। আরে বাপু, ক্ষত্রিয়ের রক্ত যাবে কোথায়। এতদিন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল, এবারে জেগেছে আর রক্ষা নেই। নাও তৈরি হও গিয়ে।

কুন্তল ।। তাড়া কি আসুন না মহারাজা ফিরে।

প্রবীণ শ্রমণ।। আচার্য (হুয়েন সাং-এর প্রতি) না এসে পৌঁছলেন আচার্য দিবাকর মিত্র, না হল চিত্র সম্পূর্ণ, এদিকে পূর্ণিমা যে লাগে।

হুয়েন সাং।। সমস্ত নির্ধারিত সময়ে হবে।

প্রবীণ শ্রমণ।। তবে ততক্ষণ আপনি প্রার্থনা করুন।

মহারাণী।। আচার্য (বাণভট্টের প্রতি) আপনি মহারাজের কল্যাণ কামনায় মন্ত্রপাঠ করুন।

(বাণভট্ট ও হুয়েন সাং যথাক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ধম্মপদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি শুরু করলেন। এটি অনেকটা গ্রীক নাটকের কোরাসের অনুরূপভাবে অভিনয়।)

হুয়েন সাং ।। (যুক্ত করে মুদ্রিত চক্ষে)
ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।
অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।

বাণভট্ট।। (যুক্ত করে মুদ্রিত চক্ষে)
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।

পুজোর দিনে
উৎসব
অনুষ্ঠানে
লক্ষ্মী ঘি
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI
LG-12/73

বাঁশের দুর্গা প্রতীমা

হুয়েন সাং (তথৈবচ)

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা।
অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা।

বাণভট্ট।। (তথৈবচ)

হতো প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়।
কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত কর্মাণি।

হুয়েন সাং।। (তথৈবচ)

জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং।

বাণভট্ট ।। (তথৈবচ)

শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।।

হুয়েন সাং ।। (তথৈবচ)

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম চন্দিমায়
নমো নমো নন্তু গুণন্নবায়,
নমো নমো সগাকিয় নন্দনায়।।

(উদ্দেশে নমস্কার)

বাণভট্ট।। (তথৈবচ)

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ
তত্রশ্রী বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।

(উদ্দেশে নমস্কার)

(এমন সময়ে সশস্ত্র যোদ্ধৃবেশে মহারাজা হর্ষবর্ধনের প্রবেশ। ইহা এমনি অপ্রত্যাশিত যে রঙ্গমঞ্চস্থ পাত্র-পাত্রীগণ চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চের অপর দিক দিয়ে কাষায় বস্ত্র হস্তে আচার্য দিবাকর মিত্রের প্রবেশ। হর্ষ তাঁকে দেখেও দেখলেন না তথাগতর অসমাপ্ত চিত্রের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন।)

হর্ষবর্ধন।। (নতজানু যুক্তকর)

ভগবান তথাগত আমি আত্মপ্রবঞ্চক। অমৃত অভিপ্রেত মূর্ত ধারণ করে দুর্জয় মার আমাকে আত্মতৃপ্তির যে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল ভ্রান্ত সন্ন্যাসের কাষায় বস্ত্রে তা সমাচ্ছন্ন। নির্বাণের লোভ দেখিয়ে স্বধর্ম থেকে ছিন্ন করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল দুর্জয় মার। আমি যে ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে উঠেছিলাম জানতে পারিনি। এমন সময়ে তোমার অপার করুণা পরীক্ষার দারুণ ঝঞ্ঝায় উড়িয়ে পুড়িয়ে সরিয়ে দিল গৈরিক, বেরিয়ে পড়লো যোদ্ধৃবেশ, বেরিয়ে পড়লো শ্রমণের দণ্ডের পরিবর্তে রাজদণ্ড, বেরিয়ে পড়লো ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রের পরিবর্তে প্রজার ষষ্ঠাংশের দাবী। হায়রে ভ্রান্ত হর্ষবর্ধন। তুমি রাজধর্মের ঋণ অপ্রতিশোধ্য রেখে হাত বাড়িয়েছিলে কাষায়ের দিকে—সে কাষায় যে আজ ঝড়ের মুখে উড়ে চলে গেল। আজ তুমি জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হলে নগ্নরূপে, ভণ্ডরূপে, আত্মপ্রবঞ্চকরূপে। না প্রভু, আমি সন্ন্যাসী নই, শ্রমণ নই, কাষায়ের যোগ্য নই, আমি যোদ্ধা। আমি দণ্ডধারী সন্ন্যাসী নই প্রভু, আমি দণ্ডদাতা রাজা, আমি দুষ্টের শাসক, আমি শিষ্টের পালক, যোগীর পদ্মাসন নয়, রাজার সিংহাসন আমার আশ্রয়। রক্তের শাসন অগ্রাহ্য করবার শক্তি আমার নাই। ভগবান, তোমার অমেয় করুণায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মপ্রবঞ্চনার ভ্রান্ত স্বর্গ থেকে আমাকে রক্ষা করলে তুমি। জয় হোক তোমার প্রভু।

(প্রণামান্তে উত্থান—এমন সময়ে চোখে পড়লো দিনকর মিত্রকে)

হর্ষ।। আচার্য আজ আমাকে ক্ষমা করুন।
দিবাকর মিত্র।। না বৎস, এখন তোমার সময় হয়নি।
হর্ষ।। মহামাত্য
মহামাত্য।। প্রভু
হর্ষ।। সেনাপতিরা কোথায়?
মহামাত্য।। এখানেই উপস্থিত আছে।
হর্ষ।। উত্তম। সিংহনাদ তোমার সৈন্যবাহিনী?
সিংহনাদ।। প্রস্তুত।
হর্ষ।। কুন্তল, তোমার অশ্ববাহিনী?
কুন্তল ।। প্রস্তুত।
হর্ষ ।। স্কন্দগুপ্ত, তোমার হস্তীবাহিনী
স্কন্দগুপ্ত।। প্রস্তুত।
হর্ষ।। তবে আর বিলম্ব নয়। এখনি যুদ্ধযাত্রার আদেশ করো।

সকলে।। যে-আদেশ মহারাজ।

(সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তুরী ভেরী পণব প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে উঠল জনতার জয়ধ্বনি, জয় মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শিলাদিত্যের জয়।')

মহারাণী।। মহারাজ, ক্ষত্রিয় কন্যা, ক্ষত্রিয় পত্নী, ক্ষত্রিয় নারী বলে আজ আমি ধন্য।

হর্ষ।। চলো মহিষী।

(রাজা ও রাণীকে অনুসরণ করে সকলের প্রস্থান। পশ্চাদ রঙ্গমঞ্চে শুধু রইলো শ্রমণদ্বয়, দিবাকর মিত্র ও রাজকুমারী রাজ্যশ্রী।)

রাজ্যশ্রী।। আচার্যদেব, পূর্ণিমা তো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, ভগবান তথাগতর চিত্র যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল—
দিবাকর মিত্র।। সম্পূর্ণ হবে।
রাজ্যশ্রী। কবে প্রভু
দিবাকর মিত্র।। সম্মুখে আছে অনন্ত কাল—চিন্তা করো না। এসো এখন।

(তখন চারজনে অসম্পূর্ণ চিত্রের সম্মুখে নতজানু হয়ে আবৃত্তি ও প্রণাম করলো)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা

বিশেষ স্মর্তব্য : ঘটনাকাল ও নাটকের কাল সমান।

ভালবাসার মুখ
আশাপূর্ণা দেবী
উপন্যাস

দুটো লোহার শিকের মাঝখানের ফাঁকে মুখটা চেপে ধরার দরুন দু গালে খাঁজ পড়ে যাওয়ার মত দাগ বসে যাচ্ছে, তবু সাগর আরো চেপে ধরছে মুখটা। দেখে মনে হচ্ছে, পারলে ওই সরু ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়ে সব মাথাটাই গলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে দেখতো নীচের দৃশ্যটা।

অথচ দৃশ্যটা এমন কিছুই নয়।

একটা আধবুড়ো লোক বাগানে ঘুরে ঘুরে বোধ হয় সার ছড়াচ্ছে।

ফুলের বাগান নয়, সবজীর বাগান। এখন এই গরমের সময় কী-ই বা ফলছে? কপিও নয়, মটরসুঁটিও নয়, চকচকে টোম্যাটো কি ঢলঢলে বেগুনও নয়, নেহাৎই ঢ্যাঁড়শ ঝিঙে বরবটি। তবু যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু সেটা আবার এমন কী দ্রষ্টব্য?

সাগরের চোখ দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না বাগানটা সম্পর্কে কৌতূহল আছে ওর, কৌতূহল ওর ওই লোকটা সম্পর্কে।

লোকটার পরনে একটা রং-জ্বলা খাকি হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি, মোজাবিহীন পায়ে একজোড়া ভারী গাম-বুট, আর মাথায় এ অঞ্চলের পেটেন্ট তালপাতার হ্যাট।

ছেলেবেলায় এ হ্যাট দেখেছে সাগর, মা যখন মেলার সময়-টময় বাপের বাড়ি আসতো, সাগরের জন্যে কিনে নিয়ে যেত। হয়তো—প্রবালের ছেলেবেলাতেও নিয়ে যেত। এখানের মেলার তালপাতার জিনিস বিখ্যাত। ব্যাগ, সাজি পাটি, আর ওই টুপি।

মেলার পর কিছুদিন ধরে গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলের মাথায় ওই হ্যাট দেখতে পাওয়া যাবে।

সাগর এসব শুনেছে মার কাছে।

সাগররা এর আগে কখনো আসেনি মার বাপের বাড়ির দেশে।

সাগরের ঠাকুর্দা নাকি কবে একবার বলে ফেলেছিলেন সাগরের মাকে, 'বাচ্চা-টাচ্চাদের না নিয়ে গেলেই ভাল হয়। পাড়াগাঁ, মশার রাজত্ব, রোগ বাধিয়ে আনবে শেষটা। তোমার বাবার দেশের মশা তো বৌমা শুনেছি আস্ত মানুষটাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠে ফেলতে পারে।'

সেই যে অভিমান হল মার, আর কক্ষনো বাপের বাড়ির দেশে ছেলেদের নিয়ে গেলেন না। তখন বোধ হয় সাগরের দাদা প্রবাল হচ্ছে 'বাচ্চা'। সাগর জন্মায়নি।

তা শুধু ঠাকুর্দাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? সাগরের বাবাই বা কবে এসেছে?

বাবারও নাকি দারুণ ভীতি ছিল পাড়াগাঁ সম্পর্কে। কিছুতেই যেতে চাইতো না। মাকে পাঠিয়ে দিতো এর ওর সঙ্গে। মার বোন এক জ্ঞাতি দাদা থাকতো কলকাতায় মেসে, তারও মেলার সময় বাড়ি যাওয়া চাই-ই চাই। অতএব—

যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় সাগরদের বাড়িতে চলে আসতো ভোলামামা, 'শালাই' আদরে খেতো দেতো, রাত্রে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো, আর ভোরের গাড়িতে মাকে নিয়ে চলে যেতো। ভোরের গাড়িটাই নাকি সুবিধের।

তা গাড়ি যদি ছ'টার, তো ভোলামামা জেগে উঠে বসে আছে রাত তিনটেয়, আর থেকে থেকেই সাড়া তুলছে 'কইরে চিনু, তোর হলো?'

ভোলামামাকে দু চক্ষে দেখতে পারতো না সাগর।

প্রবাল বরং ভোলামামার তাসের ম্যাজিক দেখে মোহিত হতো, ভোলামামার গল্প জমানোয় আকৃষ্ট হতো, সাগর কদাচ না। ওকে দেখলেই সাগরের মনে হতো লোকটা যেন ছদ্মবেশী দৈত্য, সাগরের মাকে ভুলিয়ে হরণ করে নিয়ে যাবার তালেই অমন একটা মজলিশি মানুষ সেজে আসে।

একদিন বলেও ফেলেছিল সেকথা মাকে। মাতো শুনে হেসেই খুন।

আবার সাগরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও ছাড়েনি মা। সেই কথাটি হেসে হেসে বলে দিয়েছিল ভোলামামাকে।

গুঁফো ভোলামামারও গোঁফের ফাঁকে সে কী হাসি। সাগরের ইচ্ছে হয়েছিল ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির বাইরে পার করে দেয় ওকে।

এখন ভাবলে মন কেমন করে।

এখন বুঝতে পারে লোকটা সত্যিই ভালো লোক ছিল।

কয়েক বছর হলো মারা গেছে ভোলামামা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ। মেস থেকে কে একজন এসে খবর দিল বেশী জ্বর, সাগরের বাবা শুনেই চলে গেল। সাগরের মাকে বলে গেল, 'তেমন বুঝলে এখানে নিয়ে চলে আসবো। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

ওমা গিয়ে না কি দেখে সব শেষ।

সেদিনের বাবার কথাটা খুব মনে আছে সাগরের। বাড়ি ফিরে মাকে বললো, 'নিয়ে আসতে আর হলো না ভোলাদাকে।'

মা বললো, 'জ্বর ছেড়ে গেছে বুঝি?'

বাবা বললো, 'হ্যাঁ। চিরদিনের জন্যে।'

মা আচমকা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সেই প্রথম বুকে ধাক্কা লেগেছিল সাগর নামের ছোট্ট ছেলেটার। সাগর যেন একটা অপরাধের ভার অনুভব করছিল।

সাগর তো তা বলে ভোলামামার 'চিরদিনের মত জ্বর ছাড়া' চায়নি। সাগর শুধু ভোলামামার কলকাতা থেকে বদলী হয়ে যাওয়া চাইতো। অনেক—অনেক দূরে কোনো দেশে।

ভোলামামা মারা যাওয়ার পর থেকেই সাগরের মার ফুলঝাটিতে যাওয়া বন্ধই হয়ে গেল। কে নিয়ে যাবে? মার নিজের তো ভাই নেই। দুজন দিদি আছে দূর-দূর দেশে। ওই ফুলঝাটিতে মায়ের শুধু মা ঠাকুমা আর দাদু।

দাদার পৈতের সময় মায়ের ওই ঠাকুমা আর ঠাকুর-দাদাকে দেখেছে সাগর, এসেছিলেন ওঁরা। মায়ের মা আসতে চাননি। বলেছিলেন, 'আমার সাধ-আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে। উৎসবের বাড়িতে আমায় মানায় না।'

তখন সাগর বুঝতে পেরেছিল সাগরের দাদু নেই বলেই এরকম। একজন মরে গেলে আর একজনের সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যায়—এটা বুঝে সাগর খুব দুঃখ পেয়েছিল। সাগর তো জ্ঞানে তার দিদিমাকে দেখেনি।

কিন্তু সাগরের মায়ের দাদু-ঠাকুমা তো এলেন, আমোদ-আহ্লাদও করলেন না, তা নয়। মার দেখাদেখি অমলও ওঁকে ঠাকুমা বলছিলাম বলে ভুল শুধরে দিয়ে বললেন, 'না, না। ঠাকুমা তো তোদের মায়ের। তোরা বলবি ঝিমা'।

শুনে তো আমরা হি হি করে উঠেছি।

'ঝিমা' কী আবার। ঝি তো বাসন মাজে।

মা বললো, 'পাড়াগাঁয়ে ওই রকমই বলে। থাকগে বাবা তোরা 'বুড়ো ঠাকুমা' বল'।

ওঁরা দুজনে দাদাকে সোনার বোতাম আর পাথর বসানো আংটি দিলেন, আমাকেও একটা 'হার্মোনিকা' দিয়ে গেলেন। বললেন, 'তোর ছোটছেলেটাকে তো দেখিই নি চিনি। মুখ-দেখানি দিলাম।'

তখন ভোলামামা ছিলেন, ওঁকে দিয়েই মা ফুলঝাটির সবাইকে আনিয়েছিলেন। ওই দাদু ঠাকুমা বাদেও পিসি জেঠি কাদের সব যেন। ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন ওই ভোলামামাকে দিয়ে। ভোলামামা নাকি বলতেন, 'আমার আবার ছুটি নেওয়া! হুঁঃ! চেয়ারের পিঠে চাদর বেঁধে রেখে চলে এসে, পাঁচ দিন ডুব মারতে পারি। অফিসের বঙ্কিমবাবু সব্বাইয়ের সই নকল করতে পারে। আমার সইটা এমন রপ্ত করে রেখেছে যে দেখে আমিই বুঝতে পারি না। অফিসের হাজরে খাতার সইটা বঙ্কিমবাবুই ম্যানেজ করে ফেলে।'

বিয়ে-থাওয়া করেন নি ভোলামামা, স্ত্রী-পুত্র সংসার কিছুই নেই। তবু এতো ছুটির দরকার কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ভোলামামার পরিচিত জগতে যে যেখানে আছে, তাদের যতরকম 'কাজের দায়' এসে পড়ে, সব দায়ই তো ভোলামামার।

'ভোলাদা না থাকলে আমার এসব কিছুই হতো না—' একথা মা দুঃখ করে এখনো বলে।

আর বলে, 'ভোলাদা গিয়ে অবধি ফুলঝাটির মাঘমেলা দেখা বন্ধ হয়ে গেল আমার।'

বাবাকে শুনিয়েই বলে, তবে বাবা এমন বোকা ছেলে নয় যে, বলে ফেলবে, 'আচ্ছা, এবার না হয় আমিই যাচ্ছি—'

সাগরের এখনো পৈতে-টৈতে হয়নি।

প্রবালের এ-বয়সে কবে হয়ে গেছে। ন' বছরে না এগারো বছরে।

সাগর এবার হায়ার সেকেন্ডারী দিয়েছে, তবু ওর পৈতে নিয়ে কেউ গা করে না।

চেষ্টা করে একটা উপলক্ষ খুঁজে বার করে ঘটাপটা করবার মন আর এখন নেই কারুর। যাঁর বেশী উৎসাহ থাকতে পারতো তিনিই তো পরপারে চলে গেছেন। ঠাকুর্দা।

সাগরের ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে অবশ্য খুব একটা ঘটাপটা হয়ে গিয়েছিল।

কেউ মারা গেলে বিয়েবাড়ির মত ঘটা করতে হয় কেন, এটা ভেবে পায়নি সাগর। সাগরের বড় দুঃখ হয়েছিল। দাদুকে সাগর খুব ভালবাসতো। ওই ঘটার পর অনেক সন্দেশ বেড়েছিল, সাগরের সেজন্যে আরো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দাদু এতো ভালবাসতেন সন্দেশ খেতে। তা' রোজ মাত্র একটি করে খেতেন।

সাগরের মনে হচ্ছিল যদি একটুও উপায় থাকতো, তাহলে বেশী করে চারটি সন্দেশ কাগজে মুড়ে দাদুর কাছে পৌঁছে দিতো।

বোধ হয় ওই ঘটাটা করতে হল বলেই সাগরের বাবা আর ছেলের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না।

মা একবার বলেছিল, 'হায়ার সেকেন্ডারীটা দেবার পরই পৈতেটা দিয়ে দিলে হয় সাগরের। কলেজে ঢুকতে ঢুকতে ন্যাড়া মাথায় চুল গজিয়ে যাবে।'

ওই পর্যন্তই।

তারপরই হঠাৎ এই ফুলঝাটি আসার কথা উঠলো। মা বললো, 'ছেলেরা বড় হয়েছে, ওদের সঙ্গে যেতে পারি না আমি? এখনো কি ওদের মশায় টেনে নিয়ে যাবে?'

প্রবালও তো এখন বসে।

কবে পার্ট-টুর পরীক্ষা হবে, সেই অনিশ্চিতের আশায় হতাশ হয়ে বসে আছে।

'তৈরী পড়াগুলো ভুলেই যাচ্ছি—' বলেছিল প্রবাল, অথচ আর বইগুলো ছুঁতে ইচ্ছে করছে না। ভালই হবে মার বাপের বাড়ির দেশের মশার কামড়ে সব ভুলে যাবো। ফিরে এসে নতুন করে পড়তে এনার্জি পাবো।'

দাদাই সাহস দিল।

সাগরের থেকে চার বছরের বড় দাদা প্রবাল।

ফুলঝাটিতে এসে মা কোথায় ভেসে গেলো। সাগর জানে না। দাদার খবরও প্রায় অজানা। সাগরকেই এই পুরনো বাড়ির দোতলার ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে।

রেলগাড়ি থেকে নামবার সময় সাগরের পা মচকে গেছে।

সাগর সকাল থেকে দুপুর অবধি জানালায় মুখ দিয়ে ওই লোকটাকে দেখে। ওই তালপাতার হ্যাট আর ভারী গামবুট-পরা লোকটাকে।

লোকটা নাকি একদা একজন আই সি এস অফিসার ছিল। মায়ের ওই জ্ঞাতি কাকা।

—ভাবা যায় না।

সত্যিই ভাবা যায় না, একজন আই সি এস ওই রকম হাস্যকর সাজে সেজে মাঠে কাজ করে বেড়াতে পারে। মায়ের মুখে তাঁর এই রকম কথা অনেক শুনেছে সাগর। সুবিধে পেলেই বাপের বাড়ির দিকের লোকের বিষয়ে গল্প করা মার এক বাতিক। ওঁর পিতৃকুলের যে যেখানে আছে, এবং ছিল, সবাইকে মা ওই গল্পের সূত্রেই চিনিয়ে ছেড়েছে।

সাগরের মনে হয় মায়ের কাছে যেন একটা ক্যামেরা আছে, মা সেইটা দিয়ে তার নিজের দিকের যে যেখানে ছিল আর আছে তাদের ফটো তুলে মনের অ্যালবামে সেঁটে রেখেছে।

সুবিধে পেলেই মা সেই অ্যালবামটা খুলে ধরে ছেলেদের দেখাতে বসে। তার মানে নিজেও তাদের সঙ্গে দেখতে বসে যায়।

তার সঙ্গে শুরু করে সেইসব কথা। যা বহুবার বলা হয়ে গেছে।

মায়ের দাদু যে অনায়াসেই দশ মাইল পথ হাঁটতে পারেন, এটা মা রোজ নতুন করে শোনাতে বসে।

প্রবাল তেমন কান পেতে শোনে না।

প্রবাল হেসে হেসে বলে, 'এ গল্প আর কতবার শুনবো মা?'

সাগর মাকে অমন মনঃক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

সাগরের যেন মনে হয়, মায়ের কোনখানে একটা চাপা দুঃখ আছে। তাই সাগর মায়ের কথা গল্প সব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে।

মায়ের ওই আই সি এস কাকার গল্প শুনে শুনে মানুষটা সম্পর্কে মনের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য একখানা ছবি এঁকে রেখেছিল সাগর। বহুবারই তো শুনেছে, 'সেই বিরাট পোস্ট, সেই অত টাকা মাইনে এক কথায় ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'মিথ্যের সঙ্গে আপোস করতে পারবো না।'

ছেলেদের কাছে বাপের বাড়ির লোকের 'বরং গল্প করার সময় সাগরের মা ছেলেদের বয়েস বা বোধশক্তির দিকে তত তাকান না, কথা উঠলেই (নিজেই ওঠয়) উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

ওই আই সি এস বি এন মুখার্জি সম্বন্ধেও সেই ভাবে বলেছে, কাকা তখন বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কড়া নীতি, দুঁদে মানুষ। হঠাৎ ওঁর হাতে এক কেস এলো, মস্ত একটা দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারীর কান্ড। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার নিয়ে জাল জোচ্চুরি। কাকা তার মূল শেকড় টেনে তুলে দেখেন নাটের গুরু এক মন্ত্রীর জামাই।

আর তার সহায়ক হচ্ছেন ওই মন্ত্রী-শ্বশুর!... স্বাধীনতার তখনো খুব বেশী দিন হয়নি, শিশুরাষ্ট্র, শিশুরাষ্ট্র' বলে সাতখুন মাপ চলছে। আর তখনো এখনকার মত পাবলিকের চোখে ধরা পড়েনি। যেই রক্ষক সেই ভক্ষক'। দুর্নীতি দেখে দেখে চোখে ঘাঁটাও পড়ে যায়নি, কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু সোরগোল উঠলো।

কিন্তু ওই মন্ত্রিমশাই নাকি কাকার ওপর অনুরোধের চাপ চাপলেন ব্যাপারটাকে চেপে ফেলতে হবে। মানে সবকিছুতে ধামাচাপা দিয়ে ভুলক্রমে এরকম একটা কেস উঠেছিল এটাই প্রকাশ করতে হবে।

কাকা বললেন, অসম্ভব।'

ওরা বললো, তা বলে তো আর মন্ত্রীর জামাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না? সেটাও অসম্ভব।'

কাকা বললেন, তাহলে যেটা সম্ভব সেটাই করতে হবে।'

ব্যস্‌। অত বড় পোস্ট, অত টাকা মাইনে সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ফুলঝাটিতে। বললেন, চাষবাস করবো।'

এই কথা বলে সাগরের মা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতো, সেই যে তোদের পড়ার বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা আছে? আমিও দন্ড ছাড়িনু এবার, ফিরিয়ে চালিনু গ্রামে আপনার, বিচারশালার খেলাঘরে আর না রহিব অবরুদ্ধ।'. ঠিক সেইরকম না? মনে আছে তো শেষের লাইনগুলো ছাড়ি দিয়া গেল গৌরব পদ, দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ, গ্রামের কুটির চলি গেল ফিরে দীন দরিদ্র বিপ্র।' বিনুকাকার কথা ভাবলেই আমার ওই কবিতাটা মনে পড়ে যায় ... কাকা পেনসন পর্যন্ত নেন না জানিস? অসম্মানে পদত্যাগ বলে সামান্য কিছুও পেনসন দেয়, কারণ ওপরওলারা তো ওঁকে বিব্রত দিতেও দেয় না, উনি পদত্যাগ করেছেন তাও ঠিকমত প্রকাশ করেনি না। বললো, অসুস্থতার জন্যে ছাড়ছেন। কাজেই পেনসন দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কাকা বললেন ছেঁড়া জুতো পা থেকে ফেলে দেবার পর তার সুকতলাটা কুড়িয়ে তুলে নেব কাজে লাগাবে বলে?'

মা আবার উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু সংসারের লোক এই তেজস্বিতার মর্ম বোঝে? বোঝে না। বিনুকাকী স্বামীর এই দুরকম মুখামিতে রেগে আগুন হয়ে কাকার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেলেন দুই ছেলেকে নিয়ে। ছেলেরা অবশ্য তখন ছোট ছোট। কাকীর বাপ একজন বড় পুলিশ অফিসার। দাদাও ওই পুলিশেই ঢুকেছে। বিশ্ব সংসারের যত দুষ্কর্ম দুর্নীতির খবর ওঁদের ডালভাত। কাকী জানেন, এসব সাধারণ ঘটনা। .. ক্ষমতা হাতে পেলেই লোকে নেবে সুযোগ, সে ক্ষমতা করবে প্রয়োগ। এটাই মানুষের স্বধর্ম। এই সব মানুষের সঙ্গেই আপোস করে সমাজে চলতে হবে। কারণ এরাই সমাজের মাথার মণি। তুমি ভাবলে আমি খুব একটা মহৎ ব্যক্তি, লোকে তা বলবে না। বলবে, 'গোঁয়ার মুখ্যু, কান্ডজ্ঞানহীন। তোমার নিজের মহিমা বজায় রাখাটাই শেষ কথা? স্ত্রী-পুত্রের প্রতি একটা কর্তব্য নেই?'...

তা কাকা বললেন, 'আমার স্ত্রী-পুত্র আমার মতই থাকুক। যখন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে মুখার্জি সাহেব হয়ে বেড়িয়েছি, তখন তো স্বামীর সব কিছুর ভাগীদার হয়েছিলে? এখন যদি স্বামীর অবস্থার তারতম্য ঘটে থাকে, সেইভাবেই তো চলা উচিত। স্ত্রী শুধু ঐশ্বর্যেরই ভাগীদার? দৈন্যের নয়? সুখেরই সঙ্গিণী? দুঃখের নয়?' .. তাতে, শুনলে তোরা অবাক হবি, কাকী দস্যু রত্নাকরের গল্প থেকে উদাহরণ তুলে বলেছিলেন, তাই হয়। স্ত্রী পুত্র মা-বাপ কেউই দুর্বুদ্ধির দুর্নীতির ফলের ভাগ নেয় না।'

তা নিলেন না তিনি সে ভাগ।

সেই অবধিই বাপের বাড়িতে।

ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, বড়টা তো মামা আর দাদুর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যেই ওই পুলিশে ঢুকে পড়ে বেশ ভাল চাকরী পেয়ে গেছে। আর কাকীকে পায় কে?'

সাগর অবাক হয়ে বলেছে, 'আর ওঁদের কোনো দিন ভাব হলো না?'

মা হেসে ফেলে বলেছে, 'না। আর কোনো দিন ভাব হলো না।'

সাগর তখন ক্লাশ এইটের ছাত্র।

সাগর মায়ের কোলের কাছে ঘেসে বলেছিল তুমি পারো মা?'

শুনে মা অবাক, কী পারি?'

'ওই রকম হঠাৎ বাবার সঙ্গে 'ভাব' ছেড়ে ফেলে চিরকালের মত অন্য জায়গায় থাকতে?

মা বলেছিল, 'দুর্গা, দুর্গা। ও কী কথার দশা! একথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই বাবা। আমি কেন অমন হতে যাবো?'

কাকা বেশ কয়েকবার বৌ ছেলেকে দেশে আসার কথা বলেছেন, কাকী বলেছেন, 'অ্যাবসার্ড।'

ছেলেরা বলেছে, যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেখানে মানুষ বাস করতে পারে কী করে এ তো আমাদের বুদ্ধির বাইরে। তাছাড়া, 'লেখাপড়া? ইস্কুল কোথায় মানুষের মত?

কাকা বলেছেন, 'ফুলঝাটির ইস্কুলে পড়েই আমি মানুষ হয়েছি।'

কাকী বলেছেন, 'মানুষ? তুমি অবশ্য তাই ভেবে আনন্দে আছো, সবাই ঠিক তা ভাবে না।'

কাকী তো আর সবাই ছাড়া নয়? সাগরের মার কাকী? তাই সবাই যা ভাবে না, তিনিও তা ভাবেন না। সবাই যা ভাবে, তিনিও তাই ভাবেন।

এখন অবিশ্যি ফুলঝাঁটিতে ইলেকট্রি-সিটি এসেছে, কারণ কাছেই কোথায় সব নানা কলকারখানা বসেছে। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে?...না সে আর কী করে হবে? যে নিতে পারবে খরচা করবে, তার বাড়িতে আসবে। তা গ্রামের লোক সবাই কি অতো খরচা করতে পারে? তারা অপেক্ষা করে থাকে কাছাকাছি কোথায় কবে 'পোস্ট' বসবে। তখন দেখা যাবে।

কাকা সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সবই মার 'ভোলাদা'র কাছ থেকে পাওয়া। ওই যে ও'রা একসঙ্গে রেলগাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন, সেই 'সংসার দায় লেশ-শূন্য' সময়টায় নিরবচ্ছিন্ন কথার চাষ চলতো। বেশীর ভাগই অবশ্য ভোলাদা বক্তা, চিনু শ্রোতা।

কখনো কখনো উল্টো।

'ভোলাদা চলে গিয়ে পর্যন্ত ফুল-ঝাঁটির খবরের দরজা আমার বন্ধ হয়ে গেছে—'চিনুর চোখ জলে ভরে আসে।'

সাগর শুনলে ভাবে, সত্যি, ওই ফুলঝাঁটি আর তার লোকেরা মার প্রাণ।'

যাক এতোদিন পরে মা আবার তার প্রাণের জায়গায় এসেছে।

সাগর ভাবে।

আর ভাবে ধ্যেৎতারি, আসবার মুখেই পা মচকালাম। ওই বুড়োর সঙ্গে আলাপ করা হচ্ছে না।

মায়ের কাকা সম্পর্কে এতো মহিমা এ যাবৎ শুনে এসেছিল সাগর যে, মনের মধ্যে তাকে বেশ একখানি হীরো করে রেখেছিল।

এসে যখন ওই মূর্তি দেখলো, সাগর যেন ধসে পড়লো। 'লোকটা' ছাড়া আর তো কিছু মনেই হচ্ছে না। ওকে 'দাদু' বলা যাবে?

অথচ মায়ের কাকাকে না কি দাদুই বলতে হয়।

মায়ের অতি শৈশবে বাবা গেছেন, নিজের কোনো কাকা নেই, ওই কাকার কাছে অনেক স্নেহ আদর পেয়েছেন—ওকে সমীহ না করলে চলবে?

পাটাকে ছড়িয়ে বসে জানলায় মুখ রেখেছে সাগর, এরা কসে চুন হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে। তাই বিছানার চাদরটা বাঁচাতে পায়ের তলায় একখানা খবরের কাগজ খুলে বিছোনো। সেটা হলুদের আর চুনের গুড়োয় বিচ্ছিরী হয়ে আছে। দেখলে অপ্রবৃত্তি আসছে।

সাগরের ভাগ্যেই এমন হলো।

যে কটা গল্পের বই সঙ্গে এনেছিল, এই তিন দিনেই দু-চারবার করে পড়া হয়ে গেছে। মায়ের মা সকালবেলা এসে কালী সিংহীর মহাভারতের একটা খণ্ড দিয়ে গেছেন, বলেছেন, 'দুর্ভিক্ষের সময় লোকে ভাত না জুটলে কচু ঘেঁচু যা পায় তাই দিয়েই পেট ভরায়, সেই ভেবেই পড়। তারপর দেখিস নেশা লেগে যাবে। গল্পের বইয়ের অভাবে উসখুস করছিস, দেখিস এর মধ্যে কত গল্প। এরপর অন্য খণ্ডগুলো চেয়ে চেয়ে পড়বি।'

দিদিমাকে এই প্রথম দেখলো সাগর।

ও'র সম্পর্কে যা ধারণা গড়া ছিল, তার থেকে কিন্তু অনেক ভাল লাগলো। উনি যে এমন আঁট-সাঁট শক্ত পোক্ত তা ভাবতো না সাগর। সাগরের মা ও'র থেকে ন্যাতা ন্যাতা। একটুতে হাঁপায়, একটুতে শুয়ে পড়ে।

দিদিমা খটখটে চৌকস।

চিনু তাঁর ছেলেদের কাছে মায়ের অনেক গুণের কথা বলেছে, রান্না-বান্না, সেলাই-ফোঁড়াই, বড়ি দেওয়া, আচার করা, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি, কিন্তু তিনি যে বইয়ের পোকা, তা কোনো দিন বলে নি। এখন বললো, 'মা তোমার এই বই পড়ার ঝোঁক যে দেখছি, বুড়ো হয়ে না কমে বরং বেড়েছে। বুঝলি সাগর, মার এই বইপড়া বাতিকের জন্যে ঠাকুমার কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে হদ্দ হতো?... তা তোদের মত অত গল্পের বই কোথায় পাবেন? ওই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপ-পুরাণ, আর যতো রাজ্যের হোমিও-প্যাথির বই।

সাগরের দাদু নাকি হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিলেন, এবং ভাল করে শেখবার খুব ঝোঁক ছিল।

সাগরের মা নিজের ছেলের গল্পের বইয়ের অভাবে ছটফটানির কথা তুলেই ওকথা বলেছিল।

দিদিমা বললেন, 'বুড়ো হয়ে কমবে কেন? বাড়াই তো উচিত। ক্রমশই তো চোখের জ্যোতি কমে আসছে যতদিন পারি পড়ে নিই।'

তারপর ওই মহাভারত প্রদান।

সাগর দেখলো বেশ ভাল করে বাঁধানো খণ্ড, পিছনে নাম লেখা 'শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।'

দিদিমার নাম যে মৃন্ময়ী দেবী, তা এই যেন প্রথম জানলো সাগর। আগে যদি শুনেও থাকে মনে নেই।

তবে মৃন্ময়ী দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে বলে মনে হচ্ছে না, কী জটিল ভাষারে বাবা! আর কে কার ছেলে, কে কার বাপ, বুঝতেই মাথা ঝিমঝিম করে। শুয়ে শুয়ে পড়ার পক্ষে ভারীও আছে।

তার থেকে মন্দের ভালো জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা।

সাগরের দিদিদের জমির অংশের লাগোয়াই হচ্ছে ওই লোকটার জমি। মা যাকে বলতে বলেছে 'সাহেব দাদু'। এখানের সব নাতি-নাতনী সম্পর্কিত ছেলেমেয়েরা নাকি ও'কে সাহেব দাদুই বলে।

তার কারণ বোধ হয় ওই তালপাতার হ্যাট।

অথবা প্রাক্তন জীবনে উনি যখন এই ফুলঝাঁটিতে আসতেন, তখন ও'র ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি পোশাক আসাক চলন-বলন এবং ও'র স্ত্রী-পুত্রের জ্বলজ্বলাটি ভাবই এই নামের জনক।

বিনুবাবী নাকি তখন এক দু-দিনের জন্যে আসতেন, সঙ্গে ঝি-চাকর আর্দালি ইত্যাদি নিয়ে। সমারোহ দেখিয়ে চলে যেতেন।

ও'র লোকজন ও'কে 'মেমসাহেব' বলতো, সেই থেকেই হয়তো ওই নাম-করণ। মোটকথা একদার বি এন, মুখার্জি এখন ছেলেমহলে 'সাহেবদাদু' নামেই পরিচিত।

পাটাকে একটু ছুঁড়লো সাগর।
অসহ্য এই আটকে থাকা।
ছুঁড়ে নিজেরই লাগলো।
বলে উঠলো, 'উঃ।'

আর হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো 'টু।'

মেয়ে-গলা।

সাগর চমকে তাকালো।

সেই মেয়েটা। যে সাগরদের আসার দিনই 'অভ্যর্থনা সমিতির' চেয়ারম্যান হয়ে হৈ-চৈ করে মরছিল। কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে কিনা, 'ও চিনুপিসি, তোমার ছেলে কার বাড়িতে হাঁড়ি খেতে গিয়েছিল?'

হাড় জ্বলে গিয়েছিল সাগরের।

অন্য লোকের বাড়ির লোককে যে 'আপনি' করে বলতে হয়, এটুকু জ্ঞানও নেই। আর জীবনে যাকে দেখিস নি, তার ব্যাপারে এইভাবে কথা বলা!

তা সেই যা দেখেছিল সেদিন, তারপর আর দেখেনি সাগর মেয়েটাকে, ভেবেছিল, বাঁচা গেছে। বোধ হয় অন্য কোথাও থেকে আসা মেয়ে। চলে গেছে নিজের জায়গায়।

আবার এলো হাড় জ্বালাতে।

সাগর শক্ত হয়ে বসে মহাভারতখানা পাশ থেকে তুলে নিয়ে খুলে ধরলো।

ব্যস!

ওর মতো মেয়ের পক্ষে যেমন আচরণ সম্ভব, তাই করলো মেয়েটা, হি হি করে হেসে গড়াতে গড়াতে এসে ধুপ করে খাটের উপর বসে পড়লো।

সাগর তো আর কথা কইতে যাবে না, কাজেই বিরক্তি প্রকাশও চলে না। সাগর মন দিয়ে 'বৈশম্পায়ন' কী কহিলেন তাই দেখতে লাগলো।

মেয়েটা বলে উঠলো, 'আহা! কী কষ্ট নিয়েই বসেছেন। যেন পাকাবুড়ো। এইটুকু বয়সে আবার ওই বুড়ো মহা-ভারত পড়া কেন রে? পড়বি তো ছোটদের মহাভারত পড়—'

সাগর কি এরপরও চুপ করে থাকতে পারবে?

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, 'তুমি আমায় 'তুই তুই' করছো মানে?'

মেয়েটা কিছু না দমে হেসে হেসে বলে, 'মানে হচ্ছে আমি তোর দিদি। সাল তারিখের হিসেব করে প্রমাণ হয়ে গেছে তুই আমার থেকে আট মাসের ছোট! অতএব তুই আমায় দিদি বলবি। 'লতুদি'। বুঝলি? আমার নাম হচ্ছে শ্রীমতী লতিকা সরকার।'

'তোমার নাম জানতে আমার দর-কার নেই।' সাগর জবাব মহাভারতের পাতায় মনোনিবেশ করে।

লতিকা বলে ওঠে, 'কলিকালে কারুর ভাল করতে নেই। ভাবলাম আহা ছেলেটা পা মচকে একা পড়ে আছে, যাই একটু গল্প-সল্প করিগে। তা এমন ভাব করছিস, যেন শত্রু এসেছি। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বাবা আপনজনকে 'তুই তুমি'ই বলি, অত আপনি আজ্ঞে করি না। যাক এবার থেকে 'আপনি' করেই বলবো। ..এই একটা ডাঁসা পেয়ারা এনেছিলাম, খাবেন তো খান। আর যদি ইচ্ছে না হয় জানলা দিয়ে ফেলে দিন।'

বলে খাট থেকে নেমে পড়ে।

দুখানা পাতা সমেত নীটোল পুষ্ট একটি পেয়ারা। সদ্য গাছ ভাঙা। দেখে লোভ সামলানো শক্ত।

সাগরের হঠাৎ মনে হয়, ওই লতিকার মুখটা যেন এই পেয়ারাটার মত। নীটোল চকচকে আর তাজা।

চলে যাচ্ছে দেখে একটু লজ্জা হলো।

ব্যবহারটা ভালো হয়নি।

সত্যি গ্রামের লোকেরা তো গাইয়া হবেই।

ইতস্ততঃ করে বললো সাগর, 'চলে যেতে কে বলেছে?'

'থাকতেও কেউ বলেনি।'

'বলার কি আছে? তুমি তো বসতেই এসেছিলে—'

লতিকা বলে, 'এসেছিলাম, কিন্তু আপনি তো শত্রুর মত দেখলেন।'

'আঃ। আপনি কী আবার?'

'তা কী করবো? আমি বাবা হয় 'তুই' বলবো, নয় 'আপনি'। মাঝামাঝির মধ্যে নেই।'

'ঠিক আছে তুই-ই বল বাবা।'

'বাচলাম। ইচ্ছে করলে তুইও আমায় তুই বলতে পারিস। আমি তো আমার দিদিকে তুই বলি।'

'সে তো আমিও আমার দাদাকে বলি।'

'তবে?'

লতিকা বলে ওঠে, 'তবে তো ল্যাঠা মিটেই গেল। খা পেয়ারাটা।'

'তোমার কই?'

'এই আবার তুমি?'

সাগর অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বলবো পরে। এতো তাড়াতাড়ি—'

'আচ্ছা দুদিন সময় দিলাম। কিন্তু খবরদার নাম ধরবি না। লতুদি বলবি। আমার কী পেয়ারার অভাব? এই দেখ কত রয়েছে।

আঁচলের তলা থেকে চার চারটে ডাল ভাল পেয়ারা বার করলো।

বললো, 'ওই একটা দেখেই চিনুপিসি বললো, 'অতবড় পেয়ারাটা আস্ত খেলে সাগরের পেটব্যথা করবে, দে কেটে দিই।' আমি দিলাম না। পাতাশুদ্ধু কী সুন্দর দেখতে।..দুটো তোর দাদাকে দেব। অবশ্য আমারও দাদা। কোথায় রে সে?'

সাগর মাথা নাড়লো, 'আমি কি জানি?'

'তবে তোর কাছে রেখে দে। এলে দিস। চিনু পিসিকে দিলে ঠিক কেটে টুকরো করবে। পেয়ারা কেটে খেলে স্বাদ থাকে? ছিঃ।'

সাগর জিনিসটার স্বাদ পেতে পেতে বলে, 'তা সত্যি।'

লতুও একটা হাতে নিয়ে দাঁত বসাতে বসাতে বসে, 'তোর দাদা, মানে প্রবালদা কী পড়ে রে?'

'এই তো পার্ট-টু দেবে। কবেই দেওয়া হতো, গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে পড়তো। পরীক্ষা পিছিয়ে পিছিয়ে এতো দিন যাচ্ছে।'

দাদাকেও যেন নেহাৎ হেলা ফেলা করে কথা না বলে মেয়েটা, তাই সাগর এতো গুছিয়ে কথা বলে দাদার সম্পর্কে।

লতু পেয়ারা চিবোতে চিবোতে ঘরের এদিক ওদিক দেখে বলে, 'এই ঘরেই বুঝি তোরা থাকিস?'

'আমি মা আর দিদিমা।'

'আর প্রবালদা?'

'পাশের ঘরে। অনেক তো ঘর আছে। বুড়ো ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না বলে নীচতলায় থাকেন।'

লতু একটা পেয়ারা শেষ করে আর একটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'কর্তাদাদু কিন্তু খুব শক্ত আছেন, এই তো আশী বছর পার হয়ে গেছে, রথযাত্রা দেখতে পুরী গেছেন।'

খবরটা সাগরের জানা।

সাগরের মা আঙুলে গুনে গুনে দেখছেন কবে ফিরবেন তিনি।

লতু আবার বলে ওঠে, 'সাহেব দাদুকে দেখলি?'

'সব সময়ই তো দেখছি।'

সাগর বাইরের দিকে তাকায়।

লতু হঠাৎ ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বলে, তুই একটা বুদ্ধু। ওই দেখার কথা বলেছি? . আলাপ করার কথা হচ্ছে।'

সাগর উদাসভাবে বলে, 'আমি আর কী করে আলাপ করতে যাবো?'

'হ্যাঁ তাও তো বটে।' লতু আবার হি হি করে হাসে তুই তো ঠ্যাং ভেঙে বসে আছিস! তা দাদু আসেন নি তোদের দেখতে?'

'শুনলাম এসেছিলেন কাল। নীচেরতলায় বসে কথা-টথা বলে চলে গেছেন।'

উত্তর না দিয়ে উপায় নেই, তাই দেওয়া।

নইলে আবার 'হি হি' শব্দ ঠ্যাং ভাঙা শুনে সাগরের মেজাজ তো গরম হয়ে উঠেছে।

'ওমা! তুই এখানে পড়ে আছিস, বুড়ো তোকে একবার দেখেও গেল না?' লতু গিন্নীদের মত গালে হাত দিয়ে বলে, 'বুড়ো এক আজব জীব। শুনেছিস কিছু ওর বিষয়ে?'

সাগর গম্ভীরভাবে বাইরে চোখ ফেলে রেখেই বলে, 'সবই শুনেছি।'

'তা তো শুনবিই। চিনুমাসি তো বলবেই। বোঝ কী রকম অদ্ভুত মানুষ। কোথায় রাজার মত থাকবার কথা, তা নয়, ওই দীনদুঃখী চাষীর মতন! পরের হাততোলায় খাওয়া দাওয়া!'

সাগর 'হাততোলা' শব্দটার মানে জানে না। তাই বলে, 'কিসের খাওয়া-দাওয়া?'

'আহা বুঝতে পারলি না? সাহেব দাদুর নিজের বাড়িতে তো আর রান্না-টান্নার ব্যবস্থা নেই? কে করবে? বাড়িতে না আছে কোনো মেয়েমানুষ না আছে রাঁধুনী-চাকর। . কে করবে ব্যবস্থা? পটাই দিদা যাই রেঁধে বেড়ে দু বেলা খাইয়ে যায় তাই—

মেয়েটা তো কথাও বলতে পারে!'

মনে ভাবে সাগর।

পটাই দিদা! আবার কেমন নাম?

সে আবার কে।

তাছাড়া—ওই সাহেব দাদুর জন্যে কে রান্না করে দেয়, তা জেনে সাগরের লাভ?

সাগর কথা বলে না।

লতু দ্বিতীয় পেয়ারাটা শেষ করে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'তুই দেখেছিস পটাই দিদাকে?'

'নামও শুনি নি।'

'ওমা! আসল লোকেরই নাম শুনিস নি?' লতু একটু হাসে।

'আসল লোক মানে? কে হন উনি?'

'কে হন? মানে চিনুপিসির এক-রকম পিসি আর কি। লতু হঠাৎ মুখটাকে দিব্য শান্ত করে নিলো, কেন কে জানে। বললো, 'সাহেব দাদুরও সেইরকম হলেন। খুব মজার মানুষ! সব সময় হাসছেন, কথায় কথায় ছড়া আওড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে আবার গানও গান। কেত্তনের গান। পাড়ার সব্বাইয়ের উপকার করে বেড়ান।'

সাগরের এসব কথা মোটেই ভাল লাগছিল না, কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তার কথা শুনে কী হবে সাগরের।

লতু ঘরের মধ্যে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল, আর বসেনি।

এখন বলে উঠলো, 'গল্প করতে তোর ভাল লাগছে না বুঝতে পারছি। চললাম। কলকাতা থেকে এসেছিস বলেই আহ্লাদ হলো। কলকাতার লোক দেখতে খুব ভাল লাগে রে—'

সাগরের মনটা মায়া মায়া হয়।

সত্যি তার ব্যবহারটা ভাল হচ্ছে না।

বলে উঠলো, 'আমি তো বলিনি ভাল লাগছে না।'

'তুই বলিস নি, তোর চোখ-মুখ বলছে। আচ্ছা চললাম। পেয়ারা দুটো প্রবালদাকে দিস।'

আর সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে যায় সাগরের।

আশ্চর্য! এতোক্ষণ তো কেবলই মনে হচ্ছিল কখন যাবে ও। কথা বলে বলে মাথা ধরিয়ে দিল। কিন্তু চলে যাবার সময়টা এমনভাবে চলে গেল!

মায়া মায়া লাগছে।

আহা সত্যি, গ্রামে পড়ে থেকে, কলকাতার লোক দেখলে ভাল লাগে।

তা আগে বলবি তো একথা। তাহলে সাগর একটু ভদ্র ব্যবহার করতো।

সাগরের ধারণা ছিল গ্রামের মেয়েরা খুব শান্তশিষ্ট সভ্য সংযত হয়; তাই সাগরের লতুকে দেখে বাচাল মনে হচ্ছিল। এখন মনে হল কী আর বাচালতা করেছে? বেশী কথা কইতে ভালবাসে তাই।

সাগর মনে মনে ঠিক করে ফেললো, এরপর দেখা হলে একটু ভদ্র ব্যবহার করবে। গল্পে উৎসাহ দেখাবে।

কিন্তু কি হয় ও এদের?

আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কী?

সম্পর্ক যে কিছুই নেই, থাকতে পারে না, সেটা বোঝবার ক্ষমতা সাগরের থাকবার কথা নয়। সাগরের বয়সী কোনো মেয়ে ঠিকই বুঝতে পারতো। লতুর পদবী শুনেই বুঝতে পারতো। মুখুজ্যে চাটুজ্যেদের সঙ্গে সরকারদের যে সম্পর্কের যোগসূত্র থাকে না সেকথা মেয়েরা জানে।

এটাও একটা আশ্চর্য!

একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটো ছেলে আর মেয়ের মধ্যে 'সংসারজ্ঞানের' পার্থক্য থাকে আকাশ পাতাল। মেয়েরা যে কোন ফাঁকে সব কিছু বুঝে ফেলে, জেনে ফেলে, শিখে ফেলে! ছেলেগুলোর ওই 'বোধের' জগতের দরজাটি স্রেফ বন্ধ।

বিশেষ করে এই একটা বয়েস পর্যন্ত। ছেলেগুলো যেন এইমাত্র পৃথিবীতে পড়লো, যা শোনে তাতেই অবাক হয়। আর মেয়েগুলো যেন কিছুতেই অবাক হতে জানে না, সব জেনে-বুঝে ওস্তাদ হয়ে বসে আছে।

যে পরিস্থিতিতে মেয়েগুলো ধুরন্ধর, সেই পরিস্থিতিতে ছেলেগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাগরের ভেবে অবাক লাগলো লতু সাগরের থেকে মোটে আট মাসের বড়। ওর মুখ-চোখ কথাবার্তা ভাবভঙ্গী সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন সাগরের মা দিদিমাদেরই দলের একজন।

লতু একটা আস্ত বড়-মেয়ে। সাগর স্রেফ একটা 'ছেলে' মাত্র।

সাগরের এখন লতুর ওপর খুব রাগ এলো। যেন লতুই সাগরকে 'ছোট' করে রেখে ডিঙিয়ে বড় হয়ে গেছে।

তখন সাগর শক্ত হলো।

দিদি বলবে না হাতী করবে।

লতুদি।

দায় পড়েছে বলতে।

লতু! স্রেফ লতু। আর হ্যাঁ ওই, 'তুই'ই ঠিক। ও যদি অমন অনায়াসে সাগরকে 'তুই' বলতে পারে, সাগরই বা নয় কেন?

দাদা এসে ঘামে ভেজা জামাটা খুলে খাটের বাজুতে বিছিয়ে ফিরলে, সাগর পেয়ারা দুটো বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এই নে।'

প্রবাল তাকিয়ে দেখে হো হো করে হেসে বলে উঠলো, 'তুই আমায় দিতে এসেছিস? এই নে কটা খাবি।'

প্রবাল তার প্যান্টের দু পকেট থেকে তেমনি তাজা ডাঁশা পেয়ারা বার করে সাগরের বিছানার ধারে রাখে।

এখন সাগরের নজরে পড়ে, দাদার পকেট দুটো টিপি হয়ে রয়েছে।

সাগর হাসি হাসি মুখে বললো, 'কোথায় পেলি?'

'কোথায় না পাবো? চারিদিকেই তো পেয়ারা গাছ। আর গাদা গাদা ফলে রয়েছে।'

'কী অদ্ভুত! কেউ নেয় না?'

'কত নেবে? এখানের ছেলেমেয়েদের কাছে তো আর এটা নতুন নয়। অরুচি ধরে গেছে। তোরই পায়ের জন্যে মুস্কিল হয়ে গেছে।'

ছেলেরা কখনো 'মন কেমন' প্রকাশ করে 'আহা' বলে না, এইটুকুই যথেষ্ট। সাগরের মনের মধ্যে সুখ দুঃখের একটা আলোড়ন ওঠে।

দাদা জামা গেঞ্জি খুলে রেখে আর একটা গেঞ্জি খুঁজছিল আলনা টাটকে। এই ঘরে মা, এই ঘরেই আলনা বাকস। সাগর বললো, 'লতিকা সরকার তোর জন্যে এই দুটো রেখে গেছে। ওদের গাছের।'

'লতিকা সরকার।'

প্রবাল বললো, 'তিনি আবার কে?'

'সেই যে সেই মেয়েটা। আমাদের আসার দিন তুই যার হৈ-চৈ দেখে বললি, 'ইনিই বুঝি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান?'

'ও! সেই মেয়েটা? মা যাকে লতু লতু করছিল? তিনি আবার লতিকা সরকার হলেন কখন?'

'আমায় তো বললো, ওই নাম ওর।'

দাদা বললো 'মেয়েটা ভারী বক্তার। সেদিন এতো বকবক করছিল! তোকে জ্বালাতে এসেছিল বুঝি?'

সাগর হেসে ফেলে বললো, 'ঠিক ধরেছিস।'

লতিকা প্রসঙ্গে যবনিকা পাত করে প্রবাল বললো 'ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আজ খুব কথা হলো। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এতো আইডিয়া আছে ওঁর মাথায়!

'কে, ওই সাহেব দাদু?'

'হুঁ! সবাই তাই বলে শুনলাম। উনি অবশ্য খুব হেসে হেসে বললেন, সাহেবের কোন চিহ্নটা দেখলে আমার মধ্যে? এই তালপাতার টুপিটা? না ছেঁড়া বুটজোড়াটি?...ভদ্রলোকের কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে।'

'আই সি এস অফিসার ছিলেন তো?'

'সে তো ছিলেন। তাছাড়াও অনেক কিছু নিজে স্টাডি করেছেন উনি। শুনলে অবাক হবি উনি মৌমাছি পালন শিখে মৌচাক বানিয়ে একবার নাকি দু সের মধু তৈরী করেছিলেন?

সাগরের মনে হলো, দাদা ওঁকে দেখে বেশ মোহিত হয়ে গেছে।

আঃ সাগরের পাটা যে কবে সারবে।

খড়াচুড়ো ছেড়ে ঘসে ঘসে তেল মাখছিলেন ইনি এন মুখার্জি, এরপর গিয়ে পুকুরে পড়বেন।

হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলেন মুখার্জি।

'আরে চিনু, আয় আয়। এইটিই বুঝি তোর ছোটছেলে? পা সেরেছে?'

চিনু একগাল হেসে বললো, হ্যাঁ। সেই দিন থেকে ছটফট করছি তোমার কাছে একবার নিয়ে আসবো—'

আর ওই 'তুমি' কথাটাও সাগরের কানে খট করে বাজলো। সাগররা তো কাকা জ্যাঠা মেসোমশাই পিসেমশাই সবাইকেই আপনি বলে। তার মানে এই ফুলঝাটিতে 'সবাই সবাইয়ের খুব 'আপনজন'।

সাগর ছেলেবেলা থেকেই জানে, বড়দের নতুন দেখলেই প্রণাম করতে হয়। মায়ের নির্দেশে করেওছে। কিন্তু হঠাৎ যেন ওই ব্যাপারটায় দারুণ লজ্জা পাচ্ছে। গুরুজন দেখলাম, আর টিপ করে মাথা হেঁট করলাম, এটা যেন নেহাৎ ছেলেমানুষী।

অথচ না করলেও অস্বস্তি লাগে।

করি কি না করি এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা নিয়ে বেশীর ভাগ সময় খাড়া দাঁড়িয়েই থেকে যায়।

হঠাৎ লম্বা হয়ে গিয়েই কি এমন অবস্থা হয়েছে? না কি সাগরের বয়সের সব ছেলেরই এই দশা ঘটে?

এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়বার ভয়েই সাগর লম্বা হয়ে পর্যন্ত সাধ্যপক্ষে বাড়িতে কেউ এলে তার দিকে যেতে চায় না। আর গেলে তো, মা হয় প্রণাম করতে ইসারা করবেন, নয়তো খোলা গলায় বলে উঠবেন, 'ও কী রে ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? প্রণাম কর?

এতো রাগ হয় তখন।

আজ আর সাগর ওই সব বলাবলির মধ্যে যাবে না ঠিক করেই এগিয়ে গিয়ে প্যান্টের কোমরটা টেনে টাইট করে হেঁট হতে গেল, আর আজই কিনা মা বলে উঠলো, 'এই এই, তেল মাখছেন, এখন প্রণাম করতে নেই'।

যা বাবা!

উনি বললেন, 'তেল মাখার সময় প্রণাম করলে কী হয় রে?'

মা বললো 'পরমায়ু ক্ষয় হয়।'

শুনে ওনার কী হাসি।

হা হা করে একেবারে।

এই লোককে ওঁর স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করেছে। ভেবে ভারী আশ্চর্য লাগলো সাগরের।

'আমি হচ্ছি তোমাদের সাহেব দাদু বুঝলে? কী রকম লাগছে? ঠিক সাহেবের মতন?'

আবার হাসি।

তারপর নানান জিজ্ঞাসাবাদ।

কী পড়? কী নিয়ে পড়ছো? পাশ করে বেরিয়ে—কী পড়ার ইচ্ছে? এই সব।

আজ শারদপ্রাতে...
নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলা।
চারিদিকে আনন্দের গুঞ্জন মুখরিত
এই শরতে
বোরোলীন
নির্মল ও নিরাময় করবে আপনার ত্বক।
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক-বিবর্ণ ত্বক
রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।
BOROLINE
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা-৭০০০০৩

মা বললো, 'পাশ করবেই আগে।'

সাহেব দাদু ধমকে উঠে বললেন, 'তুই থামতো। ভদ্রলোকের ছেলে, পাশ করবে না কি? কেন তোর বড়ছেলেটাকে তো খুব ইন্টালিজেন্ট দেখলাম।'

মা অমনি বলে বসলো, 'বড়টির মত এ নয়। একটু ভাবুক ভাবুক।'

আঃ! এতো বাজে লাগে এই রকম কথা।

নিজের সম্পর্কে কোনো কথা উত্থাপিত হওয়াই পছন্দ করে না সাগর। তবে উনি এতে একটি বেশ ভাল কথা বললেন। বললেন, 'তাই না কি? তাহলে বিকেলের দিকে আমার কাছে চলে আসবে বুঝলে? আমি তোমায় এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো। ভাবনার খোরাক পাবে।'

ওরা যখন চলে আসবে তখন টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ক্লাসে এক মহিলা প্রবেশ করলেন।

ছিপছিপে গড়ন ধবধবে রং, আর টকটকে মুখ এই বিধবা মহিলাটিকে এর আগে দেখেনি সাগর।

ইনিই বোধহয় তিনি।

লতুটা যার কথা বলছিল।

কী যেন দিদা।

কী সেটা মনে পড়ছিল না, মার বলে ওঠায় মনে পড়ে গেল।

মা বললো, 'আরে! পটাই 'পিসি'! যাক তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।'

সাহেব দাদু বলে উঠলেন, 'এই ভয়ই করছিলাম।'

'কী ভয় শুনি?'

পটাইয়ের মুখটা কৌতুকে ঝলসে উঠলো।

'এই যে! পটেশ্বরী দেবী কৌটো হাতে ঝুলিয়ে হাজির হলেন বলে! আমার এদিকে চান হয়নি।'

পটাইয়ের বাক্সংস্করণ 'পটেশ্বরী' তা বোঝা গেল।

পটেশ্বরী অথবা 'পটাই' হাতের কৌটো নামিয়ে ওদিকে কোথায় যেন গিয়ে হাত ধুয়ে এসে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, কবে আবার আমি এসে দেখি বিনুদা তোমার চান হয়ে গেছে?'

'আহা অত অপবাদ দিসনি, কতো-দিন—'

'বাজে কথা বিশ্বাস করিসনি চিনু! রোজ এই বেলা দেড়টা দুটোয় চান। তারপর খাওয়া। বেলা বারোটায় ভাত চড়িয়েও সে ভাত ঠান্ডা! এতে শরীর টেঁকে?'

বিনুদা প্রায় যুবকদের মত গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে নিজের দু বাহুতে থাবড়া মেরে বললেন, 'কেন? দেখে কি না টেঁকার মত লাগছে? কী রে চিনু?'

চিনু বললো, 'থাক আর মঙ্গলবারের ভরদুপুরে নিজেকে খুঁড়তে হবে না।'

'এই দ্যাখ পটাই চিনু তোর মতন কথা বলছে।'

আবার সেই হাসি।

পটেশ্বরী ফর্সা থানের আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলেন, 'বলি কি আর সাধে? জানো না—কথায় আছে কোরো না ভাই কিছু নিয়ে জারিজুরি—'

নারায়ণের আসল নাম দর্পহারী।'

'এই হলো আরম্ভ তোর তত্ত্বকথা।'

চিনু বলে, 'যাও যাও তুমি নাইতে যাও। আমি বরং ততক্ষণ পটাই পিসির সঙ্গে গল্প করি।'

'কর!' বিনুদা বলেন, 'আজ যখন ওর ভাগ্যে তুই রয়েছিস। নইলে রোজই তো ভাত নিয়ে এসে বসে বসে ঢোলে। আমি তো ওকে দেখে তবে ভয়ে ভয়ে নাইতে ছুটি।'

'আহা! আমার ভয়ে তো পিঁপড়ের গর্তয় ঢোকো তুমি।' পটেশ্বরী মুখে একটি আহ্লাদের ভঙ্গী করে বলেন, শুনিস কেন চিনু বিনুদার কথা। দুবেলা দুটো খেয়ে আমার উদ্ধার করেন এই পর্যন্ত। অনিয়মের চূড়ান্ত করেন।'

সাহেব দাদু হাসতে হাসতে চান করতে চলে যান। দুই মহিলা গল্পে মসগুল হয়ে যান।

সাগরের হঠাৎ যেন নিজেকে অবাস্তব মনে হয়। চলে যেতে ইচ্ছে করে। ওই পটেশ্বরীটি তো তাকিয়েও দেখলেন না, এখানে আর একটা মানুষ আছে।

'আমি যাই।'

বললো সাগর।

মা বললো, 'ওমা তুই আবার এই রোদে একা যাবি কেন? আমি তো এই যাচ্ছি।'

'তুমি গেলে রোদ কমবে?'

'তা না হয় না হলো? তোর কি এখানে কাঁটা ফুটছে?'

এতক্ষণে পটাই একটি কথা বললেন সাগর সম্বন্ধে। হেসে বললেন, 'তা ফুটছে বাপু। এই বয়সের ছেলেকে মেয়েলি গল্পের মধ্যে বসে থাকতে হলে কাঁটাই ফোটে। ওর পা সেরেছে?'

সাগরের আবার রাগ ধরে গেল।

তার পা মচকানোর খবরটা কি দেশ-সুদ্ধ লোককে জানানো হয়েছে! সেরেছে সেটার প্রমাণ দেখাতে সাগর 'আমি যাচ্ছি—' বলে হনহন করে বেরিয়ে পড়লো।

গাঁটের কাছে খচখচ করছে। করুক।

সাগর জানতো না লতিকাদের বাড়িটা কোন দিকে, সাগর তার দাদুর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল পাশ থেকে লতিকার গলা শোনা গেল। ওমা তুই এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিস?'

তাকিয়ে দেখে একটা একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপরকার ঘরের জানলায় লতুর মুখ।

আবার এই এক ঝামেলা।

সাগর বললো, 'বাড়ি যাচ্ছি।'

'গিছলি কোথায়?'

'সাহেব দাদুর ওখানে—'

সাগর চলতে শুরু করে। রোদ সত্যিই বেশী।

চলতে চলতেই সাগর টের পায় লতিকা সরকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে তার পিছু নিয়েছে। কী ছিনে জোঁক মেয়ে বাবা!

'এই অতো জোরে হাঁটছিস কেন?'

লতিকা ওকে ধরে ফেলতে না পেরে ডাক দেয়, 'দেখছিস আমি এলাম।'

সাগর ঠিক করেছিল সেও ওকে তুই বলবে, কিন্তু চট করে পেরে উঠল না। আলতোভাবে বললো, 'কে বলেছে আসতে?'

'বাবা বাবা, তুই যে কী অভদ্র! ভাবতাম কলকাতার ছেলেরা খুব ভদ্র সভ্য হয়। তুই বাবা যেন কাঠখোট্টা।'

সাগর এরকম কথা পছন্দ করে না, তবু বলবেই লতুটা। এই তো কাল গিয়ে সাগরের দিদিমার সঙ্গে এক ঘন্টা ধরে বক বক করলো, তার বেশীর ভাগই সাগরের আর প্রবালের নামে ব্যাখ্যানা।

'বুঝলেন চাটুয্যে দিদা, আপনার এই নাতি দুটি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না।'

এই একজনকেই 'আপনি' বলতে শোনে সাগর লতুর মুখ থেকে।

দিদিমার বিশেষ একটি ব্যক্তিত্ব আছে।

দিদিমার সামনে সকলেই যেন সমীহ করে কথা বলে।

দিদিমার থেকে বয়স্ক লোকেরাও।

এমন কি স্বয়ং শাশুড়ী, যিনি না কি একদা মৃন্ময়ী দেবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, তিনিও যা বলেন, আড়ালে বলেন।

ঘরের মধ্যে গজগজ করতে থাকেন, আর যদি মৃন্ময়ী দেবী হঠাৎ জিগ্যেস করেন, 'মা কিছু বলছেন?'

উনি চট করে বলে ওঠেন, 'না বাছা তোমায় কিছু বলিনি। বলছি আপনার কপালকে। ভগবান যার এক সন্তানকে কেড়ে নেন, তার আর—'

'সে তো অনেকদিনের কথা মা। ভগবান এতোদিনে ভুলেও গেছেন।'

ভুলে গেছেন!

শাশুড়ী রেগে রেগে চাপা গলায় গর্জন করেন। 'সব তাতেই আমার সঙ্গে টক্কর।'

তবু সামনে কিছু বলতে পারেন না।

মৃন্ময়ীর যে অবসর সময়টা বাড়ি দিতে আচার-আমসত্ত্ব বানাতে নিদেন চালের কাঁকর বাছতে ইচ্ছে না করে বই পড়তে ইচ্ছে করে, এতে তিনি ক্রুদ্ধ, কোপটা নিজের মধ্যে সংহত রাখতে হয় বলে, আরো ক্রুদ্ধ।

শ্বশুরও বৌমাকে সমীহ করে চলেন, বলেন।

ওই যে সাগরের মার আর এক কাকা, ছোটকাকা। যদিও জ্ঞাতি কাকাই, তিনিই তো এ সংসারের সব কিছু দেখাশুনো করেন। বাড়ির হাল ধরবার তো কেউ নেই বাড়িতে।

দুটো বুড়োবুড়ি, আর একজন ওই আধবুড়ি. এই তো সংসার। অভিভাবক বলতে ওই ছোটকাকা। কিন্তু কী নম্র, কী শান্ত। দিদিমার সঙ্গে যখন কথা বলেন মনে হয় যেন 'গুরুকে' বলছেন।

অথচ বয়সে উনিই বড় সাগরের দিদিমা ওই মন্মথীদেবীর থেকে।

ওই ছোটকাকা, যাঁর নাম 'অবনেন্দ্র' তিনির ওই ধরনটি দেখেছে সাগর।

দাওয়ার ধার থেকেই হয়তো জিগ্যেস করেন, 'ধান কি এখন আর ভানাতে হবে সেজবৌদি?' নয়তো বলেন, 'আমওলা আম দিয়ে গিয়েছিল?'

এ'দের নাকি আমবাগান আছে, সে বাগান জমা দেওয়া হয় কিন্তু তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট থাকে কিছু কিছু আম তারা বাড়িতে দিয়ে যাবে খাবার জন্যে।

দিদিমা দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ান। বলেন, 'দিয়ে গেছে। গোটা কতক। তাও ছোট ছোট। নাতিরা এসেছে।'

বলেন, 'না না চাল এখন যথেষ্ট আছে।'

উনি বাজার করে এনে দেন।

মাছ এনে খুঁৎ খুঁৎ করেন, 'নাতিরা এসেছে, তেমন মাছ আনতে পাচ্ছি না। প্রায়ই চারা মাছ।

দিদিমা বলেন, 'নাতিরা তো বড্ডই মাছ খাইয়ে! পাতে পাড়তে চায় না। যা খায় চিনু।'

'তাহলে ওদের জন্যে রোজই একটু মাংস জোগাড় করতে হয়—'

দিদিমা বলেন, 'রোজ আর কোথায় পাচ্ছো? এনো মাঝে মাঝে—

এই রকম সংক্ষিপ্ত কাটছাঁট কথা দিদিমার ওই ওঁর ঠাকুরপোর সঙ্গে। রীতিমত দূরত্ব রেখে। এবং প্রয়োজনের বাইরে একটিও নয়।

দিদিমার ব্যক্তিত্বই এর কারণ অবশ্যই! অথচ এমনিতে দিদিমা কিছু আর খুব গম্ভীর নয়। তবে বেশী কথাও কন না। দিদিমার শাশুড়ী সুবিধে পেলেই চুপি চুপি বলেন, 'তোদের দিদিমা যদি দুটো চারটি কথা বলতো তাহলেও প্রাণটা এতো হাঁফাত না। নেহাৎ এই এখন তোরা এসেছিস তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচছি। বৌমা আমার কর্তব্যটি যা ররবার সব নিখুঁৎ করলেন কিন্তু তারপরে আর কারুর নয়, ওই বই। এই যে অবুণ, আমাদের জন্যে প্রাণপাত করে, কখনো দরকার ব্যতীত দুটো কথা বলে? বলে না। একবাটি চাও কখনো সামনে ধরে দেয় না খাও ঠাকুরপো বলে। আমার তো ভাসুরপো আমি একটু বলি। তা তোদের দিদিমা বলে কি জানিস? 'বসালেই আবার খানিক সময় খরচ। বোঝ?'

বুড়ো দিদিমা তাঁর বিশালকায় বপুতে একখানি চওড়া পাড়শাড়ি জড়িয়ে সারাক্ষণ চৌকিতে শুয়ে থাকেন আর পাখা নাড়েন। ওঁর হাতের মোটা সোনার বালা থেকে ঝিলিক ওঠে।

বুড়ো দিদিমার মাথাজোড়া টাকের ওপর পরা সিঁদুরটা ছড়িয়ে পড়ায় সারা মাথাটা লাল দেখায়।

ওই অবুণেন্দ্র চলে যাবার পর বুড়ো দিদিমা গজ গজ করেন, 'একটা মানুষ চিরটাকাল তোমাদের সংসারের জন্যে প্রাণটা ঢালছে, তাকে এতটুকু ছেন্দা সমীহ নেই। এই যে ঘরে আম থই থই, দুটো কেটে দেওয়া যায় না?.. রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে তোমাদের বাজার বয়ে আনলো, এক গেলাশ লেবুর শরবৎ করে দেওয়া যায় না? ও যদি এতো না করতো, তোমাদের একটা লোক রাখতে হতো না মাইনে দিয়ে?

দিদিমা হেসে ফেলে বলেন, 'না করলে তো করতেই হতো। এই আমি যদি শুয়ে থাকতাম, আপনাকে নিশ্চয় একটা রাঁধুনী রাখতে হতো।'

দিদিমার ওই নির্মায়িক ভাবটা সাগরেরও তেমন পছন্দ হয় না। সত্যিই তো। ছোড়দাদু সম্পর্কে কি দিদিমার আর একটু মায়া মমতা দেখানো উচিত ছিল না?

সাগরের এই দিদিমার বাড়িতে রোজ-গারী লোক বলতে কেউ নেই। তবু যে দিব্যি রাজার হালেই চলে যায় সংসারটি, তার কারণও তো ওই মার অবুণকাকা।

বাগানের আম থেকে পুকুরের মাছ থেকে, ক্ষেতের ধান থেকে, সব দেখা শোনা রাখা বেচা ওঁরই ঘাড়ে।

ওই যে কারখানা হয়েছে, তার কিছু জমি নাকি দিদিমাদের, সেটা বিলি ব্যবস্থা করিয়ে লীজ দেওয়ানো, কে করতো অবুণেন্দু ছাড়া?

অবুণেন্দ্রর অবস্থা এমন কিছু নয়, রেলে চাকরী করতেন, সামান্যই চাকরী, এখন তো রিটায়ার করেছেন। কিন্তু কেউ বলুক দিকি অসহায়দের বিষয় আশায় টাকা-কড়ি থেকে এতোটুকু এদিক ওদিক করেছেন?

'উপকারীর মর্ম বোঝে না—'

এই হচ্ছে—বুড়ো দিদিমার আক্ষে-পোক্তি। মাঝে মাঝে একদিন নেমন্তন্ন করলে, কি ঘরে তৈরী খাবারদাবার খাওয়ালে। এটুকু মনিষ্যত্ব করবে তো?

দিদিমা কিন্তু এসবে কান দেন না। ওঁর যেন, কাজ পেলেই হল।

শুনে শুনে সত্যিই একটু খারাপ লাগে সাগরের। দিদিমাকে চক্ষুলজ্জাহীন স্বার্থপর বলে মনে হয়। একটু যেন কাঠখোট্টাও। উনি তো অবুণেন্দ্রর বৌদি হন, একটু ভালভাবে কথা বলতেও তো পারেন।

এই একটু আগেই দিদিমার বিষয়ে এই কথা ভেবেছে সাগর।

অরুণেন্দ্র এসেছিলেন এক থলে চাল নিয়ে। কালোকোলো মানুষ, রোদে যেন ঝলসে কয়লা।

থলেটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে কিছু বাসমতী আতপ চাল আছে—'

দিদিমা কাঠের টুকরোর মত কথা ছুঁড়লেন, 'বাসমতী আতপের অর্ডার কে দিয়েছিল?'

অবুণেন্দ্র বললেন, 'না না, মানে—হাটে হঠাৎ পেয়ে গেলাম তাই নিয়ে এলাম।'

দিদিমা তেমনি কাঠখোট্টার মত বললেন 'আজ যা এসেছে, এসেছে আর যেন না আসে। আতপ খেতে তো আমি? বাসমতীর দরকার নেই।'

অবুণেন্দ্র সেই রোদ্দুরে কপালের ঘাম মুছে চলে গেলেন।

দেখে দিদিমার ওপর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সাগরের।

এখন সাগরকেই সেই অপবাদ দিচ্ছে লতু।

সাগর বললো, 'কলকাতার ছেলেরা সভ্য হয়, ভদ্র হয় একথা কে বলেছে তোমাকে?'

'এমনি মনে হতো।'

লতু একটু হেসে বলে, 'আর মনে হবে না। যা নমুনা দেখছি। যেমন দাদা তেমনি ভাই।'

দাদা।

দাদার কথা বলে কেন।

সাগর চমকে বলে উঠলো 'দাদার কথা তুমি কী জানো?'

'জানতে কতক্ষণ লাগে?' লতু উদাস-ভাবে বলে, 'রাস্তায় দেখতে পেলে চিনতেই পারে না।'

'দাদা ওই রকমই অন্যমনস্ক।'

'তবে আর কি সাতখুন মাপ। এই যে আমি তোকে একটা কীল মারলাম। বলি যে এই আমার স্বভাব?'

লতু সত্যিই কথার সঙ্গে সঙ্গে সাগরের পিঠে একটা মাঝারি গোছের কীল বসিয়ে দেয়।

সাগর জীবনে কখনো এমন সেপরোয়া মেয়ে দেখেনি। গ্রামের মেয়েরা ওই রকমই হয় নাকি? তা মাও তো এই গ্রামেরই মেয়ে। আচ্ছা মা না হয় সেকালের মেয়ে আর এই যে বাড়িতে কত কারা যেন সব আসছে মার সঙ্গে দেখা করতে, তাদের সঙ্গে মেয়ে টেয়ে নেই নাকি? লতুর মত বয়সেরও আছে। কেউ তো মুখ তুলে কথাই কয় না।

আর কিনা লতু এই রকম ডানপিটেমি করে বেড়ায়। ওর মা কিছু বলে না?

কীল খেয়ে সাগরের ভীষণ রাগই হবার হওয়া উচিত তবু যেন তেমন হল না।

পিঠের ওই মাঝখানটায় যে চিনচিন করতে লাগলো, সেটা লাগার না অন্য

একরকম অনুভূতির, তা'ও যেন বুঝতে পারছে না সাগর।

অতএব সাগর ছিটকে চলে না গিয়ে রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'তোমার মা তোমায় কিছু বকেন না?'

লতু সাগরের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ তারপর বিচিত্র একটু হেসে বললো, 'হয়তো বকেন, বুঝতে পারি না।'

সাগর একটু কেঁপে উঠলো।

সাগর ওই হাসিটার মধ্য দিয়েই জেনে ফেললো লতুর মা নেই।

সাগরের মায় থেকে লজ্জাটা বেশী হলো। ছি ছি ওই কথাটা কেন বলতে গেল সাগর? না বললে তো লতুর দুঃখের জায়গাটায় নাড়া পড়তো না।

অথচ সাগর কিছু বলতেও পারছে না।

কী বলবে?

দুঃখ প্রকাশ করবে? সান্ত্বনা দেবে? ধেৎ!

সাগর চুপ করেই ওর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

লতুও তাই।

একটু পরে লতু বললো, 'রাগ করলি?'

'রাগ করবো কেন? বাঃ!'

'ওই যে কীল বসিয়ে দিলাম?'

'আরে ও তো ঠাট্টা করে।'

'যাক বুঝেছিস তাহলে।'

লতু একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

সাগর একবার নড়েচড়ে দাঁড়ায়, প্যান্টটা দুদিক ধরে টেনে কোমরের ওপর একবার হাত বোলায়, তারপর বলেই ফেলে, 'আমি জানতাম না সত্যি।'

এর বেশী আর বেশী কথা তার জোগাল না। অথচ এ ইচ্ছেও হচ্ছিল সাগরের কথায় সান্ত্বনার চেহারা দিতে লতুর কাঁধটায় একটু হাত রাখে।

না, সে ইচ্ছে কাজে পরিণত করা সাগরের পক্ষে সম্ভব নয়।

লতু কি ভাবছিল কে জানে।

চমকে বললো, 'কী জানতিস না?'

'তোমার মা নেই।'

সাগরের এই সময় 'তুই' বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল, তা কৈ বা পারলো কই?

ওই হি-হি করা আহ্লাদী মেয়ে, তবু কেনই যে লতুকে নিজের থেকে অনেক বড় লাগে সাগরের।

লতু তো মাত্র স্কুল ফাইন্যাল পাশ। জেনে ফেলেছে সেটা। আর বয়সে মাত্র আট মাস বেশী।

তবে এতবড় লাগে কেন? লতু শাড়ি পরে বলে?

নাকি লতুর ওই মস্তবড় খোঁপাটার জন্যে? যেটা খুলে ছড়িয়ে দিলে ওর পিঠটা সব ঢেকে যায়?

নাকি লতুর ওই ফর্সা ফর্সা নিটোল হাত দুটোর জন্যে? হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো দেহের দুপাশে একটা ছন্দে আন্দোলিত হতে হতে চলেছে। আর নয়তো কি লতুর ওই 'হৃষ্টপুষ্ট' স্বাস্থ্যটার জন্যে? সাগর নিজে তো রোগা পটকা।

মা বলে, 'দিন দিন লম্বাই ভালগাছ হচ্ছেন ছেলে। চওড়ায় একটু যদি বাড়ে আছে। জামাজোড়া পরে থাকিস তাই, জামা খুললে প্যাকাটি।'

নিজের সেই দৈন্যেই কি স্বাস্থ্যপুষ্ট লতুকে নিজের থেকে বড় লাগে? আর কিছু ভাবতে সাহস পায় না সাগর।

লতুই এগিয়ে যাচ্ছিল।

সেটা সাগরের হাঁটতে না পারার জন্যে নয়, রাস্তাটা লতুর জানা, আর সাগরের অজানা বলে।

লতু বললো, 'সে তো সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নেই।'

'তবে তোমায় কে মানুষ করেছে?'

'মানুষ?'

লতু আবার হি হি করে হাসে, 'মানুষ' আবার হলাম কই রে? 'মানুষ' হলে এতোবড় মেয়ে এরকম রাস্তার মাঝখানে হি হি করে হাসে? মানুষ হওয়া মেয়ে দেখিস সবাইয়ের বাড়িতে। সভ্যভব্য শান্ত। তবে 'বড় করা' বলতে পারিস। সেটা পিসি করেছে। মা মরে যাওয়ার পর তখন পিসি যদি দুধ-টুধ না খাওয়াতো পরে ধরে-বেঁধে চান করিয়ে, ভাত গিলিয়ে ঘুম-টুম না পাড়াতো, করেই অক্কা পেতাম।'

সাগর সত্যিই এমন অদ্ভুত কথা বলা মেয়ে দেখেনি। সাগরের নিজের পিসিরই এক মেয়ে আছে সাগরের কাছাকাছি বয়েস, সব্বাই তাকে 'ধিঙ্গী অবতার' বলে, 'বাচাল মেয়ে' বলে, তবু ঠিক এরকমটা নয়।

লতুর মধ্যে প্রশস্ত একটা দুঃখ আছে, লতু সেটাকে চাপা দিতে এইরকম হি-হি করে বেড়ায়।

'লতু, তোমার বাবা?'

জিগ্যেস করে আবার ভয় করে সাগরের।

হয়তো বাবাও নেই লতুর।

কিন্তু সাগরের ভয় ভাঙলো লতু বলে উঠলো, 'বাবা? বাবা শিউড়িতে থাকে।'

তবু ভাল।

সাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু অত 'কথাতেও' লতু হঠাৎ এমন চুপ মেরে গেল কেন?

সাগরের অত বেশী কথাতেও যেমন প্রাণ হাঁপায়, তেমনি আবার প্রাণ হাঁপাচ্ছে এই স্তব্ধতায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুর, মাঝে মাঝে যে দমকা হাওয়া এসে গায়ে লাগছে, তাতেও যেন আগুনের হলকা। তবে লতু এমন একটা গাছপালায় ঢাকা ছায়া ছায়া জায়গা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাথায় রোদ লাগছে না।

সাগর ভাবছিলো, কী বলে একে?

বাগান তো নয়? অরণ্য? ধ্যেৎ! গ্রামের মধ্যে আবার অরণ্য আসবে কোথা থেকে? যদিও পায়ের তলায় শুকনো পাতার শব্দ উঠছে, সর্বত্র শুকনো পাতার ছড়াছড়ি, বড় বড় সব সাগরের অজানা গাছ তাদের ডালপালা বিস্তার করে আকাশকে প্রায় ঢেকে রেখেছে, তাদেরই গুঁড়িতে শাখাতে নানা লতানে গাছ যেন জট পাকিয়ে বসে আছে।

সাগর ভেবে ঠিক করলো, একে তাহলে জঙ্গল বলা চলে।

কিন্তু কতক্ষণ হাঁটছে তারা? এই জঙ্গলের মধ্যে স্তব্ধতা দারুণ অস্বস্তিকর। সাগর এর আগে কখনো এমন অস্বস্তি অনুভব করেনি।

সাগরই স্তব্ধতা ভাঙবে বাবা।

সাগর কথা ভেবে নিয়ে বলে, 'তুমি সিউড়ীতে থাকো না?'

লতু জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'নাঃ।'

তারপর একটু পরে বলে, 'কে থাকবে, বাবা সেখানে। সৎমাকে আমার ভাল লাগে না।'

সৎমা!

তার মানে বিমাতা।

ইস! লতুর মধ্যে এতো দুঃখ! আর সাগর ওকে প্রথম থেকে অগ্রাহ্য করছে?

সাগর লতুর কাঁধটা একটু ছুঁয়ে ফেললো, বললো, 'আমি এসব কিছুই জানতাম না লতুদি!'

কী আশ্চর্য! সে লতুদি বলে ফেললো, নিজেই অবাক হয়ে গেল সাগর। কই সে তো ভেবে বলেনি। কাঁধটা ছুঁয়ে ফেলে সাগরের বুকটা ধক ধক করে উঠলো। সবটাই যেন তার অজ্ঞাতসারে হলো। 'বিমাতা' শব্দটাই সাগরকে বিচলিত করে ফেলেছে।

লতুর কিন্তু কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না।

লতু একটু হেসে বললো, 'যাক, বললি তাহলে দিদি?......আমিও ঠিক করে রেখেছিলাম আর উপরোধ করবো না, ইচ্ছে হলে বলবি।...আমায় কেউ দিদি বলে না জানিস?'

সাগর অবাক হয়ে বললো, 'সে কি তোমার থেকে ছোট কেউ নেই?'

'আছে! পাড়ায়। তারা বলে দিদি, কিন্তু সেগুলো নেহাৎ গুটকে ফুটকুনি বুঝলি? বললো, আর না বললো। একটা বড় ছেলে বললে সুখ আছে।'

লতু ওর একটা হাত চেপে ধরলো।

বললো, 'সাবধান! এখানটায় গর্ত আছে।'

সাগরের হাতের ওই ধরে রাখা জায়গাটা কেমন জ্বালাজ্বালা চিনচিন চিনচিন করছে।

সাগর আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'কতক্ষণ হাঁটছি আমরা, কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছো? আমাদের ওখানে তো আরো অনেক আগেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।'

লতু আবার সেই ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে উঠলো। সাগরের পিঠের

ধারে একটা ঠেলা মেরে বললো, 'এতোক্ষণে সে হুঁশ হলো? তোদের বাড়ি তো কখন পেরিয়ে ছাড়িয়ে চলে এসেছি।'

'সে কী? তবে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

লতু তেমনি হি-হি করে বলে, 'বিবাগী হয়ে চলে যাচ্ছি। দেখছিস না জঙ্গলে ঢুকেছি। এতোক্ষণে বাবুর খেয়াল হলো। অনেক আগে পেঁৗছে যাওয়া উচিত ছিল। আমি তাহলে তোকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছিলাম বল? যেরকম নিশিতে ডেকে নিয়ে যায়। নিশি জানিস তো? নাকি জানিস না, কলকাতার ছেলে, না জানতেও পারিস।'

'জানবো না কেন?' সাগর সতেজে বলে 'রাত্তিরবেলা নিজের লোকের মত গলার স্বর করে ডাকে—'

'ওঃ তাহলে জানিস? আমাদের এখানে একবার একজনকে, ভট্‌চাযিদের নাম শুনেছিস? তাদেরই একটা বৌকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'যাঃ, ও আবার সত্যি হয় নাকি?'

সাগর মন্ত্রমুগ্ধতার অপবাদ খন্ডন করতেই বোধহয় বলে ওঠে, 'ওসব তো বানানো গল্প! 'নিশি' যদি থাকে, তাহলে এক্ষনড়েও আছে, ব্রহ্মদৈত্যও আছে ভূত-পেত্নীও আছে।'

'নেই তো কী?'

লতু হাতমুখ নেড়ে বলে, 'কী নেই জগতে? সব আছে। না থাকলে ভট্‌চাযদের বৌটা নিশির ডাক পেয়ে গেল কী করে? রাত তখন দুটো, হঠাৎ ওই বৌটার বরটা দেখলো, বৌ নেই, ঘর খোলা। তখন ও চেঁচিয়ে উঠেছে, সবাই এসে দেখে।...দেখে যে সদর দরজাও খোলা। তাহলেই বোঝো? নেশার ঘোরের মতন চলে গেছে।......দুদিন ধরে কত খোঁজা-খুঁজি, কত লোকে কত কি বলতে লাগলো, তারপর দেখা গেল ওই নিশিতে ডাকার ব্যাপার। পুকুরের পাড়ে মরে পড়ে আছে, কাছেই একটা মুখ কাটা ডাব।'

মুখকাটা ডাব।

সাগরের জ্ঞানের পরিধির বাইরে এসব কথা। সাগর যেন নিজেকেই কোথাও মরে পড়ে থাকতে দেখে কোনো একটা মুখকাটা ডাবের সামনে।

সাগরের গলা শুকিয়ে আসে, 'মুখ-কাটা ডাব কেন?'

'বাঃ থাকবে না? ডাবের মধ্যেই তো প্রাণটা ভরে নেয়।'

'যাঃ! প্রাণ নিয়ে ওদের লাভ?'

'এমা তুই দেখছি কিছুই জানিস না। একজনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই তো আর একজনকে মারে। ধর তোর খুব অসুখ করলো, চিনু পিসি নিশির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো, তখন নিশি রাত্তিরে আমার ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণটা ডাবের মধ্যে ভরে চিনু পিসিকে দিলো সেই ডাবের জলটা খেয়ে তুই বেঁচে উঠলি।'

'যোঃ!' সাগর এবার বুদ্ধি ফিরে পায়, বলে যতোসব বাজে কথা।'

'বাজে তো বাজে! জগৎ সুদ্ধ লোক বিশ্বাস করছে, তুই না করলে তো বড় বয়েই গেল।'

সাগর তর্কের সুরে বলে, 'তা'হলে আর রাজপুত্র রাজকন্যারা মরতো না।'

লতু উদাসভাবে বলে, 'তারা জানে না নিশি-টিশি কোথায় পাওয়া যায়, তাই মরে।'

'নিশি-টিশির কথা শুনতে চাই না আমি, ভাল লাগছে না, বাড়ি চল।'

'বাড়ি?'

লতুর সেই হাসি।

'বাড়ি এখন অনেক দূরে, কোথায় এসে পড়লাম দেখ।'

জঙ্গলের ফাঁক থেকে একটা পুরনো মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

লতু ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'সাবধানে আয়, এখানে কাঁটার ঝোপ রয়েছে। এই হচ্ছে 'সাধক কালীর মন্দির', খুব পুরনো।'

সাগরের মনে পড়লো, মার মুখে এই নামটা শুনেছে। এখানের বিশেষ বিখ্যাত দেবতা।

কিন্তু সাগরের কী দরকার ছিল এখানে আসার?

মন্দির তখনো বন্ধ।

লতু বলে, 'আয় আমরা খানিকক্ষণ এইখানে চাতালে বসে থাকি, সাড়ে চারটে বাজলে সেবাইৎ এসে মন্দির খুলবে।'

সাগরের পা ব্যথা করছে।

সাগর বিরক্ত হয়ে বলে 'তা এখানে আনার আমার কী দরকার ছিল?'

'ওমা! তুই রাগ করছিস? আমি বলে কত কষ্ট করে শর্টকার্ট দিয়ে তোকে নিয়ে এলাম!'

লতুর চোখটা জলে ভরা দেখালো।

সাগর ভারী অপ্রতিভ হলো। বললো, 'সেই তো বলছি। কষ্ট করতে গেলে কেন? আমার এতো ঠাকুর-টাকুরে ভক্তি নেই।'

'এই ছিঃ! কী বলছিস সাগর? এই কালী ঠাকুর কী রকম জাগ্রত জানিস? তুই যা মানসিক করবি হবে।'

'অমনি হবে! আমি রাজা হতে চাইছি। হবো?'

'দ্যাখ ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ঠাট্টা করতে নেই। তুই প্রার্থনা কর ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করবি, ঠিক হয়ে যাবে।'

সাগর ঠোঁট উল্টে বলে, 'সে আমি প্রার্থনা না করলেও হবো। যা লিখে এসেছি, সেটা তো আর উল্টে যাবে না?'

লতু বলে, 'বিশ্বাস থাকলে হয়। নইলে আমার মতন গবেট মেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন পায়?'

'তুমি গবেট মেয়ে?'

'নয়তো কী!'

লতু উদাস গলায় বলে, 'একের নম্বরের গবেট!'

মাঝে মাঝেই লতু এই রকম উদাস হয়ে যায়। আর তখনই সাগরের মনের মধ্যে একটা মনকেমন মনকেমন ভাব লাগে।

সাগরের ইচ্ছে হয় ওর হাতটা হাতে নিয়ে চুপ করে একটু বসে থাকতে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে হাসি পায়। কী বোকার মত লাগবে দেখতে।

'আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

সাগর বলে।

'এই সেরেছে!'

লতু বলে, 'এখানে খাবার জল কোথা? গাঁয়ের লোকেরা ওই পুকুরের জল খায় ঢকঢক করে, তুই তো আর খাবি না?'

'পুকুরের জল? মাথা খারাপ!

'তাইতো বলছি। তেষ্টা পেয়েছে বললি।'

লতু উঠে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এসে করুণ গলায় বলে, 'কোথাও কিছু দেখছি না। মন্দিরের দরজা খোলা হলে যদি কিছু সুবিধে হয়। আহা তেষ্টা পেয়েছে বললি—'

ভারী অস্থির দেখালো লতুকে।

'ঠিক আছে থাক!'

বললো সাগর, 'এখন কটা বেজেছে?'

'ওইতো মন্দিরের চূড়োর কোণে রোদ হেলেছে, চারটে বাজলো বলে।......কিন্তু মন্দিরেও তো গঙ্গাজল—'

লতুর যেন ছটফটানি ধরে।

লতু আবার উঠে যায়।

অনেকক্ষণ লতুকে দেখতে পাওয়া যায় না।

সাগরের ভয় করে।

এই অচেনা মন্দিরের চাতালে একা বসে আছে সে, এদিকে ওদিকে কিছু কিছু একেবারে দেহাতি লোক বসে বসে বিড়ি টানছে। দু একজনের পরণে আবার লাল কাপড়, যা দেখলে ভয় বাড়ে বৈ কমে না।

সাগরের এতোক্ষণে মনে পড়ে সে সেই সাহেব দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'বাড়ি যাচ্ছি' বলে। মা নিশ্চয় তক্ষুনি ফিরে এসেছিল।

তারপর?

তারপরের অবস্থাটা ভেবে কাঠ হয়ে যায় সাগর।...এতোক্ষণ একথা মনে পড়েনি তার!

মা যখন এসে তাকে দেখতে পাবে না, এবং এদিক ওদিক কোথাও খুঁজে পাবে না, তখন কী হুলুস্থুল পড়ে যাবে, একবারও মনে পড়ল না!

কী হয়েছিল তার?

সাগরের ভিতরে যেন একটা কাঁপুনি এলো।

এও একরকম নিশির ডাক নয়তো?

দুপুরবেলাও তো হয় এসব।

সাগরের কাকার মেয়েটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী সব বলে না? 'ভর দুপুর-বেলা, ভূতে মারে ঢ্যালা—' নিশ্চয় ওই রকম কিছু হয়েছে। নইলে এই এতোটা সময় কিছু মনে পড়েনি কেন? লতুটার পিছু পিছু চলে আসছিল যেন আচ্ছন্নের

মত? ঝোপ জঙ্গল কাঁটাগাছ সব তুচ্ছ করে? লতু আসলে কী কে জানে! কেন নিয়ে এলো আমাকে না বলে-টলে।

পাগল-টাগলও হতে পারে মেয়েটা।

এই চলে গেল তার যদি না আসে? সাগর কী রকম করে ফিরবে? সাগর কি আর রাস্তা চিনতে পারবে? না আসছে না। নিশ্চয় সাগরকে এইখানে টেনে এনে ফেলে রেখে চলে গেছে।... কেউ সাগরকে খুঁজে পাবে না, আর দু-তিন দিন পরে দেখতে পাবে—

মন্দিরের পিছন রাস্তা ধরে লতুকে আসতে দেখা গেল।

লতুর সঙ্গে একটা ঝাঁকড়া চুল নিকষকালো লোক, কিন্তু তার হাতে ও কী! সাগরের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো, সাগরের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল সাগরের পা দুটো মাটিতে পুঁতে বসে গেল।

লতু বললো, 'এই এতক্ষণে সমস্যা মিটলো। আসতে কী চায়? কত তুতিয়ে পাতিয়ে—ওই ওদিকে এর ঘর, অনেক ডাব রয়েছে। লোকে পুজো দেবার জন্যে গাদাগাদা ডাব কেনে তো? দাও বাপু, ডাবের মুখটা কেটে দাও।'

নাঃ, আর মাটিতে পুঁতে থাকা নয়, সাগরের পায়ে রেসের ঘোড়ার দুরন্ত ক্ষিপ্রগতি।

'ও কী রে ও কী। ছুট মারছিস কেন? এই সাগর?'

লতুও ছুটতে থাকে।

শুধু এই লোকটাকে হাতের ইসারায় ফিরে যেতে বলে।

লতু অবাক হয়ে যায়।

লতু যা ভাবে তা এই, ডাবওয়ালাটাকে দেখে ভয় লেগে গেছে ছেলেটার। সত্যি ঠিক ডাকাতের মত দেখতে। ওকে না নিয়ে এসে একেবারে ডাবটা কাটিয়ে নিজে নিয়ে এলেই পারতাম। জলটা গরম হয়ে যাবে ভেবে—

ছুটতে ছুটতে লতুরও ঘাম ছুটে যায়।

কী বুদ্ধু ছেলে বাবা!

একটা ঝাঁকড়া চুল লোককে দেখে এতো ভয়। আহা এতো কষ্ট করে মা কালীর দরজা পর্যন্ত এসে দর্শন হলো না! লতু নিজেকেও ধিক্কার দিল। নাই বা মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছিল, ঠাকুর তো আর সত্যি ঘুমোচ্ছে না? তবুও যা মনোবাঞ্ছা সেটা লতু মাকে জানিয়ে প্রার্থনা করলো না কেন?

সাগর ছুটছিল।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মতই ছুটছিল।

ধাক্কা খেলো একজনের সঙ্গে। ধাক্কা খেলো, অথবা তিনি ওকে ধরেই ফেললেন ঝাপটে।

'কী ব্যাপার? তুমি চিনুর ছেলে না? এখানে কোথায় এসেছিলে? ওদিকে তোমার মা কেঁদেকেটে— [illegible]'

পাড়াগাঁয়ে পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির অভাব নেই। বি এন মুখার্জি অর্থাৎ বিনুকাকা অর্থাৎ বিনয়েন্দ্রনাথ পথের ধারের অমনি একটা বাড়ির ঘাস-গজানো দাওয়ায় সাগরকে বসিয়ে বলেন, 'সব শুনবো, আগে একটু জল খাও।'

নিজের কাঁধে ঝোলানো শ্রীনিকেতনী ঝোলা থেকে ফ্লাস্ক বার করে জল খাওয়ান সাগরকে।

আর তখন সাগরের মনে হয় এই জলটা এই মুহূর্তে না পেলে অজ্ঞান হয়ে যেত সাগর।

সাগরের ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ে, কিন্তু এই বয়সের ছেলের পক্ষে অতটা খেলো হওয়া সম্ভব নয়।

যাক, এখন সাগর হাতে চাঁদ পেয়েছে পেয়েছে বনস্পতির আশ্রয়, এখন সামলে উঠতে পারবে।

বিনয়েন্দ্রনাথ বললেন, 'এইবার বল তো অমন ভূতে তাড়া খাওয়ার মত আসছিলি কোথা থেকে?'

সাগর এখন মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

এখন একেবারে অন্যরকম।

ফর্সা খদ্দরের পায়জামা, গলাবন্ধ গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর শাদা খদ্দরের টুপি-পরা এই দীর্ঘাকৃতি মানুষটাকে দেখলে সমীহ শ্রদ্ধা না এসে পারে না। মুখের চেহারায় একটি দৃপ্ত আভিজাত্যের ছাপ, যেটা জানলা দিয়ে দেখে দেখে অনুমান করতে পারেনি সাগর, তেলমাখা অবস্থায়ও অনুভব করতে পারেনি।

সাগরের এখন এই মানুষটার সামনে সেই ভয় পাওয়ার কারণটা বলতে লজ্জা করলো। সাগর বুঝতে পারলো বলতে গেলে কী ছেলেমানুষী হবে।

এই দিনদুপুরে সাগরকে 'নিশি'তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সরকারদের মেয়ে লতিকার ছদ্মবেশে, এ-কথা এঁর সামনে বলা যায়?

এঁর সেই উদাত্ত হাসিটা এখনও যে কানে বাজছে। শুনলে সেই হাসিটি হাসবেন তো!

সাগর বললো, 'অন্য রাস্তা দিয়ে যাবো বলে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'রাস্তা হারিয়ে এতো দূর চলে এসেছিলে?'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'আচ্ছা ছেলে তো!...আমি কোথায় ভাবছি তোমায় 'কোপাই'য়ের ওপারে বেড়াতে নিয়ে যাবো—ওদিকে তোমার মা দাদা দিদিমা সবাই খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি ভাবলাম আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? [illegible] কী ছুটেই

আসছিলে! গরুতে তাড়া করেছিল না কী?'

সাগর ঘাড় কাৎ করে।

সাগর ভাবে ফাঁড়া কাটলো।

গরুতে তাড়া করলে মানুষ ছুটবে, এটা তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সাগরের শনিও যে তখন খাঁড়া উঁচিয়ে ছুটে আসছে, তা কী জানা ছিল তার?

সাগর হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।

লতুর মুখটা টকটকে লাল, শাড়িটা এলোমেলো, ব্লাউসটা ঘামে ভিজে টসটসে, আর লতুর খোঁপা ভেঙে-পড়া চুলের রাশি সাপুড়ের ঝাঁপি ভেঙে বেরিয়ে পড়া সাপের ঝাঁকের মত ফণা তুলে দুলছে।

লতু হাঁপাচ্ছে।

লতুরও মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি।

তবু লতু ছুরির ফলার মত ধারালো গলায় বলে উঠলো, 'তুই এইখানে? দাদুর কোলের কাছে আহ্লাদে গোপালের মতন বসে আছিস? আর তোর জন্যে আমি? এই দ্যাখ্ হোঁচট খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটার কী অবস্থা!'

'সে কী? কই দেখি?'

বিনয়েন্দ্র তাড়াতাড়ি নীচু হল।

সাগরও ভয়ে ভয়ে তাকায়। অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। রক্ত ঝরছে এখনো।

'বোস স্থির হয়ে।'

বিনয়েন্দ্র আবার তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকান। ওষুধ আর তুলো বার করে প্রাথমিক চিকিৎসা সমাপ্ত করেন।

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'এসবও আপনার সঙ্গে থাকে?'

লতু এতক্ষণে একটু আরাম পেয়ে স্থির হয়ে বসে বলে, 'শুধু এসব? কী নয়? পেটের অসুখ মাথাধরার ওষুধ থেকে শুরু করে সাপে কামড়ানোর ওষুধ পর্যন্ত।'

'কেন?'

'কেন? সাধে বলি বুদ্ধু? এইটাই তো সাহেবদাদুর দেহাতিদের বস্তিতে বেড়াতে যাবার সময়।...ওই নদীর চরে চরে মন্দিরের ওধারে দেহাতিদের বস্তি তো? দাদু ওদের বিনি পয়সায় ওষুধ দেন, ওদের জন্যে যে ইস্কুল করে দিয়েছেন, তাতে পড়ান, ওদের শিক্ষা-দীক্ষা দেন। ওরা দাদুকে ঠিক ভগবানের মতন ভক্তি করে।'

'আচ্ছা! যথেষ্ট পাকামি হয়েছে, এখন তোর ইতিহাসটা শুনি। তোকে কে তাড়া করেছিল? বাঘে?'

'আমায় আবার তাড়া করবে কে?' লতু ভুরু বাঁকিয়ে [illegible] 'ওই বীরপুরুষটিকে জিগ্যেস করুন না। দুপুর [illegible] শর্টকাট করে ওকে আমি সাধক-

কালী দেখাতে নিয়ে গেলাম, ওর তেষ্টা পেয়েছে বলে ডাবওলাকে খোসামোদ করে ডেকে নিয়ে এলাম, আর ও কিনা সেই লোকটার ঝাঁকড়া চুল আর কালো রং দেখে দৌড় মারলো। কলকাতার ছেলের সাহস দেখলাম বটে।'

বিনয়েন্দ্র একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলেন, 'তুমি তো এসব কথা বলনি ইয়ে—।'

'সাগর।'

'হ্যাঁ, সাগর। তুমি তো অন্য কথা বললে।'

সাগরের মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে।

লতু সন্দেহ সন্দেহ গলায় বলে, 'কী আবার বলেছে?'

'অন্য কথা বলেছে। কিন্তু কেন বল তো? তুমি চিনুর ছেলে তোমার ব্যাপারটা তো আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। উল্টো কথা বললে কেন, এর কারণটা তো আমায় জানতে হবে।'

সাগর এই প্রায় অপরিচিত মানুষটার গলায় অভিভাবকের দৃঢ়তা দেখে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। এতোক্ষণের ভয় কষ্ট সবকিছুর প্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

অবশেষে বলতেই হয় সাগরকে তার মিথ্যা ভাষণের কারণ। লজ্জা! লজ্জাতেই কথা বানিয়েছে।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে রোদে ঝকঝকে শাদা আকাশ নানা বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমারোহে যেন কোনো এক নিগূঢ় উৎসবের আয়োজন করছে।

লতুকে আর এখন তেমন অগ্নি-মূর্তি দেখাচ্ছে না। কোমল একটি লাবণ্যের ছায়া ওর সর্বাঙ্গে। সাগর তখনও তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না, এখনো পাচ্ছে না।

লতু গিন্নীদের মত কপালে হাত রেখে বলছে, 'হায় কপাল! তুই আমায় ছদ্মবেশী 'নিশি' ভাবলি! আমি মুখ-কাটা ডাব নিয়ে তোর প্রাণ হরণ করতে আসছিলাম। শুনে যে আমার বিষ খেতে ইচ্ছে করছে রে!'

আর বিনয়েন্দ্রনাথের সেই হা-হা হাসি যেন আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়ে।

'তোরও দোষ, তুই বা ওকে নিশিতে পাওয়ার গল্প করতে গেলি কেন? ও বেচারা শহরের ছেলে, অত-শত জানে না—'

বিনয়েন্দ্রই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সাগরকে। দরাজ গলায় হাঁক পাড়লেন, 'চিনু কোথায়? সন্দেশ খাওয়া। ছেলে খুঁজে এনে দিলাম।'

এতোক্ষণ চিনু বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলে ছেলে করে কেঁদে বেড়াচ্ছিল ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল ছেলেকে পেলে জীবনে তাকে বকবে না।

কিন্তু যেই না আস্ত সুস্থ ছেলেকে দেখা, তেড়ে আসে বকতে।

'কোথায় ছিলি এতোক্ষণ হতভাগা ছেলে—'

'নো নো!'

বিনয়েন্দ্র চিনুর সামনে হাত নেড়ে বলেন, 'নো মাই গার্ল! বকা চলবে না! জিগ্যেস করাও চলবে না। তোমার ছেলে ভয়ঙ্কর মারাত্মক এক আততায়ীর হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছে অভিনন্দন জানাও ওকে। আর কই? আমার সন্দেশ কই?'

লতিকা সকাল থেকে বহুবার চেষ্টা করছে চাটুয্যে দিদিমার বাড়ি গিয়ে ওনার নাতির খবরটা নিয়ে আসে। এটা তো জিগ্যেস করতে হবে, 'কী হে বীরপুরুষ! রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল? না চমকে চমকে উঠেছিলে?'

জিগ্যেস করতে পেলে কি হতো বলা শক্ত।

লতুর সন্দেহটা তো মিথ্যে নয়।

সাগর নামের ছেলেটাকে বুঝি নিশিতেই পেয়ে বসে আছে। নইলে কেন এখনো ওর অবস্থা আচ্ছন্নের মত? কেনই বা অবিরত সেই বেদের ঝাঁপি ভেঙে বেরিয়ে পড়া এক বাঁক ফণা-তোলা সাপ তার চোখের সামনে দুলেই চলেছে?

আর কেন সমস্তক্ষণ তাকে মরমে মেরে সেই সকরুণ আক্ষেপধ্বনিটা বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, 'হায় কপাল! তুই আমায় ছদ্মবেশী 'নিশি' ভাবলি? আমার যে বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে রে!'

সমস্ত ঘটনাটা শ্লেটের লেখার মত যদি হাত দিয়ে মুছে ফেলা যেত!

হয়তো লতুও ভাবছিল, মরতে আমি ওকে ওই নিশি পাওয়ার গল্পটা বলতে গিয়েছিলাম। গিয়ে তাই বলিগে। বলি আমরা তো আজন্মই এসব শুনেছি। ভূত প্রেত দৈত্য দানো কিছুরই অভাব নেই আমাদের এই গ্রামটিতে।

কিন্তু বলতে যাওয়া হল না।

বৈঠকখানা বাড়ির সামনে একজন আটকালো ওকে। গম্ভীর গলায় বললো, 'কাল সাগরকে ওভাবে ভয় দেখিয়েছিলে কেন?'

লতু চোখ তুলে তাকালো।

বাচাল লতু, বেপরোয়া লতু মুখরা আর প্রখরা লতু একেবারে মূক হয়ে গেল। লতু চোখ নামিয়ে নিল।

লতুর সেই চোখের অন্তরালে গরম বাষ্পোচ্ছ্বাস উথলে উঠতে চাইলো।

সেই গম্ভীর গলা আবার বলে উঠলো ও তোমাদের এই গাঁয়ের মেয়ে-মেয়েদের মত পাকা নয়, ওকে ওই সব ভয়ের গল্প বলতে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। সাপের দাদুর সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে যথেষ্ট বিপদ হতে পারতো ওর।'

লতুর সেই প্রতিক্ষণ খৈ-ফোটা মুখ এমন তালা-চাবি আঁটা হয়ে গেল কী করে? লতুর মুখ আরো নীচু হয়ে গেল! লতুর চোখ লজ্জা সংযম রাখতে দিল না।

এই নির্লজ্জ চোখ দুটো নিয়ে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না?

লতু ঝপ্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে।

ওর ওই চলে যাওয়া দেখে প্রবাল একটু অপ্রস্তুত হয়। এতোটা হবে ভাবে নি। সে সাগরের দাদা, সাগরের থেকে বড়, অতএব অভিভাবকের ভূমিকা তার নেওয়া উচিত, এমনি একটি মনোভাব নিয়ে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে বাচাল মেয়েটাকে একটু 'টাইট' দিতে এসেছিল। ধারণা ছিল নিজের দোষ স্খলনের জন্য মেয়েটা খুব তড়পাবে, এবং প্রবাল তার উত্তরে আর একটু শাসনসুর চড়াবে নেবে।

প্রবাল তো আর ছেলেমানুষ নয়, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে তার। মাঝে মাঝেই দেখে মেয়েটাকে, দিদিমার কাছে, মার কাছে বসে বসে বকবক করায়, প্রবালকেও 'প্রবালদা প্রবালদা' করে কথা বলতে আসে। তবে প্রবাল গ্রাহ্য করে না।

বলতে গেলে ইচ্ছে করে তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখায়। এই যে সেদিন হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে বলে উঠলো, 'প্রবালদা চিনুপিসি বাড়িতে আছেন?'

'চিনুপিসি বাড়ি আছেন কিনা, সেটা বাড়ি গিয়েই দেখগে যা। তা নয় গায়ে পড়ে কথা কইতে আসা।

প্রবাল যদি তখন ভাল করে একটা উত্তর দেয়, নির্ঘাৎ আরো কথা বলতে বসবে। প্রবাল তাই গম্ভীরভাবে বললো, 'জানি না।'

প্রথম দিনই ওর ওপর রাগ হয়ে গিয়েছিল প্রবালের।

'চিনুপিসি, তোমার ছেলেদের নাম দুটো কী সুন্দর! প্রবাল আর সাগর। কখনো এমন চমৎকার নাম শুনি নি। তোমার যদি একটা মেয়ে থাকতো, কী নাম রাখতে? ঝিনুক?'

চিনুপিসির ছেলেদের নামের ব্যাখ্যায় তোর কি দরকার বাবা? মানে বুঝিস এসব নামের? তা প্রবাল যে ওকে গ্রাহ্য করবে না, তাচ্ছিল্য করে সেটা বুঝেও তো যাওয়া আসায় কিছু কমতি ছিল না, আজই হঠাৎ এতো অপমান হয়ে গেল!

নিজের দিকে যতই যুক্তি রাখুক, অপ্রতিভ একটু হলোই প্রবাল। অতএব আরো যুক্তি জড়ো করতে লাগলো তা হোক, একটু টাইট দেওয়া ভাল। গ্রামের মেয়ে তুমি এতো ফিঙ্গী কেন?'

আর সরকার বাড়ির লতিকা নামের সেই মেয়েটা?

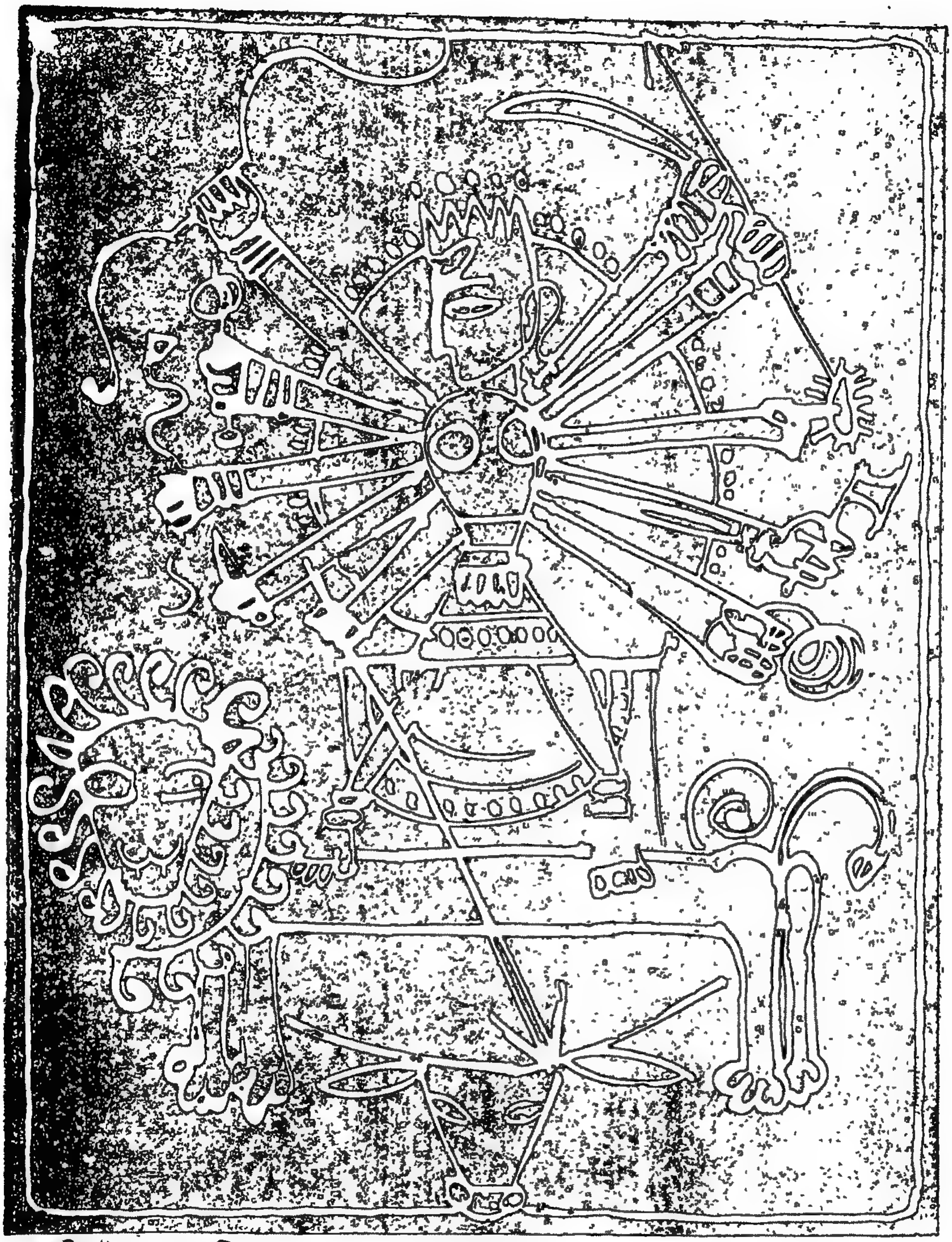

শারদীয় উৎসবের দিনে শুভেচ্ছা প্রকাশ করতে
একটি পঙ্‌ক্তিই হয়তো যথেষ্ট। কিন্তু এল. আই. সি-র
কাছে এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা খুবই অর্থবহ। আনন্দঘন
দিনগুলিতে বহু ক্লেশের বাধা ডিঙিয়ে আপনার
আশা যাতে ফলবতী হয়, অমঙ্গল আর দারিদ্র্যের চির
অবসানে বিজয়ী হয় শুভচেতনা আর প্রগতি, এল.আই.সি.সে
ব্যাপারে নানা উপায়ে আপনাকে সহায়তা করতে সচেষ্ট।

mcm

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

তার তো দারুণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, সে বালিশে মাথা চেপে শুয়ে থাকবে না?

তার পিসি এসে সাধ্য সাধনা করে একটু গরম দুধ খাওয়ালো। আর খুড়ি ঠোঁট বাঁকিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'ঠাকুরঝিই মেয়েটার মাথা খেলেন।'

লতুর বাপ অনেকবার চেষ্টা করেছে লতুকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে, পিসিই যেতে দেয় নি। বলেছে, 'মা মরলে বাপ তালুই। মেয়েকে নিয়ে যাবার দরকার তো তোর নতুন অপোগণ্ডগুলোর কাঁথা করবার জন্যে? এক ঝাঁক তো ছেড়েছে নতুন বৌ?'

বাপ রেগে বলেছিল, 'এতেই বা তফাৎ কী? সৎমা পর, কাকীই বুঝি বড় আপন?'

পিসি বললো, 'আপন নয় সেটাই সুখের। এ তো জানছে কাকার সংসারে কাকী। আর চোখের ওপর যখন দেখবে বাপের সংসারে অন্য একজন গিন্নীগিরি করছে, বাপ জোড়হস্ত হয়ে পড়ে আছে, সেটা সওয়া শক্ত। মেয়েকে একেবারে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে তবে আমি মরবো।'

অতএব কাকী যদি বলে 'ঠাকুরঝিই মেয়েটার মাথা খেলেন।' ভুল বলে না।

কিন্তু সে মেয়ে অন্যের মাথা খাবে. এটা তো ভালো কথা নয়? ..অনেকেই এ প্রশ্ন করছে।

টর্চটা পকেটে ফেলে বাড়ির বাইরের দরজার শেকলটা তুলে দিচ্ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ, দেখতে পেলেন গগনদের বাড়ির পাশের গলি থেকে একটা আলোর রেখা।

ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে।

একটু হতাশ গলায় স্বগতোক্তি করলেন, 'এই এক পাগল!'

আলোটা কাছে এসে গেল।

তার সঙ্গে ধবধবে থানে মোড়া একখানি অবয়ব। পটেশ্বরীর মত সর্বদা এমন ফরসা থান, ফুলঝাটির আর কোনো বিধবা পরে না।

পটেশ্বরীর এক হাতে হ্যারিকেন আর অন্য হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার। এটা সকালের থেকে কিঞ্চিৎ ছোট।

বিনয়েন্দ্র শেকলটা না লাগিয়ে দরজা হাট করে দিয়ে সরে এসে বলে উঠলেন, 'আবার তুই মরতে মরতে এলি? সকালে কী বলে দিয়েছিলাম?'

পটেশ্বরী হাতের জিনিস দুটো নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে বিনয়েন্দ্রর 'ডিনার টেবল' অর্থাৎ মেলায় কেনা সস্তা কাঠের চৌকো টুলটা টেনে এনে মাঝখানে বসিয়ে বলেন, 'রাতে যখন শয্যাশায়ী হবো, তখন আর আসবো না।... এখনো যখন হেঁটে চলে সবই করছি, তখন আর এটুকু-আসতে মরে যাব না।'

'আরে বাবা) আমিই কি ওইটুকু গিয়ে খেয়ে আসতে মরে যাব?'

পটেশ্বরী টেবিলের ওপর থালা পেতে টিফিন কৌটো খুলে সাজাতে সাজাতে বলেন, 'নিয়ে আসতে আমিও মরে যাব না।'

তারপর ঘরের অন্য একদিকে একটা বেতের মোড়া টেনে এনে পেতে দিয়ে বলেন, 'কথা রেখে এখন খেতে বসো তো।'

বিনয়েন্দ্র বসে পড়ে থালায় চোখ ফেলে বলেন, 'এই দেখো, আবার সেই একগাদা রেঁধে মরেছিস? তোকে নিয়ে আর পারা যাবে না।'

'পেরো না।'

বলে নিজেও একটা টুল টেনে বসে পটেশ্বরী নিজস্ব অভ্যাসে আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে থাকেন।

বিনয়েন্দ্র রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে পরিতৃপ্তির গলায় বলেন, 'তবে তুই যা বলিস মিথ্যেও নয়। নিজের জায়গায় বসে খাওয়ার একটা স্বস্তি আছে। তোদের ওখানে গেলে পাটুর মেয়েরা বাতাস করতে ছুটে আসে, জটাইয়ের বৌ হাতে জল দিতে ছুটে আসে, অস্বস্তি লাগে।'

স্বীকার করছো তাহলে?'

পটেশ্বরী আঁচল নাড়াটা স্থগিত রাখেন।

'এসবই তোর রান্না?'

এ বেলায় তো সবই নিরিমিষ, আমার ছাড়া কার? মাছটা জটাইয়ের বৌ রাঁধে সকালে।'

নারকেলের ডালনাটা যা একখানা রাঁধিস! সত্যি ফার্স্টক্লাশ।

'থামো বিনুদা। তোমার হয়েছে, লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা! রাজবেশ ছেড়ে রাখাল বেশে পড়ে থাকা! দেখে দেখে আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে।'

'এই খবরদার! যা ইচ্ছে করে তা করতে বসিসনে যেন।

'নাঃ! করতে আর পারা যায় কই?' পটেশ্বরী বলেন, 'আমার তো তোমার বৌয়ের কাছে গিয়ে তেড়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।'

বিনয়েন্দ্র হেসে ওঠেন, 'তা এটা যদি তোর সাহস থাকে যা। মানা করছি না।'

'আমার খুব সাহস আছে। পটেশ্বরী কাউকে ভয় করে না।'

'তবে গেলেই পারিস।'

পটেশ্বরী আবার আঁচল ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, 'যাই না অনেক দিক ভেবে।'

কিছুক্ষণ একমনে খেয়ে যান বিনয়েন্দ্র, তারপর বলে ওঠেন, 'কিন্তু পটাই। সেই যে একটা কাজ করবার ছেলের কথা বলেছিলাম, রাঁধতে টাঁধতেও পারবে. বর্ধমান থেকে আনাবার কথা ছিল, তার কী হল?'

পটেশ্বরী ক্ষুব্ধ গম্ভীর গলায় বলেন, 'তবে যে বললে 'নারকেলের ডালনাটা ফার্স্টক্লাশ! বানিয়ে বললে?'

'আরে! কোথাকার কথা কোথায়! হঠাৎ একথা?'

'না বোঝবার মত কমবুদ্ধি ছেলে তুমি নও বিনুদা!'

বিনয়েন্দ্র ফের গলা-ছেড়ে হাসেন।

'আসল কথাটা তা হলে ধরেই ফেলেছিস? তোর রান্না আর মুখে রুচছে না বলে. একটা নতুন হাত খুঁজছি।'

'তা ছাড়া কী বলবো? একটা রাস্তার বেড়ানো, ছোড়া ধরে এনে তোমার খাওয়া দাওয়া তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো এই কথাই তো বলছো তুমি?'

বিনয়েন্দ্র সহাস্যে বলেন, 'তুই চিরকাল একরকম রইলি। কিন্তু পটাই তুই আর কতোকাল ভূতের বেগার খাটবি?'

পটেশ্বরী সহসা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'চললাম। বসে বসে কতকগুলো আগডুম বাগডুম শোনার দরকার নেই আমার।'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'এই দ্যাখো! নাঃ! সাধে বলি তোকে নিয়ে পারা যায় না।.. চলে যাচ্ছিস? ঠিক আছে, এই রইল তোর চিঁড়ের পায়েস—'

'হয়েছে!'

পটেশ্বরী আবার বসে পড়ে বলেন, 'পটাই আবার কী এমন একটা মানুষ বিনুদা? যে তার জন্যে তোমার চিন্তা? ভূতের বেগার খাটতে পাঠিয়েছে ভগবান, জ্ঞানাবধি তাই খেটে চলেছি। তবে ভূতে ভগবানে তফাৎ বোঝবার ক্ষ্যামতা নেই, এতো অধম নই।'

'তবে নাচার!'

বিনয়েন্দ্র হেসে বলেন, 'ভগবানের নৈবিদ্যি সাজিয়ে পরকালের কাজ কর।

পটেশ্বরী আবার আঁচল ঘোরাতে শুরু করে বলে ওঠেন, 'কিন্তু এও মাঝে মাঝে ভাবি বিনুদা, তোমারই বা এটা কী জীবন!'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'কেন, জীবনটা মন্দই বা কী?'

'খুব ভাল!'

'ভালই তো। যেভাবে ইচ্ছে চরে বেড়াচ্ছি, কাজ করছি, না কাজ করছি আর লবে বসে তোফা পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাচ্ছি-দাচ্ছি। খাওয়ার জন্যে লোককে বাজার রে দোকান রে কত হ্যাঙ্গামা করতে হয়, এ একেবারে আঙুলটি নাড়াতে হচ্ছে না। এমন সুখের জীবন আর কী হতে পারে?

'আহারে মরি মরি! চিরকাল যেন তুমি নিজেই খেটে পিটে সংসার করেছো? এ হচ্ছে তোমার শখের কাজল পরে চোখ জ্বালানো। সুখে থাকতে ভূতের কীল খাওয়া।' এখন পটাই কত ভূতের ব্যাগার খাটবে, সেই চিন্তায় ঘুম নেই।'

বিনয়েন্দ্র খেয়ে ওঠেন।

হাত ধুয়ে এসে বলেন. 'চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'শোনো কথা। আমায় আবার পৌঁছে দেওয়া! ভূত পেতনী সাপখোপ চোর ডাকাত সবাই পটাই বামনীকে ডরায়।'

'তা হোক। আমি তোর গুরুজন, সেটা ভুলে যাস নি!' হাহা করে হেসে ওঠেন।' আমার একটা দায়িত্ব নেই?'

অতএব গলগলিয়ে গল্প করতে করতে প্রৌঢ় দুই ভাই বোন পথ মুখরিত করতে করতে যান।

গগনদের বাড়ির জানলার নীচে দিয়ে যাবার সময় গগনের পিসি স্বগতোক্তি করেন, 'ফিরলেন পটেশ্বরী গুরুসেবা সেরে।'

আর গগনের বাবা মনে মনে ভাবলো 'পটাইদি একটা ভাল তালুক বাগিয়েছে। বিনুদার দেওয়া খাই খরচা থেকেই বোধহয় পুঁটু জটাইয়ের হেঁসেল খরচটা চলে যায়।.....সে ইয়ে না থাকলে আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এমনভাবে হাসা-বদনে চালানো যায় না বাবা!'

ওদের দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে দিয়ে টর্চ জেলে জেলে ফিরে আসেন বিনয়েন্দ্র। তক্ষুনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন না।

বাড়ির সামনে রোয়াকের দু পাশের সীমেন্ট গাঁথান 'চেয়ারে'র একটায় বসেন।

কোথা থেকে যেন বেল যুঁইয়ের গন্ধ ভেসে আসছে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশের নক্ষত্রগুলো ঝিকমিক করছে, ভারী ভাল লাগছে।

ভাল লাগতে লাগতে যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন। তলিয়ে গেলেন চিন্তার গভীরে।

এই সংসারের পাওয়া না পাওয়া, হারজিত, লাভ লোকসান, সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেন একটি শান্তির সাগরে আশ্রয় পেয়েছেন।

'ভুল করেছি' একথা কোনোদিন ভাবেন না বিনয়েন্দ্রনাথ।

উচ্চপদে যখন আসীন ছিলেন, স্ত্রীর ইচ্ছার প্রাবল্যে এবং পদমর্যাদার তাল বজায় রাখতে জীবনযাত্রায় ছিল আড়ম্বর, ছিল বিলাস বহুলতা, কিন্তু সেই জীবনটা কি বিনয়েন্দ্রর নিজের জীবন ছিল?

সে জীবনে কি কোনোদিন বিনয়েন্দ্র এমন একখানি স্তব্ধ প্রকৃতির মুখোমুখি প্রকৃতিরই একাংশের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পেয়েছেন? তলিয়ে যেতে পেরেছেন আপন চিন্তার গভীরে। অথবা চিন্তাবিহীন, সুখ দুঃখে ভাল-মন্দের অনুভূতিহীন একটি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে।

সুরমাকে তিনি কোনোদিন আপন রুচির সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।.. তার জন্য বিনয়েন্দ্র কোনোদিন সুরমাকে দোষ দেন না।

মানুষ মাত্রেরই আপন রুচিমত থাকবার অধিকার আছে, বিনয়েন্দ্র এ সত্যে বিশ্বাসী।

সুরমা যদি এই অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে না পান, সুরমা যদি বাড়ি গাড়ি দাসদাসী অলঙ্কার [illegible] সার্থক জীবনের [illegible] বলে মনে করেন, বিনয়েন্দ্রর [illegible] নষ্ট। [illegible] ঠিক, সুরমার অভিযোগ বিনয়েন্দ্রর মনে অপরাধবোধ জাগায় না।

সুরমা তো কম লড়াই করেন নি। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন, বুনো রামনাথ বলে বিদ্রূপ করেছেন, পাগল বলেছেন, বুদ্ধিভ্রংশ বলেছেন, বিনয়েন্দ্র টলেন নি। ওঁর সেই কাঠ কবুল—'সভ্যতার খোলস' এঁটে আর নয়।

পড়ন্তবেলায় বালুর চড়ার ওপর বসে একটি সদ্য উন্মেষিত কিশোর মনের কাছে ওই কথাটাই বলছিলেন বিনয়েন্দ্র।

যেটাকে 'সভ্যতা' বলে গৌরব করা হয়, সেটা হচ্ছে 'সভ্যতার খোলস।' এই সব আদিবাসীদের মধ্যে যে সভ্যতাবোধ আছে, তা তোমাদের তথাকথিত সভ্য ব্যক্তিদের মধ্যে নেই। অথচ ওই খোলস আঁটা সভ্যরা অ-সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাচ্ছেন। 'সভ্যতা' নামের ওই কলঙ্কিত খোলসটা ক্রমশঃই মানুষের সব কিছু ঢেকে ফেলছে। দিনের দিন লোভ বেড়েই চলেছে মানুষের। আর লোভই হচ্ছে সকল দুর্নীতির জন্ম-দাতা।'

ছেলেটা মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিল ওই দৃঢ় প্রত্যয়ের মুখকে। সাগরের বাবাও নীতি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে, মানুষ যে ক্রমশঃই 'উচ্ছন্ন' যাচ্ছে, একথা বাবা সর্বদাই সরবে ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু বাবার মুখে এই বেদনার ছাপ নেই, এই প্রত্যয়ের ছাপ নেই।

সেই বিশ্বাস প্রত্যয়ের ছাপে উজ্জ্বল মুখটা তখনো বলে চলেছিল, 'এই সভ্যতার ধ্বংস না হলে, সমাজের কোনো উন্নতি নেই। মানুষ ক্রমেই নিজেকে লোভের পাঁকে পুঁতে ফেলে তলিয়ে যাবার সাধনা করবে।...তুমি হয়তো ভাবছো, তুমি তো একটা ছেলেমানুষ ছেলে, তোমায় এসব বলছি কেন? ভেবে দেখছি তোমাদের মত ছেলেমানুষদেরই এ সম্বন্ধে চেতনা আসা দরকার। লোভের কোনো শেষ নেই, চাহিদার সীমারেখা নেই, কতোদূরে যাবে তুমি? কতদূরে?... টাকার পাহাড় জমিয়ে তুললেও তো মানুষ—'আর দরকার নেই' বলে ছেড়ে দেবে না? দরকারটাকেই বাড়িয়ে তুলবে। সে দরকার হবেই—দেয়ালের মধ্যে পুঁতে রাখার।'

রোদ পড়ে এসে সোনালী আলোয় চারিদিক ভরে গেছে, গ্রীষ্মের নদী অনেক নীচু দিয়ে বয়ে চলেছে, তার কলধ্বনি নীরব। দূরে দূরে তিন-চার-পাঁচজনে দল বেঁধে আদিবাসী দেহাতী মজুরেরা কাজ সেরে ঘরে ফিরছে।

মজুরনীও যাচ্ছে জনা কয়েকে মিলে পরস্পরের কোমর বেষ্টন করে গান গাইতে গাইতে। ওরাও যেন এই মুক্ত প্রকৃতির এক অংশ।

বিনয়েন্দ্র যেন ক্রমশঃ নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছেন, 'সবচেয়ে ক্ষমতা-শালীরাই সবচেয়ে অসহায়, এই হচ্ছে ট্রাজেডি। কোথায় তারা অসহায় জানো? লোভের কাছে। ...তাই নিজের হাতে গড়া আইন যন্ত্রের দুর্বল স্ক্রুগুলো খুঁজে বেড়ায় যন্ত্রটা ঢিলে করে ফেলে সুবিধে করে নিতে।...নিজের হাতে বাঁধা নিয়মের বেড়ার বাঁধনগুলোকে নেংটি ইঁদুরের মত লুকিয়ে বসে কাটে, তা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু এতো যে নীচতা, এতো যে ক্ষুদ্রতা, এতো নোংরামী আর নির্লজ্জতা, এর বিনিময়ে কী পাচ্ছো তুমি?'

কী পাচ্ছো 'তুমি!'

এ আবার কী কথা!

সাগর ব্যাকুল হলেও অস্ফুট গলায় বলে 'আমি! আমি তো কিছু—'

'তুমি তো কিছু করো নি?'

এই গভীর গম্ভীর পরিবেশের মাঝ-খানে বিনয়েন্দ্রর হা হা করা হাসির আওয়াজটা যেন বেমানান লাগে।

হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'তা তুমিও যে কিছু করতে পারো না তা নয়? ইচ্ছে করলেই তুমি পরীক্ষার সময় টুকে মেরে পাশ করতে পারো। সেটা তো তোমাদের মত ছেলেদের প্রায় পেশা।'

বিনয়েন্দ্রর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

সাগর এ অপবাদটি বরদাস্ত করে নিতে পারে না। বলে ওঠে, 'আমি কক্ষণো টুকি না।'

বিনয়েন্দ্র হাসেন, 'জানি জানি। বুঝতে পেরেছি সে কথা। তাই তো তোমার কাছে বলতে বসেছি একথা। তোমরা যদি এই পচে যাওয়া পৃথিবীকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারো। আমার কি মনে হয় জানো, এই আমাদের সমাজটার যেন 'ক্যানসার' ধরেছে। শিরায় শিরায় শেকড় চালিয়ে পচ ধরাচ্ছে সে। নির্মমভাবে অপারেশনের ছুরি চালাতে পারলে তবে যদি—কিন্তু কে চালাবে? সকলের মধ্যেই যে রোগের বীজ!...

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়া হয়ে গেছে, বিনয়েন্দ্র উঠে পড়েন, বলেন, 'চলো ফেরা যাক।'

সাগর নিঃশব্দে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাগরের মনের মধ্যে কিসের যেন একটা ভার টলমল করতে থাকে। এ কী সদ্য জাগ্রত চেতনার ভার?

কিন্তু এসব কথা কি সাগর এই প্রথম শুনলো? এ তো তার জ্ঞান থেকেই শুনে আসছে। সাগরের নিজের কাকাই তো লেকচার দেয়, 'এ জাতের বারোটা বেজে গেছে। এর হাড়ে হাড়ে ঘুন, শিরায় শিরায় ক্যানসার হবে না? এযুগে যে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েই শিশু দেখতে থাকে চারিদিকে শুধু দুর্নীতি। সেই বিষের হাওয়া নিশ্বাস নিচ্ছে তো? বিষের থলিই সঞ্চয় করছে।'

সাগর হাঁ হয়ে শুনেছে।

কিন্তু তক্ষুনি কাকা চলে গেলেই বাবা বলতো, 'আর ভাঁওতা দিসনে

যবা। লোকের আর জানতে কিছু বাকি নেই। তোর যোধপুর পার্কের জমি কেনার কথা তুই যতই চাপিস, আমার জানা হয়ে গেছে।'

এসব কথার মানে আগে আগে বুঝতে পারতো না সাগর। এখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের আলো-আঁধারিতে কাকাকে আর তেমন আপন মানুষ মনে হয় না।

স্কুলের ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাসও তো বলে।

আরো উগ্রভাবে, আরো কড়া করে বলে।

বলে, এই পচা গলা সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে শুভ-বুদ্ধির ঘৃত প্রদীপ জ্বেলে নয়, রামধুন গাইয়ে নয়, আর সাম্যবাদের বুলি কপচে নয়, গড়তে হবে বেতিয়ে গায়ের চামড়া তুলে। নেহরু বলেছিল, ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে বেত মারবে, যা বলেছিল করে নি, আমরা করবো। যেখানে যত চোরা-কারবারি আর কালোবাজারী আছে, যত ভণ্ড বাবা মহারাজ আছে, যত ছদ্মবেশী 'সমাজসেবী' আর 'মানবদরদী' আছে, তাদের খোলস ছাড়িয়ে ফেলে ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে, শুধু চাবুক। আইনের দ্বারা কিছু হবে না। যেই রক্ষক, সেই ভক্ষক, কাজ হবে স্রেফ চাবুকে।'

বলতে বলতে অনিল বিশ্বাসের মুখটা কঠিন কুৎসিত হয়ে যায়, অনিল বিশ্বাসের মুখের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে, আর সেই রেখায় রেখায় উপচে ওঠে শুধু ঘৃণার জ্বালা।

অনিল বিশ্বাসের মুখে কোনোদিন এমন গভীর বেদনাবিদ্ধ ভাব দেখেনি সাগর।

বিনয়েন্দ্র চলতে চলতে তেমনি আত্ম-মগ্নভাবেই বলেন, ভেবে ভারী বিস্ময় লাগে, আকাশের এই উদার অপার মহিমা-ময় সৌন্দর্য যা প্রতিক্ষণে রূপ আর রং বদলে বদলে মনকে উপলব্ধির একটা অনির্বচনীয় লোকে পৌঁছে দেয়, এ কি কোনোদিন ওদের চোখে পড়ে না? ওদের কি একবারও মনে হয় না 'এখানে আমরা মানুষেরা কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, কতো ক্ষণকালের!' .. তাই 'আমি চিরকালের, এ পৃথিবী সব ধ্বংস হয় হোক, আমি অমর অবিনশ্বর' এই অহংকারে ভরপুর হয়ে শিশুর খাদ্যে ভেজাল দেয়, রোগীর ওষুধে ভেজাল দেয় আর অবোধ মানুষগুলোকে হাতিয়ার করে তোলবার জন্যে তাদের আত্মাকে কিনে ফেলে তার মধ্যে ভেজালের কারবার চালায়। অথচ দেখো এই অবাধ খুনের ব্যবসা চলে আসছে, চলছে। আর মজা এই, দেশে বড় বড় পণ্ডিত আছেন, চিন্তাশীল আছেন সমাজবিজ্ঞানী আছেন। এঁরা [illegible] দেখেন না কী আত্মঘাতী পথ ধরেছি আমরা। শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে আর মানুষের মধ্যেকার পশুটাকে নিয়ে উন্মাদ খেলায় মেতেছি আমরা।... লক্ষ্যটা কী? ক্ষমতা, আর টাকা। দুষ্প্রবৃত্তিকে জোগাবার ইন্ধন।'

সাগরের মনে হয়, ওই মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। সাগরও কি হারিয়ে যাবে?

একটুক্ষণ পরে চুপ হয়ে যান বিনয়েন্দ্র আর যখন তারা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা সমান রাস্তায় এসে পড়ে বিনয়েন্দ্র হঠাৎ সাগরের পিঠে একটা থাবড়া বসিয়ে বলেন 'কী হে নাতি সাহেব, খুব ঘাবড়ে গেছিস তো? ভাব-ছিস আচ্ছা এক পাগলা বুড়োর খপ্পরে পড়েছি!'

সাগর বেশী কথা বলতে পারে না, শুধু বলে, 'ধ্যাৎ'

বিনয়েন্দ্র হেসে বলেন, 'তাহলে বলতে হবে তুই খুব সাহসী। ঘাবড়া-বারই তো কথা। বুড়োটা তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে সাঁওতালি বস্তিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো, কতক-গুলো গণ্ডমূর্খ আদিবাসীর বাৎচিৎ শোনালো, আর তারপর নদীর চড়ায় টেনে এনে একা কব্জায় পেয়ে লেকচার ঝাড়তে বসলো! কে না ঘাবড়াবে?'

সাগর এবার সাহস সংগ্রহ করে।

সাগর বেশ সতেজে প্রতিবাদ করে, 'আমি মোটেই ঘাবড়াইনি।'

'ঘাবড়াসনি? তবু ভাল। সেদিন কিন্তু 'নিশির ডাকে' আচ্ছা ঘাবড়েছিলি। কী বলিস? আসলে কী জানিস? 'কুসংস্কার' জিনিসটা মানুষের মৌল উপকরণ, ওটা একেবারে গভীরে থাকে হয়তো, কিন্তু পুরো মাত্রায় আছে। অপর কারো মূঢ়তা আর কুসংস্কারের অন্ধ বিশ্বাস যদি সেখানটায় গিয়ে ধাক্কা মারে, চেতনার গভীর স্তর থেকে উঠে আসে সেই আদিম চেতনা। যার একমাত্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়।... কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলে চিনতে শিখলে ভয় কমে যায়।... তোকে এতো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন জানিস? দেখলাম তোর মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হচ্ছে সরলতা, আর বিশ্বাস। তোর মতন একটা সাকরেদ পেতে ইচ্ছে করে বুঝলি? মনে হয় মনের মধ্যে যে সব কথা ওঠে, কাউকে বুঝি বলে যেতে হবে।'

সাগর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মত একটা কথা বলে বসে। বলে, 'আপনি তো খুব বড় চাকরী করতেন, সাহেবের মত শৌখিন ভাবে থাকতেন, এইভাবে থাকতে আপনার ভাল লাগে?'

একটা প্রাণখোলা উদাত্ত হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির গায়ে। সে শব্দ বাতাসে তরঙ্গিত হতে থাকে অনেকক্ষণ।

বিনয়েন্দ্র আবার একটি থাবড়া মারেন ওর পিঠে, বলেন, 'আমায় দেখে কী মনে হয় তোর? ভাল লাগে না?'

না তাতো মনে হয় না।

ওঁকে দেখলে তো সাগরের মনে হয় একটি আনন্দের মূর্তি, কীসের এই আনন্দ? কোথা থেকে আসে এই ভাল লাগা? ভাল লাগবার উপকরণটা কী? .. সকালবেলা ওই গামবুট আর তাল-পাতার হ্যাট পরে চাষাদের মত মাঠে কাদায় ঘুরে কাজ করা, (যেখানে রাজ্যের ব্যাং কেঁচো কেন্নো ঘুরে বেড়ায়, সাপ থাকাও আশ্চর্য নয়), দুপুরে চাষী-টাষীদের মতই পুকুরে ডুবে চান করা (যা সাগরের এই দিদিমাদের বাড়িতে কেউই করে না, পুকুরের জল কেউ ছোঁয়ই না, টিউবওয়েলেই সব করে), তারপর কে যেন দয়া করে একটু রেঁধে দিয়ে যায় তাই খাওয়া, আর বিকেলে মাইল মাইল হেঁটে আদিবাসী, দেহাতী, আর সাঁওতাল বস্তিতে বসে ঘুরে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা, তাদের বিনি পয়সায় ওষুধ দেওয়া, আর রাত্তিরে ফিরে সেই কার যেন দিয়ে যাওয়া একটু রুটি তরকারি খেয়ে শুয়ে পড়া। এই তো অবস্থা। এ জীবন কী করে ভাল লাগে? সত্যি চাষীদেরই তো ভাল লাগে না, তারা তাদের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠায়, যাতে তারাও ভবিষ্যতে এই মাঠে কাদায় কাজ না করে ভাল কাজ করতে পায়। অথচ উনি—

এই ভাল লাগার উৎসটা কী ভাবতে থাকে সাগর।

সাগরের মা যে বলে, 'সাগর হচ্ছে ভাবুক ভাবুক ওর দাদার মত লেখা-পড়ায় অতো চৌকস নয়, সেটা ঠিক।

সাগরের মনের কাছে যা কিছু নতুন আসে, সাগরের মধ্যে তার তরঙ্গ ওঠে। সাগর ভাবতে বসে তার কার্যকারণ। সাগরের মনে বড় সহজে নাড়া পড়ে।

সাহেব দাদু ওকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেবার পরে সাগর ভাবতেই থাকে।

চিনু খেতে দিয়ে ডেকে ডেকে তেড়ে আসে, 'এখানে এসে যে দেখছি সাপের পাঁচটা পা দেখেছিস। বেরিয়েছিস তো একেবারে পাঁচ ঘণ্টার মত। আজ আবার কোন নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?'

সাগর বিরক্ত চোখে তাকায়, 'যা ইচ্ছে বল কেন? সাহেব দাদুর সঙ্গে গিয়ে-ছিলাম।'

'ওমা তাই বুঝি? বলতে হয় সেকথা?' চিনু মরমে মরে যায়, 'ওনার সঙ্গে যে যতটুকু থাকতে পারে, তার লাভ। অমন মানুষটাকে আপন লোকেরা বুঝলো না।'

সাগর জোরালো গলায় বললো, 'তোমরা তো বোঝো।'

'আমরা বুঝলে আর কী হবে?' চিনু হতাশ নিশ্বাস ফেলে, 'আপন লোকেরা না বুঝলে?'

'আসল নকল বলে কিছু নেই—' সাগর ঘোষণার মত করে বলে, 'সাহেব

বাপু বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক জন্মগত সম্পর্ক, এই দিয়ে আপন পরের হিসেব হয় না। রুচি প্রকৃতির মিল অমিলই আপন পরের হিসেব। তুমি আমায় বুঝতে পারছো তুমি আমার আপন আত্মীয়, তুমি আমায় বুঝতে পারলে না, তুমি আমার পর।'

'ওমা!'

চিনু গালে হাত দেয়, 'এতো কথা হয়েছেন তোর সঙ্গে?'

'শুধু এই কথা?'

সাগর গভীর গলায় বলে, 'আরো কত কথা।'

বলেই সাবধান হয়ে যায় সাগর, আর বেশী বললেই হয়তো মা মাদুর পেতে বসে বলবে 'বোস শুনি কী কী বলেছেন?'

ভোলামামার কাছে গল্প টল্প শুনে এলে, মা ওই রকম বিপদে ফেলতো তো সাগরকে। বলতো 'বল শুনি, কী গল্প বললো তোদের ভোলামামা।'

সাগরের ভাগ্যে তখন সাগরের দাদা এসে ঢুকলো। বললো, মা কী করছো? আম কাটছো? আর বাকে দেবে দাও, আমার দিও না।'

'ওমা, সে কী? এই এতো ভালবেসে খাচ্ছিল?'

'সেই তো! ভালবাসার ফল ফেরেছে। আম খেয়ে খেয়ে এই কদিনেই ফুঁড়ি হয়ে গেল। আর একটুকরোও না।'

দিদিমা রান্নাঘরের কোণে তোলা উনুনে জেবলে পরোটা ভাজছিলেন। এটা তাঁর নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট, অপর কারো স্পর্শের অধিকার নেই। নিজেই বেলছেন, নিজেই ভাজছেন। সাগরের মা গিয়ে একটা থালা পাতছে, দিদিমা তার উপর গরম পরোটা ফেলে ফেলে দিচ্ছেন। তরকারি রান্না করা আছে, মাছের তরকারি। দিদিমা দুপুরে স্নানের আগে রেঁধে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। মেয়েকে করতে দেন না, বলেন, 'তুই এই কদিনের জন্যে এসেছিস, আর রেঁধে খাবি? পাগল না ক্ষ্যাপা!...তোর দাদুর জন্যে নিয়ম করে করতে হয় না আমার? তোর ঠাকুমার তবু একবেলা না হলে চলে, দাদুর চলে না।'

কিন্তু এই নিত্য নিয়মিত জোগানটি কে দেয়? এসব জায়গায় ঠিক নিয়মিত জোগানের বাজার নেই। একদিন খুব এলো তো, দুদিন এলোই না। তাহলে?

আর কে জোগান দেবে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অরুণেন্দু ছাড়া?

যেখান থেকে হোক দেবেনই এনে। তাও দিদিমা খুঁৎ-খুঁতুনী করতে ছাড়েন না।

'এতো কাঁটা মাছ আনলে? জানোই তো খাবার মধ্যে দুটি বুড়োবুড়ি!'

অথচ একদিনও এমন কথা বলতে শোনেন না, 'আজ মাছটা বেশ ভাল আছে, গবগবে করে বেঁধেছি, তুমি দুখানা খেয়ে যাও।'

চিনু বলেছিল ক'দিন, 'অরুণকাকা, এতো করেন, ওঁকে তো এক-আধদিন খেতে বলতে পারো মা! বৌ-মরা মানুষ, মেয়েটা কী রাঁধে কী খাওয়ায় ভগবানই জানেন।'

দিদিমা দিব্যি হেসে হেসে বলেন, 'আর আমিও জানি। রোজ মুসুর ডাল, রোজ আলু ভাতে, রোজ একটা করে আগড়ুম বাগড়ুম চচ্চড়ি।'

'আহা মা গো! তবে তো মাঝে মাঝে—'

দিদিমা তেমনি নির্মায়িক গলায় বলেন, 'মাঝে মাঝে একদিন ওর দুঃখ ঘুচবে? সবাই তো বলেছিল তখন, কে তোমার সংসার দেখবে, আর একটা বিয়ে কর, তা শুনলো?'

সাগর গল্পের বই পড়তে পড়তেও শুনতে পাচ্ছিল সব কথা। সাগর বলে উঠেছিল, 'আহা, তাহলেই তো ওই লতুর মত সৎমা আসবে বাড়িতে। খুব ভাল বুঝি?'

দিদিমা মৃন্ময়ী দেবী সকৌতুকে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'লতুর বাবার পক্ষে খুব কিছু খারাপ হয়নি।'

'একজনের ভাল হলেই হবে?'

'সবাইয়ের ভাল আবার কোন ব্যবস্থায় হয়রে সাগর? কথামালায় গল্প পড়িসনি?'

ওই সব কথায় নেমন্তন্নর কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল, চিন্ময়ীই আবার তুললো, 'তা বলতে গেলে অরুণকাকা মহত্ত্বই করেছিলেন, জন্মরুগ্ন বৌকে কেবল সেবাযত্নই করে মরেছেন, তবু তিনি মারা যেতে বিয়েটিয়ে করলেন না। পঞ্চাশ বছরেও লোকে বিয়ে করে। তবু যাই হোক আপনার লোকেদের উচিত একটু যত্নআত্তি করা। উনি যখন এমন প্রাণ দিয়ে করছেন।'

মৃন্ময়ী চাকি-বেলুনে ঠকঠাকরে শব্দ তুলে হেসে হেসে বলেন, 'তা তোর ইচ্ছে হয়, তুই কর নেমন্তন্ন? বলবো চিনু গিন্নীবান্নী হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, চিনুর সাধ—'

'তা তাই ভালো।'

'কিন্তু অরুণেন্দুর আর সে আদরযত্ন নেবার ফুরসৎই হয় না। কেবলই বলেন, 'হবে হবে, একদিন হবে, তুই তো আছিস এখনো।'

মৃন্ময়ী দেবী বলেন, 'বাদ দে ওর কথা' ও ওই রকমই। তোদের খুড়ি তো ছিল জন্মরুগ্ন, যত্ন-সেবা করেই মরেছে, যত্নের স্বাদ নিজে তো কখনো পায়নি, বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর তো বৌ মরে গিয়ে আরো মহাপুরুষ বনে গেছে।'

'তা রান্নাটান্না তো নিজেও একটু দেখতে পারেন।'

'সে ক্ষ্যামতাই কি আছে না কি? তাহলে রাজ্যিসুদ্ধু লোকের ব্যাগার খাটবে কে? বাঁধে ওই পুঁটকে মেয়েটা।'

চিনু দুঃখের গলায় বলে, 'অথচ বলতে গেলে এ-বাড়িরই লোক।'

অর্থাৎ এ-বাড়িতে থাকতে বলাটা উচিতের পর্যায়েই পড়তো।

মৃন্ময়ী সেটা অনুধাবন করেই বোধহয় বলেন, 'হ্যাঁ, ওনার ঠাকুর্দা আর আমার দাদাশ্বশুর তো সহোদর ভাই ছিলেন। তবে মুখ দেখাদেখিটা বন্ধ ছিল দুই ভাইয়ে, সেটা আমরাই শুনেছি।'

'তা বাপু আর একটু বেশী খুললেই হয়—' চিনু হেসে ওঠে, 'সংসার বলতে তো কাকা আর বারোতেরো বছরের মেয়েটা।'

'থাকসনে চিনু। খাল কেটে কুমীর আনার শখ আমার নেই।'

চিনু মনে মনে ভাবে, মা এদিকে এতো উদার, অথচ ওই জ্ঞাতির ব্যাপারে বাপু বড় সংকীর্ণচিত্ত। তারপর বলে, 'মেয়েটা কিন্তু কক্ষনো আসে না। মা-মরা মেয়ে! সরকারদের মেয়েটা পিসির আদরে তবু আছে ভাল। পাড়া বেড়িয়েই বেড়ায়। ক'দিন কিন্তু আর আসছে না।'

মৃন্ময়ী দেবী কৌটো থেকে জলভেজা বার করে নাতিদের পাতে আলগোছে ফেলে দিতে দিতে বলেন, 'সরকারদের লতুর কথা বলছিস? তার তো অসুখ।'

'অসুখ! কী অসুখ?'

'কি জানি ওর পিসি কোন্খান থেকে নাকি কিসের শেকড় আনতে যাচ্ছে, বললো নিজে থেকেই, 'লতুর যে কী হয়েছে, রাতদিন মাথায় যন্ত্রণা, তাই কী নাকি শেকড় বেটে রগে লাগাবে—'

'জ্বর আছে?'

'না, জ্বর হয়নি। তাহলে তো মাথার যন্ত্রণার মানে পাওয়া যেতো। কেবল শুয়ে আছে, বলে মাথা তুলতে পারছি না।'

প্রবাল গম্ভীরভাবে গেলাসের জলটা শেষ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'তার মানে চোখ খারাপ হয়েছে, চশমা দরকার হবে।'

মা ছেলের চিকিৎসাবিদ্যার পরিচয়ে বিন্দুমাত্র বিগলিত না হয়ে বলে উঠলো, 'সত্যি করেই একটুও আম খেলি না? কী রে তুই!'

'বললাম তো খাব না—'

'আরে বাবা! উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে—'

'আমি মহৎ ব্যক্তি মা—'

মা রুক্ষ গলায় বলে, 'এতো আম! তোদের জন্যে এবার তোদের দিদিমা আম-বাগানের সব জমা ধরালেন। আর এই ক'দিন খেয়েই হয়ে গেল তোর?

লতু মেয়েটা যখন-তখন আসছিল, এলেই আম কেটে বসিয়ে খাওয়াতাম, আহা, মা-মরা মেয়েটা। তা সেও তো আসছে না—'

সাগরের মার সকলের প্রতিই 'আহা।'

এতোক্ষণ সাহেব দাদুর ভাবী ভাবী কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল, তার উপর আর একটা ঢেউ এসে পড়লো।

লতু।

লতু মাথার যন্ত্রণায়— ছটফট করে আজ তিন-চারদিন বাড়িতে পড়ে আছে, আর সাগরের সেটা খেয়ালই হয়নি? ভাবছে না যে অতো আসতো, সে আসছে না কেন? সাগর অন্য চিন্তা নিয়েই মত্ত থেকেছে।...

সাগর খেয়ে গিয়ে শুয়ে না পড়ে সেই জানলাটার দাঁড়ালো গাল চেপে। ...সাগর কি নীচের সেই মাঠটার দিকে তাকিয়ে আছে? যেখানে সকালবেলা সেই ক্ষ্যাপা চেহারার লোকটা বেড়ায়।

না কি সাগর নিজের মনের মধ্যেটাই দেখছে লোহার শিকে গাল চেপে।

প্রথম দিকে তো লতুকে দেখেই গা জ্বালা করেছিল সাগরের। যেদিন লতুর পিছন পিছন চলে গিয়েছিল প্রায় মন্ত্রাহতের মত, সেদিনও তো লতুর ওপর মায়াটায়া জাগেনি, বরং লতুকে নিজের থেকে বড়ই মনে হয়েছে।

তবে আজই হঠাৎ লতুর কথা ভেবে এমন মায়া হচ্ছে কেন? কেন এমন মন কেমন কেমন করছে? কেন মনে হচ্ছে ইস্ যদি এখন রাত্তির বেলা না হয়ে দিনের বেলা হতো!...

দিনের বেলা হলে সাগর ঠিক টুক করে বেরিয়ে গিয়ে সরকারদের বাড়ির সেই দাওয়ার ওপরকার জানালাটা দিয়ে ডাকতো, 'লতুদি!'

যদিও এখন আর লতুকে নিজের থেকে বড় মনে হচ্ছে না সাগরের, মায়ের মত তারও মনের মধ্যে ওই শব্দটাই ধাক্কা দিচ্ছে 'আহা, মা-মরা মেয়েটা!'

মায়ের ওই 'আহা'টিই কি লতুকে সাগরের কাছে ছেলেমানুষ করে দিল? তবুও সাগর 'লতুদি' বলেই ডেকে উঠবে।

সাগরের মনে হল সেটাই সভ্যতা।

সাগরের কেন হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা বোধশক্তির উন্মেষ হচ্ছে। সাগর হয়তো ক'দিন আগেও ওই সভ্যতার ধারণায় চিন্তা করতে পারতো না। সাগরের মনের মধ্যে কোনও মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ভাল দেখানো না-দেখানোর প্রশ্ন জাগা এই প্রথম।

কিন্তু সাগরের কেন লতুর কথা মনে পড়লেই সেই ফণা তোলা সাপের মত চুল ওড়ানো হাঁপিয়ে ছুটে আসা মূর্তিটাই চোখে ভেসে ওঠে? সাগর তো আরো অনেক রকম চেহারাতেই দেখেছে লতুকে।

নীচের তলায় দালানে বসে মায়ের সঙ্গে বকবকাতে দেখেছে, বসে বসে পরিতোষ করে আম খেতে দেখেছে, গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে দিদিমার ঠাকুরঘরের ফুল এনে দিতে দেখেছে, দিদিমার রান্নাঘরের মোচা ছাড়িয়ে দিতে দেখেছে, দেখেছে শাক বেছে দিতে।

লতুকে রাস্তায় হেঁটে যেতেও দেখেছে হনহনিয়ে। একদিন তো দেখলো লতু একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ঘাড়ে করে চলেছে।

সাগর দোতলার জানলা থেকে চেঁচালো, 'গাছ কী হবে?'

লতু ঠিক শুনতে পেল না। এদিক-ওদিক চেয়ে চলে গেল।

সাগর যদি 'লতুদি' কি 'লতু' বলে ডাক দিতো, নিশ্চয় শুনতে পেতো। নিজের নামটা লোকে ঠিকই শুনতে পায়, ঘুমের ঘোরেও পায়। তা নইলে কেন? সাগর নিজের মনের গালে নিজেই একটা থাপ্পড় মেরেছিল।

আবার সেই নিশির ডাকের চিন্তা!

তোর কী হল সাগর?

কিন্তু তারপর কী আর লতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাগরের? তাই জিগ্যেস করবে, 'লতু অত ভারী একটা গাছের ডাল ঘাড়ে করে যাচ্ছিলে কোথায়?

সকাল হলেই সাগর লতুকে দেখতে যাবে আর বলবে, 'লতু সাহেব দাদুর মত মানুষের কাছাকাছি থেকেও তুমি এখনো এতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন? জানো কুসংস্কারই ভয়ের জনক। আর বলবে, 'হঠাৎ 'কী হলো তোমার? মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারছো না?'

ভাবনার সাগরে তলিয়ে যেতে যেতে সাগর কতো রাত্তিরে যেন ঘুমোলো।

হয়তো আর কয়েকটা বছর পরেই সাগর তার এই সরল আগ্রহী আর বিশ্বাসী মনটাকে হারিয়ে ফেলবে। সাগর তার আজকের দিনের ভাবনা ভেবে হেসে উঠবে। করুণা করবে এই বোকা ছেলেটাকে, বলবে, 'ওহে বালক ওইসব আদর্শবাদের বুলি আউড়ে আউড়েই আমাদের পূর্বতনেরা দেশটাকে পঙ্গু করে রেখেছেন। আকাশ! বাতাস! আলো মাটি! ওসব কথা কবিতাতেই মানায়। অথবা মানাতো। ওরা বাঁচতে জানতো না জানতো মরতে। তাই বাঁচার শিক্ষা দিত না, মরার শিক্ষাটা দিত!'

হবেই এসব।

বয়ঃসন্ধির বারান্দাটা পার হয়ে গিয়ে কঠিন জমিতে পা ফেললেই তার। এখন এ-বয়সে সব কথা নতুন লাগে সব রং আশ্চর্য লাগে।

এখন শুধু বিস্ময়!

এখন সাধারণই অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়।

একটি মেয়ের হাসি কথা হাত-মুখ নাড়া চোখের পাতা ফেলা, এর মধ্যে যে এমন এক অলৌকিক আকর্ষণ লুকনো থাকতে পারে সে-কথা কি জানা যায় এ-বয়সের আগে?

ভাললাগা যে এমন ভয়ের বস্তু, তাই বা কে টের পায় এ-বয়সে পা না ফেললে?

সাগর যেই অনুভব করছে লতুকে তার ভাল লাগছে, লতুর কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে, সেই ভয় ভর করছে সাগরের। অন্য এক ধরনের ভয়, অপরাধবোধের মত কেমন একরকম ভয়।

এই ভয়ই বুঝি অপরাধের জনক।

সাগর যখন লতুদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে, তখন প্রবালকে দেখতে পেল। প্রবালকে এখানের পাড়ার ছেলেরা তাদের পকেট সংস্করণ লাইব্রেরীটিতে একবার পদার্পণ করতে বলেছে, কারণ প্রবালকে তারা একজন মহার্ঘি ঠাউরেছে।

প্রবাল নাকি আশ্বাস দিয়েছে সে কলকাতায় ফিরে কিছু বই জোগাড় করে পাঠিয়ে দেবে। অতএব প্রবাল এখন তাদের চোখে হীরো। ওদেরই দু'জন প্রবালকে লাইব্রেরীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

সাগরকে দেখতে পেল প্রবাল, প্রবালকে সাগর। সাগর সঙ্গে সঙ্গে গতিপথ বদলালো। সরকারদের বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

প্রবাল ডেকে বললো, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'সাহেব দাদুর বাড়ি।'

'উনি তো এখন মাঠে।'

সাগর গোঁজামিল করে কী একটা বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। সাগর সাহেব দাদুর বাড়ির কাছ পর্যন্তই চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সাগর আস্তে ফিরে এল, সেই রোয়াকটার ধারে দাঁড়ালো। কিন্তু ওর ওপর উঠে জানলায় মুখ দিয়ে লতুদি বলে ডাকা?

ও বাবা! অসম্ভব!

অথচ রাত্রে কত সহজ আর সম্ভবই মনে হচ্ছিল। তখন শুধু মনে হচ্ছিল, সকালটা হওয়ার ওয়াস্তা।

নাঃ ফিরেই যেতে হবে সাগরকে।

অথচ একটুখানি উঠে গিয়ে ওই খোলা জানলাটায় দাঁড়ালেই দেখা যাবে লতু শুয়ে আছে। মাথার যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না লতু। তবু সাগর যখন 'লতুদি' বলে ডেকে উঠবে, তখন নিশ্চয় লতু চোখ খুলে দেখবে, লতু

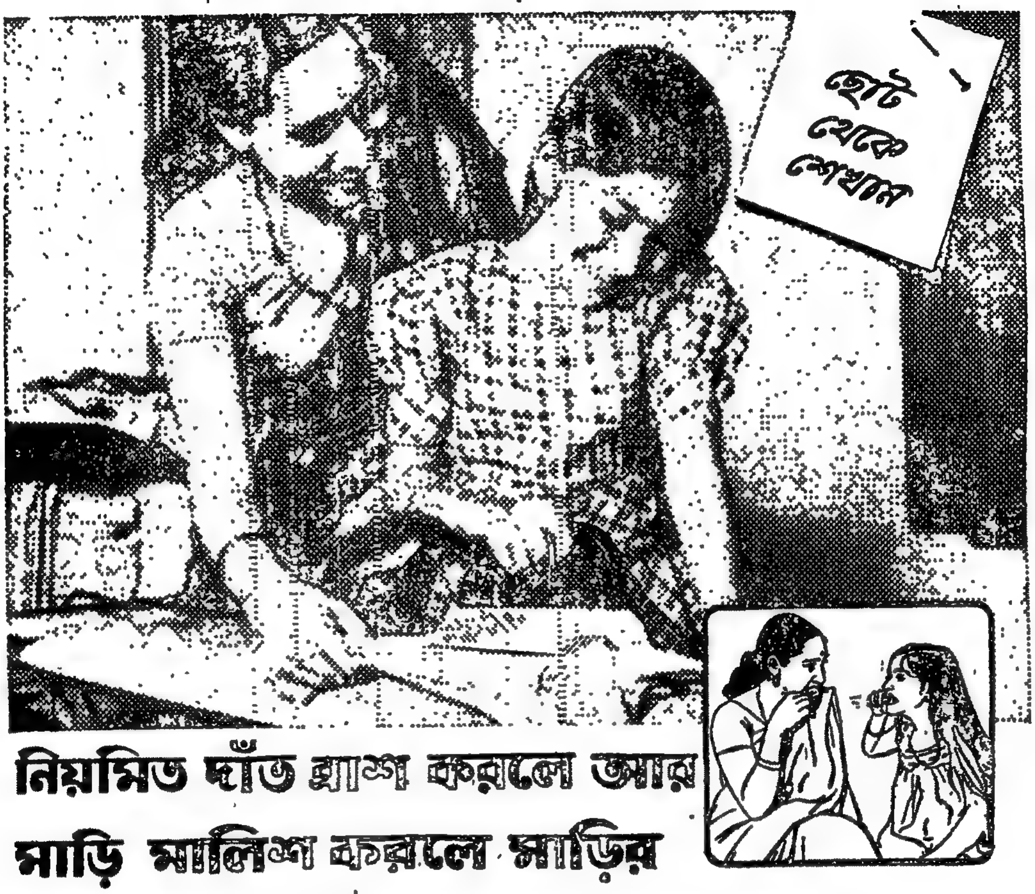

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করালে আর মাড়ি মালিশ করালে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, মাড়ি মজবুত ও সুস্থ রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হল নিয়মিত মাড়ি মালিশ করা। আর, দাঁতের ক্ষয় রোধ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল নিয়মিত রোজ রাত্রে ও সকালে এবং প্রতিবার খাবার পর দাঁত ব্রাশ করা, যাতে ক্ষয় সৃষ্টিকারী সমস্ত খাবারের কুচি বেরিয়ে গিয়ে দাঁত পরিষ্কার হয়ে যায়।

আপনার ছেলেমেয়েদের নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে শেখান : এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর মাড়ি মালিশ করবার জন্যে ফরহ্যান্স ডবল্ অ্যাক্শন্ জুনিয়র টুথব্রাশ দিয়ে।

যত তাড়াতাড়ি ফরহ্যান্স দিয়ে দাঁতের যত্ন নিতে শেখাবেন ততই ভালো

ফরহ্যান্স
টুথপেষ্ট
এক দাঁতের
ডাক্তারের তৈরী

বিনামূল্যে! তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা*: "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" ডাক খরচ বাবদ ২০ পয়সার ডাকটিকিটসহ এই কুপন নিচের ঠিকানায় পাঠান: ম্যানার্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরি ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই-১।

নাম ______________________ বয়েস __________

ঠিকানা ______________________________

*অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরেজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, উর্দু, বাংলা, অসমীয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী। A7P

114 F-203 R-BN

উঠে চলে আসবে। বলবে, 'ওমা, সাগর তুই?'

তা সাগরের ভাগ্যটা আজ সকালটার জন্যে অন্ততঃ সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল, তাই সাগর তার পিছন থেকে সেই একান্ত প্রার্থিত ধ্বনিটা শুনতে পেল, 'ওমা, সাগর তুই এখানে দাঁড়িয়ে?'

'না, না বাড়ির মধ্যে নয়, আয় আমরা ওই লেবুতলায় বসিগে।'

বড় বড় বাতাবী লেবুর গাছে ভর্তি জায়গাটার তলার জমি যেন নিকোনো পরিষ্কার।

'পিসি এখানে ধান শুকোতে দেয়।'

বললো লতু।

তারপর সাগরের হাত ধরে টানলো 'আয় এদিকে একটা জিনিস দেখাই—'

আচ্ছা এর আগেও কি সাগরের হাত ধরেনি লতু? সেই প্রথম দিনেই তো পেয়ারা দিতে এসে হাত ধরে টেনেছিল, 'দূর, এখন বসে বসে মহাভারত পড়ছে। যত শুয়ে থাকবি ততই পায়ের ব্যথা কমতে দেরী হবে।"

কিন্তু সেদিন স্রেফ রাগে হাড় জ্বলে গিয়েছিল। আজ অন্যরকম। আজ সাগরের সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুতের চমক লাগলো। সাগর অস্ফুটে বললো, 'কী?'

'চল না দেখাচ্ছি।'

লতু ওকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলা দেখালো।

'এই যে লেপনকরা জায়গাটা দেখছিস? এইখানে আমার খেলাঘর ছিল। এই যে এই ক্ষুদে উনুন দুটো এখনো তার সাক্ষী। দেখলে এখনো মনটা কেমন কেমন করে জানিস।'

সাগরের আর জানার অবস্থা।

সাগরকে সেই ভয় চেপে ধরছে।

সাগর বলে ওঠে, 'সেদিন তুমি একটা গাছের ডাল ঘাড়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে লতু?'

'নাঃ, তুই আর আমায় দিদি বলতে পারলি না। গাছের ডাল নিয়ে আবার কোথায় যাবো? কবে রে?'

'সেই যে সেদিন। যেদিন সেই কালীবাড়িতে নিয়ে গেলে—তার পরের দিন।'

'তার পরের দিন। তার পরের দিন। ..ওঃ ওঃ। আর বলিস না, পিসির কী এক শিবপুজোর ঘটা, একশো আট চক্কর ছাড়া ত্রিপত্র বিল্বপত্র চাই কে যাবা খুঁজে খুঁজে আনবে? গগনকে দিয়ে একটা ডাল কাটিয়ে—'

'গগন? কে?'

'তোদের মামাদেরই কোনো জ্ঞাতি বাবা। এই ফুলঝাঁটিতে তো সবই তোদের বামুনের ঝাড। আমরাই আছি অভাগা কায়স্থ—'

সাগর আড়ষ্ট হয়ে বলে, 'তোমরা বামুন নয়?'

'এই দ্যাখো বুদ্ধুর কথা। আমরা সরকার না?'

'সরকার হলে বামুন হয় না?'

'উঃ তোকে নিয়ে কী করবো সাগর? তোর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লি। তা আমার সেই গাছের ডাল ঘাড়ে করে যাওয়াটা তোর মনে পড়লো যে?

'এমনি।'

'দেখ না গোঁয়ার্তুমীর ফলও ফলেছিল', লতু তার হাতটা তুলে দেখায়, 'বেলের কাঁটা লেগে একেবারে ক্ষতবিক্ষত।'

লতু তার ডান হাতটা বিছিয়ে ধরে সাগরের সামনে।

লতুর ফর্সা ফর্সা নিটোল হৃষ্টপুষ্ট হাতের ওপর কাঁটার খোঁচাগুলো সত্যিই দেখতে কষ্টকর।

সাগর বলে ওঠে, 'ইস!'

'পিসির কাছে বকুনিও খেয়েছি তেমনি।'

সাগরের ইচ্ছে হয় ওই হাতটায় একটু হাত বুলিয়ে নেয়, সাহসে কুলোয় না।

সাগর আস্তে বলে, 'তোমার খুব মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল? তিন-চার দিন ধরে?'

লতু হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, মুখটা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'মাথার যন্ত্রণা হয়নি, আমার দুঃখু হয়েছিল, তাই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

'দুঃখু!'

'হুঁ।'

সাগর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তোমার পিসিমা বকেছিলেন বুঝি?'

'দূর। পিসির বকুনি আমি এক কান দিয়ে ঢোকাই এক কান দিয়ে বার করি। ..'

'তবে?'

সাগর সাবধানে লতুর দিকে তাকায়।

'তুই যা কাণ্ড করলি সেদিন। সেইজন্যেই না অত অপমান জুটলো আমার ভাগ্যে।...অথচ আমি ভাবতে ভাবতে গিয়েছিলাম মাকালীর কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার প্রার্থনা জানাবো। তা নয় সব গুবলেট। দর্শন পর্যন্ত হলো না।'

সাগরের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

তবু সাগরের মনের মধ্যে ঢেউ আছড়ায়।

কী মনোবাঞ্ছা ছিল লতুর?

যা সে মা কালীকে জানাতে গিয়েছিল।

কিন্তু সেকথা কী সাহস করে জিগ্যেস করা যায়?

অথচ বোকার মত এই লেবু গাছতলায় চুপ করে বসে থাকাও তো অস্বস্তিকর।

সাগর বলে ফেলে, 'তাতে তোমার অপমান হবে কেন?'

'তা' সেটাই তো কারণ। তোকে ভয় দেখিয়েছি বলে তোর দাদা আমায় যাচ্ছেতাই করলো না?'

লতুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

এ এক ভয়ানক পরীক্ষা!

যে লতু হি হি করেই আছে, তার চোখে জল!...

সাগর একটা যুবক পুরুষ নয় যে, সেই পুরুষের সাহস নিয়ে ওই জলভরা চোখ মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলতে পারবে 'এই লতু কাঁদে না—ছি!'

সাগর একটা বালক নয় যে সেই বালকের সরল সাহস নিয়ে ওর হাত ধরে বললে, 'এমা লতুদি কাঁদছো কেন শুধু শুধু?'

সাগরের বয়েসটা যেন দু নৌকোয় পা দিয়ে টলমল করছে। সাগর তাই প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তবু সাগর ভয়ানক একটা দুঃসাহস করে বসলো। সাগর লতুর কাঁধটা একটু ছুঁয়ে বললো, 'দাদার কথায় কিছু মনে কোরো না লতু, দাদা ওই রকম নিষ্ঠুর।'

'তুইতো দাদার হয়ে ওকালতি করতেই আছিস। আমি আর কক্ষণো তোদের বাড়ি যাবো না।'

সাগর বলে, 'আমরা তো আর ক'দিন পরেই চলে যাবো, দাদা তার আগেই যাবে।'

লতু চমকে ওঠে।

বলে, 'তার আগেই যাবে।'

লতুর চমকানিটা যেন দশকারের তুলনায় অনেক বেশী মনে হয়।

লতু আবার বললো, 'আগে যাবে কেন?'

'কবে পরীক্ষা হবে জানতে পারছে না, বাবার চিঠিপত্র আসছে না—'

লতু হঠাৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলে, 'চলে যে যাবে, তা তোরা কার সঙ্গে যাবি?'

'আমরা? আমি আর মা তো? কার সঙ্গে আবার যাবো? আমরা যেতে পারবো না?'

লতু সেই জল জল চোখেই হেসে ওঠে, 'চিনু পিসি তো ভীতুর রাজা। আর তুই? হি হি! তুই যা ছেলে—হি-হি।'

তুই যা ছেলে!

এবার অপমানের পালা সাগরের। সাগর উঠে পড়ে বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

'এই সেরেছে।'

লতু বলে ওঠে, 'রাগ হয়ে গেল বাবুর? আচ্ছা বাবা আচ্ছা, খুব একখানা সাহসী পুরুষ তুমি। এখন বোসো তো।'

আবার হাতধরা।

সাগরের কি তবুও চলে যাবার ক্ষমতা থাকবে?

'রোজ রোজ সাহেব দাদুর সঙ্গে কোথায় যাস?'

'কত জায়গায়।'

'সেই বস্তিতে বস্তিতে তো? ওনার রকম দেখে সবাই হাসে; বলে ক্যাপা।'

সাগর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, 'ওকে কেউ বুঝতে পারে না।'

'সেই তো মুস্কিল। একটু উল্টো-পাল্টা লোকেদেরই পৃথিবীতে মুস্কিল। আচ্ছা সাগর, আমায় তুই বুঝতে পারিস?'

আচমকা এই আক্রমণে সাগর থতমত খাবেই।

সাগর তাই শুধু বলতে পারে, 'বাঃ কেন পারবো না?'

'কি জানি। পিসি তো বলে, তোকে কেউ বুঝতে পারবে না লতি, যারা ঘরে নিয়ে যাবে, তারা পত্রপাঠ ফেরৎ দিয়ে যাবে।'

'ফেরৎ দিয়ে যাবে? শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

সাগর আরো উত্তেজিত হয়।

লতু হাসে।

বলে, 'তা সবাই তো আর তোর মত নয়? এই তো তোর দাদা। কাউকে বুঝতে চেষ্টা করবে? ধমকেই শেষ করে দেবে।'

সাগর দাদার দুর্ব্যবহারে মরমে মরে যায়।

লতু, মা কালীর কাছে কী প্রার্থনা করতে তুমি?'

'আর বলে কী হবে? সে আশা আর পূরণ হবে না।'

সাগরের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। কী সেই প্রার্থনা?

সাগর চুপ করে থাকে।

লতু হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে, 'বাতাবি লেবু খাবি সাগর?'

'বাতাবি লেবু? ধোৎ!'

'ধোৎ কেন রে? খুব মিষ্টি। একখান খাওয়াতে পারি তোকে—'

আমার দরকার নেই। আচ্ছা লতু মানুষ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কী সুখ পায় বল তো?'

'ওই তো মজা। জগতের সব রহস্যের সার রহস্য। অথচ ভাল ব্যবহার করতে পয়সা খরচ নেই।'

সাগর একটু থেমে বলে, 'এই দিদিমার কথাই বলি, অরুণদাদু কতো কাজ করে দেন এবাড়ি। কতো কষ্ট করেন অথচ দিদিমা ওঁকে এতো অবজ্ঞা করেন। কী মানে বল?'

লতু সাগরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে ছোট্ট করে হেসে বলে, ও তুই বুঝবি না—'

সাগর রাগ রাগ গলায় বলে, 'বুঝবো না কেন? ঠিকই বুঝি। গরীব বলেই।'

'তাহলে সবই বুঝেছিস।' লতু বলে, 'থাক বাবা, তোকে পাকাতে চাই না। বা অবোধ তুই।'

'ঠিক আছে তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী। যে যত ভালই হোক, গরীবকে, কালো কুচ্ছিৎকে হেনস্থা করবেই। ওই সাহেব দাদুকে করুন বিকিন দিদিমা। ওরকম?...বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, পরশু দিনকে রোদে পুড়ে উনি হাট থেকে কিছু ভাল আতপ চাল বয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, দিদিমা যেন মারতে উঠলেন, 'আবার—বাসমতী চাল এনেছো তুমি? সেদিন না বলে দিলাম, আর যেন কোনোদিন না আসে।'

অরুণ দাদু বোঝাতে চেষ্টা করেন, দামে এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু খেতে অনেক ভালো, তাই দেখে—তা শুনছে কে? ...এদিকে কতো দিকে কত পয়সা খরচা করছেন দিদিমা, অথচ ওই চালে কী একটু বেশী পয়সা খরচা হয়েছে বলে—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না লতু; নিলেন না সে চাল। বললেন, 'পত্রপাঠ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাও।' ভাবতে পারো? সেই রোদ সেই গরম আর তখুনি সেই চালের থলি নিয়ে চলে যেতে হল অরুণদাদুকে।

একবার একটু হেসে বলতে গিয়েছিলেন, 'পত্রপাঠ চলে যাবো? একটু বসতে ইচ্ছে করছে।'...দিদিমা বলে উঠলেন, 'না না মানুষের স্বভাবই হচ্ছে বসতে পেলে শুতে চায়।' ...মা বাড়ি ছিলেন না, পটাই পিসিদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন, এতো খারাপ লাগছিল আমার। মা থাকলে ঠিক বসাতেন, জলটল খাওয়াতেন।'

লতু শুনছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল।

লতুর এই ধরনটাও ভাল লাগলো না সাগরের। মানুষের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, এ দেখলে দুঃখ না হয়ে হাসি পাবে? সাগর বললো, 'হাসছো যে?'

'হাসছি তুই কত সরল তাই দেখে। দিদিমা এদিকে এতো ভাল, আর ওর সঙ্গেই বা কেন অমন খারাপ ব্যবহার করেন, এটা তোর মনে আসে না?'

'আসবে না কেন? বললামই তো গরীব বলে।'

'বেশ তাই যদি হয়, অরুণদাদুই বা রাগে অপমানে ওদের বাড়িতে আসা ছেড়ে দেন না কেন? গরীবদের তো মান অপমান জ্ঞান বেশী হয়।'

সাগর গম্ভীরভাবে বলে, 'সে উনি খুব ভদ্র বলে। ছেলেরা মেয়েদের থেকে অনেক বেশী ভদ্র হয় বুঝলে লতু!'

'বুঝলাম।'

বলে লতু একটু হাসে।

তারপর বলে ওঠে, 'তোকে একদিন বলবো।'

'তোমার সবই খালি পরে বলবো!'

লতু সাগরের লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে বলে, 'সব কথা কি সব সময় বলা যায়।'

ওই চুলের গোড়া বেয়ে একটা তীব্র অগ্নিশিখা সাগরের শিরায় শিরায় উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। সাগর বেকুবের মত একটা কাজ করে বসে।

সাগর হঠাৎ লতুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'লতু, আমি তোমায়, তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। তোমায় আমি ভালবাসি।'

লতু গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলাতেই বলে, 'ছাড় কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।...ভাল লাগে, ভালবাসিস সেটা এতো ঘটা করে জানাবার কী আছে? আমিই কি তোকে ভালবাসি না? তোকে দেখে মাত্তরই তো আমার ভাল লেগেছিল। সেটা এতো ঘটা করে জানাতে গিয়েছি কোনোদিন?'

সাগর আর এক বেকুবের কাজ করে।

সাগর হঠাৎ উঠে ছুটে পালিয়ে যায়।

'কী হল? আবার আজ তোকে নিশিতে পেল নাকি?'

সাগর চমকে তাকাল।

সাগর বরফ সাগর হয়ে গেল।

সাগর পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ে গেছে।

পুলিশের পরণে রং জ্বলে যাওয়া খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। মাথায় তালপাতার হ্যাট, পায়ে ভারী গামবুট।

'সাগর কি এর কাছ থেকে পালাতে পারবে?

সাগর আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না।

সাগর আত্মসমর্পণ করে। সাগর স্বীকারোক্তি করে বসে।

'আমি আমি ভয়ানক একটা খারাপ কাজ করে এসেছি।'

এটা পূবের চাতাল।

এখন এখানে আর রোদ নেই।

এখানে বেঞ্চি পাতা আছে।

বিনয়েন্দ্র মাঝে মাঝে এসে বসেন। আস্ত একখানা বাড়ি, একটা মাত্র লোক কতটাই বা ভোগ করতে পারে?

তবু বসেন বিনয়েন্দ্র এখানে সেখানে।

কেউ সামনে থাকলে বলেন, 'এইখানে বসে আমার দাদু তেল মাখতেন। এইখানে পিসিমা রোদে পিঠ পুড়িয়ে বড়ি দিতেন।'

'বোস এখানে!'

বললেন বিনয়েন্দ্র, 'এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে না।'

তারপর বললেন, 'এইখানে বসে আমরা—আমি আর আমার কাকা দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করতাম।'

সাগর শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো।

বিনয়েন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে ওই মাথা হেঁট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলেন, 'ভালবাসাটা খারাপ কাজ, এটা তোকে কে বললে? যাকে ইচ্ছে ভালবাসতে পারো তুমি। তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে খানিকটা

বোকামী বলতে পারা যায়। তবে সাংঘাতিক বোকামী হচ্ছে, আড়ম্বর করে সেটা বলতে বসা। কী দরকার বলতে যাবার? তুমি যদি কাউকে সত্যি ভালোবাসো, সেটা কি সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না বললে বুঝতে পারবে না? ...এই যে তুই আমায় ভালবাসিস, ভক্তি-শ্রদ্ধা করিস, কোনদিনই বা দেখেছিস, তবু করিস, এ কি আমি বুঝতে পারি না, না পারছি না? আমায় তুই বলতে এসেছিলি? না না হাসিস না, সত্যি ভালবাসা সব সময় এরকম। তুমি বাসলেই সে জানতে পারবে। কিন্তু দেখ ডেকে হেঁকে বলতে যাওয়ার কী বিপদ! লতুর মত মেয়ে সংসারে দুর্লভ, ওকে কে না ভালবেসে থাকতে পারে?'

আবার একটু হাসেন বিনয়েন্দ্র, 'আমার তো মনে হয়, ও যদি ওর সৎমার কাছে গিয়ে থাকতো, সেও ভালবাসতে বাধ্য হত। ...ওকে যদি তোর ভালবাসতে ইচ্ছে হয় সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু যে মুহূর্তে তুই মুখ ফসকে বলে বসলি, সেই মুহূর্তে তোর কী দশা হলো বল? স্রেফ চুরি ধরা পড়ে যাবার মত ছুট মেরে পালিয়ে এলি। আর এরপর কী হবে? ওই লতুর সামনে মুখ তুলতে পারবি না। ওকে দেখলেই ছুট মারতে ইচ্ছে করবে। অতএব তুমি এরপর থেকে ওকে অ্যাভয়েড করে চলবে। তাহলে বল? লাভটা কী হল তোমার? ভালবাসাটি জাহির করে বলতে গিয়ে তুমি ভালবাসার পাত্রটিকে হারালে!'

সাগরের হেঁট মুণ্ডের অন্তরালে কী ঘটতে থাকে কে জানে।

বিনয়েন্দ্র সেদিকে তাকিয়ে দেখেন না।

হয়তো ইচ্ছে করেই দেখেন না।

একটুক্ষণ পায়চারী করে বেড়িয়ে সরে এসে বলেন, 'তোর মত ছেলেদের জন্যেই ভাবনা বেশী। তোদেরই বিপদের সম্ভাবনা। পলিটিক্স তোদেরই টানে বেশি। ...যাক আমি তোকে বলে দিচ্ছি, একথা ভাবিস না ক'দিন পরেই তো চলে যাবো, এ কটা দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেব, আর ওর ছায়া মাড়াচ্ছি না। সেটা অন্যায় হবে। সেটাই খারাপ কাজ হবে। লতুর সঙ্গে দেখাটেখা করবি। যেমন সহজভাবে কথা বলতিস বলবি। তবে দেখিস বাবা, আবার যেন ঘটা করে ক্ষমাটমা চাইতে যাসনে। ও মেয়ে তাহলে তোকে চাঁটি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। মহা জাঁহাবাজ মেয়ে।'

বলে হাহা করে হেসে ওঠেন বিনয়েন্দ্র।

যে হাসিতে সমস্ত পরিবেশটা নির্মল হয়ে ওঠে।

লাইব্রেরী থেকে ফেরার সময় প্রবালের সঙ্গের ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠলো, 'প্রবালদা, একটু দাঁড়ান, আমাদের লাইব্রেরীর আর একটি পাণ্ডার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। এই যে লতুদি—'

লতুর হাতে একগোছা লম্বা কঞ্চি, লতু গম্ভীরভাবে ফিরে তাকায়।

'প্রবালদা আজ আমাদের লাইব্রেরী দেখতে গিয়েছিলেন লতুদি—'

লতু কঞ্চি সমেত হাতটাই একটু জোড় করতে চেষ্টা করলো।

প্রবাল মৃদু হেসে বললো, 'ইনি সেক্রেটারী?'

'না-না, সে কী, সেক্রেটারীর সঙ্গে যে এইমাত্র আলাপ করিয়ে দিলাম? ..

ইনি মানে লতুদি, আমাদের খুব সাহায্য টাহায্য করেন। বই গুছিয়ে দেন, লিস্ট করে সাজিয়ে দেন—'

লতু গম্ভীরভাবে বলে, 'থেমে যাচ্ছিস কেন? সবগুলো বল? বইয়ের ধুলো ঝেড়ে দেন, ঘর ঝাড়ু দিয়ে দেন—'

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে বলে, 'আঃ কী যে বল লতুদি?'

লতু ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন কিছু বাড়িয়ে বলেছি? করি না এসব? তোদের যুগসবাটি আদর্শ লাইব্রেরীর নিজস্ব একটা ঝাড়ু আছে?'

প্রবাল কৌতুকভাবে হেসে বলে, 'তাতে কী? সেটা গ্রামের মেয়েদের হাতে থাকলেই হলো।'

লতু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তো?'

ছেলেটা থতমত খেয়ে বলে, 'হ্যাঁ ইয়ে, প্রবালদা তো এই সামনের সোমবার পর্যন্ত থাকছেন। .. কঞ্চি কী হবে লতুদি?'

'বেড়া দেব।'

বলে গটগটিয়ে চলে যায় লতু।

লতু মনে মনে বলে, 'মানুষ কেন মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে জানিস সাগর? মনে করে ওটাই বাহাদুরী।'

তারপর আবার বলে, 'তোরা দুটো ভাই-ই বুদ্ধু। চিনুপিসি অবিশ্যি বোকাসোকা ভালমানুষ, কিন্তু তোদের মত বুদ্ধু নয়। তুই আজ কী বিদঘুটে কাণ্ডই করে বসলি বল তো? যা বললি, তা বললি, অমন করে পালালি কেন? আমি তোকে মেরেছি? বকেছি? কিছু বলেছি? দূর মেজাজটাই বিগড়ে দিয়ে গেলি। .. আর তোর ওই বোকামির ফলে আমার এখান ওখান খুঁজে কঞ্চি খুঁজে বেড়িয়ে দেরী করতে হলো। কি জানি বাবা, আবার তোর ওই ভয়ে ছুট মারা অবস্থার সঙ্গে আমায় যদি কেউ দেখে নির্ঘাৎ ভাববে তোকে একলা পেলেই আমি শাঁকচুন্নী মূর্তি ধারণ করে ভয় দেখাই। আরো কত কী ভাবতে পারে—লোকের তো ভাবার গাছ পাথর নেই। মহৎ মহৎ ব্যক্তিদের নিয়েই ভাবছে, অন্যসাধারণ কথা ভাব। তোর দাদা যদি দেখতো নির্ঘাৎ আমায় ফাঁসিতে লটকাতে আনতো। এই যে এখন? কী দরকার ছিল প্রবালবাবু 'তোমার আমার মতন একটা তুচ্ছ মেয়েকে ব্যঙ্গ করতে আসার?... মেধো বলেছে—আমি লাইব্রেরীর সেক্রেটারী! অবিশ্যি তা হলেও আমার কিছু মান বাড়তো না। ভারী তো লাইব্রেরী, তার আবার সেক্রেটারী! যেমন কুঁয়ে তেমনি বাজনদার। হুঃ। লাইব্রেরীতে প্রবালদার পায়ের ধুলো পড়ায় ধন্য হয়ে গেল লাইব্রেরী।' যতোক্ষণ না বাড়ি ঢোকে মনে মনে কথা বলে যায় লতু।

কিন্তু প্রবাল বলে ছেলেটা?

লতুর ব্যবহারে সে নিজেকে অপদস্থ মনে করে কেন?

এর আগেও লতুকে ধমকানোর দিন নিজেকে অপ্রস্তুত অপ্রতিভ মনে হয়েছিল। এই একটা দারুণ দোষ আছে মেয়েটার। আর একদিন সুযোগ পাই তো এর শোধ নিই।

কিন্তু দোষটা কী ধরনের সেটাই ঠিক করতে পারে না প্রবাল।

আচ্ছা করে কড়কে দেবে?

না, খুব ভদ্র ব্যবহার করবে?

'তুমি কি পড়? তোমার কী সাবজেক্ট ছিল? এরপর আর পড়তে ইচ্ছে করে কিনা, শিউড়িতে তো কলেজ আছে, আর তোমার বাবাও শুনেছি সেখানে আছেন, তবে কলেজে পড়লে না কেন?' এসব জিগ্যেস করলেও মন্দ হয় না।...

আমাকে খুব অভদ্র আর রাফ ভেবে রেখে দিয়েছে তো। ধারণা বদলে যাবে।

সুযোগটা করে কখন কোথায় পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে কথা।

এখানে অবিশ্যি সুযোগের খুব একটা অভাব নেই। মেয়েগুলো তো পাড়া বেড়ানি। আর কতো অগাধ জায়গা আছে। মাঠ নদীর ধার মন্দির-টন্দির... ওই সাহেব দাদুর বাড়িতেও তো হরদম যায়। ...ভদ্রলোকের সঙ্গে আর তেমন আলাপ করা হচ্ছে না। উনি নাকি এখানে পোলট্রি করবেন। দেশের লোকেরা এখন আর ভাল করে খেতে পায় না, অথচ গরু পোষাও বায় সাপেক্ষ, তাই ঘরে ঘরে পোলট্রি করবার পরিকল্পনা ওঁর আছে। কম খরচে তবু একটা পুষ্টিকর জিনিস খেতে পাবে লোকে। ...গ্রাম সম্বন্ধে খুব ভাবেন উনি। আদর্শ আছে। তবে পথটা শক্ত। আমরা পারবো গ্রামে এসে গ্রাম উন্নয়ন করতে? ...ফুলবাটির এই বিষয় সম্পত্তির মালিক তো শেষ পর্যন্ত আমাদের মা শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী। এটা নিয়ে পরীক্ষা করা অসম্ভব নয়। ..কিন্তু অসম্ভব। আদর্শপাগল লোক ছাড়া কেউ পারবে না এসব।

ছেলে দুটো কোথায় যে ঘুরেছে।

চিনু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, পটেশ্বরী ঢুকলেন একবাটি রাজভোগ হাতে নিয়ে। বেশ বড় জামবাটি একটি।

বাটিটা চিনুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কই তো, আমার বরেন কই?'

চিনু হেসে ফেলে বলে, 'আমিও জানি না। তা এত কী হবে গো পিসি?'

'কী আবার হবে? ঋষি মায়ে পোয়ে। ছোঁড়ারা এসেছে পর্যন্ত ভাবছি হাত করে একটু খাবার তৈরী করে নিয়ে যাই, তা আর হয়ে উঠছে না। হবে কি, বড়াত দুধ চাইলে গয়লারা দিতে পারে না। ফুলঝাটিতেও এখন দুধের আকাল। বোঝ? এই আমরাই একদা মাকে লুকিয়ে গেলাশ গেলাশ দুধ গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েছি। আর ভালমানুষী মুখ করে বলেছি—খেয়েছি সবটা। আর এখন? দুধের বাছারাই দুধ পাচ্ছে না। আমার এই জীবদ্দশাতেই এই ফুলঝাটির কত রূপান্তরই দেখলাম।.....থাকগে, সেসব কথা তুললে এখন মহাভারত। তা আমার বর দুটো কোথায় গেল?'

চিনু হেসে ফেলে বলে, 'বর দুটো? আমার দুটো ছেলে একটা বৌ?'

'তাতে কী, রাতদিন তো তোর মা মহাভারত নিয়েই আছে, তাতে এর আহিক উদাহরণ নেই?'

চিনু হাসে।

বলে, 'দুটোর একটাও কাড়ি নেই। এসে পর্যন্ত তো ঠিক দেখা পাচ্ছি না কারুর। আসার আগে পাড়াগাঁ বলে কত ভয় ভাবনা, এসে তো দেখছি—'

'হুঁ। ওটা এই ফুলঝাটির মাটির গুণ রে চিনু। এ মাটিতে পা দিলেই ভালবাসা জন্মায়।'

চিনু হেসে বলে, 'কই আর? সকল বাড়িই তো ফর্সা। বোরা তো সব 'ভাগলবা।' বেশীর ভাগ বাড়িতেই তো দুটো একটা করে বুড়ো বুড়ি ভিটে আগলে পড়ে আছে। আর ওই সব প্যাসেঞ্জার কটা যা সংসার করছে।'

পটেশ্বরী একটি নিশ্বাস ফেলে বলেন 'তা যা বলেছিস। কী রমরমাই ছিল দেশে। বাড়িবাড়ি গোলা মরাই, গোয়াল গরু—।

হঠাৎ হেসে ওঠেন।

বলেন, 'সেই যে বলে না বাখালী, কত খেলাই দেখালি।' তা মা সাধরকালী দেখাচ্ছেন বটে খেলা।...মাকে দেখতে গিয়েছিলি চিনু?'

'কই আর হলো?'

চিনু বলে 'তুমি একদিন সময় করে নিয়ে চল না?'

'তা তাই যাবো। তোর মা তো আবার একরকম। না হিন্দু না খৃষ্টান। ওদিকে আচার বিচার পুজো পাঠ রামায়ণ মহাভারত সব, অথচ দেব মন্দিরের দিকে পা বাড়াবে না। বাড়ির চৌকাঠই পার হতে চায় না। যাবো আমিই নিয়ে যাব। আছিস তো কদিন?'

'আমি আছি মাস কাবার পর্যন্ত।...বড় ছেলে কাল চলে যাচ্ছে—'

'এই দ্যাখো! কাল চলে যাচ্ছে? খুব ভাগ্যিস খাবারটুকু নিয়ে এলাম আজ। তা ও আগে যাচ্ছে কেন?'

'আর বল কেন পিসি! ওই এক একবগ্গা ছেলে। যাবো বললো তো যাবোই। পরীক্ষা পরীক্ষা বাই চেগেছে এখন। পোড়ারমুখো পরীক্ষাও কি তেমনি? ঝুলিয়ে রেখেছে দু মাস। .... আগে কখনো এমন দেখিনি বাবা। এসব একেবারে চন্দ্র সূর্যের নিয়মের মত ছিল।'

'এখন সবই বদলাচ্ছে। সবই একেবারে উল্টো অবতার। নেহাৎ মানুষ জাতটা এখনো পাটা ওপর দিকে আর মাথাটা নিচের দিকে করে হাঁটছে না। আরও বাঁচলে হয়তো তাও দেখে যাবো। তোদের শহর বাজারে তো শুনেছি হিপি না টিপি কী হয়েছে? তা তারাই এ ফ্যাসান আনবে।'

চিনু হাসতে থাকে।

বলে, 'পটাই পিসির এক কথা।'

পটেশ্বরী আঁচল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলেন, 'বলি কি আর সাধে লো সই, বলি কি সাধে? দেখেশুনে প্রাণপাখী ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। তা দূর করে একটা কথা তোকে বলে ফেলছি চিনু। শুনে গায়ে ধুলো দিস তো সে ধুলো মেখেই চলে যাবো।'

চিনু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

পটেশ্বরী আঁচল ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, 'বলেই ফেলছি তাহলে—বলি এখন তো সবই উল্টো পুরাণ, তোদের কলকেতায় তো এখন শুনি জাতের বিচার লোপ পেয়েছে। বামুন কায়েত তো দূরের কথা, হাড়িবাগদীতেও হচ্ছে। তা তুই কেন নে না একটা কায়েতের মেয়ে? বড় ছেলের বিয়ে তো দিবি আজ বাদে কাল।'

চিনু অবাক হয়ে তাকায়।

'প্রবালের বিয়ের কথা বলছো?'

'তবে না তো কী? তবে আজকেই কি আর দিতে বলছি? বলে কয়ে রাখতিস।'

চিনু একটা নিশ্বাস ফেলে।

চিনু বলে, 'লতুর কথা বলছো?'

'যাক্ বুঝেছিস তাহলে?'

চিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'সে কি আর তোমার জামাই রাজী হবে?'

'হবে না? কেন, জামাই খুব গোঁড়া বুঝি?'

'না না তা নয়। তবু—'

পটেশ্বরী বলেন। বুঝেছি। আর বলতে হবে না। ওই তবু ভার কিন্তু এরাই রাজ্য চালাচ্ছে। মেয়েটা বড় ভাল রে চিনু। তোর ছেলের গুণাগুণ আমি জানি না, তোর কথা ভেবেই বলছিলুম। কি জানি কোথায় গিয়ে পড়বে, কোন শাসনের তলায় পেষাই হবে। তোর মতন একটি শাশুড়ী কি আর জুটবে?'

চিনু অপ্রতিভ মুখে বলে, 'আজকাল আর সেই আগের মতন বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী নেই পিসি।'

পটেশ্বরী বলেন, 'ওই শুনতেই নেই লো চিনু। সবই ঠিক আছে। এখন তোদের কালে সোজায় কাটে না, উল্টো প্যাঁচে কাটে।'

'পিসি রাগ টাগ কোরো না।'

'আরে দূর মেয়ে। আমি কি আর সত্যি পিত্যেস নিয়ে বলেছি? ভাবলাম বলেই দেখি ভগবান কখন কোন কথা কানে শোনেন। মেয়েটার জন্যে মনটা বড় কাঁদে।...ওমা এই যে আমার একটি বর এলেন। একেই বলে মনের টান। আমাদের একটা গোয়ালা ছিল, বলতো, 'মনের টানে জরু, আর বাঁশির টানে, গরু। তা কাল গোকুল ছেড়ে মথুরায়?'

প্রবাল নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'মানে বুঝলাম না।'

'মানেই বুঝলি না? চিনু, তোর বিদ্বান ছেলে বলে কী? এসব তোদের পড়ার বইতে থাকে না বুঝি? তা একটু মালপো থাকলো খেও ভাই! বুড়ি বলে ঘেন্না করে যেন ফেলে দিও না।'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'মা বললেই পারতিস পটাই!'

পটেশ্বরী বলেন, 'ভাবলাম, বলেই ফেলি খা করে! যা হয়। না হলে না হলো, আমার মানের কানা তাতে খসে যাবে না।'

'মৃন্ময়ী বৌদি শুনলে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

'হলে ভাতের চাল দুটি বেশী নেবেন। পটেশ্বরী কারো সন্তোষ অসন্তোষের ধার ধারে না।'

বিনয়েন্দ্র সকৌতুকে বলেন, 'সাত জন্মে তো কখনো শ্বশুরঘর করলি না। তাই ঘোড়ার রাশ পরানোই হল না।'

কিন্তু বাপের বাড়িতেই কি আর রাশ টানার কথা ওঠে না?

লতুর কাকা দিদিকে বলে, 'তোমাকে আর কী বলবো দিদি, তোমার অবস্থা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত। স্নেহান্ধ। তবু দাদা এখানে নেই, আমার বলা কর্তব্য বলেই বলছি—মেয়েকে একটু রাশ টেনো। অনবরত মেয়ে রাস্তায় ধিঙ্গী নাচ নেচে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরীতে ফাংশান হবে, তাতে তোর কী? আর চিনুর ওই ছোট ছেলেটা, লম্বায় তো আমার জেঠামশাই, সেটার সঙ্গে এতো কী?'

লতুর পিসিও ভাইয়ের দিদি।

তিনি তেমনি চড়া গলায় বলেন, 'তা তোর যদি চোখে ঠেকে থাকে তো মানা করছিস না কেন?'

'আমি মানা করার কে?'

'ওঃ! বাপকাকায় শাসন করবে না, পাড়ার লোক এসে শাসন করবে? মেয়ে বেচাল হলে এই সবকর বংশেরই মুখ পুড়বে, আমার শ্বশুরের বংশের নয়!'

'বেচাল হলে? হতে বাকি আছে?'

কাকা চড়া গলায় বলে ...ই তো দেখলাম খানাডোবা পেরিয়ে কাঁটাবন ডিঙিয়ে ইষ্টিশানের মধ্যে কোথায় চলেছে, চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'যাচ্ছিস

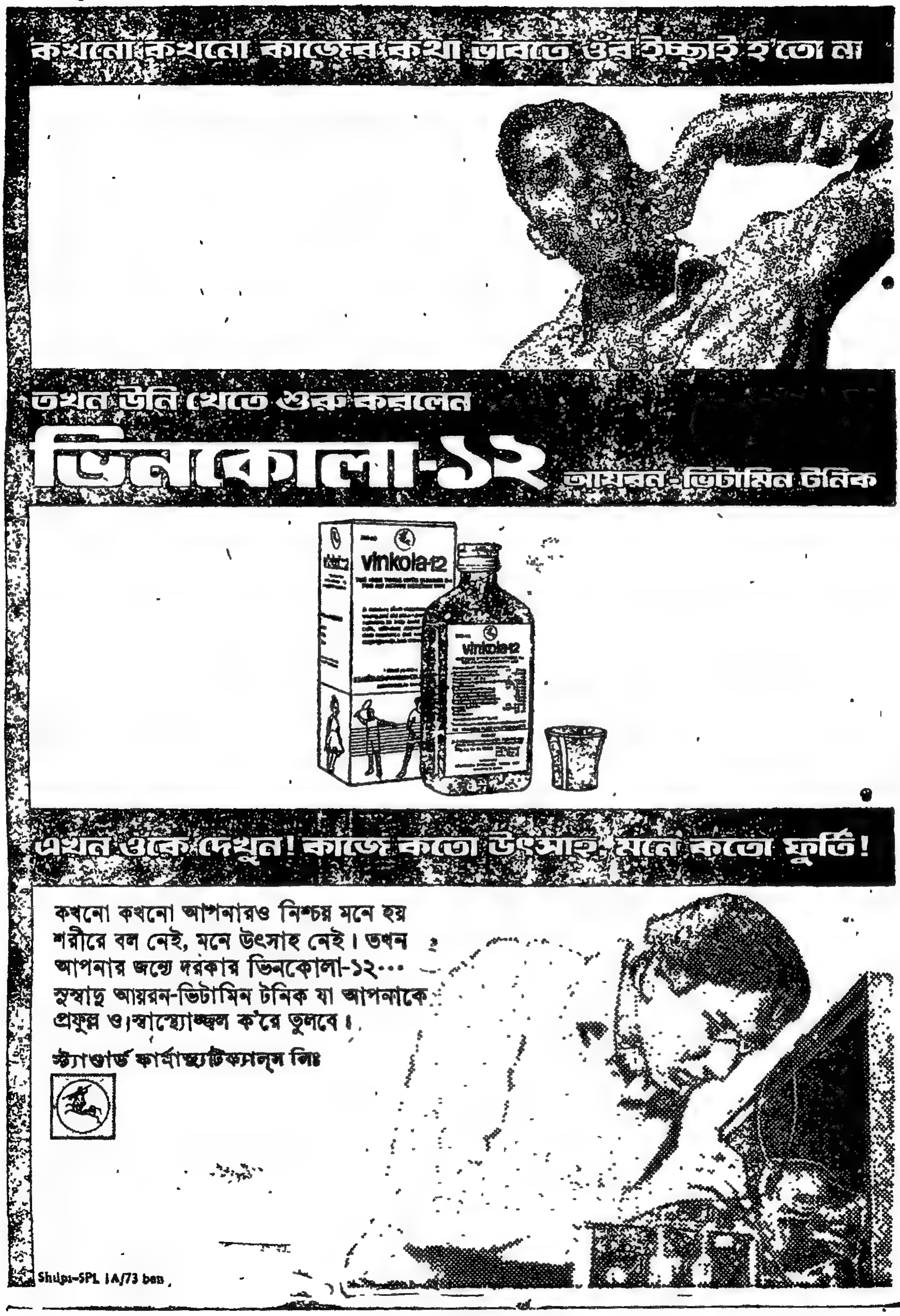
কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না
তখন উনি খেতে শুরু করলেন
ভিনকোলা-১২
আয়রন-ভিটামিন টনিক
vinkola-12
এখন ওকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!
কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।
স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যালস লিঃ
Shilpi-SPL 1A/73 ben

কোথায়? ও. শুনতেই পেলেন না রাজকন্যে।'

পিসি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ইস্টিশানে যাবার জন্যে খানা ডোবা ডিঙোতে যাবে কেন? পাকা সড়ক কী দোষ করলো?'

'খোদা জানে।'

'তার মানে ইস্টিশানে যাচ্ছে না। ওর সেই বন্ধু মৌটুসীর কাছে যাচ্ছে।'

'শাক দিয়ে মাছ ঢেকে ঢেকে তুমি মেয়েটার ইহ-পরকাল খেলে দিদি!'

বলে কাকা হনহনিয়ে চলে যায়।

তা অভিযোগটা মিথ্যে নয়।

এরকম শাক দিয়ে মাছ ঢেকেই থাকেন পিসি। তবে তিনি যখন নিজে ভাবতে বসেন, তখন বলেন, 'বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি ওর দ্বারা কোনো মন্দ কাজ হবে না। তাই আমার এতো নিশ্চিন্ততা।'

অথচ যে কাজটা করতে খানা ডোবা ডিঙিয়ে শর্টকাট করছিল লতু, জগতের চোখে সেটা এমন কিছু ভাল নয়।

এই যে তুমি পায়ে হেঁটে সাইকেল রিকশকে ছাড়িয়ে আগে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়ে, সেটা কী বেশ শোভন হলো? তোমার বাপ দাদা কেউ রওনা দিচ্ছে? তাই তুমি উৎকণ্ঠায় ছুটলে?...আর ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরও উদাস নয়ন মেলে আকাশে ছড়িয়ে পড়া ইঞ্জিনের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইলে!

রইলে তো রইলেই।

আর রইলে বলেই না লম্বার তোমার কাকার জেঠামশাইয়ের মত ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর সাগরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে দাঁড়িয়েই চমকে গেল।

'লতু, তুমি এখানে?'

'হুঁ। আমার চেনা একজন বর্ধমান গেল তাই—'

'এই দেখো! দাদাও তো গেল এই ট্রেনে।'

'হুঁ দেখলাম। সাইকেল রিকশ চেপে এলো। কই তোকে তো দেখলাম না?'

'দাদার খেয়ে দেয়ে নিতে দেরী হয়ে যাবে বলে, দিদিমা আমার আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন টিকিট কেটে রাখতে—'

'তুই পারলি?'

'একটা টিকিট কেটে রাখতে পারবো না? তুমি আমায় কী ভাবো লতু?

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিনের কথা মনে পড়ে যায় সাগরের।

যদিও সাহেব দাদু বলেছিলেন 'পালিয়ে পালিয়ে বেড়িও না, লতুর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দেখাটেখা হোক, কথা বোলো', কিন্তু সে সাধ্য হয়নি সাগরের।

সাগর মনকে চোখ ঠেরেছিল, আমি তো আর পালিয়ে বেড়াচ্ছি না, অ্যাভয়েডও করছি না, দেখা না হয়ে গেলে কী করবো? বাড়ি গিয়ে খুঁজতে হবে? অনেক ঝামেলা তাতে। সেদিন ওদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওর সেই কাকা। 'তুমিই চিনুদির ছোট ছেলে না?' বলে এমনভাবে তাকালেন, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মার বাপের বাড়ির দেশে এসে পর্যন্ত কী যে এক ভয় ঢুকেছে। ভয়ে ভয়েই হার্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ভয় মানেই সাহসের অভাব।

লতুকে খোঁজ করে স্বাভাবিক হবার সাহস হয়নি সাগরের।.... কিন্তু এখন হঠাৎ প্লাটফরমের ধারে কাঠচাঁপা গাছটার তলায় লতুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাগরের আহ্লাদের সাগর উথলে উঠলো।

সাগর বললো, 'এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবে?'

'নাঃ ইচ্ছে করছে না। আয় না, ওদিকে ওই গাছতলাটায় গিয়ে বসি। বেশ বাঁধিয়ে রেখেছে, বসবার সুবিধে আছে।'

সাগর কৃতার্থ হয়ে যায়

সাগর চোখ তুলে তাকায়।

সাগর তবু না বলে পারে না, 'দেরী হলে বাড়িতে বকবে না তো?'

'বকুক গে। বকুনির ভয়ে কেঁচো-কেন্নোর মত গুটিয়ে গুটিয়ে জীবন কাটালেই কি তুই বকুনির হাত থেকে রেহাই পাবি?......না তোর কথা বলছি না, তোদের ছেলেদের তো সাতখুন মাপ। গোঁফ গজালেই আর কেউ বকতে সাহস পায় না। যত জ্বালা মেয়েমানুষের। ....আমি বাবা ঠিক করে রেখেছি কত বকবে বকো। আমি নিজে অন্যায় অপকর্ম না করলেই হলো।'

সাগর আত্মমর্দনার মত বলে ফেলে, 'আমি সেদিন খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছিলাম।'

'তা করেছিলি।'

বললো লতু উদাসভাবে।

সাগরের মুখ শুকিয়ে চুন।

সাগর মনের চাঞ্চল্য সংহত করতে আঙুলগুলো নিয়ে মটকাতে শুরু করে।

লতু একটু পরে বলে, 'তোর ওই পালিয়ে যাওয়াটা খুব খারাপ কাজ হয়েছিল। আমি তোকে গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম? ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম?'

সাগর আরও জোরে আঙুল মটকাতে থাকে।

লতু ওর হাতটা টেনে ধরে ছাড়িয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, 'আঙুল মটকাসনে। কেউ দেখলে ভাববে, তুই কাউকে শাপমন্যি দিচ্ছিস।...কী রে তোর আঙুলগুলো যে কাঁপছে।'

'লতু তুমি আমার হাত ধরো না।'

'কেন?'

'আমার, আমার কীরকম যেন হয়, ভয় করে, আবার হয়তো সেদিনের মত—'

লতু ওর হাতটা আরো শক্ত করে চেপে রেখে বলে 'এই খোলা প্লাটফরমে সেদিনের মতন লতু, তোমায় আমি-ভালবাসি' বলে জড়িয়ে ধরলে লোকে তো পুলিশে ধরবে। তুই এতোটুকু ছেলে, তোর এতো কেন? বাসলেই বা ভালো, 'দিদি' বলে ভালবাসতে পারিস না?'

সাগর হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিয়ে উদ্ধত গলায় বলে, 'না। তুমি আমার থেকে মোটে আট মাসের বড়।'

'তার মানে তুই আমার থেকে আট মাসের মাত্তর ছোট। আমি তো বেশ নিজেকে তোর দিদি দিদি ভাবতে পারছি।'

সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না।

লতু একটু হেসে বলে, 'ওঃ বাবুর মানের হানি হলো।...তবে বলি সাগর, সেদিনই বলতাম, বলবো বলেই লেবুতলায় নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলাম। তা তুই তো সব গুবলেট করে দিলি। তোকে ভালবাসতে আমার এতো ভাল লাগে কেন জানিস, তুই প্রবালদার ভাই বলে।'

সাগর চমকে তাকায়।

সাগরের মুখটা বোকার মত দেখতে লাগে।

লতু সামনের ফাঁকা রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে অন্যমনা গলায় বলে, 'সেদিন মা কালীর কাছে কী মানত করতে গিয়েছিলাম জানিস? প্রবালদা যেন আমার সঙ্গে একটু ভালভাবে কথা কয়।'

সাগরের ঠোঁটদুটো কাঁপে।

সাগরের আঙুলগুলোও আবার কাঁপে।

সাগর তবু সেই হাতটা ব্যাকুল নিজে থেকেই লতুর হাতটা চেপে ধরে বলে ওঠে, 'লতুদি!

'যাক্। তাহলে বুঝতে পারলি?'

লতু বললো, ভালবাসার রূপ শিখেছিস পাকার মত, 'ভালবাসার মুখ চিনতে শিখিসনি। তোর যদি বুদ্ধি থাকতো, প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারতিস।'

'আমি বুঝতে পারিনি, সত্যিই বুঝতে পারিনি লতুদি!'

'এখন তো পারলি?'

লতু একটু নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার মরণের কপাল, তাই প্রবালদা প্রথম দিন থেকেই আমায় অগ্রাহ্য করছে, আর আমি প্রথম দিন থেকেই ওর জন্যে মরছি।..ইচ্ছে হতো একবার দুটো কথা এইবার সুযোগ পেলে বলে নিই, আমি তো বাপু তোমায় বিয়ে করতেও চাইছি না, তোমায় নিয়ে পালাতেও চাইছি না, শুধু একটু ভাল করে ডেকে কথা বললে, কি হাসলে গল্প করলে, এতে কিছু আর তোমার জাত যাবে না। তবু আমার মনের মধ্যে একটা ভালবাসা ভালবাসা সুখ থাকতো। ওই সুখটা কৌটোয় ভরে তুলে রাখবো, যেদিন জগৎ সংসারের ব্যাভারে মনটা দুঃখু দুঃখু হয়ে যাবে, কৌটো খুলে ওই সুখটি বার করে দেখবো।'

'লতুদি, তুমি এই বয়সে এতো কথা ভাবো কী করে?

লতু হেসে ওঠে।

'বলে ভাবাই আমার ব্যাধি। ভেবে ভেবেই আমি ভালবাসার মুখ চিনতে শিখেছি, বুঝলি? তুইও যদি ভাবতে শিখিস, দেখতে পাবি যে যাকে ভালবাসে,

[illegible] দেখলেই তার মুখে একটা [illegible] জ্বলে ওঠে। যেন ভেতরে কে ইলেকট্রিকের সুইচ টিপে দিল।'

'এরকম তুমি কখনো দেখেছো লতুদি?'

লতু মাথাটা কাৎ করে বলে, 'না দেখলে আর বুঝবো কী করে?'

'কই? কোথায়? কবে?'

'এখানেই দেখছি, রোজই দেখছি। তুইও দেখছিস। পটাই ঠাকুমা যখন সাহেব দাদুর ভাত নিয়ে এসে কাছে বসেন তাকিয়ে দেখিস।'

সাগর চমকে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'অ্যাঁ!'

লতুর ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে।

লতুর কপালের ওপর ঝুরো চুলগুলো খোলা হাওয়ায় দুলছে।...সাপের মত নয়, লাউ ডগার কচি পাতার মত।

লতুর মুখে মৃদু হাসি।

'শুধু কি আর আমিই বুঝতে শিখেছি রে? সংসার শুদ্ধু লোক বুঝে বুঝে পাকা। মেয়েমানুষের চোখে এ আলো ধরা পড়বেই। তবে পাকা লোকেরা পচা পচা কথা বলে, এই যা দুঃখু। আমার ভারী ভাল লাগে জানিস। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি ওই আলোটার দিকে।...যতো আলো সাহেব দাদুর মুখে, তত আলো পটাই দিদিমার মুখে—'

সাহেব দাদু! পটাই ঠাকুমা!

সাগরের একথা অবিশ্বাস্য লাগে।

সাগর বলেই ফেলে, 'ধ্যাৎ। ওঁরা তো বুড়ো!'

লতু ওর কাঁধে একটু ঠেলা মেরে বলে, 'সাধে বলি তুই একটা বুদ্ধু! বুড়ো তা কী? বুড়ো হলে ভালবাসা ফুরিয়ে যায়?...চিরদিনই তো মানুষ ভালবাসতে বাসতেই পৃথিবীতে এগোচ্ছে! বুড়ো হলে মাতৃস্নেহ থাকে না? সন্তানস্নেহ থাকে না? বন্ধুর ভালবাসা থাকে না? তবে এটাই বা [illegible] হবে কেন? বরং তো আরোই বাড়বে। যতোই পৃথিবীর অন্য সব কাজ কমে আসবে, ততোই এই ভালবাসাটাকেই আঁকড়ে ধরবে।'

একটা মালগাড়ি এলো।

থামলো না।

শনশন করে চলে গেল। তবু কিছুক্ষণের জন্যে প্ল্যাটফরমটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ।

সাগরের মনের মধ্যে আবার সেই উত্তাল ঢেউ আছড়াচ্ছে।

লতু যেন আস্তে আস্তে সাগরের চোখের সামনে একটা অজানা রহস্যের দরজা খুলে দিচ্ছে।...এরপর হয়তো [illegible] ...সাগর তেমন দেখতে পেলে বুঝতে পারবে মুখের নীচে চামড়ার তলায় কে যেন একটা ইলেকট্রিক আলো জেবলে দিল ওদের।

অনেকক্ষণ পরে লতু আবার বললো, 'তুই সেদিন বলেছিলি মনে আছে, সাহেব দাদু কোনোদিন সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও চলে যাবে। আমি হেসেছিলাম মনে আছে?'

সাগর মাথা নেড়ে সায় দেয়।

লতু আস্তে আস্তে বলে, 'আমি বললাম, সন্ন্যাসী তো হয়েই আছেন নতুন আর কি হবেন? তবে চলে কোথাও যাবেন না দেখিস?'... লতু পটেশ্বরীর মত আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'তুই বললি, কেন যাবেন না? আমি বললাম পরে বলবো—'

'তুমি তো সব কথাই 'পরে বলবো' বলে ঠেলে রাখো লতুদি!'

লতুদি!

আশ্চর্য! এখন কত সহজেই 'লতুদি' বলতে পারছে সাগর। বলতে ইচ্ছেই করছে।...যেন এখন সাগর লতুকে স্বাস্থ্য করে ভালবাসতে পারবে। নির্ভয়ে।

লতু বলে, 'ঠেলে রাখি কি সাধে। তুই যে নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ! কেন যাবেন না জানিস? ওঁর ওই ক্ষেত-খামারের জন্যেও নয়, আর সাঁওতাল বস্তির ভক্তদের জন্যেও নয়, পারবেন না স্রেফ ওই পটাই ঠাকুমার জন্যে।'

'ধ্যেৎ! এ তুমি কল্পনা করে করে বলছো লতুদি—'

'কল্পনা করে করেই মানুষ জগতের সকল রহস্য উদ্ধার করে সাগর। পড়িসনি সেই পদ্যটা? 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা। ভ্রমর ফিরেছে মাধবী কুঞ্জে তরুরে ঘিরেছে লতা।'

সাগর মাথা নেড়ে বলে, 'পড়েছি।'

তবেই দ্যাখ। 'এতো যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে। সেকথা কখন হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে?...' কবির কাছে। কবির আর কী সম্বল বল? কল্পনা ছাড়া। কিন্তু মজা এই নিজের মুখটা তো কেউ দেখতে পায় না? তাই ওই হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোটাও দেখতে পায় না। উনি ভাবেন, ওঁর আদর্শের জন্যে আটকে আছেন এখানে। ওই চাষবাস, ওই অনুগত ভক্তরা, এদের জন্যেই ওঁর ফুলঝাটির আকাশবাতাস জল মাটি সব এতে ভাল লাগে। মানুষ যদি সত্যি করে কাউকে ভালবাসতে পারে, তার সব ভাল লাগে বুঝলি?...নইলে তোর ওই স্বরূপদাদুর [illegible] লাগে কেন? [illegible] দিতেও মুখে আলো জ্বলে ওঠে কেন?'

সাগর প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'লতুদি!'

লতু একটু মধুর হাসি হেসে বলে, 'আচ্ছা এবার থেকে লক্ষ্য করে দেখিস। দিদিমা মহা চালাক মেয়ে, তাই ওই আলোটি ঢাকতে, মুখকে যত পারেন ব্যাজার করেন।'

সাগর গাঢ় গভীর গলায় বলে, 'লতুদি, তুমি আগে কেন এসব বলনি?'

'বললে তোর কী চারখানা হাত গজাতো?'

'চোখটা গজাতো! দেখতাম—দেখতাম দাদাকে দেখলে তোমার মুখেও—'

লতু উদাসভাবে বলে, 'সে আর তোর ভাগ্যে হল না।'

তবু লতুর মুখটা এখন আলো আলোই দেখাচ্ছে কেন? পড়ন্ত বিকেলের আলোটা এসে পড়েছে বলে?'

সাগর অবাক হয়ে ভাবে, এই মুখ দেখেও দাদা বর্জন লাগিয়েছে। সাগর মর্মাহত গলায় বলে, 'দাদা বড় নিষ্ঠুর লতুদি।'

লতু চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়।

লতুর মুখটা হাসি হাসি। বলে, 'নিষ্ঠুর নয়।'

'নয়?'

'নারে! তুই আমার বন্ধু, তোকে বলেই ফেলি, আমি যখন ওই ওখানে পাকুড় গাছটার কাছে আসছি, প্রবালদা রিকশা থেকে নামছে। আমায় দেখে বললো, 'লতু না? এখানে?' আমি বললাম, 'এমনি!' প্রবালদা বললো, 'এই শোনো, তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছো না?' সত্যি আমি খুব অভদ্র।' তারপরই গাড়ি এসে গেল।.. গাড়ি থেকে হাত নাড়লো।'

সাগর দেখলো লতুর মুখের সেই আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

সাগরের চোখের সামনের সেই হঠাৎ খুলে যাওয়া দরজাটা দিয়ে অনেক দূরের একটা দৃশ্য দেখতে পেল সাগর।

কলকাতার বাড়ির দরজায় একটা ট্যাক্সি। মার বাক্স সুটকেশ ওঠানো হয়েছে তাতে, মা ফর্সা শাড়ি আর কপালে সিঁদুর টিপ পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলো। ভোলামামা তার জীর্ণ ব্যাগটি নিয়ে উঠলেন তাতে।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

তবু মার মুখটা ওই দরজাটি দিয়ে দেখতে পাচ্ছে সাগর। ভোলামামার মুখটাও। আলো ঝকঝকে।

রসরঙ্গে

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র

পাঠকগণকে আশ্বাস দিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিম-সঞ্জীব-দীনবন্ধু সাহিত্যে হাস্যরসের বিকাশ লইয়া বিমর্ষ গম্ভীর কোনো প্রবন্ধ ফাঁদিতে বসি নাই, আমার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ কিন্তু সুনন্দ। তাহা হইল—চলিত বাংলায়—

ঐ তিন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ব্যক্তি-জীবনে আচার-আচরণে কথাবার্তায় কতখানি রসিক ছিলেন, তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা। রসসাহিত্যিক মানেই রসিক মানুষ হবেন এমন কোনো কথা নেই। লেখায় যিনি রসিকতার চূড়ান্ত করেছেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি হয়ত নিরেট গাম্ভীর্যের দ্বারা উপস্থিত মানুষদের হাস্যহরণ করে থাকেন; আবার জীবনে এক কলম লিখে রসসৃষ্টি করতে পারেন নি, কিন্তু তিনিই দেশের সর্বোত্তম রসিক মানুষ। দৃষ্টান্ত খুব কাছেই আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র লেখক হিসাবে বাংলাদেশের সেরা হিউমারিস্ট, কারণ তিনি কমলাকান্তের স্রষ্টা। তিনিই প্রথম নির্মল হাসি বাংলা সাহিত্যে এনেছেন, একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাধারণভাবে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রসিকতা করতেন না তা নয়, তবে তার পরিমাণ যথেষ্ট বলে শুনিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ কলমের মুখেই।

তাহলেও বঙ্কিম রসিকতা করতেন—প্রধানতঃ চাপা রসিকতা। তাঁর বাড়িতে মজলিশ বসত, তাতে তিনি যোগ দিতেনও। কিন্তু আত্মহারা স্ফূর্তির স্বভাব তাঁর ছিল না।

তবে দুষ্ট কৌতুকে তিনি যে সমর্থ ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীতে পাই। বঙ্কিমের দ্বিতীয়া পত্নী খুবই সুন্দরী। একবার তাঁকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ট্রেনে যাচ্ছেন। সেকালের রীতিতে পত্নী অবগুণ্ঠনবতী। এক দেশীয় রেলকর্মচারীর সন্ধানী নয়নে সেই রূপসৌন্দর্য ঘোমটার যবনিকা সত্ত্বেও ধরা পড়ল এবং সে ব্যক্তি বারবার যবনিকা কম্পমানের প্রত্যাশায় উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। ব্যাপারটা বঙ্কিম দেখতে পেলেন। লোকটিকে তিনি ডেকে আনলেন। পত্নীর ঘোমটা খুলে দিয়ে বললেন, 'ভাল করে দ্যাখো।' তারপর বললেন, 'ওহে, আমার নাম বঙ্কিম চাটুজ্যে, আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাতশো-আটশো টাকা মাইনে পাই, আমার বইও বিক্রি হয়। সব কিছু এঁর পায়ে ঢেলে দিয়েছি, তবু মন পাইনি। এখন তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো—।'

বঙ্কিম নিজে মজার গল্পের স্রষ্টা। তাই অপরের কাছ থেকে শোনা গল্প বলার প্রয়োজন তাঁর বিশেষ হত না। তবু দু-একবার তাঁর লেখায় মজার শোনা-গল্প ঢোকাননি তা নয়। ধরে নিতে পারি, এই ধরনের কিছু গল্প তিনি মজলিশে বলতেন। তেমন একটি গল্প—

'কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালয়ে গিয়াছেন; আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের জোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কইমাছ আনিয়া দিল, অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্যসহ স্ত্রীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃতমোহে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অন্য রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। সে জিদ করিয়া বলিল—'এখন অম্বল থাকুক, আগে ও-মাছটি খান।' গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—'উটি যদি না খান তো আপনার বেটার মাথা খান।' আমরাও চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানব্বুইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি! আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাহ্যতঃ কেবল গম্ভীর নন, দেমাকীও। চাটুজ্যেবাড়ির দেমাকের প্রসিদ্ধি ছিল, একথা নবীন সেন জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষটি মজলিশ ভালবাসতেন, এবং মাঝে মাঝে স্বেচ্ছারোপিত সীমারেখাকে লঙ্ঘনও করতেন। 'শ্রুতি-স্মৃতি' গ্রন্থে মন্মোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তেমন একটি ঘটনার কথা বলেছেন। যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক নৈহাটির এক ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে গল্পগুজব করতে বঙ্কিমচন্দ্র যেতেন—সেখানে নিজের হাতে তামাক সেজে খেতেন। তা দেখে উক্ত ডাক্তারের কাকা বলেন, 'বঙ্কিম, তুমি এখন মস্ত লোক, তোমার বঙ্গদর্শনের কর্তা নাম—তোমার এরকম নিজের হাতে তামাক সাজা মানায় না। ডিসপেনসারির চাকরকে বললেই সে তামাক সেজে দিতে পারে।' বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা শুনেই লাফিয়ে উঠে গাইলেন—

'হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে,
কে করে যাবিরে ভাই শিঙে ফুঁকে।'

একই গ্রন্থ থেকে জেনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র গোপাল উড়ের 'আমার বাড়ি এসো যাদু, তোমায় দিব ভালবাসা' গানটি গাইতে খুব ভালবাসতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এক তিক্ত বিদ্রূপের কথাও পেয়েছি একই গ্রন্থে। 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'তে অক্ষয় সরকার প্রবন্ধ পড়বেন; বিষয়—'হিন্দু বিধবার আবার বিয়ে হওয়া উচিত কি না?' সভাপতি হবার অনুরোধ জানাতে বঙ্কিমের কাছে লোক গেল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্তাব শুনে বললেন, 'ভালই হয়েছে; হিন্দু বিধবার বিবাহের আলোচনা হবে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে—সংগতই হয়েছে।'

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ-কৌতুকময় প্রসন্ন স্বভাবের কিছু বিবরণ নবীন সেন ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায়। প্রথম সাক্ষাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নবীনচন্দ্র দেখলেন—'একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ; চক্ষু দুটি নাতি ক্ষুদ্র ও নাতি বৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত; অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া—অগ্রভাগ কুঞ্চিত; দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা; মুখ ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত; অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান এবং পরিধানে নয়নসুখের ধুতি।' 'দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর সতেজ এবং প্রতিভান্বিত' বলে নবীন সেনের মনে হয়েছিল। পরিচয় পাবার আগেই বঙ্কিমকে চিনেছেন—একথা নবীন সেন সঞ্জীবচন্দ্রকে বললেন। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কিভাবে চিনলেন?

নবীন হেসে বললেন—'শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।' সস্মিত আনন্দে বঙ্কিম বললেন—'বটে! আমার গোঁফের উপরেই প্রথম নজর পড়েছে!' নবীন সেন বয়সের তুলনায় দেখতে নবীন, তদুপরি অক্ষয় সরকারকে তিনি দাদা সম্বোধন করছিলেন, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সহাস্যে বললেন—'বটে! অক্ষয় আপনার দাদা, আর অক্ষয় আমার নাতি এবং অসাধারণী আমার নাতবৌ, অতএব তুমিও আমার নাতি।' 'অক্ষয়বাবুর কাগজের নাম সাধারণী—তাই বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন অসাধারণী।' অক্ষয় সরকারকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসতেন। অক্ষয় সরকারও প্রতিদান দিতে চেষ্টা করতেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'চাটুজ্যেদের অহংকার দেশে একটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অক্ষয় সরকার গুলি খেতেন। তাঁকে ঠেস দিয়ে বঙ্কিম বললেন, 'এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসের সমালোচনা হচ্ছিল। এক গুলিখোর বলল—বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর, তা না হলে বাবা, এমন রসিকতা কি কলম থেকে বের হয়?'

লোকটি অবশ্যই অহঙ্কারী—কিন্তু সকলের কাছে নয়। নবীন সেনকে ট্রেন-ফেল করিয়ে কিভাবে আটকে রাখার ফন্দী করেছিলেন, যা নবীনের কাছে 'জীবনের একটি সুখস্বপ্ন', তার বর্ণনা দেবার পরে নবীন প্রশ্ন করেছেন—'এই স্নেহবান, সুরসিক, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি লোকের কাছে ঘোরতর অহঙ্কারী বলিয়া পরিচিত?'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দূর কুটুম্ব সম্পর্ক ছিল—সেই সূত্রে বাল্যকাল থেকে পাঁচকড়ি বঙ্কিমকে জানেন। নিকট-মহলে বঙ্কিম কি রকম স্নেহতপ্ত ও রসোজ্জ্বল তার কিছু পরিচয় পাঁচকড়ি দিয়েছেন। পাঁচকড়ি তখন পাটনা কলেজে বি-এ পড়েন—কলকাতায় এসেছেন — বঙ্কিমের জামাতা রাখালচন্দ্র পাঁচকড়িকে 'প্রচার' পত্রিকার জন্য কিছু লিখতে বললেন। তদনুযায়ী পাঁচকড়ি ১৫ দিন পরিশ্রম করে 'প্রেম' সম্বন্ধে ৩৬ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ লিখলেন, যার মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্য থেকে প্রেমতত্ত্ব সংগ্রহ করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—যাতে 'পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির—সভ্য-অসভ্য, বর্বর-রাক্ষস—সকল জাতির চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রথার বিবরণ ছিল। প্রবন্ধটি পাঁচকড়ি তাঁর রাখালদাদার কাছে পাঠিয়ে দেন। দুদিন পরে উভয়ের সাক্ষাৎ এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচকড়ি তাঁর রাখালদাদার হাত থেকে সবেগে চপেটাঘাত পুরস্কার লাভ করলেন। রাখালচন্দ্র বললেন, 'হতভাগা, আর কিছু লেখবার পাওনি? শুনেছ, কর্তা (বঙ্কিমচন্দ্র) কি বলেছেন?—পাঁচুর আর বিয়ে না দিলে চলে না।' পাঁচকড়ি প্রবন্ধটি ফেরত পেলেন। আরও দু-একদিন ঘাঁটলেন। প্রবন্ধে বৈষ্ণবপ্রেমের, ঈশ্বরপ্রেমের বিবৃতি জুড়ে দিয়ে তাকে 'ধর্মসন্দর্ভে' পরিণত করে অতঃপর পাঠিয়ে দিলেন 'ধর্মপ্রচারকে' এবং সেখানে ওটি ছাপা হল। বঙ্কিম তা পড়ে বললেন, 'ছেলেটা ভারী দুষ্টু।—কিন্তু অসাধারণ মেধাবী।'

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ-কোপের এবং রসবোধের আরও দু-একটা ঘরোয়া নিদর্শন পাঁচকড়ি দিয়েছেন। নিজের লেখা সম্বন্ধে সরস কটাক্ষকে বঙ্কিমচন্দ্র উপভোগ করতে সমর্থ ছিলেন, তা পাঁচকড়ি জানিয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' বের হবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এক সম্পর্কের জামাই কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঁচকড়ি বঙ্কিমের বাড়ি গিয়েছেন। আহারাদির পরে কৃষ্ণধন শ্বশুরের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন, আর পাঁচকড়ি নীরবে ঘাড় নাড়তে ও পান চিবোতে লাগলেন। 'কতক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি পড়িয়া কি বুঝিয়াছ?' আমি মস্তক অবনত করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলাম, 'পায়োনীয়ারে দেখেছেন তো কান্দাহারে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে, সে কৃষ্ণ পোষাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি পাঠান— যেমন জন্ম, যেমন কর্ম, যেমন সংসার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।' এইটুকু বলিয়া আমি নীরব হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, 'আর এক বাটি ক্ষীর খা, আর দুটো রসগোল্লা খা—ব্যাপান্ত করেছিস বটে!' রাখালদাদা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই বাড়ির ভিতর হইতে ক্ষীর ও রসগোল্লা আনিয়া দিলেন। আমার তখন আহারে অরুচি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তিনটাই একদরের!' তিনি উঠিয়া যাইলেন। আমরা তিনজনে ক্ষীর ও রসগোল্লা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলাম।'

বন্ধুসংসর্গে, সাহিত্যিক সমাগমে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি আনন্দিত থাকতেন, চন্দ্রনাথ বসু তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। একবার তিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্কিমের বাড়িতে নিয়ে আসেন; সেখানে আরও উপস্থিত, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শীতকালের সন্ধ্যা এসে গেল। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব কমনীয়তা-মিশ্রিত অসীম প্রতিভা ও পুরুষত্বব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ!...কি স্ফূর্তি। স্ফূর্তিতে এই কথা যেন ফুটিতে লাগিল—ইহাই তো সুখ, ইহাই তো জীবন, এই রকমই তো চাই!'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে অনেকে আসতেন, অনেক হাসি আনন্দ গল্প হত—যাঁরা আসতেন তাঁরা বঙ্কিমের প্রতিভার টানেই আসতেন, কিন্তু যদি আসরে সঞ্জীবচন্দ্র উপস্থিত থাকতেন, কিংবা দীনবন্ধু, তাহলে সম্ভবত তাঁরা হাস্যপরিহাসের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুজনের সঙ্গই অধিক উপভোগ্য করতেন। সঞ্জীবচন্দ্র যাঁর প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়—তিনি তাঁর হাসির সম্ভার বোহেসেবী খুশিতে ছড়িয়ে বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন: 'বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। ...এক-একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।' সঞ্জীবচন্দ্র মানুষটি 'পুষ্পপ্রিয় সুখপ্রিয়, সৌন্দর্যপ্রিয়'। তাঁর বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও সাক্ষ্য: 'সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন।... উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিকট সমাগত হইতেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত।'

সঞ্জীব-দীনবন্ধুর সম্মিলন স্থলে বঙ্কিমও অনেক সময়ে উপস্থিত থাকতেন। সেখানে যেসব রসিকতা হত, তা একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ছিল না—যথেষ্ট রক্তমাংসের গন্ধ থাকত। রসিকতার সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র পাত্রবিচার বা বস্তুবিচার করতেন না, রসরত্নকে তিনি দুষ্কুল থেকেও আহরণ করতেন, এবং অশ্লীলতার আঁচলের তলায় উঁকি দিতে দ্বিধা করতেন না। এক পণ্ডিতের অত্যন্ত স্থূল এক রসিকতায় সংকুচিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে ত্বরিতে সরে গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তার চমৎকার ছবি দিয়েছেন, কিন্তু ঐ ছবি থেকে কেউ যেন মনে না করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা কাঁটা বেছে সরভাজা খেতেন। তাঁদের আড্ডায় যেসব গল্পগাছা হত, তার দু-একটি নমুনা শ্রীশ মজুমদার বা নবীন সেনের লেখায় পেয়েছি। শ্রীশ মজুমদার চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বউবাজারের বাসায় গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুকে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দিলেন—'ওঁকে চেনো না?—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম!' সেদিন সন্ধ্যায় বহরমপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এক প্রাচীন বন্ধু এলেন। 'সেদিন মিলনের আনন্দ ও হাস্য' দীর্ঘদিন পরেও শ্রীশ মজুমদার ভোলেননি। উক্ত বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রও এসেছিলেন, যিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ফোর্থ

জীবনের উত্তেজনা-পূর্ণ মুহূর্ত

চির-নূতন করে রাখুন।

সর্বদা হাতের কাছে নির্ভরযোগ্য ক্লিক III ক্যামেরা মজুত রাখুন। এবং জীবনের ক্ষণস্থায়ী পরম মুহূর্তগুলিকে আপনার স্মৃতিপটের ছবির মতই স্পষ্টভাবে চিরজীবনের জন্য সঞ্চয় করে রাখুন।

আগফা ক্লিকে অতি সহজে ছবি তোলা যায় তাই তাকে বলা হয় "এম অ্যাণ্ড শুট" ক্যামেরা। এই ক্যামেরা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক এবং নিখুঁত। অতি অল্প খরচে, নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবহার করা যায়।

- প্রতি ১২০ রোলের ফিল্মে আপনি ১২টি বড় সাইজের (৬×৬ সেঃমিঃ) ছবি পাবেন!
- সব সময়ে ব্যবহারযোগ্য চামড়ার খাপ, পোর্ট্রেট লেন্স এবং ফ্ল্যাশগানে— এ সবই পৃথক মূল্যে পাওয়া যায়।

স্পষ্ট, পরিষ্কার প্রিন্টের জন্য এবং এনলার্জমেন্টের জন্য সর্বদা আগফা-গেভার্ট ফোটো পেপার ব্যবহার করুন। প্রত্যেক অনুমোদিত-আগফা-গেভার্ট ডিলারের কাছে পাওয়া যায়।

লিভারকুসেনের আগফা-গেভার্ট, এ.জি.র সহযোগিতায় প্রস্তুত করে: দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার:
আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ
® ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগফা-গেভার্ট, অ্যান্টওয়ার্প লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক

দাম—
৫৬ টাকা ২৫ পয়সা
(এক্সাইজ ডিউটি সমেত, অন্যান্য কর পৃথক)

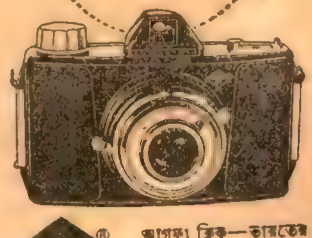

Agfa ®
আগফা ক্লিক—ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্যামেরা

SIMOES-AG-18 BEN

রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, হরে রাম

ইয়ারে পড়তেন। তাঁকে প্রশ্ন করে জানা গেল, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা তাঁর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়েন তবু উভয়ের মধ্যে আলাপ নেই। বঙ্কিম সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কি হে—এক ক্লাসে পড়ো, আলাপ নেই?' তাতে সঞ্জীবচন্দ্র বললেন, 'তা জানো না বুঝি? এখনকার ছেলেদের ভিতর নাম জিজ্ঞাসা করাটা ঘোর বেয়াদপি। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্যশিক্ষিতের সঙ্গে একজন সেকেলে লোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, তাঁর নামটি কি? নব্যবাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি আবার প্রশ্ন করিল, মশায়ের পিতার নাম কি? বাবুটি চটে লাল; বুড়োকে মারেন আর কি! ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া বাড়ির অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটিকে শুধাইল, বাবু, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে—আপনাদের রাগ কেন?'

কিন্তু এই রসিকতাই নাকি সঞ্জীবচন্দ্রের কাল হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে সংবাদ দিয়েছেন। সঞ্জীবচন্দ্র যখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হলেই পাকা হতে পারেন, সেই সময়ে ১৮৮৪ সালে ডিস্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাস হয়েছিল, যার দ্বারা তিনি জেলা শহরের অন্যতম কমিশনার হয়েছিলেন। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন চেয়ারম্যান, সাহেব জজ অন্যতম কমিশনার। একদিন কমিটিতে কথা উঠল—রাস্তার নাম দিতে হবে, টিনের উপরে নাম লিখে রাস্তায় রাস্তায় টাঙাতে হবে। স্থির হল, তার জন্য ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হবে। উৎসাহী জজসাহেব বললেন, 'আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাংলা নাম কে বুঝবে? ওগুলো ইংরেজীতে তর্জমা করে দিতে হবে। বৌমার গলি, বললে কেউ বুঝবে না, ডটার-ইন-ল্জ লেন বলতে হবে।' জজসাহেবের কথায় কারোরই আস্থা দেখা গেল না, তবু তিনি বারবার একই কথা বলে যেতে লাগলেন। তখন সঞ্জীবচন্দ্রের মুখ চুলকে উঠল। তিনি বললেন, '৭৫ টাকায় হবে না, আমি প্রস্তাব করি, আরও ৩০০ টাকা দরকার।' জজসাহেব উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন কেন?' সঞ্জীব বললেন, 'আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নাম ইংরেজীতে তর্জমা করা দরকার। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলে একজন হাকিম আছেন—কালীপদ মিত্র বললে কে বুঝবে—তাঁকে ব্ল্যাক-ফুটেড ফ্রেন্ড বলে তর্জমা করতে হবে।' সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। জজসাহেবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, সঞ্জীব, কাজটা ভাল করলে না; বাসায় গিয়ে ওঁকে ঠান্ডা করো। সঞ্জীব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জজসাহেব ঠান্ডা হননি। তিনি কিছুদিনের মধ্যে সরকারের সেক্রেটারী হলেন, তারপর দেখা গেল, উত্তীর্ণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের তালিকায় সঞ্জীবচন্দ্রের নাম নেই।

রসবোধ নয়, রসবোধের অভাবই সর্বজনীন। দেশীয় বিজ্ঞজনদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গিয়ে নবীন সেন কিরকম বিপাকে পড়েছিলেন, তার একটা মজার কাহিনী প্রসংগক্রমে বলে নেওয়া যায়। নবীন সেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য। সদস্যদের মধ্যে একটা সখের প্রতিযোগিতা চালু ছিল—বাংলা কথার মধ্যে ইংরেজী শব্দ আনলে শব্দ পিছু এক পয়সা দন্ড। নবীন সেন কোনো বিরস সদস্যকে খ্যাপাবার জন্য বলেছিলেন, অমুক ব্যক্তির নামে চিঠি দেবার সময়ে সার্কুলার রোড-এর বদলে 'চক্রাবর্ত্ম' লেখা উচিত। কলকাতার রাস্তাগুলির নামের বাংলা সংস্করণ করার প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন। তদনুযায়ী কলেজ স্ট্রীট হবে 'বিদ্যালয় বর্ত্ম', কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হবে 'কর্নবালিশ বর্ত্ম'। এই রসিকতা এবং নবীন সেনের অন্যান্য রসিকতা পূর্বোক্ত গম্ভীরানন্দের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। নবীন সেন হতাশ হয়ে বলতে চেয়েছেন, ঠাট্টা বুঝতে এইসব ব্যক্তিদের অস্ত্রচিকিৎসা দরকার। এঁদের কথাবার্তা শুনলেই নবীন সেনের হাসি পেত, আর তাতে এঁরা ক্ষেপে উঠে সজোরে টেবিল চাপড়ে চেঁচাতেন—'এ উপহাসের স্থান নহে, হাসিবার স্থান নহে।' নবীন সেন ধীরে বলতেন, 'তবে কি কাঁদিবার স্থান?'

বঙ্কিমচন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র অনেকের মতে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—এবং দীনবন্ধু প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক নাটকই লিখেছেন। দীনবন্ধুর রচনার হাস্যরস স্বভাবতই আমাদের আলোচনার বস্তু নয়—কিন্তু দীনবন্ধু মানুষটি যে তাঁর দৃষ্ট বস্তু এবং চরিত্রকে সাহিত্যে প্রায় হুবহু তুলে ধরতেন, একথা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অনুযায়ী জানতে পারি। তাঁর থেকে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতাও সেকালে কোনো বাঙালী লেখকের ছিল কিনা সন্দেহ। 'দীনবন্ধুকে রাজকার্যানুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।... গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি আহলাদপূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন।' সেইসঙ্গে দীনবন্ধুর ছিল অসীম মানবপ্রীতি। 'এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।' এইজন্য একদিকে দীনবন্ধু পীড়িত মানুষের বেদনাকে বেদনাহাস্যের সঙ্গে উন্মোচন করতেন, অন্যদিকে 'সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই,

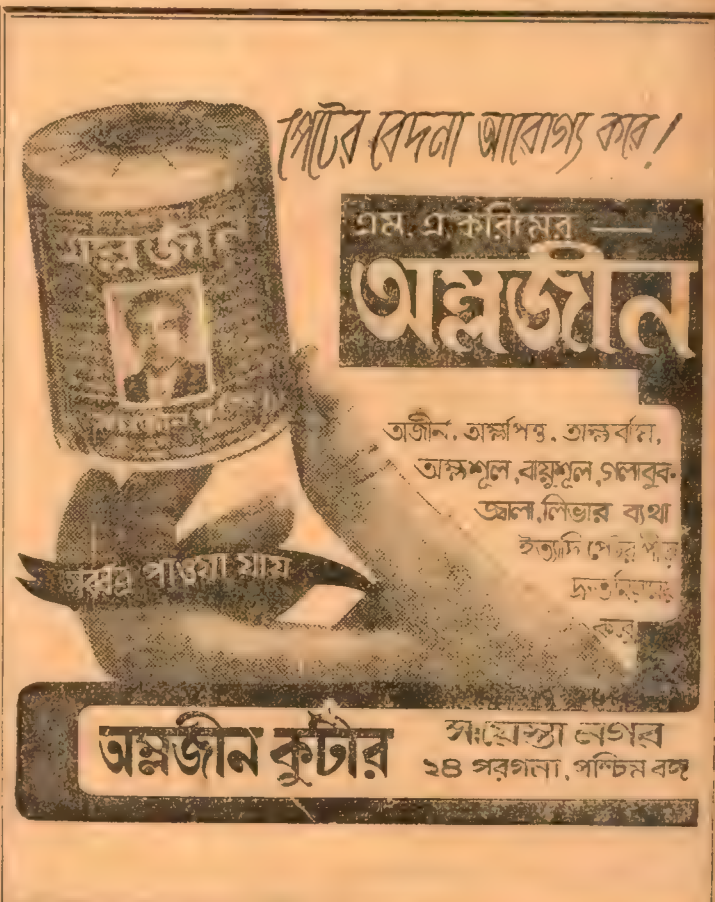

অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজসুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।'

দীনবন্ধু হাসতে ভালবাসতেন এবং হাসাতে ভালবাসতেন। 'যাহা কিছু স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়ে আসিয়া দাঁড়ায়।' এই ভূতের দলকে দীনবন্ধু কেবল সাহিত্যে নয়, কথাবার্তার সময়েও হাজির করতেন। তখন শ্রোতাদের মধ্যে কি বিপর্যয় কাণ্ড হত, তা ভাবলেও আনন্দে আতঙ্কিত হতে হয়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হয়ে একথা পর্যন্ত বলেছেন, দীনবন্ধুর সাহিত্য অপেক্ষা দীনবন্ধুর মুখের কথা' অনেক অধিক হাস্যরসাত্মক। 'তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে-সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতবর্গ মর্মের দুঃখসকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরসসাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসকল বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে, আর হাসিতে পারি না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেখানে সন্দেহ করবে কে! বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ হাস্যরস কাকে বলে জানতেন না, একথা বলে হাস্যরস সৃষ্টি করবেই বা কে? আর বঙ্কিমচন্দ্রই কেবল বন্ধুপ্রীতিবশে একথা বলেছেন তা নয়, যাঁরাই দীনবন্ধুকে জানতেন তাঁরাই একই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন, 'দীনবন্ধুর নাটক-সকল উগ্র হাস্যরসাত্মক হইলেও তাঁহার আলাপ ততোধিক উগ্র হাস্যোদ্দীপক ছিল।... তাঁহার কাছে আধ ঘণ্টা বসিলে পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইত। তিনি আসিতেছেন, এ সংবাদে যেন যশোহরে একটি আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল।...দীনবন্ধুবাবুর শ্যামবর্ণ স্থূল দেহ, মধ্যমাকৃতি চক্ষু ক্ষুদ্র কোটরস্থ, কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্যোতিসম্পন্ন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় তাঁহার গম্ভীর মূর্তি। তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিত, কিন্তু তিনি নিজে কদাচিৎ হাসিতেন।'

দীনবন্ধুর মুখের হাসির কথাগুলি প্রায় সংগৃহীত হয়নি। তাতে খুব বেশী ক্ষতি হয়নি, কারণ তিনি নিজে হাস্যরসের বড় লেখক। যা হোক, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধুর হাসির কিছু তথ্য-পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতেও 'হাস্যরসে ও বাকপটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র—এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন।' পূর্ণচন্দ্র অবশ্য গুরুচরণ বাঁড়ুজ্যে নামক শক্তিপুরের এক ভাঁড়ের কাছে 'অপরাজেয়' দীনবন্ধুর পরাজয়ের ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। দীনবন্ধু কিভাবে পরাভূত হতেন, তার দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টাও করেছেন। ঐ দৃষ্টান্তগুলি থেকে গুরুচরণী ভাঁড়ামির অতিরিক্ত কিছু পাই না, এবং দীনবন্ধুর পরাজয় যে স্বেচ্ছা-পরাজয়, নিছক মজা উপভোগ করবার জন্যই, তাও বুঝতে পারি। দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করলে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসবোধের উপরে খুব কটাক্ষ করা হবে বলে তা থেকে বিরত থাকছি। আসল ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। তিনি লিখেছেন, 'অনেক লোক আছে যে, নির্বোধ অথচ আত্মাভিমানী। দীনবন্ধু...কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকেই দীনবন্ধুর কিছু উচ্চাঙ্গের মৌখিক রসিকতার পরিচয় পাই। জীবনের শেষের দিকে, যখন দীনবন্ধুর হাস্যরসপটুতা কমে এসেছে মনে হয়েছিল, তখন এক রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এক বন্ধুকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন, 'দীনবন্ধুর রসউদ্দীপনশক্তি শুখাইয়াছে কিনা?' দীনবন্ধু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বন্ধুদের হাসাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনেরগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।' এহেন শক্তি কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ প্রবল থাকতে পারে না। তবু একেবারে নিস্তেজ হয়নিও। 'অনেকেই জানেন যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক। প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়। তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ একটি বামপদে হইল। এই সময়ে তাঁহার পূর্বোক্ত বন্ধুটি কার্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ফোড়া আমার পায়ে ধরিয়াছে।'

মানুষটি হাসতেন—অপরাজেয় হাসি। তাঁর হাসি ঈশ্বর গুপ্তের হাসি নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পারিবারিক জীবন বড় দুঃখময়। নিতান্ত কুরূপা অযোগ্যা পত্নী তাঁর। ভাগ্যের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে হাসির লড়াইয়ে তিনি নেমেছিলেন। অপরপক্ষে দীনবন্ধুর হাসি সুখপূর্ণ জীবনের এবং সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের অভিব্যক্তি। 'সাধ্বী, স্নেহশালিনী, পতিপরায়ণা পত্নী তাঁর। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়ই—দীনবন্ধু ব্যতিক্রম। একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঝগড়া বাধাবেনই, কিন্তু 'প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন কি তাঁহার সহধর্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস-দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ নাই।'

কি করবেন—বিধাতা দীনবন্ধুকে দ্বিতীয় রিপুতে বঞ্চিত করেছিলেন। রাগা উচিত অথচ রাগতে পারছেন না, কী অন্যায়!—বঙ্কিমচন্দ্র অনুযোগ করলেন। দীনবন্ধু তখন প্রাণপণে রাগতে চাইলেন, পারলেন না, অপ্রতিভ হয়ে বললেন—'কই, রাগ যে হয় না!'

রানী দর্শন

মনোজ বসু

নামও শোনেন নি? তা কেন শুনবেন। ডাকসাইটে সুন্দরী বলতে আপনারা পদ্মিনী নূরজাহান ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি জেনে আছেন। রানী তিলোত্তমা এখনো রক্তেমাংসে বর্তমান পড়শিরাজ্য বাংলাদেশে। পঁচিশটা বছর আগে একই দেশ ছিল—হায়রে হায়, সেই আমলে কেন দেখলাম না। মনে মনে নিজের গাল চড়াই। সেই ত্রুটি এতদিনে মেরামত করে এলাম। শুনুন।

ডি সি সাহেব খাতির করে একটা জীপ দিয়ে দিলেন: যে কটা দিন আছেন ইচ্ছে মতন ঘোরাঘুরি করবেন। তিনকড়ি প্রস্তাব দিল: তবে চলুন নরসিংগড়—রানী তিলোত্তমা যেখানে। অনেক দিন ওখানে কাজ করেছি সমস্ত চেনা জানা। বাংলা একষট্টি সনে কুমার বাহাদুর দেহ রাখলেন, ইস্তফা দিয়ে আমি হিন্দুস্থানে সরে পড়লাম।

ভর সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। গড়ের পাঁচিল অন্ধকারের মতন কালো। বিধাতা যে দিন পৃথিবী গড়লেন, নরসিংগড়ও সম্ভবত সেই দিনের গড়া। অনাদিকাল রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝাপটা খেয়ে খেয়ে কালো চেহারা দাঁড়িয়েছে। অতিকায় দৈত্য দিগন্ত জুড়ে হাত-পা মেলে আকাশ অবধি মাথা তুলে আছে, এমনি মনে হয়।

ফটকের সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ—বড় বড় বট অশ্বত্থ ঝাউগাছ এখানে ওখানে। বাজার ছিল, অগ্নিকাণ্ডের পর এই দশা—

তিনকড়ি বলে জাঁকের বাজার—এদেশ-সেদেশ জুড়ে নাম। নদীর কিনারা ধরে সারবন্দি মহাজনি গদি—

এদিক-ওদিক তাকাই: নদী কোথায়?

তিনকড়ি হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়: ধান ক্ষেত দেখতে পাচ্ছেন, ঐখানটা ছিল। খরস্রোত নদী—নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ। শিল্প কর্মের জন্য নামটা বেশি ছড়িয়েছিল। বিশেষ করে হাতির দাঁতের কাজ, সুন্দরি আর আবলুশ কাঠের কাজ, বেতের কাজ, গালা আর শোলার কাজ, তুলটকাগজে আঁকা পটের ছবি। পাইতক্কের মধ্যে কোথাও অমন জিনিস মিলত না। শৌখিন লোকে দোকানে দোকানে ঘুরে পছন্দ করত, পাইকারে লট ধরে কিনে নৌকোয় চালান দিত। ব্রহ্মার কোপে রাত্রের মধ্যে পুড়ে সমস্ত ছাই।

বিদ্যুৎ চমকাল। মাথার উপর চেয়ে দেখি অবস্থা খারাপ। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। বেশ এক চোট ঢালবে, বেশি দেরিও নেই তার। তাড়াতাড়ি কোথাও ঢুকে পড়া দরকার।

তোফা অতিথিশালা আছে ঢুকলেই হল। তিনকড়ি চেঁচামেচি লাগিয়েছে: চাটুজ্জে মশায় কোথা, কোন কামরা আমাদের দিচ্ছেন? তিনজনে থাব—আমরা এই দুজন আর ড্রাইভার।

তিনকড়ির খাতিরে ভাল কামরাই মিলল। কামরায় আবার তক্তাপোষ। নীলকমল চাটুজ্জের নিজস্ব জিনিস—অতিথি সংকারে দিয়ে আজকের রাতটা সে মেজেয় গড়াবে। রন্ধনে এখন ঘোরতর ব্যস্ত। বৃষ্টি নামবার আগেই রাঁধাবাড়া শেষ করতে হবে, অতিথির অদৃষ্টে নয় তো হরিমটর। যে কামরায় বসে আছি, ছাত পড়ে যাওয়ার দরুন উপরটা গোলপাতার ছাউনি—তাতে মোটামুটি বৃষ্টি

ঠেকায়। কিন্তু রান্নাকুঠুরিতে প্রাচীন হাত বজায় থাকার ফলে বাইরে কোঠা কোঠা পড়তে শুরু হলেই ভেতরে নাকি মুখলথরে পড়বে। কেন পড়ে, ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বরের উপর যাবতীয় দায় চ পরে চাটুজ্জে মুক্ত রান্নাকুঠুরি গিয়ে উনুনের মুখে মোটা মোটা কাঠ ঠাসতে লাগল। ভাত যাতে তাড়াতাড়ি ফোটে।

দুজনে তক্তাপোষে চেপে বসেছি। তিনকড়ি আর আমি। হেরিকেন টিম টিম করছে। জানলা দিয়ে মাঠে তাকাই। প্রাচীন বনস্পতিরা এক এক বোঝা জমাট অন্ধকার যেন। দু-পাঁচ গন্ডা জোনাকি তাদের গায়ে।

তিনকড়ি বলে, ঐ সব গাছগাছালির মধ্যে ভূতপেত্নী নাকি কিলবিল করে বেড়ায়। এক-শ টাকা বাজি ধরলেও আমরা এদিকটা মাড়াতাম না। জমজমাট বাজার, কত লোকের ঘরবসতি, কাজকর্ম সেরে নিশ্চিন্তে সব শুয়ে পড়েছে— সকালবেলা ছাই আর পোড়াকয়লা ভিন্ন অন্য কিছু নেই। বেঁচেছিল সন্ন্যানাই।

বাতাস কম, গাছের পাতাটি নড়ে না। বৃষ্টি নামল বলে। চারি দিক স্তম্ভিত। মাঝেমধ্যে তক্ষক ডেকে ডেকে উঠছে—তা ছাড়া কোন দিকে কোন রকম শব্দ নেই। দল আটকে আসে, বিশাল অট্টালিকা ইটকাঠের বোঝা নিয়ে বুকের উপরে যেন দ্রুপে বসেছে। তবু রক্ষা, তিনকড়ি অবিরত বক বক করে যাচ্ছে পাশটিতে বসে।

নিশিরাত্র আগুন। গোল পাতায়-ছাওয়া চৌরি ও বাংলা ঘর বেশির ভাগ। টিনের ঘরও খানেক হবে। আগুন দেখে যত শিককার যত বাতাস যেয়ে এসে পড়েছে, চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। লালঘোড়া দাবড়ানো বলে না—ওর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর হয় না। অদৃশ্য সওয়ারেরা এক লাখ দু-লাখ রক্তবরণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে অন্তরীক্ষে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, লাফিয়ে পড়ছে এ-ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে। আগুনের গতিক দেখে মনে হবে তাই। আকাশ রাঙা—আকাশেও বুঝি আগুন ধরে গেছে।

তখন তুমি ছিলে নরসিংগড়ে? নিজে দেখেছ?

হি-হি করে হেসে তিনকড়ি বলল, মুখে মুখে শোনা। জন্মই হয়নি তখন আমার। সেকি আজকের কথা?

নীলকমল চাটুজ্জে এই সময় ঢুকল। বাবাজি এঁটে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে এসেছে, কোণের দিকে সাবধান করে রাখল। বৃষ্টিবাদলার উপর ক্ষেপে গেছে : ভদ্রলোকেরা এলেন, একখানা দু-খানা তরকারি বানাব—তা একটুখানি সবুর মানল না, গুড়ি গুড়ি আরম্ভ করে দিল। রাঁধাভাত শেষটা জলে ভাসবে—হাঁড়ির মুখে তাড়াতাড়ি সরা চাপা দিয়ে সরিয়ে আনলাম। তব ভাগ্যিস ভাতের মধ্যে কলা বেগুন, কুমড়ো ছেড়ে দিলাম। ভাতে ভাতই শুধু, তার উপরে কিছু করতে দিল না।

খাসা হবে—। বলে চাটুজ্জেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি : বিনি মশলার সিদ্ধ তরকারিতে ভিটামিন ষোল আনা থেকে যায়। শরীরের পক্ষে ভাল।

তিনকড়ির মাথায় অগ্নিকাণ্ড ঘুরছে। বলে, চক্ষুে দেখেছিলেন এই চাটুজ্জে মশায়। অন্যেরা ফৌত। অন্তত নরসিংগড়ে কেউ নেই।

নীলকমল প্রতিবাদ করে ওঠে : কেন, রাণী তিলোত্তমা? আসল জনকেই বাদ দিচ্ছ। আগুন লেগে সকলের সর্বস্ব গেল, কপাল খুলল কেবল সুরেন সিংহির মেয়ের। তিলু সিংহি হয়ে দাঁড়ালেন রাণী তিলোত্তমা।

রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি, জমে আসছে। তক্তাপোষে পাশের জায়গা দেখিয়ে বলি, দাঁড়িয়ে কেন চাটুজ্জে মশাই। বসুন।

বসতে বসতে নীলকমল পরিচয় দিচ্ছে। সুরেন সিংহি মস্ত দরের কারিগর, হাতির দাঁতের জিনিস গড়তেন। এ অঞ্চলের মানুষ নন—সুরেনের ঠাকুরদাদা কোন পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে নরসিংগড়ে দোকান ফেঁদেছিলেন নাকি। কথাবার্তায় কিছু মালুম পাবেন না, তবে রংটা অতিরিক্ত ফর্সা আর মেয়েদের কড়া রকমের পর্দা।

নীলকমলের বাপ বিশ্বম্ভর তখন রান্নাবাড়ির প্রধান—যতগুলো পাচক ছিল সকলের মাথার উপরে। স্বহস্তে দুখানা-তিনখানা তরকারি রাঁধতেন—একেবারে অমৃত। কুমার বাহাদুর বড্ড পেয়ার করতেন তাঁকে। ছেলেমানুষ নীলকমল বাপের কাছে থাকত। রাত দুপুরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, হাত ধরে বাপ হেঁচকাটান দিলেন : আগুন, আগুন—ছুটে ফাঁকায় চলে যা। সদ্য ঘুম-ভাঙা বালক নিরাপদ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছে, সম্বিত আছে কিম্বা নেই—

কুমার বাহাদুর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছেন। শত শত পিতলের কলসি এনেছে, আগুনের আভায় ঝিকমিক করছে। মেটে কলসি এবং ভাঁড়ও অজস্র। নদী থেকে জল ভরে একদল অন্য দলের হাতে দিচ্ছে, এবং তাদের হাতের খালি কলসি নিয়ে ছোটে আবার নদীর দিকে। ভরা কলসি এ-দল থেকে ও-দলে—লোকের হাতে হাতে চলে কলসির জল অবশেষে আগুনে গিয়ে পড়ে। রোখা যাচ্ছে না আগুন। খুঁটি পুড়ে গিয়ে চালগুলো একের পর এক ভুঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। প্রচণ্ড বাতাসে ফুলকি উড়ছে চারিদিকে—অগ্নিবৃষ্টির মতো দেখায়। বুক চাপড়াচ্ছে মানুষ পাগলের মতন, আর্তনাদ করছে। গেল গেল, সব গেল আমার—ছুটে লোকটা আগুনের মধ্যে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে চায়। পাঁচ-সাতজনে গিয়ে জাপটে ধরেছে—কিন্তু লিকলিকে দেহে যেন অসুরের বল, ধরে রাখতে ওরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কান্না কোলাহল আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে কুমার বাহাদুরের হুকুমহাকামগুলো স্পষ্ট সকলের কানে আসছে। বরুন ঘাটের উপর তবু যেন সিংহ হয়ে গর্জাচ্ছেন এদিক-সেদিক।

কী হল হঠাৎ—মানুষের কান্নাকাটি বুক-চাপড়ানি, কলসি নিয়ে শতেক জনের ছুটোছুটি, কুমার বাহাদুরের গর্জন লহমায় স্তব্ধ। যে যেখানে যেমন অবস্থায় ছিল, মন্ত্রার্পিতবৎ সেইখানে সে রইল। কিসে কি হল, কয়েক সেকেণ্ড কেউ বুঝতে পারে না। তারপর মালুম হল। সতের আঠার বছরের মেয়েটা, সুরেন কারিগরের ঘরে তিলু, ঘুম ভেঙে স্বল্পবাসে আলুথালু অবস্থায় প্রজ্বলিতাগ্নির ভিতর থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়েছে। চতুর্দিকে চেয়ে দেখে তারপর তীর বেগে কুমার বাহাদুরের কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে পড়ল : ঘরবাড়ি জ্বলছে, বাবা-মা আটক পড়ে গেছে, আমরা পথের ভিখারি হলাম।

VOA

মিডিয়ম ওয়েভ,
১৯০ মিটারে শুনুন

ভয়েস অব
আমেরিকা

বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৮-৩০ মিঃ থেকে
৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত
শর্ট ওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড
১৯, ২৫ ও ৩১
মিডিয়ম-ওয়েভ ১৯০ মীটার

কুমার বাহাদুরও কেমন হতভম্ব, কী অবস্থায় কেন যে এই নদীকূলে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল যেন বিস্মৃত হয়ে রইলেন। যত মানুষ দেখছে, সবারই এই দশা। আধবুড়ো একজনের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে তিড়িং মিড়িং করে লাফাচ্ছে, আর একজনে ভাঁড়ের জল ছিটাচ্ছে কাপড়ের আগুনে—সর্বনেশে ব্যাপার। জল ছিটানো বন্ধ, এবং মানুষটার দাপাদাপিও। ছুটোছুটির মধ্যে একটুকু দাঁড়িয়ে পড়ে—বলতে গেলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ তার ভিতরেও মেয়েটাকে একনজর না দেখে পারে না। অসম্ভব রূপসী—কুমার বাহাদুর বলছেন রূপসী প্রলয়ংকরী। দর্শনেই রক্ত আগুনে ধরিয়ে দেয়।

বাপ-মা ও গজদন্তের কারবার পুড়ে ছাই। মেয়েটাও যে যত্রতত্র ঘুরে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াবে, কুমার বাহাদুর তা হতে দেবেন না। তিনুকে গড়ের ভিতরে নিয়ে তুললেন। বিয়ে করবেন না—ষাটে পৌঁছানোর পর মনে নিয়েছেন, বিধাতা বিমুখ। নিরাশ হয়ে ঐ কর্মে পাকাপাকি ইস্তফা দিয়েছেন। সারা জন্ম বিয়ের পর বিয়ে করে এসেছেন। কতগুলো, ঝট করে বলা যাবে না— হিসেব করে দেখতে হয়। বেশির ভাগই আগেভাগে স্বর্গে গিয়ে সতীলোক আলো করে আছে। সে আমলে লোকে দশ-বারো বছরে কন্যাদান করত, বিয়ের পরে তখন বছর দশেক সময় দিয়ে পরের বিয়ের বসতেন। তারপরে কনে ক্রমশ ধুবেড়ো, আরও ধুবড়ো পাওয়া যাচ্ছে—ষোল আঠারো বিশ বাইশ। কুমার বাহাদুরের বয়সও বেড়ে যাচ্ছে—এ-বিয়ে আর পরের বিয়ের মাঝের ফাঁক দশ বছর থেকে কমতে কমতে শেষটা তিন-চারে এসে ঠেকল। ষাট পেরিয়ে এসে কুমার বাহাদুর দুঃখ করে বলছেন, আমার কসুর নেই—পিতৃপুরুষেরা উপর থেকে দেখেছেন। পিণ্ড-লোপ না হয়, প্রাণপণে আমি চেষ্টা করে এসেছি। লাভ হল না, ক্ষেপে ক্ষেপে মেয়েগুলো পটাপট পটল তুলে গেল। পরিশেষে সবাই স্বর্গে যায়।

আর বিয়ে নয়, কুমার বাহাদুরের প্রতিজ্ঞা। রইলেনও ছটা বছর চোখকান বন্ধ করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল। লোকজনদের বললেন, আয়োজনে লেগে যাও—উপায় নেই। সত্তর ধরি-ধরি করেছি, কবে আছি কবে নেই। খুব তাড়াতাড়ি।

আড়ালে আবডালে লোকে রস-রসিকতা করে : শেষমেষ উপযুক্ত রানী বাছাই হল। দরাজ মন, দরাজ মেজাজ। আমলা গোমস্তা ইস্কুলের মাস্টার প্রজা-পাঠক আত্মীয়কুটুম্ব কুমার বাহাদুরের সবাই হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁর সাধ পুরণে কেউ পিছপাও হবে না। ছেলের মুখ দেখেই তিনি চোখ বুজতে পারবেন।

এর উপরে কেউ টিপ্পনী কাটে : চোখ বোজার আগে না-ও যদি দেখেন, পরলোক থেকে পরে ঠিক ছেলে দেখতে পাবেন।

কিন্তু ছেলের মুখ দেখার আশায় বিয়ে নয় এবারে।

তিনকড়ি হাসতে হাসতে নীলকমল চাটুজ্জের দিকে তাকাল : চুপচাপ কেন চাটুজ্জে মশায়, একদিনের ব্যাপার তো আপনারই চোখের উপর। এখন আর বলতে কি—বলুন না সারকে।

কুমার বাহাদুর থাকতে গড়ে মানুষ কিলবিল করত। রান্নাঘর, ভোজনঘরও সেই অনুপাতে—পাশাপাশি দুই প্রকাণ্ড কোঠাঘর। বিশ্বম্ভর বুড়ো হয়ে যাওয়ায় তার কাজটা ক্রমশ এই নীলকমলে বর্তাল। ভোরের বেলা একসঙ্গে ছটা উনুনে আগুন পড়ত। পাচকেরা রাঁধত, —ধবধবে পৈতের গোছা গলায় ঝুলিয়ে নীলকমল তদারক করে ঘুরত। খুন্তি দিয়ে এই উনুনের তরকারি একটু তুলে দেখল, ঐ উনুনের মাংস টিপে দেখল, সিদ্ধ হয়েছে কিনা, মাছের কালিয়ার একটুখানি হাতের তেলোয় ঢেলে সোঁ করে মুখে টেনে নুন-ঝালের পরখ করল। ছ-ছটা উনুনে রাবণের চিতার মতো আগুন দাউদাউ জ্বলছে, তার মাঝখান দিয়ে অবিরাম ঘোরাঘুরি—মাংস-মাছ সিদ্ধ হয়েছে এবং নীলকমল নিজেও অর্ধেক সিদ্ধ। চুকেবুকে যেতে রাতদুপুর। সারাক্ষণ রাঁধাবাড়া, রান্না-কর্ম, পাতা পেড়ে দলে দলে খাওয়া ও দেওয়াথোওয়া—সমস্ত শেষ হয়ে আলো নিভেছে। বিশাল-গহ্বর সারি সারি নিভন্ত উনুনের উপর হয়তো বা জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়ল। রান্নাঘর ভোজনঘর নির্জন-তায় থমথম করছে। এমনি এক নিশি-রাত্রে নীলকমল বিশেষ একটু কাজে আবার রান্নাঘরে এসেছে। কাজটা বলেই ফেলুন না। সুখদা কবে মরে গেছে—এখন আর বলতে বাধা কি?

বয়সের ধর্মে সুখদা দাসীর সঙ্গে নীলকমলের একটু ইয়ে মতন হয়েছিল। বিধবা সুখদা লোকনিন্দার ভয়ে প্রকাশ্যে মাছ খেত না, অথচ মাছে বড় লোভ। নীলকমল ভাল গলদাচিংড়ি কি রুইয়ের মুড়ো সুযোগ মতন উনুনের পাশে লুকিয়ে রাখত, রাত্রে চুপিসারে গিয়ে খাওয়াত। আজও সেই বাবদে চোরের মতন পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসেছে—

বিশাল ভোজনঘরে সহসা খলখল হাসির শব্দ। চুরুটের আগুনও দেখা যায়। জ্যোৎস্না রাত্রি, এবং একেবারে পাশের ঘর। সুড়ুত করে নীলকমল উনুনের অন্ধিসন্ধির ভিতরে গিয়ে বসে পড়লেন। রাত্রির শেষযামে কুমারবাহাদুর দ্বিরিধর শামিনকে নিয়ে এই নির্জনে কোন কাজে এসেছেন, না দেখে যাওয়া যায় না।

দেখবারই বস্তু বটে। জায়গাটা জন-হীন ভাবা গিয়েছিল, তা নয়—কোঠাঘরের শেষ প্রান্তে গরুছাগলের মত দড়ি দিয়ে বাঁধা তিন ছোকরা। নতুন ইস্কুল হয়েছে তার শিক্ষকদের একজন, অপর দুটি কাছারির কর্মচারী। দড়ি খুলে একটিকে দ্বিরিধর কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি আনলেন। কৃত্তিবাস মানুষ তিনি—সদালাপী সদাহাসামুখ, জিভ টেনে টেনে জায়গা জমি জরিপ করে বেড়ান। গোপন রাত্রে মনিবের হুকুমে দানব হয়ে উঠেছেন তিনি এখন। হাত দেড়েক লম্বা দাঁড়ের চাবুকে ছোকরাকে বেদম পেটাচ্ছেন। পেটানোর পদ্ধতিও রীতিমত চমৎকার—সর্বশক্তিতে প্রহারের পর তরঙ্গে তরঙ্গে হাসতে থাকেন কুমার বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে। পর-ক্ষণে গাম্ভীর্য। অন্য একটিকে এনে ধরলেন এবার। ঐ একই ধরনে প্রহার—একই ঢঙে হাসি ও গাম্ভীর্য। তারপরে তৃতীয়জন। সে ছোকরার উপর যথাবিধি প্রয়োগ সমাধা করে আবার প্রথমটিকে নিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ক্রম কিছু বিশ্রাম হয়ে গেছে, বলবার কিছু নেই। একেবারে হিসাব করা— মনে হয়, মারের সময় চাবুক কতবার চলল সঠিক ওঁরা

কল্লোল যুগের অন্যতম কবি অজিত দত্ত সম্পাদিত

এখন রাখাল বাণীপ্রিয়র জন্য শাশ্বত স্বীকারোক্তি

কাব্যগ্রন্থে কৃত্তিবাস গোষ্ঠির দুই খ্যাতিমান পুরোধা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিজিৎ ঘোষের কবিতাবলী আপনাকে এক নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করবে। সত্তরের তরুণতম কবির এই গৌরবময় স্বীকৃতি আজ বড়ো কম কথা নয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত অভিজিৎ ঘোষের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ

ইতস্ততঃ আমার অস্তিত্বে

অরিন্দম ॥ ২১/১ গড়িয়াহাট রোড (প) কলিকাতা—৩১

পেশে যাচ্ছেন। এক কিস্তি হয়ে যাবার পর ক্রূরশান্ত হাসি এবং পরবর্তী গাম্ভীর্যটুকুও মিনিটের হিসাবে মাপা রয়েছে। আরও মজা, এত মার খেয়েও টুঁ শব্দটি নেই কারো মুখে।

চলছে একাদিক্রমে, অকস্মাৎ কুমার-বাহাদুর হাত তুলে গম্ভীর চাপা গলায় বললেন, থামো—। চাবুক সবেগে উঁচানো তখন—গিরিধর আমিন কোন গতিকে সামলে নিলেন। দস্তুর মতো ভয় পেয়ে গেছেন। মার আধখানা বেশি হয়ে গেছে, কুমার বাহাদুরের নয়তো ও-রকম কণ্ঠস্বর কেন?

কুমার বাহাদুর বললেন, তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ আমিন মশায়। ঘোরতর অন্যায়। শাস্তির ব্যাপারে তোমার উপরে নির্ভর করা চলবে না, তোমারই বরঞ্চ শাস্তি হওয়া উচিত।

একটানে গিরিধরের হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিলেন। আমিন ঘাড় নিচু করলেন। চাবুক এবার বুঝি তাঁর উপরেই পড়ে। তা পড়বে না, সঠিক জানেন নীলকমল—কুমার বাহাদুর আজা-মোজা কিছু করেন না। যথোচিত তৌল করে দেখে তবে শাস্তির হুকুম হয়।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে কুমার-বাহাদুর বললেন, তোমায় কাল ডাকব আমিন মশায়। বাকিটুকু সেরে ওদের বিদেয় করে দাও।

হাতের চাবুক নিয়ে নিয়েছেন—এর পরের কাজটা কি, নীলকমল তাকিয়ে পড়ে দেখছেন। তিন ছোকরারই মুণ্ডের নিচে গিরিধর থাবা দিলেন, তারা হাঁ করে পড়ল। দুটো আঙুল গালের ভিতর চুকিয়ে ঢুকিয়ে আলগোছে কাপড়ের বল বের করে আনলেন—একে একে তিনজনেরই। ন্যাকড়া জড়িয়ে বলের মতন করে তাদের মুখবিবরে ঢোকানো ছিল। নিঃশব্দে মার খাওয়ার অর্থ বোঝা যাচ্ছে এবার—আওয়াজ বেরুনোর উপায় ছিল না। মুখ যেই মাত্র খালি হয়ে যাওয়া, তাগড়া তাগড়া জোয়ান ছেলে কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে—কুমার বাহাদুরের করুণা উদ্রেক হবে।

কুমার বাহাদুর বললেন, দিনমানে খাটবে রাত্রে মনের সুখে ঘুমোবে। তা নয়, রাত-দুপুরে তিন্দুর জানলায় ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো। দিনমানে কাছারির হাতবাক্সর সামনে বসে বসে ঢুলুনি—সামান্য যোগটা বিয়োগটাও নির্ভুল হয় না।

ছোকরারা নির্বাক।

জানো, তিলোত্তমা কে?

আজ্ঞে, সুরেন সিংহি মশায়ের মেয়ে।

ছিল তাই। হবে নরসিংগড়ের ছোট-রানী। আমি বিয়ে করব।

গজর গজর করছেন খানিকটা আপন মনে: ভেবে ছিলাম চিরজীবনের মতো এই কর্মে ইতি। হতে দেবে তাই? সৎছেলে খুঁজে খুঁজে এনে এস্টেটের কাজে লাগালাম, শিক্ষিত ছেলে খুঁজে খুঁজে ইস্কুলের কাজে বসালাম—কাজে মন নেই, তিলোত্তমার ঘরের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা। আজকের তিনটে নিয়ে মোট কতয় দাঁড়াল আমিন মশায়?

গিরিধরের হাজির-জবাব: সাত-চল্লিশ, হুজুর।

আরে সর্বনাশ! কুমার বাহাদুর শিউরে উঠলেন: দেরি করলে লোক আর একটা ভাল থাকবে না। সকাল থেকেই লেগে যাও। শেষ কাজ আমার—আয়োজনে কোনরকম খামতি না থাকে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলেন, লোকের বাড়ি কত রকমের মচ্ছব—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, ছেলেমেয়ের বিয়ে। আমার সারাজীবন একই মচ্ছব শুধু—নিজের বিয়ে। এ ছাড়া মানুষ-জন খাওয়ানোর আর কোন উপলক্ষ নেই।

বিয়ে খুব জাঁকজমকে হয়েছিল। বিরাট ভোজ—তল্লাটের বুড়োমানুষদের মুখে এই বিশ-পঁচিশ বছর আগেও বর্ণনা পাওয়া যেত। এখন তাঁরা সব ফৌত হয়ে গেছেন। যদ্দিন কুমার-বাহাদুর ছিলেন, রানী তিলোত্তমা ছিলেন অতিশয় তোয়াজে—

মেঘ থমথম করছে, আকাশ অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে এদিকে সেদিকে। তিনকড়ি জানলা দিয়ে মাঠের পানে চেয়ে আছে। বলে, এই ঘরেই শুয়ে ছিলাম একদিন। রাতদুপুর। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রচণ্ড ভয়। ঘুম ভেঙে গেল আমার। বিদ্যুতের ঝিলিকে কালো কালো ছায়ামূর্তি দেখলাম—মাঠজুড়ে ছুটোছুটি করছে। আগুনে অনেক লোক পুড়ে মরেছিল, অপঘাতে মরে ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্য হয়ে মাঠে তারা আস্তানা গেড়েছেন, লোকে বলত। গা শির-শির করে উঠল, জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছি—টাহর পেলাম, হাতে লাঠি লোকগুলোর। ভূত না হয়ে খুনে ডাকাতও হতে পারে। ছুটোছুটি করে দমাদম ভুঁয়ে লাঠির বাড়ি মারছে। পরের দিন জানলাম পরিষ্কার হল—কুমার-বাহাদুরের মাইনে-করা বরকন্দাজ তারা সব। ব্যাঙের ডাকে রানী তিলোত্তমার পাছে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, সারা রাত তারা ব্যাঙ তাড়িয়ে বেড়ায়। কুমারবাহাদুর বর্তমানে এত বাহার ছিল রানী তিলোত্তমার।

সকাল বেলা। নীলকমলের ব্যবস্থায় দুজনের দু-কাপ চাও মিলেছে। তিনকড়ি বলল, কটা বাজল দেখুন তো। হ্যাঁ, রানী এইবার দরবারে বসবেন। দেখা হবে, উঠুন।

এ-বারান্দা সে-বারান্দা, এঘর-ওঘর করে যাচ্ছি। তিনকড়ি বলে, গোলকধাঁধা। পৌঁছব ঠিকই—একই পথ ধরে যাব, ধরে বসেন তো মুশকিল। আমি তো পারিনি কখনো।

দরদালান। আঁটা দেয়াল দুদিকে—হাঁটছি তো হাঁটছিই। দিনমানেও এখন ঘোর অন্ধকার। টর্চ জেবলে মাঝে মাঝে পথ দেখে নিচ্ছি। আলো দেখতে পেয়ে চামচিকে অমনি চতুর্দিকে ফরফর করে ওড়ে। গায়ে না পড়ে—তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলি। চামচিকে ওড়াও বন্ধ, কড়িকাঠে পা এঁটে নিম্নমুখ হয়ে যথাপূর্ব ঝুলছে। পিছনে তাকাই—অতল অন্ধকার। সামনে তাকাই—কোন কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার-সমুদ্রের মধ্যে দুজনে আমরা সাঁতার কেটে এগুচ্ছি।

ঈষৎ আলো অবশেষে। রাত পোহাবার সময়কার ভাব। তখন মালুম হল দরদালান ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড হলঘরে এসে পড়েছি। খোলা দরজা অপর প্রান্তে, দিনের আলো ঢোকার পথ পেয়েছে।

নীলকমল চাটুজ্জের সহসা আবির্ভাব। কোন সংক্ষিপ্ত পথে অন্ধকারের ইঁদুরের মতন সুড় সুড় করে আমাদের আগে এসে পড়েছে। বলে, মোহর আছে তো?

মোহর কেন?

রানী-দর্শনে নমো-নমো করে হলেও তো পাঁচ থাক মোহরের নজরানা—

বিরক্ত হয়ে বলি, রানী-দর্শন তবে হবে না। আগে বললে না কেন তিনকড়ি, এতখানি পথ ঝঞ্ঝাট করে তা হলে আসতাম না।

নীলকমল বলে, নজরানা সম্পূর্ণ আবার পেয়ে যাবেন। সমুদ্রে জিনিস দিলে ঢেউয়ের সঙ্গে সব আবার ফেরত দিয়ে দেয়। রানীও তেমনি। হাতে করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত।

তা হলেও পাচ্ছি কোথা মোহর? সেকালে মাঝে মধ্যে দেখতে পেতাম। তিরিশ বছরের মধ্যে ও বস্তু চোখেই তো পড়েনি।

নীলকমল একগাল হেসে বলল, দর্শনে এসে বিফল হয়ে যাবেন, আমরা তবে কি জন্যে আছি? ঐ বুঝেই তো ছুটে এলাম। মোহর আমরাই রাখি—আসল রামচন্দ্রী মোহর। হাল আমলের রদ্দি জিনিস রানীর হাতে তুলে দেবেন কেমন করে?

হাত পেতে দাঁড়াল: আড়াই টাকা—পাঁচ খান আড়াই টাকা—আটআনা করে মোহর?

কেন হবে না। আবার তো ফেরত আসছে। আমাদের জিনিস আমাদেরই থাকবে।

ধরুন, এলো না ফেরত। রানী তিলোত্তমা রেখে দিলেন। চাইতে তো পারবেন না।

আহা, রাখুন না তাই—। নীলকমল গদ-গদ হয়ে থাকল : রানী প্রতিগ্রহ করবেন, চাট্টিখানি কথা! অত বড় ভাগ্য কারো হয় না।

সুড়ুত করে সে বেরিয়ে গেল। এবং পলকের মধ্যে ঝকঝকে মাজা রেকাবির উপর রামচন্দ্রী মোহর এনে হাজির করল। রাজা রামচন্দ্র কলিযুগের নন—দ্বাপরের নন, তারও আগে ত্রেতা-যুগের। হায়রে হায়, কালে কালে কী হয়ে যায়—সোনার মোহর কটকটে কালো, পাথুরে কয়লারও অধম। মোহরের গায়ে হিজিবিজি কিছু রয়েছে। ত্রেতাযুগীয় হরফ রপ্ত না থাকায়—কি করব, ওঁদের সঙ্গে সায় দিতে হল লেখাতে রামেরই প্রশস্তি। সে যাই হোক, ধাতু-বিশেষের গোলাকার চাকতি এবং গণতিতে পাঁচ-খণ্ড—এ দুটি ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রতিগ্রহ ব্যাপারে কেন রানী নিস্পৃহ, জিনিসটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। রানী তো রানী—সামান্য ছাপোষা লোক হয়েও এইমাত্র মূল্যস্বরূপ আড়াই টাকা দিলাম, ও মোহর আমার পকেটে ফেলতে এলেও আমি তো ছিটকে গিয়ে পড়ব।

যাক গে, কথা না বাড়িয়ে মোহরের রেকাবি দু-হাতে ধরে চলেছি। কিছু দূরে বৃহদাকার চেয়ারের উপর স্তূপাকার পদার্থ—ডাই-করা কাপড়চোপড়। কাছাকাছি হয়ে চেয়ারের অপরূপ কারুকর্ম দেখতে পাচ্ছি—চেয়ার বলায় গুনাহ্ হয়েছে, পুরোদস্তুর সিংহাসন। সিংহাসনে কাপড়ের গাদা ভাবছিলাম—তিনকড়ি ফিসফিসিয়ে বলে দিল, কাপড়ের মধ্যে রানী।

দূর! ধাপ্পা দিচ্ছে, ধাপ্পা দিয়ে আমায় বেকুব বানাতে চায়। ও হরি, কাপড় যে নড়েচড়ে—কাপড় ভেদ করে দুটো হাত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠল। এবং হাতের খানিকটা উপরে দেখতে পেলাম জ্বলন্ত চোখ একজোড়া। অন্ধকারে বাঘের চোখ জ্বলে—এখানটা আধ-অন্ধকার বলে চক্ষুদ্বয় সত্যিই দুটো আগুনের ফুলকির মতন দেখাচ্ছে।

এগিয়ে যান, একেবারে সামনে—। হাত বাড়িয়ে নীলকমল দেখিয়ে দেয়।

ডাইনে-বাঁয়ে একসঙ্গে দপ করে দুটো সরা জ্বলে উঠল। পরিষ্কার স্নিগ্ধ আলো—ঘরের ভিতর কোন কিছুই আর দৃষ্টির অগোচর নেই। সিংহাসনের পিছন দিকে অয়েলপেন্টিং ঝুলছে—একটি হাস্যমুখ সুন্দরী মেয়ে। ডাকসাইটে সুন্দরী—কিছুমাত্র সেটা অতিশয়োক্তি নয়।

তিনকড়ি কানে কানে বলে, ইনিই—

মুগ্ধকণ্ঠে বললাম, ছবিতেও কী চমৎকার এসেছে!

তিনকড়ি পুনশ্চ বলল, সিংহাসনে এঁর কথা বলছি আমি। রেকাবিসুদ্ধ রানীর হাতে দিয়ে দিন।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কুৎসিত ঐ মাংসপিণ্ডটা নাকি রানী তিলোত্তমা, যার উপমা পদ্মিনী নূরজাহান ক্লিওপেট্রা—

তিনকড়ি চুকচুক করে : কালে কালে কী হয়ে যায়! নরসিংগড়ে আসতে যে দেরি করে ফেললেন। আসতেন অন্তত চল্লিশটা বছর আগে—ছবির সঙ্গে ইনি ধরে রানী মিলিয়ে নিতেন।

রানী দর্শন হল। আপনাদের কিন্তু সন্দেহ রয়ে গেছে, রামচন্দ্রী মোহর ও রানী তিলোত্তমা কোনটাই খাঁটি নয়। ব্যাগ খুলে আমি যে দুই টাকা ও এক আধুলি দিয়েছিলাম, তাই কেবল খাঁটি ছিল।

উৎসবের দিন ও প্রতিদিন
বাংলার অতুলনীয় তাঁতবস্ত্র
তন্তুজ
কিনে খুশি হবেন।
আপনার রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী পাবেন :
শাড়ি ধুতি • লুঙ্গী • সার্টের কাপড় বেডকভার।
আপনার কাছাকাছি যে-কোন বিক্রয়কেন্দ্র থেকে কেনাকাটা করুন।
• কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'তন্তুজ' বিক্রয় কেন্দ্র আছে •
১০% পুজো রিবেট
সেন্ট্রাল সেলস্ ডিপো :
দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪ ★ ফোন : ৩৫-৩৬৫৮

পাঁচ অধ্যায়, প্লাস

পরিমল গোস্বামী

।। এক ।।

ধনঞ্জয় শর্মা নিখিল বঙ্গ গাঁজিকা প্রচার সমিতির সভায় খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন—গাঁজাই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব নেশা, এবং আপনারা যাঁরা এ সভায় উপস্থিত আছেন তাঁরা একথা ভাল করেই জানেন। তামাক দেশী নেশা নয়, ওটা বিদেশের আমদানি। এ গরিব দেশের লোকেরা খাচ্ছে গাঁজা আপনা থেকেই জন্মায়, কিন্তু কেন ভেবে দেখেছেন কি? এটা গরিব দেশ, তাই প্রকৃতি থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি দেবনেশাও বটে। আমাদের দেবতা শিবঠাকুর শুধু গাঁজা ভাঙের আকর্ষণে কৈলাস থেকে বাংলায় নেমে আসতেন। তিনি বহু শিষ্য রেখে গেছেন এ রাজ্যে। নীলপূজা ত্রিনাথ পূজায় শিষ্যরা গাঁজা এবং ভাঙ খেয়ে সেই ঐতিহ্যটা বজায় রেখে চলেছেন। আমাদের কোনো দেবতা তামাক খেতেন শুনেছেন কখনো?

শ্রোতারা সমস্বরে বলল—না কখনো শুনিনি।

একথা শুনে খুশি হলাম। গাঁজা যে কত মূল্যবান নেশা, তার চোরাকারবারের বহর দেখেই সবার বোঝা উচিত। ভারতীয় গাঁজা, অথচ আমেরিকা এ নেশার প্রধান ভক্ত হয়ে পড়েছে। সেখানকার সকল পেশার মানুষ, সকল বয়সের মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এখন গাঁজা খাচ্ছে। সম্প্রতি আপনারা কাগজে পড়েছেন ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের সভ্যরা এবং লর্ড বংশের সন্তানেরাও গাঁজা আরম্ভ করেছে। তারা খাচ্ছে আর ভাবছে এ নেশা ইম্পীরিয়াল নেশা, ভারতে থাকতে যদি আরম্ভ করলে আর এম্পায়ার ছাড়তে হত না।

ধনঞ্জয় শর্মা আবেগের সঙ্গে বলে চলেছেন, আপনারা সিগারেট ছাড়ুন, হুঁকো ছাড়ুন, ছোট সরু কলকের গাঁজা খেতে আরম্ভ করুন। মেয়েদের পক্ষে প্রকাশ্যে কলকে টানা দেখতে খারাপ হতে পারে, সেজন্য আমেরিকার মতো গাঁজার সিগারেট তৈরি করে নিন। অসুবিধা দূর হবে।

ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন-এর জন্য বৃথা সময় নষ্ট করতে হবে না আপনাকে, কলকেয় একটা টান মারলেই সোজা কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্বর্গসুখ। যত টানবেন, ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন তত দীর্ঘস্থায়ী হবে। মদ এদেশের উপযোগী নেশা হতে পারে না, ওতে কেবল ধ্বংস, অর্থ এবং স্বাস্থ্যের।

বক্তৃতা শুনতে শুনতে দু-একজন শ্রোতা পকেটে হাত দিয়েছিল, কিন্তু সভার মধ্যে কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে বাইরে গিয়ে কলকে বার করে টেনে এলো। শ্রোতারা বলতে লাগল, আমরা সেই জন্যই তো এ নেশার প্রচার কামনায় সমিতি গঠন করেছি।

বক্তা বললেন, আদর্শ কাজ করেছেন। বাংলার সাহিত্যিকরা এবং নামকরা সাহিত্যিকরা বহু আগেই গাঁজার মর্ম বুঝতে পেরে নিয়মিত খেয়ে চলেছেন। দু-একজন সাহিত্যিক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গাঁজা টেনে পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আপনাদের প্রচারে এসব কথা উল্লেখ করবেন, এবং বাঙালী মাত্রেই যারা অন্য নেশা করে তাদের সেসব ছাড়িয়ে দিয়ে গাঁজা ধরান। পল্লীতে পল্লীতে শাখা সমিতি গঠন করুন।

এইভাবে পুরো এক ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে ধনঞ্জয় শর্মা ঘড়ি দেখলেন। বললেন, আমি আর অপেক্ষা করব না, অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

।। দুই ।।

তিনি বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠে আর এক সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। এটির নাম মদ্য প্রচারিণী সভা। সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং যারা কাছাকাছি কোনো 'বার' থেকে মদ খেয়ে এসেছিল, তারা ক্রমেই আরো পিপাসার্ত হয়ে পড়ছিল। কারণ ধনঞ্জয় শর্মার এ সভায় আসতে কিছু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, এবারে আর ক্ষোভ নেই কারো। মদ্যপান প্রচারে তাঁর পরামর্শ দরকার। তাঁর প্রেরণাই এদের এখন প্রধান ভরসা এবং প্রেরণা।

তিনি বলছিলেন, ঊনিশ শতকে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে বাঙালী জাতি সকল বিষয়ে ভারতের মধ্যে অগ্রণী হয়েছিল, কিন্তু এখন পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু কেন? ব্রিটিশ আমলে ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ মদ শস্তায় পাওয়া যেত বলে। সে দেবভোগ্য সুরা এখন আর নেই সত্য, এবং থাকলেও দুর্লভ, গোপনে অনেক বেশি দাম দিয়ে কেনা যায়, তবু এদেশে এখন যথেষ্ট ভাল মদ তৈরি হচ্ছে। "গুড ওয়াইন নীডস নো বুশ"—বোতলের দিকে চেয়ে বলা যায় না সত্য, কিন্তু তবু সোনা সোনাই। বাঙালীর মগজকে শানিত করতে বিদেশী মদের মতো দেশী মদের স্টেনলেস ব্লেডের ধার না থাকলেও 'কাট্-থ্রোট' ক্ষুরের ধার অবশ্যই আছে। তা নিয়মিত খেতে পারলে আবার বাঙালী সর্ববিষয়ে জগৎসভায়

পূজ্য হয়ে উঠবে। তবু যদি কোনো কোনো প্রাচীনপন্থী একমাত্র বিদেশী মদ খেতে চান, তার জন্য সরকারের উচিত বিশেষ পারমিট মঞ্জুর করা। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না। মোট কথা, দেশী হোক বিদেশী হোক, মদ বাঙালীর জীবনে চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন আগেই বলেছিলেন—

কত কাল রবে
বল ভারত রে,
শুধু ডাল ভাত জল
পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের
হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা
আর মুর্গি-মটন।

শোনামাত্র হলঘর হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হল। বক্তা বললেন, দেখুন এটি কত আগের লেখা, একেবারে ঋষি-বাক্য যাকে বলে। দেশে আজ অন্নজলের ঘোর অনটন হবে, এবং তা হলে কি কর্তব্য, তা দ্বারকেশ্বরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। দেশে যখন অন্নাভাব, জলের অভাব, তখন একমাত্র খাদ্য যা ঐ গানে বলা আছে। মারি আঁতোয়ানেৎও এককালে ফ্রানসে প্রায় ঐ রকমই বলে-ছিলেন। অতএব আপনারা বুক বাঁধুন। মদ খান। দেশকে বাঁচান। পথের মোড়ে মোড়ে 'বার' খোলার ব্যবস্থা করুন, দেখবেন হৃত গৌরব আবার আপনারা ফিরে পাবেন।

শ্রোতারা ধন্য ধন্য করতে লাগল বক্তাকে, অনেকে বোতল পকেটে করেই এনেছিল, তারা তাতে চুমুক লাগাল।

।। তিন ।।

সভা শেষে শর্মামহাশয় বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। এর পর আর এক সভা। মোট পাঁচটি সভার জন্য আজ তিনি বুকড। এবারের সভা মদ্যপান নিবারণ সমিতির উদ্যোগে। এ সভায় তিনি বলছিলেন—দেশকে বাঁচাতে হলে আগে দেশ থেকে সকল রকম মাদক নিষিদ্ধ করতে হবে।

বিশেষ করে, মদ্যপান নিবারণ এখন এই মুহূর্তে জরুরী দরকার হয়ে পড়েছে। আপনারা অবশ্যই এটা বুঝতে পেরেছেন, আর সেই জন্যই আপনাদের এই আয়োজন। এতে আমি আজ গর্ববোধ করছি যে, দেশের এই দুর্দিনে আমাদের যুবকদের মধ্যে এমন একটি বৃহৎ দল আছে যার উদ্দেশ্য দেশকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো। এটি শুভ লক্ষণ। আমরা আবার বাঁচব। মদ আমা-দের দেশের পয়লা নম্বর শত্রু। এ এক বিষম অভিশাপ। শ্রমজীবীদের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর তাদের জন্য অন্য কোনো আনন্দের ব্যবস্থা নেই, তাই তারা সস্তা মদ খেতে বাধ্য হয়। অনেকে মরেও যায় বিষাক্ত মদ খেয়ে। কিন্তু তবু

ফটো : গৌরা মল্লিক

তাদের মদ খাওয়ার একটা হেতু আছে। কিন্তু যারা শ্রমিক নয়, ভদ্রলোক, তারা মদ খাওয়ার মতো অন্যায় বিলাসিতা করবে কেন? কত লোক এর জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের এই পাপের ফলে কত পরিবার পথে বসেছে। মদ খেতে আরম্ভ করে সবাই প্রথমে খেলাচ্ছলে। তারপর অভ্যাস পাকা হয়ে যায়, শেষে আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। মাতাল হয়। মাতাল হওয়া খাশ মদের দেশেই সামাজিক একটি ঘৃণ্য অভ্যাস। তবু পরি-নাম হিসাব করে চলে তারা, অন্তত চেষ্টা করে। শীতের দেশে তাই ওদের অভ্যাস একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। আমাদের দেশে কোনো সামাজিক নিষেধই নেই। তাছাড়া এর অভ্যাস এদেশের উপ-যোগী নয় একেবারে। পাড়ায় পাড়ায় আপনারা কমিটি গঠন করুন, প্রচার আরম্ভ করুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

।। চার ।।

খুবই হর্ষধ্বনির মধ্যে এ সভা শেষ হল। ধনঞ্জয় শর্মা ঘড়ি দেখে বেরিয়ে পড়লেন। পরবর্তী সভা এক শহীদের স্মরণ সভা। ইংরেজ মারতে গিয়ে ইনি ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। শর্মামহাশয় বলছিলেন, এটি বীরের মৃত্যু। কারণ ইনি দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য অস্ত্র ধরেছিলেন। কার জন্য? নিজেই যদি না বাঁচা গেল তবে কার জন্য স্বাধীনতা? কিন্তু এ প্রশ্ন দেশপ্রেমিকের

নয়। স্বার্থত্যাগ আত্মত্যাগই তাঁর ধর্ম। পীড়নকারী ইংরেজকে না মারতে আরম্ভ করলে তাদের সুখের সুদৃঢ় মাজত্বে ফাটল ধরত না। তাদের টনক নড়ত না। তারা তবু বর্বর এবং হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তাই হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োজন ছিল। যে মানুষ যে ভাষা বোঝে তাকে সেই ভাষায় বোঝাতে হয়। হিংসা ছাড়া বাঙালী জাগত না, আর ইংরেজ শাসকও বুঝতে পারত না দেশ কি চায়; হিংসা ছাড়া এ জিনিস সম্ভব ছিল না। তাই ইংরেজ আমলে যাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি বোমা অথবা একটি বুলেট ব্যবহার করেছেন তিনি আজ সরকার কর্তৃকও সম্মানিত। উপদেশ দিয়ে হিংস্র বাঘের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে আমরা পারি না। এ কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। ভাল কথায় নীতিভ্রষ্ট লোক ভোলে না। কিন্তু সামনে বন্দুক ধরুন, তৎক্ষণাৎ অন্যায়কারী জব্দ হয়ে যাবে। বিদেশী শাসকের হিংসার বিরুদ্ধে আমাদের হিংসা ছিল বলেই ক্রমে তাদের পত্তন-পাওয়া-জমি এই ভারতবর্ষ ছাড়তে হল। বিরাট প্রচণ্ড হিংসাশক্তি ছিল ওদের, আর আমাদের কয়েক শ যুবক মাত্র তার মধ্যে আবার কেউ কেউ স্কুলের ছেলে। তবু কি মহিমা! 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'—এই কথাটি ঐ ছেলেদের মর্মে বাসা বেঁধেছিল। তাই তারা অন্যায় সহ্য করেনি। এই হল বীরের কাজ। সে বীরত্ব সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত এসে তবে আমাদের স্বাধীনতার পথ খুলে গেছে। সুভাষচন্দ্র নেতাজি রূপে কি কৃচ্ছ্রসাধনের পথে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন! কত সুখে থাকতে পারতেন তিনি, কিন্তু নিজের জন সুখ তিনি অকাতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল তলোয়ার। তিনি ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। আর যারা এই বীরত্বের পথে এসেছিল, তারা বয়সে যত ছোট হোক তারা আমাদের প্রণম্য। ভুলবেন না, অন্যায়কে দমন করতে হলে হিংসা চাই। শ্রোতারা হিংসার বিরুদ্ধে হিংসায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল।

এরপর প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলল তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণ। শ্রোতাদের পেশী লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠছিল এক এক সময় তাঁর বীরত্বউদ্বোধক ভাষায়। দাঁতে দাঁত দৃঢ়নিবদ্ধ হচ্ছিল।

।। পাঁচ ।।

এর পরের সভা ছিল গান্ধীস্মরণ উপলক্ষে। ধনঞ্জয় শর্মা এখানে এসেই বলতে আরম্ভ করেছিলেন—হিংসা চাই বাঁচতে হলে হিংসা চাই। পূর্ব ভাষণে মনটা তাঁর পূর্ণ ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল, এ কি বলছি। তখন কথাটা এইভাবে সংশোধন করলেন—বাঁচতে হলে হিংসা চাই, একথা যারা বলে, তারা ভারতীয় আত্মিক জীবনদর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

শ্রোতারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, এবং সাধু সাধু ধ্বনিতে হলঘর মুখর করে তুলল।

তিনি বলতে লাগলেন, আমরা মানুষ, আমরা পশু থেকে উন্নত এ কারণে যে, আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে। আমরা সহজাত সংস্কারবশে চলি না আমরা পশুর মতো অন্ধ নিয়মে চলি না। তাই আমরা ব্রুট ফোর্সে বিশ্বাস করি না। পশুশক্তিতে সাময়িকভাবে জয়লাভ হতে পারে, কিন্তু ওতে কিছু মীমাংসা হয় না। হিংসার বদলে হিংসা—পৃথিবী আজ এই নীতিতে জর্জরিত অশান্ত, অস্থির। জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অহিংস শক্তিতে। মহাত্মা গান্ধী এই ভারতীয় অধ্যাত্ম নীতি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে আমাদের সম্মান বাড়িয়েছেন বিশ্বের চোখে। ভালবাসা দিয়ে শত্রু হৃদয় জয় কর। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, টলস্টয়, গান্ধী—এঁরাই জগতের পূজ্য। গান্ধীজীর অহিংস নীতি, অহিংস অসহযোগ এক বিরাট শক্তি। এই শক্তিতে ব্রিটিশ সিংহ কাবু হল। চরমা শক্তি এর অনুচর মাত্র। আপনাদের মধ্যে মিশনারী স্পিরিট যাঁদের আছে, তাঁরা দেশের জেলায় জেলায় প্রচার ব্যবস্থা করুন—আমি আছি আপনাদের পিছনে। দেশকে এখনো বাঁচাবার সময় আছে। তার একমাত্র উপায় অহিংসা।

ইত্যাদি প্রায় দু-ঘন্টা ধরে চলল উত্তেজক ভাষণ। সবাই মুগ্ধ বিগলিত। একজনের পকেটে একখানা ছোট্ট ছুরি ছিল, সেটাকে সে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। সভা ভঙ্গ হল একটা মহা-তৃপ্তির সঙ্গে। যাদের পকেটে বড় ছোরা ছিল, বোমা ছিল, সব তারা বাইরের নালা ট্যাংকে নিক্ষেপ করে তৃপ্ত মনে ঘরে ফিরল।

।।শ্লাস।।

পরদিন সমস্ত কাগজে এই পাঁচটি সভার বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হল এবং ধনঞ্জয় শর্মার পাঁচটি ভাষণের প্রায় সবখানিই পাঠকেরা পড়ার সুযোগ পেলেন। তাঁরা সবাই খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু শর্মা মহাশয়ের জীবনের শান্তি গেল একেবারে ঘুচে। সমস্ত সভা এখন কেবল তাঁকেই চায় প্রধান অতিথি রূপে। তাঁর সম্মান এখন দশগুণ বেড়ে গেছে। এমন বহুমুখী বক্তা পৃথিবীতে অদ্যাবধি নাকি জন্মায় নি—সবার মুখে ঐ একই কথা।

কবিতা

ত্রিকাল তার মোছায় মুখ ॥

বিষ্ণু দে

কপালে নেই দুঃখ-সুখ,
শুধুই আছে জ্বালা।
যখনই খোঁজে ভূত বা ভাবী;
বর্তমানে ফেরে।
ত্রিকাল তার মোছায় মুখ,
দোলে মুণ্ডমালা।
জানায় ঘৃণা—নাকি লোভে?
কোটির এক দাবি।

যেমন যেন পাগলা লোক,
সুখদুঃখ জানে।
কিন্তু জেনে মন না মানে,
এ কী অঘোরপন্থী!
পায় নি সে কি হর্ষ-শোক?
কে তার মন হানে?
ক্লান্তি তার জটেষে প্রাণে?
কি তন্ত্রে সে যন্ত্রী?

স্বর ॥

অরুণ মিত্র

ইটকাঠপাথরে বিঁধে বিঁধে
তেজীয়ান ঝলকগুলো চমকায়।

প্রথম গুনগুনে এক স্মৃতি হয়ে আছে;
সেখানে ছায়ার মূর্তি নিয়ে বিষাদ
হৃদয়ের উপরে নত
যেন কোনো দুঃখের সান্ত্বনা নেই।
তখন অনুভব হয়েছিল
ঘরের গুমোট কান্নায় ভিজে গিয়েছে,
দরোজার পথে উজাড় বুক পেতে দিয়েছে
মরা পাণ্ড,
আকাশ থেকে পালক
গাছ থেকে নীড়ের খড়কুটো
ঝরতে ঝরতে চারদিকে গহন রাত,
এক মুখ আর এক মুখের দিকে
অন্ধের মতো ফেরানো।

সরু রেখার স্বর
চোঁয়ানো রক্তের স্বর
কখন মোড় ঘুরে প্রচণ্ড সূর্যকে লুফে নিয়েছে।
অন্ধকার পাড় ভেঙে এমন ঝলকানি
যেন গলায় দিগন্ত জ্বলছে,
আর পৃথিবীর আবহাওয়ার বলয়
সাদা আগুনে সমস্ত শব্দ মুড়ে নিয়েছে,
তুফান টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে আওয়াজ কাঁপছে,
আর চোখে মুখে সংস্পর্শ
বিদ্যুতের মতো [illegible]।
ভিতসুদ্ধ চার দেয়ালই টলমল।

ভুতুড়ে দেশ ॥

দিনেশ দাস

আমি কি সারাজীবন ধ'রে
অন্ধকারের জাল টেনে বেড়াব?
প্রতিদিন আমার দেহ খণ্ডিত হয়.
আমার ফুসফুস, হৃদয়, বুদ্ধি চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে ;
আমার দেহের ভাঙা বাল্‌বগুলো
আর কোনোদিন বদল করা যাবে না,
ঠোঁট শুধু ভাষার আলো-আঁধারে পথ হাতড়ায়,
নিঃশব্দ অন্ধকারে আমার শব্দহীন জবানবন্দী।

এদিকে রাবণের সোনার সিঁড়ি ক্রমশঃ স্বর্গে ওঠে ;
নীচে হাড়ের আওয়াজ
মৃতের খুলি নড়ে
দাঁত আস্তে আস্তে নামে
জিভ ওপরে উঠে আগুন ছড়ায়।

এ কি ভৌতিক কাণ্ড!
টাকা হঠাৎ সিকি হ'য়ে গেল,
ভাত-মাছ ছোঁবার আগেই অদৃশ্য,
কিসের রুটি খাই গমের, যবের, না হাড়ের?

জলের গেলাসে কালো কালো ছায়া ;
দিনের আলোতেও মানুষ হঠাৎ হারিয়ে যায়.
কেউ আর তাদের খুঁজে পায় না।
এ কি ভুতুড়ে দেশ!

ট্রাম বাস রেলগাড়ি চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে,
ডকে জাহাজও ভাসে ধোঁয়ার সমুদ্রে।
কালো ধোঁয়ায় মানুষের চোখ অন্ধ হ'য়ে এল।
অদৃশ্য কালোহাতগুলো পরস্পর
নিখুঁত কালোচক্র গড়ে তোলে।
অন্ধকারের ছুঁচ ফুটছে চোখে-মুখে, কানে-[illegible]।
জ্ঞানী পেচকেরা দেখি
আঁধারেই বেশ স্বচ্ছন্দে ওড়ে।
এই গাঢ় অন্ধকারে
আমি শুধু এক চামচ আলো চেয়েছিলাম।

সাংবাদিকের ডাইরি

লীলা মজুমদার

এর আগেও অনেকবার বলেছি আমাদের আপিসের নিয়মই হল যে কর্মী যত অপটু, আনকোরা হবে, তার হাতে তত ঘোরেল জটিল সমস্যা দেওয়া হবে। অথচ সঙ্গে সহকারী, সাহায্যকারী, ফটোগ্রাফার, বন্দুকধারী কিছু থাকবে না। আশা করি শেষেরটা শুনে কেউ আশ্চর্য হচ্ছেন না। এরকম অনেক সমস্যার সমাধান আমাকেই নিজের হাতে করতে হয়েছে এবং নিজের বিষয়ে গর্ব করা যদিও আমি আদৌ পছন্দ করি না, তবু সত্যের খাতিরে বলতেই হচ্ছে যে অনেক অনেক বাবুদের চাইতে—সে যাক গে।

এ বছর-ও বর্ষার গোড়ায় বড়বাবু, অর্থাৎ সহ-সম্পাদকদের মধ্যে একজন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ওহে অবনীশ, সবাই কাজে ব্যস্ত, এই সামান্য তদন্তটুকু তুমি সেরে ফেল দিকি নি। মোটরসাইকেলটা নিতে পার।'

শুনেই আমার কান খাড়া। যত দিন না টাকা জমিয়ে, কি অন্য কোনো উপায়ে নিজের একটা কিনে ফেলছি, তত-দিন যে আমি ভুবনদার কেনা গোলাম, সেটা ভুবনদা ভালো করেই জানেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে এবং অন্যরা যারা বেশি মাইনে পায় তারা যেতে রাজি হয় নি কেন?'

ভুবনদা চটে গেলেন, 'একটা রহস্য ভেদ করার সুযোগ দিচ্ছি, কোথায় আহ্লাদে আটখানা হবে, না কোথায়, কি, কেন! না যেতে চাও বল, আমি পানুকে বলছি। খরচা বাবদ পেট্রোল ছাড়া দশ টাকা করে ডি-এ।'

আমি বললাম, 'দিন, চাবি দিন।

ভুবনদা তারি বিরক্ত, 'আহা, কাজটার কথা আগে শুনতে হবে তো। কিছুটা রিস্ক আছে, ভয় করে তো বল, আমি পানুকে—'

আমি বললাম, 'কি করতে হবে তাই বলুন। আমি করে আনব। করব কি না? বড়রা পেছপা হয়েছে তো—'

ভুবনদা ঘোরানো চেয়ারটাকে আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'পান্ডুয়া ছাড়িয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে একটু দূর গেলেই, ডান দিক দিয়ে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে কালনার দিকে। ঐটে ধরবে। একটু এবড়োখেবড়ো হলেও চমৎকার ছায়া-ছায়া মতো। আর এবড়ো-খেবড়ো হবে-নাই-বা কেন, শুনলাম গত সতেরো বছরের মধ্যে ওতে কারো হাত পড়ে নি। এক রকম বলতে গেলে পা-ও পড়ে নি। ঐ পথ ধরে মাইল পনেরো গেলেই দেখবে বিরাট একটা রাজ-বাড়ির মতো। জন-মনিষ্যি নেই ত্রি-সীমানার মধ্যে, কিন্তু খাসা বাড়ি, শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো বড় বড় হল ঘর, শ্বেতপাথরের প্রকান্ড সিঁড়ি। অবিশ্যি তাতে এত ধুলো যে হঠাৎ কিছু ঠাহর হয় না। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে রঙিন কাচের নক্সা করা বড় বড় জানলা—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই সব কাচ ভাঙা। আপনি গিয়েছেন নাকি ওখানে?'

ভুবনদা আঁৎকে উঠলেন, 'আমি যাব ওখানে!! শুনলে ত্রিসীমানায় কেউ থাকে না, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি পর্যন্ত যায় না। আমার স্ত্রীপুত্র-পরিবার নেই? তাছাড়া গুরুদেব ওসব পছন্দ করেন না—'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা। লোক দেবেন সঙ্গে একটা?'

'লোক? লোক কোথায় পাব বাছা? আর তারা ঐ শ্মশানবাড়িতে যাবে কেন? টলটলে জলভরা পুকুরগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে খাক হয়ে গেছে। এখন সরকার ঐ বাড়ি ভাড়া নিতে চান, শস্য মজুত হবে। বাড়ি মেরামত করাতে হবে, ঝাপাতে হবে, তা কনট্রাক্টররা কেউই যেতে চাইছে না। তুমি যাও দিকি নি বাপ, ওখানে তে-রাত্তির বাস করে প্রমাণ করে দাও দিকি নি যে যত রাজ্যের বাজে গাঁজাখুরি গল্প শুনে ভয় পাওয়া, স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের শোভা পায় না।'

আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম, 'সব না হয় বুঝলাম। কিন্তু একেবারে একা একা তিন রাত্তির—'

ভুবনদা রেগে গেলেন, 'আহা, একেবারে একা একা কে বলেছে? পুলিশের গোয়েন্দাও সঙ্গে থাকবে। ঐ যে ডি-সিল্ভা আছে গুপ্তগোয়েন্দা, মেয়েছেলে সেজে তদন্ত করে, ঐ যে মেয়েকারবারি সেজে জহর বাঈয়ের বিখ্যাত চোরা-কারবারে ঢুকে, ভেতর থেকে সব ভেস্তে দিয়েছিল, জান তো সব—সেই পথের মাঝখানে কোথাও তোমার সঙ্গ নেবে। সুন্দরী মেয়ে সেজে। বুঝলে কি না আমরা আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া দেখি, ও ভূতফুতে বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় কোনো চোরাকারবার চলছে, চোলাই, কিম্বা নোটজাল কিম্বা ব্ল্যাকমার্কেটের গুদামখানা—মোট কথা দুজনে মিলে সব এন্তাজাম করে নেবে। এখন যাও, শরসাকীড় গুছিয়ে নাও, খাবার-দাবার, বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানীয় জল সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকবে। দেখ, আর মনে রাখবে আইন-ভঙ্গকারী ধরা তোমার কাজ নয়, তোমা যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে আনবে। দুষ্কৃতকারী ধরাটরা ডি-সিল্ভা বুঝবে।'

এই তো ব্যাপারের শুরু। ভুবনদার কথামতো দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই বেরোলাম। বেশি আলো থাকতে না পৌঁছনোই ভালো। পথে যে কোনো জায়গায় ডি-সিল্ভা আমার মোটরসাইকেলে উঠে, আমার পেছনে বসবে। একজন সুন্দরী ফিরিঙ্গী মেয়ে নিয়ে এভাবে চলেছি দেখলে মা আর পিসিমা কি বলতেন ভেবে বেজায় হাসি পাচ্ছিল। ওঁদের দৃঢ় বিশ্বাস দুনিয়ার যাবতীয় সুন্দরী এবং অযোগ্য মেয়েরা আমার গলায় মালা দেবার জন্য পরস্পরের পায়ের গোড়ালি মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

বাস্তবিকই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটা যত না মোলায়েম মসৃণ তেল চুকচুকে হক, কালনা যাবার এই বিশেষ পথটা অতি যাচ্ছেতাই, সেইজন্যই নিশ্চয় স্থানীয় অধিবাসীরা এ দিক মাড়ায় না, ভূতফুত বাজে কথা। নাকি আলো জ্বলে আর নেবে। গোঁ গোঁ শব্দ হয়। দরজা-জানলা খোলে আর বন্ধ হয়। জানলায় লোকের মাথা দেখা যায়। অথচ সাহস করে গোড়ার দিকে যারা ভেতরে গেছে, তারা দেখেছে সব ভোঁ-ভাঁ, চামচিকে পর্যন্ত নেই। নাকি পরিকল্পনার আগে কোনো উপদ্রব ছিল না। খুবই সন্দেহজনক।

পনেরো মাইলের হয়তো তিন ভাগ চলে এসেছি, একবার টায়ার সারাতে হয়েছে। বিকেল পড়ে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়েছে, সন্ধ্যা নামল বলে। এবার তো ডি-সিল্ভার দর্শন পাওয়া উচিত। কথাটা মনে হতেই দেখি কালভার্টের ধারে গাঢ় নীল ঘাঘরা আর ওড়না গায়ে দিয়ে ডি-সিল্ভা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বাস্তবিক এত অসম্ভব ভালো দেখাচ্ছে যে ওর মেয়ে হয়ে জন্মানই উচিত ছিল। সজ্ঞানে সে-কথা বলে। কে বলবে ভয়ডরবিহীন বেপরোয়া গোয়েন্দা। নিখুঁতভাবে মেয়ে সেজেছে। কপালে রঙীন টিকা, হাতে সোনালী কাঁকন সোনার বালা, ডান-হাতের অনামিকায় লম্বা একটা সবুজ পাথরের আংটি। জহর বাঈয়ের মতো চালাক মেয়েও যে বোকা বনবে তাতে আর আশ্চর্য কি! পরে দেখলাম নিখুঁত হিন্দী আর বাংলা বলে। বাঁ দিকের ভুরুর ওপরে একটা কালশিরে এঁকেছে, তাতে আরো যেন ভালো দেখাচ্ছে। কেমন বেপরোয়া ভাব। আমি থামতেই কোনো কথা না বলে আমার পিছনে উঠে বসল। কি একটা এসেন্সের গন্ধ আমার নাকে এল, শুকনো ঘাসের মতো, কস্তূরীর মতো, ভাবি ভালো। ডি-সিল্ভা দুই হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'রাত নামছে। শীগ্গির চল।' আমি বললাম না কিছু, সায়েব আমাকে বোবা বানিয়েছিল।

এই ধরনের রিপোর্টারের কাজের সঙ্গে পুলিশি তদন্তের আসলে খুব বেশি তফাৎ নেই। সাংবাদিক বলে জানতে পারলেই জনতার মুখে কুলুপ পড়ে। তাই একরকম ছদ্মবেশ ধরে থাকতে হয়। আজকে যেমন আমি একজন হাইকার হয়ে গেছিলাম। আধময়লা কাপড়ে আঁটো পেন্টালুন। লাল টকটকে আধময়লা হাতকাটা সার্ট। চোখে গগল্স। পায়ে লোমওঠা শম্বরের চামড়ার জুতো। চেনবার জো ছিল না। কিন্তু ডি-সিল্ভাকে দেখেই বুঝলাম আমি ওর পায়ের কাছেও দাঁড়াবার যোগ্য নই।

ভুবনদা আমাদের তালিম দেবার সময় বলছিলেন, 'ছদ্মবেশ যখন একবার ধরবে —তখন আর সেটা ছদ্মবেশই থাকবে না, তোমার নিজের প্রকৃতি হয়ে যাওয়া চাই। সেই রকম সাজপোষাক, সেই রকম চেহারা, সেই রকম চলাফেরা, সেই রকম চিন্তা, কথা। আর শুধু লোকের সামনে নয়, যখন একেবারে নির্জনে একা থাকবে, তখনো এক মুহূর্তের জন্যও ঐ নকল ব্যক্তিত্বটি ছাড়লে চলবে না। ঐ রকম করেই ভাববে, বলবে, একেবারে ঐ রকমই বনে যাবে।'

ডি-সিল্ভা দেখলাম তাই করেছে, ও বিলকুল একটা রহস্যময়ী সুন্দরী বনে গেছে। আরেকটু এগুতেই খিল খিল করে হেসে, আমার ঘাড় নাকট ঘষে বলল, 'এই, কোথায় যাচ্ছ, ঐ তো বাঁ হাতে বড় মাকান।' আমার চুল-দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল, গায়ে শিহরণ লাগল। ওস্তাদ বটে সায়েব।

বড় মাকান বললে কম করে বলা হয়, বিশাল একটা রাজপ্রাসাদ বললেও চলে। চুনবালি খসা, ইঁটের পাঁজরা বের করা, বাদুড়-প্যাঁচার প্রকাণ্ড একটা আস্তানা। একতলার সব দরজা-জানলা কবে কে খুলে নিয়ে গেছে, দোতলার গুলি বন্ধ। খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামছিল, একটুও ভালো লাগছিল না। ডি-সিল্ভা মেহেদী-লাগানো দুটো চাঁপাকলি হাত দিয়ে আমার কনুই ধরে কানে কানে বলল, 'চল, পুকুরে খুঁজি,

এ'দিকে কেউ কিছু বাকি রাখেনি।' সে-কথা সত্যি, পুলিশরা, কনট্রাক্টররা, সরকারী কর্মচারীরা কি আর কিছু ছেড়ে দেবার পাত্র।

সত্যি কথাই বলব, যদিও গলায় পিসিমার মাদুলি বাঁধা ছিল, তাছাড়া ভূতপ্রেতে আমি বিশ্বাসও করি না, তবু সায়েব সঙ্গে না থাকলে কতটা কি করে উঠতে পারতাম জানি না। ফাঁকা হলঘরে আমার জুতোর শব্দ গমগম করছিল, সায়েবের পায়ে নাগরা, এত হাল্কা চলা যে, এতটুকু শব্দ হয় না। মনে মনে ধারণা হল যে, সমস্ত ব্যাপারটাই স্রেফ চালাকি। এই ধ্যাধ্যাড়ে গোবিন্দপুরের সরকারী বাবুদের এসে গুদমখানা আগলাতে ভারি বয়ে গেছে, তাই যে করে হোক কতকগুলো মনগড়া গল্প ফেঁদে পরিকল্পনাটাকে রদ করার চেষ্টা ছাড়া এ আর কিছু নয়।

ততক্ষণ সায়েব আমাকে টেনে খিড়কিপুকুরের ধারে নিয়ে গেছে। বিরাট চৌকোণা পাথর দিয়ে বাঁধানো পুকুর। চারদিক তার ঘেরা। ওপারে শূন্য মন্দিরের সারি, দুপাশে হয়তো সেকালে পাকশাল, ভাঁড়ার, লোকজন থাকবার ঘর, এই সব ছিল। পুকুরে এক ফোঁটা জল নেই, কাদা শুকিয়ে ফেটে রয়েছে। ঘাটের সিঁড়ির ওপরে অদ্ভুত একটি পাথর কুঁদে তৈরি করা সিন্দুক, তার লোহার কব্জা জং ধরে ভেঙে রয়েছে। সায়েব বলল, 'ওতে গয়নাগাঁটি রাখা হত। বর্গীরা সব কুড়কুড়ে নিয়ে গেছিল। এইখানে একটু খুঁড়ে দেখ না। কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

সায়েব ঘাটের সিঁড়ির লাগোয়া একটুখানি জায়গা দেখিয়ে দিল। বুঝলাম পুলিশের গোয়েন্দার শাবল ধরতে অপমান লাগে। আমার ঝোলাতে শাবল না থাকলেও, ছোট একটা লোহার গাঁইতি মতো জিনিস ছিল। তাই দিয়ে লাগালাম কয়েক কোপ। দেখতে দেখতে এক ঢিপি মাটি জমে গেল, তারপরেই গল্পের বইয়ের মতো ঠুং করে শব্দ হল। অমনি ডি-সিল্ভা খিল খিল করে হেসে ঝুঁকে পড়ে ছোট একটা চার-কোণা বাক্স তুলে নিয়ে দে ছুট!

আমি অমনি অবাক হয়ে গেলাম যে কি বলব! বাক্সে নিশ্চয়ই দামী কিছু ছিল। শুনেছিলাম ডি-সিল্ভা ইটালিয়ান গাড়ি কিনেছে। থানার হরি-হরবাবু তাই নিয়ে ভুবনদার সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন। খুব রাগ হল। তাই যদি বলা যায়, ইটালিয়ান গাড়িতে কি আমারি খুব অনিচ্ছা!

রাগের চোটে ওর নাম ধরে খুব খানিকটা চেঁচালাম। ততক্ষণে ভয়টয় আমার উবে গেছে। ঝোলা থেকে বড় টর্চটা বের করে আগাগোড়া বাড়িটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলাম। ওপরে, নিচে, সিঁড়িতে, দালানে, গুদামে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে এক-রকম রাত কাবার করে দিলাম। কোথাও একটা ইঁদুর লুকোবার জায়গা নেই। সকালে মোটরসাইকেলে চেপে, উস্কো-খুস্কো চেহারা নিয়ে, না খেয়েদেয়ে, ভুবনদার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ঝুলিঝোলা নামিয়ে ফেলে রেগে-মেগে বললাম, 'আচ্ছা লোক দিয়ে-ছিলেন সঙ্গে!!'

ভুবনদা লাফিয়ে উঠে আমাকে আলিঙ্গন করেন আর কি! 'কি করি ভাই, ডি-সিল্ভার কাল সকাল থেকে জ্বর, ভুল-বকা, আর লোক কোথায় পাই অত শর্ট নোটিশে? একলা একলা কতখানি কি করতে পারবে ভেবে সারা হচ্ছিলাম!'

নাকে যেন আবার একটু শুকনো ঘাসের সঙ্গে কস্তুরীর গন্ধ পেলাম, চারদিক অন্ধকার হয়ে এল, ক্ষীণ একটু শুনতে পেলাম ভুবনদা চেঁচাচ্ছেন, 'ও সারদা, ও রাধেশ, জল আন!'

দ্বিতীয় সীতা

জীবনে মাত্র একবারই স্বদেশের বাইরে পা বাড়িয়েছিলাম। তাও সহস্র-যোজন দূরের কোনো অবিসংবাদিত বিদেশ নয়। ধনুষ্কোডিতে জাহাজে চেপে দুঘণ্টায় লঙ্কায়। মহাবীরের এক ফোঁটা রক্ত শরীরে আছে কি নেই, তাতেই আমরা যে-পরিমাণে লম্ফঝম্প করি তিনি যে এক লম্ফে এই একফালি সমুদ্র পার হবেন তাতে বিস্মিত হবার কী আছে! তবে বিস্মিত হলাম লঙ্কাদ্বীপে আমার প্রথম অভিজ্ঞতায়। মনীষী ডারুইনের মতে যিনি আমার আদিপুরুষ তিনি স্বর্ণলঙ্কায় কীরকম নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন রামায়ণ যারাই পড়েছে বা শুনেছে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু আধুনিক লঙ্কা কি ভেবে, বহুযুগের ইতিহাসের ও কিংবদন্তীর মুখে আগুন দিয়ে, আমাকে বুকে টেনে নিল।

নাচের দলের অধিনায়ক হিসেবে বেসরকারী নিমন্ত্রণে দেড় মাসের সফরে গিয়েছিলাম। আমাদের কাণ্ডারী ছিলেন ডক্টর গুহরায়। তাঁরই আনুকূল্যে দলটা টিঁকে ছিল। অসম্ভব মুখচোরা মানুষ। দিনরাত বইয়ে ডুবে থাকতেন। সব ব্যাপারে আমাকে সামনে ঠেলে দিতেন। ফলে আমাকেই অধিনায়কের ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

সতীকান্ত গুহ

রাতে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেন-এ উঠেছিলাম। পরদিন সকালে লংকার রাজধানী কলম্বোয় স্টেশনের প্লাটফর্মে বিপুল সম্বর্ধনার মুখে পড়ে গেলাম। বেসরকারী অভ্যর্থনা শুরু হবার আগেই লংকা সরকারের প্রতিনিধি আমার ডান হাত দখল করেছিলেন। পাল্টা চাল দিতে গিয়ে বেসরকারী দলের নেতা ডক্টর কোরেয়া আমার বাঁ হাতে বিশেষ ক্লেশকর চাপ দিয়ে তাঁদের আপ্যায়নের আন্তরিকতার জোর প্রমাণ করলেন। আমি এ অভিজ্ঞতায় শুধু বিস্মিত হলাম না, বিহ্বল বোধ করলাম। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নানা ব্যাপারে লংকাদ্বীপ ও ভারতের ভিতর খিটিমিটি লেগেই আছে। তাছাড়া তামিলনাড়ুকে চুকে মাদ্রাজ শহর পার হয়ে আরো কিছুটা এগোলেই যেন লংকার বিদ্বেষের নিঃশ্বাস গায়ে লাগে। জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে আলোয় বাতাসে মানুষের অপ্রত্যক্ষ আচরণে একটা বৈরিতার ইঙ্গিত অনুভব না করে পারা যায় না। মনে হয় রামরাবণের যুদ্ধের ফলাফল লংকার আত্মা চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারেনি। ফলে প্রত্যক্ষ জীবনের অন্তরালে কোথাও একটা দ্বিতীয় লংকাকাণ্ডের জন্য তৈরী হচ্ছে।

কলম্বো শহরের এক প্রান্তে একটি সৌখীন বাংলোয় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সারাদিন খবরের কাগজের রিপোর্টার ও নৃত্যকলার উপাসক ও অনুরাগীদের সংগে অবিরাম কচকচির পর আমি বারান্দায় একটা আরামচেয়ারে শুয়ে লংকার মনের দুটি বিপরীত দিকের ভিতর একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলাম। চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। ফটকে একটা মস্ত কালো গাড়ি এসে থামলো। একটি সুসজ্জিত কালো কুচকুচে যুবক দ্রুত-পদে বারান্দায় উঠে এসে বিলিতি কেতায় নমস্কার জানিয়ে হাতে একখানা চিঠি দিল। আমি তাকে বসতে বললাম। সে মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো। কোনো অজ্ঞাত কারণে, আমার মান বাড়াতে গিয়েই হয়তো বসল না। আমি যতক্ষণ চিঠি পড়লাম টের পেলাম সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছে।

চিঠি মিস্টার ফার্নানডেজের। ফার্নানডেজ লংকার বিখ্যাত রবার শিল্পপতিদের এক নম্বর। কোটি কোটি টাকার মালিক। এঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারী দল আমাকে লংকা সফরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ফার্নানডেজের চিঠির সারমর্ম : আমার দলের শিল্পীরা বাংলোয় থাকুন। তাঁরা যাতে আরামে থাকেন সে বিষয় যত্নের ত্রুটি হবে না। তবে সকলে [illegible] আমার উচিত তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর বাংলোয় থাকা। আমি ইতস্তত করলে তিনি দুঃখিত হবেন।

দলের কারো অমত হবে না অনুমান করে আমি চিঠিটা মুড়তে মুড়তে বললাম, 'আচ্ছা।' আমার দেখার ভুল কিনা জানি না আমার কথায় যুবকের কালো মুখ যেন আরো কালো হল। কিন্তু সে পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। ঈষৎ হেসে বলল, "আপনি কি এখনই আসবেন না সময় নেবেন?"

আমি হেসে বললাম, 'প্রায় এখনই। অর্থাৎ দশ মিনিট সময় নেব।'

যুবক অপ্রস্তুত হল। কেতায় কোনো ত্রুটি না রেখে মাথা নুইয়ে আমাকে অভিবাদন করল।

ফার্নানডেজের বাংলো কলম্বো শহর থেকে সাত মাইল। প্রশস্ত একটানা পথ। কচিৎ কোনো গাড়ি বা পথচারীর দেখা মেলে। ফার্নানডেজের দুর্মূল্য বিরাট গাড়ি এই সাত মাইল পথ মিনিট দশেকের ভিতর অবলীলাক্রমে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর বাংলোর বিস্তীর্ণ হাতোয়ায় ঢুকলো। ফটক থেকে অনেকটা তফাতে জানুয়ারীর ঠান্ডা জ্যোৎস্নায় ফার্নান-ডেজের বিশাল বাংলো, নরম তুলিতে আঁকা ছবির মত দেখলাম।

গাড়ি ফটক পার হয়ে খানিকটা এগোতেই বুঝলাম কোনো কারণে একটা মাপ-এর ভুল হয়েছিল। বাংলোর এলাকাকে হাতোয়া বললে অর্থের ত্রুটি থেকে যায়। অরণ্য, কুঞ্জ, শখের কেয়ারি সবুজ স্যাটিনের মতো মসৃণ লন এবং নরম জ্যোৎস্নার প্রার্থনার উত্তরের মতো একটি অলৌকিক বাংলো। কোনো একটি বিশেষ মনের ফরমাস তৈরী একটুকরো পৃথিবী।

গাড়ি একেবারে বাংলোর লম্বা ঢাকা বারান্দার সম্মুখে এসে থামলো। যুবক সারাপথ কোনো কথা বলেনি। সে সামনের সিট-এ বসেছিল' গাড়ি থামতে পিছন ফিরে বলল, 'আমরা এসে গিয়েছি।'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।' সে অস্ফুটস্বরে কী বলল বুঝলাম না। বারান্দার অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করলাম রওনা হবার আগে তার মুখে যে-একটা অসন্তোষের বা আশংকার আভাস দেখেছিলাম তা তখনও থেকে থেকে সাড়া দিচ্ছে।

যুবকের পিছন পিছন আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পার হয়ে হলঘরে ঢুকলাম। দামী নরম কার্পেটে সারাটা মেঝে আগাগোড়া ঢাকা। পা ফেলতে ব্যথা হয়। এ কার্পেট যেন সজীব, সচেতন। চলতে গিয়ে মনে হয় কোনো কবীলীর বুকের উপর দিয়ে চলছি।

হলঘরের একধারে একটা বিচিত্র [illegible] সিঁড়ি যেন হাওয়ায় ভেসে দিয়ে ঢেউয়ের মতো দোতলায় উঠেছে। কুশলী কারিগর চল্লিশ ধাপের লম্বা সিঁড়িটার তলায় কোনো থামের ঠেকা না দিয়ে যেন শূন্যে ঝুলিয়ে মেঝে থেকে দোতলায় তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমি উঠতে গিয়ে ইতস্তত করলাম। এবার যুবকের মুখের মেঘ খানিকটা কেটে গিয়ে একটা ক্ষীণ হাসি প্রকাশ পেল। বলল, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই। একটা ছোটখাট হাতি উঠলেও সিঁড়ি একটুও হেলবে না।"

আমি বললাম, 'আমি একথা ভাবছি না।' আমি যে সিঁড়ির অনুসাধক, সিঁড়ির মতো সিঁড়ি দেখলে আমি যে একটা নেশায় জগতে চলে যাই, স্বর্গের সিঁড়ির স্বপ্ন দেখতে শুরু করি, যুবককে কেন খুলে বলতে যাই? যুবকের পিছন পিছন আমি ধাপে ধাপে উঠতে লাগলাম।

ফার্নানডেজের খাসবেয়ারা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাকে একটা 'লম্বা সেলাম দিয়ে প্রায় ছুটে গিয়ে একটা রুপোর পাতে মোড়া ভারি দরজা প্রাণপণে টেনে মেলে ধরল। আমি যুবকের পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম।

ময়দানব পাণ্ডবদের জন্য যে রাজ-সভা তৈরী করেছিলেন সেখানে দুর্যোধনের যে-হাল হয়েছিল ফার্নান-ডেজের ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমার অবস্থা প্রায় অনুরূপ হল। মানুষের কল্পনা ও শক্তির চেয়ে তার দম্ভের কথাই বেশী মনে হল। কল্পনা ও শক্তির ক্ষুধা ছাড়িয়ে দম্ভই মানুষকে স্বর্গজয়ের অভিযানে নিয়ে যায়। ফার্নানডেজের ড্রয়িংরুম যে ইন্দ্রসভাকে হার মানাতে প্রাণপাত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

আমি বিস্ময়ে অবিশ্বাসে ড্রয়িং-রুমের সজ্জা ও শোভা দেখছিলাম। ফার্নানডেজ কখন তাঁর সোফা থেকে উঠে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে-ছেন খেয়াল ছিল না। ফার্নানডেজের কথা কানে যেতে আমার হুঁশ হল।

ফার্নানডেজ বললেন, 'এক কথায় বিনা নোটিশে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছেন, এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই সংগে একটা নালিশও না জানিয়ে পারছি না। আমার ঘরের তারিফ করতে গিয়ে আপনি আমাকে প্রায় অস্বীকার করে বসেছিলেন।"

আমি বললাম, দোষ আমার নয়। আপনার। এ ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেছেন, তাতে ঘরে আপনাকে কেন, নিজেকেও ভুলতে বসেছিলাম।'

চোখের ও মনের ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লেগেছিল। এতক্ষণে ফার্নানডেজকে লক্ষ্য করে দেখলাম। অবাক হলাম। এই ক্ষুদ্র, প্রায় ব্যক্তিত্বহীন মানুষটি ফার্নানডেজ? অসংখ্য কোটি

ঐশ্বর্যের মালিক, বিরাট সম্পত্তির অধীশ্বর, সুপণ্ডিত মহানায়ক ফার্নান্ডেজ?

আমার বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করে ফার্নান্ডেজ হাসলেন। হাসি মুখ থেকে রেখে উঠে উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুতের মতো ছিটকে বার হল। আমি প্রবল কণ্ঠের বহু স্পষ্ট অনুভব করলাম।

সমস্তক্ষণ ঘরে এখানে সেখানে পরিপাটি করে সাজানো বসবার জায়গা। এক মিনিটের নোটিশে বড়রকমের পার্টি দেওয়া চলে। কিন্তু আসল কথা এ নয়। এ ঘরে কারো ইচ্ছামন্ত্রে ঝাড়লণ্ঠনে অলঙ্কারে আভরণে স্বর্ণলঙ্কা অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছে। দুর্লভ বাতিদানে দৃষ্টিকটু সমারোহে নয়। সংযমপথে, ঘরের অলৌকিক বিন্যাসে। বাইরের পৃথিবীকে বাদ দিয়ে এ ঘরে যদি অকস্মাৎ ঋতু পরিবর্তনের পালা শুরু হয়, অবিশ্বাস করার উপায় থাকবে না। কারণ বসন্তই থাক। এ ঘর মায়াপুত।

মিসেস ফার্নান্ডেজ ইতিমধ্যে উঠে এসেছেন। ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। তা সত্ত্বেও যৌবনে যে যথার্থ সুন্দরী শ্রীমতী ছিলেন, স্পষ্ট বোঝা যায়। বয়স দেহে প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু চোখের ভাষায় আঁচড় কাটতে পারেনি। সেখানে অলকানন্দার কবিতা এখনও উজ্জ্বল। কবিতা এখন গভীর হতে গভীরতর, শান্ত, সমাহিত। কিন্তু অর্থ অটুট, অবিকৃত।

ফার্নান্ডেজ স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মিসেস ফার্নান্ডেজ ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আমার দুটি হাত কোমল করপুটে তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনি এসেছেন। আমরা সুখী। অত্যন্ত সুখী।'

আমি তাঁর এই আবেগে বিস্মিত ও অভিভূত হলাম। আমি তাঁর কথার জবাব দেবার সুযোগ পেলাম না। তিনি স্বামীকে একধারে একটু টেনে নিয়ে গেলেন। দুজনের ভিতর খাটো গলায় কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হল বুঝলাম না। দুজনের মুখ প্রসন্ন। দুজনে আমার দিকে একসঙ্গে তাকালেন। দুজন কোনো বিষয়ে যে পারস্পরিক সমর্থনে ঈষৎ মাথা নাড়লেন আমার চোখ এড়ালো না।

মিসেস ফার্নান্ডেজ আমাদের বসালেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে আমার দুপাশে বসলেন। আমি তাঁদের অন্তরঙ্গ আচরণে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

ফার্নান্ডেজ বললেন, 'আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে কটা দিন থাকুন। ললিতা হয়তো আমার সম্বন্ধে বেশী কড়া ভেবেছিল। ওদের কথা গ্রাহ্য করবেন না। আপনার কথাই আলাদা। কিন্তু ওদের প্রাণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল যেন।'

মিসেস ফার্নান্ডেজ আমাকে লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'দিয়েছি না কি?'

আমি বলে বসলাম, 'জোয়ার টেনে এনেছেন, হয়তো তাই।'

গভীর আবেগে মিসেস ফার্নান্ডেজের দুচোখ প্রায় বুজে এল। অসঙ্কোচে আমার গায়ে ঈষৎ গা লাগিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আপনার কথা সত্য হোক। এতে যে আমাদের কী স্বার্থ কী করে বোঝাবো।'

আমি চমকে উঠলাম। ফার্নান্ডেজও চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। স্ত্রীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু এ ব্যাপার হয়তো আমার চোখের ছলনা। কারণ পরমুহূর্তেই দুজনের ভিতর দৃষ্টিবিনিময় হল। দুজনেই পুনরায় পরস্পরের সমর্থনে হাসলেন।

ফার্নান্ডেজ বললেন, 'সামনের কটা দিন আপনার দলের নৃত্যাভিনয় দেখে প্রচুর আনন্দ পাবো। বিনিময়ে কী দেব? আমার হয়ে ললিতা দিক।'

ফার্নান্ডেজের ইঙ্গিতে মিসেস ফার্নান্ডেজ পিয়ানোর দিকে এগোলেন। ডালা খুলে আসন টেনে নিয়ে বসলেন। আঙুল দিতে না দিতেই পিয়ানো যেভাবে সাড়া দিল, আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। শুনেছিলাম পিয়ানো বাজনায় লঙ্কাদ্বীপে তাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'একি বাজনা? না বাজনার আড়ালে সম্মোহন?' আমি তাঁর বাজনা শুনতে শুনতে সুদূর অতীতে চলে গেলাম। ঘরে বসে লঙ্কার আকাশের তলায় কাদের হাহাকার শুনলাম! কারা বুক চাপড়াচ্ছে? কারা ধুলোয় লুটোচ্ছে? কোন্ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অধ্যায়ে কারা তাদের জীবনের পরম ধন নিষ্ঠুর বেদীতে উৎসর্গ করতে চলেছে?'

ফার্নান্ডেজের দুচোখে দুফোঁটা জল শিশিরের মতো টলটল করছে। আমি অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি আর্দ্র চোখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'দশাননের শেষযাত্রা। জীবন থেকে মৃত্যুতে। মিথ্যা থেকে সত্যে। তাঁর নিজ জীবনের মিথ্যা নয়। কাহিনীর কিংবদন্তীর মিথ্যা। ললিতার নিজস্ব রচনা।'

মিসেস ফার্নান্ডেজ খানিকক্ষণ পিয়ানোর সম্মুখে নিশ্চল বসে রইলেন। তারপর উঠে ধীরে ধীরে এসে আমার পাশে বসলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'জানি না কতটা বোঝাতে পেরেছি। দশাননের সত্য কটা মানুষ বোঝে? যদি বুঝে থাকেন মনে রাখবেন।'

আমি যা হোক কোনো একটা উত্তর দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছা চাপতে না পেরে বললাম, 'বুঝেছি। আশ্চর্যরকমে বুঝেছি। মনে হল চোখে দেখলাম। দশানন যেন আমার কানে কানে তাঁর কথা বলে গেলেন।'

মিসেস ফার্নান্ডেজ আমার একটি হাত নরম করে ধরে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আশ্চর্য! আমরা একজন ভারতীয়ের মুখে এই কথা শোনার জন্য কতকাল অপেক্ষা করে আছি! আজ শুনলাম।'

ফার্নান্ডেজ নিষ্পলক চোখে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে তিনি গম্ভীরমুখে মাথা নাড়লেন। লঙ্কা ও ভারতের ভিতর যে-একফালি সমুদ্র, আমার মনে হল তা আসলে বিস্ময়ের সাগর। ফার্নান্ডেজের বাংলোয় আমার প্রাত্যহিক জীবনের জাহাজডুবি হয়ে আমি সেই সাগরে তলিয়ে গিয়েছি।

খাবার টেবিলে দল ভারী হল। ফার্নান্ডেজ দম্পতির একমাত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারিণী তাঁদের অষ্টাদশী কন্যাকে দেখলাম। সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক কাব্যে ও নাটকে এই শ্রেণীর তরুণীর উল্লেখ ও বর্ণনা মেলে। নিতান্ত অরসিক না হলে কিছুক্ষণের জন্যে যে-কোনো পুরুষের মন অধিকার করে নেয়। আমি কয়েকবার তাকে পূর্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য না করে পারলাম না। সেও প্রতিবারই আমার দৃষ্টির উত্তরে নিঃশঙ্কে চক্ষুবাণ নিক্ষেপ করে তার বয়সের ধর্ম পালন করল।

কুমারী ফার্নান্ডেজের পাশে বসেছিল তার সহপাঠিনী একটি তরুণী। টেবিলে সুপ-এর প্লেট পৌঁছে গেল। এই সময়ে এ গল্পের আর একটি পাত্র আবির্ভূত হল। ফার্নান্ডেজের দূত সুসজ্জিত কালো কুচকুচে যুবক পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। ফার্নান্ডেজ-কন্যার সহপাঠিনী মৃদু হেসে আসন ছেড়ে একটা চেয়ার তফাতে বসল। যুবক সকলকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে পরিত্যক্ত আসনে ফার্নান্ডেজ-কন্যার পাশে বসল। সেই মুহূর্তে একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হল। সে ফার্নান্ডেজ-কন্যার অনুরাগী। সম্ভবত পাণিপ্রার্থী। আমিও সর্বপ্রকারে যুবক। অনেকেরই মতে সুদর্শন। পুরুষসিংহ না হলেও সুপুরুষ। ফার্নান্ডেজের বাংলোয় আমার আগমন ও অবস্থান কোনোক্রমেই তার মনঃপূত হতে পারে না। যেন তার মুখে আজ সন্ধ্যায় দুবার দুর্যোগের অন্ধকার দেখেছিলাম এ বিস্ময়ের অবসান হল। লঙ্কাদ্বীপে বিশেষ করে ফার্নান্ডেজের বাংলোয় নানা বিস্ময়ের উপর্যুপরি আক্রমণে আমি বিপর্যস্ত বোধ করছিলাম। অন্তত একটা বিস্ময় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরে আমি কিছুটা হালকা হলাম। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে বিস্ময়ের যে-ধাক্কা এল তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

ফার্নান্ডেজ হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার ঘোষ। আপনি বিবাহিত?'

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ।'

ফার্নান্ডেজ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তাই শুনেছিলাম। এখন আপনার মুখে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।'

ফার্নান্ডেজ নিশ্চিন্ত হলেন। কেন? আমি সবিস্ময়ে মুখ তুলতে বুঝলাম সকলেই ফার্নান্ডেজের প্রশ্নের আমি কী উত্তর দিই শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিল। দেখলাম, দেখে অবাক হলাম ললিতা ফার্নান্ডেজ, তাঁর কন্যা ও তার সহপাঠিনীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুবকের মুখে ঝড়ের অন্ধকার নেমেছে। তার চোখে বাজেপড়া বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। আমি বিবাহিত এ সংবাদে ফার্নান্ডেজ পরিবারের কেন উল্লাস? যুবকের হতাশা কেন? মনে হল মনস্তত্ত্বের শাস্ত্র কোনো একটা আচমকা ধাক্কায় ডিগবাজী খেয়েছে।

সে রাতে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও দুর্বোধ্য বিস্ময়ের ভার বুকে নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। ঘুম এল না। ফার্নান্ডেজের বাংলোয় যে-রহস্য আমার বুদ্ধির ও অভিজ্ঞতার ঝুঁটি ধরে টান দিল তার মর্মভেদ করতে মনস্তত্ত্বের নানা পথে হেঁটেও কোনো মীমাংসা খুঁজে পেলাম না। শেষে ক্লান্ত হয়ে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিয়ে শূন্যমনে শুয়ে রইলাম। এভাবে কতক্ষণ ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল ছিল না। হঠাৎ জেগে পড়লাম। বেডল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। রাত পৌনে একটা। এগারোটায় শুয়েছিলাম। তারপর ঘণ্টাখানেক চিন্তায় দুশ্চিন্তায় কেটেছিল। মগজ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হল। মনে পড়ল ঘুমঘোরে যেন কাদের হাহাকার কোলাহল শুনেছিলাম। ললিতা ফার্নান্ডেজ পিয়ানোর দশাননের শেষযাত্রায় যে বিয়োগান্ত অধ্যায়কে ভাষা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে যেন এই হাহাকারের ও কোলাহলের বিশেষ মিল ছিল। মিল কেন, বলা যায় যে ললিতা ফার্নান্ডেজের বাজনাই যেন স্বপ্নঘোরে আমার কানে ও হৃদয়ে তুফান তুলেছিল।

বেডল্যাম্প নেভাতে গিয়ে আমার হাত থেমে গেল। আমি কি জেগে না ঘুমিয়ে—নিজেকে প্রশ্ন করলাম। কারণ স্বপ্নঘোরে যে হাহাকার ও কোলাহল শুনেছিলাম তা আবার শোনা যাচ্ছে। এ হাহাকার ও কোলাহল ললিতা ফার্নান্ডেজের গীত রচনার সাঙ্কেতিক ধ্বনি নয়। স্বপ্নে শোনা অস্পষ্ট আওয়াজও নয়। অতি নিকটেই কান্না বিলাপে অভিসম্পাতে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সরোষ নালিশে রাতের পৃথিবীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চলেছে! এ কোন শোকোন্মত্ত অক্ষৌহিণীর পায়ের চাপে মাটি টলমল করছে? কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি উঠলাম। ঘরের কপাট খুলতে গেলাম। বাধা পেলাম। মরিয়া হয়ে চাপ দিতে কপাট খুলে গেল। বারান্দায় পা দিতে গেলাম। ফার্নান্ডেজের সঙ্গে মুখোমুখি হল। বললেন, 'কী করছেন? কোথায় যাচ্ছেন?' তাঁর বলার ভঙ্গি ঈষৎ রূঢ় মনে হল। পরমুহূর্তেই গলা নামিয়ে নরম স্বরে বললেন, 'আপনি জেগে রয়েছেন?' তাঁর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

আমি উত্তরে বললাম, 'গোলমালে ঘুম ভেঙে গিয়েছে।'

ফার্নান্ডেজ বললেন, 'আশ্চর্য! ঘুম ভাঙবার কথা নয়।' তারপর জানলা দিয়ে টেবিলের উপর জলের গেলাস-ভরা দেখে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বুঝেছি।' আমিও বুঝলাম তাঁর এই শেষোক্তি আমার শোনার জন্য নয়।

বাইরের দাপাদাপি কোলাহল তখন সপ্তমে উঠেছে। অসংখ্য মশালের আলোয় জ্যোৎস্না লাল হয়ে গিয়েছে।

ফার্নান্ডেজ ওদিকে দৃকপাত না করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিলেন। ধীরকণ্ঠে বললেন, 'দশাননের শেষযাত্রার মহলা চলছে। আপনার জন্য আয়োজন। কাল রাতে দেখবেন। আগে পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখা উচিত হবে না। আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে।' ঘর হতে বার হতে গিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন। টেবিলের উপর গেলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'জলটা খেয়ে ফেলুন। না হলে আতিথ্যের অমর্যাদা করা হবে।'

ফার্নান্ডেজের কথার ইঙ্গিত যতই অস্পষ্ট ও অস্বস্তিকর হোক না কেন, মোহাবিষ্টের মতো গেলাসটা তুলে নিয়ে নিঃশেষ করলাম। ফার্নান্ডেজ আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন আমার সঙ্গেই তাঁর কোনো কূট চক্রান্ত।

আমি একটানা সাত ঘণ্টা ঘুমিয়ে যখন উঠলাম ঘড়িতে তখন পৌনে নটা। ধড়মড় করে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নানপর্ব শেষ করে যখন ড্রয়িংরুমে গেলাম তখন দশটার কাছাকাছি।

ফার্নান্ডেজ দম্পতি খবরের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। বুঝলাম ওটা বাহ্য। আসলে দুজন আমার অপেক্ষায় ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে দুজনে উঠে দাঁড়ালেন। মিসেস ফার্নান্ডেজ বললেন, 'কাগজ পরে পড়বেন। এখন খাবার টেবিলে চলুন।'

ড্রয়িংরুমে ফার্নান্ডেজ-কন্যা একা চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রেখে তন্ময় হয়ে কী চিন্তা করছিল। আমরা ঢুকতে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার চোখে চোখ পড়তে তার মুখ সলজ্জ হাসিতে ভরে গেল। আমি সাড়া দিতে গিয়ে বাধা পেলাম। গত রাতে ফার্নান্ডেজের প্রশ্নের উত্তরে আমি বিবাহিত এই স্বীকারোক্তির পর আমি মনের দিক থেকে দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। লঙ্কাদ্বীপে কোনো খণ্ড প্রেমে অস্থায়ী কোনো অংশগ্রহণ করলে জড়িয়ে পড়ব এ আশঙ্কা আমার ছিল না। সংসারের খুঁটিতে বাঁধা থেকে সমস্তক্ষণ আমি কখনো-সখনো এ মাঠে যে মাঠে বিচরণ করেছি। কিন্তু যাকে আশ্রয়, আশ্বাস বা স্বাদ কোথাও মেলেনি। বলে নিজের ঘর ও সংসারকে ইহলোকে স্বর্গ বলে মেনে নিয়েছি। লঙ্কারও কোনো আকর্ষণেই আমার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হতে পারত না। শুধু কেন বলতে পারি না, বাধা পেলাম।

টেবিলে আমরা যে যার চেয়ারে বসবার পর মিসেস ফার্নান্ডেজের নির্দেশে ফার্নান্ডেজ-কন্যা চায়ের পেয়ালা হাতে সন্তর্পণে আমার পাশে এসে বসল। মিসেস ফার্নান্ডেজ কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন, 'সীতা! চিনি ও দুধের পরিমাণ ঠিক করে মিস্টার ঘোষের চা তুমি তৈরী করো। আমি তোমার বাবাকে সাহায্য দিচ্ছি।'

ফার্নান্ডেজ-কন্যার সীতা নাম আমার কানে অস্বাভাবিক ঠেকল। ফার্নান্ডেজ আমার মনোভাব অনুমান করে বললেন, 'পরিহাসচ্ছলে না, গভীর প্রয়োজনে আমরা ওর নাম সীতা রেখেছি। এ নাম ওকে শুধু মানায়নি। ওকে তিলে তিলে সম্পূর্ণ করেছে। এখন এ নাম ওর পরম সম্পদ। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এ নাম ও প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে থাকবে।'

যতক্ষণ ফার্নান্ডেজ কথা বললেন, লক্ষ্য করলাম সীতার অনভ্যস্ত চায়ের কাপ ও দুধ ও চিনির পাত্রর উপর থরথর কাঁপলো। চা তৈরী করে সে কাপটা আমার সম্মুখে রাখলো। দেখলাম উদার আকাশের মতো তার মুখ রূপে ও নির্মল। তার দুটি গভীর চোখে অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভারতের সীতার কাছে সংবাদ নিয়ে একদিন মহাবীর স্বর্ণলঙ্কায় হানা দিয়েছিলেন। আমি জাহাজে চেপে পড়ের সমুদ্র ভয় করে লঙ্কায় এসেছি। আমার কাছে লঙ্কাদুহিতা সীতা কোন সংবাদ চায়?'

মিসেস ফার্নান্ডেজ কন্যাকে নিষ্পলক চোখে দেখছিলেন। তাঁর দুচোখ আর্দ্র হয়ে এসেছিল। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'কেন ওর সীতা নাম, রাতে শুনবেন।' তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন।

ফার্নান্ডেজ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'বলতে প্রাণ ছটফট করছে। তবু ধৈর্য ধরতেই হবে। রাতে ডিনারের পরে আমার বক্তব্য শুনবেন। 'দশাননের শেষযাত্রা' গানার ভূমিকা হিসেবে। বলেছেন, যদিও স্বর্ণলঙ্কাকে আমরা প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি, আমরা ভারতকেও চাই। আমাদের গভীর প্রয়োজনে চাই।'

লক্ষ্য করলাম ফার্নান্ডেজ দম্পতি ও আমি, আমরা তিনজনই সীতাকে একদৃষ্টে দেখছি। কিন্তু সে এই পৃথিবীতে তখন নেই। তার গোপন ধ্যান তাকে

কিছুক্ষণের জন্য লোকান্তরে নিয়ে গিয়েছে।

সারা লংকায় কলম্বোর টাউনহলই বেশী মান। এ কারণে প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন টাউনহল-এই হয়েছিল। প্রথম সারে বাঁদিকে গণ্যমান্যদের দলে আমরা বসেছিলাম। আমরা অর্থাৎ লংকার ইংরেজ শাসক ও তাঁর ফুটফুটে পরীর মতো স্ত্রী, ঠিক তাঁর পাশে আমি। তারপর ক্রমান্বয়ে ফার্নানডেজ পরিবার ও রেসঃকারী দলের নেতা ডক্টর কোরেশ।

লংকা সফরের জন্য আমি একটা পাঁচ-মিশেলী দল জুটিয়েছিলাম। ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী, এই চার রকমের নাচ নানাপ্রকারে সাজিয়ে অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়েছিলাম। প্রথামতো ভরতনাট্যম দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। পর্দা উঠল পড়ল। দর্শকদের হাততালি প্রেক্ষাগৃহে বারবার একটা বিশাল পায়রার ঝাঁকের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে অনুষ্ঠানের শেষ নাচ শুরু হল সীতাহরণ।

অনুষ্ঠানসূচীতে সীতাহরণ কথাটার উপর চোখ পড়তেই আমি কি মনে করে সীতার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম সে একটা চাপা উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সে নিশ্চল। কিন্তু তার দুচোখ জ্বলছে। সে তার দুচোখে আলো জেলে মঞ্চের সীতাকে লক্ষ্য করছে। ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে দশানন মঞ্চে প্রবেশ করতে তার উত্তেজনা শেষ সীমায় পৌঁছলো। তার ঠোঁট কাঁপলো, নাসিকা স্ফুরিত হল। মঞ্চের সীতা ও দশাননকে দুচোখে বন্দী করে সে যেন কোনো দুর্লভ ঈপ্সিত মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আছে। দশানন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে রাজবেশে মহামহিমায় আত্মপ্রকাশ করলেন। মনে হল মঞ্চের সীতার সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের সীতাও কেঁপে উঠলো। দশানন যখন সীতার কেশাকর্ষণ করলেন লংকার প্রেক্ষাগৃহ তখন নিস্তব্ধ। হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য দর্শকদের মন সীতার লাঞ্ছনায় কাতর, তাদের শ্রেষ্ঠবীর মহাবলী দশাননের প্রতি কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমুখ। লংকা তখন একবিন্দু দ্বীপ নয়, সসাগরা পৃথিবী। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা শুধু লংকাবাসী নয়, মহাপৃথিবীর মানুষ। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি! কিন্তু এ কি? আমার চোখের ভুল নিশ্চয়ই নয়।

নজরুল এক বিস্ময়
(সঙ্গীতসহ সমগ্র নজরুল সাহিত্যের রস-সমীক্ষা)
ড: রাজজীবন আচার্য
প্রাপ্তিস্থান : পান্না বুক এজেন্সী
২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ক্‌ল-১২

প্রেক্ষাগৃহে সীতা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে আদি লংকার রক্ষকুলের উল্লাস। সে হাততালি দিতে যাচ্ছে। আমার দিকে সে একবার তাকালো। এক মুহূর্ত সে ইতস্তত করল। তারপর কি মনে করে সে বসে পড়ল। আমি হতবুদ্ধি হলাম। যে সীতার ধ্যানে বিভোর, প্রাণ দিয়ে তার নাম আঁকড়ে রয়েছে, সীতার লাঞ্ছনায় তার এ উল্লাসের অর্থ কি? আবার বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম।

অনুষ্ঠানের পর আনুষ্ঠানিক পরিচয় ও লৌকিকতার পালা শেষ হতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগলো। দশাননের শেষযাত্রার ব্যবস্থার জন্য ফার্নানডেজরা তাড়াহুড়ো করে পর্দা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছিলেন। কেন জানি না ফার্নানডেজ-কন্যার অনুরাগী কালো-কুচকুচে যুবকটি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর থেকেই আমার উপর নজর রাখছিল। সে যেন কি বলতে চায়। ভিড় হাল্কা হতে সে কয়েক পা আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করল। কারণ বুঝতে দেরী হল না। দেখলাম অদূরে ডক্টর কোরেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবককে লক্ষ্য করছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি ইশারা করলেন। আমি কাছে যেতেই তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে একটা খালি ঘরে ঢুকলেন। কপাট বন্ধ করে একটা চেয়ার আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন। কথা আছে।' ডক্টর কোরেশ আমার পাশে বসলেন। আমাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, 'জয়বর্ধন আপনাকে অনুসরণ করে ফিরছে, লক্ষ্য করেছেন?'

আমি বললাম, 'জয়বর্ধন! জয়বর্ধন কে?'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'ফার্নানডেজের দূত। যে আপনাকে ফার্নানডেজের বাংলোয় লটবহর সমেত নিয়ে গিয়েছে।'

আমি বললাম, 'ওঃ!'

ডক্টর কোরেশ আমার এই কপট ঔদাসীন্যে প্রীত হলেন না। বললেন, 'ফার্নানডেজের বাংলোয় গিয়ে ভাল করেন নি। একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলে পারতেন।'

আমি বললাম, 'জিজ্ঞাসা করার সময় দিলে তো! গাড়ি পাঠিয়ে কয়েক মিনিটের নোটিশে নিয়ে গেলেন।'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'কোনো অজুহাতে সময় নেওয়া উচিত ছিল।' তাঁকে বিশেষ চিন্তিত মনে হল। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কয়েক বছর ধরে ফার্নানডেজ একটা বিপদ সৃষ্টি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। স্ত্রী ও কন্যাকে জড়িয়েছে। জয়বর্ধন সীতার আকর্ষণে নিজে থেকেই জড়িয়েছে। না জেনে আপনিও বিপদে পা বাড়িয়েছেন। জড়িয়ে না পড়েন।'

আমি স্তম্ভিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বিপদ।'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'কল্পনা ও আধ্যাত্মিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যে বিপদ ঘটে সেই বিপদ। ফার্নানডেজ আদি রামায়ণের রায় পাল্টে দিতে চান। কন্যাকে সীতার ভূমিকা দিয়েছেন। কাকে কোন্ ভূমিকা দিয়ে কী অনর্থ বাধান কে জানে?'

এবার আমার হাসি পেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি রামচন্দ্র না দশানন?'

ডক্টর কোরেশ আমার এ পরিহাস গায়ে না মেখে বললেন, 'জয়বর্ধনের রকম-সকম দেখে আমি বিচলিত বোধ করছি। আজ বিনানিমন্ত্রণেই একটা ছুতোয় ফার্নানডেজের বাংলোয় যেতে হচ্ছে।' তবে আপনার সঙ্গে নয়। হাতে জরুরী কাজ আছে, সেরে আলাদা যাবো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডক্টর কোরেশ বললেন, 'আপনি আমার উপর নির্ভর করে লংকায় এসেছেন। আপনাকে জাহাজে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছি না।'

ডিনার শুরু হতে ডক্টর কোরেশ মহাদাপটে খাবার ঘরে ঢুকলেন। ফার্নানডেজকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে বাদ দিয়ে আজ রাতে বাংলোয় ধুমধামে কি কান্ড করছ ফার্নানডেজ?'

ডক্টর কোরেশের আকস্মিক আবির্ভাবে সবাই চমকে উঠেছিল। ফার্নানডেজও। সামলে নিয়ে জবাব দিলেন, 'তুমি বাদ পড়তে চাও বলে বাদ দিই কোরেশ। না হলে তোমাকে বাদ দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'তুমি অন্তর্যামী হতে গিয়ে ভুল করো ফার্নানডেজ। বাদ পড়ার ইচ্ছে মোটেই নেই, কখনও ছিল না।'

ফার্নানডেজ তপ্তস্বরে বললেন, কিন্তু তোমার অবিশ্বাস? তোমার অবিশ্বাস দিয়ে তুমি নিজেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছো।'

ডক্টর কোরেশ কপাল চাপড়ে বললেন, 'ভিতরে বিশ্বাস গভীর বলেই অবিশ্বাস দিয়ে তাকে যাচাই করি। তোমার বোঝা উচিত ফার্নানডেজ।'

ফার্ণানডেজ ডক্টর কোরেশের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে ধরা গলায় বললেন, 'আমার কাছে নিজেকে একটু খুলে ধরতে পারতে কোরেশ। তাহলে বৃথা ভুল বোঝাবুঝি হত না।'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'আমি দেখছিলাম তুমি কত ভুল বুঝতে পারো।

আজ মনে হল ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার অবিশ্বাসের মুখোশ খুলে ফেলা দরকার। তাছাড়া—'

ফার্নানডেজ স্যুপের প্লেটে চামচে ডুবিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ডকটর কোরেশ বললেন, 'আজ শুধু আমার বিশ্বাস জাহির করতে আসি নি। তুমি কি ভাবছো জানি না। আমার আজ থেকে থেকেই মনে হচ্ছে সময় এসে গিয়েছে।'

ফার্নানডেজের দুচোখ জ্বলে উঠল। ঠিক সেই সময় জয়বর্ধনের হাত থেকে স্যুপের চামচে পড়ে গেল। সে হঠাৎ বিষম খেল।

ডকটর কোরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোআটস রং উইথ ইউ জয়বর্ধন? আর ইউ নট ফীলিং ওয়েল?'

জয়বর্ধন পাংশুমুখে কাষ্ঠহাসি হাসল।

এক মুহূর্তে জয়বর্ধনের উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করে টেবিলের দুধারে অনেক জোড়া চোখ ডকটর কোরেশের দিকে ফিরলো। ডকটর কোরেশের মুখে মৃদু হাসি। তিনি কোন্ সুস্বপ্ন দেখছেন? তিনি কী চাল চালছেন বুঝে উঠতে পারলাম না।

মিসেস ফার্নানডেজ ডকটর কোরেশকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অনেক দিন বাদে আপনাকে আগের মতো দেখছি। কী ভাল লাগছে বোঝাতে পারবো না।'

ফার্নানডেজ অনন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ প্লেট থেকে মুখ তুললেন। বললেন, 'কোরেশ! তোমার অনুমান সত্য। সময় এসে গিয়েছে।' ফার্নানডেজের দৃষ্টি তখন আমার উপর। আমার বুক দুরুদুরু করে উঠল।

ডিনারের পর আমরা ড্রয়িংরুমে জড় হলাম। ফার্নানডেজ দম্পতি ও তাদের কন্যা একটা লম্বা সোফায় পাশাপাশি বসলেন। ডকটর কোরেশ, জয়বর্ধন ও আমি একটু তফাতে তাঁদের দিকে মুখ করে বসলাম।

ফার্নানডেজ বললেন, 'রাত তিনটের দশাননের শেষযাত্রা সুরু হবে। এখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা। আমার বক্তব্য ও সে বিষয়ে প্রশ্ন, উত্তর ও আলোচনা ঘন্টাখানেকের বেশী সময় নেবে না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা দশাননের শেষযাত্রা'র জন্য তৈরী হব। সীতাকে আজ একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে হচ্ছে। তাকে একটু আগেই তৈরী হতে হবে।'

সীতা ফার্নানডেজের দিকে তাকালো। কিন্তু সে ফার্নানডেজকে দেখছে না। তার দৃষ্টি কত দূরে কোথায় চলে গিয়েছে! সে কি দেখছে? কাকে দেখছে?

ফার্নানডেজ এবার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মিস্টার ঘোষ। আজিল-দেশ পার হয়ে লঙ্কাদ্বীপে এসেছেন। মানুষের চালচলনে আচরণে নানা তুচ্ছ অবাঞ্ছনীয় ঘটনায় মনে না হয়ে পারে না যে আমাদের দেশ আপনাদের সঙ্গে যে-কোনো অজুহাতে ঝগড়া বাধাতে চায়। এর মূল কারণ কী জানেন?'

আমি বললাম, 'রামরাবণের যুদ্ধ।'

ফার্নানডেজ বললেন, 'যুদ্ধ? যুদ্ধ তো মানুষ জাতের নিত্যসঙ্গী। লেগেই আছে। রাজায় রাজায়, দেশে দেশেয়। কখনো কখনো মনে হয় জীবনের সবকিছুই, এমন কি সখ্য-মৈত্রী স্নেহ-প্রেম পরিণামে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।'

ডকটর কোরেশ সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক। বলা চলে জীবনের আর এক নাম যুদ্ধ।'

আমি ফার্নানডেজকে লক্ষ্য করে বললাম, 'তা হলে?'

ফার্নানডেজ বললেন, 'রামায়ণ। রামায়ণ যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী তার ভুল ব্যাখ্যা। এবং এর জন্য দায়ী আপনার দেশ। তা না হলে খুব সম্ভব আমার দেশ আপনাদের রামায়ণ মেনে নিতো।'

আমি বললাম, 'পৃথিবী মেনে নিয়েছে।'

ফার্নানডেজ দ্রুতকণ্ঠে বললেন, 'কারণ পৃথিবীর গায়ে আঁচড় লাগে নি।'

ডকটর কোরেশ বললেন, 'অথচ সুকৌশলে লংকার হৃৎপিন্ড ভেদ করা হয়েছে।'

ফার্নানডেজ ডকটর কোরেশের দিকে সমর্থনসূচক দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'দশানন কেন সীতাকে গন্ডী থেকে বার করে লঙ্কায় আনতে গেলেন রামায়ণে খোলাখুলি না বলা হলেও অনুমান করা চলে। স্বর্ণলঙ্কায় সব ছিল। শৌর্য, ঐশ্বর্য, সংস্কৃতি, কীর্তি—কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল মহামহিমায় একটি দুর্লভ নারী-আত্মার। যে-আত্মা জীবনের সর্বস্ব মূল্যস্বরূপ চেয়ে বসে। সীতা সেই আত্মা নিয়ে মহাকাব্যের ভূমিকার অপেক্ষায় ছিলেন। সব জেনে দশানন সীতাকে হরণ করলেন। তারপর কৃতকর্মের জন্য লঙ্কাকান্ডের প্রতিটি দিন কঠিন মূল্য দিলেন। স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই হল। বজ্রকুল বীরহীন হল কিন্তু দশানন টললেন না। দশানন দশমুখে দশ কথা বলেছেন তা দিয়ে তাঁর বিচার হয়েছে। কিন্তু দুঃখে পরাজয়ে তাঁর আত্মা যে-কথা বলেছে তা ভারতের কানে ঢোকেনি, মর্মে পৌঁছনো দূরের কথা।'

আমি বললাম 'রামায়ণ পড়ে কি দশাননের উদ্দেশ্য আদর্শ সম্বন্ধে এই রকম ধারণা হয়?'

ফার্নানডেজ অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললেন, 'রামায়ণের বাক্যজালের আড়ালে যে ইঙ্গিত স্পষ্ট তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার হয় না। অবশ্য আমি চর্মচক্ষুর কথা বলছি না। যে চোখ শুধু মানুষের আছে বলে তার অহংকার, সেই চোখের কথা বলছি।'

ডকটর কোরেশ বললেন, 'এই চোখ না থাকলে মানুষের কী থাকে?'

ফার্নানডেজ বললেন, 'দশাননকে নীতিজ্ঞানহীন রাক্ষস বলে ধিক্কার দিয়ে ভারত লংকাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অথচ লঙ্কা ভারতকে চায়: স্বর্ণলঙ্কা সুদূর অতীতে যেমন চেয়েছিল ঠিক সেই অতল পিপাসা নিয়ে চায়। সাড়া পায় না বলে ক্ষোভে অভিমানে নানা ছুতোয় বিরূপতা করে।'

আমি বললাম, 'যে কারণেই হোক না কেন ভারত ও লঙ্কা দুটি দেশের ভিতর এরকম ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়। দুদেশ এক হতে কতক্ষণ? মাঝে তো এক ফালি সমুদ্র।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করতে করতে ফার্নানডেজ বললেন, 'এক? কী অর্থে এক? আপনি কি আমার দেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে বলছেন?'

আমি বললাম, 'না না। আমি আত্মিক ঐক্যের কথা বলছি।'

ফার্নানডেজের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমি এই আত্মিক মিলন ঘটাতে কয়েকটা বছর কী কঠোর সাধনাই না করছি।'

ডকটর কোরেশ বললেন, 'মিস্টার ঘোষ তোমার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখন তুমি সাচ্ছন্দে তোমার বক্তব্যে আসতে পারো।'

ফার্নানডেজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'সময় হয়েছে। না বলে উপায় নেই। আমার অনুরোধ, শর্ত বলে ধরে নিতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হচ্ছে, পৃথিবী ঘুণাক্ষরে আমার সাধনার হিদশ টের না পায়। দশাননের শেষযাত্রায় যারা অভিনয় করে তাদের ধারণা আমি একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে বছরের পর বছর টাকা ঢেলে চলেছি। তারা আমার উদ্দেশ্য জানে না। জানার প্রয়োজনও নেই।'

ফার্নানডেজ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'দীর্ঘকাল বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে আমি কিছুকাল আগে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছই। ভারত ও লংকার ভিতরের পুরনো ঝগড়া রাজনীতি বা অর্থনীতি দিয়ে মেটানো যাবে না। আত্মিক মিলনের জন্য আত্মিক মূল্যের প্রয়োজন। এ মূল্য দুদেশকে দিতে হবে। কিন্তু কে দেবে? দেশ? দেশ মানে তো মাটি ইট কাঠ পাথর ইত্যাদি। দেশ মানে তো দল। দেশের হয়ে কে দেবে? যে দেশের আত্মাকে নিজের ভিতর দেখতে পায়। আত্মার হয়ে মূল্য দিতে যে সব দিতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।'

ডকটর কোরেশ বললেন, 'অর্থাৎ দুটি মানুষ যে যার দেশের হয়ে নিজেকে বলি দেবে।'

ফার্নানডেজ বললেন, 'কিন্তু তারা কারা? এবং কী উপায়ে নিজেদের উৎসর্গ করবে? সামান্য ভুলে মূল্য দিয়েও কোনো ফল না পাওয়া যেতে পারে। ঠিক কিনা কোরেশ?'

ডকটর কোরেশ বললেন, 'ঠিক।'

ফার্নানডেজ বললেন, 'কোরেশ! তুমি জানো আমি জন্মসিদ্ধ। হাঁসওয়েল্‌ আমার স্থান নেই। আমি উচ্চতত্ত্বে বিশ্বাসী ও শাস্ত্রদর্শী। ঐ তত্ত্বের জোরে আমি চিনলাম। আমি আমার বিশেষ দৃষ্টিতে মানুষ দুটির লক্ষণ টের পেলাম, লক্ষণ মিলিয়ে চেনা কঠিন হলেও দুঃসাধ্য হবে না। এবং চিনলামও। তারা রামায়ণের দুটি শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদের উৎসর্গ করবে। সেজন্যই দশাননের শেষ-যাত্রার আয়োজন। আজ রাতে দশাননের শেষযাত্রা'র শেষ অভিনয়। কারণ দশানন ও সীতার হবে দুটি মানুষ দুদেশের হবে জীবনের চরম মূল্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাধনা শেষ হবে।'

ঘর হঠাৎ আশ্চর্যরকমে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ডকটর কোরেশ আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন কেন? শুধু কোরেশ নয়, সকলেই যেন আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে। ডকটর কোরেশের দিকে তাকাতে আমার মনে হল তিনি দৃষ্টিপথে একটা সূক্ষ্ম ইশারা করলেন। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম। সাহসে বুক বাঁধতে চেষ্টা করলাম।

ডকটর কোরেশ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'ফার্নানডেজ! তোমার মানুষ দুটি কারা?'

ফার্নানডেজ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'লক্ষণ বিচারে প্রথমত তাদের দুজনেরই বিবাহিত হওয়া দরকার। রামায়ণের দশানন-সীতাঘটিত ব্যাপারে দুজনেরই একটা ইচ্ছাকৃত সম্পর্ক থাকা দরকার। মিস্টার ঘোষ বিবাহিত। তাঁর দলের শ্রেষ্ঠ পালা সীতাহরণ। সুতরাং দশানন-সীতাঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর নিকট ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।'

আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। আমি বিবাহিত, এই আনন্দের সংবাদে কারো এত উৎসাহ কারো এত বিষাদ কেন বুঝলাম।

ডকটর কোরেশ আমাকে প্রতিবিম্ব করে বললেন, 'কিন্তু সীতা? সীতা কি বিবাহিত?'

ফার্নানডেজ বললেন, 'হ্যাঁ। জন-বর্ণনের সঙ্গে সীতার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সংগোপনে। আমাদের দুজনের উপস্থিতিতে।' ফার্নানডেজ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মনে হল মিসেস ফার্নানডেজ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ডকটর কোরেশ আমাকে সচকিত করে দিয়ে বললেন, 'এতটা যখন গড়িয়েছে লুকোচুরি করে কোনো লাভ নেই। মিস্টার ঘোষও এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে লঙ্কাদ্বীপে এসেছেন আজ রাতে টাউনহল-এ অভ্যাগত ছিলেন।'

আমি হাসবো কি কাঁদবো স্থির করে উঠতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরের সঙ্গে ডকটর কোরেশকেও স্মরণ করলাম।

ফার্নানডেজ বললেন, 'দশাননের শেষ পালায় আমি রামায়ণের একটু অদলবদল করেছি। এ পালায় সীতা লঙ্কাদ্বীপের হবে দশানন ভারতের। সীতা বাল্মীকির দশাননের বেড়াজাল ভেঙে মৃত দশাননের অনুগামিনী হবেন।'

সোফা থেকে উঠতে উঠতে ফার্নানডেজ ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমাকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি যে লঙ্কার আমার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। তবু সাবধানের মার নেই। বাংলোর আজ রাতে কড়া পাহারা বসেছে। পালানোর পথ বন্ধ। হঠাৎ সাহস হারিয়ে কেউ পালাতে গেলে বিপদ ডেকে আনবেন।'

ফার্নানডেজের কঠোর সঙ্কল্প তাঁর চোখের দুটি মণিতে ইস্পাতের মত চক-চক করে উঠল।

ঘরে ফিরে এসে নিজের দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। কেন ডকটর কোরেশকে জিজ্ঞাসা না করে ফার্নানডেজের বাংলোয় এককথায় চলে এলাম, বার বার নিজেকে প্রশ্ন করলাম। ডকটর কোরেশের উপরও কম রাগ হল না। এতই যদি জানতেন টাউনহল-এ আজ রাতেই সব খুলে বলে আমাকে আটকে ফেললেই পারতেন। কেন বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন? আমাকে এখন কী উপায়ে রক্ষা করবেন, ঈশ্বর ও তিনিই জানেন।

ঘরে কপাট দিয়ে বসে ছিলাম। কপাটে কে টোকা দিল। একবার, কয়েক বার। উঠে কপাট খুলতে সাহস হল না। ঘরের জানালায় পরপর জোর ঘা পড়ল। জানালায় খিল আলগা ছিল, খুলে গেল। ডকটর কোরেশ আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'শিগগির কপাট খুলুন।'

কপাট খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডকটর কোরেশ একটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে পড়লেন। কপাট ভাল করে বন্ধ করে সোফায় আমার পাশে বসে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বদ্ধ পাগল। এতটা এগিয়েছে জানলে কি আপনাকে আজ এখানে আসতে দিই?' তারপর আমাকে বললেন, 'দশানন সম্বন্ধে যা বলল একবর্ণ বিশ্বাস করেন? ইন মাই কনসিডার্ড ওপিনিয়ন দশানন ওয়াজ এ মাইটি কিং বাট এ ফিনিশড স্কাউন্ড্রেল। শুনলে শুধু ফার্নানডেজ নয়, লঙ্কার অনেকেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। কিন্তু যে যা নয় তাকে তা বলে মেনে নিই কী করে?'

আমার অতি দুঃখে হাসি পেল। আমি প্রাণভয়ে কাতর। এই সময় ডকটর কোরেশের দশানন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতটা আমার কানে বেসুরো ঠেকল।

ডকটর কোরেশ আমার দুশ্চিন্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুনরায় সজাগ হলেন। বললেন, 'বাইরে চাঁদের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে। কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। দশাননের শেষযাত্রা'র মিছিল বাংলোর ফটক থেকে বার হবে। হাতে দুটি ঘন্টা সময় আছে। এরই ভিতর আপনাকে সরে পড়তে হবে।'

আমি হতাশস্বরে বললাম, 'ফার্নান-ডেজ তার পথ রাখেননি। সাবধান করে দিয়েছেন।'

ডকটর কোরেশ মৃদুস্বরে বললেন, 'বাড় গেট থেকে পাঁচ মেজ মানুষ হৃৎকম্পাই বার হয়ে আসছে। ওরকম একটা পাঁচ থেকে আর একরকম একটা বাংলো থেকে বার হতে পারবেন না?'

আমাকে নিরুত্তর দেখে বললেন, 'না পারেন, অগত্যা আমাকে সীজারিয়ান অপারেশন করতে হবে।' ডক্টর কোরেশ মুচকি হাসলেন। আমার সাহস একটু ফিরে এল।

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'আমি ধারে-কাছেই থাকবো। আমার থেকে কেউ এলে চুপ মেরে যাবেন।' ঘর থেকে যাব হতে গিয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'মনের জোর হারাবেন না। সীতা আসতে পারে। কোনরকমেই তার কাছে নিজেকে ধরা দেবেন না।'

সীতা এল। ঘরে ঢোকার আগেই টের পেয়েছিলাম সে আসছে। তার পায়ে অ জ স্বর্ণলঙ্কার সনাতনী মল বাজছে। আবরণে আভরণে অলঙ্কারে আজ সে স্বর্ণলঙ্কার মানসকন্যা। রূপশাস্ত্রের অনিন্দ্য প্রতিমা।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে নত হয়ে আমাকে প্রণাম করল। গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আজ আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নেই। আজ তুমি নিজেকে উৎসর্গ করে দেহমুক্ত হবে। আমি অনন্ত আকাশকে সাক্ষী রেখে তোমার অনুগামিনী হবো।'

আমি অভিনয় করতে পারলাম না। আমার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

সীতা আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে উল্লাস, মুখে সহস্র জ্যোতিষ্কের ছটা। হঠাৎ তার দুচোখে ছায়া নামলো। সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি নীরব কেন? কথা বলো। আমাকে আশীর্বাদ করো।'

আমি যন্ত্রচালিতের মতো হাত তুললাম। মাথা হেঁট করে আশীর্বাদ নিয়ে সীতা বলল, 'দুঃখ হয় তোমার সংসার আছে, স্ত্রী আছে। আমাদের জন্য তাদেরও মূল্য দিতে হবে। তবে তা না হলে হয়তো জীবনের উঁচুতে উঠে অক্ষয় মিলন সম্ভব হত না। কারণ তোমার দিক থেকে বাধা না থাকলে আমি হয়তো নীচে নেমে যেতাম। তুমি দুর্লভ। তুমি কাম্য। যে করেই হোক দেহ দিয়ে তোমার দেহের অনুগামী হতাম। কিন্তু সে অদৃষ্ট আমার নয়। আমার অদৃষ্ট আজ আকাশের তারায় তারায়, গভীরস্বরে গভীর কথা বলছে। আজ আমি তোমার আত্মার। আজ আমি অনন্তের।'

নিবিড় আবেগে স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে আমি সীতাকে আকর্ষণ করতে গেলাম। সীতা আমার দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠলো। পরমুহূর্তে সরে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। মনের জোর কেড়ে নিও না। আমি সীতা। অপাপবিদ্ধা। আমাকে পবিত্র থাকতে দাও।' একটু থেমে সীতা বলল, 'আমি যাই। তুমিও তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে রাজবেশে সাজতে হবে। ডাক এল বলে।'

সীতা চলে গেল। আমি বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থায় বসে রইলাম। এ কী ঘটনা! আমার জীবনে এ কোন অবিশ্বাস্য অধ্যায়!

ডক্টর কোরেশ হঠাৎ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'দশাননের শেষযাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরে পড়ব। ব্যবস্থা করেছি।'

আমি বললাম, 'তা কী করে হবে? আমাকে দশাননের রাজবেশে সাজতে হবে। নিতে এল বলে।'

ডক্টর কোরেশ বললেন, 'দশাননের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন সে ভালয় ভালয় বাকসদের কাঁধে উঠলে বাঁচি।'

আমি বললাম, 'বুঝলাম না।'

ডক্টর কোরেশ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। পরে চাপা গলায় বললেন, 'ঈশ্বরকে ডাকুন। প্রার্থনা করুন আজ রাতের দশানন ধরা না পড়ে।' তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'নকল দশাননের কেরামতির উপর আপনার নিষ্কৃতি নির্ভর করছে।'

ডক্টর কোরেশ ছায়ামূর্তির মতো আমার ঘরের আশেপাশে ফিরছেন। আমি আমার ভবিষ্যৎ হাতের মুঠোয় নিয়ে নিশ্চল বসে আছি। এভাবে কতটা সময় গেল হিসেব ছিল না। হঠাৎ বাংলোর বাঁ-ধারে অরণ্য থেকে দশাননের শেষ-যাত্রার মিছিল বার হয়ে এল। আলোর চুমকিতে সাজানো একটা বিরাট অজগর যেন, সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকল। রাতের আকাশ আলো কোলাহলে সাড়া দিয়ে উঠলো। গত রাতে স্বপ্নঘোরে শোনা সেই বিলাপ, অভিসম্পাত, হাহা-কার। কখনো রুদ্ধ গর্জনে আকাশ ফাটিয়ে থেকে থেকে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। দশাননের শেষযাত্রা। রক্ষ-কুলের অন্তিম আস্ফালন ও আর্তনাদ।

ডক্টর কোরেশের সঙ্গে আমি বারান্দায় বার হয়ে এসেছিলাম। শেষ-যাত্রা আলোয় ঝলমল করছে। অনেকটা তফাতে হলেও প্রখর আলোয় মিছিলের প্রতিটি মানুষকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ডক্টর কোরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, 'দেখুন। দশানন রথে আরোহণ করেছে। ঐ দেখুন তার পিছনে সীতা চলেছে। মিছিল সমুদ্রের পারে পৌঁছলে সীতা সহমৃতা হবে।'

আমি আমার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতে কেঁপে উঠলাম। মিনার উপ-শিরায় অদৃশ্য ঝিঁঝির গান শুরু হল। সীতা চলেছে। সম্মোহিতা বর্ণনাতীত সীতা। সে আজ কোন্ মধুলগ্নে অনন্তের বাঁশিতে কী সুর শুনে নিজেকে দিতে চলেছে। পৃথিবীর পথ হাঁটিতে হাঁটিতে আজ সে শেষযাত্রার রথ ও চতুর্দোলার ঊর্ধ্বে কী অবলীলা-ক্রমে উঠে গিয়েছে। হয়তো ধরা পড়বে, শেষযাত্রা গোলমালে ভেঙে যাবে, কিন্তু সীতাকে তার অভীষ্টের অভিসারে কে ঠেকাবে? দূরে থেকে তার অজ্ঞাতসারেই সে আমাকে আকর্ষণ করছে। আমার অতীত ও বর্তমানের উপর একটা যবনিকা নেমে আসছে। আমি আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। চেঁচিয়ে নাম ধরে সীতাকে ডাকতে গেলাম। ডক্টর কোরেশ আমার মুখ চেপে ধরলেন। তারপর একটা হেঁচকা টান দিয়ে বললেন, 'আসুন। এখন সবাই শেষযাত্রার ওদিকে ভিড় করেছে। সকলের চোখ এখন দশানন ও সীতার উপর। সরে পড়ার এই প্রশস্ত সময়।'

ডক্টর কোরেশ আমাকে বাংলোর পিছনে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে তুলে দিলেন। বললেন, 'গাড়ি সোজা গলফেস হোটেলে যাবে। ঘর রিজার্ভ করা আছে। কাউকে কোনো কথা বলবার প্রয়োজন নেই। হবেও না। মন থেকে সব ভাবনা দূরে সরিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করুন। যথাসময়ে দেখা হবে।' গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর কোরেশ ঊর্ধ্বশ্বাসে শেষযাত্রার মিছিলের দিকে ছুটে চললেন।

সারারাত আমি হোটেলের আরাম শয্যায় ছটফট করলাম। সীতা যেন অদৃশ্য আমার সঙ্গে এসেছিল। সে আমাকে অশরীরীর মতো ঘিরে রইল। শেষযাত্রার কির যাবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমি বারবার শয্যায় উঠে বসলাম।

সকাল না হতেই ডক্টর কোরেশ কপাট ঠেলে আমার ঘরে এলেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে কষ্টহাসি হেসে বললেন, 'শেষযাত্রায় জনার্দন-ভেজকে লুকিয়ে আমার একটা বড় ঢুকিয়েছিলাম। ব্যবস্থাও সব ঠিক ছিল। কিন্তু সীতাই বাধা হয়ে দাঁড়ালো।' দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে ডক্টর কোরেশ বললেন, 'জনার্দনকে আমার দল দশাননের রাজ-বেশে সাজিয়ে হাতির দাঁতের পালঙ্কে তুলে দিয়েছিল। সেও মড়ার ভান করে শুয়ে ছিল। কিন্তু আর যার চোখে ধুলো দিক, সীতাকে ঠকাতে পারল না। সীতা দশাননের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালো। কী সন্দেহ করল কে জানে। সে দশাননের মুখ থেকে সোনালী চাদর সরিয়ে এক মুহূর্ত দেখেই চীৎকার করে উঠল। বাধা দিতে না দিতেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৎস্যজীবনেরা ভিতরই তার দেহ উদ্ধার করা হল। কিন্তু সে দেহে তখন সে নেই।' ডক্টর কোরেশের চোখ জলে ভরে উঠলো।

সেদিন কলম্বোর ন্যাশনাল থিয়েটারে অনুষ্ঠান ছিল। আমার পক্ষে সেখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না। অনুষ্ঠানসূচী থেকে সীতাহরণ পালা কেটে বাদ দিলাম।

এভাবে তার এক সুন্দর চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল। দরজা বন্ধ। জানালা খোলা। শীতকাল। অথচ ঠাণ্ডা পড়েনি তেমন। সে শুয়ে শুয়ে কি লিখবে ভেবে পেল না। তাঁকে কি লেখা যায়, কিভাবে তাঁকে সম্বোধন করা যায় সে ভেবে পেল না। একটা চিঠি লিখতে এত ভাবতে হয় সে জানত না। সে এত বেশি চিঠি লিখেছে, এত সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখতে পারে—আজ কি যে হয়েছে, সামান্য সম্বোধনেই গণ্ডগোল। তাঁকে কি লেখা যায়, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মান্যবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, সে ভেবে পেল না এবং এমন কেন যে হচ্ছে। একটা চিঠি লিখতে গিয়ে সে একটা লাইন ভেবে পাচ্ছে না।

সে তো কত কথা ভেবেছিল, কত কিছু ভেবেছিল। প্রতিদিন যখন সকাল হত, যখন ওদের রাস্তায় একটা পাউডার গাড়ি টংলিং টংলিং শব্দ করে চলে যেত, সে জানলা খুলে ভাবত, তাঁকে চিঠি লিখবে। এবং এভাবে সে সারাদিন ভাবত, সময় পেলেই ভাবত। ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলেই সে তাঁকে সুন্দর চিঠি লিখবে। সে যেন সেই ছোট্ট মেয়ের মতো অধীর হয়ে থাকত, বাবা তাকে কখন পুজো দেখাতে নিয়ে যাবে. একটা চিঠি লেখা, পুজো দেখার সামিল হয়ে গেছে। চিঠিটা লিখে ফেলতে পারলেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ। সে তাঁর কাছে আর কিছু চায় না। শুধু চিঠি পৌঁছে গেলেই সে আবার সুন্দর লতা-পাতা আঁকা শাড়ি পরে চুপচাপ জানালায় জবাবের আশায় অপেক্ষা করবে। তার দিন এভাবে এক প্রতীক্ষার দিন হয়ে যাবে। সে ভাল করে স্নান করবে বাথরুমে, সে যেমন সকালে ড্রেসিংগাউন পরে কাটিয়ে দেয়, চিঠিটা লিখে ফেলতে পারলেই আর নীল রঙের গাউন পরে থাকবে না। জানালার শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বলবে, হেই ডাক-পিয়ন আমার চিঠি, এখানে, বাক্সে দেবে না। আমার হাতে দেবে।

অথচ সে সুন্দর করে আজ আলতা পরেছে। মুখে ক্রীম। ওর স্বভাব গরম জলে মুখ ধুয়ে, মুখে শোবার আগে ক্রীম লাগানো। এবং পরিচ্ছন্নতা চারপাশে তখন কি যে মহিমময়ী করে রাখে! সে এভাবে পরিচ্ছন্ন না থাকলে ঠিক সুন্দর চিঠি লিখতে পারবে না। সে বেশ সোনালি নাইটি পরে শুয়ে আছে। সামনে প্যাড। ঝুঁকে আছে প্যাডের ওপর। বারান্দার আলোটা কেউ নিভিয়ে দিয়ে গেল, সে এখনও জেগে আছে দেখলে মাসিমা রাগ করবে, দরজায় বাঁধা, বড় কালো রঙের অ্যালসেসিয়ান। বাঘা কেন যে গোংগাচ্ছে।

সে উঠে পড়ল। দরজা খুলে বলল, এই কি হচ্ছে। আমি চিঠি লিখছি। ডিস্টার্ব করবে না। আসলে সব কিছুই খারাপ লাগছে, কোন শব্দ শুনলেই সে বিরক্ত হচ্ছে। সে খাটো নাইটি পরে থাকে, তার সুন্দর স্তন, ব্রেসিয়ার নেই বলে আশ্চর্য স্নিগ্ধ। আয়নার সে দাঁড়ালে বুঝতে পারে তার শরীরে কি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা। কেউ বুঝবে না, চিঠিটা লিখতে পারছে না বলে তার কি কষ্ট!

সকালে লাবণ্য দেখল, বেশ বেলা হয়েছে, অথচ দীপু ঘুম থেকে ওঠেনি। দীপুর খুব সকাল সকাল ওঠার স্বভাব। দীপু পড়াশোনায় ভাল। পার্ট টু পড়ছে। ইকনমিকসে অনার্স। এবং বড় কলেজে দীপু পড়ে। দীপু শুয়ে থাকার সময় একটা পাতলা সিল্কের চাদর গায়ে রাখে। ওর চুল ঘন ঘন বলে, আর বোধহয় রাতে চুল না বেঁধেই শুয়েছে, সমস্ত চুলটা মুখে শরীরে লেপ্টে আছে। আর লাবণ্য দেখল ওর শিয়রের কাছে নীল রঙের প্যাড। কলম। তারিখ লিখেছে, ঠিকানা লিখেছে। আর কিছু লেখেনি। কাউকে চিঠি লেখার বোধহয় কথা আছে দীপুর। লাবণ্য মনে মনে না হেসে পারল না। এ বয়সে মেয়েরা ভীষণ চিঠি লিখতে ভালবাসে। সে তো দিব্যেন্দুকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম এভাবেই চিঠি দিত।

তারপর দিনও লাবণ্য দেখল, মেয়েটা শুয়ে আছে শীতের সময়, অথচ গায়ে পাতলা চাদর, এই বয়সে শরীরে বেশ উষ্ণতা থাকে, অথবা চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা কখনও ঘুম আসে না, একটা চিঠি লিখবে দীপু অথচ প্রায় সকালে লাবণ্য দেখছে, দীপুর চোখ ফোলা, রাতে ঘুম হয়নি, চিঠি লিখতে পারছে না বলে দীপু কেমন নিজের ভিতরেই কষ্ট পাচ্ছে।

এবং আর এক সকালে লাবণ্য দেখল, দীপু জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। প্যাড অথবা কলম শিয়রের কাছে পড়ে নেই। জানালায় কারো আসার কথা, দীপু জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। লাবণ্যর মনে আছে, মেয়েরা ভালবাসায় পড়ে গেলে এভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

লাবণ্য যতদূর জানে, মেয়েটার ভালবাসার কেউ নেই। আর কি বা বয়স, আঠারো পার হয়নি, পার্ট-টু পড়ছে। ও যখন কলেজে যায়, চারপাশের সবাই বুঝতে পারে এখন দীপু কলেজে যাচ্ছে যেন দেখলেও বোঝা, যায় দীপু লম্বা মেয়ে দীপু, যার ঘন চুল, নরম চোখ, এবং তাজা শরীর, যে কম বয়সে বেশি লম্বা হয়ে গেছে, যে লতাপাতাআঁকা শাড়ি পরতে ভালবাসে আর যার শরীরে রয়েছে আশ্চর্য এক সৌরভ, যে গেলেই বোঝা যায়, কেউ যাচ্ছে, তেমন মেয়ে আজ জানালার দাঁড়িয়ে থাকলে লাবণ্য ভাবনায় পড়ে গেল।

লাবণ্য ডাকল, দীপু।

দীপু সাড়া না দিলে আবার ডাকল লাবণ্য, দীপু।

—মাসি আমাকে কিছু বলছ।

—কি দেখছিস রে।

দীপু কেমন লজ্জায় পড়ে গেল। বলল, কিছু না মাসি। তারপর নিজেও ভেবে পেল না, সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন। কাল সে চিঠি দিয়েছে। চিঠিটা যাবে, চিঠিটা যেতে দু-তিন দিন সময় নেবে। তারপর চিঠিটা তিনি পড়বেন। পড়ে ভাল লাগতে পারে, নাও পারে। বিরক্ত হতে পারেন। তিনি কি বয়সের, দেখতে কেমন, সে তো তার কিছু জানে না। কোথায় একটা সিনেমা কাগজে একবার ওঁর একটা ছবি ছাপা হয়েছিল, সে তার বন্ধু নীলুকে নিয়ে ছবিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। নীলু শেষ পর্যন্ত ছবিটা বের করতে না পারলেও একটা তার উপকার করে দিয়েছে। যে ঠিকানা পাবার জন্য সে দু মাসের ওপর মনে মনে চেষ্টা করে যাচ্ছে, নীলু এক মিনিটে তার সমাধান করে দিয়ে গেছিল। এবং নীলুই দীপুর হয়ে ফোন করেছিল, দেখুন এটা পত্রিকা অফিস।

—ইয়েস।

—অমুক লেখকের ঠিকানাটা দেবেন!

আমাদের তো দেবার নিয়ম নেই।

দেখুন ওঁকে বিরক্ত করব না। শুধু চিঠি লিখে ওঁর কাছে আমাদের একটা কথা জানব।

—আমাদের দেবেন, পাঠিয়ে দেব।

—আমাদের ব্যক্তিগত চিঠি আপনাকে দিলে চলবে কেন!

এবং বোধহয় সেই পত্রিকার রসিক মানুষটি বুঝে ফেলেছিলেন কিছু। শুধু ঝামেলা। কেন বাবা একজন শান্তিপ্রিয় লেখকের জীবনে অশান্তি টেনে আনবে। তবু এতে যেন কোথায় মজা আছে, এবং তিনি নিজেও যেহেতু সমকালের বড় কবি, না হেসে পারলেন না। বললেন, ঠিকানাটা খুব দরকার?

—খুব দরকার।

—লিখে নাও।

নীলু বলে যাচ্ছিল, আর দীপু লিখে যাচ্ছে। লিখতে গিয়ে কি যে বোকা মতো হাত কাঁপছিল। আর নীলুর

কি সাহস। সে হলে কেউ আর বলতে পারত না, প্রায় জলের মতো যেন ঠিকানাটা আদায় করে নিল।

কোলের পাশে দাঁড়িয়ে দীপু সব কথা শুনছিল। সে বলেছিল যে, এই তো হল, কিন্তু ওঁর কাছে যেতে গেলে একটা তো অজুহাত লাগবে।

নীলু বলল, আসলে তুই কি চাস!

—কি যে চাই আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, ওঁর গলার স্বর শুনতে আমার ভাল লাগবে।

—আর কিছু না।

—মনে হয় আমার সমস্ত অস্তিত্বে তিনি জড়িয়ে গেছেন।

—কি বলছিস রে! একেবারে সব কাব্য।

দীপু বলল, হবে হয়ত। কিন্তু ওঁকে চিঠি লিখতে হলে একটা কারণ দেখানো দরকার।

নীলু বলেছিল, কিরোলজি চর্চা করছি তুই তো জানিস।

—জানি।

—লিখতে হবে, এটা যেন তুই লিখছিস আমার হয়ে।

—কি লিখব।

—লিখবি, আপনার সঙ্গে পত্রবন্ধু হতে চাই। আমি আপনার মুগ্ধ পাঠিকা।

—মুগ্ধ পাঠিকা তো, বই পড়। দেখা করার কি দরকার।

—না, লিখবি আমার বন্ধু কিরোলজি চর্চা করছে।

—কিরোলজি চর্চা করছে করুক। তিনি যদি এখন রেগে যান।

—আগে শোন না।

দীপু ওদের পার্লারে এমন সব কথাবার্তা বলেছিল। মাসি কলেজে, মেসো অফিসে। মাসি মেসো আর কেউ নেই। বুড়ো চাকরটা নিচে। কেবল বাবা, সে আর নীলু। এখন ওরা উল্লাসে ফেটে পড়লেও কেউ টের পাবে না, এমন একটা ছিমছাম বাড়ি, সিঁড়িতে লাল কার্পেট, সাদা মোমের মতো মেঝে এবং প্লাস্টিক কালারের দেয়াল, বিচিত্র রঙের ছবি আর উজ্জ্বল সোফা-সেট, নিচে গোলাপের চাষ, দুটো একটা গোলাপের পাপড়ি বাতাসে উড়ে আসছে, কেমন যেন এক ঐশ্বর্য এই বাড়ির সর্বত্র ঘোরাফেরা করে বেড়ায়।

—লিখবি, আমি এবারে বি-এ পার্ট-টু পড়ছি। ইকনমিক্সে অনার্স আছে। তবে অর্থনীতির নীরস বিষয় আমার সাহিত্যানুরাগকে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

দীপু বলেছিল, সাহিত্যানুরাগ কথাটা এ-যুগে অচল। ওটা লিখলে তিনি আমাকে সেকেলে বুড়ো ভাববেন।

—শোন না। বলে নীলু ওর শাড়ি ঠিকঠাক করে বলেছিল। লিখবি, আমাদের ক্লাশ ভাল করে এখনও শুরু হয়নি। সময় কাটানোর জন্য কিরোলজি চর্চা করছি। এর ফলে নানা চরিত্রের, নানা মানসিকতার মানুষের সঙ্গে আমাকে বন্ধুত্ব করতে হয়। অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা। আচ্ছা, বলে নীলু একটু সময়ের জন্য থেমেছিল, তারপর কি বলেছিল মনে নেই, কেবল মনে আছে নীলু বলেছিল, লেখা পড়ে মানুষটিকে তোর কেমন মনে হয়।

—মনে হয় ভীষণ সতেজ। আর আশ্চর্য সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা আমাদের শরীরে ঘুমিয়ে থাকে, টের পাই না, তিনি ছুঁয়ে দিলে জেগে ওঠে যেন।

—তিনি ছুঁয়ে দিলে মানে।

—ঐ, ওঁর লেখা। লেখাতেই মানুষটাকে আমি ঠিক চিনে ফেলেছি।

—আচ্ছা ধর সে যদি একটু বয়সী মানুষ হয়।

দীপু কেমন দুঃখ পেয়েছিল এমন কথায়। সে বলেছিল, বয়সী মানুষ হতেই পারে না। বয়সী মানুষেরা কখনও এভাবে লিখতে পারে না।

নীলু বলেছিল, তুমি মরেছ বাছা।

দীপু চুপচাপ দেয়ালের ছবি দেখছিল। মেসো ছবিটা এনেছিল মাদ্রাজ থেকে। আশ্চর্য সবুজ শস্যক্ষেত্র, একটি সুন্দর মেয়ে ছোট্ট ভেড়ার বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কি যেন দেখছে, অথবা ছবিতে মেয়েটার চোখ দেখলে মনে হয়—অনেক দূর থেকে অথবা সমুদ্রযাত্রা শেষ করে কারো ফিরে আসার কথা আছে। সে তার প্রিয় মানুষের জন্য সবুজ শস্যক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে। সে ধীরে ধীরে বলছিল, নীলু আমি ওঁর জন্য অপেক্ষায় আছি।

নীলু বলল, ঠিক আছে। শোন না, লিখবি তবে, আপনি সতেজ এক প্রাণের আর সূক্ষ্ম এক মনের অধিকারী, যারা এই বিশেষ সুষমাটুকু অনায়াসে ধরতে পারেন, জানতে পারে, বুঝতে পারে। আমার বন্ধু কিরোলজি চর্চা করছে। আমি ওর কাছে কিছু কিছু শিখছি। ওকে নিয়ে আপনার কাছে যাব। লেখক মানুষের হাতের রেখাগুলো কেমন দেখতে আমাদের ভারি ইচ্ছা।

দীপুর মনে হয়েছিল, এভাবে চিঠি লিখলে খারাপ দেখাবে না। সে এভাবেই চিঠি লিখবে ভেবেছিল, এবং রাতের পর রাত সে মেসো মাসি শুয়ে পড়লে, বাড়ির আলোগুলো নিভে গেলে, নিজের ঘরে সবুজ আলো জেলে বসে থাকত। বসে থাকত আর ভাবত। ভাবতে ভাবতে লেখা হত না, সে প্রথমে একটা লাইন লিখেই কেটে দিত। সুন্দর হয়নি লেখা। এমন একজনের কাছে চিঠি সুন্দর না হলে ঠিক হবে না। নীল রঙের প্যাডে, আর সাদা খামে চিঠিটা যাবে। সে চিঠির জন্য এভাবে যখন রাতে ঘুমোতে পারত না, মনে হত, কবিতার লাইন। সে মিশনারি স্কুলের ছাত্রী। সে অনেক কবিতা পড়েছে। নানারকম কবিতার লাইন মনের ভিতর ঘুরে বেড়ালে নিজের মতো একটা কবিতা হয়ে যেত। ওর ইচ্ছা হত তাই লেখে। চিঠি না লিখে কবিতা লেখে। কিন্তু কবিতা লিখলে তিনি কি করে জানবেন, দীপু ওকে দেখার জন্য পাগল।

শেষ পর্যন্ত কোনরকমে দু পাতার চিঠি। চিঠিটা লিখে সে বারবার পড়েছে। বারবার কেটেছে। আবার লিখেছে। মনে হয়েছে, এভাবে হয়ত দিলেও চলবে। কিন্তু সকালে চিঠি পোস্ট করে এসেই ভেবেছে, কি যে সে লিখেছে! মনে হলেই বুকটা কাঁপে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, চিঠিটা না পেলেই ভাল। তার হাতের লেখা ভাল হয়নি। সে ধরে ধরে লিখেও হাতের লেখাটা ভাল করতে পারেনি। কেবল হাত কেঁপে গেছে। কেঁপে গেলেই লেখা ঠিক থাকে না। লেখা কুৎসিত হয়ে যায়। তার রাগে দুঃখে তখন হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। সে এ-বয়সে অনেক পড়েছে, সে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখে দিয়েছে বন্ধুদের হয়ে। তার নিজের চিঠিটাই ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে তিন দিনের দিন চোখে জল এসে গেল। সে যদি আর একটু ভাল লিখতে পারত।

(২)

বেশ রাত হয়ে যায় তার ফিরতে। সে বাসে ফিরে আসে। এ দিকটায় নতুন শহর গড়ে উঠছে বলে, চারপাশে

নতুন সব বাড়ি, রাস্তা এখনও পাকা হয় নি, কোথাও কোথাও আলো পর্যন্ত আসে নি। বাস থেকে নেমে সামান্য রাস্তা হাঁটলেই বাড়ি। কিছু পুকুর, নারকেল গাছ, এবং এখনও গ্রাম্য সরলতা যেন চারপাশে রয়ে গেছে। শহর থেকে ফিরে তার এই রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে খুব ভাল লাগে। কেবল নির্জনতা। মানুষগুলো এখানে সকাল সকাল কাজ শেষ করে ফেলে। রাত নটায় ফিরলে দেখেছে, অনেক বাড়ির আলো পর্যন্ত নিভে গেছে, আর সামনে বোগেনভেলিয়ার সবুজ পাতা অথবা, কিছু সরল বৃক্ষ পার হয়ে গেলেই তার বাড়ি। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাতার জেগে থাকে। জেগে পড়াশোনা করে। সুমিতা বারান্দায় পায়চারি করে। কখন গেছে, ফিরতে ফিরতে কত রাত হয়ে যায়—এই সংসারের জন্য সারা দিনমান একজন কেবল খেটে চলেছে, এবং এমন মনে হলেই ওর ভীষণ মায়া হয় মানুষটার ওপর। নীনা বেশ ঘুমোচ্ছে। মশারির নিচে ওর সুন্দর মুখ হাত-পা এবং সুমিতা জানে, সে এলেই মশারির ভিতর শরীর ঢুকিয়ে মেয়েটার কোলা গালে চুমো খাবে। ঘুম ভেঙে গেলে যে নীনার কষ্ট হয় সে তা বুঝবে না। কেমন ছেলেমানুষের মতো তার এই স্বভাব।

সে এলেই, তাতার বলল, তোমাকে আবার একটা মেয়ে চিঠি দিয়েছে বাবা।

সুমিতা বলল, এরা কি করে যে ঠিকানা পায়।

সে বলল, সত্যি আশ্চর্য।

ওর যা কিছু চিঠি অফিসের ঠিকানায় আসে। শুধু আত্মীয়স্বজনের চিঠি বাড়ির ঠিকানায় আসে। পত্রপত্রিকা থেকে যেসব চিঠি আসে তাও অফিসের ঠিকানায়, কেবল কিছু লেখক বন্ধু এবং দু-একটা পাঠক অফিস বাদে প্রায় কেউ বাড়ির ঠিকানা জানে না। সেও ইচ্ছা করে দেয় না। অযথা এলে চিঠি, চিঠি এলে একটা জবাবও দিতে হয়। এবং ওর হাতে সময় এত কম যে চিঠির জবাব দু-তিন লাইনে সেরে দিতে পারলে বাঁচে।

তাতার এখনও পড়ছে। সে এখন থেকে রেকর্ড মার্কস পাবে বলে পড়ছে। তাতার এম নতে বয়সানুযায়ী লম্বা। সে আর দু এক বছর বাদে বাবাকে ডিঙিয়ে যাবে। এ নিয়ে সুমিতার ভীষণ ভাবনা। এতটুকু ছেলে এমন লম্বা হলে সে যে কি করে। ওর বয়স তবে যে অনেক বেড়ে যায়। সুমিতা আজকাল তাতারকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে ভীষণ সংকোচ বোধ করে। বারো বছরের ছেলে প্রায় ষোল সতেরো বছরের মতো দেখতে। সে বুঝতে পারে, আসলে তাতার তার বাবার মতো হয়েছে। তার চোখ, লম্বা শরীর, চুল মুখ, তাতার বড় হলে ওর মতো হুবহু দেখতে হবে। এবং সুমিতার ভাবতে ভাল লাগে, ও তাতারের বয়সে ঠিক দেখতে হুবহু এমন ছিল। তখন সুমিতার ভীষণ ভাল লাগে সেই ছেলেমানুষ বয়সে মানুষটা দেখতে কি না সুন্দর ছিল। আর এই বয়সেও সুমিতা দেখেছে, তাতারের মতো আশ্চর্য সরল চোখ মুখ, ছেলেমানুষীতে সে এখনও তাতারের চেয়ে কম যায় না, অভিমান হলে তো একেবারে তাতারের মতো চোখ ভারি হয়ে যায়। আসলে সে বুঝেছে মানুষটার মন ভীষণ নরম। এবং মনে হয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ মানুষ সে। ওর লেখা গল্প উপন্যাস সুমিতা দেখেছে, মানুষের কোন খারাপ স্বভাব থাকে না। সে মানুষকে বড় বেশি ভালবাসে।

তাতারের সামনেই খোলা চিঠি। তাতার চিঠিটা পড়েছে। এ-বাড়িতে এ-সব চিঠি খোলা নিয়ে কেউ কিছু কখনও বলে না। যেন সবার চিঠি সবাই পড়তে পারে। সুমিতাও হয়তো চিঠিটা পড়েছে। কাজেই তার কোন এখন আর উৎসাহ নেই। পর পর কটা চিঠি বাড়ির ঠিকানায় এল। সবই মেয়েদের চিঠি। চিঠিগুলোতে একই রকম ইচ্ছের কথা থাকে। কোন বই, এবং কেন ভাল লাগে, অথবা মানুষদের প্রতি ভালবাসা জনিত এই সব চিঠি। ওর এতে কিছু আসে যায় না। সে শীতের সময় বলে শাদা ফুলহাতা সোয়েটার পরে আছে, গরম ব্লু সার্জের প্যান্ট, কাজের মেয়েটা বাথরুমে গরম জল রেখে দিয়েছে। সে এখন হাত মুখ ধুয়ে সোজা নীনাকে আদর করতে মশারির নিচে চলে যাবে, তখন চিঠির কথা। আলোতে নিয়ে সে ভাবল, চিঠিটা পড়বে। কিন্তু কেমন আলস্য লাগল। সেই এক সম্বোধন। এদের সম্বোধনে পর্যন্ত আলাদা হতে পারে না।

খাবার টেবিলে সে, সুমিতা তাতার। এবং চিঠির ভাষা নিয়ে প্রথম কথা হচ্ছিল। এগুলো হয়। তাতার বলল, মেয়েটা ভাল লিখতে জানে না।

সুমিতা বলল, হাতের লেখা ভীষণ খারাপ।

সে চিঠিটা পড়ে বুঝল, মেয়েটাই নাবালিকা। সে হেসে ফেলল। কি লিখেছে দেখেছো?

—কি লিখেছে।

—কেয়েলজি চর্চা করছে ওর বন্ধু। তাকে নিয়ে আসবে। আমার হাত দেখবে।

—খুব ছেলেমানুষ। সুমিতা মাছ তুলে দেবার সময় বলল।

তাতার বলল, মেয়েরা আবার হাত দেখে নাকি।

সুমিতা বলল, আমাদের সময় ও-সব ছিল না।

—ছিল না বল না। তুমি তো ভাল ব্যাডমিন্টন খেলতে।

—তা ব্যাডমিন্টন খেলা আর হাত দেখা এক হল!

—ও একই ব্যাপার।

—সেজন্য পুরুষের হাত নিয়ে মেয়ে দেখবে।

—ক্ষতির কি! পুরুষেরা মেয়েদের হাত নিয়ে দেখতে পারে, মেয়েদের দেখলেই বুঝি ক্ষতি। বলে সে তাতারকে বলল, তোর ইতিহাসের খাতা দিয়েছে?

—না।

—কবে দেবে?

সুনীতিবাবু আসছেন না। এলে দেবেন।

ইতিহাস নিয়ে ওর খুব ভাবনা। তাতার সব বিষয়ে প্রথম হতে পারে, কেবল ইতিহাসে পারে না। এবার সে তাতারকে ইতিহাসের তিন-চারটে বই এনে দিয়েছে। ইতিহাসের মাস্টারমশাইর ছেলে ইতিহাসে প্রথম হয়। এটা হওয়া স্বাভাবিক। তাতার কোন বিষয়ে দ্বিতীয় হলে মন ভার করে রাখে। সে তিন-চারটে বই থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করছে। এবং ইতিহাসের খাতায় কেমন নম্বর উঠবে এবার, কদিন থেকেই তার জানার আগ্রহ।

আসলে সে মানুষ হিসাবে ভীষণ পারিবারিক। চিঠিটা পাশে পড়ে আছে। সবটা পড়েনি, কিছুটা পড়তে পড়তে তাতারের ইতিহাস পরীক্ষার কথা মনে হয়েছে, সে চিঠিটা পাশে রেখে তাতারের ইতিহাস খাতা কবে দেবে একথা জানতে গিয়ে চিঠির কথা ভুলে গেছে।

তাতারই যেন বলল, মেয়েটা তোমার পদধূলি চায়।

তাতার এখন টেবিলে নেই। তাতার পরেছে লম্বা পাজামা, আর লম্বা ডোরাকাটা সার্ট। একটা পশম-ওয়ালা গায়ে। নীনার শরীর লেপে ঢাকা। নীনার খাটের পাশে, যে কাজ করে মেয়েটা, সে থাকে, পাশের একটা খাটে তাতার। সুমিতা আর সে পাশের ঘরে থাকে। [illegible]

করিডোর পার হলে স্টোর রুম, সিঁড়ির ঘর, এবং পাশে বড় ব্যালকনি। নিচে কিছু মরসুমী ফুল, বেলফুল, রজনীগন্ধা লাগিয়েছে। নিজের বাড়ি, নিজের ফুলগাছ, আর সন্ধ্যায় স্কুল থেকে ফেরার পর গা ধুয়ে ব্যালকনিতে অল্প আলোতে চুপচাপ বসে থাকা সবটাই এই একজন মানুষের পরিশ্রমের বিনিময়ে। বড় সংসার। মা বাবা ভাই বোনের জন্য আলাদা বড় অঙ্কের টাকা পাঠাতে হয় মাসে মাসে। এসব করেও প্রাণপাত পরিশ্রমে ছবির মতো ছিমছাম বাড়িটা করে ফেলে মানুষটা বড় বেশি গাম্ভীর্যশীল হয়ে গেছে যেন। ছোটখাট দুঃখ থাকলেও সুমিতার, মানুষটার ওপর অভিমান করতে ইচ্ছা হয় না।

এই যেমন রবিবারে সবাই কেমন স্বামী স্ত্রীতে বেড়াতে যায়, সিনেমা থিয়েটার দেখে। সে বছরে একদিন পারে কিনা সন্দেহ। কেবল কাজ। রবিবারে তো সকাল থেকেই লেখা, আর বই পড়া, কখনও চুপচাপ পায়চারি, বোধ হয় কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়ে গেলে সে ভেবে পায় না, কি করে আর এগুবে। তখন বারান্দায় পাগলের মতো পায়চারি করতে থাকে। কি যে দুঃখ অপ্রকাশের, ওর চোখ না দেখলে বোঝা যায় না। সুমিতার নিজেরও ভীষণ খারাপ লাগে। কাছে গিয়ে বলবে, এই শুনছ!

—কি!

—আর ভাবতে হবে না।

—কেন!

—তোমার চোখ মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না!

—কেন বলত।

—ভিতরে তুমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছ। অত ভেবে কি হবে, অত লিখে কি হবে। আমার খুব বেশি একটা লাগে না।

রাতে সবার কাজ হয়ে গেলেও ওর কাজ থেকে যায়। সে বারান্দায় বসে থাকে চুপচাপ। ছোট্ট টিপয়ে সব সময় সুমিতা কিছু ফুল ফুলদানিতে রেখে দেয়। যখনকার যে ফুল। এখন চারপাশে পলাশ ফুটেছে। শিমুল ফুল ফুটেছে। সুমিতা ছোট্ট একটা পলাশের ফুল পাতাসহ ডাল গুঁজে রেখেছে। র‍্যাপারে শরীর জড়িয়ে রেখেছে সে। অন্যমনস্কভাবে বসে সিগারেট খাওয়ার স্বভাব। শীতের সামান্য বাতাস ফুলগুলো ফুরফুর করে উড়ছে। তাতেও মনে পড়েছে। সুমিতা ওর মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছে। শীতের জ্যোৎস্না এখন মাঠে। কোথাকার একটা মেয়ে, এ-ভাবে সব মেয়েরা চিঠি লিখলে ওর ভীষণ ভাল লাগে। যদিও সুমিতার সামনে সে চিঠির ব্যাপারে খুব একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখায়, কিন্তু এ-সব চিঠি না পেলে সে যেন লিখতে উৎসাহ পেত না। সে চিঠিটা এই অবকাশে ভাল করে পড়বে ভাবল।

সে ডাকল, সুমিতা।

সুমিতা বলল, কিছু বলবে।

—চিঠিটা দাওতো। কি লিখছে ভাল করে পড়ে দেখি।

সুমিতা চিঠিটা দিলে সে বলল, তুমি এ-ভাবে খুকখুক করে কাসছ, একবার ডাক্তার দেখালে পারতে।

—সেরে যাবে।

—গার্গল করেছিলে।

—করেছি। টনসিলের ব্যথাটা নেই। তুমি এখন শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

—তুমি শোও। যাচ্ছি।

সে চিঠিটার ভাঁজ এবার খুলল।

লিখেছে সে, শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক।

তার জানা আছে অনেক ভাবনার পর এই চিঠি সে যতই অবহেলা দেখানোর চেষ্টা করুক, আসলে এই সব চিঠি যারা লেখে, কতদিন কতভাবে ভেবে যে ওরা চিঠি লিখে থাকে। অনেক ভাবে ভেবে লিখে থাকে বলে শেষ পর্যন্ত কেমন সাদামাটা হয়ে যায়। এ-চিঠিতেও তার নিদর্শন। মেয়েটা একটা ভাল সম্বোধন পর্যন্ত খুঁজে পেল না। তারপর লিখেছে—আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার পাঠিকা। আমাদের কাছে আপনার লেখার স্থান যে কোথায় আর তার মূল্য যে কতখানি তা জানতে পারলে আপনার খুব ভাল লাগবে।

সে ভাবল, তাহলে মেয়েটা এটা বোঝে।

লিখেছে, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিই সম্পূর্ণ নতুন এক স্বাদের সাহিত্য উপহার দেওয়ার জন্য। আপনার লেখা আমি পড়ি। শুধু যে হাতের কাছে পেলেই পড়ি তা নয়, অনেক সময়ে চেষ্টা করে খুঁজে নিতে হয়। অর আজ পর্যন্ত এমন কোন লেখা পড়িনি যাতে আমার আশাভঙ্গ হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে আপনার লেখা আশ্চর্য। একে মাথা খাটিয়ে তৈরি করা যায় না। এ আসে একেবারে বুকের মাঝখান থেকে। এ লেখা যে লিখতে পারে সহজেই পারে। আর যে পারে না হাজার চেষ্টাতেও পারে না।

আপনি কোন বয়সের তা জানি না। তবে আমাদের সমবয়সী অনেকেই, আমিও তার মধ্যে পড়ি, আজকাল অস্তিত্ববাদ নিয়ে ভীষণ মাথা ঘামাই, যদিও এটা এখন পুরোনো কথা তবু ক্যামু, সার্ত্রে, ইয়োনেস্কো পড়ে মাথা গরম করি। আজকাল বাংলাসাহিত্যে এটা পুরোনো ব্যাপার। আপনার লেখাতেও তা আছে তবে ভিন্ন রূপমে। ভিন্ন স্বাদ। জীবনযন্ত্রণা অথবা যাকে বলতে পারি আইডেনটিটি ক্রাইসিস আপনার লেখায় আছে, তবু তার ভিতর পাওয়া যায় এক আশ্চর্য সজীবতার স্পর্শ।

এতটুকু পড়েই সে মেয়েটার মুখ ভাবার চেষ্টা করল। এসব চিঠিতে আজকালকার মেয়েদের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এ বয়সে মেয়েটির পক্ষে জীবন সম্পর্কে কতটা ধারণা জন্মানো সম্ভব সে ভেবে পেল না।

আরও লেখার পর সে লিখেছে, আপনি নিঃসন্দেহে আমাকে একজন ভদ্রমহিলা বলে বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার সঙ্গে যে আলাপ, তা পত্রালাপের বেড়া ডিঙিয়ে বেশি দূরে টেনে নিয়ে যাবার অনুরোধ আমি করব না। হঠাৎ আপনার বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা করবার বা আপনাকে কফি-হাউজে ধরে নিয়ে গিয়ে স্বরচিত কবিতা শোনাবার অপচেষ্টা যে আমি কখনও করব না সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আমি শুধু আপনার সেই ভেতরের মানুষটাকে জানতে চাই। যে মানুষ সময় পেলেই নদীর পাড়ে হেঁটে যায়, এবং চুপচাপ জলে পা ডুবিয়ে কোন মসৃণ পাথরে বসে থাকে।

সে বুঝতে পারল, মেয়েটি তার বড় উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্রকে খুব মনে রেখেছে।

আমাদের ডাকবিভাগের তৎপরতার যে-রকম নমুনা, তাতে এ চিঠি আপনার কাছে আদৌ পৌঁছাবে কিনা, জানি না। যদি চিঠি পান, সামান্য জবাব পেলেই খুশি। আমি রোজ এখন সকালে উঠে জানালায় বসে থাকব। কখন পিয়ন আসবে সেই আশায়। যদি আমার চিঠিটা তার কাছে থাকে। নিচে লিখেছে দীপান্বিতা বসু। সঙ্গে বালীগঞ্জ এলাকার একটা ঠিকানা।

সে চিঠিটা পড়ে কেমন চুপচাপ বসে থাকল। চিঠিতে মেয়েটির মোটামুটি সব খবর আছে। সে নামী কলেজের ছাত্রী। সুতরাং পড়াশোনায় ভালো। সে যে রাস্তার নাম দিয়েছে, সেখানে সব বড়লোকেরা থাকে। সে রাস্তায় সে অনেকদিন একাকী হেঁটে গেছে। কারণ সেখানে ওর বন্ধু কমলেশ থাকে। কমলেশের বাড়ি যেতে আসতে সে কতদিন সুন্দর সব ছবির মতো বাড়ির ব্যালকনিতে নানারঙের রঙীন শাড়ি পরা তরুণীদের দেখেছে। ওর কেন জানি মনে হল, মেয়েটাকে দেখলে সে ঠিক চিনে ফেলবে। কারণ কোনো মেয়ে উদাসীন চোখে তাকালে তাকে সে ভুলতে পারে না।

সে যখন সুমিতার পাশে শুতে গেল, তখন সুমিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। শীতের জ্যোৎস্না সুমিতার পায়ের কাছে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সুমিতা শোবার আগে খুব সাজগোছ করতে ভালবাসে। সে লেপ টেনে সুমিতার বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে ফেলল। ফিসফিস গলায় ডাকল, এই সুমি, আমার ঘুম আসছে না। তুমি জেগে না গেলে আমার আর ঘুম আসবে না।

(৩)

লাবণ্য বলল, হ্যাঁরে দীপু, তোকে এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন! যেন লাবণ্য হঠাৎ দীপুর মুখে কি রকম সহসা এক অধীর বিষণ্ণতা আবিষ্কার করে এমন বলে ফেলল।

দীপু খাটে চোখ বুজে পড়েছিল, অসময়ে চোখ বুজে পড়ে থাকা ঠিক না। লাবণ্য ঘরে এসে দীপুর মুখ দেখে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে মেয়েটা কেমন ভীষণ অন্যমনস্ক।

বিকেল হলে দীপুকে ধরে রাখা খুব কঠিন। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। অথবা কোথায় কার কি সব রেকর্ড এসেছে নতুন নতুন সে তার বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে শুনতে ভালবাসে। কখনও কখনও সে তার বন্ধু-নিয়ে এসে নিজের কালেকসনের সব দামী দামী রেকর্ড শুনিয়ে দেয়। অদ্ভুত প্রাণ চঞ্চল মেয়ে দীপু। চোখদুটো ওর যেহেতু বড় এবং মায়াবী, চোখ দুটোতে দুঃখ দেখা দিলেই মুখ দীপুর ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

দীপুর মুখ ফ্যাকাশে দেখে লাবণ্য ঘাবড়ে গেল। কারণ এই তো একটা মাত্র মেয়ে। মেয়েটা অসময়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। কোথাও বের হচ্ছে না ক'দিন থেকে। সময় পেলেই জানলায় বসে থাকে। মাঝে মাঝে দীপুর পায়ের শব্দে টের পায় সে নিচে নেমে ডাকবাকস খুলেছে। আবার বন্ধ করছে। আবার জানালায় দাঁড়াচ্ছে। এটা ভাল না। খেতে বসে ঠিক খাচ্ছে না, দীপুর খুব সময় নিয়ে চান করার অভ্যাস। এখন সে কোনরকমে স্নানটা সেরে নেয়। কেউ যেন আসার কথা আছে। বাথরুমে দেরি হলে সে চলে যেতে পারে। সে এলেই বুঝি আবার সে ভাল করে বাথরুমে গুনগুন করে গান গাইবে। সাবানের ফেনায় ওর শরীরের লাবণ্য থেকে যাবে।

লাবণ্য দেখল, দীপু কিছু বলছে না। কেবল পাশ ফিরে শুল।

—তোর কি হয়েছে!

—কিছু হয়নি মাসি।

—সন্ধ্যের সময় শুয়ে থাকতে নেই দীপু। ওঠ।

—উঠছি।

দীপু শাড়ি ঠিকঠাক করে উঠে বসল। এবং মনে হল লাবণ্যর দীপু কতদিন থেকে যেন না ঘুমিয়ে আছে। লাবণ্যের ভাল লাগল না। সে বলল, রাতে তোর দীপু ঘুম হয় না?

দীপু হেসে ফেলল, ঘুম হবে না কেন?

এ বয়সে মেয়েদের অনেক কিছু হয়। ওরা অনেক কিছু এ-বয়সে আবার গোপন রাখতে ভালবাসে। অথবা নানাভাবে আশ্চর্য খবর ওরা পেয়ে যায়, তখন ওদের ভীষণ অহংকারী লাগে। লাবণ্য এটা অনুমান করতে পারে। সে বলল, শরীর খারাপ লাগছে?

—না তো!

—তবে এটা দিন দিন তোমার কি হচ্ছে। আমি তোমার বাবাকে আজই চিঠি লিখে দেব। তোমাকে নিয়ে যাবে।

—এখন আমি কোথাও যেতে পারব না মাসি।

—তার মানে! লাবণ্য বুঝতে পারল ঘরে শীতের বাতাস আসছে। সে জানালা বন্ধ করে দিল, আলো জেলে দিল। বেশ শীত-শীত করছে।

লাবণ্য দেখল, দীপুর ঘরটা ভীষণ অগোছালো। ওর সবই কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মানদা ওর ঘরে দেখা-শোনা করে। ঘরের এমন অবস্থা দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল লাবণ্য। সে চিৎকার করে ডাকল, মানদা।

দীপু বলল, ওর দোষ নেই মাসি।

লাবণ্য বলল, তার মানে!

—ওতো ঠিকই আসে। আমি যে দিই না।

—কেন দাও না!

—অনেক আমার কাজ থাকে। ঘর ঝাড়পোছ করলে আমাকে অনেকক্ষণ ঘরের বাইরে থাকতে হয়। এখন আমার এ-ঘর বাদে কিছু ভাল লাগে না মাসি।

লাবণ্য এতটা বুঝতে পারেনি। দীপুর ঘরটা সিঁড়ি ধরে উঠে শেষ মাথায়। ওর ঘরের পাশে পার্লার। তারপর একটা ঘর সেখানে নানারকম বই-এর আলমারী। সিঁড়ি ডানদিকে রেখে করিডোরে হেঁটে গেলে

ডানদিকের ঘরটায় থাকে সে নিজে পরের ঘরটা খালি। কিছু আসবাবপত্র আছে, তারপর কিচেন, ডাইনিং হল, এবং শেষদিকে বাথরুম। নিচে আগে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। ওঁরা চলে যাবার পর আর ভাড়া দেবার দরকার বোধ করেনি লাবণ্য। দিব্যেন্দু একটু বেশি নির্জনতাপ্রিয়। সেও চায় না নিচটা ভাড়া হোক। নিচের কোলাহলে সে মাঝে-সাঝে খুব বিরক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং এত বড় বাড়িতে সে যেহেতু সবদিক সামলায়, দীপু যেহেতু এ-বাড়িতে নিজের মেয়ের মতো, কোন কিছু অসুবিধা, সেই যে চিৎকার চেঁচামেচি লাগিয়ে দেয়, সেই মেয়ের ঘর এমন হয়ে আছে ভাবতে লাবণ্যর কান্না পাচ্ছিল।

দিব্যেন্দু এলে লাবণ্য বলল, তুমি দীপুকে ডাক্তার দেখাও।

—ডাক্তার!

—দিন দিন ও কি হয়ে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু খুব সকাল সকাল খেয়ে বের হয়ে যায়। ফিরতে রাত হয়। দীপুর সঙ্গে খাবার টেবিলে দেখা হবার কথা। কিন্তু কদিন থেকে দীপু আগে আগে খেয়ে নিচ্ছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। দরজা বন্ধ করে ওর নানারকম বই পড়ার স্বভাব। বাইরের এতটুকু আওয়াজ সে তখন সহ্য করতে পারে না। সেই মেয়েটার কি হয়েছে! সে ডাকল, দীপু।

দীপু দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে বলল, তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি মেসো।

দিব্যেন্দুর এটা নিজের ঘর। সে অফিসের জামা-প্যান্ট খুলে হালকা কিছু পরে নেবে ভাবছে। দেয়ালে ওর সুন্দর সুন্দর ছবি। আর শাদা আলো। দরজার পাশে বলে দীপুর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেবল আঁচল উড়ে আসছে, অথবা শীতের র‍্যাপার যাতে, সে বলল, এদিকে এস।

দীপু বলল, কিছু বলবে!

—এদিকে এস। দেখি। তোমার নামে ভীষণ রিপোর্ট।

কিন্তু যখন দীপু সত্যি এসে সামনে দাঁড়াল, দিব্যেন্দু আর সহজভাবে কথা বলতে পারল না। মেয়েটা যেন ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। দীপুর সুন্দর ভারি উজ্জ্বল চোখদুটো কেমন কষ্টের ভিতর পড়ে গেছে। দিব্যেন্দু সোফাতে শরীর এলিয়ে দিল। বলল, বোস। তারপর বলল, তোমার কিন্তু সত্যি কিছু হয়েছে। অসুখ না হলে মানুষের মুখ এমন হয় না।

দীপু হাসল। —আমি ভাল আছি মেসো। আমার সত্যি কোন অসুখ হয়নি।

তবু কে শোনে কার কথা। ডাক্তার হালদার এলেন রাতে। তিনি ওর বুকে মুখ পেট হাতড়াল [illegible] কোথাও কোন [illegible] নেই। বললেন, সবই ঠিক আছে দেখছি।

দীপু অপরাধীর মতো বসে রয়েছে। ওর নিজের ঘরে এখন মাসি মেসো, ডাক্তার এবং মানদা। বড়ো মানকচো, যে এবাড়ি কেউ না থাকলেও পাহারা দেয়, সেই মানুষ বারান্দায়। বাঘা পায়চারি করছে। দীপুর কিছু হলেই কুকুরটা বুঝতে পারে। দীপু নিচে নেমে গেলে পেছনে পেছনে কুকুরটাও নিচে নেমে যায়। দীপু দ্রুত নামলে বাঘা লাফিয়ে লাফিয়ে নামে। দীপু আস্তে নামলে বাঘা আরও ধীর পায়ে নেমে যায়। এবং দীপুর কিছু হয়েছে জেনে বাঘা মাঝে মাঝে ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে উঠছে।

ডাঃ হালদার চলে গেলে দীপু বলল, মাসি সত্যি বলছি আমার কোন অসুখ করেনি।

খেতে বসে কিন্তু দীপু বলতে পারল না, আমার অসুখ করেনি। ওর এতটুকু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আজও চিঠিটা এল না। শেষ ডাক বিকেলে আসে। তারপরই দীপু শুয়ে পড়েছিল। একটা চিঠির জন্য এভাবে কেউ কষ্টের ভিতর পড়ে যায় ভাবা যায় না। সে কেমন অভিমানে অথবা দুঃখে এবং কেন যে এমন একটা দুঃখে সে ভেঙে পড়ছে, সে কি সেই বড় উপন্যাস পড়তে পড়তে কোন মায়াবী চরিত্রের ভিতর লেখকের সুবর্মামণ্ডিত মুখ আবিষ্কার করে ফেলেছিল এবং সময় পার হলে এক দুরারোগ্য ভালবাসা সেই মায়াবী চরিত্রের জন্য। সে কেমন ছেলেমানুষের মতো বালিশে মুখ চেপে পড়েছিল। লাবণ্য অথবা দিব্যেন্দু কিছুই বুঝতে না পেরে, ওর বাবা এবং মাকে খবর পাঠাবে ভাবল। কারণ লাবণ্য এবং দিব্যেন্দু কেউ বুঝতে পারছে না অসুখটা কোথায়।

দিব্যেন্দু লাবণ্যকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, স্রেফ একটা প্রেম-টেমের ব্যাপার। ওর মুখ চোখ দেখে আমার সেই মনে হচ্ছে লাবণ্য। ওকে একা রাখা ঠিক না। পারতো কিছু জানতে চেষ্টা কর। কারণ আঠারো বছরের প্রেম ভীষণ মারাত্মক।

লাবণ্য বলল, ও আজকাল কেন যে জানালার পাশে চুপচাপ বসে থাকে।

—কেউ যায়?

—কি করে বলব!

—লক্ষ্য করবে তো।

—কখন করি!

কিন্তু পরদিন এই এগারোটার সময় সকলে অবাক, দিব্যেন্দু অফিসে, লাবণ্য কলেজ যায় নি, সারা সকাল দীপুর ঘর গুছিয়েছে, জানালা সব খুলে দিয়েছে আর ভাল ভাল ছবি ওর দেয়ালে এনে টাঙিয়ে রেখেছে, যেন দীপু মনে করতে না পারে, ওর প্রেমের জন্য ওদের অবহেলা আছে, যদি কিছু হয়ে থাকে, হয়ে যাবে, আটকাবে না, দুঃখ নিয়ে বাঁচা এ-বাড়িতে চলবে না। দিব্যেন্দুর এমন স্বভাব, সে গোমরা মুখ একেবারে পছন্দ করে না।

দীপু রেকর্ড-প্লেয়ারে ডিন মার্টিনের রেকর্ড বাজাচ্ছে এখন।

লাবণ্য অবাক হয়ে গেল। সে নিজের ঘরে বাজারের ফর্দ মেলাচ্ছিল, তখন গমগম করে গোটা বাড়িটা বেজে উঠল যেন। দীপু কি এখন নাচছে, ওর যেন মনে হল, এই পরিবারে যে সামান্য বিষণ্ণতা এসে জড় হয়েছিল, মুহূর্তে এই অসামান্য মিউজিক সব ধুয়ে-মুছে বৃষ্টিপাতের পর এক সবুজ শস্যক্ষেত্র বানিয়ে ফেলছে। ওর নিজেরও ভীষণ ভাল লাগে। ভিতরে তার কি যে হয়। ইচ্ছে করে কোন সবুজ মাঠে ছুটে যেতে এবং অকারণ মনে দুই দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকা। দিব্যেন্দুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে হয়। সব ফেলে এখন তার নিজেরও ইচ্ছে হয় পা মিলিয়ে দীপুর সঙ্গে নাচে।

এভাবে এসব হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। দীপুর ঘরের দরজা বন্ধ। দীপুকে এসময় দেখতে এখন কি না সুন্দর লাগছে। দীপু নিশ্চয়ই সেই খবর পেয়ে গেছে, অথবা জানালায় যার আসার কথা, দীপু বোধ হয় টের পেয়েছে সে এসে গেছে।

লাবণ্য পার্লারে ঢুকে গেল। তারপর বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। না কেউ নেই। দীপু তবে কি ভেবে এমন এক আশ্চর্য মিউজিকের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। ফর্দ হাতে নেবার আগে ওর একবার শুধু মনে হয়েছিল, দীপু ছুটে নিচে নেমে গেছে, কুকুরটা পেছনে পেছনে গেছে, তারপর দীপু লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙেছে, এবং নিজের ঘরে ঢুকে বোধহয় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছে।

এবার লাবণ্য দীপুর জানালায় উঁকি দিল। দেখল, একটা চিঠি। চিঠির ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। বালিশে সে হেলান দিয়ে আছে। পায়ের কাছে রেকর্ড-প্লেয়ার। ডিন ডিন করে ক্রমাগত বাজনা বেজে চলছে, আর দীপু আশ্চর্য সজীব, সতেজ, সুন্দর চোখ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে সত্যি চিঠির ভিতর ডুবে গেছে। চিঠিটা কে লিখেছে লাবণ্য জানে না। সে বলতেও পারছে না, কে সে! পৃথিবীতে তোমার এমন কে আছে দীপু যার সামান্য সুন্দর হস্তাক্ষর পড়তে পড়তে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছ। চিঠিটা আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে দীপু।

দীপুর চোখে পড়ে যেতে পারে ভেবে লাবণ্য আর দাঁড়াল না। ওর বাবা-মাকে আর এখন চিঠি লেখার দরকার নেই। দীপুর এ-বয়সে এটা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ দীপু স্বপ্নের ভিতর বেঁচে থাকতে ভালবাসে। এটা স্বপ্নের বয়েস। এ-বয়সে যদি একটু সুইট-ড্রিম নিয়ে না বাঁচে তবে কবে আর বাঁচবে।

আর এখন দীপু বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই চিঠি পড়তে পড়তে অবাক

হয়ে যাচ্ছে, কি সুন্দর তাঁর হস্তাক্ষর, কবিতার মতো শব্দচয়ন, একটা সামান্য চিঠি, লেখার গুণে তার কাছে কি যে অসামান্য হয়ে গেছে। এমন একটা খবর পৃথিবীতে এখন সে একমাত্র নীলুকেই দিতে পারে, নীলু, তিনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন। তখন রেকর্ডটা শেষ হয়ে আসছে। ওর প্রিয় গানটা শেষ হয়ে আসছে। সে এবার ইংগিলবার্ট হামপার ডিনকের রেকর্ড বসিয়ে দিল। সে ভলিউম কমিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় এল। ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে বলল, নীলু আছে?

—আছে, দিচ্ছি।

দীপু তাড়াতাড়ি ফোনটা জানালায় গলিয়ে দিল। তারপর নিজের বিছানায় শুয়ে সে চিঠিটা সব পড়ে শোনাবে। এমন একটা চিঠি সে যদি নীলুকে শোনাতে না পারে তবে পাগল হয়ে যাবে।

—দীপু বলছিস!

—হ্যারে আমি।

—কি ব্যাপার!

—চিঠি এসেছে।

—সত্যি!

—সত্যি। কি সুন্দর চিঠি রে?

—কি লিখেছে!

—শুনবি!

—শুনব না মানে! না শুনলে মরে যাব।

—ইস। তুই মরে গেলে ওঁর কিছু হবে না।

—কেন হবে না?

দীপু চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। এ-সময় সে প্রায় সকাল বেলাটা ড্রেসিং গাউন পরে থাকে। সে পায়ের ওপর পা রেখে এবং খালি পা, নরম আর সুন্দর পায়ের মসৃণতা নিয়ে চিঠি পড়ে যাচ্ছে।

সে পড়ল, লিখেছে, সুচরিতাসু।

—তারপর!

—তারপর আর কিছু লেখে নি।

—না।

—উনি আমাকে আর কিছু না লিখলেও ক্ষতি ছিল না।

নীলু বলল, কি বাজছে রে?

—একটা গান, প্লিজ রিলিজ মি, লেট মি গো।

—ইংগিলবার্ট হাম্পার ডিনকের।

—ঠিক ধরতে পেরেছিস তো!

—তারপর কি হল?

তারপর লিখেছেন, তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল। পত্রবন্ধু হতে আপত্তির কি আছে। তুমি যে ভদ্রমহিলা সে তো চিঠির প্রত্যেকটা কথার ভিতরেই রয়ে গেছে।

—আরও একটু জোরে পড। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক লাউড হয়ে যাচ্ছে।

—এ-চিঠি জোরে পড়তে ভাল লাগে না রে। বলে সে গানের ভলিউম আরও কমিয়ে বলল, ঠিক আছে?

ফটো ঃ রামকিঙ্কর সিংহ

—ঠিক আছে।

—তারপর লিখেছেন, ওটা স্পষ্ট করে না লিখলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আর আমি তো এমন মানুষ, যে সব মানুষকে ভালবাসতে চায়। সে তো বিশ্বাস করে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ নেই। তার বিশ্বাস এ-পৃথিবীতে কেউ ছোট নয়। প্রত্যেকে আপন অক্ষরেখায় ঘুরছে। কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে। এবং একদিন সব প্রত্যাবর্তনই থেমে যায়। তবে এত ভাবনা কেন! তোমার চিঠিটা পড়ে মনে হয়েছে বড় মানুষের কাছে একজন সাধারণ মানুষ লিখছে। এটা ঠিক না। আমাকে খুব সহজভাবেই নিতে পার। শুধু সময় কম। ফোন করে জেনে নিও, কখন সময় দিতে পারব। অনেক কাজ। এলে ভালই লাগবে।

নীলু চিৎকার করে উঠল, বিউটিফুল।

—তারপর কি লিখেছেন শোন। দীপু এই বলে উপুড় হয়ে শুল। লিখেছেন, আশা করি এর পরে মনে কোন সংকোচ থাকবে না। আমাকে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ভাবলে খুশি হব। নিজেকে আলাদা ভাবতে কষ্ট হয়।

দীপু আর পড়ল না। একেবারে চুপ মেরে গেল।

নীলু বলল, এই দীপু!

—বল।

—আর কিছু লেখে নি।

—লিখেছেন।

—পড়ছিস না কেন।

—আমার পড়তে ইচ্ছে হয়ে না রে?

—কেন, খারাপ কিছু লিখেছে!

—ভীষণ খারাপ।

—কি লিখেছে?

—লিখেছেন, তোমার নামটি ভারি সুন্দর, দীপান্বিতা। বলতে বলতে দীপুর গলা কেমন ভার হয়ে এল। বলল, নীলু আমাকে ওঁর কাছে কবে নিয়ে যাবি। আমি যে আর থাকতে পারছি

না রে! লিখেছেন, এতদিন তো জানতাম, পুরুষরাই মেয়েদের হাত দেখে। মেয়েরা হাত দেখে তাতো জানতাম না।

(৪)

সে বাড়ি ফিরেই দেখল, সুমিতা বারান্দায় বসে রয়েছে। সুমিতা গায়ে দিয়েছে একটা হলুদ রঙের কার্ডিগান। বোধ হয় কোথাও বের হয়েছিল। অথবা শীতের জন্যও হতে পারে। শীত যাবার আগে শেষবারের মতো বেশ শীত পড়ছে। সুমিতার শীতকালটাই ভাল লাগে। শীতকালটা চলে গেলে সুমিতা গরমে বেশ কষ্ট পায়। সুমিতাকে শীতকালে ভীষণ ভাল লাগে। এবং এসব শীতকাল এলেই সুমিতার ভারী ইচ্ছা হয় ওকে নিয়ে সামনের যে মাঠ, খালের পাড়ে পাড়ে মাঠ, এবং সামনে নষ্ট লেকের খালি জমি, জমিতে এখনও ভাল করে ঘাস গজায় নি, অর্থাৎ শাদা জ্যোৎস্নায় এইসব ঘাসবিহীন মাঠে ঘুরে বেড়ালে কখনও সুমিতার মনে হয় জ্যোৎস্না রাতে মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আবার মনে হয় কখনও সে সমুদ্রের বেলাভূমিতে হেঁটে যাচ্ছে এবং এমন সব শীতের রাতে সুমিতা এখনও ওকে নিয়ে হাঁটতে ভালবাসে। সুমিতা চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সে যখন শীতের মাঠে, ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে গায় তখন এত ভাল লাগে, মনে হয় সে, নীল জলের নিচে সুন্দর একটা রুপালি মাছকে দেখছে।

সুমিতা বলল তুমি এত দেরি করে ফের যে চিন্তা হয়।

সে ঘড়ি দেখল। নটা বেজে গেছে। বাস-ট্রামের জন্য এটা ঠিক হয় না। ওর নানারকমের কাজ থাকে। যেমন সে সাতটা পর্যন্ত কোন প্রকাশকের ঘরে বসে নিজের প্রুফ দেখে দেয়। যেমন কখনও গল্প করতে করতে রাত করে ফেলে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কোথাও-না-কোথাও এভাবে সে আটকে গেলে ফিরতে রাত হয়। সে এখন বলতে পারে না, সামান্য রাতে তুমি এমন ঘাবড়ে যাও কেন! এ-বয়সে যে-কোন মানুষের পক্ষেই বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। একটু রাত হলেই তুমি যে কেন এত চিন্তায় পড়ে যাও। আসলে সে বোঝে, যখন সে ক্রমে মহার্ঘ হয়ে যাচ্ছে, তখনই সুমিতার ভীষণ একটা বাজে চিন্তা। সময়মতো না ফিরলে বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকে। সে ফিরলে যেন সত্যি ফিরেছে মনে হয়। অথবা সুমিতার বুঝি মনে হয় মাঝে মাঝে, সেই কোন সুন্দর পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে মানুষটা যে গাছ-পালায় ছায়ায় হারিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। আর সুমিতা যেন সেই পাহাড়ের চারপাশে কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে অথবা ওর [illegible] যাচ্ছে—কোথায় যে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। এবং যখন সব মেয়েদের চিঠি আসে তখন ওর ভেতরে ভেতরে দুঃখটা বেড়ে যায়। সুমিতা ওকে বলতে পারে না, তুমি ওদের আসকারা দেবে না। সুমিতা তখন চুপচাপ বসে থাকে। ওর মুখে থাকে বালিকার মতো অভিমান। যেন ওর হাতের মোয়া সবাই কেড়ে নিতে চাইছে।

সে বলল, ঠান্ডায় বসে আছ?

—কোথায় ঠান্ডা! বোস।

সে বসলে সুমিতা বলল, দ্যাখো কি সুন্দর জ্যোৎস্না।

ওর মনে হল সত্যি সুন্দর জ্যোৎস্না। তাতার ঘরে পড়ছে। বাবা এসেছে সে বুঝতে পেরেছে। বাবা এলেই নম বাথরুমে গরম জল রাখে। বাবার জামা কাপড় রেখে দেয়। তাতার ঘরে বসে বুঝতে পারে, বাবা বারান্দায় বসে এখন মার সঙ্গে গল্প করছে। ওরা যখন নিরিবিলি গল্প করে তখন নীনা ঘুমায়। একটু পড়তে বসলেই নীনার ঘুম পায়। বাবা মা কেউ নীনাকে কিছু বলে না। তখন ভীষণ রাগ হয় তাতারের।

সামনে জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় বোধহয় হেঁটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সুমিতার। সুমিতার মাঝে মাঝে এটা হয়। শীত-গ্রীষ্ম মানে না। সে তখনও কখনও প্রায় ছেলেমানুষের মতো এই সব সামনের বালি জমিতে ছুটতে ভালবাসে। তখন মনেই হয় না সুমিতার ছেলে তাতার। তাতার আর দু-চার বছর বাদে ওর চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে যাবে এবং সে দেখেছে, চিঠি এলে এমন দুঃখ মাঝে মাঝে। সুমিতাকে দেখে মনে হল, আজও এমন হবে। যেন এখন তাতার শুয়ে পড়লেই, নিরিবিলি পাকা রাস্তা পার হয়ে খাল পার হবে, খালে একটা নৌকা আছে, এবং সুমিতা তখন কেমন ভয় পায় না, নৌকায় ওর হাত ধরে পার হয়ে যায়। সুমিতা ওপারে লাফিয়ে নামলে এক আশ্চর্য আকর্ষণ। সে হেঁটে যায়। সুমিতা পাশাপাশি হেঁটে যায়। সুমিতা চুপচাপ কখনও ওর বুকের কাছে মুখ রেখে বলে, জানো আমার ভয় করে!

—কিসের ভয়!

—কিসের ভয় জানি না।

—তুমি থাকলে আমার কোন ভয় থাকবে না।

সে তখন সুমিতার হাত ধরে হাঁটতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, কোন ভয় নেই। আমি তো আছি। আমি থাকলে তোমার ভয় থাকবে কেন!

সে অবশ্য জানে ভয়টা কোথায়। সে এও জানে, মানুষের থাকে দুরারোগ্য ব্যাধি। মানুষ চায় বার বার নিরাময় হতে। পারে না। কষ্ট হয়। সে তখন অন্য কথায় এসে যায়। —একটা গান গাও সুমি।

সুমিতা তখন চুপচাপ। জ্যোৎস্না রাত। যখন, গাছপালার ভিতর বাড়িগুলো আবছা [illegible] যখন সামনে জোনাকিবিহীন মাঠ, বালি জমি, কিছু কিছু ঘাস, শীতে যাদের শিশির পড়েছে তখন সুমিতা বালি জমিতে বসে কি যে গভীর ভালবাসার পুরোনো সব স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ওর গান শুনলে সে তার প্রথম যৌবনের কথা কত সহজে মনে করতে পারে। অথবা মনে করতে পারে এই মেয়ে কবে সেই এক আসামের বড় শহরে মানুষ। খেলায় তখন সুমিতার ভীষণ সুনাম, পর পর তিনবার সে জোনাল চ্যাম্পিয়ান। এবং রাত হলেই মনে হয়, এক ফ্রকপরা মেয়ে শাদা ভূমের আলোতে একটা শাদা কর্ক নিয়ে কেবল খেলছে। সুমিতার গলার স্বর গভীর। সুমিতা ভীষণ লম্বা, সুমিতা এ বয়সেও ভীষণ তাজা, আর সুমিতা ঠিক টের পায় কখন তার মানুষটা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মানুষটা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই সুমিতা তাকে বসতে দেয় না, সে তাকে নিরাময়ের জন্য জ্যোৎস্না রাতে, এই শাদা বালি জমির ওপর এসে বসে থাকে কারণ খোলা আকাশের নিচে এবং নিরিবিলি মাঠে সুমিতা মানুষটাকে নিয়ে বসলেই কবিতার মতো মনে হয় এই পৃথিবীকে।

মানুষটাকে ভীষণ তার ছেলেমানুষ মনে হয় তখন।

অথবা এভাবেই মাঝে মাঝে সুমিতা কিছু টের পেলেই তাকে নিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। কোন শীতের পাহাড়ে, অথবা কোন আশ্চর্য নগরীতে। যেখানে মনে হয় সুমিতা আর সে সেই প্রাচীন কাল থেকে কেবল হেঁটে যাচ্ছে। অথবা সৌর জগতের কোন জ্যোতির্বলয়ের ভিতর কখনও কোন প্রাণসঞ্চার হয়ে থাকে সেখানেও আছে তারা, অথবা মানুষের প্রথম জন্মের দিনে যে ভালবাসা, তারা অনুভব করতে পারে, এখনও সেই এক উত্তরাধিকারে বেঁচে আছে তারা। তখন আর মানুষটা তাকে ফেলে বেশি দূরে যেতে পারে না, কেমন মায়ায় জড়িয়ে যায়। প্রাচীন বিদর্ভ নগরীতে অথবা চন্দ্রবতীতে তারা হেঁটে বেড়িয়েছিল কবে থেকে যেন।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল সে এবং সুমিতা এখন জেগে। জ্যোৎস্না শীতের মাঠে একাকী রয়েছে জেগে। আর কিছু নক্ষত্র, ওরা সামনে নেমে গেল, কিছু জঙ্গল পার হলে সুন্দর মাঠ। বালির শাদা জমি। জমিতে ওরা দুজন পাশাপাশি চললে সুমিতা বলল, চিঠির জবাব পেলে?

সে বলল আজ ফোন করেছিল।

—কি বলল?

—বলল, আসবে।

—কবে।

—কবে আমি জানি না। আবার ফোন করে জেনে নিতে বলেছি। এখন আমার অনেক কাজ।

—ওর গলার স্বর কেমন?

—খুব সুন্দর।

—তুমি সকালেই পারতে এলে কি হত?

—ওরা আসতে চায়, আমি বারণ করি

করতে দেবে ভাবল। সে বলল, মহিমবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন। ওর সঙ্গে কথা বলব। এটা রেখে যান।

লোকটি চলে গেলে, বাকী আরও দুজন। সে ওদের একজনকে ডাকলে দেখল মানুষটা বয়সী। অনেক দূর থেকে এসেছে। ভদ্রলোক বসতে বসতে বলল, আমার দুটো ম্যানাস্ক্রিপ্ট ছিল।

—এখনও দেখা হয় নি। দেখা হলে চিঠি যাবে।

—আপনি নিজে কিন্তু পড়বেন।

সে বলল, আমি নিজেই পড়ি।

—সবটা পড়বেন। না পড়লে ঠিক বোঝা যাবে না।

সে বলল, পড়ব। ভাল লাগলে ছাপা হবে।

বয়সী মানুষটি ফের বলল, আমরা গাঁয়ে পড়ে আছি, গাঁয়ে থেকে কিছু হয় না।

ওর ইচ্ছা হল বলে, শহরে থাকলেও হয় না। সে কিছু না বলে, প্রুফ কার কাছে কি যাবে দেখতে লাগল। সে ডাকল, জয়ন্ত।

জয়ন্ত এলে বলল, কাইন্ড কপি দেখলাম। ভুল থাকছে। দরকার হলে আমাকে একবার দেখিয়ে নিতে পার।

জয়ন্ত বলল, তাই করব দাদা। এত চেষ্টা করেও দেখছি ভুল থেকে যায়।

বয়সী মানুষটি তখনও বসে রয়েছে। ওর হাতে অনেক কাজ, মনে মনে সামান্য বিরক্ত যে না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু মুখ খুব সহজ লঘু। যেন কিছু হয় নি, বসে আছে সে থাকুক, বরং যেন ওর ব্যবহারে মনে হয় এখন বয়সী মানুষটির জন্য চা-মিষ্টি পর্যন্ত চলে আসতে পারে।

সে বলল, আমি দেখব। খুব যত্ন নিয়ে পড়ব।

বয়সী মানুষটি এবার ওর লেখার প্রশংসা আরম্ভ করে দিল। এ-সব ক্ষেত্রে সে কেমন ভীষণ সংকোচ বোধ করতে থাকে। যেন সে সামান্য লেখে বলেই, এই বয়সী মানুষটির লেখা সে ঠিক বুঝতে পারবে। সে ছাড়া ওর লেখা বোঝার মতো ক্ষমতা খুব কম লোকের আছে। সে নিজের প্রশংসায় এলে হাঁ বা হু বলে এড়িয়ে যায়। এদের মুখ থেকে সে প্রশংসা শুনতে চায় না। বিরক্ত হলে সে যেন না বলে পারে না, একটু দেরি হবে দেখতে। দুশোর ওপর ম্যানুস্ক্রিপ্ট এসেছে।

বয়সী মানুষটাকে কিছু কঠিন কথা বলতে পারলে ভাল হত। কারণ বয়সী মানুষটি বাইশখানা উপন্যাস লিখে রেখেছেন। দুশোর ওপর গল্প। আঠারোর ওপরে নাটক। কিছু কিছু লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। কেবল বই আকারে প্রকাশ হচ্ছে না। এদিকটা এখন সে একমাত্র কিছু করতে পারে।

সে এবার না বলে পারল না, আমি সত্যি চেষ্টা করব।

—আজকাল কি যে লেখা হচ্ছে সব!

এই রে! সে খুব বিপদের মুখে পড়ে গেল যেন। সাহিত্য আলোচনা উঠলে কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে। সে সুবোধ বালকের মতো বলল, সত্যি পড়া যায় না। ট্র্যাস।

—আসলে কি জানেন, সব গ্রুপ। গ্রুপে ঢুকতে না পারলে কিছু করা যায় না।

সে বলল, তা ঠিক। সবই ঠিক। তবে সে বলতে পারছে না, এবারে দয়া করে উঠুন। আরও লোক আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর আবার কারা আসবে। হাতে দেখছেন, আপনার মতো মহামান্য লেখকদের অনেক পাণ্ডুলিপি। এগুলো শেষ করতে করতে আবার আসবে। সবই পড়তে হয়। আপনি একাই যদি এতটা সময় নেন, তবে আমার বাকি কাজ কখন হবে। কিন্তু সে কিছুতেই বলতে পারে না, সে এবার বলল, সত্যি গ্রুপবাজি হচ্ছে।

—গ্রুপে ঢুকতে না পারলে কিছু হচ্ছে না।

—চেষ্টা করুন না।

—তেল দিতে হয়।

—আপনি কি জীবনে তেল দেন নি!

—না।

—তবে আর এ বয়সে সত্যি তেল দিয়ে কি হবে!

—সত্যি বলেছেন।

—এত সব জেনেও কেন লিখলেন!

—কাল। কাল যদি স্বীকার করে নেয়।

সে চোখ বুজে ফেলল। কাল কথাটা সত্যি খুব বড়। কেমন দুঃখ হল তার। সে নানারকম পাণ্ডুলিপি পড়েছে। একটাও সে ছাপতে পারার মতো মনে করতে পারে নি। অথচ এরা সবাই এমন ভেবেই মরে যাবে। ওরা, তাদের উত্তরাধিকারদের জন্য মহামূল্য সব পাণ্ডুলিপি রেখে গেল। সে বলল, আপনাকে আর আসতে হবে না। চিঠিতে জানিয়ে দেব।

—কবে পাব আশা করি।

—সাত-আট দিনের মধ্যে পাবেন।

—আচ্ছা উঠি। মনে রাখবেন, আপনি এখানে আছেন, জেনেই এসেছি। অন্য কেউ থাকলে আসতাম না।

—তা ঠিক। সে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না।

তারপর আরও একজন। সে কাজের মানুষ, কাজ বুঝে নিয়েই চলে গেছে। তারপর সেই দুই মেয়ে। জয়ন্ত বলল, বলব আসতে।

—বলো।

ওরা এলে সে দেরাজ খুলল। ভাল করে দেখল না। দেরাজে ওর দুটো বিজ্ঞাপনের ম্যাটার আছে। ওগুলো পত্রিকা থেকে লোক এলে দিতে হবে। এবং এ-কাজটা জয়ন্তকে বুঝিয়ে না দিলে চলবে না। শিশির কিছু দিন থেকে আসছে না। ছুটিতে আছে। জয়ন্তর কাজের চাপ পড়েছে। এমন ভেবেই যেন দেরাজ খোলা। মেয়ে দুজন দেখতে কেমন, ওর দেখায় আগ্রহ নেই। সে ওদের হাত তুলে বসতে বলল। তারপর দেরাজে কি খুঁজল, টুকিটাকি কাজ, মিনিট দুই তিন, নিজের কাজ করে যেন সামান্য অবসর পেয়ে গেছে, তেমন চোখে মুখে তাকিয়ে বলল, আপনারা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।

ওরা দুজনের একজন একটু সপ্রতিভ। অন্যজন চুপচাপ, সামান্য মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। আপনিই চিঠি দিয়েছিলেন?

—না। নীলু বলল। দীপু আপনাকে চিঠি দিয়েছে।

—আপনার নাম দীপু।

দীপুর ভেতরে কি যে হচ্ছে, মানুষটাকে দেখেই মনে হয়েছে নবীন, আবার আশ্চর্য প্রবীণতা আছে কথাবার্তায়, অথবা চোখে যেন প্রাচীন ইরাবতীর ঐশ্বর্য। তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এবং দীপু ভাল করে দেখেও নি। একবার ঢোকবার মুখে এক পলক দেখেছে। কালো ট্রাউজার, সাদা হাওয়াই সার্ট আর চোখে ভারি চশমা আর কি আছে, চুল ঘন। সে দেখতে দেখতে তার প্রিয় সব চরিত্রের ভিতরে চলে গেলে কেমন এক মুহ্যমান অবস্থা। ওর কথা বলতে গলা কাঁপছিল। সে দুবার চেষ্টা করেছে নাম বলতে, কিন্তু গলার কাছে এসে নামটা আটকে গেছে। এমন শীতের বিকেলেও দীপু ঘামছে।

নীলুই ওর হয়ে বলল, ওরই নাম দীপু। দীপান্বিতা বসু।

—ঠিকানা কোথায় পেলেন!

নীলু একটা পত্রিকার নাম বলল।

—আপনাদের সাহস আছে তো।

এবারে দীপু কেমন খুব সতেজভাবে তাকাবার চেষ্টা করল। দীপু তাকে ভালভাবে দেখছে। দীপু বার বার তাকাবে ভাবল, কিন্তু চোখে পড়ে যাবে, চোখে চোখ পড়ে গেলে, মানুষটা বুঝে ফেলবে সব, সব ধরা পড়ে যাবে, যা চোখ, আর যা মানুষ, লম্বা এবং কেমন অসাধারণ সরল অনাড়ম্বর মুখ, যা দেখলে বোঝা যায় না, সে ভেবে পেল না এর বয়স কি, বয়স বিশ হতে পারে, আবার দেখলে মনে হবে চল্লিশ, আরও বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু এক শিশুর মতো মুখের অবয়বে আছে অসাধারণ সারল্য। দীপু কিছুতেই তাকাতে পারল না।

নীলু বলল, আপনার কোনো অসুবিধা করছি না তো!

—তাতো একটু অসুবিধা হচ্ছে।

—আমরা বেশি সময় নেব না।

—তাও বুঝতে পেরেছি।

নীলু বলে, আমি আপনার হাতের ছাপটা নেব।

—কেন বলুন তো?

—আপনি আপনি করছেন কেন!

—তুমি তুমি একদিনেই। ভাল দেখাবে।

নীলু বলল, খুব ভাল দেখাবে।

—আমার হাতের ছাপ দিয়ে কি করবে।

—আমরা দেখব। লেখকের হাত কেমন হয় দেখার ইচ্ছে।

—আমরা মানে!

—আমি আর দীপু!

—তোমাদের কে কিরোলজিস্ট।

—আমি। দীপু আমার কাছ থেকে শিখছে।

—কেন তুকতাক করবে না তো হাতের ছাপ দিয়ে?

—তুকতাক করলে তো আপনি লাভবান হবেন।

—কিন্তু তোমাদের চিঠি আমার বড় ছেলে প্রথম খুলেছে। তুকতাক করতে গিয়ে আবার ঠকে যাবে না তো। বাড়ি ঢুকতেই বড়ছেলে বলল, বাবা তোমার চিঠি। আবার একটা মেয়ে চিঠি দিয়েছে।

নীলু যে নীলু যার মুখে কোন কথা আটকায় না, বয়সী মানুষদের সে সহজেই সমবয়সী করে ফেলতে পারে সে পর্যন্ত জবাব দিতে পারল না। শীতের র‍্যাপারের ভিতর তখন দীপু মুখ লুকিয়ে রেখেছে। ওর চোখ দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। দীপু তাকে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। সে এবার দীপুর দিকে তাকাল। বলল, কি দীপু কথা বলছ না কেন।

দীপু অনেক দূর থেকে বলার মতো বলল, আমাকে কিছু বলছেন?

আসলে দীপু এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে এসে কেমন গোলমালের ভিতর পড়ে গেছে। দীপুকে দেখলেই মনে হবে, সে নিজের ভেতরে নেই। এমন কি নীলু আর ওর কথাবার্তার ভিতর দীপু যেন এতক্ষণ একটাও কথা শুনতে পারেনি। সারাক্ষণ সে যে কি ভেবেছে। সে যে কি হয়ে যাচ্ছে। ওর মনের ভিতর কি যে আছে, যা কিছু সবই হারিয়ে যাবার মতো। দীপুর কি ভিতরে কান্না পাচ্ছে। এই যে কথাবার্তা, বয়সী মানুষের মতো মনে হয় মাঝে মাঝে আবার যখন হাসেন, মনে হয় কি যে ছেলেমানুষ, সে যে কি বলবে ভেবে পায় না। সে শুধু সারাজীবন যেন এখন থেকে মানুষটাকে বলে যেতে পারে, আমাকে কিছু বলছেন?

—তোমাকেই বলছি।

—কি বলছেন?

—কথা বলছ না কেন?

—আমি! তারপর বলার ইচ্ছা যেন, আমি তো সারাক্ষণই কথা বলে যাচ্ছি। আপনি শুনতে পাননি। আমি চুপচাপ থাকলেও কত কথা যে বলে যাই। আমি তো জানি আমার কথা আপনি সবই বুঝতে পারেন। আমি আপনার সঙ্গেই সেই থেকে অজস্র কথা বলে যাচ্ছি। কাছে এসে কিছু বলতে পারছি না। সব হারিয়ে ফেলেছি।

—কি বলব, দীপু বলল।

—এই তুমি যা বলতে চাও।

—আমি কি যে বলতে চাই, জানি না।

তারপরই দীপু আবার নিজের ভিতরে ডুবে গেল। নীলু ততক্ষণে ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগজ, কালো রং, এবং ছোট্ট একটা রোলার, ঘসে ঘসে কালি মাখিয়ে, ওর হাতে কালি মাখিয়ে দিচ্ছে। আর দীপুর দেখে কেমন শরীর শির শির করে কাঁপছে। কি যে অনায়াসে নীলু কালি মাখিয়ে দিল হাতে। নীলু তারপর ধীরে ধীরে চেপে চেপে হাতের ছাপটা তুলে ফেলল। কি সুন্দর হাত, হাতের আঙুল, এবং নীলু তারপর হাজার চেষ্টা করেও কালিটা সাদা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলতে পারল না। হাতের রেখাগুলোর ভিতর কালি সামান্য লেগে রয়েছে। ভেসলিনে পর্যন্ত উঠছে না। নীলু বোধহয় সারাজীবন চেষ্টা করলেও ওর হাতের এই সামান্য দাগ মুছে ফেলতে পারবে না। নীলু খুব চেষ্টা করছে তুলতে। তিনি হেসে বললেন, হবে না। সাবান জল না হলে উঠবে না।

দীপু কিছু বলল না।

নীলু বলল, আপনার বড়ছেলে দীপুর চিঠি খুলে পড়েছে!

—পড়েছে কিনা জানি না। আমাদের বাড়িতে এমন কিছু নেই যা ছেলে অথবা আমার স্ত্রী খুলতে পারে না।

দীপুর সমস্ত মুখ কেমন রক্তাভ হয়ে যাচ্ছে। সে কি বলতে গিয়েও বলতে পারল না। গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর দীপু না বলে পারল না, জল খাব।

সে বলল, এদিকে এক গ্লাস জল দেবে।

দীপু জলটা কেমন ধীরে ধীরে খেল। গলায় আটকে যাবার মতো। এবার সে দীপুকে দেখল। দীপু জল খেয়ে আলতো-ভাবে মুখ মুছল রুমালে। জল খেয়ে মনে হল, দীপু কিছুটা স্বাভাবিক। দীপুর মুখ দেখলেই মনে হয় নাবালিকা। চোখ ভারি। সে পরেছে একটা সবুজ পাড়ের সাদা সিল্ক। সে বেণী দুলিয়ে আসতে পারত। কিন্তু আশ্চর্য সে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে এসেছে। ওর হাত মসৃণ, এবং শরীরে যে কি যে সুষমায় ভরা। দেখলেই মনে হয় দীপু রোদ লাগায় না শরীরে, এবং কোমল ত্বকে মনোরম সব ইচ্ছার কথা লেখা আছে। সে বুঝতে পারল, দীপুর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। দীপু উঁচু করে খোঁপা বেঁধে সহসা যুবতী হয়ে যেতে চাইছে।

সে বলল, তোমাদের চিনে আসতে অসুবিধা হয়নি তো।

নীলু বলল, না।

ওর ইচ্ছা দীপু দুটো একটা কথা বলুক। কিন্তু দীপু কথা বলছে না। যেন নীলুই এসেছে ওর কাছে, দীপু আসেনি। নীলুর একা আসতে সংকোচ বলে দীপু সঙ্গে এসেছে। চিঠিতে কিন্তু সে ভেবে-ছিল, দীপু ভীষণ স্মার্ট মেয়ে হবে। দীপু এসেই বলবে কি চিনতে পারলেন।

কিন্তু দীপুর মুখ চোখ ওর বসে থাকা, ওর স্বভাব দেখে মনে হচ্ছে দীপু কখনও এমন কথা বলতে পারবে না। অথবা এক দুঃখ থেকে যায়, বড় হতে হতে শরীরের দুঃখটা বাড়ে, দীপুর দুঃখ ভিতরে এভাবে খুব বেড়ে গেছে—সে কথা বলতে পর্যন্ত পারছে না। ওর কাছে এসে দীপু একেবারে কোমলমতি বালিকার মতো বসে রয়েছে।

তারপর নীলু বলল, আজ উঠি, খুব বিরক্ত করলাম।

সে বলল, না না।

নীলু বলল, আমরা সময় পেলেই আসব।

—এস।

ওরা উঠে চলে গেল। সে ওদের যাবার সময় তাকাল না পর্যন্ত। কেবল বলল, দীপু তোমরা খুব ছেলেমানুষ।

দীপু এবার পেছন ফিরে ওঁকে দেখার চেষ্টা করল। তিনি এখন আবার লেখায় ডুবেছেন নয়ে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ঘাড়ে ঘন চুল, বড় বড় চুল কেমন উড়ো উড়ো ভাবে দুরন্ত হয়ে উঠছে। ঘাড়ের কাছে কাঁধ, কি আশ্চর্য বলিষ্ঠতা নিয়ে জেগে রয়েছে। দীপুর মনে হলো, এই ঘন চুলে তার দু হাত ছড়িয়ে দিতে না পারলে সে মরে যাবে। দীপু গাড়িতে বসে শুধু বলল, ওর হাতের রেখা দেখলি?

—তা ত দেখিনি।

গাড়ি তখন বড় রাস্তায় ছুটছে। বাল-ট্রাম পার হয়ে যাচ্ছে। আর ওরা এই শীতের বিকেলে দুজন পাশাপাশি বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে হাতের রেখা দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল।

এবং দীপু তখন সেই একটিমাত্র রেখা খুঁজছে। সে দেখতে পাচ্ছে, তা আছে। ওর জোরে জোরে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন। আছে, আছে, সে বলতে পারত আছে। সে বলল, দেখেছিস!

নীলু বলল, কি!

—এই যে আছে।

—ওটা থাকা ভাল না।

—আমার পক্ষে ভাল। বলেই দীপু জানালায় মুখ রাখল। দীপু ড্রাইভারকে বলল, আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি না। মাঠে নামব।

নীলু বলল, তুই কথা বললি না।

—পারলাম না!

সে বলল, নীনা যাও। নীনা নেমে গেল। তাতার জোরে জোরে ভূগোল পড়ছে। নীন দাদার কাছে পড়তে বসলে, এ-ঘরে কি কথা হবে শুনতে পাবে না। সে-জন্যই সে নীনাকে দাদার সামনে গিয়ে পড়তে বসতে বলল। সুমিতা অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে, যা নীনা অথবা তাতারের শোনা ঠিক না।

সে বলল, কোমরের নীচটায় কম ভারি। মেয়েদের আরও ভারি হয়।

—তুমি যে কি না!

—আমি কি!

—সব দিকে লক্ষ্য তোমার।

—লক্ষ্য না থাকলে চলবে কি করে! তারপর সে সুমিতাকে দেখল। সুমিতা ওকে দেখল। আসলে মেয়েটি এখনও ঠিক বয়সে আসে নি। ওর সবই হবে। কোমরের নিচটাও ভারি হবে। বয়স বাড়লেই মেয়েদের সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

—কি বয়স।

—এই সতেরো আঠারো।

—তুমি কি বললে!

—বললাম, ভীষণ বাচ্চা মেয়ে।

—বাচ্চা না ছাই।

—হ্যাঁ ভীষণ বাচ্চা। বাচ্চা বলতে সে রেগে গেল। সে এভাবে সুমিতাকে রাগিয়ে দিতেও ভালবাসে। দীপুকে সে বাচ্চা মেয়ে বলে নি। তবে দেখে মনে হয়েছে, বেশ ছোট। এই সব মেয়েদের দেখলেই সে বুঝতে পারে, তার বয়স হয়ে গেছে। বয়সের ফারাকটা বুঝতে পারে। যত না ছোট তখন তার চেয়ে বেশি ছোট মনে হয়। মনে হয় মেয়েটি বাড়িতে ফ্রক পরত, ওর সঙ্গে দেখা করবে বলে শাড়ি পরে ছুটে এসেছে।

সুমিতা বলল, মেয়েরা এ-বয়সে সবই জানে।

—তা জানে।

—এ-বয়সে সে কারো চেয়ে কম যাবে না।

—তা যাবে না।

—তুমি বেশি আশকারা দেবে না।

—একেবারেই দিচ্ছি না।

—এলে বলবে, সময় নেই।

—সে কি আর আসবে!

—ঠিক আসবে। তুমি আর কি বললে।

—বললাম, তাতারই প্রথম খবর দিয়েছে চিঠিটার।

—তোমার ছেলের নাম তাতার ওরা জানে।

—ছেলে আছে জানে।

—বৌ।

—এ বয়সে বৌ কার না থাকে।

সুমিতা এবার কেমন সামান্য নিশ্চিন্ত। যেন ভেবে ফেলেছে, মেয়েরা বিবাহিত মানুষের কাছে বেশি ঘেঁষতে চায় না। যেন সেই এক বেড়া অর্থাৎ বুকিং ক্লোজড, এখানে ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। যা কিছু লাভ-অলাভ এখন তার।

অফিসে গিয়ে বসতে না বসতেই সে ফোন পেল।

—চিনতে পারছেন?

মেয়েলি গলা। মেয়েদের গলা ওর কাছে সব সময়ই এক রকমের মনে হয়। সে বলল, কে নীলু?

—নীলু হতে যাবে কেন? আমি দীপু।

—দীপু। কি খবর!

—আপনি আমার গলা বুঝতে পারলেন না।

—কি করে বুঝব। তুমি তো কথাই বল নি।

—তা ঠিক।

—তবে তুমি অথবা নীলু হবে বুঝতে পারছিলাম।

—কি করছেন।

—কাজ।

—কাজ তো সবাই করে। কি কাজ।

মেয়েটা তো, আচ্ছা মেয়ে! এসেছিল সে। ভাল করে কথাও বলতে পারে নি। আর এখন সেই মেয়ে কত সহজে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। যেন সে সমবয়সী মানুষের সঙ্গে কথা বলছে।

সে বলল, তুমি কি করছ?

—শুয়ে শুয়ে ফোন করছি।

—কেউ বলবে না, কাকে ফোন করছ।

—আমাদের বাড়িতে স্বাধীনতা একটু বেশি। আপনি কি করছেন।

—একটা ম্যানাস্ক্রিপট দেখছি।

—আপনার ভাল লাগে এ-সব।

—কেন লাগবে না।

—আপনি যে মানুষ তাতে তো এ-সব ভাল লাগার কথা নয়।

—ভাল না লাগলেও কিছু কাজ করতে হয়।

—আমাকে আপনার কেমন লাগে।

—ভেবে দেখি নি।

—ভেবে দেখুন না।

—আচ্ছা ভাবব।

—আমাকে দেখে আপনার কিছু মনে হয় নি।

—মনে হয়েছে বাচ্চা মেয়ে।

—আমি বাচ্চা হতে যাব কেন? বেশ বড় আমি।

—আমার কিন্তু মনে হয়েছে, আমার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে ছুটে এসেছ।

—মোটেই না।

—কিন্তু তোমাকে যে আমি বড় ভাবতে পারি না।

—না পারলে এটা আমার অসম্মান। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেবেন।

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কি বলবে ভেবে পেল না। দীপুকে চিঠির সঙ্গে মেলাতে পারে। কিন্তু সেদিন সে যেভাবে বসেছিল, তাতে কষ্ট বুঝতে পারছে না, এই সেই দীপু। সে বলল, আমি ভাবতে পারি নি, তুমি এমন সব কথা বলতে পার। আমাদের সময়ে মেয়েরা এভাবে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে পারত না।

—এখন পারে।

—তাতো তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

—আবার কবে দেখা হবে।

—কেন, গোপন কথা আছে? সে ঠাট্টা করল দীপুকে অথবা ভয় পাইয়ে দিতে চাইল।

—একটা সারপ্রাইজ আছে আপনার জন্য।

—সেটা কি।

—দেখা না হলে হবে না।

—ফোনে হয় না।

—ফোনে হলে লাভ নেই।

সে কেমন এক অদ্ভুত আকর্ষণের ভিতর পড়ে যাচ্ছে। সে ফোন ছেড়ে দিতে পারল না। ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে বলল, আচ্ছা দীপু আমার কাছে আসতে তোমার খুব ভাল লাগে।

—জানি না। আপনাকে না ভেবে আমি থাকতে পারি নি।

কি বলছে মেয়েটা! আর কি অকপটে। সে কেমন ঘাবড়ে গেল। সে বলল, দীপু প্লিজ, এভাবে কথা বলবে না। আমাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিও না। আমার অনেক বয়েস।

—কত?

—এই অনেক!

—তা কত বলবেন তো।

—সে তো কবে থেকে আমি আছি।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা ---- ৩·৫০. ৩। কাব্য আমপারা -- ৪·০০
৪। পুবের হাওয়া ---- ২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি --- ২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

—আমিও তো কবে থেকে আছি।

—সেই দীর্ঘদিন থেকে। প্রাণের বিকাশ থেকেই আমি আছি।

—সে তো আমিও আছি।

—তবু তুমি আগে কিম্বা পরে। আমার ঠিক সময় তুমি নও।

দীপু বলল, সে আমি বুঝি না। আপনার হাতে অদ্ভুত একটা চিহ্ন আছে।

—কি চিহ্ন।

—লা-মিস্টিক। সবার হাতে থাকে না। নীলু বলল।

—থাকলে কি হয়।

—থাকলে সে বড় হয়, প্রেমিক হয়, ভাল হয়। নির্ভাবনায় তার কাছে যাওয়া যায়।

—আর কিছু না।

—আর কিছু ভেবে দেখি নি।

তারপর আবার চুপ। ফোন ছেড়ে দিলে হয়। কিন্তু ও-পাশে দীপু কান পেতে আছে। সে যা বলবে শুনবে। সে এমন একটা ঘটনার ভিতর পড়ে যাবে ভাবতে পারে নি।

দীপু বলল, কি কথা বলছেন না কেন!

—আমার হাতে অনেক কাজ। পরে কথা বলব।

দীপু তখন বলল, এই!

—কি!

—আপনি কিভাবে লেখেন খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

—একদিন তবে আমার বাড়ি চলে এস। দেখতে পাবে।

—সে ভাবে না। চুরি করে। আপনি জানবেন, আমি নেই। কিন্তু আমি আছি। পালিয়ে পালিয়ে আপনার নিবিষ্টতা দেখেছি।

—আমার হাতে আর কি আছে?

—সেটা ভাল করে নীলু এখনও দেখে নি।

—আচ্ছা আমার হাতে নাকি আছে আমি কয়েক বছরের ভিতর মরে যাব।

হঠাৎ যেন দীপু আর্তনাদ করে উঠল, কে বলেছে!

—একজন বড় জ্যোতিষ। আমার মেয়ে নীনার ঠিকুজি সে করেছে। লেখা আছে জাতকের একটা বয়সের কথা। সে বয়সে তার পিতৃবিয়োগ আছে। বাড়িতে এ-নিয়ে বড় ভাবনা।

—কখনও না। কখনও হতে পারে না। মিথ্যা বলেছে। কিছু জানে না।

তারপর দীপুও কথা বলতে পারল না। সেও না। দুজনেই দু প্রান্তে চুপচাপ। যেন কতকাল থেকে ওরা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে রয়েছে। এক আশ্চর্য সঙ্কেত পাঠাচ্ছে একজন আর একজনকে। সেই সৌরলোকে সে দেখতে পেল, কি যেন আকস্মিক ঘটনা। এবং রক্তাক্ত এক সন্ধ্যায় সুতোটা কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। তারপর অনন্ত আকাশের নিচে সুতোটা ঝুলে পড়ছে। সে বার বার ডেকেও দীপুর সাড়া পেল না। দীপু কি পাগলের মতো চারপাশে যে নীলিমা আছে যেখানে যা কিছু প্রাণ আছে, আপন আবেগে তাকে রক্ষা করার জন্য ঘরের ভিতর ছুটোছুটি করছে। সে চিৎকার করে ডাকল, দীপু, আমি ফোন কেটে দিলাম।

দীপু বলল, আপনি কেটে দিলেও আমি কেটে দিচ্ছি না। সারা জীবন ধরে বসে থাকব।

(৭)

এই মেয়ে যখন দীপু তখন তাকে নিয়ে লেখক সত্যি ভাবনায় পড়ে গেল। আসলে মানুষটি কখনও চায় না, দীপুর মতো মেয়ে এমন একটা ভুল করুক। দীপুকে সারা-জীবন কষ্ট পেতে হবে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় দীপুর আঠারো বয়সের অহংকার ভয়ংকর নিষ্ঠুর। অথবা এ বয়সে এমন একটা ভয়ংকর খেলার ভিতর দীপু তাকে কেন যে ফেলে দিতে চাইছে। অথবা এ-বয়সে এ-সময়ের মেয়েরা কেন এমন হয়ে যায় জানে না। দীপুকে সে যত সহজে ফিরিয়ে দিবে ভেবেছিল, তত সহজে সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না।

দীপুর কথাবার্তা আশ্চর্যরকমের অকপট। কোন বাধা মানে না। যা মুখে আসে যেন বলে দিচ্ছে। তার জন্য একটা সারপ্রাইজ রেখে দিয়েছে, সেটা কি। দীপু এভাবে পাগলের মতো এগিয়ে আসছে কেন? সে তো নানাভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে, সে সবসময়ই একটু ভীতু-গোছের প্রেমের ব্যাপারে। সে তার বিশ একুশ বছরে বিয়ে করলে, দীপুর মতো মেয়ে থাকতে পারত। তার ভিতর দীপু কি পেয়েছে। তারপর সে ভাবল, আসলে দীপু তার লেখার ভিতর ঘোরাফেরা করে কেমন অনেক দূরে চলে যায়। এটা মানুষের স্বভাব, সে এই যে চারপাশে এত সব আছে, তবু যেন কি নেই, ভিতরে এক কঠিন হাহাকার, যেন এ-জীবনে কি সে পেল না, এবং এভাবে যখন সবাই ছুটছে, বড় হচ্ছে, দীপুও বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে আবিষ্কার করে ফেলেছে, এক লেখক অনবরত কাব্য-সুষমায় এই পৃথিবীকে নিত্য নূতনভাবে গড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। দীপু কি সেখানে তার ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে ফেলেছে! সে বলল, বুঝলে সুমি দীপু ফোন করেছিল!

সুমিতা দেখল, সে জানালায় চুপচাপ বসে রয়েছে! বোতাম খোলা। মানুষটার এই স্বভাব, ঠাণ্ডা লাগছে, খেয়াল নেই। সুমিতা পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বুকের বোতাম লাগিয়ে দিল। নীনা বাবার কাণ্ড দেখে হাসছে। সুমিতা বলল, তোমার বাবা মাঝে মাঝে তোমাদের চেয়েও ছোট হয়ে যায়।

সে বলল, দীপু ফোনে কত কথা যে বলল!

—কি বলল?

—অনেক কথা। অথচ আশ্চর্য আমার সামনে মুখ তুলে একটা কথা বলতে পারেনি। আমাকে বলল, কেমন লাগে আমাকে।

—কি বললে?

—কি বলব! এর জবাব আমি কি দেব বল। এমন সুন্দর মেয়েকে ভাল লাগে না বললে মিথ্যা বলা হবে না।

সুমি বলল, মেয়েটা কি!

—আমিও তাই ভাবি।

সুমি বলল, অনেক মেয়েরাই তো তোমাকে চিঠি দেয়। কেউ এ-ভাবে কথা বলে না। মাথা খারাপ।

—আমার এ-বয়সে কি আর আছে!

—অনেক আছে। তোমার যা আছে অনেকের তা নেই। আমার চোখে তো পড়ে না।

সে বলল, যাক্ এতদিনে ফের নিজের দামটা বুঝতে পারছি।

—কেন, এতদিন বোঝনি।

—না।

—তাতো হবেই আমারও বয়স দীপুর মত ছিল।

—তখন আমারও বয়স ছিল সুমি।

—তা হলেও কেউ এ-ভাবে একজন সামান্য যুবকের সঙ্গে চলে যায় না। সব ফেলে চলে যায় না। আমি গেছি।

—কেন এমন করেছিলে বলতো! সে কেমন সরল বালকের মতো তাকিয়ে থাকল।

—জানি না কেন? কি যে আছে তোমার চোখে!

—কি আছে?

—কি আছে জানি না, সেদিন মনে হয়েছিল, সব একদিকে, তুমি একদিকে।

সুমির সেইসব দিনের কথা ভাবলে সে অবাক হয়ে যায়। সে সামান্য একটা চাকরি করত। অপরের সংসার, সে আঠারো বছর বয়স থেকেই সংসারের দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাববার আর অবসর পেল না। দীপু অথবা সুমিদের যখন প্রেমের বয়স, তখন সে কঠিন পরিশ্রমে নিজেকে তৈরি করছিল এবং এ-ভাবেই সময় পার হলে এক ট্রেনিং কলেজে দেখা সুমির সঙ্গে। সুমির পক্ষে সেদিন সে খুবই সামান্য ছিল। এ-সব ভাবলে সুমির কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না। সুমি জীবনের বৈভব ছেড়ে এক সামান্য যুবকের সঙ্গে চলে এসেছিল।

সে বলল, এখন?

—এখন আমরা একদিকে, তুমি একদিকে!

—আমরা মানে!

—এই আমি, তাতার, নীনা। আর তুমি দিন দিন কেন যে দূরে সরে যাচ্ছো। সংসার যেন আমরা দুই মেয়েতে ক্রমে সরে যাচ্ছি। বলেই সুমি জানালার পর্দা ভাল করে সরিয়ে দিল। রোদ এসে পড়েছে, সামনের মাঠে

কিছু ধানের চাষ। অসময়ে ধানের চাষ দেখতে ভীষণ ভাল লাগে। শিশির জমে আছে, একটু কুয়াশার মতো করেছিল সকালে, এখন আকাশ পরিষ্কার।

সে, সুমিতার দুঃখটা ধরতে পারে। আসলে সে নিজের লেখা, এবং সম্মান, নানাভাবে একা একা ঘোরাঘুরি, অথবা কাজ এবং এই নিয়ে যখন সময় পার করে দিচ্ছে তখন বুঝতে পারছে সুমিকে সে একেবারে সময় দিতে পারছে না। চাপা অভিমান আছে সুমির। এবং এই চাপা অভিমানই সুমিকে এই সংসারে যেন বেশি কর্তব্যপরায়ণ করে তুলেছে। সুমি কাজে-কর্মে বুঝতেই দিচ্ছে না, তার নিজেরও একটা চাহিদা আছে। সে সুমির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, এখন থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে, সে সুমিকে নিয়ে বেড়াবে, অথবা সুমি যখন গান গাইবে, তখন লেখা ছেড়ে ওর গান শুনবে। চাপা অভিমান নিয়ে সুমি সামনে দাঁড়ালে সে স্থির থাকতে পারে না, যেন মনে করিয়ে দেয় লেখক দিন দিন তোমার দাম বাড়ছে, আমার দাম কমছে, কিন্তু আমার কাছে তোমার ঐশ্বর্য আজকের নয়। যখন তোমার কিছু ছিল না তখনও তুমি ছিলে আমার ঐশ্বর্য।

আর এ-সব মনে হলেই সে ভাবে দীপুকে বলবে, দীপু সময় কম। কবে দেখা হবে জানি না। আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল। বেশি দেখা হলে আমরা কষ্টের ভিতর পড়ে যাব। আমাদের কষ্টের ভিতর ফেলে তোমার কি লাভ। পৃথিবীর সব সুন্দর সুন্দর যুবকেরা তোমার সামান্য ছোঁয়ার জন্য পাগল। আমি জানি, রাস্তায় যখন হেঁটে যাও তখন তুমি এক সুন্দর সূর্যমুখীর মতো। এ-বয়সে তুমি কেন আর তোমার আঠারো বছরের অহংকার নিয়ে আমাকে কষ্ট করে দিতে চাও।

সূর্যমুখী কথাটা তার ভাবতে ভাল লাগে। যেমন সে বাড়ির সামনে কিছু সূর্যমুখীর গাছ লাগিয়ে রেখেছে। ফুল ফুটলে সে জানালায় দেখতে পায়, ওরা ফুটেছে। ভীষণ অহমিকা নিয়ে ফুটে আছে। চারপাশে কি ঘটছে তারা একেবারেই ভাবছে না।

এবং অফিসে এসে সেদিন বসতে না বসতেই ফোন। দীপুর গলা সে চিনে ফেলেছে। দীপুর একটা বিশেষ সময় আছে ফোন করবার। তখন সে ফোন করতে ভালবাসে। বোধ হয় তখন বাড়িতে কেউ থাকে না। এবং একা একা আর ওর ভাল না লাগলে ফোন করে। সে তখন একমাত্র মানুষ, যাকে অনায়াসে ফোন করতে পারে।

দীপু বলল, আমি কাল যাচ্ছি। হাতে কোন কাজ রাখবেন না।

সে বলল, কাজ রাখব না মানে?

—কাজ রাখলে কথা বলব কি করে? আমার অনেক কথা আছে।

—কি এত কথা।

—ভীষণ একটি বিপদে পড়ে গেছি।

—কি বিপদ। ওর গলার স্বর কেমন সামান্য উদ্বিগ্ন শোনাল।

—ফোনে বলা যাবে না।

এবং তারপরই ঠিক কথামতো দীপু এসে পরদিন হাজির। দীপু এসেই সেই আগের মতো। মাঝে মাঝে কেবল চোখ তুলে তাকাচ্ছে। দেখছে তাকে। এত যে কথা বলতে এসেছে একটা কথাও দীপু বলতে পারছে না। দীপুকে সে বলল, কেমন আছো?

—ভাল না।

তারপর আবার চুপ। সে বলল, চা খাবে?

—কিছু না। গরমে কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না। হঠাৎ কেমন গরম পড়ে গেল।

—কিছু ঠাণ্ডা আনিয়ে দিচ্ছি।

দীপু বলল, বসন্তকাল এটা।

—তুমি আমাকে কি যেন সারপ্রাইজ দেবে?

—দেব। এত তাড়াতাড়ি কেন? ...

সে জয়ন্তকে বলল, আমি একটু যাচ্ছি। ফিরব না। দীপু ওকে নিয়ে বের হয়ে এল। সামনে সাদা রঙের গাড়ি। এবং ড্রাইভার।

সে বলল, কি ব্যাপার! গাড়ি, ড্রাইভার!

—উঠুন, বুঝতে পারবেন।

ড্রাইভার মাঠের একপাশে গাড়ি থামালে ওরা নেমে গেল।

ওরা একটা গাছের ছায়া দেখে বসল। দীপু কোন কথা বলছে না। ঠিক আগের মতো। গাড়িতে একটা কথাও বলেনি। এখনও বলছে না। চুপচাপ। সে বলল, তোমার কি বিপদ বলতো।

—ঐ এমনি।

—এর জন্যে এখানে নিয়ে এলে।

—কিছু ভাল লাগছিল না।

—আমি তার কি করব।

দীপু পাশ থেকে দেখল। কিছু বলল না।

—কত কথা আছে বললে।

—বলছি।

তারপর আবার চুপ। মাঠে সবুজ ঘাস, ছেলেরা নানারকমের পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও মাঠে খেলা হচ্ছে। ফুটবল থেমে গেছে। শীতের মাঠে ক্রিকেটের যে ছবি দেখা যেত এখন তা নেই। এখন রঙ-বেরঙের জার্সি পরে খেলা। এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাশে রঙ-বেরঙের শাড়ি পরে ঘোরাফেরা করছে যুবতীরা। ওর কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। সে আর না বলে থাকতে পারল না, তোমার সঙ্গে এ-ভাবে বসে থাকলে লোকে কি ভাববে বলতো!

—কি ভাববে!

—তোমার বাড়িতে কেউ কিছু ভাবে না।

—না। আমি তো একজন লেখকের কাছে আসছি। মাসি তো বার বার বলছে আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আপনার কাছে এলে কে কি ভাববে!

—তিনি আমার লেখা পড়েন!

—পড়েন।

আবার চুপচাপ। সে ভাবল, একে নিয়ে বেশ মেয়েটা খেলছে। ওর কেমন খারাপ লাগছিল। কত কাজ। সব ফেলে চলে এসেছে। অবশ্য এরা আছে বলে, সে এখনও লেখায় তাজা প্রাণের খোঁজ পেয়ে যায় এবং এক অসীম উজ্জ্বলতায় সব চরিত্রেরা ওর উপন্যাসে ঘোরাফেরা করতে পারে। সে কিছুতেই এদের অবহেলা করতে পারে না। সে বলল, কি বলছ নাতো কি হয়েছে।

—এমন কিছু না।

—তবে তো আমার ওখানে বসেই কথাবার্তা হতে পারত।

দীপু বলল, সব কথা সব জায়গায় হয় না।

—তবে বল।

—বলছি। এবং দেখল সে, দীপুর মুখ কেমন বিষণ্ণতায় ভারি হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন করছে মেয়েটা। সে একটু দমে গেল।

দীপু বলল, আমার কি হবে!

—কি হবে আবার। পরীক্ষায় পাশ করবে ভাল। তারপর ইউনিভার্সিটি, তারপর রিসার্চ, তারপর বিয়ে, ঘর বর, ছেলে-পুলে, শেষে দিদিমা ঠাকুমা।

—একদম ভাল লাগে না দিদিমা হতে।

—কি হতে ভাল লাগে।

—জানি না।

অথচ সে ভেবে পাচ্ছে না ওর এমন কি কথা। সে বলল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। চল উঠি।

—রাতে আমার ঘুম হচ্ছে না।

—কদিন থেকে।

—সেই চিঠি লেখার পর থেকে।

—স্লিপিং পিল খাও। ঘুমিয়ে পড়বে।

—খাচ্ছি।

সে কেমন আঁৎকে উঠল। সত্যি খাচ্ছ!

আমি এমনি ঠাট্টা করে বললাম।

—সত্যি। আপনাকে ছুঁয়ে বলছি।

এমন আন্তরিক গলা সে যেন কখনও কোথাও শোনে নি। সে ধীরে ধীরে বলল, দীপু আমার দোহাই। তুমি স্লিপিং পিল খাবে না। ওগুলো খাওয়া ভাল না। আজকাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এসব খাচ্ছে। এটা ঠিক না।

—খেলে, কেমন ভাল লাগে। আমি তখন এক সুন্দর স্বপ্নের ভিতর চলে যাই। আমার যা ইচ্ছা হয়, সব সেখানে পেয়ে যাই কেমন।

সে বলল, তুমি খাবে না বল।

—না খেলে আপনার কি হবে!

—যাই হোক। খাবে না। আমাকে কথা দিতে হবে।

—আপনি আমার কথা নেবেন, আমাকে কোন কথা দেবেন না?

—কি কথা দেব।

দীপু ওর দামী ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা রুপোর মিনাকরা কৌটা বের করল।

সেখানে দীপু কত যত্নে কি রেখে দিয়েছে। সে নীল রঙের একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে বলল, ঘুম না এলে ভাবি। আর যখন ভাবি তখন অজস্র ইংরেজি কবিতার লাইন মাথায় চলে আসে। তা তখন লিখি, তারপর দেখি সবই আপনাকে নিয়ে লেখা। এটা আপনাকে না দিতে পারলে আমি আরও ঘুমোতে পারব না।

সে দেখল দীপু লিখেছে,

After a series of sleepless nights.
Through the bed-side window
- - - - - - - - - - - - - -
I saw you coming. . . . .
I found you so complete by
yourself!
The sun was dazzling on your
forehead,
The birds were peeping through
their nests.
The flowers were blooming by
your touch;
And — bathed in a devine
innocence
You knocked at my door

সে কবিতাটা পড়ে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল। দীপু ভাল ছাত্রী। ইংরেজি অথবা ইকনমিকসে অনার্স, যে কোন বিষয়েই সে হয়তো প্রথম হয়ে যেতে পারে। তবু এমন সুন্দর দীপু কবিতা লিখবে, আশা করতে পারে নি। সে ইংরেজি ভাল জানে না, যতটুকু বোঝে তাতে মনে হল, হয়তো দীপু নানারকম কবিতার বই ঘেঁটে ওর জন্য কবিতাটা খাড়া করেছে। বেশ বড় এবং দীর্ঘ। তবু সবটা পড়ে ওর মনে হল, এই মেয়ে তাকে নিয়ে সমুদ্রে যেতে চায়। সে ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকল।

কবিতা পড়ার সময় দীপু তাকে অপলক দেখছিল, কিছুটা চুরি করে দেখার মতো। কবিতা পড়া শেষ হলেও ওর হাতে সেই নীল রঙের কাগজ। কেমন চোখ মুখ ভারি, বিষণ্ণ।

দীপু বলল, আপনাকে আমি ভীষণ কষ্টের ভিতর ফেলে দিলাম।

সে তবু একটা কথা বলল না। সুন্দর সৌরভ দীপু শরীরে রেখে দেয়। খুব চড়া না গন্ধটা, কেমন হাল্কা। দীপু পায়ের পাতার শাড়ি টেনে দিল। হাওয়ায় আঁচল উড়ে উড়ে বার বার কোথাও উধাও হতে চাইছে। কিছুতেই সে শাড়ি সামলাতে পারছে না।

দীপু বলল, কি, একেবারে চুপ।

সে বলল, তোমার বয়স কত দীপু?

—উনিশ। মাসি আঠারো বলে। মা আরও কম।

সে কি বলতে গিয়েও আর বলতে পারল না। বললে যেন এমন শোনাতো, আমি এই বয়সের মেয়েকে নিয়ে কি করতে পারি। কিন্তু সে কিছুই বলল না। দীপুর কপালে সামান্য ঘাম। সে শুধু বলল, কপালের ঘাম মুছে ফেল দীপু।

—আমি আর কি করব?

—ভাল মেয়ে হয়ে যাবে। আমার লেখা আর পড়বে না।

—আপনি আমাকে খারাপ করে দিয়েছেন।

—এখন তাই মনে হচ্ছে।

দীপু হাসল। বলল, হয়তো তাই হবে। তারপর সেই চরিত্ররা ওর মগজে ঘোরাফেরা করতে থাকে, কেমন এক অসীমতায় তারা তাকে বার বার টেনে নিয়ে গেছে। সেই ঈশ্বর সামিল মানুষটির মুখে কষ্ট দেখে বলল, আমি তো আপনার কাছে কিছু চাইনি। আপনি তবে এত ভাবছেন কেন?

সে বলল, দীপু তুমি এর আগে প্রেম কর নি?

—না। তবে অনেকের পছন্দ। নানা-ভাবে প্রেম করতে চায়।

—আমি তো তাই ভাবি, এমন মেয়ের প্রেমিক থাকবে না!

—রাস্তায় হেঁটে গেলেই আমি চার-পাশে আমার প্রেমিকদের দেখতে পাই। তাদের দৈন্য এত বেশি যে কখনও কথা বলতে পর্যন্ত ইচ্ছে হয় না। আমাকে ছুঁয়ে দিতে পারলেই ওরা খুশী। ওদের সঙ্গে আমি কি প্রেম করব বলুন।

সে বলল, আমিও যে পারি না। তুমি খুব ছোট। তোমার সঙ্গে প্রেম করলে লোক হাসবে।

দীপু এবার কেমন ঝড়ের মতো উঠে দাঁড়াল। — আপনি যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু এভাবে অসম্মান করতে পারেন না। আমি বড়। খুব বড়। খুব।

দীপু কি এখন পরীক্ষা দিতে চায়। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, দীপু লক্ষ্মী মেয়ে।

দীপু খুব ধীরে ধীরে বলল, চলুন।

আর চারপাশে তখন সে দেখল শহরের উজ্জ্বল আলো, ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায় একটা বড় আলো, টাটা বিল্ডিং-এর পাশে সারি সারি আলোর মালা, হুস-হুস গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে, অস্পষ্ট আলোতে জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক মুখোমুখি, পৃথিবীতে কোন দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, প্রত্যাবর্তন আছে, এ-সব দেখে বিশ্বাসই করা গেল না। সে বলল, দীপু, তুমি বড় হও। দেখা যাবে। বয়স বাড়লে এ-সব ইলিউশান থাকে না। তুমি নিজেই ভুল বুঝতে পারবে।

দীপু সোজা হেঁটে যাবার সময় শুধু বলেছিল, আবার কবে দেখা হবে।

—সে একদিন ঠিক করে নিলেই হবে।

—আমি কিন্তু রোজ ফোন করব।

—করবে।

তারপর দীপু গাড়িতে উঠে, ঠিক উল্টো দিকে চালাতে বলে দিল। সে বুঝতে পারল, দীপু ওকে ওর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে চলে যাবে। মনে হল কেমন দীপু মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওর ফিরতে রাত হবে ভ্রূক্ষেপ করছে না। তবু কেন যে সে দীপুকে বলতে পারল না, এভাবে জীবন চলে না, এতে জীবনের দাম কমে যায়।

(৮)

তারপর দীপু এভাবেই বড় হতে থাকল। কখনও ফোন, কখনও চিঠি, এবং সে মাঝে মাঝে বড় দেখানোর জন্য উঁচু লম্বা খোঁপা কখনও সে কেমন অনেক দূরে গাড়িতে তাকে নিয়ে চুপচাপ ঘুরতে ভালবাসে। পরীক্ষার পর দীপু গাড়ি চালাতে শিখল। এবং পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট করে নিজে গাড়ি চালিয়ে হাজির। এসেই দমদাম ঢুকে গেল। বলল, চলুন কথা আছে।

—আবার কথা!

—চলুন না!

দীপু নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে দেখে অবাক। এটা তো বলনি।

দীপু বলল, সারপ্রাইজ। তারপর দীপু কেমন অলস ভঙ্গীতে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বলল, এবার সত্যি আমি বড় হয়ে গেছি। আপনাকে একটা চিঠি লিখেছি। আপনার প্রতি আমার কোন ইলিউশান নেই। যা সত্যি তাই।

—চিঠি!

—কাল পাবেন। আসার সময় পোস্ট করে এসেছি।

—নিয়ে এলেই পারতে।

—চিঠি হাতে দিতে ভাল লাগে না। চিঠি, চিঠি। আমি থাকব না, আপনি পড়বেন। আমি ভাবব, আপনি পড়ছেন। চিঠির জবাব চাই। না দিলে ভীষণ কাণ্ড হবে।

—এখন স্লিপিং পিল খাচ্ছ না তো।

—খাচ্ছি। তবে কম। আমার এটা হয়। জানেন, মাঝে মাঝে কেমন মাথার ভেতরে হগোলেগ্‌ ফিল করি। যেন কিছু নেই। ফাঁকা। খুব খোলা আকাশের নিচে একা দাঁড়ালে এমন হয়। আমাকে কারা যেন কেড়ে নিতে চায়।

সে বুঝতে পারল না, কি ব্যাপার। সে এমন একটা অবস্থায় পড়ে গেছে যে কাউকে কিছু বলতেও পারছে না। একদিন হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দীপুর দেখা। অফিসে দীপু এলেই পরিচয় করিয়ে দিতে বলেছিল, আরে ওদের তো আমি চিনি। এবং এমন সব কথা বলেছিল ওদের পরিবার সম্পর্কে যে বেশ মান্য করতে ইচ্ছে হচ্ছিল দীপুকে। দীপুর কোন অসুখ নেই তো! দীপুকে সে বলল, তোমার বাড়ির সবাই জানে, তোমার এমন হয়?

—জানে। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিছু হয় নি।

—এখনও হয়?

—না। তবে আপনি বকলে হয়।

—আমি আবার তোমাকে কবে বকলাম!

—কেন বকেন নি। এটা ভাল না, ওটা ভাল না দীপু, বাবা মার কথা শুনবে। সুযোগ পেলেই আমাকে শাসন করেন না?

—তোমার ভালোর জন্য করি।

—আচ্ছা আপনি কি। আমার ভাল আমি বুঝি না! আপনি উপদেশ দিলেই আমার রাগ হয়। ভীষণ রাগ হয়।

—রাগ হলে কী কর?

—যা করার করি? খুব সুন্দর আর দামী নাইটি পরে দরজা বন্ধ করে দি। সিগারেট খাই। সিগারেট খেয়ে শোধ নি। তারপর টুপ করে একটা শ্লিপিং পিল। তারপর সুন্দর সোনালি রঙে একটা চাদর সারা গায়ে জড়িয়ে ফেলি। ওঃ কি যে আরাম!

—আর কিছু না!

—আপনাকে আর বলব না।

সে জানতে খুব উৎসাহ দেখাল না বলে দীপু বলল, মাঝে বাড়ি গেছিলাম। মা বাবাকে আপনার কথা বলেছি। ওঁরা খুব ইম্‌প্রেসড্‌।

—সব কিছু খুলে বললে ইমপ্রেসড হতেন না। ভীষণ ডিপ্রেসড্‌ হয়ে যেত।

—কেন আমি কি খারাপ কিছু করেছি!

—করতে কতক্ষণ!

দীপু বলল, বেশ মাঠ, দেখছেন কেমন চাষ হচ্ছে।

—এদিকটায় আমি কখনও আসি নি। শহরের কাছে এমন গ্রাম জায়গা আছে সত্যি ভাবা যায় না।

—আমাদের বাড়িতে গেলেও এমন মনে হবে। এখন তো মাঝে মাঝে ছুটির দিনে গাড়ি চালিয়ে চলে যাই।

—মাসি মেসো রাগ করে না।

—রাগ করবে কেন। ওদের তো কেউ নেই। যা কিছু আমিই ওদের। মা তো বাড়ি গেলে আসতে দেন না। জানেন, বলে দীপু তাকাল ওর দিকে।

সে বলল, কি।

—আমার আগে ইচ্ছে হত, একটা ছোট্ট বোন থাকবে আমার। এখন ভাবি যদি আমার একটা ছোট্ট মেয়ে থাকত। তাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতাম।

—তোমার বাবাকে তবে লিখে দিচ্ছি। দীপুর ঘরসংসার করতে খুব ইচ্ছে। বিয়ে দিয়ে দিন।

—কার সঙ্গে।

—খুব সুন্দর একটি মেয়ে। যার চুল বড়, সে লম্বা খুব, যার চোখ আমার চেয়েও সুন্দর।

—নেই। কোথাও সে নেই।

—আমি ঠিক খুঁজে দেব।

—সে দেখা যাবে। এখন তো পড়াটা শেষ করি।

এমনি সব নিছক কথা অথবা ঘুরে বেড়ানোর ভিতর সে বুঝতে পারত, দীপু সত্যি বড় হয়ে যাচ্ছে। অথচ সে বুঝতে দিতে চায় না, দীপু বড় হয়ে যাচ্ছে। কেমন সব সময় একটা সে অহমিকা নিয়ে থাকে, বড় হলে বোঝা যাবে, আমি তোমাকে কিছুতেই বড় হতে দিচ্ছি না। দিলেই তুমি যে কি সব করে ফেলবে।

এবং সে বাড়ি এসে চিঠিটা পেল। সুমি চিঠি খোলেনি। কিন্তু সুমিকে ভীষণ বিরক্ত দেখাচ্ছে। সুমি রাগ করলে তার খারাপ লাগে। কিছু ভাল লাগে না। সে চিঠিটা খুলে পড়তে গিয়ে কেমন কেঁপে উঠল। এ-সব কি লিখেছে দীপু। দীপু এ-ভাবে চিঠি লিখলে আমি কি করি। এ-সব চিঠি কেন যে তুমি আমার বাড়ির ঠিকানায় লেখ। সে, সুমিকে চিঠিটা এই প্রথম দেখাতে সাহস পেল না।

পরদিন অফিসে এসেই সে ফোন করল, দীপু আছে?

—নেই তো।

সে তার নাম বলল, বলল, ওকে এলে একটু কথা বলতে বলবেন। তারপর সে অনেক কাজ করবে ভেবে চিঠিপত্র দেখতে থাকল। কিন্তু সে কিছু করতে পারছে না। কেবল ঘুরে ঘুরে চিঠির কথা। দীপুর চিঠিটা পড়ে সে গত রাতে ভাল ঘুমোতে পারে নি পর্যন্ত। এবং সুমি এটা বেশ টের পেয়েছে। সুমি ভোরে উঠেই বলেছে, তুমি আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছ। আমার খুব ভয় করছে।

দীপুর ফোন এলে সে বলল, তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসো?

—বাসি।

—তবে এ-ভাবে বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখেছ কেন?

—কি হয়েছে!

—কিছু হয় নি বলছ! আমার স্ত্রী বড় শান্ত প্রকৃতির। তাকে কষ্টে ফেলে দিলে আমিও কষ্ট পাব দীপু। আমাকে এ-ভাবে ছোট করে কি লাভ।

—আর দেব না।

সে তারপর কিছু বলতে পারল না।

দীপুই বলল, তবে কোন ঠিকানায় চিঠি দেব?

সে একটা প্রকাশকের ঠিকানা দিয়ে বলল, এখানে দিলে পাব। তারপরই ওর ভিতরে কি যে হয়ে যায়। দীপুকে কেন যে সে অন্য ঠিকানা দিতে গেল। সে এটা ঠিক করছে না। সুমির কথা মনে হলেই পুরানো স্মৃতি মনে হয়। সুমির তখন কি প্রাণান্তকর ইচ্ছে সে কথাবার্তায় আরও স্মার্ট হোক। সে বলল, দীপু আমার এখন সুসময়। আমার স্ত্রী সব ছেড়ে আমার অসময়ে এসেছিলেন। তাকে তুমি ছোট কর না। প্লিজ।

—আর করব না।

আসলে দীপু যা বলতে চায়, কাছে থাকলে কিছুটা বলতে পারে, ফোনে একটু বেশি বলতে পারে। আর চিঠিতে ওর ইচ্ছের কথা খোলামেলা থাকে। কোন ভরডর নেই। সে এই মেয়ের জন্য কেমন ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবু সে ফোনে না বলে পারল না, তোমাকে একটা গল্প বলি দীপু। শুনলে বুঝতে পারবে, সুমিতা কত বড় আমার কাছে।

দীপু বলল, বলুন।

সে বলল, আমার সঙ্গে ওর একটা ঘরোয়া পরিবেশে প্রথম দেখা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা রেসিডেন্সিয়েল কলেজ। আমরা ওখানে ট্রেনিং নিতে গেছি। তখন ছিল শীতের রাত। বাইরে জ্যোৎস্না ছিল। কামিনী ফুল গাছটাতে বোধ হয় কিছু ফুল, ফুলের সৌরভ। আমি আর সে গাছের নিচে সামান্য দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। জাফরিকাটা জ্যোৎস্না ওর লতাপাতা-আঁকা শাড়িতে ছড়িয়ে আছে। বলেছিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

—কি শুনছ!

—শুনছি।

—তুমি তো জানো আমি পূর্ববঙ্গের মানুষ। এখন অবশ্য সুমিতার জন্য এটা তেমরা ধরতে পার না।

—তা পারি না।

—কিন্তু আগে ভীষণ টান ছিল কথায়।

—এখনও আছে। তবে সামান্য।

—যাই হোক, ও আমাকে কি বলবে বলে যেন খুব ইতস্তত করছিল। কিছু-ক্ষণ আগে পরিচয়সভাতে ও গান গেয়েছিল।

—পরিচয়-সভা মানে।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
স্থাপিত ১৮৬২
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

—ট্রেনিং কলেজে প্রথম দিনই একটা পরিচয়-সভা হত। কে কোন্ স্কুল থেকে এসেছে, কি নাম, জীবনের কিছু বিশেষ ঘটনা বলে পরিচয় করে নেওয়া। যে গান জানত, সে গান গাইত। যে গল্প বলতে পারত, সে গল্প বলত।

—তারপর।

—সে তখন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে কিছু বলবে বলে।

—ও বলল, পরিচয়-সভাতে আপনার গল্পটা বেশ ভাল লেগেছে। আপনি জাহাজে ছিলেন। সে এইটুকু বলে আমাকে সামান্য অবসর পর্যন্ত দেয়নি। ফের সে বলে চলল, যে শহরের ওপর গল্পটা বললেন, তার নাম কিন্তু মেলবোর্ণ। ম্যালবোর্ণ হবে না। আপনি কিন্তু বার-বার ম্যালবোর্ণ ম্যালবোর্ণ করছিলেন।

—আমার এ-ব্যাপারে কোন হাত ছিল না। কারণ নানাভাবে দেখেছি অনেক যত্নে যখন দেশের টান ভুলতে চেষ্টা করছি, তখন কোথায় যেন ভেতর থেকে তারা রক্তের ছায়া হয়ে দেখা দেয়। টানের চোটে এমন ভেসে যাই যে মেলবোর্ণ, ম্যালবোর্ণ হয়ে যায়। আমি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক ঠিক বলে যেতে পারি না।

—আমরা ছেলেরা থাকতাম এ-পাশের হোস্টেলে। ওরা থাকত ওপাশে। খাবার ঘর ছিল আমাদের কমন। দুপুরে খেতে গিয়ে দেখি ও বসে আছে ও-পাশে। খুব গম্ভীর। আমার দিকে কিছুতেই তাকাচ্ছে না। কেমন মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। উঠে যাবার সময় দেখলাম সে আমার পেছনে। বলছে, আবার!

—আবার মানে! আমি বললাম।

—আবার মানে কি! প্রার্থনা-সভা থেকে বের হয়ে জুতু খুঁজছিলেন। জুতু বলে কোন বাংলা শব্দ নেই।

—জানো দীপু, ওর কথা শুনে আমি হা-হা করে হাসতে গিয়ে কেমন ঢোক গিলে ফেললাম। কি শুনছো তো!

—শুনছি।

—প্রতিপক্ষ এত গম্ভীর যে, বোকার মতো আর যাই করা যাক, হা-হা করে হাসা যায় না! তারপর ঢোক গিলে যেমন বলতে হয় বলা, হ্যাঁ হ্যাঁ জুতু। যতবার জুতো বলতে যাই, ততবার জুতু হয়ে হয়ে যায়। ভারি মুশকিলে পড়া গেল। থাকতাম কলোনিতে, কাজ করতাম কলোনির স্কুলে। বন্ধুবান্ধব যা সব—যদিও এ-দেশের, তবু তারা আমার ভাঙা বাংলা শব্দ সহ্য করে আসছে। ওরা যদি প্রথম থেকেই শুধরে দিত, তবে এতটা ন্যাজেহাল হতে হত না। কি যে করি।

—ওর এমন একটা মজার ঘটনা কোথায় খুব উপভোগ করার কথা ছিল, তা না, সে কেমন কঠিন হয়ে গেল। বলল, আমাদের হোস্টেলে এ নিয়ে ভীষণ হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে।

—আমি বললাম, তাই বুঝি!

—গীতা চন্দনা অর্চনা সবাই বলছে, ওরে আজ ম্যালবোর্ণ বলছে, জুতু কোথায় গেল। সে একটু থেকে বলল, কি, ঘোর করছে নাতো!

—আপনি বলে যান। দীপু বলল।

—আমি বললাম, ওরা বলছে বলতে দিন। ওরা এটা নিয়ে বেশ আনন্দে যখন আছে, তখন দোষের কি। আনন্দটা ওদের উপভোগ করতে দিন না।

দীপু বলল, তিনি কি বললেন!

—কি বলবে। ওর কথায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না দেখে, ও কেমন আরও ক্ষেপে গেল। বলল, দেখুন, আমি এ-দেশের মেয়ে হতে পারি। কিন্তু আমার মা পূর্ববঙ্গের। ছেলেবেলাতে আমরা মামাবাড়িতে মানুষ। কই, আমাদের তো এমন হয় না!

—আমি বললাম, আর হবে না। আর সে এভাবে আমাকে ক্রমে সংস্কার করে যাচ্ছিল। যেমন একদিন সাফাইর ক্লাশ থেকে বের হবার মুখে এক ধমক লাগাল। জ্যোতির্ময় বলতে পারেন না। জুতির্ময় জুতির্ময় করছেন কেবল।

—দীপু বলল, জ্যোতির্ময় কে।

—সে আমার সহপাঠী। ক্যাণ্টিনে ওকে খুঁজছিলাম। আমি তখন কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কি করে জ্যোতির্ময় জুতির্ময় হয়ে যায় এবং এভাবে কে আমাকে সারাটা বছর পিছনে লেগে লেগে কখন যে ঘোপদুরস্ত করে ফেলেছে জানি না। এসবঅবসানে টের পেলাম আমাদের ভেতর এই করে আশ্চর্য এক মায়া অথবা বলা যায় ভালবাসা অজান্তে গড়ে উঠেছে। আর এভাবে বুঝতে পারি সে আমার খুব কাছাকাছি এসে গেছে এবং কোন ট্রেন-যাত্রায় অথবা কোন বড় মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে টের পেতাম—কথা বলতে বলতে ওর কেমন গলা ধরে আসছে। ট্রেনিং শেষ হবার মুখে সুস্মিতা কি করে যেন টের পেয়েছিল—এক বছর ধরে যে-মানুষকে ঘোপদুরস্ত করা গেল, ছেড়ে দিলে আবার আগের জুতু, জুতির্ময় হয়ে যাবে।

সে ভেবেছিল, এমন কথা শুনে দীপু হাসবে। দীপু হাসছে না। যেন দম বন্ধ করে গল্পটা শুনছে।

সে বলল, তারপর যা হয়ে থাকে দীপু, এক শীতের রাতে আবার আমরা দূরগামী ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছি। সে আমার শিয়রে বসেছিল। কপালে লাল সিঁদুরের টিপ, পরনে ঢাকাই বেনারসী। হাতে শংখের বালা। সে আমার শিয়রে বসেছিল। অথবা বেশ বড় একটা শীতের মাঠ পার হয়ে নদীর পুলে উঠে গেছি—তারপর আদিগন্ত মাঠ। শীতের মাঠে রাতের ট্রেনে আমরা নানাভাবে দুজনে যখন বেশ সুন্দর সুচারু স্বপ্নের ভিতর ডুবে যাচ্ছিলাম, তখন আমার শরীরে কি শীত! ওকে বললাম, ল্যাপটা দাও। শীত করছে।

—আবার ল্যাপ। সে কেমন ধমকে উঠল।

—লেপটা ধীরে ধীরে গায়ে ঢেকে দিলে, ওর দু' হাত ধরে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম মেয়ে ল্যাপ না বললে তোমাকে যে আমি কোথায় পেতাম। এবারে সুস্মিতা হেসে ফেলল।

তারপর সে থেমে খুব ধীরে ধীরে দীপুর কাছে প্রায় যেন প্রার্থনা জানানোর মতো বলল, তারপর সেই দূরগামী ট্রেনের শব্দ শুনতে থাকলাম। শীতের মাঠে, শাদা জ্যোৎস্নায় কামিনী ফুল এবং তার সৌরভের ভিতর আমরা আবার হারিয়ে গেলাম। সে একটু থেমে বলল, দীপু আমাকে সেখান থেকে আর ফিরিয়ে এনো না। দোহাই তোমার ঈশ্বরের।

সে বলল, আপনি আমার ঈশ্বর। তবে কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি কখনও ছোট করব না। আপনি ছোট হলে আমিও যে ছোট হয়ে যাব।

(৯)

তারপর এমন মেয়েকে আর কি করে না ভালবেসে থাকা যায়। ওর মাঝে মাঝে দীপুকে বলতে ইচ্ছে হয়, কি করে এমন তোমার হল মেয়ে।

দীপু বলত, সে অনেক কথা।

—যেমন।

—আমি তো মিশনারি স্কুলে পড়তাম। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। ছোট ভাই-বোন নেই। বাবার বড় ব্যবসা। ছেলেবেলা থেকে একা একা থাকলে যা হয় কেমন নিঃসঙ্গ। ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ বই পড়তে ভালবাসতাম। বাংলা বই তখন খুব বেশি পড়তাম না। কেবল মার জন্য বাংলা কাগজ আসত। বাবা আমাকে সব সুন্দর ছবির বই কিনে দিতেন। ধীরে ধীরে সেগুলো কেমন একঘেয়ে হয়ে গেল। স্কুল থেকে তখন বড়দের বই এনে পড়তাম। টলস্টয়ের সব ছোট ছোট গল্পগুলো পড়তে পড়তে কেমন অবাক হয়ে যেতাম।

দীপু এভাবেই বলত, আমার বয়স যখন বারো, তখন একবার মেলায় নাগর-দোলায় চড়তে চড়তে পেটে ভীষণ ব্যথা। দীপুর যেন কিছু বলতেই সংকোচ হত না। দীপু তার জীবনী বলতে গিয়ে কিছুই বাদ দিয়ে বলত না। সে বলেছিল, বাড়ি এসেও ভীষণ কষ্ট, তারপর বাথরুমে কি দেখে আঁৎকে উঠলাম। এবং আমার ওটা কেমন মাঝে মাঝে হত। মাকে বলতে পারতাম না। বড় কষ্ট হত। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। আমি হয়তো কোনো পাপ করেছি। ফাদার আলফ্রেড বলতেন, সব পাপের কথা ওঁকে বলে দিলে কোন কষ্ট থাকে না। একদিন গীর্জার সিঁড়িতে ছুটি হলে উঠে গেলাম। তারপর আমার পাপের কথা বললাম। আমার আর

কোন কষ্ট থাকল না। বাড়িতে এসে দেখি মা খুব উদ্বিগ্ন চোখে মুখে তাকাচ্ছে। আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, মা আমি ভাল হয়ে গেছি। আসলে সেদিনই মা আমাকে বলেছিলেন, দীপু তোমার কিছু হয় না? মাঝে মাঝে ব্যথা উঠলে কিছু হয় না?

—হয় মা।

মা আমাকে বুকের কাছে টেনে বললেন, এ-সব মেয়েদের হয়। মেয়ে হলেই হয়।

এ-ভাবে দীপু তার শৈশবের কথা অকপটে বলত। বলতে বলতে সে কেমন চুপ করে যেত। কোন মাঠে, অথবা অফিসে বসে একাকী থাকলেই দীপুর অজস্র কথা। এবং দীপু এ-ভাবেই বলেছিল, সে যখন পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিচ্ছে তখন তার মা বলেছিলেন, কি আজেবাজে সব ইংরেজী বই পড়িছস। যে সাপ্তাহিক বাংলা কাগজটি আসে ওদের বাড়িতে, তার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন ওর মা, ভাল একটা লেখা বের হচ্ছে। পড়িস।

দীপু বলেছিল, আমি প্রথম সংখ্যা মিস করেছিলাম। তারপর পড়া আর পড়া। আমি এ-ভাবে নিজের সব কিছু ভাল মন্দ সেই লেখাতে হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রথম একটা গল্প, একজন লেখকের নাম, আমার চোখের ওপর সূর্য ওঠার মতো উঠে এল।

দীপু নিবিষ্ট মনে বলত, কি লজ্জা কি লজ্জা?

—লজ্জা কেন?

—বলবেন না। পেটে আমার সেই ভীষণ ব্যথা। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। এ-কটা দিন আমাকে বিছনায় শুয়ে থাকতে হয়। মা তখন পাশে থাকে। আমি বাড়িতে তখন। কাগজটা আমাদের বাড়িতে বিকেলে আসে। মা জানত, কাগজটার জন্য আমার ভীষণ অপেক্ষা। বিছানায় শুয়ে সেই বিকেল থেকে মাকে বলছি, এখনও এল না। লেখক এ-সংখ্যাতেই উপন্যাস তার শেষ করছেন।

দীপু ওর দিকে একটু তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে বলত, কোথাও পাওয়া গেল না কাগজটা। আমার ঘুম আসবে না। সারারাত হয়ত জেগে থাকতে হবে। কাগজটার জন্য সাতদিনের অপেক্ষাই মরাত্মক। তার ওপর আবার কাগজটা হারিয়ে গেল। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল দুঃখে। বাবা দশটায় ফিরে আসেন। তিনি আমার পাশে বসে বললেন, কেমন আছিস? আর তখনই দেখি বাবার হাতে কাগজ।

এবং এ—ভাবে দীপু তার বাবার হাতে থেকে কাগজ নিয়ে পড়বে ভেবেছিল, কিন্তু তক্ষুনি কিছু খেতে হবে। ওর খেতে পর্যন্ত ভাল লাগছে না। সবাই খেয়েদেয়ে যখন শুয়ে পড়বে, সে তার বেডসুইচ অন করে শেষ লেখাটুকু পড়বে ভেবেছিল। আর তারপরই দীপু বলত, বুঝলেন, কি লজ্জা কি লজ্জা! মা ঘুম থেকে কান্না শুনে জেগে উঠেছেন। আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম। মা উঠে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, দীপু কি হয়েছে! ব্যথাটা বেড়েছে। গরম জলে সেক দিচ্ছি সেরে যাবে। মা আমার মুখের ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে আরও কি বলতে গেলে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেললাম। কি মিষ্টি কান্না। কি সুন্দর সেই কান্না। যেন এতদিন যে বড় হয়ে উঠেছি, এতদিনের নিঃসঙ্গতা এক আশ্চর্য সুষমায় ভরে উঠল। মাকে বললাম, মা আমি ভাল আছি, খুব ভাল আছি।

মা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, পড়ে আমিও কেঁদেছি দীপু। বার বার কেঁদেছি।

এবং এ-ভাবে মা মেয়ে এক জায়গায় কেমন সুন্দরভাবে ধরা দিলে দীপু ওঁকে খুঁজতে আরম্ভ করেছিল মনে মনে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পরই সে নানাভাবে ভেবেছে, তাঁকে একটা সুন্দর চিঠি লিখবে. তারপর থেকে সে আবার পড়া আরম্ভ করে দিল। এখন শুধু বাংলা বই। সস্তা ইংরেজি বইয়ের চেয়ে এই দেশের জল মাটিতেই আছে কত সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান। সে তখন গোগ্রাসে গিলত। সে তার প্রিয় লেখকের লেখা খুঁজে খুঁজে পড়ত। আর পড়া শেষ করেই ভাবত তাকে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে উঠত না।

দীপু একদিন এসে বলল, জানেন আজকাল আপনার লেখায় আমি চলে আসছি।

সে বলেছিল, তা হয়তো হবে।

দীপু বলত কখনও, আচ্ছা আপনার শৈশবের কথা এত জানতে ইচ্ছে করে কেন!

দেশবাসীর জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধ তৈরি করা
—৩৭ বছর ধরে এই আমাদের লক্ষ্য

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
কাজ করে চলেছে
আপনার জন্যে

দেশের সামাজিক লক্ষ্য পূরণে এই আমাদের প্রাথমিক কাজ। আমাদের জন্ম যে শুধু ভারতে, তাই নয়, মনে-প্রাণেও আমরা ষোল আনা ভারতীয়।

অসুখ-বিসুখ ঠেকিয়ে দেশবাসী যাতে নিরোগ জীবনযাপন করতে পারেন, সেজন্যে আমরা বানিয়ে চলেছি নানা ধরনের ওষুধ। আর নিত্যনতুন গবেষণার মাধ্যমে সমানে করে চলেছি রোগ নিরাময়ের কাজ।

আজ আমরা অনেক রকমের ওষুধ, ইঞ্জেকশন আর রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারক। আমাদের প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি, গত সাঁইত্রিশ বছরে আমাদের শ্রীবৃদ্ধির খতিয়ান দেখলেই তা বোঝা যাবে। নিজের দেশবাসীর জন্যে কিছু করতে পারা —এর চেয়ে আমাদের আর কী হতে পারে!

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-১৩

করতে ইচ্ছা হয়। একদিন সত্যি হয়তো কিছু হয়ে যাবে।

—সেদিন তুমি আমার কাছে আর দীপু আসবে না।

দীপু হাসল। খুব কষ্ট ফুটে উঠল সেই হাসির ভিতর।

এমনভাবে হাসলে সে স্থির থাকতে পারে না। সুস্মিতার কথা মনে হয়, ডাক্তার আছে, নীনা আছে। সে নিজের হাতে তৈরি করেছে একটা সুন্দর জগৎ, সেখানে সে কিছু করে ফেললে অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলবে। সে নিজে ছোট হয়ে যাবে। সুস্মিতা ছোট হয়ে যাবে। আসলে তো এই জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ভিতর একটা ভীষণ অহমিকা থেকে যায় এবং সে-অহমিকাও তাকে ছোট হতে দেয় না।

দীপু বলল, সেদিন সত্যি আর আসব না।

দীপু যদি সত্যি না আসে, তবে তার কি ভাল লাগবে? সে তো এখন একজন তরুণ যুবকের চেয়েও বেশি অহংকারী। একজন সম্রাটের মতো সে নিজেকে ভাবতে ভালবাসে। দীপুর লাবণ্যময় শরীর, সুষমামণ্ডিত মুখ, ভারি চোখ, ঘন কালো চুল, আর সমুদ্রের মতো এক আশ্চর্য গভীরতা নিয়ে যখন তাকিয়ে থাকে, পৃথিবীর সে তখন সবচেয়ে সুখী মানুষ। সম্রাট সিজার পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর তার কাছে। এমন ঐশ্বর্য সে কি করে দূরে সরিয়ে রাখবে! সে বুঝতে পারছে, তার আমার আমি যন্ত্রণায় হাহাকার করছে।

দীপু ফের বলল, খুব ছোট হয়ে গেলাম।

সে চোখ তুলে তাকাল। যেন সে কোন পাণ্ডুলিপি পড়ছে এমনভাবে দেখল দীপুকে। তারপর বলল, না। তুমি যা ছিলে তাই। ছোটও হওনি বড়ও হওনি। এখন তোমাকে অনেক বেশি কাছের মনে হচ্ছে। তোমাকে আরও সুন্দর, পবিত্র লাগছে।

(১০)

আসলে সে ভেবে থাকে, মেয়েরা কখনও এসব ব্যাপারে সত্যি কথা বলে না। সব সময় মেয়েদের দেখলে মনে হবে, তারা কিছু করে না। পুরুষরাই সব করে থাকে। দীপুর স্বভাব অন্যরকমের। সে অকপটে বলে গেল। ভিতরে তার কি হয়ে যায়, সে দীপুকে এখন নিয়ে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু দীপুর মুখের পবিত্রতা অথবা সে যখন ভাবে এ-বয়সে এমন একটা ভুল করা ঠিক না, তখন ভীষণভাবে দীপুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু সেই যে গেল দীপু আর এল না। ফোন দীপুই করে থাকে। সে করে না। তার হাতের কাছে ফোন, তবু করে না। দীপু না থাকলে, ওর মাসি অথবা অন্য কেউ ধরলে সে অপ্রস্তুতের ভিতর পড়ে যাবে। সেজন্য সে ফোন করে না। কিন্তু দীপু এসব ভাবে না। দীপু যেন সগর্বে বলে বেড়াতে পারে সবাইকে, আমার ভালবাসায় মানুষ পেয়ে গেছি। তাকে নিয়ে যা খুশি করব। তোমাদের তাতে কি!

অথচ সে সবসময় কেমন গোটা ব্যাপারটাই গোপন থাকুক, চায়। এবং মাঝে মাঝে তখন মনে হয় অধ্যাপকের চেয়ে সে স্বভাবে বেশি ভাল না। এখনও সে সে দীপুকে ব্যবহার করেনি, একমাত্র সুস্মিতার জন্য। সুস্মিতা তেত্রিশের যুবতী। এবং এমনভাবে সুস্মিতা তার সব প্রাচুর্য দিয়ে ঢেকে রাখে যে, সে কখনও বেশি দূর যেতে পারে না। এই যে দীপু চলে আসে, অথবা গাড়িতে কখনও ডায়মণ্ড-হারবার, সাগরিকায় কিছু খাওয়া, আবার ডাং ডাং করে যাত্রা এবং সবসময় দীপু সকালে গিয়ে রাতের ভিতর আসে। কখনও দু-একজন বান্ধবী, অথবা নীলুকে সঙ্গে নেয়, বোধহয় ওর মেসোর অফিসে অনেক গাড়ি, দীপু ফোন করলেই গাড়ি পেয়ে যায়। আর দীপু এবং সে যখন এ-ভাবে একা একা থাকে, দীপুর অন্যমনস্কতা যখন ভীষণ, যেন মুখ নিচু করে কি ভাবে, তখন মনে হয়, দুজনে জলের ভিতর টুপ করে ডুব দিলে কি হয়। তারপরই মনে হয় সেও হয়তো হয়ে যাবে একটা ডামি, ব্যবহারে ডামি হয়ে গেলে এমন সুন্দর একটা স্বপ্ন দুজনেরই মরে যাবে।

দীপু কোথাও গেলে, বলে যায়, যাচ্ছি। সে ঠিকানা দিয়ে যায়। যেন গিয়েই চিঠি পাই।

সে বলে, সে কি! সেখানে গিয়ে তুমি আমাকে আগে চিঠি দাও। তবে তো।

—চিঠি না পেলে ভীষণ রাগ করব।

আর সে দেখেছে, তার চিঠি লেখার আগে দীপুর চিঠি হাজির। একটা ডাক-বাক্সে চিঠিটা দীপু ফেলে যায়। আর একটা ডাকবাক্সের খোঁজে সে যায়, সেই ঠিকানায়। একটা ডেস্ক ওপরে বসে থাকে। দোতলার ঘরে। নিচে ডাকবাক্স। একটা দুটো চিঠি আসে। সে চিঠির খোঁজে মাঝে মাঝে গিয়ে কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। চিঠি আসেনি! সকালে বিকেলে, অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটা ডাকবাক্সের চারপাশে ঘুরে বেড়ালে একদিন সত্যি সহসা সে চিঠিটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। সাদা খামে দীপুর চিঠি। চিঠিটার জন্য ওর কেমন বুক ঢিপ ঢিপ করে। এবং নানাকারণে চিঠি পেতে দেরি হলে ওর কেমন অভিমান হয়। সে বুঝতে চায় না ডাক-বিভাগের জন্য এটা হতে পারে। দীপু কোথাও গেলে সে দুদিনের মাথায় চিঠি পায়। কখনও তিনদিনের। একবার সাতদিন হয়ে গিয়েছিল এই সাতদিন কেউ দেখলে তাকে ভাবত, মানুষটা পাগল, যার ডাকবাক্সে কি খুঁজে যাচ্ছে পাচ্ছে না। যেন এক অলৌকিক খবর আসার কথা পৃথিবীতে। খবর এলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ঘরে ঘরে খবরটা পৌঁছে দিতে।

আবার সে দেখেছে, দীপুর থাকার কথা একমাস, একমাসের জন্য সে পিসির সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে চিঠি দিয়েছে, কি সুন্দর জায়গা কখনও কোন গাছের বর্ণনা এবং গাছের নিচে দাঁড়ালে তার কি কি মনে হয় অথবা কোন পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলে সে কি ভেবে থাকে, যেমন সে একবার লিখেছিল, সে ভেবে থাকে, এই পাহাড়-শীর্ষে একমাত্র দীপু এবং সেই দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করলে আকাশ ছুঁয়ে দিতে পারে আর কেউ পারে না, এবং একবার দীপু তাকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যাবেই, কেবল পরীক্ষাটা, পরীক্ষা হয়ে গেলেই সে একটা ভাল কাজ পেয়ে যাবে, তখন স্বাধীন, তখন যা ইচ্ছে করবে, তারপর আবার হয়তো সে লিখত, আমি তো কিছু চাই না। আমি চাই সারাজীবন এক অসাধারণ ঈশ্বরের মতো প্রেম বেঁচে থাকবে। আমি শুধু ভালবেসে, মরে যাব।

তারপর সে দেখছে, সাতদিনও যায়নি, দীপু এসে হাজির।

হয়তো আগের দিন চিঠি পেয়েছে, কাল রাতে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা এমন কেন হয় বলুন তো, খুব বৃষ্টি ভিজে কেবল আপনি আমার ঘরে ঢুকে যান। চারপাশে তখন বৃষ্টিপাতের শব্দ থাকে। কিছু ফুলের গাছ, এবং কোন সৌরভ থাকে, আমি তখন জানালায় দাঁড়িয়ে থাকি, বরাবর স্বপ্নে আমি আপনাকে দেখি ঠিক একইভাবে। আপনি বৃষ্টিতে ভিজে শীতে ভীষণ কাঁপছেন। আমি পাথরের মূর্তির মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। কত কিছু করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারি না। এমনকি আপনার জল মুছে নিয়ে, একটা শীতের র‍্যাপার পর্যন্ত গায়ে জড়িয়ে দিতে পারি না। আমার কি যে রাগ হয় তখন!

এভাবে সে কখনও চিঠি পায়, আর তার পরদিনই সে দেখে দীপু দরজা খুলতে খুলতে হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে বসে পড়েছে। সে ভীষণ অবাক হয়ে যেত।—আরে তুমি!

—ধুস! ভাল্লাগে না। চলে এলাম।

—খুব সুন্দর জায়গা, স্বপ্ন-টপ্ন দেখছ!

—ও একদিন দুদিন। তারপর কিরকম সব ফাঁকা, অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে পালাতে পারলে বাঁচি।—জল খাব।

দীপু এমনই স্বভাবের মেয়ে। কি যে হয়ে গেছে কোথাও গিয়ে সে থাকতে পারে না। একবার অন্তত দিনে দেখা না হলে কষ্ট পায়। আর সেই দেখা তিনদিনের ওপর একেবারে চুপচাপ। যদি

যার সে ভেবেছে, একটা ফোন করে দেখে। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। অথচ এই এক সংকোচ, সে যদি ফোন করে, আর ওর মাসি ফোন ধরে ফেলে, ভাববে, বে-আক্কেল মানুষ। একটা বাচ্চা মেয়েকে নাচাচ্ছে। সে কেমন অপরাধী ভেবে ফেললে কিছুতেই আর ফোন করতে পারে না।

সেদিন হাতের কাজকর্ম করে গেল। বেশি কথা বলল না। তিনদিন দেখা না হলে এমন হয় সে ভাবতে পারত না। সে কেমন পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে যদি এভাবে কোনদিন পাগল হয়ে যায়। দীপু এটা তো সহজেই হতে পারে। তুমি যেভাবে ভাবছ আমি তো ঠিক সেভাবে ভাবতে পারছি না, আবার তার মনে হয়, আসলে সে সেয়ানা মানুষ, সে পাগল হতে পারে না তার সুমিতা আছে, তাতার আছে নীনা আছে। সে দুদিকই সামলাচ্ছে। বরং দীপুর এমন হতে পারে।

তার সেদিন কিছু ভাল লাগল না। এমনকি সে ফোনও করল না। বাড়ি এসে সুমিতা বুঝতে পারল, ওর মনটা ভাল নেই। সুমিতা বলল, তোমার শরীর খারাপ।

এবং সুমিতার এই স্বভাব, ও একটুতেই কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। সে, সেজন্য সুমিতাকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্য বলল, ও এমনি। যা গরম পড়েছে। এবং যাতে সুমিতা কিছু ভেবে না ফেলে সেজন্য সে খুব লঘু স্বরে ডাকল, নীনা।

সুমিতা বলল, ওকে তুলবে না। ঘুমোচ্ছে।

সে তারপর স্ত্রীকে বলল, তুমি সারা-রাত আজকে গান গাইবে, আমি রাত জেগে শুনব।

—তোমার যে কি মাঝে মাঝে ছেলে-মানুষী হয় না!

—না। তুমি বল গাইবে। ছাদের ওপর বসে, নিরিবিলি, কেউ শুনতে পাবে না, কেবল তুমি আর আমি। গাইবে বল!

সুমিতা বলল, হাত মুখ ধুয়ে নাও তো। পরে দেখা যাবে।

—কথা না দিলে যাবই না।

—আচ্ছা হবে।

যখন সুমিতা ছাদে উঠে এসেছিল, তখন বেশ রাত। চারপাশে এখনও বাড়ি-ঘর ওঠেনি। ফাঁকা জায়গায় বাড়িটা। জ্যোৎস্না রাতে এভাবে গান গাইতে খারাপ লাগে না সুমিতার। কিন্তু ভিতরে সব সময় কাঁটার মতো খচ করে কি যেন লাগে। সে বলল, দীপু আর এসেছিল!

—যাচ্ছেতাই সব বাজে কথা!

সুমিতা বুঝতে পারল, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু সুমিতা তাকে বেশি কিছু বলতে সাহস পায় না। সে তবু বলল, তোমার মানসী! তুমি তো সব গল্প দেখছি এখন ওকে নিয়েই লিখছ।

সে এবার কেমন রেগে গেল। বলল, এজন্য এখানে এসেছি!

তারপর সুমিতা আর কিছু বলল না। গান গাইল, একের পর এক, কি সুন্দর গায় গান এবং চোখ ভারি হয়ে যায়। গান শুনতে শুনতে ভাবল, সুমিতার ভেতরেও কম ঐশ্বর্য নেই। সে সুমিতার পাশে আরও ঘন হয়ে বসল, কেমন এক নিবিড় ভালবাসা টের পায় দীর্ঘ দিনে যা এক অখণ্ড রূপ নিয়েছে। কিছুতেই ভাঙা যায় না, ইচ্ছাকরলেই দূরে সরিয়ে রাখা যায় না এবং সুমিতাও কি টের পেয়ে তার যা-কিছু আছে সব দিয়ে, যেমন রাতে মানুষটা ভীষণ ছটফট করতে থাকলে, সে সুন্দরভাবে তাকে কাছে টেনে আনে। সুমিতা তাকে কোন কিছুর অভাব টের পেতে দেয় না। যা-কিছু আমার আছে, তুলে নাও। একটা জীবন এতেই চলে যাবে।

সকালে সে ভাল করে স্নান করল। নীনাকে নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াল। তাতারকে বলল, তোর জন্য একজন ভাল মাস্টার-মশাই ঠিক করেছি। সপ্তাহে তিনদিন আসবে। ইংরেজি সে পড়াবে। সুমিতাকে বলল, কাল একটা শো দেখব। টিকিট কেটে রাখবে।

সে এভাবে যখন আবার ভীষণ পারি-বারিক হতে যাচ্ছে, দীপুর কথা একে-বারেই ভাবব না ঠিক করেছে, মেয়েটা একটা আশ্চর্য গোলকধাঁধায় ওকে ফেলে এখন তামাসা দেখছে, সেও যে কম যায় না, সে একেবারে ভুলে থাকার জন্য যখন দশ দিনের দিন দাঁত কামড়ে পড়ে আছে, কিছুতেই ফোন করে জানবে না, তখনই সে টের পেল, দীপু ফোন করছে। অনেক দূর থেকে আলো-বাতাসের ভিতর দিয়ে কি যেন রিণ-রিণ করে ভেসে আসছে। কি মিষ্টি, কি মিষ্টি! সে পাগলের মতো বলল, দী-পু!

—এই। দীপু বলল, আস্তে।

সে সঙ্গে সঙ্গে কেমন গলা ভারি করে ফেলল। এতটা উৎসাহ সে কেন যে দেখাতে গেল। সামান্য হিপোক্রিসি এতে থাকলে কি ক্ষতির ছিল। কিন্তু এখন সে টের পাচ্ছে যতই সে গলা ভারি করে কথা বলুক, দীপু তাকে পেয়ে বসেছে। সে বলল, কেমন আছো?

—ভাল না।

সে বলল না, এতদিন ফোন করনি কেন? এতদিন আসনি কেন? সে এ-দিকটা একেবারে চেপে গেল।

দীপু বলল, কি, আমি এতদিন কেন যাইনি, কিছু জানতে চাইলেন না তো!

—জেনে লাভ।

—তা অবশ্য ঠিক।

তারপরই দীপু কেমন পাগলের মতো চিৎকার করে কথা বলতে থাকল—আপনি স্বার্থপর। আপনি সেলফিস জায়েণ্ট।

সে বলল, দীপু কি হচ্ছে!

—আপনি এই দশদিন খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারলেন!

—খোঁজ নেবার কি আছে। ভাবলাম, কোথাও গেছ। এলে ঠিক দেখা হবে। যেন একটা সাবেকি ঘটনা, খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। সে উদাসীনভাবে ফোন ধরে বসে থাকল।

—আপনি মানুষ না, আর কিছু!

সে হাসল।

—হাসার কিছু নেই।

সে এবার কেমন সহজভাবে বলল, তুমি তো জানো দীপু, ফোন করলে ভয়, তোমার মাসি ধরবে। এটা কি জানাজানি হওয়া ভাল। মাসি তোমার ভাববে, লোকটা কি বেহায়া। কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই। একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে।

—সেই এক কথা। সারাজীবন এক কথা। বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা মেয়ে। আপনি কি ভাবছেন! এবার আমি সবাইকে বলব, মাসিকে বলব, বাবাকে বলব। মাকে বলব।

—দোহাই দীপু

—না বলব। একজন মানুষ আমাকে পাগল বানিয়ে দিয়ে মজা দেখছে।

—দীপু প্লিজ।

—দীর্ঘদিন ফোনের কাছে বসে থেকেছি, ফোন বার বার তুলে নিয়েছি, কিন্তু পারিনি। স্নান করতে দেরি করিনি, খেতে দেরি করিনি, কখন ফোন আসে, কেবল নিজের ঘরে বসে থেকেছি। ভাবছি ফোন করে অন্তত একবার খোঁজ নেবেন। আজ পর্যন্ত আপনি আমাকে একটা ফোন করেছেন! আপনার কাছ থেকে আমার ফোন পেতে ইচ্ছা হয় না!

—অন্যায় হয়েছে দীপু, আমি তোমাকে কাল ঠিক ফোন করব।

—না লাগবে না। আপনাকে ফোন করতে হবে না। বলেই সে ফোন কেটে দিল।

সে তখন কি করে। নিজেই ডায়াল ঘুরিয়ে বলল, এই।

কেমন নিস্পৃহ গলায় বলল দীপু, বলুন।

—রাগ করেছ?

—কেন রাগ করতে যাব।

—তুমি রাগ করলে আমার ভীষণ ভয় করে।

—ভয় নেই। কাউকে বলব না, আমি আপনাকে ভালবাসি। কেউ জানবে না পৃথিবীর আপনি আমাকে ভালবাসেন। তারপর দীপু কেমন চুপচাপ। মাঝে মাঝে কোথাও ঘড়ির কাঁটার শব্দ হচ্ছে—টিক্-টিক্। ফোনে সেই শব্দটাও উঠে আসছে।

উজ্জ্বল হাসির
মধুর ছটা
খাটাউ
ভয়েলস-এ

সে বলল, দীপু কিছু বল।

—কি বলব।

—এই কিছু।

—একটা গল্প বলতে পারি শুধু।

—বল।

—আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হবে না তো?

—না।

দীপু বলল, গল্পটা আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। ছেলেবেলা পড়েছি। আমাদের ছিল মিশনারি স্কুল। নানা রকমের বই উপহার পেতাম। কি যে সব সুন্দর সুন্দর গল্প ছিল বইগুলোতে। তারপর দীপু একটু থেমে বলল, মনে হয় গল্পটা অস্কার ওয়াইলডের। সে হাই তুলল. যেন দীপু বলতে বলতে একটা হাই তোলার মতো শব্দ করল। তারপর বলল, শুনছেন তো।

সে বলল, শুনছি।

দীপু বলল, সেটা কি মাস, শীতকাল ভাবতেই আমার ভাল লাগছে। শীতকালে অবশ্য সে-সব দেশে তুষার পড়তে থাকে। আর আমার যতদূর মনে আছে, ছেলেটি শুয়েছিল ঘাসের ভিতর। ভারি দুঃখ তার। সবুজ গিরগিটি এসে বলেছিল, এই স্কুলে তোমার কি দুঃখ, তুমি এভাবে কেন ঘাসে উপুড় হয়ে শুয়ে আছ?

বোধহয় লাইনে কেউ ট্যাপ করছে তখনই দীপু কি বলছে সে শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, দীপু ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।

দীপু বলল, ছেলেটির একটা লাল গোলাপ চাই। লাল গোলাপ না হলে সে আগামীকাল তার প্রেমিকার সঙ্গে নাচতে পারবে না। খুব দুঃখ। সবুজ গিরগিটির মনটা ভীষণ ভারি। তখন শীতকাল। সে পাবে কোথায় লাল গোলাপ। চড়ুই পাখি উড়ে যাচ্ছিল তখন। দেখল সুন্দর শীতের বিকেলে চুপচাপ ঘাসের ভেতর কে শুয়ে আছে। সে বলল, তোমার কি দুঃখ। আমি যদি পারি আনতে দূরের সমুদ্র থেকে কুয়াশার জল। বলে চড়ুই পাখিটা উড়ে যেতে থাকল। এবং এ-সময়ে দীপু সামান্য কেশে নিল। গলা পরিষ্কার করে সে জানে, কিছু কিছু অনাসৃষ্টির ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমার নিজের যেভাবে ভাল লাগে বলতে সেভাবে বলছি। গল্পটা কার টের পেলেও কিন্তু কোন কারণে নিন্দা করতে পারবেন না।

সে বলল, তা করব না।

দীপু বলল, ছেলেটির ভারি দুঃখ। চাই তার লাল গোলাপ। চড়ুই পাখি বলল, সব নিয়ে আসতে পারি, যা চাইবে. কেবল লাল গোলাপ বাদে। শীতকালে পৃথিবীর কোথায় লাল গোলাপ ফোটে আমার জানা নেই। আর ঠিক তখনই উড়ে যাচ্ছিল একটা নাইটিঙ্গেল। সে দেখল, আহারে, কি সুন্দর ছেলেটা। এমন সুন্দর দিনে কি যে দুঃখ নিয়ে ঘাসের ভিতর শুয়ে আছে। সে বলল, তোমার কি দুঃখ?

—আমার দুঃখ একটা লাল গোলাপ। কাল আমার নাচার কথা আছে। কিন্তু নাচার আগে সে চায় একটা লাল গোলাপ। আমার লাল গোলাপ বলতে বলতে সে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। দীপু বলল, কি আর করে নাইটিঙ্গেল। সে তো নীল আকাশের নিচে উড়ে বেড়ায়। পৃথিবীর কত কি দুঃখ আছে জেনে নেয়। তারপর সে শান্ত আকাশের নিচে আশ্চর্য স্বরে গান গায়। নাইটিঙ্গেল গান গেয়ে গেয়ে বলল, হে গোলাপ গাছেরা, তোমরা পার না এমন দিনে একটি লাল গোলাপ দিতে। সামনের গাছটি বলল, শীতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার পাতা ঝরে গেছে, কি করে তোমাকে লাল গোলাপ দিই। অবার নাইটিঙ্গেল বলল আর একটা গাছের ডালে বসে, হে গোলাপ গাছেরা তোমরা পার না একটা লাল গোলাপ ফোটাতে। গাছটি বলল, আমার সব ফুল ফুটে গেছে। ঝরে গেছে। এ-ঋতুতে আর ফুল ফোটার কথা নেই। তবে তুমি যেতে পার আমার ভাই আরেক গোলাপ গাছের কাছে. সে বলে দিতে পারে লাল গোলাপ দিতে পারে কি পারে না।

সে বলতে চাইল তখন দীপু বাকিটা আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু তুমি কি-যে সুন্দরভাবে গল্প বলতে পার। সে বলল, তারপর?

—আপনি গল্পটা কোথাও পড়েন নি?

সে বলল, না দীপু।

দীপু এবার দ্বিগুণ উৎসাহে বলল.. শাদা গোলাপ গাছ বলল, না। নাইটিঙ্গেল মনের দুঃখে উড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সে যে কত প্রেমের গান গেয়েছে। সারাজীবন সে আকাশের নিচে শুধু প্রেমের গান গেয়ে পৃথিবীর যুবতীর দুঃখ মুছে দিতে চেয়েছে। তখনই নাইটিঙ্গেল শুনতে পেল, শাদা গোলাপ গাছ বলছে, দিতে পারি।

—দিতে পার! আহা রে।

গোলাপ গাছ বলল, কিন্তু বড় যে দুঃখ।

—দুঃখ কেন?

—আমার বলতেও ভয় লাগছে।

—কিসের ভয়? নাইটিঙ্গেল গাছটির মাথায় উড়ে বেড়াতে লাগল।

—শাদা কুঁড়ির ওপরে গোলাপ কাঁটার, বুক ফুটিয়ে দিতে হবে।

নাইটিঙ্গেল সারাজীবন ফুল ফুটিয়েছে। প্রেমের জন্য ভালবাসার জন্য ফুল ফুটিয়েছে। সে বলল, ঠিক আছে। আমি বসছি। এই বলে সে সারা আকাশ প্রান্তে ঘুরে এসে চুপচাপ ওম দেবার মতো গোলাপ কাঁটায় বুক ফুটিয়ে বসে পড়ল।

গোলাপ গাছ বলল নাইটিঙ্গেল তুমি বুঝি প্রেমের গান গাইতে পারছ না?

নাইটিঙ্গেল ধীরে ধীরে গাইতে থাকল। আর আকাশের তারারা ক্রমে নেমে আসতে থাকল পৃথিবীর কাছে।

গোলাপ গাছ বলল, নাইটিঙ্গেল রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে। তুমি আরও জোরে গাও। বুকে আরও গোলাপ কাঁটা ঢুকিয়ে দাও।

নাইটিঙ্গেল আরও জোরে চেপে বসল। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের উষ্ণতায় কুঁড়িটা ফুটবে হয়তো। অথচ ফুটছে না। এবং নাইটিঙ্গেল আরও জোরে গাইছে। রক্ত ক্রমে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। আকাশের তারারাও আরও নিচে নেমে এসেছে। গোলাপ গাছ বলছে, নাইটিঙ্গেল, সকাল হয়ে যাচ্ছে তুমি শেষবারের মতো চেষ্টা করো, আরও চেপে বসো। সকাল হয়ে গেলে আর ফুটবে না। তুমি জোরে জোরে গাও। নাইটিঙ্গেল শেষবারের মতো ওর বুকের ভেতরে শেষ রক্তবিন্দুর ভেতরে গোলাপ কাঁটা ঢুকিয়ে দিল। শেষ রক্তবিন্দু ঝরে পড়ল কুঁড়িটায় আর সুন্দর সকালে ছেলেটি দেখতে পেল জানালা দিয়ে. ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মায়াময় এক লাল গোলাপ। নিচে মরে পড়ে আছে একটা নাইটিঙ্গেল বেচারা।

এখানে দীপু থামল। দীপুর কথার ভিতর ভীষণ আন্তরিকতা। বোধহয় নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু দীপুকে সামান্য আহত করেছে। সে বুঝতে পারছে দীপু ভীষণ উত্তেজিত অথবা এক এক ধরনের শব্দ হচ্ছে, না খুব দুঃখের। দীপু কি গল্পটা বলতে বলতে কাঁদছে! সে বলল. কি দীপু। শেষ? সে ইচ্ছা করেই এমন বলল।

—না না! শেষ হবে কেন?

সে যেন জানে না, এবং জীবনেও গল্পটি শোনেনি, এমন ভঙ্গীতে বলল, তারপর?

—তারপর ছেলেটি গেল নাচতে। লাল গোলাপ হাতে দিলে মেয়েটি বলল, হবে না। তার নাচের সাজ-পোশাক কে এক কোষাধ্যক্ষ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি তার সঙ্গেই নাচবে।

সে বলল, খুব অন্যায়।

দীপু বলল, অন্যায় না! তখন আর ছেলেটি কি করে! সে ফিরে এল। ফুলটা ফেলে দিল রাস্তায়। একটা গাড়ির চাকা ফুলটাকে মাড়িয়ে চলে গেল। বলেই দীপু কেমন সহসা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল আপনার কার জন্য কষ্ট হয়?

—নাইটিঙ্গেলের জন্য।

—ছেলেটার জন্য হয় না?

—না। ভীষণ স্বার্থপর।

—স্বার্থপর কেন?

—সে ফুলটা ঘরে নিয়ে আসতে পারত।

দীপু ধীরে ধীরে বলল, আমার শুধু ফুলটার জন্যই কষ্ট। ফুলটা যে সারারাত ধরে ফুটল, কেউ তার কষ্ট বুঝল না। তার আকাঙ্ক্ষার কথা কেউ ভাবল না। ফুলের

ফটো : শ্যামল বসু

কথা ভাবলে আপনার চোখে কিন্তু ঘুম থাকার কথা না।

(১১)

দীপু ফোন ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকল। দেয়ালঘড়িতে শব্দ—সেই এক টিক-টিক-যেন আবহমানকাল এক নিঃসঙ্গতার শব্দ, সে এটা খেয়াল করেনি, এখন এই ঘরে এবং জানালায় যখন বড় আকাশ আর দেয়ালে সব দামী দামী ছবি ওর মনে হয়, সে আর কিছুতেই নিজেকে বাঁধি রক্ষা করতে পারবে না। এবং চোখে মুখে ভীষণ হতাশা আর শরীরের জন্য যেন কোন মায়া নেই। এবং চুল খোলা, চুল হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, চোখের নিচে অনিদ্রার চিহ্ন আর দীপু ভেবেছিল জীবনেও সে তাকে ফোন করবে না। তারপর ক্রমে কি যে হয়ে যায়, সে কেমন এক আকর্ষণে ফোনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে নিজের সঙ্গে নিজে, অথবা ফোনের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেই টের পায়, একটা সামান্য ফোন পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে, আর উপহাসের ভঙ্গীতে যেন তাকিয়ে আছে দীপুর দিকে—তুমি দীপু কি যে এক আকর্ষণের ভিতর পড়ে গেলে! তারপর দূরাগত এক শব্দের ভিতর ডুবে গেলে মনেই হয় না দীপুর পৃথিবীতে আর কিছু চাইবার আছে।

আর দীপু যখন বলে, আমি আর পারছি না, কি করব! তখনও মানুষটা ছেলে-মানুষের মতো হাসে। দীপু তুমি সরল বালিকা, তোমাকে আমার কখনও খুব দূরে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যেন কোন সে গুরুত্ব দেয় না দীপুর কথায়। তখন কি-যে রাগ হয় দীপুর। ইচ্ছে হয় তার পোশাক দীপু ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কিন্তু কি এক মায়া চোখে দেখলেই দীপু থর-থর করে কাঁপে। ঠিক ভোরের হাওয়ায় সেই এক সূর্যমুখীর মতো।

তারপর দীপুর রাগ হলে আর যা হয়, সে শরীরের সব কিছু খুলে ফেলে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়। কি নেই শরীরে, কিসের অভাব! সে যখন জানে যাবতীয় ঐশ্বর্যে ভরা এই শরীর স্তন কি সাদা, এবং নীলাভ রঙ বোঁটার পাশে, আর নাভি-মূল পর্যন্ত তাকানো যায় না এক অসীম বনের ভিতর অপন মহিমায় বড় হচ্ছে, অথবা জঙ্ঘার দু-পাশে চাঁপা ফুলের গন্ধ, মনোরম লাবণ্য সারা শরীরময়, কোন ফুলের উপত্যকাতে সাদা জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়ালে যে সহজেই বনদেবী হয়ে যেতে পারে। তার কাছে তখন একজন অহংকারী চাঁদ্রশের যুবক এত নিষ্ঠুর।

দীপু কখন জানে এই বাড়িতে সে আর বাবা। নিচে বুড়ো মাস্টারটা থাকে। তার এই দোতলার ঘরে সে এই দুপুর, বিকেল একা কাটিয়ে দেয়। তবে এখন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। নীলু মাঝে মাঝে আসে। সে এখন আর নীলুকেও কিছু বলে না। দীপু তার দুঃখের অথবা যা কিছু গোপনীয় শুধু একজনকেই বলতে পারে। সে দুপুরে নির্বিকার মানুষটার কাছে ফোন করে হেরে গেছে। হেরে যাওয়ার গ্লানি তার সমস্ত শরীরে মুখে। তার হতাশা এখন বুঝি আরও বেড়ে গেছে। এত সুন্দর একটা গল্প শুনেও মানুষটার কোন উৎসাহ নেই। কেমন নির্বোধ। নির্বোধ ভাবেই সে কেমন তাকে যেন খাটো করে দিল। সে বলল, না, উদাসীন। আপনি বড় উদাসীন।

আজকাল দীপু নানাভাবে কিছু মিথ্যা কথা বলে থাকে। সে যে এক ফুলের নাম করে অন্য জায়গায় যায়। এতে প্রথম প্রথম

খুব অপমান করছে ভাবত, এখন এ-সব একেবারেই মনে হয় না। সে যেমন যায়, বলে যায়, যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছ? সে যদি যায় দক্ষিণে, বলবে উত্তরে। সে যদি যায় নদীর পাড়ে, বলবে মাঠে যাচ্ছি। এবং ক্রমে দীপু মাসির কাছে কেমন রহস্যময়ী হয়ে গেল। একদিন মাসি বলেই ফেলল, দীপু, পড়াশোনা কি লাটে তুলে দিলি!

—না-তো মাসি!

—এত কামাই করছিস? ক্লাস করছিস না। সারাদিন বাড়িতে কি করিস।

—কে বলল, ক্লাশ করছি না!

—দীপু বলল, আমি তো ভেবেছি তোর ছুটি।

দীপু বলতে পারত এই দশদিন আমি জ্বরে এই ঘর, আর ফোনের ভিতর সেই শব্দ, কিন্তু যতবার রিসিভার তুলেছি শব্দ শুনে, ততবার নিরাশ হয়েছি, সেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা আমি ভেঙে দিতে পারছি না, আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

মাসি বলল, কিরে চুপ করে আছিস কেন? তারপর পাশে বসে বলল, তুই ওর কাছে পালিয়ে পালিয়ে যাস শুনলাম।

—তুমি কি যে না মাসি। দীপু সহসা এত উজ্জ্বল হয়ে গেল যে মাসি দেখে অবাক। তুমি তো ওঁকে বছরখানেক আগে কেন কালেজে দেখেছিলে! ওতো আমার প্রায় মায়ের বয়সী। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু হতে পারে।

এবং এভাবে বিশ্বাসই হয় না সত্যি কিছু হতে পারে। দীপু এমন বলেই খুব মজা পেয়ে গেল। ওর কাছে মনে হল, যাক মানুষটাকে সে ঠিক অপমান করতে পেরেছে। সে বলল, একেবারে বাজে কথা। আসলে সে দেখেছে, মাসিও বেশ ছুক-ছুক করছে, কিরে দীপু একদিন নিয়ে আয় না ওঁকে। তোর সঙ্গে এত আলাপ, একদিন এখানে খেতে বলতে পারিস। বলতে পারিস, মাসি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। এবং এ-সব আলাপের ভিতর কোথায় কি দুর্বলতা থাকে দীপু এখন সেটা সঠিক বুঝে ফেলেছে। সে একদিন সেজন্য মাসিকে নিয়ে গেল। মাসি যে খাসি, স্মার্ট এবং যে উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে ভালবাসে, কারণ, দীপু জানে লেখকের ওটা খুব পছন্দ। আসলে সব পুরুষমানুষদেরই ভাল লাগে, মসৃণ ঘাড়, পুষ্ট বাহু এবং স্তনের রেখায় সাবলীল খেলা এসব জেনেই দীপু ভালভাবে সেজে দিল, রঙের সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি ব্লাউজ, অথবা মিশুক চোখে সামান্য কাজলের রেখা, এত-সবেও সে যখন পেরে উঠছে না, মনে হয় কোমল ছবি হয়ে সে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং কোন করে একদিন ঠিক ডেকে আনবে তাকে। এই খালি বাড়িতে, কি যে ভাল লাগবে—সে আর দীপু, দীপুর আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর শরীরের সমারোহ মিলে ঠিক রঙিন ছবি হয়ে যাবে তারা।

মাসি কেমন বোকার মতো বসে থাকল। দুটো একটা কথা, খুব বেশি না। যা না বললে নয়, আসলে বোধ হয় সামনে গেলে ওঁর সব চরিত্ররা চোখের ওপর ভিড় করে আসে। মাসিদের আকাঙ্ক্ষা, সেই চরিত্র নিয়ে সামান্য কথাবার্তা হোক, অথবা কোন দৃশ্যাবলী, কিন্তু মাসি দেখল, সে কেমন সব সহজ কথাবার্তা বলছে।

দীপু বলল, আমাদের বাড়িতে মা মাসিরা আপনার লেখা খুব পছন্দ করে। আমাদের ভাল লাগে না। কি যে লেখেন!

সে ভীষণ অবাক। দীপু ওকে আমলই দিচ্ছে না। কিন্তু দুদিন আগে ফোনে দীপুর গলা ধরে আসছিল। এখন দীপুকে মনে হচ্ছে, মাসিকে নিয়ে এসেছে সে। মাসির সঙ্গে তার ভাল প্রেম হতে পারে। দীপুর চোখে দুষ্টুমি দেখে সে হেসে ফেলল। মা মাসিরা ভরবয়সী, ওদের সঙ্গেই মানায়, দীপু যেন একটু চোখ নাচিয়ে ইশারায় এমন বলতে চাইছে।

ওর বলতে ইচ্ছা হয়েছিল, দীপু তুমি কি আমার ইজারা নিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমার মানায় না, সে তো বার বারই বলেছি, তোমার মাসিকে টেনে আনার দরকার ছিল না। তারা আমার সমকালে, ইচ্ছে করলে কিছু একটা হয়েও যেতে পারে। আর এ-ভাবে সে অবাক। ওর মাসির সামনে দীপু ওকে খুব সেকেলে মানুষের মতো ব্যবহার করছে। বুঝতেই দিচ্ছে না এই দীপু ক্রমে জলের রেখার মতো ঘুরে ঘুরে বৃত্ত হয়ে যায়, ক্রমে কেমন লতাপাতা হয়ে যায় এবং ওকে জড়িয়ে বেড়ে উঠতে চায়। সে বলল, তুমি তো জানো দীপু আমি একটু সেকেলে। তোমাদের জেনারেশনকে আমি ঠিক বুঝি না। আর তখনই দীপু বেশ অভিনয় করতে পারছে ভেবে দুষ্টুমিতে চোখ ভরে যায়। মাসির সামনে এমন ব্যবহার, যে এখন মাসির কেসই উল্টো না হয়ে যায়। দীপু মাসির জন্য ভীষণ করুণা বোধ করল।

দীপু গাড়িতে বলল, কেমন দেখলে!

মাসি বলল, ভীষণ আনস্মার্ট।

—তুমি তো আরও। দীপু হেসে দিল। কথা বলতে স্ট্যামারিং করছিলে।

মাসি বলল, বা! তারপর একটু থেমে বলল, কি বলব। ভাবলাম সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা হবে, তা না, কেবল আজেবাজে কথা।

দীপু মনে মনে হেসে ফেলল। ভাবল তা ঠিক। তুমি যে-ভাবে চুরি করে ওঁকে দেখছিলে, কে বলবে আমি না তুমি তাঁর প্রণয়ী।

মাসি বলল, কেমন সাদাসিধে কথা-বার্তা। সাহিত্যিক মানুষের কথাবার্তা এমন হওয়া ঠিক না।

—ওঁর এই স্বভাব।

—লেখা নিয়ে কোন আলোচনাই করল না!

—তোমার প্রশ্নের জবাবে কিছু বলেছে। দীপু এবার ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘোরাল।

—যা বলল, ওতে তো ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না। মাথায় যা আসে লেখে, আর সবাই পড়ে ভেবে সে খুব অবাক হয়ে যায়!

—ওরকম ওঁর কথা বলার রীতি। দীপু বলল।

—ও-ভাবে বললে, মানুষের প্রত্যাশা থাকে না।

—ভালভাবে বললে, তুমি আর উঠতেই না। তিনি সেটা বুঝতে পারেন।

—দীপু, খুব ফাজিল হয়েছিস। মাসি দীপুর দিকে না তাকিয়েই এমন বলল। তারপর ট্রাম, বাস, ইলেকট্রিক তারে কাকের ডানা, রাস্তার আখের ছোবড়া এবং বড় মাঠে সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে ওরা প্ল্যানেটোরিয়াম পার হয়ে কখনও রেড রোড ধরে কখনও রেসের মাঠ বাঁয়ে ফেলে, আবার স্কুলের কখনও, গঙ্গার ধারে, কোন দামী রেস্টুরেন্টে বসে কফি, টোস্ট অথবা স্যান্ড-উইচ কিংবা চিকেন রোল এ-সবের ভিতরও থেকে যায় সেই এক মানুষের কাছাকাছি থাকার ইচ্ছা। দীপু চায় তার মানুষ, সংসারে আত্মীয়ের মতো হয়ে থাক। তবে দীপুর আর কোন কষ্ট থাকবে না। সে যা যা বই চেয়ে এনেছে ওঁর কাছ থেকে, বাড়িতে সবাই পড়ে পড়ে মানুষটাকে খুব চিনে ফেলেছে যেন, ওর ইচ্ছা মা এলে মাকেও সে বলবে, চল না মা ওঁকে দেখে আসি। অথচ দীপু দেখেছে, সেই এক দুখ, কিছুতেই তাকে রাজি করানো যায় না। গেলেই বলবে, দীপু তুমি ভাল হয়ে যাও। তুমি নিরাময় হলে আমি বাঁচি। তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ। তোমার চোখ আমাকে ফাঁকি দিতে পারে না দীপু।

তখন দীপু চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় আমি তো কিছু চাইনি। আমি তো বলিনি, আপনাকে আমার কিছু দিতে হবে। আমি মাঝে মাঝে আসব, বসব, কথা বলব, আবার চলে যাব। না দেখে থাকতে পারি না বলে আসব। না-ভেবে থাকতে পারি না বলে কথা বলব। তারপরই মনে হয়েছে সব মিথ্যে। সে চায় সব চায়। সে মিথ্যে কথা বলেছে, বলেছে, তার জোর নেই বলে। তার দাবী কেউ স্বীকার করবে না বলে, সে তখন ভেবে শান্তি পেতে ভালবাসে, শুধু পাওয়ার ভিতরই আনন্দ নেই, চাওয়ার ভিতরও আছে। তখন দীপুর জোরে জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়। সে নিজের সঙ্গে নিজে সোনার হরিণের খেলা খেলছে। সে তখন ঘরে একা একা পায়চারি করে। সে তার সবচেয়ে সুন্দর দামী সোনালি গাউন শরীরে পরে নেয়। সে চারপাশে রাখে গোলাপের পাপড়ি, সে বাগান থেকে যত তাজা ফুল তুলে আনে, খোঁপায় গুঁজে দেয়, বিছানায় ছড়িয়ে দেয় পাপড়ি, এবং নরম বিছানায় সেইসব পাপড়ি বাতাসে উড়ে বেড়ালে, দীপু তাদের ধরার জন্য হামাগুড়ি দিতে থাকে। তখন জানে না সেই মানুষ,

দীপুর হামাগুড়ির সময়, ওর পাতলা গাউনের ভিতর থেকে নীল জলের নিচে একটা রুপালি মাছ ভেসে বেড়ায়। যেন ঘুরেফিরে, এইসব পাপড়ি সংগ্রহের ভিতর দীপু মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে চায়, গভীরে ডুবে যেতে আমার কি যে ইচ্ছা। তারপর দীপু সবুজ অল্প আলো জেলে রেকর্ড-প্লেয়ারে তাজমহল রাসের, এ টেস্ট অফ হানি আবার কখনও ধীরে ধীরে, যেন পৃথিবীর কেউ শুনতে না পায় সে এবং তার মানুষ কেবল শুনবে, যেমন ট্রি কিংবা লিটল সেলর সঙ্গীত, রিনরিন করে বাজবে, ফোনের রিসিভারটা সেই রেকর্ডের কাছে এনে শোনানোর ইচ্ছা, যেমন সে একদিন ফোন করে বলেছিল, রেকর্ড বাজাচ্ছি। শুনুন। প্রায় এক ঘণ্টার ওপর দীপু ফোনে ওঁকে ওর যাবতীয় প্রিয় রেকর্ডের কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছিল। যদিও এখন দীপু জানে, তাকে সে শোনাতে পারবে না, তবু সে ভেবে নেয়, এইসব সঙ্গীত, অথবা মেলোডি দূরের কোন পাইনের জঙ্গলে, অথবা সমুদ্রের সেই নির্জন দ্বীপে কোন পুরুষের একা একা হেঁটে যাওয়া। সে যেন দেখতে পায় সঙ্গীতের ভিতরই রয়েছে তার মানুষ, দ্বীপে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। তার সেই লেখক, কি একটা সমুদ্রের গল্পে যেন এমন লিখেছিল, মাঝে মাঝে সেই নির্জন দ্বীপে, একজন যুবক একাকী হেঁটে যায়। সে দ্বীপের, পাথরে পাহাড়ে নীল রঙের গাছে, সোনালি লতার স্বপ্ন দেখে। অসংখ্য কচ্ছপ আর জোয়ারের সময় উড়ুক্কু মাছ সংগ্রহ করে আনে সে। দীপুর মনে হয় তখন সে আর কেউ নেই। তার লেখক। দীপুর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, তেমন কোন নির্জন দ্বীপে এই মানুষকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। সেখানে সে হ্রদের জল এনে রান্না করবে, মানুষটা যাবে সমুদ্রে, পিঠে তার বড় বোঝা, নানারকমের মাছ, কচ্ছপের ডিম, কাঁকড়া সে সংগ্রহ করে আনছে। মানুষটার দ্বীপে থাকতে থাকতে লম্বা দাড়ি হয়ে গেছে, চুল বড় হয়ে গেছে, পায়ের নোখ বড় হয়ে গেছে। আর সমুদ্রের কি যে মায়াবী আবহাওয়া, দীপু দেখতে পায়, মানুষটা ভীষণ উঁচু লম্বা, নীল রঙের দাড়ি, আর লাবণ্যময় শরীর, যেন মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো পবিত্রতা সারা শরীরে। দীপুর তখন ভীষণ কান্না পায়। সে তার কাছে থাকে না।

দীপুর কি যে হয়ে যায় তখন। অল্প আলো অন্ধকারে চোখ বুজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। রেকর্ডে বাংলা গান, এমন ধরণী আলোকে এত যে আঁধার। সে লম্বা গাউনের ভিতর শুয়ে আছে। লম্বা সিল্কের নাইটি, তার ভিতর মনে হয় মোমের পুতুলের মতো তার শরীর, ঘন চুল সাদা বুকে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে, হাতের ভাঁজে সে চোখ ঢেকে রেখেছে। যেন এই অন্ধকারের ভিতর সে বুঝতে পারছে শরীরে ভীষণ হাহাকার, এবং এক অন্ধকার থেকে একটা হাত, ক্রমে লম্বা হতে হতে, লোমশ হাত চোখের ওপরে সাপের মতো দুলে দুলে নাচছে। দীপুর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, সেই হাত আর কারো নয়, সেই অধ্যাপকের। দীপু কেমন দুচোখ ঢেকে বলল, না, আমি পারব না, আর পারব না। আমি একজনকে ভীষণ ভালবাসি। আমি তাকে ভেবে ভেবে মরে যাব। কখনও আর আপনার কাছে আমি যেতে পারব না।

দীপু বুঝতে পারল এ-ভাবে শুয়ে থাকলে তার ঘুম আসবে না। সেই হাতটা সাপের মতো সারাক্ষণ দুলবে। এবং এ-ভাবে বুঝি এক ভয়ঙ্কর গোলকের ভিতর ফেলে কেউ তাকে নিয়ে যাবে। সে উঠে পড়ল। নাইটির সঙ্গে কিছু ফুলের পাপড়ি লেগে আছে। গালে হাতে নরম পাপড়ি, সে উঠে যাবার সময় ওরা উড়ে উড়ে মেঝেতে পড়ে গেল। বাথরুমে ঢুকে সে ভাল করে গলায় মুখে ঘাড়ে জল দিল। ওর যে এখন কি স্বভাব হয়ে গেছে, মাথার কাছে রিনরিন করে রেকর্ড না বাজলে ঘুম আসে না। ঘরে সামান্য সবুজ অন্ধকার রেখে সে এ-ভাবে রেকর্ড শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর দীপু যখন চোখ মুখ ধুয়ে ফিরে এল খাটে, সে দেখল, কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। নক্ষত্র, এবং নীল রং মিলে আকাশে এক সুন্দর বর্ণমালা। আর কি বিরাট, কি কাব্যময়, সুষমায় ভরা চারপাশ, এমনকি ট্রামের শব্দ, বাসের শব্দ এখানে আসে না। জানালায় এ-ভাবে যখন আকাশে চাঁদ এবং জ্যোৎস্নায় বর্ণমালা, যখন দীপু কাত হয়ে শুয়ে আছে, তার শরীরে সাদা জ্যোৎস্না ক্রমে লম্বা হয়ে নেমে আসছে তখন সে কেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। সে এক জায়গায় হেরে যাচ্ছে। ওর মনে হল, হেরে গেলে, এমন জ্যোৎস্নার বর্ণমালা দেখার অধিকার তার নেই। সে পাশ ফিরে শুল। পেছনে আকাশ নক্ষত্র আর জ্যোৎস্নার সেই এক রঙিন বর্ণমালা। সে হাউ হাউ করে বালিশে মুখ ঢেকে, যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে সে সেই কান্না রোধ করবার জন্য কেবল পাগলের মতো মুখ ঘসছে। সে কাঁদবে না, কিছুতেই কাঁদবে না। কেঁদে নিজেকে আর অসম্মান করবে না।

তখন সুমিতা ওর পাশে বসে, কারণ সুমিতা লক্ষ্য করছে দিন দিন তার মানুষ কেমন চুপচাপ, কেমন দূরে সরে যাবার মতো, তার ভয় ধরে যায় সে কতভাবে যে তাকে আরোগ্যলাভের কথা বলে থাকে, যেমন সে মিত্র এলেই নীনাকে পাঠিয়ে দেয় কাছে। নীনার কাছে মানুষটার সব অহঙ্কার একেবারে ভাসিয়ে যায়, অথবা তাতার এবং ক্লান্ত হলে যখন সবই ঘুমিয়ে পড়ে তখন ওর মাথার চুলের গভীরে সুমিতা হাত ডুবিয়ে দিলে কেমন এক সুন্দর গান ভেসে আসে গলায়। কারণ তখন তার জানালাতেই সেই সাদা জ্যোৎস্না। সুমিতা গুনগুন করে গায়, আর গাইতে গাইতে তার গলা ভারি হয়ে যায়—

সে শুনল, সুমিতা গাইছে—

এ-পথে আমি-যে গেছি বার বার
ভুলি নি তো একদিনও।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার,
উঠিল বনের তৃণ।।
তবে মনে মনে জানি নাই ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়—
চিনিব তোমায় আসিবে সময়,
তুমি যে আমায় চিন।

(১২)

রাতে দীপু স্বপ্ন দেখল। সুমিতা স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্ন দেখল।

দীপু দেখল, সেই কালো হাতটা সারারাত তাকে পেছন থেকে তাড়া করেছে। সে গাড়ি করে যাচ্ছে, দেখছে হাতটা জানালার গলে পড়েছে, সে নদীর পাড়ে গেছে, দেখেছে হাতটা দূরে নদীর জলে শয়তানের মতো তুলে রেখেছে। সে ভয়ে ফের ঘরে ফিরে এলে দেখেছে, দেয়ালের ফুটো দিয়ে হাতটা গলে পড়েছে। সে যেখানে গেছে, যতদূরে, কখনও মাঠের ওপর দিয়ে ছোটার সময় দেখেছে, হাতটা একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ, কালো, কি ভীষণ চোখ, লাল, ছুটে আসছে, সে ছুটতে ছুটতে কখনও পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, তারপর কেমন এক শান্ত সমুদ্র, বালিয়াড়ি এবং একজন মানুষ, সমস্ত শরীরে আলখাল্লার মতো পোশাক, চুল বড় বড়। সে সামনে হেঁটে যাচ্ছে। দীপু চিৎকার করে উঠেছিল, হে মহীয়ান, পেছনে কি আসছে দেখুন। এখন সেই মহীয়ান হেঁটে যাচ্ছে। একবার তাকাল না। বলল, এস দীপু। বালিয়াড়িতে সাপ আসতে পারে না। আর দীপু তখন দেখেছিল—সত্যি কিছু নেই। সুন্দর নীল রঙের আকাশ, সামনে সমুদ্রে নীল নির্জনতা, সাদা বালিয়াড়ি আর ধূসর সন্ধ্যায়, ও-পাশের পাহাড়ে কেমন ছোট একটা কুঠিবাড়ি। মহীয়ান মানুষটি তাকে নিয়ে কুঠিবাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, কেবল যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সমুদ্রের নিচে বসে কেউ যেন তখন অদ্ভুত এক সঙ্গীত ক্রমাগত বাজিয়ে চলেছে। দীপু আর তিনি ক্রমে হেঁটে যেতে যেতে কেমন এক বিস্ময়কর আলোকের ভিতর মিলিয়ে গেল।

সুমিতা এমন যে কেন একটা স্বপ্ন দেখল! সে আর সুমিতা কোথাও বেড়াতে গেছে। জায়গাটা পাহাড়ী জায়গা, একেবারে উঁচুতে ডাকবাংলা। নিচে নানাবর্ণের গাছ। নানাবর্ণের ফুল। কেমন সুন্দর। সে আর সুমিতা। কেউ নেই। নিচে রাস্তা। অনেক দূর দিগন্তের দিকে মিশে গেছে। এবং সুমিতা দেখছে একটা সাদা রঙের গাড়ি, গাড়িতে কে বসে আছে দেখা যায় না, বার বার চড়াই পার হতে চাইছে, পারছে না, গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। গিয়ার ঠিক কাজ করছে না। গাড়িটা যেন ঠিক ডাকবাংলোর উঁচু [illegible] এমন কি [illegible] হয়, সেই কত [illegible] পার হয়ে যায়, একটা

গাড়ি উঠে আসতে চায়, পারে না, স্লিপ করছে কেবল। সুস্মিতার কেন জানি গাড়ি এবং তার আরোহীর জন্য ভীষণ মায়া হয়েছিল। সুস্মিতা ভাবল, লোকজন ডেকে সে যদি কিছু করতে পারে। এবং সুস্মিতা যখন লোকজন ডেকে কাছে গেল, আশ্চর্য এক কুয়াশা চারপাশে। সামনে পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেমন সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকছে, শুনছো, আমি এখানে। শুনতে পাচ্ছ আমি এখানে। তারপর সে জেগে গেলে দেখেছিল, ভীষণ ঘামছে।

সে দেখেছিল, একেবারে অন্যরকমের স্বপ্ন। বোধহয় ওটা একটা ফুলের উপত্যকা। ওর সঙ্গে কেউ আছে। কখনও মনে হয়েছে সুস্মিতা, কখনও মনে হয়েছে দীপু। সুন্দর সুন্দর সব ফুল, তাজা এবং সে ফুলের উপত্যকায় কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। এত ফুল, এত রকমের ফুল, সে কোনটা তুলবে ভাবতে পারছে না। তবু কথা আছে সে ফেরার সময় একটামাত্র ফুল নিতে পারবে। কিন্তু তার যে সব ফুল ভাল লাগছে। সে হেঁটে হেঁটে একটা কুন্দ ফুলের গাছ আবিষ্কার করল। তারপর মনে হল, শুধু রজনী-গন্ধার চাষ। সামনে যতদূর দেখা যাচ্ছে কেবল রজনীগন্ধা আবার কখনও গোলাপ মনে হচ্ছে, পাশে ছিমছাম মেয়ে সুস্মিতা। সুস্মিতা মাঝে মাঝে বলছে, তুমি কি খাচ্ছ! এমন কথায় সে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে বলছে, কৈ না তো! তারপর সে রুমালে দেখল একটা পাপড়ি লাল রঙের। যেন ওর মুখে এঁটো লেগে থাকার মতো ফুলের পাপড়ি। সে অবাক! আর মনে হল, সে এতক্ষণ সুস্মিতাকে লুকিয়ে যেখানে যত তাজা ফুল পেয়েছে তুলে নিয়েছে। সে চুরি করে তাজা ফুলের পাপড়ি কচ কচ করে খাচ্ছে। খেতে কি অপূর্ব। সুস্মিতা অবাক হয়ে বলছে, ঠিক কিছু খাচ্ছ। তুমি মুখ ফিরিয়ে খাচ্ছ। সে বলছে, না আমি কিছু খাচ্ছি না, আসলে সে এই ফুলের উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুস্মিতা চেষ্টা করছে বার বার, সুস্মিতা যখনই ফুল দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে তখন সে ফুলের পাপড়ি খেয়ে যাচ্ছে, ফুল খেয়ে যাচ্ছে, সে পকেটে হাত দিলেই ফুল, সে পরে আছে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি, আর পায়ে নাগরা, সে যেন তখন ফুলের উপত্যকাতে নাচতে আরম্ভ করবে, এবং ফুলের পাপড়ি খেলেই সুস্মিতা বলছে, আবার চুরি করে খাচ্ছ। সে কেবল ছেলেমানুষের মতো হাঁ করে দেখাচ্ছে কৈ দ্যাখো, খাচ্ছি না। আমি খুব ভালমানুষ। সুস্মিতা ওকে বসিয়ে ঝুঁকে মুখের ভেতরটা দেখছে—সাত নম্বর দাঁতের ফাঁকে লাল কণার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। সুস্মিতা একটা কাঁটা দিয়ে লাল কণা বের করতে গিয়ে দেখল, রাশি রাশি ফুল, ফুলের মালা, সুস্মিতা একটা দড়ির মতো টেনে টেনে বের করছে দাঁতের গোড়া থেকে ফুলের মালা, আর দেখল যে সেই মালা পাহাড় হয়ে যাচ্ছে, তার চারপাশে সুস্মিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁজছে তাকে, আসলে তখন সে অন্যদিকে একটা মঞ্চে নেচে যাচ্ছে হাজার হাজার লোক, তার হাতের লাঠি তখন বেহালা, এবং ফুলের পাপড়ি সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বেহালা বাজিয়ে সে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এমন একটা ছবি সে কোথায় দেখেছে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাওয়ার অভ্যাস সব মানুষের থাকে। কে যেন এমন একটা বোর্ড টাঙিয়ে দিলেই সাঙ্গ হল খেলা।

সুস্মিতা তখন ওকে ডাকল। বলল, কি বাজে একটা স্বপ্ন দেখলাম!

সে বলল, ঘুমোও। ওর এমন সুন্দর স্বপ্নটা সুস্মিতা ভেঙে দিল।

এবং সেদিনই সে অফিসে ফোন পেল। দীপু ফোন করছে, এই!

—দীপু?

—কি করছেন!

—কাজ।

—কাজ! আপনি কাজের লোক সে আমি জানি। আমার ভাল লাগছে না আর!

—কি করব?

—চলে আসুন না!

—এখন! তোমার কি মাথা খারাপ। বাড়ির লোক কি ভাববে?

—এই!

—বল।

—কেউ নেই। সকালে মাসি মেসো হুগলি গেছে। আমাকে যেতে বলেছিল, বললাম—যাব না। আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না। আসুন না। ভীষণ সারপ্রাইজ পাবেন।

—পাড়ার লোক মারতে আসুক।

—লক্ষ্মী সোনা, কেউ আসবে না।

সে বলল, লক্ষ্মী সোনা তুমি ঘুমোও।

—অনেক কথা ছিল।

সে বুঝি তখন জানে না, তার মুখে রক্তচাপ, হাত কাঁপছে, শরীরের ভিতর সব কীটপতঙ্গেরা একসঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো ডাকছে। সে চিৎকার করে বলল, দীপু কাল সারারাত একটা স্বপ্ন দেখেছি।

—কি স্বপ্ন!

—সারারাত ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি।

—তবে! দীপু ওর স্বপ্নের কথা বলল না।

সে বলল, তুমি নষ্ট হয়ে যাবে দীপু।

দীপু বলল, স্বপ্নে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খেতে পারেন, জেগে বুঝি পারেন না।

সে ভীষণ শক্ত গলায়, অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বলল, না পারি না।

দীপু তারপরই ফোন কেটে দিয়েছিল। এবং পরদিন সে আবার ফোন পেল। দীপু বলল, শুয়ে আছি। জ্বর। একটা ভীষণ বাজে কাজ করে ফেলেছি। খুব ভয় লাগছে এখন। কেন যে আপনার ওপর রাগ করে এ-সব করতে গেলাম। কি যে হবে —না এলে বলতে পারব না। ফোনে এ-সব বলা যায় না।

সে আর বলল না, কে আছে বাড়িতে। সে বলল, যাচ্ছি। এক্ষুনি যাচ্ছি। দীপু কি এমন বিপদ ঘটিয়েছে! ওর মুখটা কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। মেয়েটা ভীষণ হতচ্ছাড়া, একবার মনে হচ্ছে, ওকে বুঝিয়ে বলবে, এ-ভাবে দীপু কেন তুমি পচে যাচ্ছো। কত সুন্দর পৃথিবী তোমার সামনে রয়েছে। যেতে যেতে ট্যাকসিতে ভাবল, দীপু কি অভিমানে কিছু করে ফেলেছে। দীপু কি ওর ওপর এভাবে কোন প্রতিশোধ নিতে চায়। সে যখন গেল, বুড়ো মানুষটা বলল, দীপু দিদিমণি ওপরে। আর সিঁড়ির মুখে দেখল, বিরাট সেই ভয়ংকর কুকুরটা দোতলার সিঁড়ির মুখে। শেকল ধরে দীপু দাঁড়িয়ে আছে। দীপুর চুল ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো। সে একটা ম্যাকসি পরে আছে। একেবারে পা পর্যন্ত হালকা সিল্কের ম্যাকসি। দীপুর এরকম চেহারা সে কোনদিন দেখে নি। দীপুকে কেন জানি আগের সেই দীপু মনে হল না, বিনীত নয়। বরং উদ্ধত। দীপুকে দেখে আজ ছেলেমানুষের মতো সে হাসতে পারল না। তার চোখমুখ কেমন শক্ত। দীপু তাকে দেখেই লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে। তারপর হাত ধরে ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। দীপুর ঘরটা শেষদিকে। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, গোলাপী রঙের কার্পেট, সেসব মাড়িয়ে সে দেখতে পেল ডানদিকে বারান্দা, সোজা দক্ষিণে চলে গেছে, বারান্দায় এবং দেয়ালে নানারকমের ছবি, কোনটা জলরংয়ের, কোনটা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে ওর মাসি এনেছে, আর মুখোশ, রাম রাবণের মুখোশ থামে গোঁজা। এবং কোন আদিবাসী রমণী হেঁটে যাচ্ছে ছবিতে। দীপুর মাসির রুচি আছে। দীপুর ঘরে এসে সে আরও অবাক। ওর খাটের নিচে বড় আয়না, ড্রেসিংরুম টেবিল মেহগনি কাঠের, আর মানিপ্ল্যান্ট সবুজ রঙের, জানালার পাশে সব মানিপ্ল্যান্ট, তার পাতা কেমন দীপুর নিঃসঙ্গতার কথা বলছে। আর দীপু এক এক করে সে তার সব কিছু দেখাবে বলে যেন ঠিক করছে। এবং এমন ভাবলেই ওর জ্বর আসছে যেন। সে কেমন সরল বালকের মতো বসে রয়েছে। যেন কথা আছে, দীপু যা যা বলবে, সব সে না বুঝে করে যাবে। ওর এতে দোষ নেই।

দীপু খাটে বসে বলল, আমাদের বাড়িতে লোকজন কম। মাসি তো দু দণ্ড বাড়ি থাকতে চায় না। আপনি এসেছিলেন, অথচ মাসির সঙ্গে দেখা হল না, খুব খারাপ লাগে।

—তোমার জ্বর হল কেন হঠাৎ।
—কিছু হয়নি।

—বললে ভীষণ একটা কাজ করে ফেলেছি। কি সেটা?

দীপু ভীষণ দুঃখী মুখ করে ফেলল। সে মাথা নিচু করে বলল, কাল আপনি এলেন না কেন? কাল এলে আমি পাগলের মতো এসব করতাম না।

—কি করেছ?
—খারাপ কাজ।
—খারাপ কাজ করতে গেলে কেন?

—পারলাম না। একটা কালো হাত শেষপর্যন্ত আমাকে গিলে ফেলল।
—তার মানে?

—কাল থাকতে না পেরে সেই ধূর্ত মানুষটার কাছে গেলাম। ওকে আপনার ডামি হিসেবে ব্যবহার করলাম।

—দীপু কি বলছ। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।
—না।
—দীপু আর যাবে না।

—আবার যাব। থাকতে না পারলেই যাব। আপনি কিছু করতে পারবেন না।

সে উঠে দীপুর কাছে ছুটে গেল।—কি বললে।

—আপনি কিছু করতে পারবেন না।
—এভাবে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে।

—আমি মরে যাব। দীপু খুব ভীরু গলায় বলল।

সে এবার শাসনের গলায় বলল, গেলে এবার মারব।

—মারুন তো। মারুন। বলেই ভীষণ অহংকারের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, মারবেন!

—দীপু। সে কেমন ঠাস ঠাস করে চড় মেরে দিল গালে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে এক দণ্ড দাঁড়াল না। জোরে এগোচ্ছে, নেমে গেল। একবার তাকাল না বাড়িটার দিকে। সে আর অফিসে গেল না। ট্যাক্সিতে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াল। তারপরে সন্ধ্যার দিকে মাঠে হেঁটে গেল। সে একা। সে এখানে দীপুকে নিয়ে কতবার এসেছে। সে এভাবে একসময় নদীর পাড়ে চলে এল। ভীষণ ভিড়। যেখানে যাচ্ছে ভিড়। সে একটু একা থাকতে চায়। সে একজন মাঝিকে ডেকে বলল, এই মাঝগাঙ্গায় নিয়ে যাবে। এবং সে একা, মাঝ-গাঙ্গায় বসে নদীর জলের শব্দ শুনতে লাগল। সে এটা কি করে ফেলল। দীপুকে সে মেরেছে। দীপু তার কে। কেন সে এটা করতে গেল। দীপু নষ্ট হয়ে গেলে তার কি।

তারপর সে চুপচাপ বসে থাকল। মাথা গুঁজে বসে থাকল।। এবং চারপাশে কি সব সমারোহ, উজ্জ্বল আলো কলকারখানার, কোনো জাহাজের ডাইনিং হলে ব্যান্ড বাজছে নীল আকাশ, কিছু নক্ষত্র এবং ঘরে নীনা তাতার সুমিতা। সে ফিরে না গেলে, ওরা ঘুমোতে যাবে না। এখন কি যে হয়েছে, সে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত নীনাও ঘুমোয় না। সমস্ত সংসারে কেমন চাপা বিষণ্ণতা। সে আর দেরি করল না। তার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। কেবল সুমিতাকে বলল, খাবনা সুমিতা। শরীরটা ভাল নেই।

সুমিতা বলল, তোমাকে এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন?

সে বলল, আমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে?

—আয়নার দ্যাখো। খুনটুন করলে এমন দেখায়। তুমি কিছু করনি তো!

—কি আজেবাজে বকছ!

—হ্যাঁ। চোখ ঘোলা ঘোলা। স্থির। আমার ভীষণ ভয় করছে।

সে বলল, তোমরা এমন করলে বাড়ি থেকে চলে যাব। এবং যখন নীনা এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, তখন কেউ কথা বলল না, ওর চোখ ছলছল করে উঠছে। সে ভাবল, কাল সে দীপুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। না হলে সে শান্তি পাবে না। সে নীনাকে বলল, মা তোরা আমাদের বড় কষ্ট দিস। নীনা কিছু বুঝতে না পেরে বাবার পেটের কাছে মুখ লুকিয়ে ফেলল, বাবা রবিবারে আমরা চিড়িয়াখানায় যাব। তুমি নিয়ে যাবে?

সে ওকে বুকে তুলে নিল। এবং চুমো খেল। বলল, যাব না, যাব, তোরা যেতে বললে না গিয়ে পারি।

(১০)

পরদিন সে বসেছিল অফিসে। দুবার দীপুকে ফোন করেছে। দুবারই অনবরত ফোন বেজেছে। কেউ ধরেনি। সে যতদূর জানে ফোন দীপুর ঘরের কাছাকাছি থাকে। দীপু ফোনটা হাত বাড়ালেই নাগাল পায়। এই অসময়ে দীপু কোথায় যাবে। তাছাড়া ওর মাসি, এবং রান্নার মেয়েটা—কেউ ফোন ধরছে না দেখে সে কেমন অবাক হল।

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে বলল, ক'জন লোক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা সবাই মিলে দেখা করতে চান।

সে বলল, আসতে বল।

ওরা এলে দেখল বেশ সুট কোট পরা তিনজন ভদ্রলোক। সে ওদের জীবনেও দেখেনি। জীবনে সবাইকে দেখেছে, আর ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে অবশ্য এমন কখনও হয় না। সে ওদের সামনের চেয়ারে বসতে বলে, কেমন নিজের মতো কাজ করে গেল। আসলে সে যখন কিছু দেখে ঘাবড়ে যায়, এমন করে থাকে। কি বলবে, বুঝতে পারে না। তার কাছে সিনেমার কোন লোকজন আসতে পারে। কিন্তু তারা ফোন করে আসে। এভাবে এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কেউ আসে না। সে নিজে কেমন বিচলিত বোধ করল। এবং মনে হল কাল সে দীপুকে যে মেরেছে, দীপু এসব তার মেসোকে বলতে পারে। আর তখনই দেখল মাঝখানে যিনি বসে রয়েছেন, একেবারে দীপুর মুখের মতো গড়ন। দীপুর মুখের মতো গড়ন দেখেই ওর কেমন ভয় ধরে গেল।

তখন ঠিক ডানদিকের মানুষটি ওকে ভীষণভাবে দেখছে। সে সহজভাবে বলার চেষ্টা করল। বলুন আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি।

ডানদিকের মানুষটি বলল, আমার নাম রমানন্দ ঘোষ, এঁর নাম সমর ঘোষ, দীপুর বাবা। এঁর নাম মনোজিত সরকার। দীপুর মামাতো ভাই।

সে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। কারণ সে এভাবে অনেকদিন থেকে ভয়ে ভয়ে ছিল, দীপুর বাবা অথবা আত্মীয়স্বজন এসে ওকে শাসিয়ে যাবে। আপনি মশাই নামী মানুষ, আর নামী মানুষের এই কাণ্ড। একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে প্রেম!

সে ফের খুব সহজ হবার মতো বলল, ঠাণ্ডা খাবেন, না গরম।

—কিছু না।

—দীপুকে দুবার ফোন করেও পেলাম না। বাড়িতে কি কেউ নেই। এবং এভাবে সেও যেন দীপুর আত্মীয়ের মতো কেউ—দীপু এমন কি বলবে! দীপু কি কখনও বলতে পারে, কাল তিনি এসেছিলেন, তিনি আমাকে অসম্মান করেছেন, যদি হয়ে থাকে সে তো সে দীপুর ভালোর জন্যে করেছে।

দীপুর মামাতো ভাই প্রথম বলল, আপনি দীপুকে চিঠি দিতেন।

সে বলল, একথা কেন বলছেন?

—দিতেন কিনা বলুন।

সে বলল, দিতাম।

—এটা কি উচিত হয়েছে?

—কেন দীপুতো বলেছে সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সে তো যথেষ্ট বড়। যাকে লিখছি তার যদি আপত্তি না থাকে...

—আপনি চিঠি লিখে ওর মাথাটি খেয়েছেন।

সে বলল, থাক সে-সব কথা, তারপর কি আছে বলুন।

মামাতো ভাইটি বলল, আপনাকে আমরা ছাড়ব না।

সে কেমন সহসা আর কথা বলতে পারল না। এমন অস্বস্তির ভিতর সে কখনও পড়েনি। সে বলল, কি করবেন না ছেড়ে?

—জেলে দেব।

দীপুর বাবা বলল, দীপু নার্সিং হোমে।

—দীপুর কি হয়েছে?

—দীপু বেশি ঘুমের বড়ি খেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। সে অসহায় দীপু ঘুমের বড়ি বেশি কেন খেতে গেল। কিন্তু দীপু নার্সিং

হোমে শুয়ে আছে। দীপু কেমন আছে! সে বলল, দীপু কেমন আছে?

—আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে ডাক্তার কিছু বলতে পারবে না।

কিন্তু দীপুকে যে তার অনেক কথা বলার ছিল। সে বলল, দীপুর কাছে আপনারা গেছিলেন।

—সেখান থেকেই এলাম।

—দীপু আমার কথা কিছু বলেনি আমাকে নিয়ে যেতে বলেনি।

ওরা তিনজনই দুঃখের সঙ্গে হাসল। যে শুয়ে আছে চোখ বুজে, মুখে লালা কাটছে যে আদৌ হয়তো বাঁচবে না, মানুষটা কেমন আহাম্মকের মতো তার সম্পর্কে কথা বলছে। দীপুর বাবা খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, আপনি এমন করতে গেলেন কেন?

—আমি কি করেছি?

—ওকে চিঠি লিখেছেন।

—দীপু যে আমাকে চিঠি লিখতে বলত।

—ও লিখতে বললেই লিখবেন!

—কেন লিখব না। আপনি লিখতেন না। আপনার জীবনে এমন ঘটলে আপনি লিখতেন না।

এবং এভাবে এ সব সরল অকপট কথা শুনে ওরা কেউ কিছু বলতে পারল না। সে বলল, নার্সিং হোমের ঠিকানাটা দেবেন প্লিজ।

দীপুর মামাতো ভাই বলল, কাল আপনি দীপুর কাছে গিয়েছিলেন।

—গেছিলাম।

—দীপুকে আপনি নিশ্চয়ই কোন অসম্মান করেছেন।

—তা করেছি। ওকে মেরেছিলাম।

—আপনি ওকে মারার কে! আপনি আমার পরই মহিম বলল, দীপু সারা বিকেল কেঁদেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। পিসি আসার আগে চোখ মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আপনি অসম্মান না করলে কাঁদত না। দীপুর মামাতো ভাইটির কিছু রুক্ষতা আছে।

সে এবার একটু দৃঢ় হতে চাইল। সে বলল, আস্তে বলুন। এটা অফিস। দশটা লোক বাইরে বসে থাকে। কলঙ্ক আমার চেয়ে আপনাদের বেশী। আমি এখন কোন কথা বলব না। দীপুকে দেখতে যাব। জোরে বললে লোকে শুনতে পায়। ওদের কান আছে।

দীপুর বাবার গলারও কেমন রুক্ষতা বেজে উঠল। —আপনি ওকে মারতে গেলেন কেন!

—সেটা আমি নিজেও ভেবেছি। ওটা করা আমার ঠিক হয় নি। আমি রাগ সামলাতে পারি নি। ভয় নেই, পুলিশ এলেও আমি স্বীকার করব। চলুন, দীপুকে দেখতে যাব। এবং সে আর কোন আবেগ দেখাল না। ভিতরে ভিতরে সে দীপুর অসহায় মুখ দেখার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে, কথাবার্তায় এতটুকু সে বুঝতে দিচ্ছে না। কেন যে সে এমন করে ফেলল, অজস্র এই কেন তাকে যে ভিতরে কুরে কুরে খাচ্ছে সে বুঝতে দিচ্ছে না। সে বলল, চলুন।

মামাতো ভাইটি বলল, কি, মেরেছেন কেন বলুন!

সে এবার হাসল। বলল, সব কথা আপনাদের বলা যাবেই না, ওর বাবাকেও বলা যায় না। বললে দীপুকে ভীষণ ছোট করা হবে।

ওদের ভিতর তখন পুলিশের কথা-বার্তা, যেন পুলিশে খবর দিয়ে দেওয়া হবে, ঘটনা এক বিকেলের, এবং এক লেখকের কথা থাকবে, লেখকের লোভের স্বীকার, এ-সব কথাবার্তায় সে বুঝতে পারে, ওরা তাকে ভীষণ একটা অস্বস্তি-কর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। কেবল সে জানে, দীপু ভাল হয়ে উঠলে, কেউ তার কিছু করতে পারবে না। এবং এমন একটা কেলেঙ্কারী দীপু শেষ পর্যন্ত করবে, সে ভাবতে পারে নি। দীপু তুমি একটা দিন দেরী করতে পারলে না!

সে বলল, আপনারা আমাকে নিয়ে যাবেন না! ঠিকানাও দেবেন না জানি! কিন্তু আমি খুঁজে বের করবই। আসলে সে ওদের এই বলে শাসিয়ে দিতে চাইল, আমি সব কিছু সহ্য করব, কিন্তু দীপুর কোন অনিষ্ট হোক সহ্য করব না।

সে এবার বলল, পুলিশে রিপোর্ট করেছেন।

—করতে হবে।

—এখন করবেন না। করতে হবেও না। বলেই সে বুঝতে পারল সবটাই নিজের পক্ষে হয়ে যাচ্ছে। সে কিছুটা বোকামি করে ফেলে বুঝতে পারে। তার ইচ্ছা হল জানার, দীপু ওর সম্পর্কে কিছু বলেছে কিনা, চিঠিগুলো হয়তো দীপুর বাক্স থেকে পেয়েছে। দীপু খুব যত্ন করে চিঠিগুলো রাখত। এবং একটা চিঠির ভাঁজে একটা বড় লাল শুকনো গোলাপ সে রেখে দিত। সে আবার বলল, দীপু বেঁচে যাবে তো।

দীপুর বাবা বোধ হয় ওর কথাবার্তা থেকে আঁচ করতে পারছে এই মানুষের দীপুর প্রতি আন্তরিকতা ভীষণ। এবং এতক্ষণ এত কথায়ও মানুষটা খুব রাগ করে নি। ওর কেমন মনে হল, না, একে এভাবে জব্দ করা ঠিক হচ্ছে না। সে বলল, দীপু আপনাকে কি লিখত?

—আপনি নাই বা জানলেন। এটা আমার আর দীপুর ভীষণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইচ্ছা করলে আপনাকে দেখাতে পারি। আপনি ভীষণ কষ্ট পাবেন। আর এগুলো তো এখানে নেই। বাড়িতে। পুলিশ বললে অবশ্য না দিয়ে পারা যাবে না। আমার চেয়ে বেশি দীপুর অসম্মান হবে। এবং এটা আপনার চেয়ে আমার কম দুঃখের নয়।

দীপুর বাবা বলল, বেলভিউর পাঁচ-তলায়। সুট নাম্বার বি। আমার ডাক্তার বন্ধু সেখানে আছে। সেই সব রিস্ক নিয়ে করছে। পুলিশে রিপোর্ট করি নি। এলেও বেশি হাঙ্গামা হবে না, আমাদের লোক আছে। দীপুর বাবা কেমন সাধারণ-ভাবে বলে গেল। মনেই হয় না কথাবার্তায় তার একমাত্র সন্তান এখন নার্সিং হোমে, এবং সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। দীপুর বাবা তাকে কেমন খুব কাছাকাছি মানুষ ভেবে নিয়েছে।

সে বলল, এখন যাবেন!

দীপুর বাবা বলল, এখন গেলে দেখতে দেবে না। সাড়ে পাঁচটায় পারা।

সে বলল, বেলভিউ কোথায়!

এত বড় একটা নার্সিং হোমের নাম সে জানে না দেখে ওরা অবাক। দীপুর বাবা বলল, লাউডন স্ট্রীটে। শেকসপিয়ার সরণীতে ঢুকে কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে।

দীপুর মামাতো ভাই বলল, বরং আপনাকে আমিই নিয়ে যাব। পাঁচটায় ঠিক হয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে তুলে নেব।

সে বুঝতে পারে কত সহজে মানুষ নিজের হয়ে যায়, তার কথাবার্তায় সব সময় এমন কিছু থাকে, সে এটা দেখেছে, সে সোজাসুজি ভাবতে ভালবাসে। এবং সে জানে অকপট হলে সাময়িক কষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু পরে কোন জ্বালা থাকে না। যেন মুহূর্তে সব বিদ্বেষ কেটে গেল। এবং এভাবে সে কেবল ভাবছে দীপু যেন ভাল হয়ে যায়। দীপু ভাল হয়ে গেলেই ওর বাবার সঙ্গে পরামর্শ আছে দীপু সম্পর্কে। এবং মনে হয় এখন সে বেশি সাহস নিয়ে এগুতে পারবে। দীপুকে কেন সে মেরেছিল, বোধ হয় দীপুর বাবা আঁচ করতে পেরেছে। এবং এজন্য সে শেষপর্যন্ত দীপুর ঠিকানা দিয়ে গেল। ওরা দেখতে এসেছিল, মানুষ হিসেবে সে কতটা ঠিক। আসলে সব মানুষই ফুল ছিঁড়ে খেতে ভাল-বাসে। সেও তা চায়। কিন্তু অহমিকায় সে পারে না। দীপুর কাছে হেরে যাবে বলে সে ফুল ছিঁড়ে খেতে পারে না। ফুল ছিঁড়ে গেলে সেও একদিন সেই ধূর্ত অধ্যাপকের মতো ডামি হয়ে যাবে দীপুর। সে কিছুতেই তা চায় না। সে খুব, খুব বড় থাকতে চায় দীপুর কাছে।

(১৪)

দীপুর মামাতো ভাই বেশ দেখতে ভাল। চুল বড় করে রাখা স্বভাব, হাতি ঘোড়া হরিণের ছবি আঁকা জামা গায়। দীপুদের পরিবারে সে দেখেছে প্রায় সবাই

দেখতে ভাল। রঙ উজ্জ্বল। গত রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। আজও আকাশ মেঘলা। গাড়ীতে বসে সে এভাবে ভাবছিল। চুল কোঁকড়ানো, কুচকুচে কালো। দীপুর জন্য সে এমন একজন সুন্দর ছেলে খুঁজছে। বুকটা কেমন তখন কষ্টে ভরে যায়। চোখে মুখে তার বিষণ্ণতা ঝুলে থাকে।

গাড়ীতে সে আর দীপুর দাদা।

দীপুর দাদা বলল, আপনার লেখা আমারও ভাল লাগে। তখন মাথাটা ঠিক ছিল না। খুব বাজে কথা বলেছি। এখন খুব খারাপ লাগছে।

সে বলল, এমন একটা ঘটনায় মাথা ঠিক থাকার কথা না। সে একটু থেমে বলল, দীপুর সেন্স ফিরেছে?

—না। সেন্স ফিরলে তো হয়েই গেল। এখন অক্সিজেন সেলাইন এ-সব দেওয়া হচ্ছে।

সে ভাবল, তবে দীপুর অবস্থা খুবই খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। কথা বলতে ভাল লাগল না। আকাশে সামান্য মেঘ বাতাসে উড়িয়ে নিচ্ছে। দীপুর দাদা বেশ জোরে গাড়ী চালাচ্ছে।

এমনকি সে চারপাশের মানুষজন, ট্রাম-বাস, গড়ের মাঠ কিছুই দেখছে না। এমন সামান্য ঘটনায় এত সহজে মেয়েটা মরে যাবার জন্য যেন বাজি রেখে জীবনের সঙ্গে খেলা, কত তুচ্ছ ভেবে ফেলেছে এভাবে বেঁচে থাকা, সে মনে মনে বলল, দীপু, আমি সত্যি জানতাম না, এমন তুমি করবে। আমারও তো এমন স্বভাব নয়। আমার নিজের ছেলেমেয়েদের গায়ে কখনও হাত তুলিনি দীপু। তবে তুমি আমার কে? আমি কেন এভাবে তোমাকে শাসন করতে গেলাম!

দীপুর দাদা বলল, দীপু আমাদের ভারি অভিমানী মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে খুব আদরে মানুষ, আমাদের পরিবারে, পিসি বলুন, আমাদের কথা বলুন, সবার সংসারে দীপু আমাদের একমাত্র বোন। দীপু জীবনে কিছু একটা করবে, আমরা জানতাম। দীপু ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। সেজন্য সবাই ভয়ে ভয়ে থাকত। কেউ ঘাটাতো না দীপুকে।

সে কিছুই বলল না। যেন জীবন দীপু তার কাছে যত দামী ছিল, আরও দামী হয়ে যাচ্ছে। আসলে দীপু জীবনের সঙ্গে বাজি রেখে বড় হচ্ছে। ওর যা ভাল লাগছে করছে। আর সব তুচ্ছ তার কাছে। এতে যেমন ভয় আছে, তেমনি রোমাঞ্চ আছে। দীপু বোধ-হয় ছেলেবেলা থেকে এমন এক রোমাঞ্চকর জীবন চেয়েছে। গতি, গতি চেয়েছে দীপু। একদিন মনে আছে দীপু, ওর খুব কাছে বসে বলেছিল, আপনি আমার এসব খুব ছেলেমানুষী ভাবছেন না তো!

—না না!

—ছেলেমানুষী ভাবলে আমার যা কিছু গৌরব সব অগৌরবের হয়ে যাবে। তাহলে কত কষ্ট বলুন।

এবং এভাবে দীপুর কখনও অভিমানী চোখ, কখনও সরল সহজ কথাবার্তা অথবা মাঠে, কিংবা দূরবর্তী গাছপালার ভিতর ছুটে বেড়ানোর মাঝে এক অসাধারণ দৃশ্যা-বলী গড়ে উঠলে সে চোখ বুজে থাকে। আর তারপরই কেন যে সে দেখতে পায়, দীপু যাচ্ছে, বড় খাটে দীপু যাচ্ছে সামনের দিকে তার কাঁধ। দীপুর চুলে সে শেষবারের মতো তাজা ঘ্রাণ পাবে বলে সামনে কাঁধ দিয়েছে যেন। দীপু শুয়ে আছে ওপরে, ফুলের ভিতর দীপু শুয়ে আছে, দীপুর চোখ বোজা, দীপুকে চন্দন দিয়ে সাজানো হয়েছে, দীপুর পায়ে আলতা, আর সব সাদা ফুল, দীপুর শরীর ফুলে ঢাকা। অথবা সে কখনও দেখতে পায়, দীপু যেন চোখ টিপে ওকে বলছে, কেমন মজা, আমি চলে যাচ্ছি, কত সহজে সব ছেড়েছুড়ে চলে যাচ্ছি, তবু আমার যা ভাল লাগে করে গেছি পৃথিবীতে। আপনার মতো আমি ভীতু নই।

এসব ছবি সে দেখে ফেললেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওর বুক কাঁপে। গিয়ে কি দেখবে কে জানে। দীপু মাঝে মাঝে বলত, আমি আর কিছু চাই না, আপনি পাশে শুয়ে থাকবেন। শক্ত করে হাত ধরে রাখবেন। আমার খুব ভয়, কেউ আমাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

সে আবার কখনও দেখতে পেল, এক নির্জন সবুজ মাঠে, সে নেচে নেচে ম্যাণ্ডো-লিন বাজাচ্ছে, দীপু নাচছে। খুব বড় ওঠার লক্ষণ, কিন্তু দীপু কিছুতেই থামছে না, সে নাচতে নাচতে দূরে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সেও নেচে নেচে কাছে চলে যাচ্ছে, কখনও নুয়ে কখনও দাঁড়িয়ে সে পাগলের মতো বাজিয়ে যাচ্ছে, আকাশ থেকে সব বৃষ্টিপাতের কথা, সে বাজিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি ঘোড়া সব খালি। একটা মানুষ নেই। কেবল সে আর দীপু এই বড় মাঠে, চার-পাশে এত সব বড় উঁচু উঁচু বাড়ি, তবু সে আর দীপু, কেউ নেই কেউ নেই। কখনও কুয়াশা, কখনও বৃষ্টিপাতের ছায়া, কখনও নদীর ঢেউ, কখনো সমুদ্রের বালিয়াড়ি, কখনও উঁচু পাহাড়, কখনও কোনো মরুভূমির ওপর দিয়ে সে আর দীপু, দীপু নাচছে সে বাজাচ্ছে। সে কেবল ঘুরে ঘুরে দীপুর চারপাশে ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে।

তখন দীপুর দাদা বলল, আমরা এসে গেছি।

সে কোথা থেকে কোথায় নেমে এল, এমন একটা নার্সিং হোম কলকাতায় আছে, সে জানত না। দীপুর জন্য এমন সুন্দর নার্সিং হোম না হলে মানাত না। সব বেয়ারা গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, হলুদ রঙের পাথর বিছানো পথ, উঁচুতে উঠে গিয়েই ঘুরে গেছে। কি সব আলোর মালা। দেখেই মনে হবে, মৃত্যু কি করে আসবে এখানে, যখন এমন আলো, এমন নির্জনতা, এমন সারি সারি গাড়ি, এমন কাচের ঘর, এমন পবিত্রতার জন্য, মৃত্যু এখানে আসতে ভয় পাবে। সে বলল, দীপু আমি এসে গেছি।

এবং ওর তর সইছিল না। দীপুর দাদা বলল, ওদিকে না, এদিকে।

আর ঘরে ঢুকতেই আশ্চর্য এক ঠাণ্ডা, যেন কোমল শরীরে এমন করুণ ঠাণ্ডা না লাগলে দীপু বাঁচবে না। সে ঘরে ঢুকতে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কারো দিকে তাকাল না। যেন সে এই আত্মীয়ের ভিড়ে নিজের কাছের মানুষটির কাছে গিয়ে বসতে না পারলে কথা বলতে পারবে না। সে অনেকক্ষণ দীপুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ বোজা দীপুর। নাকে অক্সিজেনের নল। ওর হাত-পা বাঁধা। দীপুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সেলাইন চলছে।

দীপুর দাদা বলল, বসুন। সে একটা মোড়া এনে দিল।

ঠিক দীপুর মুখের কাছে, দীপুর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। দীপু, দীপু! কে বলবে, গতকাল চোখ বড় করে বলছিল, আপনি আমার কিছু করতে পারবেন না। এখন মনে হচ্ছে, সে সত্যি দীপুর কিছু করতে পারেনি। সে ফিসফিস করে ডাকল, দীপু, কপালে হাত রাখল, ভীষণ ঠাণ্ডা কপাল। এবং আশ্চর্য কপালে হাতের সামান্য স্পর্শেই দীপু যেন টের পেয়ে গেছে তার মানুষ এসে গেছে, সামান্য চোখ মেলে তাকিয়ে, আবার চোখ বুজে ফেলল। ঠোঁট বেঁকে গেল দীপুর। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আর কিছু না। আবার দীপু কেমন অতলে টুপ করে ডুবে গেল।

বাইরে বোধ হয় বেশ ঝড় হচ্ছে। সঙ্গে বৃষ্টিপাত। এমন ঠাণ্ডা ঘরে বসে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। কদিন ভীষণ গরম গেছে। লোড-সেডিং চলছে—এর ভিতর এমন বৃষ্টিপাত খুব মনোরম। সে এই ঘরে বসে কিছুই অনুমান করতে পারছে না। ওর জানতে ইচ্ছে করছে, দীপু কবে নিরাময় হবে, বা আদৌ হবে না। সে কাউকে কিছু বলতে পারছে না। ভীষণ অস্বস্তি। আত্মীয়-স্বজন, দীপুর মা, সবাই চুপচাপ। কেমন একটা থমথমে ভাব। এবং কিছুক্ষণ পর দীপুর দাদা এল। দীপুর দাদা কিছু খবর জানতে পারে।

সে উঠে গিয়ে বলল, ডাক্তার কিছু বলছে!

—বলছে, ভালোর দিকে। তবে ভীষণ উইক। কিছু বলা যায় না। হার্টফেল করতে পারে।

সে আরও টুকিটাকি সব খবর নিল, কাচের ভিতর দিয়ে সে কলকাতা শহর দেখতে পাচ্ছে। এত উঁচু থেকে শহর তার দেখার অভ্যাস নেই। কেমন মায়াবী শহর। এমন শহরে দীপুরা এখন বড় হয়ে উঠছে। তারপর সে প্রায় সবাই চলে গেলে, আবার এসে একাকী দীপুর সামনে দাঁড়াল। দীপুর মা বাবা, মেসো মাসি রয়েছে। দীপুর দাদা চলে যাবে। দীপুর দাদা ওকে পৌঁছে দেবে কথা আছে। ওর দাদাকে দেখে মনে হয় ওর

জন্য সে বসে রয়েছে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না তার। সে বলল, আপনি বলুন। আমি ঠিক চলে যাব।

দীপুর দাদা বলল, আর থাকতে দেবে না। আপনাকে যেতে হবে।

—আঃ! সে উঠে পড়ল। আবার কপালে হাত রাখল। দীপু আবার চোখ মেলে তাকাল এবং সামান্য হাসল। দীপুর মা বলল, আপনি আসবেন। আপনি এলে দীপু ভাল হয়ে উঠবে। সামান্য লজ্জার হাসিটুকু দীপুর মার চোখেও ধরা পড়েছে।

আর এভাবে সত্যি সে যখন যায়, তখন দীপু কেমন চোখ মেলে তাকায়, চোখ বুজে থাকতে পারে না। আরও ভাল হলে দীপুর সব নল-টল খুলে নেওয়া হয়। সে গেলে তখন দীপু তাকায় না। লজ্জায় মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে। এবং আরও পরে একদিন সে দেখেছে দীপু ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেন বলতে চায়, আমার হাত চেপে ধরুন। শক্ত করে ধরুন। কেউ যেন আমাকে নিয়ে না যেতে পারে। আর সে কেমন ঈশ্বরের মতো দীপুর নরম হাত শক্ত করে ধরে রাখত। দীপুকে বলত, তুমি ভাল হয়ে ওঠ। তারপর দীপু কেবল দেখত ওকে। যেন এভাবে সে এখানে না এলে ও'কে এত কাছে পেত না। তখন দীপুর মনে হত ভীষণ সে সুখী। তার ভিতরে যে কষ্ট ছিল, আশ্চর্য এক দেশ থেকে ফিরে এসে দেখেছে কেমন নিরাময় হয়ে গেছে।

সে বলত, দীপু তুমি এমন করবে জানতাম না।

দীপু বলত, আমিও কি জানতাম!

—তবে এমন একটা বোকার মতো কাজ করলে কেন?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তারপর থেমে থেমে দীপু আর যা বলত, বলত, আপনি চলে যাবার সময় মনে হয়েছিল, ছুটে যাই। পথ আগলে দাঁড়াই। আপনি আমাকে কত ভালবাসেন! আপনি আমার এতটুকু নীচুতা সহ্য করতে পারছেন না। আবার মনে হয়েছিল এটা আমার ভীষণ অসম্মান। বাবাকে ভেবেছিলাম লেলিয়ে দেব। সে আপনাকে যেতে দেবে না। তারপর মনে হয়েছে, আমি এ-কি করলাম। আপনাকে অপমান করলাম। অসম্মান করলাম। আপনার কাছে আমি যাব কি করে। আমার আর কি থাকল। আমার বেঁচে থাকার যে অর্থ হয় না।

দীপু তারপরও থামত না। কেউ না থাকলেই তার কথা সে বলে যেতে ভালবাসত। সে যখন একা দীপুর শিয়রে চুপচাপ বসে থাকত, তখন দীপু বলত, খুব কাঁদলাম। এমনভাবে আমি কখনও কাঁদিনি। কারণ আমি তো ঠিক করে ফেলেছি, মরে যাব আমি। আমি মরে গেলে আপনি খুব কষ্ট পাবেন জানি, আমার কেবল সে-জন্যই মরে যেতে ভাল লাগল।

তার তখন বলতে ইচ্ছে হত দীপু, তুমি ভীষণ বোকা। এসব ভাবালুতা, কিন্তু সে কিছুই বলত না। কেবল দীপুর কথা শুনে যেত।

দীপু বলত, তারপর সন্ধ্যায় কিছু খেতে ভাল লাগত না। আমি মরে যাব, মরে যাব কেবল ভাবতাম। মরে গেলে কে কে আমার জন্য কাঁদবে একবার ভাবলাম। আমার মায়ের মুখ মনে হল প্রথম, বাবার মুখ, মেসো মাসি, আরও সব মুখ, কিন্তু একজনের মুখ সেখানে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পেলাম, সে ঠিক আছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার পাশে আসতে পারছে না। দূরে সে ফুল নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর তখনই আমার মনে হল, আমি এখন না মরে গেলে, সে আর কখনও ফুল নিয়ে আসবে না। সে আমাকে ভুলে যাবে একদিন। এমন যখন সময় তখন মরে যেতে কি যে ভাল লাগছিল।

দীপু বলত, কি শুনতে পাচ্ছেন! সেই লঘু স্বর দীপুর।

সে বলত, হ্যাঁ। একটু রাত হলে নিচে নেমে বাগানে গেলাম। যত ফুল আছে সব তুলে আনলাম, শাদা গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ কোঁচড় ভরে তুলে আনলাম। বিছানাতে শাদা সিল্কের চাদর এবং তার ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলাম। দামী ধূপকাঠি জ্বাললাম বাতিদানে আর টেবিলের পাশে ফুলদানিতে রাখলাম একগুচ্ছ রজনীগন্ধার ঝাড়। সবচেয়ে দামি নাইটি এটা মা আমাকে মুর্শিদাবাদী সিল্কের কাপড় কেটে করে দিয়েছিল, মাখনের মতো রঙ, আর লাল চাঁদমালার কারুকার্য। মনে হল, আমি সম্রাজ্ঞীর মতো মরে যাব।

দীপু তারপর লজ্জায় নিজেই হেসে ফেলত। —কি ছেলেমানুষী করে ফেলেছিলাম না!

সে বলত, খুব। তারপর সে বলতে পারত; এসব মৃত্যুর পর পুলিশ, লাশ-ঘর এবং পাকস্থলি বের করে নেওয়া হয়, অথবা মাথার স্কাল ফাটিয়ে মগজ বের করে ফেলা হয়, এ-সব বুঝি তোমার জানা ছিল না দীপু। জানলে নিশ্চয়ই এত বড় একটা বোকামি করতে না। অথচ সে কিছুই বলল না। দীপুর মুখ এখনও ফ্যাকাশে। এখনও দুর্বলতা আছে। দীপু কাল কি পরশু বাড়ী যাবে। সে সেখানে আর এমন-ভাবে যেতে পারবে না। দীপুরা সংগে রোজ দেখা হচ্ছে না। এ-সব বলে দীপুকে কষ্ট দিয়ে আর লাভ নেই! সে বলত, তারপর কি করলে!

—যেমন জলের নীচে একটা করে মাছ ডুবে যায়, তেমনি মনে হল, সোনেরিল একটা একটা দুটো। দুটো সোনেরিল খাবার অভ্যাস আমার আছে। খেলেই কেমন আমি আমার ভিতর থাকি না। কেমন মনে হয়, সামনে যা কিছু আছে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাব। আমার শরীর ভীষণ হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। পাখির মতো উড়ে যেতে পারছি। তখন রেকর্ড প্লেয়ারে আমার প্রিয়া, দি লিটল সেলার দিয়ে দিলাম। তারপর আরও একটা সোনেরিল। আরও একটা। শুয়ে শুয়ে পাতলা কাঁচের প্লাসে জল খেলাম, তারপর মনে হল, যেন সেই দ্বীপে চলে গেছি। জাহাজডুবির পর দ্বীপে ছোট্ট নাবিক সাঁতরে উঠে গেছে। পাথর, বালিয়াড়ি, হলুদ রঙের ফল এবং নীল জলের হ্রদ। সে সেখানে দ্বীপের একমাত্র মানুষ। সে একটা ছোট্ট নৌকো ইতিমধ্যে বানিয়ে ফেলেছে, নৌকোয় সে জাহাজডুবির ভাঙা সব-কিছু দিয়ে একটা পাল তুলে ফেলেছে, সে দুলে দুলে সমুদ্রের ঝড়ে একা চলে যাচ্ছে, যদি খুঁজে পায় তাকে।

দীপু এখানে থেমে বলত, তাকে পেয়েছিল, তখন ছোট্ট নাবিকের দাড়ি বড় হয়ে গেছে। চুল বড় হয়ে গেছে। সে পরেছে ষোড়শ শতাব্দীর দস্যুদের পোশাক। সে খুঁজতে খুঁজতে এক বৃষ্টির রাতে, ছোট্ট আর একটা দ্বীপে তাকে পেয়ে গেল। সেও তখন বড় হয়ে গেছে। জাহাজে সে ছিল নাবালিকা। এতদিন পর দুজনই বেঁচে আছে ভেবে অবাক। আমার তখন ঘুম চলে আসছিল। আর কি হয়েছিল মনে করতে পারছি না।

সে বলল, দীপু তোমার কথা একজনকে আমি খুব বলি।

—সে কে?

—সে তোমার কথা শুনতে শুনতে কেমন তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।

—তেমন কত মানুষ আছে। তাতে, আমার কি!

—সে তোমাকে দেখতে চায়।

—আমার ভাল লাগে না।

—একবার তাকে নিয়ে আসব ভাবছি।

—না।

তবু সে একদিন দীপু ভাল হয়ে গেলে ফোনে বলল, এই দীপু!

—কি-ই।

—কাল আমার নাটক আছে। তুমি আমি যাচ্ছি।

দীপু পরদিন দুপুরেই হাজির। দীপু এখন এখানে আসলে কেউ কিছু ভাবে না। বরং দীপুর মা মাসিরা ভেবেছে, দীপুর মতো মেয়ের আর একজন গার্জিয়ান পাওয়া গেছে যা-হোক। দীপুকে আর এ-মানুষকে নিয়ে ওদের কোন ভাবনা নেই। দীপুর বাবা সব চিঠিগুলো দীপুকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে দেবার সময় বলেছে, এগুলো তোমার, তোমার জিনিস তোমার কাছে রাখো।

দীপু তার বাবাকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে পারত, কিন্তু এখন দীপু আগের মতো যেন নেই। বরং দীপু ভীষণ শান্ত এখন। সে একদিন ফোন করে বলেছে তাকে, আপনি আমাকে নিয়ে খুব গল্প-উপন্যাস লিখছেন। আমার ভাল লাগছে। বুঝতে পারছি আমি আছি সব গল্পে। আপনার গল্পে এমন চরিত্র আগে ছিল না। আমার ভয় হচ্ছে এখন আপনি আমার চেয়ে আপনার চরিত্রদের বেশি ভালবেসে ফেলেছেন। আমার দাম থাকছে না।

সে বলেছিল, তাড়াতাড়ি এস। আমরা একটু সকাল সকাল বের হব।

কিন্তু দীপু ভেতরে ঢুকে দেখল ওর চেয়ে কিছু বড় এক যুবক বেশ স্মার্ট, চোখ বড় বড়, সুন্দর, কোঁকড়ানো চুল, আর লতাপাতাআঁকা সার্ট গায়ে দিয়ে সামনের চেয়ারে বসে রয়েছে। খুব গল্প করছে তার সঙ্গে। দীপুকে দেখেও তিনি কিছু বলছেন না। যেন দীপুর চেয়ে এ মানুষের দাম তাঁর কাছে বেশি। দীপুর কালো গগলস হাতে। ওর ব্যাগটা লম্বা, এবং নানাবর্ণের পুতুলের মুখ ব্যাগে। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। তারপর বলল, কখন বের হবেন।

—একটু বোস। এস, তোমাকে আলাপ করিয়ে দি। গৌতম দত্ত। পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র। কোর্স শেষ। এখন ছবি করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুটো ছোট ডকুমেন্টারি করেছে। খুব সাকসেস। ভাল গল্প খুঁজছে।

গৌতম বলল, ও'র পরিচয় দিলেন না!

—এই দ্যাখো ভুলে গেছি। নাম দীপান্বিতা বসু। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। দেখতেই পাচ্ছ, ব্রিলিয়ান্ট সুন্দরী। তুমি অনায়াসে ওকে হিরোইন করতে পার।

দীপু বলল, এই আপনার নাটক দেখতে যাওয়া।

—আরে যাব। গৌতম বলল, যাবে। একসঙ্গে তোমার গাড়িতে আমরা চলে যাব বলে বসে আছি।

গাড়ি দীপু চালাবে। সে গৌতমকে দীপুর পাশে বসতে বললে, দীপু কেমন রুষ্টমুখে তাকাল। এবং এভাবেই সে বুঝতে পারে এখনও ঠিক সময় হয়নি। সে বলল, গৌতম, তুমি পিছনে বসো।

গৌতম বলল, বসে গেছি। এখন চালালে হয়।

দীপু যেতে যেতে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, এই সেই।

—হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে মজা করছেন!

—না, দীপু ভীষণ ভাল ছেলে। খুব সাইন করবে।

দীপু কেমন গলা কঠিন করে খুব আস্তে বলল, আঃ শুনতে পাবে। আর তারপরই দীপু কেমন এলোমেলো গাড়ি চালাতে ভালবাসে। দীপুর এই স্বভাব। সে বলল, এ-ভাবে গাড়ি চালালে তুমি আমাদের নামিয়ে দাও।

দীপু বলল, নামিয়েই দেব ভাবছি। বলে সে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে গাড়ি পার্ক করলে সে ধমক দিল, কি হচ্ছে দীপু!

দীপু এবার কেমন আর শক্ত হয়ে থাকতে পারল না। ওর শাসন দীপুকে কোথায় যেন অসহায় করে ফেলে। দীপু কথা না বলে, কলা মন্দিরে যাবার জন্য গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তাটায় গেলেই মনে হবে, এখানে দীপু মাস তিনেক আগে থেকে গেছে। দীপু পেছনের মানুষটাকে নিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকল।

আর সে হলের ভেতর দেখল, দীপু কেমন কাঠ হয়ে বসে রয়েছে। ওদের একেবারে সামনে বসতে দেওয়া হয়েছে। সে একদিকে, মাঝখানে দীপু, গৌতম একপাশে। দীপু সব সময় ওর দিকে হেলে থেকেছে। দীপুর শরীর এ-ভাবে শক্ত হয়ে যাবার কথা। এবং থিয়েটার শেষ হলে দীপু একটাও কথা বলল না। থিয়েটারের নায়ক-নায়িকারা তাঁকে ঘিরে ধরলেও না। এবং যখন কেউ কেউ অটোগ্রাফ নেবার জন্য ভিড় করেছিল, তখনও দীপু অপরিচিতের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

সিঁড়ি ধরে নামার সময় দীপু দেখল, গৌতম একটু দূরে কার সঙ্গে কথা বলছে। একেবারে আঠার মতো এতক্ষণ লেগে ছিল! দীপু পায়ে আলতা পরেছে আজ। হাল্কা লিপস্টিক। সে ইচ্ছা করলে আজকের মেয়েদের মতো কোমরের নিচে শাড়ি পরতে পারে—কিন্তু সে কিছু কিছু ব্যাপারে ভীষণ সেকেলে। দীপু খুব আস্তে আস্তে হাঁটে। এবং যখন দেখল, এই সময়, দীপু তাকে না বলে পারল না: —এমন জানলে আসতাম না!

—কেন কি হয়েছে।

—কি হয়েছে জানেন না!

—দীপু, ও খুব ভাল ছেলে। তোমাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।

—তাতে আপনার কি লাভ! দীপু কেমন চিৎকার করে বলতে চাইল কথাটা। কিন্তু পারল না। শুধু তাকিয়ে থাকল।

(১৫)

পরদিন অফিসে বসে সে একটা নতুন কভারের কি-ড্রইং দেখছিল। ক্রিমসন কালারটা ঠিক আনতে পারেনি। সামান্য লাইট হলে ভাল হত এবং এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল, তখনই দীপুর ফোন। দীপুর গলা ভারি। গতকাল দীপু আর একটাও কথা বলেনি। যেমন ওকে পৌঁছে দিলে সে বলেছিল, দীপু, প্লিজ তুমি গৌতমকে একটু কফি-হাউসে ছেড়ে দিয়ে যাবে। না হলে যা ভিড়, ট্যাকসি পেতে কষ্ট হবে, ওর যাওয়া হবে না। মৃণালবাবুর সহকারী হিসাবে সে বোধ হয় থাকবে কিছুদিন। ওখানে আজ ও'র আসার কথা আছে। দেখা করা ওর খুব দরকার।

দীপু না তাকিয়েই বলেছিল, দেব পৌঁছে।

এবং দীপুর গলা ভারি শোনালেই সে বুঝতে পারে, আজ দীপু সহজে ফোন ছাড়বে না। অনেকক্ষণ তাকে নেবে। সে যে তখন কি করে। তাতারের জন্য দুটো প্যান্টের অর্ডার দিতে হবে। তাতারের স্কুলে যেতে হবে একবার। ছুটির পর তাতারকে নিয়ে দুটো ফুল প্যান্টের মাপে কাপড় কিনে দর্জির কাছে অর্ডার দিতে হবে। তাতারকে বাসে তুলে দিয়ে ফেরার পথে সুমিতাকে ওর গানের স্কুল থেকে তুলে নিতে হবে। এ-সব যখন কাজ, তখন হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সারা দরকার। কিন্তু দীপুর ফোন পেলেই সে আর কিছু বলতে পারে না, বলতে পারে না দীপু, আমার অনেক কাজ, একটু তাড়াতাড়ি করবে, কাল তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলব। কিন্তু দীপু কথা শোনার মতো মেয়ে নয়। সে যা বলবার ঠিক বলবে। এবং কাল যেভাবে দীপু গৌতমকে নিয়ে গেল তাতে মনে মনে সে আগেই ঝড়ের আশঙ্কা করেছিল, এবং ফোন পেতেই গলা প্রায় কাঠের মতো, বলল, দীপু, কি খবর। কাল বাড়ি ফিরতে বেশি রাত হয়ে যায়নি তো!

—রাত হবে কেন!

—গৌতমকে নিয়ে আবার উল্টোমুখে যেতে হল।

—আচ্ছা আপনি কি!

—আমি কি!

—আমি জানি, আপনি সেলফিস জায়েন্ট। আর আপনার বাগানে আমি ট্রেস-পাসারস। আপনি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

—কিন্তু তুমি হয়তো জান না দীপু, বলেই দেখল, সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক ওর সামনে বসে রয়েছেন। সে বলল, একটু ধরো দীপু। সে আর্টিস্ট ভদ্রলোকের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিলে, তিনি উঠে গেলেন। সে তারপর বলল, দীপু, কিন্তু তুমি তো ভাল করেই জানো, ট্রেস-পাসারসকে তাড়িয়ে দিলে আমার বাগানে শীত চলে আসবে। সব গাছ-পালা পত্রহীন পুষ্পহীন হয়ে যাবে।

—খুব ভাল বাংলায় কথা বলছেন।

—জানি না, কেন যে বলতে ভাল লাগছে। তারপর একটু থেমে বলল, তুমি সেটা জানো দীপু। দেখে দু দিকেই কেমন নিথর হয়ে গেল। দীপু আর কিছু বলছে না দেখে সে ফের বলল, কি কথা বলছ না যে।

—কি বলব।

—রাস্তায় গৌতমের সঙ্গে কি কথা বললে!

—একটাও না।

—গৌতম বলেনি?

—বলেছে।

—তুমি তো এতটা অভদ্র জানতাম না।

—আমি খুব খারাপ। আসলে খারাপ বলেই তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। ভেবেছি, আর যাব না। আপনি আমার কাছ থেকে মুক্তি চান। শীত-টিত বাজে কথা।

—এটা ঠিক না।

—তবে কি ঠিক।

—যা হয় না...।

—কে বলেছে হয় না। আমি যদি আপনার কাছ থেকে কিছু না নিয়েও থাকতে পারি, তবে আপনার এত মাথাব্যথা কেন। আমি তো একজন মানুষকে সারাজীবন ভাল-বাসতে পারি। সারাজীবনের মুগ্ধ পাঠিকা হিসাবেও থাকতে পারি। আমার তো এ অধিকার আপনি কেড়ে নিতে পারেন না। এতে আপনার সাধুতাও ক্ষুন্ন হয় না।

—দীপু, প্লিজ, তুমি ভীষণ রেগে যাচ্ছ। এভাবে কথা বললে আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলি। প্রথম ভেবেছিলাম, এটা সাময়িক ব্যাপার, ঠিক কেটে যাবে, কিন্তু দিন দিন দেখছি, তুমি তোমার ভবিষ্যত একে-

হয়েই ভাবছ না। আমার সঙ্গে এভাবে ঘোরাঘুরির একটা দুর্নাম আছে। তোমার এতে ক্ষতি হবে দীপু।

—সেটা এতদিনে মনে হয়েছে!

—দীপু তুমি ভেবে দ্যাখো, তোমার সামনে কি সুন্দর জীবন, কিন্তু সে বলতে পারে না। সে বলল, তুমি না থাকলে আমার জানালায় শীত এসে যাবে। আমার লেখাতে শীত এসে যাবে। আমি জানি, বুড়ো হয়ে যাব, সেই স্বার্থপর দৈত্যের মতো একটা সুন্দর ফুলগাছের নিচে আমি মরে পড়ে থাকব। দীপু, তুমি অন্তত সেদিন কিছু ফুল আমার শরীরে ছড়িয়ে দিও। তবু, আমি চাই, তুমি ভাল হয়ে যাও।

দীপু কোন কথা বলছে না। সে ফের বলল, দীপু আমি কত অসহায় তোমাকে বোঝাতে পারছি না। সে এবার বলল, দীপু তুমি কথা বলছ না কেন। গোতম কোন রাগ করেনি। সে তোমাকে অভদ্র বলেনি। অভদ্র আমি বলেছি। সে বলেছে, তুমি পেঁছে না দিলে মৃণালবাবুর সঙ্গে ওর দেখা হত না। সে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে।

সে বলল, দীপু কথা বল। দীপু, তুমি কি ফোন কেটে দিয়েছ?

—না।

—তবে কথা বলছ না কেন।

—কি বলব?

—তোমার যা খুশি!

—আমার খুশিতে আপনার কিছু আসে যায় না। আসলে আপনি আপনার গল্পে নানাভাবে আমাকে ব্যবহার করে ফেলেছেন, এখন আমাকে আপনার আর ভাল লাগে না।

—দীপু, তুমি কি বলছ!

—আমার সঙ্গে যাবেন?

—কোথায়?

—আমি আপনাকে নিয়ে বের হয়ে পড়ব। কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসব। আমি জানি ঘুরতে আপনার ভাল লাগবে। কি, কথা বলছেন না কেন?

দীপু আবার বলল, একবার বলুন যাবেন। কি, কথা বলছেন না কেন?

দীপু ফের বলল, আমি নষ্ট হয়ে যাই আপনি চান। চুপ কেন!

সে কত কিছু বলতে পারত, বলতে পারত, তুমি আমার কাছে এলেই নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমার সাহসে কুলোচ্ছে না বলি, চলো সব মন্দিরগাত্রে আমাদের দেব-দেবীর প্রেম-ভালোবাসার ছবি দেখে বেড়াই। বলতে পারি না, কোন মন্দিরের চাতালে চুপচাপ শুয়ে থাকি, কারণ আমি জানি তুমি দৈনন্দিন ব্যবহারে আমার সব জেনে ফেলবে। আমি সাধারণ মানুষ হয়ে যাব। বার বার ইচ্ছে হয় সাধারণ মানুষ হয়ে যাই, কিন্তু তোমার কথা ভাবলে আর পারি না দীপু। বনবাসী মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই।

দীপু বলল, আপনি আমার সঙ্গে তাহলে আর কথা বলবেন না?

—বলব।

কি যে স্বস্তি দীপুর। সে বলল, একটা গল্প শুনবেন?

—কী গল্প!

—মহামতি লিও টলস্টয়ের গল্প। ছেলেবেলা আমার গল্পগুলো কি যে প্রিয় ছিল।

সে আর এখন কথা বলবে না। কথা বলেও লাভ নেই। দীপু কি গল্প বলবে সে জানে না। তবু সে জানে এই গল্পবলার ভিতর দীপু কিছু বলতে চাইবে। সে বলল, বল।

—সময় নষ্ট করছি না তো। সেই এক কথা যেমন বলে।

—না।

দীপু সামান্য গলা ঝেড়ে নিল। ভীষণ শান্তে কথা বলার স্বভাব দীপুর। সে বলল, সে এক বিখ্যাত শিল্পী। নাম মনে নেই। গল্পের নামও না। মনে আছে ভীষণ নাম তার ছবির। সে এক এক করে নানা বর্ণের ছবি এঁকে যাচ্ছে। আশ্চর্য সব ছবি, দেখলেই মায়া হয়। কিন্তু ছবি আঁকার পর মনে হয় শিল্পীর কিছুই হল না। যেন ঠিক জীবন্ত নয়। সে এভাবে যখন ছবির পর ছবি এঁকে ক্লান্ত, ঠিক হচ্ছে না, তখন, সে দেখে ফেলল, সুন্দর এক মেয়ে ওর জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, ওর ছবি আঁকা দেখে। শিল্পী জানেও না, কারণ সেই ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি জানায় শিল্পীর উদাস মুখ এবং ছবি আঁকার মগ্নতা দেখে ভালবেসে ছিল।

দীপু ফের সামান্য গলা ঝেড়ে বলল, গল্পটার ছায়া মনে আছে। আমি নিজের মতো করে কিন্তু গল্পটাকে বলছি। একটু এদিক ওদিক হতে পারে। আপনি পড়েন নি?

সে বলল, না।

—সেই ছোট্ট মেয়েটির চোখ ছিল ভীষণ প্রাণ-চঞ্চল। শিল্পীর মনে হল সহসা, সে তো এতদিন এই চোখ, এই মেয়ের মুখ এবং শরীরের রং আঁকতে চেয়েছে। সে যে দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটি প্রাণ-চঞ্চল মেয়ের অপেক্ষায় ছিল। আর আলাপ হতেই মেয়েটি বলল তার ভালবাসার কথা। আসলে, সে এই রাস্তায় বার বার হেঁটে গেছে, কবে একবার শিল্পী ডেকে তার সঙ্গে কথা বলবে। কথা বললেই যেন তার আর কিছু লাগে না। একবার কথা বললেই, সে সারাজীবন তার কথা ভেবে কাটিয়ে দেবে।

সে বলল, তোমার মতো!

অন্য সময় হলে দীপু হয়তো বলতো আমার বয়ে গেছে, কিন্তু এখন সে আর তেমন কথা বলল না। বরং দীপু গল্পটা বলতেই বেশি উৎসাহী।

দীপু একটু কি ভেবে নিল, তারপর বলল, হ্যাঁ মনে হয়েছে। শিল্পী বললেন, মেয়ে, আমিও তো তোমাকে এতদিন ধরে খুঁজছি। তুমি আসবে আমার জানালায়। তোমার সঙ্গে কথা বলব, তোমার ছবি আঁকব।

—মেয়েটি জানেন, অবাক হয়ে গেল। আমার ছবি!

—হ্যাঁ তোমার। তারপর তো মেয়েটি ভীষণ খুশী। সে আর কি এর চেয়ে বেশি আশা করতে পারে। রোজ সে গিয়ে ওর সামনে সুন্দরভাবে সেজেগুজে বসে থাকে। শিল্পী তার নিজের মতো রোজ আঁকছে। একদিন, দুদিন, তারপর অনেকদিন ধরে আঁকছে। ছবি আঁকছে আর দেখছে। ছবি দেখতে দেখতে সে সময় পাচ্ছে না সে মেয়েটিকে দেখার। ছবির জন্যই মেয়েটি এবং সেই সুন্দর প্রাণ-চঞ্চল মেয়েটি ক্রমে কেমন হয়ে যায়, ওর দিকে শিল্পীর নজর নেই। শিল্পী ওর চেয়ে বেশি ভালবাসছে সেই ছবিটাকে। ওর ভীষণ কান্না পায়। চোখে জল আসে। শীত চলে এলে ওর চোখদুটো ক্রমে কেমন স্থির হয়ে যাচ্ছে। সে শিল্পীর কাছে তবু তার কষ্ট বুঝতে দেয় না, যেন তার কষ্ট নেই। সে যে তার ভালবাসা হারিয়ে মরে যাচ্ছে, কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছে না।

সে বলল, আমি আর শুনব না দীপু। তোমার নিঠুরতার শেষ নেই।

দীপু বলল, প্লিজ, আমার তো এই শেষ গল্প।

ওর হাত কাঁপছে। দীপু একথা বলছে কেন ফের।

সে প্রশ্ন না করে বলল, বল।

দীপু কেমন সামান্য হেসে ছিল।—আমি বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু না বললে যে চলবে না। আমি তো সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

সে বলল, দীপু কি বলছ আজেবাজে!

—আমি বুঝি সব। গোতমবাবুকে আপনি কেন আমার হয়ে বলতে গেলেন!

—কিন্তু তুমি...তোমার সামনের দিন...

—সেজন্যই তো গল্পটা শোনা দরকার। দীপু আর ওকে কোন কথা বলতে অবসর দিল না। —শেষদিন শিল্পী ওর দুটো চোখ আঁকছে। আঁকছে আর আঁকছে। কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এবং তুলির শেষ টান দিয়েই সে চিৎকার করে ছবিটাকে জড়িয়ে ধরল, এঁকেছি। গ্র্যান্ড। কি প্রাণবন্ত আর ভালবাসায় এ ছবির জন্ম। তারপরই সে পিছনে ফিরে সুন্দর মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি কেমন ঘাড় কাত করে দিয়েছে। কাছে গেল। কি শাদা হয়ে গেছে। মোমের মতো শাদা! সে হাত দিয়ে বুঝতে পারল, সুন্দর মেয়েটি মরে গেছে। যে বেঁচে নেই। তারপর দীপু থেমে থেমে অনেক দূরে থেকে কথার মতো বলল, আমিও বুঝি এভাবে মরে গেলাম আপনার কাছে। গোতম দত্ত আমার না হলেও চলত।

সে বুঝতে পারল, দীপু ফোন কেটে দিয়েছে। দীপু তাকে আজ কিছু বলতে পর্যন্ত সময় দিল না। সে বসে থাকল। গোতমকে দীপুর পছন্দ হয়নি অথবা দীপু কি এটা ভীষণ অসম্মানের ভেবেছে। দীপু ভেবেছে, খারাপ মেয়ে সে। খারাপ মেয়ে ভেবেছো বলেই এত সাহস তোমার লেখক। আমাকে নিয়ে যা খুশি করছ, যে কোন গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে আসছি বলে পালাতে চাইছ। সে ভাবল, আমার জামাল ফুরাবে। ফোনে বলবে, দীপু

আমি বনবাসী মানুষ, তাজা ফুল আর ফুলদানিতে রাখতে পারি না, চারপাশের যা কিছু ফুল ফল, সব দেখে যেতে পারি, আর কিছু পারি না। তুমি আমাকে ছোট ভেব না।

তারপর সে ডায়াল ঘোরালে, দীপুর মাসি ধরল ফোন। বলল, দীপু তো এইমাত্র বের হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটিতে কি কাজ আছে বলে বের হয়ে গেল।

সে বলল, আমার যে দীপুকে ভীষণ দরকার।

—এলে বলব। আপনি ভালো আছেন?

সে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো। খুব ভালো আছি।

(১৬)

স্কুল কম্পাউণ্ডে তাতার দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তাকে নিতে আসে না। মা তাকে নিতে আসে। আজ বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তাতার দেখল বাবার চারপাশে কিছু পরিচিত সব গার্জিয়ান। বাবার কুশল নিচ্ছে। কিন্তু তাতার বুঝতে পারছে, বাবার কেমন দুঃখী মুখ। বাবাকে সে এত অসহায় কখনও দেখেনি। বাবা সবার সঙ্গে কোনরকমে কথা বলে ওর হাত ধরে বের হয়ে গেল। এবং বাবার সঙ্গে সে যেতে যেতে দেখেছে, অজস্র কথা বাবা তাকে বলে যাবে। যেমন এই কলকাতা শহরের সব কিছু রাস্তা, রাস্তা পার হবার নিয়মকানুন, বার বার যেমন বাবার বলার স্বভাব, যখন তাতার একা স্কুলে আসে, অথবা বাড়ি থেকে কোন কারণে মা না আসতে পারলে বাবার সেই সব কথা, তাতার বাসের পেছনের দরজায় উঠবে, পেছনের দরজায় উঠলে পড়ে গেলেও মারাত্মক ঘটনা ঘটবে না, কিন্তু সামনের দরজার খুব রিকস। অথবা, রাস্তায় চলা-ফেরা করতে হলে অপরিচিত মানুষের কোন কথায় কিছু না করার নির্দেশ এবং সে বুঝতে পারে বাবার যেন ভয়, তাতার অথবা নীনাকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অপরিচিত কেউ কিছু দিলে খাবে না। সারাক্ষণ বাবার এসব কথাবার্তা, অথচ বাবা আজ একেবারে কথা বলছে না। সে পেছনে বাবার হাঁটছে, বাবা কেমন জোরে হাঁটছে। সে যেন দৌড়ে বাবাকে নাগাল পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে ডাকছে, বাবা! আর তখন বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে যায়, তাতারকে দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি না রে।

তাতার তখন বলে, বাবা আমি তোমাকে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না।

—এই তো আমি।

তাতার বলল, আস্তে হাঁটো।

—আয়। বাবার হাত ধরে তাতার হাঁটতে থাকল। তাতার যেতে যেতে কত কথা বলে থাকে তাকে, যেমন এখন বলছে, বাবা পাখিরা ইলেকট্রিক তারে বসে থাকে, ওরা মরে যায় না কেন! বুয়া আমাদের স্কুলের ছাদ থেকে হাওয়ায় পড়ে দেখা যায়। সে যেমন উত্তর দেয়, আজও দিচ্ছে, কিন্তু তাতার বুঝতে পারে, বাবার কথাবার্তা কেমন প্রাণহীন।

তাতার বলল, বাবা তোমার শরীর ভাল নেই।

এতটুকু ছেলে পর্যন্ত বুঝতে পারছে, সে ভাল নেই। এতক্ষণ কি রাস্তার সব লোক তাকে দেখেছে। সে কি এতক্ষণ এই রাস্তায় দুঃখী মানুষের মতো হেঁটে গেছে! সে তাড়াতাড়ি বলল, আমি ভালো আছি তাতার খুব ভাল আছি। তোমার জন্য আজ সব-চেয়ে দামী সুন্দর প্যান্ট করাব, তোমাকে নিয়ে আমি ময়দান মাঠে, যাবার সময় তোমার মাকে তুলে নেব। আমরা ছিমছাম নিরিবিলি একটা রেস্তোরাঁতে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল খাবার খাব। তুমি কি খেতে পছন্দ করছ তাতার।

—বাবা আমি স্যাণ্ডউইচ খাব।

—আর কি!

—আমি মটন ওমলেট খাব।

সে এবার হেসে ফেলল। তাতারকে সে একদিন কফি হাউসে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তাতার যা খেয়েছে, তার কাছে আর কোন খাবার কাছাকাছি নয়। আসলে তাতার মার কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে কফি-হাউসের গল্প শুনে ভেবেছে, বুঝি সেখানেই আছে আশ্চর্য সব খাবার। সে একদিন খেয়ে ভেবেছে, ভালো খাবার জীবনে খুব বেশি খাওয়া হয় না। একদিন দুদিন।

সে তখন বলল, তার চেয়ে ভাল খাবার তোমাকে খাওয়াব। আসলে সে এবং সুমিতা রেস্তোরাঁতে যেতে একেবারে পছন্দ করে না। যখন যেখানে বেড়াতে গেছে ঘরের খাবার। বড় হোটেলে তাতার কিংবা সুমিতা খুব বেশি খায়নি। সে ভাবল, আজ সে তাদের নিয়ে এই শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল লিফটে উঠে যাবে, সে সবচেয়ে বেশি গর্বের সঙ্গে বেঁচে থাকবে, এবং সে যখন সুমিতাকে নিয়ে সত্যি সত্যি রাতের খাবার এত বড় হোটেলের নাচ-গানের ভিতর সেরে নিল, তখন সুমিতা কেমন অবাক, এভাবে তো তার মানুষটি কখনও তাকে কোথাও নিয়ে যায়নি। আশ্চর্য এক জায়গায় তাদের নিয়ে এসেছে, সব দামী দামী মানুষ, আর কত পানীয়, যে যা খুশী খেয়ে যাচ্ছে। সব সুন্দর সুন্দর মহিলারা হাসছে, আর একটা মেয়ে নাচছে মঞ্চে। লাল নীল আলো তখনও আলোর হলুদ ঘুম জ্বলে জ্বলে নিবে যাচ্ছে। সে খাবারে যত রকমের মেনু, আছে চেয়ে নিয়েছে, এবং সব আশ্চর্য খাবার, এমন রঙ হয় খাবারের, এমন দেখতে হয় সুমিতা জানত না। সুমিতার কেমন বিস্বাদ লাগছে—এসব হাইপিদ খাবার জন্য লোকগুলো এত টাকা খরচ করে এখানে আসে। মাথার ওপরে ঝাড় লণ্ঠন, এবং রিভলভিং মঞ্চে তখন মেয়েটা নাচছে, আর যেমন তখন বাজায় ক্ল্যারিওনেটওলা, বাজাচ্ছে, ও জিলেপী...আরও কি সব গান ঘরের ভিতর। তাতার তো ভীষণ অবাক, ওর মতো বয়সের ছেলেরা কি অনায়াসে খাচ্ছে আর সুন্দর এক ফুলপরীর মতো নাচ।

সুমিতা বলল, তাতারকে না নিয়ে এলেই হত।

—এটা আমাদের মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট। একটা দিন অন্তত সেখান থেকে উঠে আসা যাক।

কি যেন হয়েছে। সুমিতা বলল, অযথা এতগুলো টাকা খরচ। তোমার মাথায় যে মাঝে মাঝে কি চাপে।

—কেন জানি মনে হল, সবচেয়ে দামী হোটেলে তোমাদের নিয়ে যাব। মাঠে বেড়াব। গঙ্গার ধারে ঘুরে রাত্রি করে, বেশ রাত করে ফিরব। আসলে আমি তো তোমাদের একেবারেই সময় দিতে পারি না। আজ মনে হল, না এটা ঠিক না। সবারই তো আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। কেন জানি মনে হয়েছে, তোমাদের প্রতি আমি ভীষণ অন্যায় করছি। তোমাদের ভীষণ অবহেলা করছি।

তখনই সুমিতা বুঝতে পারে, মানুষটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেছে। ভীষণ কষ্টের ভিতর। আর কেন যে মায়া বেড়ে যায়। দীপু ওকে কিছু বলতে পারে। দীপুর প্রসঙ্গে সে আর এখন কিছু বলতে চায় না। এমন কি সুমিতা জানে না, দীপু এখন আর আসছে কিনা। চিঠি দেয় কিনা, ফোন করে কিনা। কারণ সুমিতা জানে, দীপু প্রসঙ্গে এলে সে সুমিতাকে এড়িয়ে যায়, অথবা মাঝে মাঝে বলে, এত বছর পর তোমার কি মনে হয় সুমিতা, তোমার কি মনে হয়, সব ফেলে আমি চলে যেতে পারি, তাতার নীনা, এদের ফেলেই আমি কোথাও যেতে পারি। গেলে আমি পাগল হয়ে যাব না।

সুমিতা তখন আর সত্যি কোন প্রশ্ন করতে পারে না। সে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যায়। সেজন্য সুমিতা দীপু প্রসঙ্গে কোন কথাই বলে না। কেবল জেনেছিল, দীপুর একবার ভীষণ অসুখ করেছিল, নার্সিং হোমে দীপুর মা-বাবার সঙ্গে ওর ভীষণ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আর কিছু না।

সে সুমিতাকে আসল ঘটনা লুকিয়ে গিয়েছিল। এবং বোধহয় ওর মনে হয়েছে, সুমিতাকে সব খুলে বলা দরকার। আজ হোক কাল হোক বলতে হবে। সুমিতা, দীপু ভীষণ ছেলেমানুষ। সে একবার মাঠে গিয়ে দেখতে চেয়েছিল, আমি ওর জন্য দূরে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কিনা। এমন মেয়েকে কে না ভালবাসবে বল। অথচ দীপু আজ ফোনে আমাকে যা বলল, তাতে ভীষণ ভুল বুঝেছে। আমার তো মনে হয় দীপু কথাবার্তায় বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, আমি একটা আস্ত ইতর। না হলে কখনও কেউ তার নিজের ভালবাসাকে এভাবে বিকিয়ে দিতে চায়।

সুমিতা বলল, এবার বাড়ি চল। যেমন সন্তানকে তার মা সময় হলে বলে দেয়,

বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী খাবারই দেওয়া উচিত

বাড়ির লোকেদের ভিভা খাওয়ান :

সর্বাধুনিক খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ভিভা। এর পেছনে আছে পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণা। আর পাঁচটা খাদ্য পানীয়ের মত ভিভাতেও আছে পুরো ননীযুক্ত খাঁটি দুধ ও বার্লি মল্ট। কিন্তু ভিভাই শুধু একমাত্র যাতে আছে হুইট মল্ট।

হুইটমল্ট কেন?

কারণ হুইট মল্টে রয়েছে সহজপাচ্য আকারে প্রকৃতিদত্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ।

হুইট মল্ট যোগ হওয়ায় আরও নানা দিক থেকে ভিভা হয়েছে বহুগুণে ভালো। এর স্বাদ ঢের ভালো রং গাঢ় সোনালী এবং জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

সেইজন্যেই আপনাদের দৈনিক আহার্যের যাবতীয় ঘাটতি পূরণে ভিভার জুড়ি নেই।

আপনার হাতে এখন বেছে নেবার উপায় রয়েছে। আপনার পরিবারের পক্ষে যে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়টি আজকের সবচেয়ে ভালো সেইটি বেছে নিন।

ভিভা কিনুন।

ভারতে তৈরী করছেন :
জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভিভা
অফুরন্ত জীবনী শক্তির উৎস

অথবা সুস্মিতা কি তার এই মানুষকে কখনও কখনও আর একজন সন্তানের মতো ভেবে থাকে। তুমি এবার চলো। অনেক রাত হয়েছে। ডাক্তারের ভীষণ ঘুম পেয়েছে! তোমারও ঘুম পেয়েছে। তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে

এভাবে তারা এক সংসারে, মোটামুটি সুখী দম্পতির মতো বেঁচে থাকতে থাকতে কেন যে এমন হয়ে যায়। সুস্মিতা দেখল, পাশ ফিরে সে শুয়ে আছে। সুস্মিতা হাত রাখল মানুষটার শরীরে। কি ঠাণ্ডা শরীর। সুস্মিতা ওর পিঠে মুখ রাখল। তারপর সুস্মিতা ডাকল, এই।

কোন সাড়াশব্দ নেই। সুস্মিতা আবার ডাকল, এই শুনছ!

সে কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুল। সুস্মিতাকে বুকের কাছে টেনে আনল।

সুস্মিতা বলল, তোমার কিছু হয়েছে।

সে আরও নিবিড়ভাবে সুস্মিতাকে জড়িয়ে ধরল। কথা বলল না। অন্ধকার রাত্রে দূরের কোথাও একটা চিল ডেকে যাচ্ছে। সুস্মিতাকে সে ক্রমে কেমন ছেলে-মানুষের মতো দু হাতে বুকের কাছে টেনে এনে নিবিড় মায়ায়, সুস্মিতার চুলের ঘ্রাণ অথবা শরীরে এখনও যে আশ্চর্য লাবণ্য রয়েছে, তার ভিতর একেবারে সমর্পণ করে দিতে চাইল।

সুস্মিতা বলল, আমি সব বুঝি। তুমি আমাকে কিছুতেই ঠকাতে পারবে না। তোমার কিছু হয়েছে।

—সত্যি বলছি কিছু হয়নি। আমার কিছু হতে যাবে কেন!

—দীপু তোমাকে কিছু বলেছে?

—কি বলবে!

—তুমি তো এমন কখনও কর না।

সে কিন্তু কোন কথা শুনল না। সুস্মিতাকে নিয়ে সে একটা বাচ্চাছেলে হয়ে গেছে। আর সুস্মিতা ওর হাতে টয়। সে সুস্মিতাকে নিয়ে কি যে করছে। হঠাৎ সুস্মিতা হেসে উঠল, এই আমার ভীষণ কাতুকুতু লাগছে। তুমি কি করছ! আর সংগে সংগে সে কেমন স্থির হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যেন কেউ তার খেলনা হাত থেকে কেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

সুস্মিতা বলল, তুমি ভাল হয়ে যাও।

সে বলল, ভাল হয়ে যাব।

তারপর সে এভাবে কখনও নিজের অফিসে ফোনের পাশে চুপচাপ একনাগাড়ে কাজ করে যেত। দীপুকে সে কখনও ফোন করে না। দীপুই এত বেশি ফোনে কথা বলত, অথবা চলে আসত অথবা ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো যে ওর কিছু বলার অবসর থাকত না। সেই দীপু ক্রমে একদিন, পরে দুদিন, আরও পর পর পর বারো, তেরো, চোদ্দ, পনেরো. দীপু পারছে এভাবে থাকতে—কার জোরও অর্জন কম যায় না. দুই যেন কে আগে ছুটে যায়, কার জাহাজ আগে যায় দেখা যাক। এভাবে এক অহংকারের খেলায় মেতে উঠে সে দীপুকে আর ফোন করল না। সে বলছে, দীপুকে আমার খুব দরকার। তারপরও দীপু ফোন না করে থাকতে পারলে, সেও পারে। আর যত এভাবে এক কঠিন জেদ তাকে কুরে কুরে খায়, তত সে বাড়িতে এসে সুস্মিতাকে নিয়ে সেই ছেলে-মানুষের মতো হাতে টয় নিয়ে নিজের খুশিমতো খেলা. যেন দীপুর ওপর প্রতি-শোধ নিচ্ছে, দ্যাখো আমার ঘরেও যে আছেন, অবহেলার নয়, সে আমার কাছে সম্রাজ্ঞীর মতো। আর সুস্মিতা তখন বলে, তুমি ভাল হয়ে যাও।

সে বলে, আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি।

এই ভাল হয়ে যাচ্ছি যাচ্ছি করে যখন মাস কেটে গেল, তখন সে এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখল, ওর লনের পাশে এক সাদা রঙের গাড়ি। গাড়ীটা ভীষণ চেনা। দীপু কখনও তার বাড়ি আসে নি। সে কি থাকতে না পেরে বাড়ি চলে এসেছে। কিন্তু সে বাড়ি ঢুকেই অবাক, দীপুর মা-বাবা! দীপুর বাবা বলল, ফোন করলাম না। একেবারে হাজির। আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বেশী দরকার।

ওর মুখ সহসা কেন যে কান্না হয়ে গেল। বলল, কি হয়েছে!

—কিছুই হয় নি। দীপুর বাবা ওর মুখে কেমন আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখে হেসে ফেলল, কিছু হয় নি। খুব ভাল খবর, দীপুর বিয়ে, আপনাদের যেতে হবে।

সেও হেসে উঠল, কি মজা! দীপুর বিয়ে। না হাসলে চলবে কেন। সে জোরে-জোরে করে খুব হাসছে। ভীষণ উল্লাস দেখাচ্ছে। সে বলল, এই সুস্মিতা, আমরা কিন্তু সকাল সকাল চলে যাব। বিয়ে কবে?

দীপুর মা নিমন্ত্রণের কার্ড দিলে সে তারিখটা দেখল। সে চশমার লেনসে কিছু বুঝতে পারছে না। অক্ষরগুলো সব হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতেই পারছে না, এটা একটা বিয়ের কার্ড। যেন এটা বিয়ের কার্ড নয়, একটা সমন সে তার কমন পেয়েছে হাতে। কোর্টে তাকে হাজিরা দিতে হবে। সে পড়ল কি পড়ল না, ঠিক বুঝতে পারছে না, তাড়াতাড়ি সে নিজেকে খুব সামলে বলল খুব মজা হবে। ওর বিয়েতে আমাকে কি করতে হবে!

দীপুর মা বলল আপনার কিছু করতে হবে না। আপনারা গেলে দীপু খুব খুশী হবে। দীপু বার বার বলছে, যেন যান। না গেলে খুব কষ্ট পাবে।

সহজ কথা। একেবারে সাধারণ কথা। আত্মীয়-টাত্মীয় হলে এমন কথা হয়ে থাকে। দীপু তো তার কেউ নয়। তবু দীপু ওর যেন বোন-টোন হবে, এমন ভাবে বলছে, না গেলে ভীষণ কষ্ট পাবে। সে বলল, সুস্মিতা তুমি যেতে পারবে তো।

সুস্মিতা ওর মুখে কি দেখল। তারপর দীপুর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে আমি নিয়ে যাব।

সুস্মিতা তুমি এভাবে বলতে যাচ্ছ কেন। যেন আমাকে তুমি নিয়ে না গেলে আমি যেতে পারব না। আসলে কি তোমরা তিনজনই আমার ভেতরের দুঃখটা ধরতে পারছ। তোমরা কি আমাকে নিয়ে মজা করছ। আমাকে সেখানে নিয়ে মজা দেখবে।

সুস্মিতা কিছুটা হাল্কা হবার জন্য বলল, ছেলে কি করে?

—ছেলের ব্যবসা আছে। ওরা দু-তিনটে কাপড়ের কলের মালিক। দীপু ছেলেকে দেখে নি। ছেলে একদিন দীপুকে দেখেছিল, রবীন্দ্রসদনে। সেই থেকে পছন্দ। অনেক দিন থেকেই ওরা কথা চালাচ্ছে। দীপু তো রাজী হচ্ছে না। এবার সে রাজী হয়ে গেল।

সে বলল, দীপু ছেলে দেখেছে?

—না। দীপুর মা শেষে বলল, কত বললাম, তুই একবার দ্যাখ। কিছুতেই দেখবে না। আমাদের পছন্দই ওর পছন্দ বলছে। কি করি এখন?

সে বলল, কি করবেন আবার। ও তো ঠিকই বলেছে। মেয়েরা আজকাল খুব দেখে-শুনে করতে গিয়ে বেশী ঠকছে। ভাল হয়েছে এটা। আসলে সে বুঝতেই দিতে চায় না, তার কোন দুঃখের কারণ থাকতে পারে। একেবারে স্বাভাবিক গলা। সহজভাবে সে বলে যাচ্ছে কথাবার্তা। দীপু একটি মেয়ে, হাজার লক্ষ মেয়ের ভিতর একজন মেয়ে। হাজার লক্ষ বিয়ের মতো একটা বিয়ে। তার কিছু আসে যায় না। সে ওদের তারপর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সুস্মিতা আগেই ওদের আদর আপ্যায়ন করেছে। কখনও বুঝতে দেয় নি, দীপুকে নিয়ে এ-সংসারে একটা চাপা অশান্তি ছিল। বরং এমন মনে হয়েছে, দীপুর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সুস্মিতা তার ওপর আরও বেশী নির্ভর করতে পারছে।

এভাবে এক ঘটনা জীবনে ঘটে গেলে, কেমন খালি খালি লাগে সব কিছু। সে আর আগের মতো থাকল না। সে সব সময় হাসে কথা বলে, অথচ এক দুঃখের ভিতর যখন ডুবে যায়, তখন সে হাসতে পারে না। একা একা রাস্তায় হাঁটলে সেটা বেশি বোঝা যায়। সে এক রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়ে। আর মনে হয় নিশিদিন [illegible] বাজছে। আর সানাইর সুর একাই সে শোনাতে চায়। যতদূর যায়, কেবল শুনতে পায় যেন সব সুর তাকে [illegible] ভিতর ফেলে [illegible]। সে [illegible] মতো [illegible]। সে কিছু আর পৃথিবীর শুনতে চায় না।

তবু ভীষণ অভিমান ওর। দীপু ওর ফোন করে নি বলে নি বিয়ে। সে আবার কাজের ভিতর মন দিল। একনাগাড়ে সব কাজ করে যায়। আগে প্রত্যেকটা ফোন বাজলে ভেবেছে, দীপুর ফোন, এখন আর তা ভাবে না। সে জানে দীপু আর তাকে ফোন করবে না। সুস্মিতা, ওদের কথা দিয়েছে, তাকে নিয়ে যাবে। যদি না যায় সে! না গেলে ব্যাপারটা আরও বেশি হাস্যকর। ওরা বুঝতে পারবে, বয়সী মানুষের আমার এমন হবে কেন। এমন যখন মনে হচ্ছিল, তখনই একদিন দীপুর ফোন—এই।

—কে! কে দীপু! দীপু তুমি আমাকে...

—হ্যাঁ ফোন করছি। আমার বিয়ে বলেই দীপুর গলা কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

—এই দীপু কি হচ্ছে!

—আমার বিয়ে. খুশী! শেষ পর্যন্ত পারলাম না, ফোন না করে থাকতে।

—খুশী দীপু। খুব খুশী।

—সময় নষ্ট করব না। আপনি তো কাজের মানুষ। তবু বলছি. ভুল যাবেন আমাকে। আপনার তো চশমা, হাতঘড়ি, কলম মাঝে মাঝে হারায়। এভাবে একটা মেয়ে হারিয়ে গেল ভাববেন।

—আচ্ছা ভাবব। সে কেমন মৃতের মতো কাঠ কাঠ গলায় এমন বললেই শুনল. আর বোধ হয় আমাদের কখনও দেখা হবে না।

সে বলল, না।

দীপু আর কিছু বলছে না। তবু কানের কাছে ফোন রেখে আরও কিছু শুনতে চায়। সেও কিছু বলছে না। সেও চায় দীপু তাকে আরও কিছু বলুক। অথবা ওরা দুজনই বোধহয় চায় সারাজীবন ওরা দুজন ফোন নিয়ে এবার থেকে বসে থাকবে। কখনও কথা বলবে, কখনও বলবে না। দুজনই দু-প্রান্তে থাকবে। কিছু না বললেও ওরা বুঝতে পারবে ওদের কথা শেষ হয়ে যায় নি। যে-কোন সময় ওরা কেউ একজন কথা বলে উঠবে।

সে আর থাকতে না পেরে বলল তোমার চিঠিগুলো ফিরিয়ে নেব। এগুলো আমার কাছে থাকা ঠিক না।

দীপু বলল. এগুলো আপনার কাছেই থাকুক। আমি নিতে পারব না।

—কিন্তু...।

—আপনি আমাকে চিঠিগুলো ফেরত দেবেন না। ওগুলো তো আমি নিজ হাতে নষ্ট করতে পারব না। যদি আপনার ভয় থাকে ছিঁড়ে ফেলবেন।

সে বলতে পারল না, দীপু আমি কি করে ছিঁড়ে ফেলব! আমি তো এগুলো খুব যত্ন করে রেখেছি। আমার যখন কিছু ভাল লাগবে না. যখন তোমার কথা মনে হবে—চিঠিগুলো পড়ব। পড়লে তোমাকে আমি খুব কাছে পাব। আমার তখন আর দুঃখ থাকবে না। দীপু বলে একটা ছোট্ট মেয়ে কি যে ভালবাসত মনে হবে!

দীপু বলল, আমার সব শেষ হয়ে গেল। আর এই বলতে বলতে দীপু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল। সে চুপচাপ। তারও ইচ্ছা হচ্ছে, দীপুর মতো ছেলেমানুষ হয়ে যায়, এভাবে কাঁদে। বাচ্চা ছেলের সেই টয় হারিয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু আশ্চর্য সে কিছুতেই কাঁদতে পারে না। দীপুকেও বলতে পারে না. না দীপু এমন করবে না। কি হচ্ছে! দীপু, প্লিজ। বরং সে মনে মনে এক সুন্দর পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যায়। সেখানে দীপু আর সে. দীপু যত দূরেই থাক. তার নিজের। দীপু, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে, শত ঐশ্বর্যের ভিতরই পড়ে থাক. তাকে ভুলে যেতে পারবে না। আর এভাবেই একদিন দীপু আর সে. হয়তো সেদিন সে আরও বড় হয়ে যাবে. তার বয়স আরও বাড়বে. ওর একটা দুটো করে চুল শাদা হতে থাকবে, তারপর আরও তারপর সে একদিন এক শীতল সাদা কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেলে শুনতে পাবে—অনেক দূর থেকে কেউ ডাকছে, আমি এখানে, আমি হারিয়ে যাই নি। কুয়াশা কেটে গেলেই আপনি আমাকে ঠিক দেখতে পাবেন।

আবার কখনও তার মনে হয় সে সত্যি সেলফিস জায়েন্ট। সে তার ফুল-ফলের জগত থেকে দীপুকে সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর থেকে সে সেই ফুল-ফলের জগতে ক্রমে কেমন দীনহীন হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের সব ফুলের গাছ মরে গেল শীতে। খাঁ খাঁ করছে। আর তুষারপাতে ক্রমে সে বরফের পাহাড়ের নিচে ঢেকে যাচ্ছে। তার জানালায় বসে একটা নাইটিঙ্গেল গান গাইত। শীতে সেও মরে গেছে। আর দুঃখ ভিতরে. শীতের দুঃখ. আর এভাবে ওর চুল শাদা হয়ে গেছে। চোখ বড় বড়। দাড়ি নীল রঙের ভিতরে এক আশ্চর্য মায়া। তখনই সকালের এক সূর্যোদয়ে সে দেখতে পাচ্ছে বরফ গলে গেছে. বাগানের এক কোণে একটা খুব বড় ফুলের গাছ। ছোট্ট একটা মেয়ে সারা সকাল চেষ্টা করছে ফুল তুলে নিতে। ফ্রক-পরা মেয়েটা পারছে না। সে কাছে গিয়ে যেন বলছে, এই যে আমি। গাছটার কি শাদা ফুল। গাছের পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না। দু হাতে সুন্দর করে সে সেই ছোট্ট মেয়েকে কাঁধে তুলে যেন বলছে. এখন যত খুশি ফুল তুলে নাও। আমি আর তোমাকে বকব না। এবং দু হাতে কোঁচড় ভরে সব তুলে নেবার জন্য সে সব ডাল ছোট্ট মেয়েটির কাছে টেনে আনছে। আর কি যে হয়ে যায় ওভাবে, সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়, সেই গাছ ক্রমে আরও বড় হয়ে যাচ্ছে, সে শুয়ে আছে তার নিচে। ওর শরীরে শাদা পোশাক। এবং সবুজ উপত্যকা। ফুল ওর শরীরে পড়তে থাকে টুপটাপ। এক দুই করে সে ফুলের ভিতর ঢেকে যাচ্ছে। যখন শীত আসে, বরফ পড়তে থাকে, তখনও সে যেন দেখতে পায়, সে শুয়ে আছে গাছের নিচে। স্বার্থপর দৈত্যের কবরে কেউ তখন ফুল রেখে যাচ্ছে। তারপর ঘুম এসে যায়। তার আর দুঃখ থাকে না।

কবিতা

ঘন্টাঘড়ি ॥

মণীন্দ্র রায়

কোথায় যেন একটা ঘন্টাঘড়ি,
শোনা যায় কি যায় না, বাজছেই,
তাঁতের মাকুর মতো, ঈশান থেকে নৈঋত,
শব্দে শব্দে বালুচরীর নকশা,
বইছে দিনরাত, ইড়া থেকে পিঙ্গলা
পিঙ্গলা থেকে সুষুম্নার দিকে,
আর নিজের নিজের গর্ত থেকে—স্বপ্ন, না সংহার!—
বেরিয়ে আসছে সাপ আর ময়ূর,
আর মৃত্যুর সঙ্গে মৃত্যুর সেই ওলটপালট,
আর জন্ম নিতে থাকে জন্ম—
কোথায় যেন, কোথায়......

কখনো-বা তর্কের ওপর, যেন কাঠগোলার আগুনে,
কখনো কোনো সমাধানের দিকে, গেলাসে গেলাস
ঠেকিয়ে যেন স্যাম্পাপান,
অথবা, তর্ক-অথচ-সমাধানের
দিনরাত্রির ডোরাকাটা রাস্তা পার হবার জেব্রায়,
দুপাশে দুই দুর্ঘটনা, আর মাঝখানের সেই যাত্রা,
হৃতোজাল যেন এই ঘন্টাঘড়ি...বাজছেই...
কুমুদ-নক্ষত্র থেকে কালপুরুষ অবধি, বাজছেই...

দান্তে কি শুনতে পেয়েছিলেন
নরক থেকে স্বর্গে তার ধ্বনি?
বাংলার মাঠে মাঠে লালন ফকির
সেই গানেই কি বাউল?
ফাউস্টের বুকে চুল্লি জ্বালালে শয়তান
তারই তৃষ্ণা কি জানতে পেরেছিলেন গোটে?
কিম্বা দিল্লি যখন আগুনে জ্বলছিল দাউদাউ
তারই আর্তনাদে কি মাতাল হয়েছিল নাদির?
অথবা হয়তো এই পৃথিবীর স্নেহাতুর বুকে
শেষ শ্বাস নিতে নিতে তারই আদর শুনেছিলেন ক্ষুদিরাম?
—প্রশ্নগুলো প্রশ্নই, অথবা প্রশ্নগুলোই যেন ঘন্টাঘড়ি,
বাজছে...

আর ক্ষতবিক্ষত বিশ্বাস,
যেন মধ্যআকাশের বিস্ফোরণে
জ্বলন্ত টুকরোর দিগ্বিদিকে ছিটকে পড়ছে জেটপ্লেন,
যেন ক্রুশকাঠের পেরেকে যীশু
ধ্বসে উঠছেন—পিতা, কেন আমাকে ছাড়লে?
আর তবুও দ্যাখো চাষীরা কেমন
শুকনো নদীর বালি খুঁড়ে খুঁড়ে
মরীয়া আশ্বাসে চিরকালই খেঁকে জল!...
এই ঈশান থেকে নৈঋত, অথবা জীবন এবং মৃত্যু,
যেন প্রণয়মত্ত দুটি আদিম যুগের অজগর—।
শরীরে শরীর পেঁচিয়ে, ল্যাজে ল্যাজ,
আর মুখোমুখি তাদের দুটি ফণা,
যেন সৃষ্টির সমুদ্রে চিরকাল
এক হিংস্র-বিস্তৃ-মধুর স্পন্দে তারা জঙ্গম,
আর ঘন্টাঘড়ি তাই বাজছে
সকালবেলার সূর্যের মতো নতুন রোদের বর্তুল,
—শূন্যের বুকে হাতুড়ি!

তোমাকে দরকার ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে আমার এখন খুব দরকার
তুমি বুঝতে পারছ না
বাইরেটা তছনছ হচ্ছে, দেখ
উল্টোপাল্টা হাওয়ায়

মাঝে মাঝে যেমন করে
তুমি গুছিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চৌকি

যেমন করে বার করে আনো
অসম্ভব সব জায়গা থেকে
আমার জরুরী দরকারের
উধাও হওয়া কাগজ

যেমন করে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে
রঙীন সুতোয়
আমাকে বানিয়ে দাও মনভোলা বাহারে কাঁথা

তেমনিভাবে আমি চাই
তুমি আমার এই ছেঁড়াখোঁড়া
নিরুদ্দিষ্ট খাপছাড়া কথাগুলোর জন্যে খুঁজে খুঁজে
যেখানে যার থাকার
সেখানে তাকে বসিয়ে দাও

বাইরেটা তছনছ হচ্ছে উল্টোপাল্টা হাওয়ায়
তুমি এখন কোথায়?

স্বগত ॥ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনে অনেক আশা
স্বপ্নের ফুলের মত
সহসা মিলায়
কবিতা কবোষ্ণ ভাষা
মেহেদীর রঙ যেন
একাকী হারায়,
কোথা প্রেম অনুপম
মধু গুঞ্জরণ
শূন্য নভে হায়, সখি
পক্ষ বিধূনন ঃ
অপাঙ্গ ইংগিতে আর
বিলম্বিত মধুকে শায়কে
নেপথ্যের স্তব্ধ গতি
জীকৃত সে সোচ্চার নায়কে,
কত জন্ম যার লাগি
ঋষির সুতীক্ষ্ণ সাধন,
তবু কেন আশাহত
ব্যথিত বিকল এই মন।

ফেরা ॥ মৃগাঙ্ক রায়

এখন আমার নিজের সঙ্গে কথা বলার বয়স,
নিজের নদীর কাছে ফিরে যাবার বয়স।
এখন আমার বাগানে রাত এসেছে, পাখীরা ফিরেছে,
আকাশের কানায় কানায় ভরে উঠেছে অন্ধকার।
তোমাদের তৈরি পথে ঘুরে ঘুরে ঘরে
এবং বহু বৎসর বিবাহিত থেকে এখন আমি ফিরেছি,
নিজের কাছে ফিরে এসেছি।
আমার বাগানের পাখীরা ফিরেছে।

এতোকাল তোমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন মিলিয়ে
মিথ্যাকে ভক্তের সাজ পরিয়েছি, শ্লোগান বেঁধেছি,
কথার পোশাক পরে সভায় সভায় ঘুরে বেড়িয়েছি।
এতোকাল লক্ষ লক্ষ জীবিত ও মৃত মানুষের শিকড়
আমার শরীরে প্রবেশ করেছে,
বহু মৃত ও জীবিত মানুষের দৃষ্টি
আমার দৃষ্টিকে ঘিরে রেখেছে। হাজার হাজার বছরের
এক পুরোনো কবরে এতোকাল আমি শুয়েছিলাম।
আমার বুকের ওপর মাটি এবং সামাজিক গাছেরা
নানা রঙের ফুল ফুটিয়েছিল,
মানুষের হাতে ফল দিয়েছিল।
এখন আমি ফিরেছি, এখন নিজের নদীতে আমি স্নান করব,
নিজের সঙ্গে কথা বলব; এখন আমার
নিজের সঙ্গে কথা বলার বয়স।।

কবে যে তুমি ॥

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কবে যে তুমি আসবে বলেছিলে,
তারপরেতে যা ছিল বলা বাকি—
সেই কথাটাই বলবে বলেছিলে ঃ
গোলাপবাগে দাঁড়িয়ে—মতি ঝলে
ভোরে যখন মোরগ হবে পাখি।

সেদিন থেকে কত যে মেঘ হবে
হাওয়ায় ডানায় উড়েছে নীল নভে।

দোয়ায় এল গ্রামের সন্ধ্যা কী?

বাকলপাতায় মাকড়সাদের জাল
সুর টানে ঝাপসা ঝোপে-ঝাড়ে,
বনোবুড়ো হারাল তার কাল,
গাঙশালিকের গর্তগুলি বাড়ে।

নিমের ডালে অকাল বৈশাখ...

তোমাকে পেয়ে হলাম হতবাক্!

আবার তোমার কথা ॥

[illegible]

আবার তোমার কথা মনে পড়ে। কতো দীর্ঘ বসন্তের পর
বুকের ভেতরে জ্যোৎস্না অপরূপ উদ্ভাসিত।
যেন দূরে অরণ্যের অন্তরালে ধ্বনিময় পার্বত্য নির্ঝর
নিদ্রাহীন উচ্চকিত। হরিদ্রা বনের
প্রবল আনন্দে-লীন স্ফুটমান প্রগাঢ় কোরক
অজস্র আন্দোলিত। সমস্ত প্রান্তর
তোমার ধ্বনিত নামে প্রত্যাশায় আলোড়িত নিবিড় উজ্জ্বল।

প্রবল তেজের মতো সজীবতা। অফুরান ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
হৃদয় বিচূর্ণ স্মৃতি নম্র অন্ধকারে।
যেন সব উন্মোচিত কতদূরে প্রতিভাত নিমেষ রজনী
শেষহীন কল্পনায়। দুর্লভ তিমিরে
ধরে কেন উজ্জ্বলতা। আর শব্দহীন
তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রেম প্রসারিত দিকে দিকে সীমানা-বিহীন।

আবার তোমার কথা মনে পড়ে। কতো দীর্ঘ বসন্তের পর
আবার তোমার নাম কোলাহল কল্লোলিত
উদাসীন আলোড়নে কোমল রক্তের ভেতর।
আবার তোমার স্পর্শে নম্র অভিসার
ছড়ায় নির্জন বৃষ্টি। কতদূর উদ্ভাসিত
রূপবান বৃষ্টির ভেতরে
হেঁটে যাই পুনর্বার প্রেমিকের মতো একা
করুণ বেদনা ছুঁয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তের উজ্জ্বল শিবিরে।

রবীন্দ্রনাথ ও অন্য ভুবন

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর পূর্বে শারদীয় অমৃতে 'অন্য ভুবন অন্য জীবন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই প্রবন্ধটি পরে অন্য দু-একটি সংকলন গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা বিষয়ে যে আগ্রহ ছিল তার কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করি। ঐ সভায় আচার্য সুনীতিকুমার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সব বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সভান্তে এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরলোক বিষয়ক আগ্রহ সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। নূতন তথ্যাবলী যা ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে তা সংযোজন করা হয়েছে এবং সম্পতির জন্য পূর্ব-প্রকাশিত তথ্যাদিও কিছু কিছু পরিবেশন করা হল।

মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমাদের দেশের মনীষীগণ দীর্ঘকাল গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিদেশী স্পিরিচুয়ালইজম কথাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এদেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'অকালটইজম' এবং স্পিরিচুয়ালইজম বিষয়ে রীতিমত গবেষণা হয়েছে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই বিষয়ে একজন পথিকৃৎ এবং তিনি 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন এ সংবাদ অনেকেই জানেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর সহোদরগণ প্রেত-চর্চা বা পরলোক চর্চা বিষয়ে যে গবেষণা করেছেন তা আজো তুলনাহীন হয়ে আছে। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় রচিত 'পরলোকের কথা' নামক গ্রন্থটি পাঠ করিলে মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের পরলোক বিষয়ক গবেষণার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ও পরলোক চর্চায় বিশ্বাসী। তিনি বর্তমান আলোচনার এই বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং নিজেও তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ কিছু কিছু লিখেছেন।

একদা বাংলাদেশে পরলোকচর্চার যে অনুশীলন ছিল এবং বাংলার স্মরণীয় মনীষীগণ নিয়মিতভাবে পরলোকচর্চা করতেন তার প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে বলেছেন — 'একদা আমার গুরুজনেরা প্লানচেটযোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন।'

এই সামান্য কয়েকটি কথায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যে একদা গুরুতরভাবে পরলোকচর্চা হত তার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চক্রে বসেছেন এবং তিনি যে বিশ্বাসী সে বিবরণ বিস্তারিতভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস করব।

।। দুই ।।

ব্রহ্মবিদ পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন — 'ইহলোকসর্বস্ব জড়বাদী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে চৈতন্য মস্তিষ্কের স্পন্দন মাত্র, স্থূলদেহের বিনাশের সঙ্গেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়। অতএব জড়বাদীর কাছে—সারভাইভাল অব ম্যান—জীবের অমরত্ব ও অক্ষয়ত্ব বাজে কথা মাত্র—'

প্রাচীন নাস্তিক্যবাদ ও আধুনিক জড়বাদ প্রায় একই বস্তু।

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য
পুনরাগমনং কুতঃ।'

এই উক্তি দেবভাষায় রচিত প্রগলভ উক্তি মাত্র। মানুষ সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন জীব। তার জীবনে এমন এক অবস্থা আসে যখন প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, সদ্যপরলোকগত প্রিয়জনের বার্তা লাভের জন্য মন চঞ্চল হয়, তখন মনে হয়, হায়রে সেই পূর্বপরিচিত জীবনের জীবনকে যদি একবার দেখতে পেতেম, একবার তার বাণী কানে শুনতেম—সে না জানি কোথায়, কিভাবে, কেমন আছে!

অধিকাংশ মৃত্যু ও পরলোকিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মূলে আছে এই কৌতূহল। মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর পরিবারবর্গ এই জাতীয় আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়েই পরলোকতত্ত্বে আগ্রহী হয়েছিলেন। শুধু হিন্দু সমাজে নয় য়ুরোপের বিভিন্ন প্রান্তে পরলোকচর্চা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ গবেষণা চলছে। যুক্তি ও প্রমাণ মাধ্যমে পরলোকবাদ সম্পর্কে যে সব গবেষণা চলছে তা যেমন বিচিত্র তেমনই বিস্ময়কর।

আশ্চর্যের বিষয় পাশ্চাত্য জগতে এই সমীক্ষা মূলতঃ ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে। ভারতীয় ধর্ম-শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি, রামায়ণ ও মহাভারত এমন কি চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি থেকে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থন লাভ করেছেন। সুতরাং স্পিরিচুয়ালইজম বা পরলোকতত্ত্বের সূতিকাগার আমাদের দেশ একথা বলা যায়।

চার্বাক দর্শনের মত বৌদ্ধ দর্শনেরও নীতি প্রায় এক রূপ। তাঁদের বিশ্বাস দেহই মন ও বুদ্ধির কারণ। অচেতন পদার্থের সংযোগের ফলে চৈতন্যবস্তুর উৎপত্তি। বেদান্ত এই জড়বাদী চিন্তা খণ্ডন করে বলেছেন — বস্তু বা পদার্থ বিশ্বের অর্ধাংশ মাত্র, অপরার্ধ হল মন বা আত্মা।

দার্শনিক শীলার বলেছেন—'বস্তু চেতনাকে সৃষ্টি করে না, তাকে সীমায়িত করে মাত্র'।

আমাদের ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে—আত্মা অবিনাশী, অস্ত্রের দ্বারা তাকে ছিন্ন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না বাতাস তাকে শুকোয় না, জলেও ভেজে না—

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ।।'

কিংবা বিখ্যাত কবি র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমারসন ভগবদ্গীতার যে শ্লোকটির মর্মানুবাদ করে 'ব্রহ্ম' নামে বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছিলেন সেই শ্লোকটি স্মরণ করা যায়—

'য এনং বেত্তি হন্তারং
যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।'

আত্মাকে যে হন্তা বা হতমান করে, সে জানে না আত্মা হত্যা করে না, হত হয় না।

মহাত্মা শিশিরকুমার লোকান্তরিত জনবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে দি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন অন্য এক প্রবন্ধে তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

বিশ্ববিখ্যাত তান্ত্রিক
জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব, তন্ত্রবিশারদ, সামুদ্রিক রত্ন, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), প্রেসিডেন্ট,—বিশ্ব বিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত : ১৯০৭ খৃঃ) এবং বারাণসী পণ্ডিত মহামণ্ডলের স্থায়ী সভাপতি। [illegible] ইনি [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী, [illegible] ও কোষ্ঠী বিচার, হস্তরেখা বাদি, [illegible] গ্রহদোষ, দাম্পত্য ও পারিবারিক অশান্তির জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, ভারতের জ্যোতিষ ও তন্ত্র শাস্ত্রের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর [illegible] প্রতিভা শুধুমাত্র ভারতে নয়,—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, জাভা, সিঙ্গাপুর) ইত্যাদি পরিব্যাপ্ত। [illegible] তিনি [illegible] সারিয়েছেন বহুপূর্ব অভিনন্দন।

[illegible] ব্যক্তি দ্বারা বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ।

[illegible] কবচ ধারণে সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয় সাধারণ : টা. ১১.৫৭, শক্তিশালী বৃহৎ : টা. [illegible]; আজীবন স্থায়ী মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক : টা. ১৭২.১১। প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর [illegible]। বগলামুখী কবচ এবং [illegible] মামলায় জয়লাভ এবং কর্মোন্নতি সাধারণ : টা. [illegible], শক্তিশালী বৃহৎ : [illegible], মহাশক্তিশালী টা. ২৭০.৩১। মোহিনী কবচ ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়, সাধারণ : টা. [illegible], শক্তিশালী বৃহৎ : টা. [illegible] ও মহাশক্তিশালী : টা. [illegible]। সরস্বতী কবচ ছাত্রদের বিদ্যোন্নতি ও পরীক্ষায় সুফল। সাধারণ : টা. [illegible], শক্তিশালী বৃহৎ : টা. [illegible] ও মহাশক্তিশালী ও আজীবন স্থায়ী : টা. [illegible]।
[illegible] ক্যাটালগের জন্য [illegible] পাঠাইবেন।

সহ-সভাপতি—সুযোগ্য পুত্র ও ছাত্র—পণ্ডিত শ্রীনন্দকুমার ভট্টাচার্য জ্যোতিশাস্ত্রী, এম-এ-এ-এস।

হেড অফিস : ৪৮/২এ, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, (ধর্মতলা স্ট্রীট ও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ মোড়) "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" কলিকাতা-১৩। সাক্ষাতের সময় :—প্রাতে ১০টা—১১টা ও বৈকালে ৫টা—৭টা। ফোন : ২৪-৪০৬৫।

রবীন্দ্রনাথ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রায়ই কঠোপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করতেন, সেই শ্লোকটি—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্ট—'

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদাই জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন।

।। তিন ।।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে পরলোকের সঙ্গে ডাক বসানোর যে প্রচেষ্টার কথা বলেছেন সম্ভবত তিনিও সেই সঙ্গে এই কৌতূহলকর ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি নিজেই বলে গেছেন, তবে তা ইতস্তত ছড়ানো আছে, এখনও সংগৃহীত হয়ে একত্রিত করা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেরো থেকে তেইশ সেই সময়কার কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে যার মধ্যে একটিতে লিখিত আছে—

'প্রঃ তিনি যে বিপদে পড়েছেন তাতে কি উদ্ধার পাবেন?
উঃ না।
প্রঃ নবৌঠান কি যাবেন?
উঃ আমি ত বলিলাম।
প্রঃ আমি বসলেই কালীকুমার নন্দী কেন আসেন?
উঃ A fool.
প্রঃ তাকে তাড়ানো যাবে কি করে?
উঃ In the name of God.

এটি যে প্ল্যানচেটের প্রশ্নোত্তর তা বুঝতে অসুবিধা নেই। তবে এর ব্যাখ্যা ঠিক মত পাওয়া যায় না। মনে হয় কোনো এক পারিবারিক সঙ্কট (যথা—নবৌঠাকুরাণীর অসুখ) কালে এই প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে মৈত্রেয়ী দেবী নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন—

'আমি কি প্রশ্ন করব তা ত' ও (মিডিয়ম) আগে থেকে জানতো না যে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আসবে। তা ছাড়া এমন সব কথা যা সে জানতেই পারে না। এই ধারণা, নতুন বৌঠান (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) আমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে পারেন তা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত। তিনি বললেন—বোকা ছেলে, এখনো তোমার বুদ্ধি হয় নি। একথা তিনিই আমাকে বলতে পারতেন।

ওর পক্ষে কল করে আন্দাজ করা কি সম্ভব?

কথা বলায় ভঙ্গীটুকুর বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বিস্মিত করেছিল। তিনি তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, হয়ত একথা তাঁরই, যিনি একথা বলতে পারতেন।

অনুরূপা দেবীর সঙ্গে একবার রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। কথাপ্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলেছিলেন—

'একদিন শমীকে (শমীন্দ্র ঠাকুর) প্রশ্ন করলাম, তুমি ওখানে কি করো? শমী উত্তর দিল—শমীর জগৎ তৈরী করি। বললাম—আমি যখন যাবো তোমার সঙ্গে শমীর জগৎ তৈরী করব, কেমন? শমী উত্তর দিল—সে কি কখনও হয় বাবা? তুমি আনবে নিজের জগৎ তৈরী করবে। আমার জগৎ তুমি কি করে করবে?'

এর পর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যখন নতুন দাদাকে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) একদিন পেলাম প্ল্যানচেটে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলাম—এ কথার মানে কি বলো ত'?

তিনি বললেন—ও তুমি বুঝবে না। এখানকার কর্মপদ্ধতি ওখানের সঙ্গে ঠিক এক নয়।

আবার প্রশ্ন করলাম—ওখানে কিভাবে কাজ হয় একটু বলোনা।

তিনি বললেন—অনেকরকম কাজ হয়। যে কোনো বড় কাজ, নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়া সবই ত' আগে এখানে হয় পরে পৃথিবীতে হতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—জ্যোতি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা তোমরা কি এখান থেকে যেমন যাও তেমনই থাকো, কিছু বদলাও না? তিনি জবাব দিলেন—বদলাই বই কি, তবে তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে বা দেখা দিলে পূর্বে পরিচিতদের ভাবেই দেখা দিই নইলে তোমাদের চেনাই শক্ত হবে—তাই সেইভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে হয়।'

চার

যে কোনো কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথের পরলোক সংবাদে বিশেষ আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, সংবাদ পেলেন যে, একটি মেয়ে ভালো মিডিয়াম, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কথায় কথায় প্রকাশ পেল তার হাতে প্রেতাত্মা ভর করে পেনসিল চালিয়ে কথা কইতে পারে।'

মেয়েটিকে আনা হল, তার হাতে পেনসিল দ্রুতগতিতে চলল। সেদিন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং প্রিয়জন, যথা—স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র-জায়া সাহানা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

প্রথমেই মণিলাল আবির্ভূত হলেন। কাগজে নাম লিখিত হল—মণিলাল গাঙ্গুলী।

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন ঃ পশ্চিম মহাদেশে আমার করণীয় কিছু আছে কি?

মণিলাল বললেন ঃ সেখানে আপনাকে যেতেই হবে। সেখানে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ধর্মমতের কি কিছু বদল হয়েছে?

মণিলাল জবাবে বললেন ঃ পৃথিবীতে আমি নাস্তিক ছিলাম। এখানে ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তুমি এখানে থাকতে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করতে। এখনও তার অনুবৃত্তি আছে কি?

মণিলাল বললেন—তার সঙ্গে এখানে কোনো মিল নেই।'

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু শিল্পী চারুচন্দ্র রায়কে প্রশ্ন করে জেনেছি যে মণিলাল নিজের নামের সঙ্গে 'গাঙ্গুলী' লিখতেন বেশী সময় এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথও মণিলালের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেছেন—মনে হয় যেন সেই কথা বলছে।

রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে হিবার্ট লেকচার এবং নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছিলেন এবং সমর্থনলাভ করেছিলেন।

এর পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

—বাংলার আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে তোমার মত কি?

—অনেকের ভিতরই পদার্থ আছে, কিন্তু ঠিক সেই সুর নেই!!

—আমার আধুনিক কবিতা পড়েছ কী?

—পড়েছি কেমন করে বলি। কিন্তু প্রতিটি লাইন জানি।

সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। তার কতকাংশ উধৃত হল—

রবীন্দ্রনাথ নতুনদাদাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি যে সকল রচনা নিয়ে পৃথিবীতে নিযুক্ত ছিলেন এখনও কি তার অনুবৃত্তি আছে?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জবাবে বললেন ঃ—ঠিক তেমন নয়। এখানে কেবল আত্মসৃষ্টিতেই আনন্দ।

—সৃষ্টির কোনো উপকরণ নেই?

—আত্মাই ত' আমাদের সব। তাকে গঠন করে পরিপূর্ণ করাই আনন্দ—

—আপনার কি দেহ নিতে ইচ্ছা হয়?

—আমি ইচ্ছা করিনে, যারা সুখ চায় তারাই ইচ্ছে করে।

—কোনো বিশেষ স্থানে বাস করেন কি?

—শূন্য আকাশে।

—সে আকাশ কি সীমাবদ্ধ?

—এখনো ত সীমারেখা দেখতে পাইনে।

রবীন্দ্রনাথ সহসা প্রশ্ন করলেন...

—জন্মান্তর আছে?

—আছে। কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে আমরা যে রকম বুঝতাম সে রকম নয়।

—আমার মুক্তি?

—পারে। কিন্তু আরও সাধনা চাই।

—আমার রচনা?

—তোমার রচনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চরম সার্থকতার পথে চলেছে। তুমি শান্ত হয়ে থেকো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি আমাকে যেন আশ্বস্ত করার অবকাশ খুঁজছিলেন। শান্ত হও বলে তিনি স্বস্তি পেলেন।

সহসা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জবানীতে প্ল্যানচেটে লিখিত হল—ঐ গোলাপ ফুলটি আনো!

রবীন্দ্রনাথ চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন—পাশের ঘরে ফুলদানিতে একটি গোলাপ ফুল আছে, তিনি সেটি আনিয়ে সামনে রাখলেন—লিখিত হল—কি সুন্দর।

এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন—একটা গান শোনাও।

রবীন্দ্রনাথ আত্মহারা হয়ে গেছেন। বিহ্বল ভঙ্গী তাঁর। সব গান যেন বিস্মৃত হয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন—রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি—রবীন্দ্রনাথ গান সুরু করে লাইন ভুলে যাচ্ছেন, তখন লিখিত হল—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথা নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভামাঝে।।

স্থূল শরীর থেকে আত্মার সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ বা আত্মার বিচ্ছিন্নতাকে মৃত্যু বলে। এর ফলে আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম প্রার্থনা—মুক্তিদাতা, তোমার দয়া, তোমার ক্ষমা। হোক চির পাথের চির যাত্রার—

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পাই অসীমের নির্ভয় পরিচয়—
মহা-অজানার।।'

রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা বিষয়ক যে সব তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে তা একটি প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে যেটুকু তথ্য পরিবেশিত হল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অন্য ভুবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তা অনুমান করা কঠিন হয় না।

বাঘা তেঁতুল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

'দাদা আছেন?'

গোবর্ধনের গলা। বাদলে দিন, এক-ঘেয়েমি কাটোবার জন্য দেরাজের ছবি-ফটোগুলি দেখতে দেখতে একটা মডার্ন আর্টের নমুনার সামনে দাঁড়িয়ে রহস্য-ভেদ করবার চেষ্টা করছিলাম, একটু উৎফুল্ল হয়েই এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা তুলে ডাকলাম—'এই যে, এসো, কোথায় ছিলে এতদিন?...বোস। ছাতা নিয়ে আসনি। বাদলা দিন, ছেড়ে ছেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে...'

একটা চেয়ার দেখিয়ে, নিজেও একটা আরামচেয়ারে সামনাসামনি হয়ে বসলাম। গোবর্ধন বসতে বসতে বলল—'ছাতা ভুলে আসা আর নিয়ে আসা একসঙ্গে চলে না দাদা। কোথায় সে ছেড়ে গেছে মনেও পড়ছে না। একটা ফ্যাসাদে পড়ে মাথাটা এদিকে তো একেবারে ঠিক ছিল না।'

একবার ভেতরের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল—'ভুল জিনিসটা আবার আপনাদের সাহিত্যিকের ভাষায় 'সংক্রামক' দাদা। বাদলের কথা বললেন, অথচ চায়ের কথাটা বলে দিলেন না। থাক, আমিই বলে আসছি।'

আমায় সময় না দিয়ে উঠে পড়ল। হেসে একটু সন্দরে নেওয়ার চেষ্টা করে বললাম—'তাহলে বাদলের মুগ্যি আর কিছুরও ব্যবস্থা করতে বলে দিও।'

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'একটা ভুলের এই সুবিধে দাদা যে, পরেরটাতে মন খুব সজাগ থাকে।'

ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বসতে বসতে গোড়ার কথার জের ধরে বলল—'একটা বিশ্রী রকম ফ্যাসাদ জুটে গিয়েছিল দাদা, ঐ যে বললাম, মাথার ঠিক থাকতে দেয়নি।'

বললাম—'ফ্যাসাদ তুমি জুটিয়ে নাও গোবর। কতবার বলেছি তোমায়...'

'আপনাদের আশীর্বাদের জোরে কাটিয়ে উঠে কতবার মনে হয়েছে এবার একবার কুষ্ঠিটা দেখিয়ে নোব। গড়িমসি করতে করতে আবার একটি জুটে যায়। একটার সঙ্গে একটার মিল নেই যে সাবধানও হব।'

'এবারে কি হোল?'

'এবারে আবার যাকে বলবেন শুকনো ডাঙায় আছাড় খাওয়া, তাই। পাড়া থেকে এমন নিখুঁতভাবে এগিয়ে আসছে যেন সব আগে থাকতে সাজানো। মন্দির-পাড়ায় রমানাথ কাকা রিটায়ার করে এসে বসেছেন, কতদিন থেকে ভাবছি একবার

সেখাই করে আসব, তা হয়ে আর ওঠে না। একটা ঝামেলা হাতে ছিল, কাটিয়ে একদিন সকালবেলায় গেলাম সন্ধ্যামে। এই আপনার মানদেবত্বক আগেকার কথা! বাড়িটার ঐ নাম। রমানাথ কতৃর্ক পত্তনে। গাঙ্গুলীদের বড় বাড়ি, আগেকার একান্নবর্তী বড় পরিবারের যেমন হোত। এখন দু' ভাগ। এক ভাগীদার, ভাইপো, বাইরেই থাকেন, ভাড়াটে বসিয়ে রেখেছেন। দুটো বাড়িরই বাইরে যাওয়ার রাস্তা এক। কাকার বৈঠকখানার সামনে দিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সাবেক-কালের বড় বড় পেরেক বসানো উঁচু দরজা পেরিয়ে। সাবেক কালের মতন বড়-বাড়ি আর ভেতর-বাড়ি আলাদা, বাইরের খালি জমিটায় আম-জামরুল আর গোটা কএক সুপুরির গাছ।

কাকাও একেবারে সাবেককালের মানুষ থেকে গেছেন। চিরকালটা বাইরে বাইরেই কেটে গেল তো চাকরিসূত্রে, আসতেন মধ্যে মাঝে, বড় ছেলে চাকরিতে রয়েছেন, বাড়ির সঙ্গে বরাবর যোগ ছিল, তবে যখনই আসতেন, এদিককার হাল-চাল দেখে যেন আরও সাবেককালেরটি হয়ে ফিরে যেতেন।

মজলিসী লোক, রিটায়ার করে কায়েমীভাবে বসে আস্তে আস্তে বেশ একটি আড্ডা জমিয়ে নিয়েছেন। আমি দেখে প্রায় সকালেই যাই, কেননা, সন্ধ্যার আড্ডাটা একরকম সম-বয়সীদের নিয়েই।

সকালেও লোক থাকে মজলিসী মানুষ অবসর জীবনের মতন একলা আকাশ-পানে চেয়ে বসে থাকতে পারে না তো, লোক থাকে, তবে পাঁচমিশালী, কাজের কথাও এই সময়টাই হয় রমানাথ কাকার।

স্নেহ পাই। আমি যেতেই বলে উঠলেন—'বাঃ, এই যে গোবর্ধন বাবাজী! মেঘ না চাইতেই জল! তোমাকে ডেকে পাঠাবই মনে করছিলাম, তুমি তো এ অঞ্চলের লোকেট!'

নীচু চৌকির ওপর চলা করলাম পাতা। পায়ের ধুলো নিয়ে বসতে বসতে বললাম—'আর দুসেই নিজের ঝামেলাতেই জড়িয়ে পড়ছি কাকা, তবু দেখি চেষ্টা-চরিত্তির যদি বলেন।'

বললেন—'এবার বড়ুর বিয়েটা দিয়ে দিতে চাই। বড়ুর না, বড়ুর মা ক'রে একুশ পেরিয়ে গেল, আর নয়। একটি ভাল ভালো পাত্রী—বেশ পছন্দসই...' ঠিক এই সময় কাপড়টা হোল কাকা। শেষ করতেও পারলেন না, হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সমস্ত আসরটাও যেন হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল।

একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের...এই সময় মজলিস দেখুন—যুবতী কথাটা মুখে কেমন যেন আটকে যায়—এ ধরনের মানুষ, একটা কিছু উদ্ভাসপূর্ণ নাম বানিয়ে দেন......'

হেসে বললাম—'বখন বয়স হয়েছে, বুঝে তো নিয়েছি।'

'তাই থাক তাহলে—গট-গট করে ভেতরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বেশ শৌখীন। চওড়া সবুজ পেড়ে শাড়ি একটু ঢিলেঢালা গাঁথা, হাতে লটকানো ব্যাগে জর্মানিটি ব্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও বেরিয়ে এসেছে, ভেতর থেকে চিৎকার করতে করতে একটি বছর তিনেকের ছেলে বেরিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

'আঃ, তোমরা একটু!'—বলে চেঁচিয়েই উঠতে যাচ্ছিল—নিশ্চয় মা-ই হবে—বোধ হয় বৈঠকখানায় লোক রয়েছে টের পেয়েই ছেলেটিকে কোলে পাঁজাকোলা করে ভেতরে চলে গিয়ে, আর বৈঠকখানায় খাতির না করে গলা ছেড়েই আরম্ভ করে দিল—'তোমরা একটু সামলে রাখতে পার না। আর কোথায় গেল? এখুনি তো আমাকে নাক-সারি থেকে নিয়ে যেতে—আজকেও লেট হলো আমার...'

মিলিয়ে যেতে যেতে এই পর্যন্তই কানে গেল দাদা, কম ধাক্কা করে থেকেও, কাকাদের ভাড়াটে বাড়িটা আবার পেছনের দিকে একেবারে।

সবাই চুপ করেই আছি যে যার নিজের চিন্তা নিয়ে, একটু পরে মেয়েটি আবার বেরিয়ে এসে হনহন করে চলে গেল, আরও পা চালিয়ে ছোট-কথা মুখটায় কাজায় ঠাসা। ছেলেটা ভেতরে তখনও চিৎকার করছে।

কেমন যেন হঠাৎ 'দ' পড়ে গেল কথা-বার্তায় দাদা! কাকাও বিয়ের কথাটা যেন ভুলে গিয়ে একটু একথা-সেকথা নিয়ে রইলেন। অভ্যেটা ভেঙেও গেল সকাল সকাল।

এ সম্বন্ধে নিজে আর কিছু বলছেন না দেখে আমিও—'আচ্ছা তাহলে আসি কাকা'—বলে উঠতে যাব, বললেন—'একটু শোন। তোমার যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, বড়ুর জন্যে একটি পাত্রীর কথা। সুন্দরী হলেই ভালো, তবে সেটা গৌণ হিসেবে, যতে বিয়ে করতে চাইছে না বেচে। তাতে বয়েসটা অল্প কম হয়, একেবারে বাচ্চা-মেয়ের অবশ্য নয়, তবে যোলর ওপরেও নয়, শান্ত স্বভাব, ঘরোয়া মেয়ে।...আর যতটা সম্ভব ঠাকুমা-দিদিমা-ঘেঁষা।'

'লেখা-পড়া কাকা?'—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নস্যি নেন। এক টিপ হাতেই ছিল, দু' নাকে ঠুসে, তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে বললেন—'একেবারেই না হলে ভালো, তবে যা কাল পড়েছে, তা তো সম্ভব নয়। তবু যতটা কম হয়। আছে জানার মধ্যে?'

বললাম, 'ভাটপাড়ার ভট্টাচার্যদের মতন এসব পাত্রীও ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে কাকা, খুঁজে বের করতে হবে। দেখি।'

বললেন—'তাহলে একটু তাড়াতাড়ি তোমার কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। যাও, ওঠ।'

এর পরেই ঐ যে চমৎকার, যোগাযোগের কথা বলছিলাম আপনাকে।

বাড়ি এসে দেখি জগদম্বা মাসি মার সঙ্গে রকে বসে গল্প করছেন। আমাকে দেখেই বললেন—'এই যে, হোল সময় ছেলের বাড়ি ফেরবার?'

পায়ের ধুলো নিয়ে রকের ধারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম—'কখন এলেন মাসিমা?'

বললেন—'শোন কথা! সেই কোন সাতসকালে এসে বসে আছি, একফোঁটা ছেলের আমার দুনিয়ার সবার উপকার করে এসে খোঁজ নেওয়ার ফুরসৎ হোল—কখন এসেছি! তা করো না সবার, ভগবান মন দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে গরীব মাসির কথাটাও তো মনে রাখতে হয় বাবা, অত করে বলছি মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে...'

এর পর মাকেও সাক্ষী মানলেন—'বলে, খালি রূপে হয় না, অন্তত ম্যাট্রিক, না কি বলে সেটা পাস করিয়ে দাও, তা তাও তো করিয়ে এনেছি দিদি।'

মা বললেন—'দেখ না বাবা, অমনু একলা পড়ে গেছে। আর সবাই তো, এত লোকের করছিস।'

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন
শ্রীঘৃত
শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ
অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কর্ণন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

আমি উলটে চটে উঠলাম বলল, মনে মনে এদিকে ধাঁতিয়ে দেখেছি তো, বললাম—'বাস, দু বোনে সংসার সাজো এক দিকে হয়ে গেলে! আমি তো সেই ধান্দাই সেরে আসছি, তা বলার ফুরসৎ দিলে তো। ছুলোয় যাক মানুষ আগেই পাস করাতে হয়, নিজেরা বাঁচিয়ে দেবে।' বললাম—এইরকম মেয়ে আমাদের। দিশা করে বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই বা ভাত, পনেরো বছরের ওপর পাঁচ মাস হয়ে গেছে, আর নয়। নিতে চাও তো তাড়াতাড়ি কুষ্ঠি মিলিয়ে নিয়ে নাও, চারিদিক থেকে হাত বাড়াচ্ছে।...বলে আছে গোবরা!'

অবাক হয়ে গেছেন দু'জনে। মা-ই জিজ্ঞেস করলো—'তা ছেলে কেমন?'

বললাম—হীরের টুকরো। মহেশ্বর-দের কথায় গোবরা থাকে না।'

মাসি জিজ্ঞেস করলেন—'অবস্থা কিরকম বাবা? দিতে-থুতে কিরকম চায়?'

আমারই তো জিত চলেছে দাদা তখন। বললাম—'ও কথা তোলবার উপায় নেই বাপের কাছে। নয়—আগে যেমন কেউ করত—'বেচতে চান মেয়েকে তো, নগদ বারো হাজার বা হাঁকেন যেমন থাকো এক ডাকে।'

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন দু'জনে, মা-ই বললেন—'হ্যাঁরে ঠিক বলছিস তো? ভেতপুড়ে এসে বাধা পড়িস না তো?'

এই সবেই আবার জিতে হয়ে গেল দাদা। রাজযোটক, যেমন সন্তু-পিসী দেব, আড়চোখে কথা কয় না, ছেলেও, তেমনি ঠান্ডা, লাজুক। মেয়ে দেখে এসে একবার শুধু বলেছিল—দেখো তো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও সামনে পরীক্ষা জামাই সময় পাবে না। বি-সি-এস এর জন্যে তৈরী হচ্ছে। ...প্রায় মনেমেলে তো পুতুলটি না হয় একটা হবে।'

চুপ করল গোবর্ধন।

কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে গিয়ে শেষ করল আমার কথা বড়ে কিনা একটু দেখে নিয়ে বললাম—'কিন্তু তোমার মধ্যে হ্যাংলাদের তো কিছুই দেখছি না গোবর। অত যে বললে!'

'এখন তো শুধুই হবার অপেক্ষা দাদা।...দাঁড়াও আসছি।' যেখানেই যাব একটা ফাঁসাদ, দিলে বুঝি সব ফেলে।'

উঠে এসে ডা-কলকাতার আলোটা জ্বালতে ছুঁড়ে ডা-রাবরটা পড়ল একটা, পেতলের পড়ে গেছে, উঠে গিয়ে খুঁটো আলতো ছাড়িয়ে নিয়ে এসে টিপয়ে রাখল, বলল 'দাঁড়াও দাদা, আগে এগুলোকে চালান করে দিই, গোবরার কপাল, একটা চোট জোটে না।'

বড় বড় তিনটে পিতলের, পাপড়, দুটো রাজভোগ। দু কাপ চায়ের একটা আমার দিকে ঠেলে দেয়েই বলল—'অমানুষি মায়েরা দূরসম্পর্কের বোন, প্রায় রক্ত-সম্পর্কেও বলা চলে, আমার মামার বাড়িও তো একেবারে মানে মাইল চারেকের মধ্যে।

হাসিয়া বিধবা। দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় ছেলে, অনুতাপ বলক তার চাকরি করেন, ছোট ছেলে পড়ে। বড় মেয়ের বিয়ে অসোয়ামীই থাকতেই হয়ে যায়! কিছু জোতজমি আছে, চলে যায় ভালোভাবেই একরকম। এখন মেয়েটিকে বিদায় করতে পারলে নিশ্চিন্ত হন মাসিমা। তা হোক ও ভালো—যেমনটি আশাই করতে পারেন নি মাসিমা, নিজের অবস্থার দিকে তাকালে।

সবই ভালো। দু'দিন বর-বৌ-কুটুম নিয়ে খুব হৈ-হৈ হোল, গোবরাও তার মধ্যে রয়েছে, দু' পক্ষেই খুব ভাব হয়ে গেছে তো। তারপর, তিন দিনের দিন বউ-ভাত বেশ হোল, দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে নিই দাদা।'

মুখহাত ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে চেয়ারে বসল গোবর্ধন। শুরু করল—

'সোনাটা আমার খুব ন্যাওটা বাল্য ছেলেবেলা থেকে। পাতয়ে তো আমি ভেতরবাড়ি বারবাড়ি এক করে বেড়াচ্ছি। কি একটা উপলক্ষ করে নন্দ-রা আর পাড়ার সমবয়সী মেয়েরা মুখে সাজ গেছে, আমায় দেখতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরে, বেরিয়ে এসে বসেছি বৈঠকখানায়, আরও সব ই রয়েছে, গল্প-গুজব হচ্ছে, এমন সময় ভেতর বাড়িতে 'আক' করে একটা উৎকট আওয়াজ, তার সঙ্গে হুটোপুটি—'ও বৌদি কি হোল!... বাবাগো!...মাগো!...ম্যাগো, কান্নে যেন কি হোল!'—একটা হৈহৈ পড়ে গেল ভেতরে, তারপর কিছু বলতে না বুঝতে 'ও গোবরদা মলুম!'—বলে সোনা ছুটতে ছুটতে বৈঠকখানায় এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে হাঁপাতে লাগল মাথা গুঁজে।

দুটো মিনিটও পারে নয়। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা এইরকম সময়। বৈঠকখানায় বেশি লোক জমেনি তখনও, তবু কাজের বাড়িই, এসেছে কিছু, এদিকে কনেবৌদের পেছনে ছুটতে ছুটতে একপাল মেয়ে এসে দরজার বাইরে আটকে গেছে, কারুরই মুখে একটা কথা নেই, কিছু ভেবে-বুঝে উঠতে পারছে না। কাকার অবস্থা আরও খারাপ। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে গেছে সোনার দিকে চেয়ে আছেন, যেন কুমোরদের কাঠের পুতুল। আমার কথা তো বাদই দিন।

হুঁশটা আগে ওঁরই হোল। উঠে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—'কী হয়েছে মা, আমায় বলো তো। চলো, ভেতরে চলো।'

কোন কথা নয়, শুধু মাথাটা নেড়ে আমার হাত দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরল। আমি তো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, এক তো গমলা, কাজ-লোক-জন বাড়ির কনেবৌ ঐভাবে মাথা গুঁজেছে গায়ের ওপর পড়ে, মুখে কথা নেই, মাঝে মাঝে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে, ওদিকে বাইরে ভিড় জমে যাচ্ছে, কী যে

করব, কী বলব মাথায় আসছে না...হতভম্ব-বোধই হয়ে গেছে, উত্তর না পেয়ে কাকা আমায় জিজ্ঞেস করার জন্য ইশারা করতে গেল সাড় হোল, মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললাম—'অমন করছিস কেন? কি হয়েছে বল্ তো আমায়। মাথা ঘুরছে? গরম বোধ হচ্ছে? চল, ভেতরে চল, ওঠ তো।'

হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়, অথচ আঁকড়ে ধরল।

ঘরের মধ্যে ততক্ষণে দু-একটি করে প্রশ্ন—মন্তব্য আরম্ভ হয়ে গেছে—হিস্টিরিয়া নেই তো?...রমানাথ, ভেতরে গিয়ে খবর নাও না কি হয়েছে...তোমরাই বল না গো কি হয়েছিল?

মেয়েরা জড়ভড় করে কাঁদতে যাচ্ছিল, আমি রমানাথ কাকাকে একটু চাপা গলায় বললাম—'ঘরটা খালি করিয়ে দিন কাকা, মেয়েরাও সব চলে যাক ভেতরে।'

যিনি কাকাকে ভেতরে খবর নিতে বললেন, কাছেই বসেছিলেন, বললেন,—হ্যাঁ, সেই ঠিক। একে অতিবিশ্ব কান্ডক, ছেলেমানুষ, আরও পেয়ে গেছে লজ্জা।... বলো মা তুমি, কোনও ভয় নেই।... যাও তোমরা ভেতরে।...তোমরাও ঘরটা খালি করে দাও। কিছু হয়নি, ছেলে-মানুষ, কি রকম একটু ঘাবড়ে গেছে। এখনি সব বলবে।...বলো মা তুমি।'

উঠে পড়লেন। ঘরটা খালি হয়ে গেল মেয়েরাও গুঞ্জন করতে করতে ভেতরে চলে গেল।

বললাম—'এবার বল কি হয়েছে।'

সেই রকম ঘাড় গুঁজে থেকেই খুব ফিসফিস করে কি বলল, বুঝতে না পেরে বললাম—'জোরে বল্।'

'বাবাও যান।'—প্রায় সেই গলাতেই বলল, তবে এবার কথা দুটো স্পষ্ট। কাকা ধরে গেল দাদা। বললাম—'কাটে। তা কেন, শুনি?'

কাকারও কানে গেছে, বললেন—থাক, বলে কাজ নেই।......উঠছি আমিও, তুমি বলো গোবরকে মা। লক্ষ্মীটি, কিছু ভয় নেই তোমার।'

উঠে গিয়ে বাড়িতে যে গুঞ্জনটা শুরু হয়েছিল সেটাও থামিয়ে দিলেন। সমস্ত বাড়িটা একদমে হয়ে গেল।

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'বল এবার। বড় বেহায়াপনা শুরু করেছিস, সোনা,—শান্ত, লাজুক বলে কেমন প্রশংসা হচ্ছিল......'

স্বল্প একটু উঠে বসে, তবে কথাটা মুখেই রয়েছে, বলল—'বাড়ি যাব।' মুখটা একটু তুলেছে।

বললাম—'এ বাড়ি পছন্দ হচ্ছে না? এত লোকজন, আদরযত্ন—ওপরে উঠলে ধর পেয়েছিস...'

'বড় লোভাই আমাকেলা দাদা!' বলে আবার গুঁজিয়ে পড়ল গা ঘেঁষে, তারপর আতঙ্কে, চাপা কান্না—'না, আমায় নিয়ে চলো—আমি মরে যাব—মরে যাব আমি—দাদো! আমার কি হবে?'

আমি বললাম—'আরসোলার এরকম উৎকট ভয়।

গোবর্ধন বলল—'ছিল, যেমন থাকে আরসোলা-ইঁদুরের ভয় কোন কোন মেয়ের। ছেলেবেলায় হাত মিছিমিছি মুঠো করে ভয় দেখিয়েছি, তবে একেবারে এরকম কেলেঙ্কারি করে বসবে জানলে কি ও মেয়ের বিয়ের কথায় থাকি দাদা? বলতেও লজ্জা, তবে বলতেই হোল। আরসোলার উৎপাত কমবেশি করে সব বাড়িতেই, তবে সাধারণতঃ রান্না, ভাঁড়ার আর পুজোর ঘরে। কনে বৌ, যাওয়ার দরকার হয়নি। ওপরে একটি মাত্র ঘর। নীচেই কুলিয়ে যেত বলে ব্যবহার হোত না। লেপতোষক আর কিছু এদিকওদিক জিনিস রাখা থাকত, এইটে ঝেড়ে-মুছে যতু-সোনাকে দেওয়া হয়েছে, পরের দিন ফুলশয্যাও এই ঘরেই হবে।

তখন পর্যন্ত দেখেনি সোনা। ছেলেমানুষ, একটা আগ্রহ থাকেই। সাজগোজ করে কাকার ঘরে বসেছিল, সবাই যে যার কাজে এদিক-ওদিক একটু চলে গেছে, ছোট ননদটির সঙ্গে গল্প করছিল সোনা, ফাঁক পেয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গিয়েছিল, তারপরেই এই কাণ্ড। সোজা পাগলের মতন ছুটে নেমে এসে একেবারে বৈঠকখানা। ও যে গিয়েছিল ওপরে কেউ জানত না, আট বছরের ননদ লক্ষ্মী একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে বৌদিদির কাণ্ড দেখে, মুখে রা করে না ডাকাত-পড়া কাণ্ড বাড়িতে।

ওপর ঘরে গেলাম সবাই, সোনা তো লজ্জায় আধমরা হয়ে কাকার বিছানায় গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে।

পুরনো বাড়ি, ফাঁকা হতে দেখা গেল, রান্না ভাঁড়ার ঘরে ভালোরকমই জমায়েৎ আরসোলার। তবে ওপর ঘরে গিয়ে দেখা গেল, হেড আফিস! আমাদেরই আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়, সোনার তো এই হাল করবেই।

ও ঘর এয়ার-টাইট করে বন্ধ করে দিয়ে নীচেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা হোল। নিত্যি আতঙ্কের মধ্যে কাটছে, শেষে অসুখে না প'ড়ে যায়, পুরুত-ঠাকুরের কাছে বিধান নিয়ে অষ্টমঙ্গলাটা এগিয়ে এনে যতু আর সোনাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোল। তারপর—মার আরসোলা! তাড়া। শেষ কর।—জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মতন, রীতিমতো আরসোলা যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল সুরভবনে।'

'হোল শেষ?'—একটু উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম।

শেষ! রীতিমতো রক্তবীজের পালা দাদা। ডি-ডি-টি, গ্যামাকসিন, ধূপ, ধুনো, গন্ধকের ধোঁয়া—কিছু বাদ নেই,—যত দেওয়া হচ্ছে, ঝাঁ-পো নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসছে আরসোলা—মরছে বৈকি, ঝাঁটার ঘা, কুলোর ঘা রয়েছে! কিন্তু কোথা থেকে যে আসছে, বাড়ি একবারে ছেয়ে ফেলেছে দাদা। এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখেননি।'

চুপ করে গিয়ে বাইরের দিকে চাইল গোবর্ধন।

আবার সেই রকম খাপছাড়া মনে হতে প্রশ্ন করলাম—'শেষ হোল?'

গোবর্ধন দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল—'এখনও আরম্ভই হয়নি আসল গল্প, শেষ হবে কোথা থেকে? তবে, আজ একটু তাড়াতাড়িই সেরে নিয়ে উঠে পড়তে হবে, নৈলে আপনার ছাতাটা হারাবে।'

ঘনিয়ে-আসা মেঘের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে আরম্ভ করল—'সমস্ত ধকোলটা যেন আমার ওপর এসে পড়ল দাদা। বাড়ি যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে, না বিয়েটা দেওয়াতায়, না এ রকম হোত। যতু ফিরে এল ক'দিন থেকে, নতুন বৌকে আনা যাচ্ছে না। অবশ্য ও'রা কিছু বলছেন না, বরং আমার অবস্থা দেখে অপ্রস্তুতই হয়ে পড়েছেন—মেয়ে আমাদের, কিন্তু বাড়ি তো ও'দেরই, বলছেন না কিছু, আমি কিন্তু লজ্জায় সুরধামে পা দিতে পারছি না। তারপর এই দিন তিনেক হোল সব মুশকিল আসান দাদা।'

'কি করে?'—আগ্রহের সংগেই প্রশ্ন করলাম।

একটু যেন ভেবে নিল গোবর্ধন, বলল—'ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করেন দাদা? এমনি না করুন, আমার মতন বেকায়দায় ফেলে যখন ঘাড় ধরে করান তখন তো করেন নিশ্চয়?'

হেসে বললাম—তা করতে হয় বৈকি।'

আহারে রুচি নেই, ঘুমুতে গেলেই আরসোলার স্বপ্ন—সোনা যেন আংকে পা জড়িয়ে চিৎকার করছে, আরও সব বুমমারি কান্ড, ভাবলাম কলকাতায় একবার পিসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, নৈলে পাগল হয়ে যব। পিসতুতো বোন অমলী এসেছে, তার ছোট ছেলেটা বলল—মামা চলো, পার্কে নতুন ঠাকুর বসিয়েছে, দেখে আসি। একটা হাত পাঁচ-ছয় উঁচু গম্বুজের নীচে একটা কাল পাথরের মূর্তি। ধ্যানাসনে বসে আছেন। মহাদেব নয়, তাহলে গলায় সাপ জড়ানো থাকত, বিবেকানন্দ নয়, তাহলে আলখাল্লা-পাগড়ি থাকত। একেকে মহাদেব না হলেও যেমন করে চোখ বুজে যোগাসনে বসে আছেন, কোন দেবতা বলেই মনে হয়, পাপী হ? তেত্রিশ কোটির মধ্যে কাজনকেই বা জানি দাদা? তবে হঠাৎ কেমন মনে হোল শিবের মারফৎ খবর দিয়ে ডেকে এনেছেন, একটা ভক্তি করে প্রণামটা সেরে নি, দেখি যদি আরসোলার সমস্যাটা মিটিয়ে দিতে পারেন। সন্ধ্যা উৎরে গেছে, বেশ অনেকক্ষণ ধরে পায়ের কাছে মাথা চেপে বসে রইলাম দাদা।

সেই রাত্রেই স্বপ্ন। হাতে বরাভয় মুদ্রা, বলছেন—অত ভয় পাচ্ছিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে, করে দিচ্ছি ব্যবস্থা।'

পরের দিন সকালে কি ঠাকুর তাও টের পাওয়া গেল।'

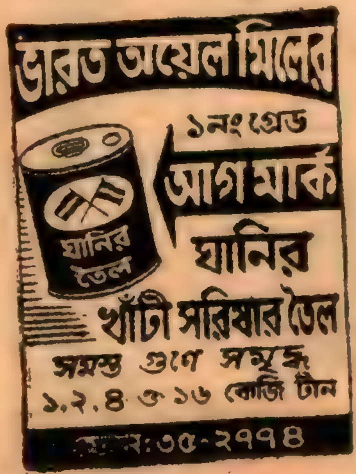

প্রশ্ন করলাম, 'কে ছিলেন।'

গোবর্ধন বলল—একেবারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেবের গ্রেডের নয় দাদা, তবে অবতারেরাও তো ঠাকুরই। সকালে চা-টা খেয়ে পিসীদের বাইরের বারান্দায় বসে বাড়ির কয়েকজন মিলে গল্প করছি পাড়ার একটি ছেলে একটা লোককে সংগে করে এনে বলল—'চাকর রাখবেন? লোকটা চাকরি খুঁজছে।'

চিনেম্যান। পিসতুতো ভাই বিষ্ণুদা বললেন—'চিনেম্যান, ও আমাদের কি চাকরি করবে!'

আমার ধাঁ করে রাত্তিরের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল দাদা তাহলে নির্ঘাৎ খোদ বুদ্ধদেব এসেছিলেন, ভক্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোকটা বোধ হয় নতুন কলকাতায় এসেছে, কেমন যেন না খেতে পেয়ে শুকনো, আলু-থালু চেহারা, বয়েস তো বোঝবার জো নেই ওদের, তবে মনে হোল তিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। নাম বলল—ফুংচিন লাও, কি মানে হয় বুঝিনে দাদা। তবে চিনেম্যান আরসোলা খাওয়ার যম, আমার কাতরানি দেখে যে ভগবান বুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওদিকে ভক্তেরও একটা সুরাহা—এতে আর তো সন্দেহ নেই তখন আমার। ওদের বললাম—আমি দেখব চিনেম্যান কেমন চাকর হয়। সেই দিনই দুপুরের গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে। স্টেশনে নেমে সোজা সুরধাম রমানাথ কাকার বাড়ি। সবাই অবাক হয়ে গেছে বললাম, অবাক হওয়ার অনেক বাকী আছে এখনও, আগে গিয়ে ওপরের ঘরটা খুলে দাও।'

ফুংচিনকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম, পেছনে বাড়িসুদ্ধ আর সবাই। সবাই হার মেনে এলে দিয়েছে, নির্বিচারে রাজ্য করছে আরসোলার দল। জানালায়, খাটে, আলমারিতে, তাকে—ছুটছে, বসছে, উড়ছে, খেলছে, মেয়েমদ্দ, বাচ্চা, ফুংচিন ঢুকেই আহ্লাদে এক হাততালি! না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত দাদা, আমার মনে হোল সেই যেন হাততালি শুনে যত আরসোলা, এন্ডাবাচ্চা-সুদ্ধ, একবার যেন মাথার ওপরকার ডাবড্যাবে চোখ নিয়ে 'থ' হয়ে গিয়ে চাইল, তারপরই পালাবার ঘটা, দরজা দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে, ওপরে স্কাই-লাইট দিয়ে কতকগুলো লুকিয়েও পড়ল, ঘরের নালায়, আলমারির ফাঁকে, দেখতে দেখতে ঘর পরিষ্কার। তার মধ্যেই ফুংচিন একরাশ ধরে নিয়ে বেলো জামার কোঁচড়ে ভরে ফেলল। আর সে কী খাওয়ার ঘটা দাদা! না দেখলে বিশ্বাস হয় না, সে এক চীনেম্যানই পারে। বলেন তো একদিন ডেকে এনে দেখাই। ওর খোরাক নিশচয় আছে বাড়িতে?'

হেসে প্রশ্ন করলাম—'আছে এখনও?'

'কী বলছেন দাদা! ফুংচিন যেতে চাইবে, না, চাইলেই ছাড়বে কেউ? কদিনে বাড়ি সাফ করে দিয়েছে, রোজ পাড়ায় ডাক। খোরাক আরসোলা। কাঁচা, ভাজা, বাসি, তাজা। আর, বাটিতে করে বাটি করে ভাত খাওয়া—একটা তামাসাই তো—লোকে ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছে। তামাসাই, তাতে পয়সাও আছে। বাটি-পিছু দু আনা, কোন না দু টাকা আড়াই টাকা এসে যাচ্ছে? সেই শুকনো, ফ্যাকাশে, হলদেটে চেহারা, এখন দেখলে আরসোলার মতন রং ধরে আসছে।

'আর সোনা, তার খবর কি?'—প্রশ্ন করলাম আমি।

'ভালো দাদা, খুবই ভালো। আজ-কাল সেই সোনা আপনাদের ভাষায় আদর্শ পুত্রবধূ। কাজেকর্মে, সেবা-যত্নে। আর, মুখে হা সাটি তো লেগেই রয়েছে। একদিন নিয়ে যব আপনাকে, রমানাথ কাকাও চান পরিচয় করতে। আমার কাছে শোনেন কিনা...আচ্ছা, একটা কথা দাদা...'

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল।

ও এসে ওর ফ্যাসাদের গল্প যে বলে, তার অতিরিক্ত একটা উদ্দেশ্য কখনও কখনও থাকে, অনেক সময় সেইটেই আসল। জানা আছে বলেই বললাম—'কিছু যেন বলবে মনে হচ্ছে গোবর।'

'ইয়ে'—বলে ঘুরে চাইল গোবর্ধন—'ফুংচিনের মতন একটা—কি যে বলে, আরসোলা-হান্টার পেয়ে আমার মনে হোল—যদি আরসোলা-চালানের একটা কারবার ফাঁদা যায়—কন্ট্রাক্ট করে—আগে এখানকারই চীনেপটি—তারপর জাহাজে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর হংকং—দরকার মতো স্টাফ বাড়িয়ে—আং, ইঁদুর নির্মূল হয়ে যাচ্ছে—ফরচুনেটলি এ দিকটায় এখনও কারুর নজর পড়ে নি—ফং চিনকে বলেছিলুম, সে তো জ্যাম প্ল্যাড—দশের উপকার, দেশের উপকার—তার ওপর—যদি কপাল খুলে গেল তো..'

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, আমার মৃদু হাসির সংগে নিরুত্তর হয়ে ভাবতে দেখে চুপসে গিয়ে একটু সপ্রতিভ হবার পাড নিজেই বলল—'নাঃ, থাক, কি বলেন? একটা ফ্যাসাদ কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতে—আর একটা—ঐ যেমন বললেন আপনি—ডেকে আনাই তো...উঠি দাদা ছাতা আর নিলাম না। কার জন্যে মিছি-মিছি বওয়া দাদা, নয় কি?'

সামাজিক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নীলার বিয়ে কিছুতেই কোথাও ঠিক হচ্ছে না, এই নিয়ে রজতবাবুর জীবনসন্ধ্যাতে অশান্তির শেষ ছিল না। নীলার মা রেণুকা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত — দিনমানে প্রায় কখনই তাঁর নাগাল পেতেন না, বাজার - রেশন - ওষুধ-ডাক্তার-টিউশানী-অপিসে নিরন্ধ্র করে রেখেছিলেন তাঁর নিরবসরটিকে—এই নিয়ে অনুযোগ করে যেতেন আর রজতবাবু নিজের অক্ষমতা ও নিরপরাধ প্রমাণের এবং নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করতেন।

এ বহুদিনের কথা, নীলার বিয়ে আর হল না, এই হতাশা নিয়েই এক-দিন রজতবাবু ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এ-সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে, যাদের রেখে যাচ্ছেন তাদের একবারে উপবাস করে কাটাতে হবে না। কারণ, নীলা তার আগেই একটা চাকরিতে ঢুকেছে।

রেণুকার আপসোস ও আপসানি অবশ্য যায়নি। বরং বিলাপ ও পরিতাপ বেড়েছে। সেই সঙ্গে মৃত-স্বামীর উদ্দেশে অনুযোগ-অভিযোগও। পুরুষ-মানুষের দায় এসব, এ কি আমার করবার কথা? উঠে পড়ে লাগলে কি আর মেয়েটার বিয়ে হত না! কালো নয়, কুলো নয়—সুন্দরী মেয়ে আমার, বি-এ পাস। নিজে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে দিব্যি সরে পড়লেন—এখন মর মাগী তুই! আমি এই বয়সে লোকের দোরে দোরে ঘুরি, ওগো আমাকে একটা পাত্তর দেখে দাও গো, ওগো আমাকে একটা পাত্তর দেখে দাও গো!

সত্যি, বিধাতার বিচার বটে। আমাকে যদি আগে নিত তাহলে আর এসব দেখতেও হত না, বলতেও হত না। যার দায় সে বুঝত, পারত দিত, না পারত মেয়ের রোজগারে বসে খেত। আমার কি তাতে!' ইত্যাদি—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন নীলা নিজেই তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করল তখন তার মা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন একেবারে। সে স্তব্ধতা অনুযোগের বা দুশ্চিন্তার কারণ দূর হল বলে নয়—সে-নীরবতা স্বস্তির বা শান্তির নয়। কারণ তাহলে সেই সঙ্গে মুখে একটা অন্ধকার ছায়াও নেমে আসত না অমনভাবে।

এ-স্তব্ধতা ও বিষাদের কারণ অনেক। তার খানিকটা নীলা জানত বা অনুমান করতে পেরেছিল—সবটা পারেনি।

সাধারণত মেয়েরা এই ধরনের স্বয়ম্বরা হলে মেয়ের মা-বাবা বা অভিভাবকরা যে কারণে বিরূপ বা ক্ষুব্ধ হন—একেত্রে সে-কারণ কিছু নেই। নীলা যাকে পছন্দ করেছে সেও ব্রাহ্মণ, বি এস-সি পাস, সুশ্রী দেখতে, ভাল চাকরি করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সে-প্রমাণও রেণুকা পেয়েছেন। ভাল নামকরা ওষুধের কারখানার মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সাতশ' টাকা মাইনে পায়, এছাড়া টি-এ থেকেও কিছু বাঁচে। বিদেশেও নিয়ে গিয়ে ফেলবে না, দীর্ঘ অনুপস্থিতিরও ভয় নেই। বিমানের হুন্দো এখানেই—কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান।

এমন পাত্র ধনীর ঘরের রূপসী দুলালী মেয়েরও কাম্য।

তবে?

নীলা ভেবেছিল যে বিয়ের পর তার আয়টা বন্ধ হয়ে যাবে বলেই মায়ের দুশ্চিন্তা এত। সেই মতো সে একটা সান্ত্বনাও দিতে গিয়েছিল, 'আমি যে টাকাটা সংসারে দিতুম মা—এখন অন্তত কিছুকাল তা দিয়ে যেতে পারব, সে-কথা ওর সঙ্গে আমার হয়েই গেছে—ও বলেছে তোমাকে বিয়ে করছি তোমার জন্যেই, তোমার রোজগার খাওয়ার জন্যে নয়। স্ত্রীর রোজগারে বসে খাবার প্রবৃত্তি হলে অনেকদিন আগেই বিয়ে করতে পারতুম—এতদিন অপেক্ষা করব কেন? আমার হাতখরচা বলে যা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা তুমি দাও, সেইটেই রাখব—তার বেশী নয়।'

তার জবাব দিয়েছেন রেণুকা ভ্রূকুটি করে, 'যদি তোমার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যেত মা—সে-চিন্তাই যদি এত বড় হত, তাহলে তোমার বিয়ের কথা জ্ঞান জন্মে বলবই বা কেন, তার জন্যে এত ব্যস্তই বা হবো কেন?'

তবে?

প্রশ্নটা নিরুত্তরই থেকে যায়। এ এমন একটা কথা যা মেয়েকেও বলতে পারেন না রেণুকা।

যেদিন থেকে ওঁরা নীলার জন্য ছেলে খুঁজতে শুরু করেছিলেন সেদিন—অর্থাৎ সে-সময় রজতবাবুর হাতে কিছু টাকা ছিল। বেশী নয় অবশ্য, হাজার আষ্টেক টাকা—এই টাকাটা তিনি অতিকষ্টে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে মানে এর মধ্যে লাইফ ইনস্যুরেন্সের একটা টাকাও ছিল, সেটা খরচ না করে—নীলার বিয়ের জন্যেই চিহ্নিত করে রেখেছিলেন।

নীলা তখন সবে বি-এ পড়তে শুরু করেছে। ডাকসাইটে সুশ্রী না হলেও সুশ্রী মেয়ে, লেখাপড়ায় ভাল, বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। ওঁরা ভেবেছিলেন ওঁদের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মাঝারি পাত্র পাওয়া খুব কঠিন হবে না। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, রেণুকার মাসী' ভাষায় বে-র ফুল ফোটেনি বলেই সম্ভবত সে-রকম 'আনে-নেয়-খায় দায়' এবং অন্তত বি-এ পাস পাত্রও একটা পাওয়া যায়নি। ওঁরা যাকে পছন্দ করেছিলেন, সে বা তার অভিভাবকরা মেয়ে ও মেয়েব ঘর পছন্দ করেননি যারা করেছে তাদের ঘরে এঁরা মেয়ে দিতে চাননি।

এইভাবেই সময় কেটেছে। বছরের পর বছর।

নীলা বি-এ পাস করেছে। এম-এও পড়েছে বছর দুই। তারপর আরও দু বছর বসে থেকে একটা চাকরিও খুঁজে নিয়েছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা বড় ওষুধের দোকানে চাকরি। সেইখানেই এই পাত্র বিমানের সঙ্গে ওর পরিচয়। তাও চট করে কিছু হয়নি—কারণ এই সময়ই একদিন, প্রায় বিনা নোটিশে রজতবাবু মারা গেছেন। আপিস থেকে ফেরার পথে অভ্যাসমতো বাজারে ঢুকেছেন একবার, সেইখানেই নাকি শরীরটা খারাপ লেগেছে, তা সত্ত্বেও দরকারী জিনিসগুলো কিনেছেন, শেষে খুব খারাপ লাগতে একটা রিকশা করেছেন, কিন্তু রিকশা থেকে নেমে সেই যে চত্বরে বসে পড়েছেন—আর ওঠেননি।

অপর পক্ষেও খুব তাড়া হয়নি। বিমান হালকা ধরনের বা আবেগপ্রবণ কাঁচা ছেলে নয়। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা বেশ কিছুটা পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ। ...ফলে পরস্পরকে চিনতে বুঝতে নিঃসংশয় হতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। সময় দিয়েছে দুজনেই, অপরকে বুঝে-নিয়েছেই।

কিন্তু এর মধ্যে বহির্জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

সরকার এর ভেতর বার বার সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের কাছে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে-হার দেখিয়েছেন—বাস্তবের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক থাকে নি। সরকারের স্বীকার-করা হারও যথেষ্ট চড়া—কিন্তু তা আসল বাজার-দরের ধারে-কাছেও যায় না।

আপিসের মাইনে অবশ্য বেড়েছে। তবে এমন বাড়েনি যাতে এই হু-হু-ছুটে-যাওয়া ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা যায়।

এ অসাম্য শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকেই। পাপচক্র—যাকে ইংরেজীতে 'ভিসিয়াস সার্কল' বলে—তার পাকে পড়ে একদিকে যেমন পাঁচ-দশ টাকা করে বাড়তি বৃদ্ধি হয়েছে—মানে নিয়ম-মাফিক ইনক্রিমেন্ট ছাড়া — অপর দিকে তেমনি তার অনুপাতে দ্বিগুণ তিন-গুণ চড়ে গেছে বাজার-দর। ফলে টানাটানি, পুঁজি ভাঙা ও শেষ পরিণতি ঋণ করা—কোনটাই বন্ধ হয়নি।

এর ভেতরেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়েছে। পেট বাড়েনি সত্যি কথা—কেউই বেশী খায় না এ-বাড়িতে। তবে তাছাড়া সব খরচাই বেড়েছে। কাপড়-জামা, বই-খাতা, লোকলৌকিকতা—সমস্ত খাতেই বিপুল ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে। তবু তো খুব বড় সংসার ওঁদের নয়—মাত্র তিনটিই ছেলেমেয়ে। 'দো যা তিন বচ্চে, বাস।' সরকারী এ-উপদেশ লঙ্ঘন করতে হয়নি রজতবাবুদের—কিন্তু সেই তিনটিকে মানুষ করতেই প্রাণান্ত ঘটেছে। নেহরুজীর স্বপ্ন জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি'র যে এই পরিণতি হবে, মধ্যবিত্ত সমাজ যে জাতির সে উচ্চমার্গে যাবার রথের চাকায় এমন-ভাবে পিষ্ট হবে, নেহরুজী বোধহয় তা কল্পনা করেননি।

বর্তমান কালের ইস্কুলে পড়ানোই তো এক শোচনীয় অভিজ্ঞতা।

মাঝারি ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও যা বায়নাক্কা, —বিশেষ মেয়ে ইস্কুলের, তাতে মনে হয় ব্যবস্থা কোন কোটিপতি-প্রধান দেশের মতো। রজতবাবুদের বাল্যকালে এসব ছিল কল্পনার বাইরে। এসব বাহুল্য আড়ম্বরকে তখন অনাভিপ্রেত মনে করা হত। রজতবাবু আমরণ এই সবিস্ময় প্রশ্ন করে গেছেন সবাইকে—যে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হেড-মিস্ট্রেসরা বা স্কুল কমিটির মেম্বাররাও কেমন করে অনায়াসে এই অকারণ ব্যয় বহুলকে প্রশ্রয় দেন, নিজেরাই প্রস্তাব করেন। মেয়েদের এক রকমের এক রঙের শাড়ি কি ফ্রক পরে ইস্কুলে আসতে হবে, ছেলেদের এক ধরনের পোশাক পরতে হবে—এ-দাবী কেন আমরা করব? এর সার্থকতা কি—এই প্রশ্নটা সুস্থ মস্তিষ্কে সহজভাবে কেউ করে দেখেনি বোধহয়। শুধুই একটা

বিদেশ থেকে আমদানী-করা ফ্যাশানের হাওয়ায় ছেলেছেন। যে-দেশের নেতা দেশের 'ইউ নটি ইন ভাইভার্সিটী'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, গৌরবান্বিত—সে-দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমন ইউনি-ফর্মের নেশায় পেয়ে বসে কেন?

এ-বিলাসিতার আড়ম্বরের খরচ টানতে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে, ঝগড়া করতে পারেননি।

ইস্কুলে জায়গা পাওয়াই যেখানে সৌভাগ্যের কথা সেখানে আবার অনু-যোগ অভিযোগ করবে কে? ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। 'তোমাদের না পোষায় তোমরা অন্যত্র যাও'—এ-কথা তো পড়েই আছে।

তবু একরকম করে চলেছিল, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে—কাতরোক্তি অসন্তোষ প্রকাশের পথ বন্ধ করে ঐ সঞ্চয়টুকু করেছিলেন রজতবাবু, কিন্তু সে সঞ্চয় কোন সুদূর বিবাহের জন্যে ধরে রাখতে পারেননি। আগামীকালের থেকে বর্তমানের দাবী অনেক বেশী প্রকট, অনেক বেশী বাস্তব।

খরচ বেড়ে গেছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার প্রতি পদে। খাওয়ার খরচ, পড়ার খরচ, পড়ার খরচই শুধু নয়—বাড়িভাড়া গাড়িভাড়া ওষুধের দাম, তেল সাবান সবক্ষেত্রেই প্রতিদিন খরচ বেড়েছে। লৌকিকতার খরচই কি কম বেড়ে গেছে! রজত-বাবুর বাল্যকালে দেখেছেন কোন বিয়েতে দুটো টাকা দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখলেই যথেষ্ট হত—কিম্বা একটা পাঁচ-সিকে দেড় টাকা দামের সিঁদুরকৌটা, কি বই। শুধু নিকট আত্মীয়েরা আই-বুড়োভাতের ধুতি বা শাড়ি দিতেন—যে পক্ষের যা। এখনকার মতো শাড়ি হাতে বৌ দেখতে আসার এত রেওয়াজ ছিল না।

এখন উপহার দেওয়া হয় পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শাড়ি তো তুচ্ছ—পঁচিশ ত্রিশ টাকার শাড়ি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। আত্মীয়দের সোনা না দিলে মন ওঠে না। অনাত্মীয়রাও যে যতটা পারেন —যা সাধ্য, তার থেকে অনেক বেশী খরচ করে মহার্ঘ উপহার দিয়ে নিজেদের সম্ভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

এ কাজ রজতবাবুকেও করতে হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর রেণুকাকেও। সমাজে বাস করে যুগধারার বিপরীত স্রোতে যাওয়া যায় না। যে পারে সে মহাবীর, মহামানব। সবাই গান্ধী নয়। মনে মনে যা-ই বলুন, মুখে যতই বিলাপ করুন —ঐ স্রোতেই গা ভাসাতে হয়েছে। তার ফলে—রজতবাবুর জীবদ্দশাতেই ও টাকায় হাত পড়েছে। কিছুটা ভাঙতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রেণুকাকে তো হয়েছেই, ক্রমশ সে টাকায় আর কিছুই বাঁচিয়ে রাখা যায় নি।

আসলে সেই কারণেই এতটা অন্ধ-কার হয়ে উঠেছে রেণুকার মুখ।

কোথাও যে কিছুই নেই আর। একে-বারেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন যে তিনি।

বিয়ে মানে সহস্রবিধ খরচ। বরপণের প্রশ্ন নেই সত্য কথা —এ ক্ষেত্রে সে প্রশ্নই উঠতে পারে না—কিন্তু তা ছাড়া আর সবই তো আছে। কোন খরচটা বাদ দেবেন তিনি, দিতে পারবেন?

জামাই নিজেই একরকম বরকর্তা। ছেলের বাবা আছেন কিন্তু ছেলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে সম্বন্ধ ঠিক করেছে বলেই সম্ভবত—তাঁর মতামত পছন্দ অপছন্দর জন্য অপেক্ষা করে নি—কোন কথায় বিশেষ থাকছেন না। না গ্রহণ না বর্জন নীতি স্থির করেছেন। বলেই দিয়েছেন —যা করতে বলবে করব, যখন যেখানে যেতে বলবে যাবো। আমাকে তো দরকার নৈর্বাদ্যের চূড়োয় মণ্ডপ বসাবার মতো—লোককে কর্তা একটা দেখাবার জন্যে—তা সে পার্ট পারফেক্টলি প্লে করব, কোন ভয় নেই। আমার হাতে যখন টাকা নেই, বেটার বেতে এক পয়সা খরচ করতে পারব না—যা করবে ছেলেই করবে—তখন আমি আর ওর মধ্যে নাক গলাতে গিয়ে বাকতাইয়ে পড়ি কেন। নিজের জোর থাকত— অর্থে বা অধিকারে—আসল বরকর্তার কাজ করতুম নিজের ওপর সব দায়দায়িত্ব নিয়ে। ছেলে পাত্রী ঠিক করেছে নিজে—আমার ওপর তো নির্ভর করে নি—আমি সেখানে ওপরপড়া হয়ে বাবাগিরি ফলাতে গেলে মেয়েপক্ষ যে ঠাস করে গালে চড় মারবে।

সুতরাং তাঁরা যে কিছু চান নি—সেটা উদারতা নয়, বরং তার উল্টো। কোন কথায় থাকবেন না বলেই এ তুষ্ণী-ভাব তাঁর—এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে যা হচ্ছে সব ব্যবস্থাটা তাঁর পছন্দ। এ পাত্রী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছেন বললে যদি বা কিছু বেশী বলা হয়—খুশী যে নন এ বিয়েতে এটা নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে কিছু না দিলে তাঁর হাতেই শাণিত অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে—ভবি-ষ্যতে কথা শোনাবার, টিটকিরি দেওয়ার।

বরের বাবা ছাড়াও বহু লোক আছে সেখানে। অন্য আত্মীয়-স্বজন—মামা, কাকা, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোন—আপন-দূরসম্পর্ক মিলিয়ে অনেক। তাদের সকলের কাছেই পাত্রের মাথা হেঁট হবে—এক বস্ত্রে মেয়েকে পাঠালে। অমন সোনারচাঁদ ছেলে তাদের, অমন সুপাত্র—অপর জায়গায় রীতিমাফিক সম্বন্ধ হলে মেয়েপক্ষ জিনিস ঢেলে দিত। আলমারী (স্টীল), ড্রেসিং টেবল, খাটবিছানা, আলনা, সোফাসেট তো বটেই—এসব তো মামুলী—ফ্রীজ, রেডিও, ডাইনিংটেবিল, স্কুটার—কত কীই যে দেয় আজকাল—সব জিনিসের নাম বা ব্যবহারও জানেন না রেণুকা—তবে অনেক জায়গাতেই দেখছেন আজকাল, দেওয়ার কি বিচিত্র ঘটা। মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে মনে করে করে—কোন সুদূর ভবিষ্যতে কোন দিন কাজে লাগতে পারে ভেবে—কত বিলাস ও আরামের উপকরণ দেয় আজকাল মেয়ের বাপেরা, মেয়ে-জামাই তথা পাত্র-পক্ষকে।

তাও, সে সব তো সেখানকার কথা। এমন মেয়ে তাঁর—তাকেই বা সম্পূর্ণ নিরাভরণা কেমন করে পাঠাবেন রেণুকা?

রূপসী মেয়ে, গুণের মেয়ে—যে এত-কাল তাঁদের সুযোগসুবিধা দেখে, তাঁদের ভরণপোষণ করেই এমন নিঃস্ব হয়েছে, কখনও নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে নি, কিছু জমিয়ে রাখে নি—তাকে তিনি কোন্ প্রাণে কোন বিবেচনায় ভিখিরীর মেয়ের মতো সম্প্রদান করবেন—শুধু রুলি কড় পরিয়ে? অথচ, কোনমতে একটা একটা করে—চলনসই কি দরিদ্র হিসেবে—গা-সাজানো গহনা দিতে গেলেও তো অন্তত পনেরো ভরি সোনা লাগবে, বর্তমানে যা বাজার-দর—তাতে ছ সাত হাজার টাকার খেলা।

কিছুই যে নেই তাঁর। সত্যিই কিছু নেই।

মেয়ে কবছর ধরে রোজগার করেছে সত্যি কথা। রজতবাবুও কিছু রেখে গিছলেন—বিশেষ কিছু না হলেও এমন নিঃস্ব হবার মতো নয়, প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো ছিল একটা পোস্ট-অফিসের খাতায়। অফিস থেকে রেণুকাকে একটা সামান্য পেনসনও দেয়—তিনি রিটায়ার করে যেতে পারেন নি বলে। বড় ছেলেটাও—নীলার চেয়ে

ছোট—অনেক দুঃখে বিস্তর ঘুরে-কেঁদে-কঁকিয়ে একটা চাকরিও পেয়েছে। সাধারণ সরকারী চাকরি। ব্যাঙ্কের মতো কি অন্য প্রাইভেট ফার্মের মতো মাইনের চমক নেই—তবে আজকাল সরকারী চাকরিও একেবারে নগণ্য নয়।

এসব কথাই বলবে লোকে। কিন্তু ঐ টাকা যে প্রয়োজনের হিসেবে কিছুই নয় —একথা কাকে বোঝাবেন তিনি? বাইরের লোক তো দূরের কথা, মেয়েকেও বলা যাবে না। সে এই কবছর প্রাণপাত করেছে বলতে গেলে, নিজের একটা শখ-শৌখিনতা করে নি, কোন শখ কি সাধের কথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করে নি। যা পেয়েছে উদয়াস্ত খেটে, মাসকাবারে সম্পূর্ণটাই এনে মায়ের হাতে ধরে দিয়েছে। যা চল্লিশ পঞ্চাশ —হাত তুলে না দিয়েছেন তাতেই বাসভাড়া, হাতখরচা টিফিন সব চালিয়েছে। রেণুকা কোন-দিন হিসেবও নেন নি যে এতেই ওর চলে কিনা। ...ভাইয়েরা কেমন করে মানুষ হবে, সংসারটা কিসে বজায় থাকবে—এই ছিল ওর একমাত্র চিন্তা, সাধনা, ধ্যান জ্ঞান।

তার বদলে আজ ওকে একথা বলা চলবে না যে, হাতে এখন টাকা নেই, সুতরাং হয় বিয়ে পিছিয়ে দাও, না হয় এক বস্ত্রে, চেলির কাপড় কি বড়জোর একখানা ধনেখালির ডুরে শাড়ি পরে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসো। আমরা তোমাকে কিছুই দিতে পারব না, এক জোড় বালাও না।

সে বুঝবেও না এত টাকা কিসে গেল। যার উপার্জন, যে সে কষ্টের টাকা দিয়ে খালাস—তার কাছে সে টাকা 'এত টাকাই'—তা 'তার অঙ্ক' যেমনই হোক। সেই জন্যেই, মা যে তার বিয়ের জন্যে চিহ্নিতকরা ঐ সামান্য টাকাও ভেঙে খেয়েছেন—একথা শুনলে সে বিস্মিত হবে, ক্ষুব্ধ হবে। হয়ত ক্রুদ্ধও হবে। এটাকে তার প্রতি অবিচার বলে মনে করবে। অথচ ঈশ্বর জানেন, রেণুকা কত চেষ্টা করেছেন—প্রাণপণে লড়াই করেছেন বলতে গেলে—ঐ টাকা কটা বাঁচিয়ে রাখতে। ছেলে তো এই সম্প্রতি চাকরিতে ঢুকেছে। তার আগে ওঁর পেনশনের একশো পঁয়ষট্টি টাকা আর মেয়ের তিন সাড়ে তিন—এই ভরসা ছিল। তাতে কি আর এই চারটে প্রাণীর খাওয়া-পরা লেখাপড়া চলে? সে সঙ্গে লোকলৌকিকতা—নিজেদের ভদ্রতা বজায় রেখে?

মেয়ে শুনলে বলবে, 'আমাদের জানাও নি কেন, আমরা আরও কষ্ট করতুম। একবেলা উপোস করে থাকতুম সেও ভাল —এমনভাবে পথের ভিখারী হতে গেলে কেন?'

তা যে হয় না—উপবাস করলেই যে সব সমস্যা মেটে না, তা আর ওকে বোঝানো যাবে না। একবার বলেছিল নীলা, 'এইসব নেমন্তন্নে যাওয়া বন্ধ করো মা। আমাদের এখন এত কুটুম্বিতে বজায় রাখার অবস্থা নয়। বাবা গেছেন, আয় কমেছে—এখন এত সব কোথায় পাবো? ...এখন আমাদের দুঃখের সময়, শোকের সময়—আনন্দ করতে যাবোই বা কেন, উৎসববাড়িতে?'

এইটেই পারেন নি রেণুকা।

অনেকগুলো সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, কমিয়ে দিয়েছেন সৌজন্যের আদানপ্রদান তাদের সঙ্গে—সাধারণ বন্ধুবান্ধব কি পরিচিত যারা তাদের বাড়ি যান না, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের কাজেকর্মে না গেলে চলে না। আর গেলে লৌকিকতাও করতে হয়। রেণুকা জানেন—আত্মীয়দের কাছে মাথা হেঁট না হয় কোনদিন, তারা না অবজ্ঞা উপেক্ষা করতে সাহস করে—এ চিন্তা ছিল রজতবাবুর কাছে চিরজাগ্রত সাধনার মতো। সত্যিই মাসের শেষ সাত দিন ডাল—ভাতের বড়া চালিয়েও ভাগ্নীর বিয়েতে দেড় ভরির মটর মালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে বছর মারা যান সেই বছরেও।

আরও সেই জন্যেই এইগুলো পরিহার করতে পারেন না রেণুকা। আত্মীয়রা গরিব ভাববে, নিঃস্ব দীন ভাববে—এ চিন্তাও যে ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। জেনে শুনে স্বামীর স্মৃতিকে অপমান করতে, তাঁর ধারণার প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করতে পারেন না।

আর, লোক-লৌকিকতাই সম্পূর্ণ দায়ী নয় এ অবস্থার জন্য। জীবন-যাত্রার সর্ব খাতেই ব্যয় বেড়েছে—তার মধ্যে শুধু খাওয়ার খরচটাতেই কিছু কমানো যায়, শরীরকে বঞ্চিত করে কিছু বাঁচানো যায়। আর কোনটা কমাবেন? কোনটা বাদ দেবেন? কিছুতেই আয়-ব্যয়ের দুই প্রান্ত টেনে মেলাতে পারেন নি বলেই—তিলে তিলে, একটু একটু করে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ষাট করে ভাঙতে হয়েছে। কোন মাসে বেশীও—ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার কী জন্য দেবার মাস-গুলোতে তো কথাই নেই। তাও—এই পুঁজি ভাঙার সব দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপালেও চলবে না, স্বামী বেঁচে থাকতেই তা শুরু হয়েছে—তিনিই শুরু করে গেছেন।

শুধু কি নেই জমা টাকা থেকেই ভাঙা হয়েছে। এক একখানা করে তাঁরও সামান্য যা ছিল, ধুলিগুঁড়ি—গহনা বেচে এই সংসারে 'তালাপুঁজি' দিতে হয় নি? ওগুলো থাকলে আর ভাবনা কি ছিল? অন্তত গহনার সমস্যা তো থাকত না। পনেরো ভরির সোনা অনায়াসে তিনি বার করতে পারতেন। আজ যে কিছুই কোথাও নেই।

এই তাই, ছেলের চাকরি হবার আগে দুদিন মাস শুধু হাতে ধার করতে হয়েছে কারও কারও কাছে। অতি সামান্যই বাড়িভাড়া, আজকালকার অনুপাতে নামমাত্র—বহুকাল আগের ভাড়া বলেই এখনও মাসিক ষাট টাকাতে বাস করতে পারছেন, বাড়িওলা কোনমতেই তুলতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, প্রার্থনা করছেন বাড়ি ভেঙে পড়ুক—তাও তিনমাস বাকী পড়েছিল। বলাইয়ের চাকরিটা এই সংকটঘন মুহূর্তে হয়ে গেল তাই কোন মতে মাথা উঁচু করে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন। এর ভেতর মেয়ের বিয়ের টাকা কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবেন?

এসব কথা মেয়েকে বলা যাবে না। সে, সে কেন ছেলেরাও, মুখে সব বড় বড় কথা বলে। আদর্শ উপদেশ কেতাবে পড়া বিদ্যের ওপর নির্ভর করে তারা বাস্তব জীবন সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। যে হাতে-কলমে না সংসার চালায় এই বাজারে —তাকে কিছুতেই এই টাকা-আনা-পাই'এর অঙ্কটা বোঝানো যাবে না। ...বিশেষ এতদিন যে ও'দের জন্যে স্বার্থ-ত্যাগ করে এসেছে—এখন বাপ-মায়েরই এই অবশ্য কর্তব্যের দায় থেকে তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে যদি শোনে যে, তার সুখের জন্য প্রায় বিগতযৌবন জীবনের এইটুকু নিরাপদ আশ্রয়, শেষ জীবনের আশা ও বাসা—পা রাখার মতো এই তলটুকুর জন্য—তাও সবই তো সেই করেছে, এখন সামান্য শেষ অনুষ্ঠানটুকু করার মতোও সামর্থ্য নেই এ'দের, সব ঘুচিয়ে বসে আছেন না, তাহলে তার মন ও রসনা দুইই বিষাক্ত হতে বাধ্য। যে কোন মেয়েরই হত। সংসারকে এতটুকু যেন চিনেছেন রেণুকা।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা গেল না।

বিবাহ বন্ধ করাও গেল না—পিছিয়ে দেওয়াও গেল না।

ওরা নিজেরাই দিন স্থির করেছে, রেণুকা মৌন হয়ে থেকে সম্মতি জানিয়েছেন।

অবশ্য নীলা একবার বলেছিল, 'দ্যাখো, যদি তেমন বোঝ, এসব কলাই আড়ম্বরে দরকার নেই, সোজা রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাই তারপর ওর ঘরে গিয়ে উঠি কোয়ার্টারে। অবশ্য ওর বাবা খুবই ক্ষুব্ধ হবেন তাতে—কিন্তু সে আর কি করা যাবে।'

রেণুকা তাতেও রাজী হতে পারেন নি।

এমন পাত্রের সঙ্গে, স্বজাতে স্ব-ঘরে বিয়ে হচ্ছে—সেটাতে পাঁচজনকে ডেকে একটা সামাজিক অনুষ্ঠান করতে পারবে না! সে হয় না। এমনিই রজতবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আগেকার প্রতিষ্ঠা অনেকটাই গেছে—এভাবে মেয়ের বিয়ে হলে আর কিছুই থাকবে না। আত্মীয়রা মনে করবে যে মুখে যতই যা বলুক— নিশ্চয় কোন আজাত-কুজাতে বিয়ে

করেছে। কেউ বা মুখ টিপে হাসবে, কেউ বা নাক কুঁচকিয়ে। নানারকম বাঁকা কথা উঠবে, আলোচনা চলবে ও'দের কেন্দ্র করে। সবাই বলবে, অমুক চক্রবর্তী মশায় সংগে সংগে ফ্যামিলিটাই লোফার-দের ফ্যামিলি হয়ে গেল!

না, সে তিনি সইতে পারবেন না। তাই যদি পারতেন তাহলে এতকাল এত দুঃখ সহ্য করলেন কেন? নিজেরা সর্ব-স্বান্ত হয়ে আত্মীয়তার প্রাপ্য শোধ করলেন কেন? ...বিয়ে তিনি দেবেন মেয়ের —বিয়ের মতো করেই। সমারোহ না হোক, কোন ফাঁক তিনি থাকতে দেবেন না কোথাও। 'আমাদের ঘরের কাজে ঘটা নেই, জ্যাটা আছে'—ও'র শাশুড়ি প্রায়ই কথাটা বলতেন, সেটার অর্থ আজ বুঝ-লেন। বুঝলেন যে সেটাও দরকার। আশপাশের বাড়িতে, পাড়ায়, আত্মীয়দের বাড়ি — নিম্নমধ্যবিত্তই সকলে—যেমন বিয়ে দেখেছেন, দেখছেন গত ক বছর ধরে, এ বছরও তিন চারটে দেখলেন—সেই মতোই আয়োজন করবেন। ও'র বোনঝি-জামাই সামান্য চার শ টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টার—সেও তো পনেরো ভরি সোনা, খাট বিছানা ড্রেসিংটেবিল, আলমারি দিয়েছে। তবে? তার চেয়ে কম দেবেন কি করে? সে তো সাধারণ কেরানী জামাই তবু!

তাই বলে তিনি যা কাণ্ড করলেন—বিয়ের দিন স্থির হবার পর—তার জন্যে বোধ করি তিনি নিজেও প্রস্তুত ছিলেন না।

নিতান্তই ঝোঁকের মাথায়, পাগলের মতো মরীয়ার মতো—বলা উচিত রেসের জুয়াড়ীর মতো করে বসলেন, অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে।

শুধু একটি তথ্যের ওপরই ভরসা করেছিলেন— প্রাণপণে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন — তিনি কোন অধর্ম করেন নি কোনদিন, তাঁর স্বামীও না, হরে-হর্মে কারও এক পয়সা নেননি কখনও, তাঁর ছেলেমেয়ে কেউ অসৎ নয়—মেয়েও তাঁর প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে কোন খারাপ পথে পা দেয় নি— তাঁদের বিপদ হবে কেন? কেন ভালভাবে, সুশৃঙ্খলে বিয়ে হবে না তাঁর মেয়ের? এত দুঃখের পর কেন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন না?

এই অত্যন্ত আবছা অস্পষ্ট একটা ধারণার ওপর ভরসা করে রেণুকা পাড়ার দোকানে গিয়ে খাট আলমারি ড্রেসিং-টেবিল বায়না দিয়ে এলেন এবং স্যাকরাকে ডেকে চুড়ি হার পাশা কঙ্কণ ও রিস্ট-লেটের অর্ডার দিলেন। ফার্ণিচারওয়ালাকে অবশ্য একশোটা টাকা আগাম দিয়েই চলে গিয়েছিল কিন্তু স্যাকরা সোনার দামটা পুরো চাইলেন, অন্যথায় সোনা। তাঁর কাছ থেকে হপ্তাদিনের সময় নিলেন রেণুকা। বিয়ের আর মাত্র দশ দিন বাকী সেদিন থেকে—তারপর টাকা পেলেও স্যাকরা আর গড়াতে পারবে না, বলে দিয়েছিলেন।

এরপর রেণুকা বেরোলেন ঐ ভাগ্যের ওপর ও ধর্মের ওপর বরাত দিয়ে টাকা ধার করতে। ভেবেছিলেন— এইখানটায় একটু চালাকিও খেলেছিলেন মনে মনে—ঠিক করে রেখেছিলেন বেশী টাকা তিনি কারও কাছ থেকেই চাইবেন না, তাহলে কেউই দেবে না। দুশো একশো করে ধার চাইবেন আত্মীয়দের কাছ থেকে। তাদের সকলকেই বলবেন, সামান্য কিছু কম পড়েছে, তাতে ভরসা পাবে তারা ধার দিতে। এতগুলো আত্মীয় তাঁর এই কলকাতায়— সাত আট মাইলের মধ্যে অন্তত বাইশ তেইশ ঘর—সবাই যদি দুশো টাকা করে ধার দেয় তাহলেই তো চার হাজার টাকা উঠে যাবে। ফার্ণিচারওলা কি অল্প হাজার খানেক টাকা বাকী রাখবে না? তা না হয় উনি তার পায়ে ধরবেন শেষ পর্যন্ত। ভদ্র-লোক, কায়স্থর ছেলে—তার সদ্ধর্ম আছে। স্যাকরার মতো নির্মম হবে না।

অবশ্য যা কেঁদেছেন উনি, চার হাজারেও হবে না। খাওয়া দাওয়া কিছুই তো ধরেন নি এখনও। কিন্তু সে চিন্তা পরে। তার জন্যে পরিচিত বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরা আছে। মেজো বলেছে অফিস থেকে হাজার খানেক টাকা ধার করার চেষ্টা করছে, ওদের নাকি এভাবে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, ওর জন্যে স্পেশাল কেস করতে সুপারিশ করে-ছেন ম্যানেজার, পেয়ে যেতে পারে। সে যা হয় তখন হবে। বেশী কাকেও বলবেন না, শ দুই বড়জোর, বরযাত্রী নিয়ে। আত্মীয়দের সবাইকে বাড়িসুদ্ধ বলবেন না সেজন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। অবস্থা বুঝতে অনুরোধ করবেন। তাও খাওয়াটা না হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশের দোহাই দিয়ে 'টিফিন' ব্যবস্থা করবেন। তাতে যদি নিন্দে হয় হোক, তার জন্যে ভাববেন না। এখন মেয়ে-জামাইকে যা দিতে হবে সেটার ব্যবস্থাই আগে দরকার।

কিন্তু তাও হল না—এমনই ভাগ্য!

কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল অত্যন্ত চালাকি এবং মনস্তত্ত্বজ্ঞানও ব্যর্থ হয়ে গেল। অত হিসেব কোন কাজেই লাগল না। দুশো কেন, একশো টাকাও দিলেন না কোন আত্মীয়।

তাঁদের তরফেও কিছু বলার আছে বৈকি!

কারও সদ্য মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কাকেও দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ্নীর বিয়ে দিতে হয়েছে, সব খরচ করে। কার বাড়িতে এক বছরের মধ্যেও কোন শিশু মারা গেছে—তা কী রোগে কী ভোগে—তাদের কিছু বলারও নেই। দেনা তাদের প্রত্যেকেরই আছে, আর সে দেনা শোধ হতে আগামী চার কি পাঁচ বছর লাগবে নিশ্চয়। এছাড়া কেউ বাড়ি করছেন—তিন হাজার টাকার এস্টিমেট ছিল, বাহাত্তর হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, এখনও বাইরে প্লাস্টারিং হয়নি, দেনায় মাথায় চুল বিকিয়ে আছে, নিজেরা একপাশে থেকে শুধু সেই দেনার সুদ গুনছেন। বাড়ীভাড়ার থেকে ঢের বেশী লাভ। কারও বা আবার সুখের দশায় অর্থাভাব, ছেলে-বৌকে আমেরিকা পাঠিয়েছেন। ছেলে স্কলারশিপ নিয়েই গেছে, কিন্তু তার গাড়িভাড়া সেলামী—বাবো হাজার টাকা গুনে দিতে হয়েছে ও'দেরই—কাল পাওনাদারের গালের ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কারও বাড়িতে হয়ত পর পর দু তিনটে কঠিন অসুখ গেছে—তাদের কাছে কথা পাড়াই গেল না। একজনের জামাইয়ের মাংসপেশী শুকিয়ে আসছে, ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ছে—তাকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে—তারই প্রত্যহ পাঁচিশ টাকার দরকার বলতে গেলে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারচেয়ে অনাত্মীয়দের কাছে সুবিধে বেশী হল।

স্বল্প পরিচিত পাড়ার তিন চারটে লোক, ছেলের এক বন্ধু—এ'দের কাছ থেকে বরং কিছু পাওয়া গেল। সব জড়িয়ে হাজারখানেক টাকা।

এবার পূজায় প্রত্যেক
ফিলিপ্স রেডিও ও

ট্রানসিসটারের সাথে
উপহার পাবেন
আপনাদের পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান :—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেডিও সার্ভিস্
৮, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৩-১৩১৫

এ টাকায় সবটাই ব্যাপারকে ধরে দিলেন রেণুকা, কিন্তু সে ভদ্রলোক তবুও ঘাড় নাড়লেন। এতে কি হবে. আড়াই ভরি সোনার দাম। কোনমতে দেড় ভরিতে একটা ফ্যাশানের হার আর ব্রোঞ্জের ওপর সোনাবাঁধানো ছ'গাছা চুড়ি হতে পারে। আরও তিন হাজার টাকা না পেলে রেণুকার ফরমাশমতো গয়নায় হাত দিতে পারবেন না সর্বানন্দ কর্মকার। তাও মজুরী এর মধ্যে তিনি ধরছেনই না।

এরপর দুটো দিন যেমন যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো ঘুরে বেড়ালেন রেণুকা। মনে হতে লাগল কী একটা ঘোরে রয়েছেন। সবাই কাছেন, নেমন্তন্ন চিঠি ছেপে এসেছে, লোকগুলো নিয়ে ছেলে-মেয়েরা যে যার নেমন্তন্ন সারছে—ওঁকেও লোকে হয়তো কোথাও কোথাও দুপারজন আসছে—ডেকরেটার কেটারার—সকলের সঙ্গেই কথা কইছেন, কিন্তু সে যেন আর কেউ, অন্য কোন প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, উনি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে শুনছেন শুধু। ইতিমধ্যে নীলা দাঁড়ান থেকে ব ব পেয়েছে সে দুশো টাকা হাতে এসেছে, হাজার টাকাই পেয়েছিল—একশো টাকা নীলা দিয়ে রেখেছে আর টুকিটাকি প্রসাধনদ্রব্য হাতখরচের জন্যে, তা থেকে ডেকরেটার ও কেটারিংকে কিছু টাকা চুকিয়ে দিতে হবে—এই চিন্তা আছে। তাও তারা দই মিষ্টি দেবে না, সে আলাদা ব্যবস্থা। ডেকরেটারও অন্তত আর আড়াইশো টাকা না পেলে কাজ শেষ করবে না।

এমনি হাজারো খরচ দানবে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্যাটারার-ওরা খবর পাঠিয়েছেন, মাল প্রায় তৈরী, তার কিছু টাকা চাই। সর্বানন্দ ব্রোঞ্জের চুড়িই ধরেছেন, হারও সওয়া ভরির বেশী হবে না। দু'গাছা করে-পাতলা-বালা চুড়ি ছিল নীলার হাতে, তা থেকে পাথা-কয়েকের মতো সোনা পাওয়া যাবে না বলে হ্যাঁ বা ওজন আরও কমাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর মজুরী। তিনি ফেলে রাখতে পারেন, কিন্তু এই বাজারে ঘর থেকে সোনা দিয়ে কারিগর খরচাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না।

এদিকে আর মোটে তিনটি দিন বাকী।

যা করতে হবে—এই একদিনেই।

কী করবেন রেণুকা—তাও ভেবে দেখছেন বৈকি। কদিন তো ক্রমাগত সেই কথাটাই ভাবছেন।

আর চব্বিশ ঘণ্টা দেখবেন তিনি। হয়তো এর মধ্যেই বা কী এমন অঘটন ঘটতে পারে, অদৃষ্টের চাকা ঘুরে যেতে পারে তবু তিনি জানেন না। তবে, কোন উপায় যদি না হয় তিনি আত্মহত্যাই করবেন।

এই একমাত্র পথ আছে এ অনুষ্ঠান বন্ধ করার।

সে গোলমাল হাঙ্গামায় এসব জিনিস—খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্ন কেউ তুলবে না। লোক এবং কেটারারীর প্রধান কর্তা বন্ধ হবে—কৌতূহল-কৌতুক-দুঃখে রসনাদের দর্শন-ভূষণ ক্লান্ত হয়ে এসে—মেয়ে-জামাই নিজের চুপি-চুপি রেজেস্ট্রী বিয়েটা সেরে নেবে। তখন আর এসব দেওয়া-থোওয়া—খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না।...

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই চরম উপায়টা ভেবে পেয়ে অনেকটা শান্ত এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছেন রেণুকা। অন্য উপায়ের কথাটাও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন।

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়েছে—তাঁর বাল্যের সহপাঠিনী মীনাক্ষী সরকারের কথাটা।

ছোটবেলায় খুবই ভাব ছিল দুজনে। একসঙ্গে ইস্কুলে আবৃত্তি করতেন—কর্ণকুন্তী সংবাদ কচ ও দেবযানী আবৃত্তিতে জুড়ি ছিলেন ওঁরা—গান গাইতেন ডুয়েটে। মীনাক্ষী বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের বৌ হয়ে গিয়েছিল—অত ধনী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি ওঁদের। তারপর বহু বহুকাল আর খবরও পাননি। শুনে-ছিলেন মীনাক্ষীর স্বামী কোন ইনস্যুরেন্স আপিসের বড় ম্যানেজার হয়ে লণ্ডনে গেছেন।

চিঠিপত্রের লেনদেন কোনকালেই ছিল না। হঠাৎ বছরখানেক আগে একদিন এক বিয়েবাড়িতে দেখা হয়ে গেল। শুনলেন মিঃ সরকার এখানেই এখন এক আই সি র এক কেষ্টবিষ্টু অফিসার হয়ে ফিরে এসেছেন। ভবানী-পুরের বিরাট পৈতৃক বাড়ী কোন ব্যাঙ্ককে ভাড়া দিয়ে দুই ভাই আলাদা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন, এই সম্প্রতি মিঃ সরকার নতুন বাড়ি করেছেন আবার।

মীনাক্ষীর নির্বন্ধাতিশয্যেই রেণুকা একদিন গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে। মীনাক্ষীও এসেছিল একদিন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বেশী মাখামাখি আর হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়। রেণুকা তাঁদের নিম্ন-তম মধ্যবিত্ততা সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন—তিনি এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে বা উৎসাহিত হতে নারাজ, মীনাক্ষীর বিহার-বিচরণের ক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত, তার অবসর কম।

ঘনিষ্ঠতা হয়নি বলেই নিমন্ত্রিতদের তালিকা করার সময় ওর নাম মনে পড়েনি। হঠাৎই পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল—এ বোধ হয় ঈশ্বরেরই নির্দেশ। অনেক টাকা মীনাক্ষীর, একটি শুধু মেয়ে সংসারে—খরচের পথ নেই বললেই চলে, কোন দায়দায়িত্বও নেই। ও যদি ইচ্ছে করলেই হাজার দুই তিন টাকা এখন দিতে পারে। গয়না অবশ্য আর আগের পরিকল্পনা মতো করা যাবে না—সময়ও নেই—ও না হচ্ছে তাই হোক, রেণুকার ওর সঙ্গে দুটো বারো মাসে হালকা বালা গড়িয়ে দিতে পারেন—তাহলেই সামনের হাতের দরিদ্রতা অনেকটা ঢেকে যাবে। ... এখন ক্যাটারারওয়ালা ও কেটারারকে টাকাটা দিতে পারলে—সেই সঙ্গে খুচরো বাজার—কোনমতে সামলে দিতে পারেন তবু। বাকী টাকার জন্যে পরেরদিনই কেটারার ডেকরেটার দই-মিষ্টিওলা গায়ের মাংস খুবলে খাবে—তা থাক, সে শুধু ওদের কাছে অপমান, তাতে বিয়েটা তো আর বন্ধ হচ্ছে না। বৃহত্তর আত্মীয়সমাজ কি নতুন কুটুম্ব-দের কাছেও দাঁড়িয়ে অপমানিত হতে হবে না তো!

সেই উদ্দেশ্যেই বেলা বারোটা নাগাদ একখানা রিকশা ডেকে যাত্রা করলেন রেণুকা। কাছেই বাড়ি, বাস ট্রাম কি ট্যাক্সির হাঙ্গামা করতে হবে না।

রেণুকা যখন উপস্থিত হলেন—তখন মীনাক্ষী ওদের ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা। চাকর সাহেবের লাঞ্চ নিয়ে আপিসে গেছে, ঝি গেছে দু-একটা খুচরো জিনিস কিনতে বাজারে। মীনাক্ষীই পাঠিয়েছে। মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে। ইকনমিক্স-এ এম-এ পড়ে সে।

মীনাক্ষীই 'পীপহোল' দিয়ে দেখে দরজা খুলে দিল এবং খুব কলরব করে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর একটু বিব্রত মুখে বলল, 'তুই এতদিন পরে এলি—কত সাধ্যসাধনার—আমি কিন্তু ভাই তেল মেখেছি—চান করতে যাচ্ছিলুম—একটু বসবি তুই? এই দশটা মিনিট? বড়জোর পনেরো—তার বেশী নিশ্চয়ই হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। যুব। তুই যা। আমি বেশ বসে থাকব।'

যে কাজে এসেছেন রেণুকা—তা সময়সাপেক্ষ। তাড়া করে কোনমতে কথা পাড়লে চলবে না। তেল মেখে আর মানুষ কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে?

ওর সম্মতি পেয়ে খানকতক কমার্শিয়াল-পত্র সামনে দিয়ে ভালভাবে বসিয়ে মীনাক্ষী নিশ্চিন্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকল। মুখে দশই বলুক আর পনেরোই বলুক—আধ ঘণ্টার ধাক্কা, তা রেণুকা বেশ জানেন। কিন্তু উপায় কি? চিরদিনই ওর চানে বেশী সময় লাগে। চপচপে করে তেল মেখে বেসন দিয়ে তা তুলে আবার সাবান মাখতে হয় ওকে—। তারপর আবার তার ওপর হালকা হাতে একটু সুগন্ধি তেল ঘষলো আছে। এতে নাকি চামড়া ভাল থাকে। ঐ তো কম-বয়েসে মেদপর্বত দেহ—রঙও ফর্সা। নয়—বরং মাজামজা করে, ও চামড়া কি আর

স্লেপিডেটের মতো মনোবল দেখাবে? হাসি পেল রেণুকার কথাটা ভেবেই।

কিন্তু একেত্রে হাসতে চান না তিনি তাড়াতাড়ি হাসিটা সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলেন।

বাইরের এই বসবার ঘরটা ছোট, দু-এক মিনিটেই দেখা হয়ে যায়। দেওয়ালে ছবির সংখ্যা খুব বেশী নয়। যামিনী রায়ের নকল দুটো পট, একটা ল্যাণ্ডস্কেপ দুটো গ্রুপ ফোটো, মিঃ সরকারের ফেয়ার-ওয়েল পার্টির সম্ভবত। সামনের কিউরিও কেসে টুকিটাকি জিনিস আছে—কিন্তু সে-ই বা দেখতে ক' মুহূর্ত লাগে? তাও এর আগের বার এসে ওর মধ্যে যা দ্রষ্টব্য দেখে গেছেন। তাছাড়া এখন চাবিবন্ধ, নেড়েচেড়ে যে দেখবেন, সে উপায় নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—এদিক ওদিক চাইতে ওদের শোবার ঘর নজরে পড়ল। নজরে পড়ল মানে—এ ঘর তো ও'র জানাই, আগের বারে ঐ ঘরে বসেই গল্প করে গেছেন। ডান দিকের এই বড় ঘরটা সম্পর্কে ওদের শোবার ঘর, হাল ফ্যাসানে দুভাগে ভাগ করা বিছানা—প্রশস্ত দুটো আধুনিক খাট। তাতেই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে, বাকিটা ওআর্ডরোব আলমারি ইত্যাদিতে ভরা। এর সঙ্গে ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘর—মীনাক্ষীর ড্রেসিং রুম।

বাঁদিকে এই মাপের জায়গাটায় সমান মাপের দুটো ঘর, মেয়ে মীনা থাকে এদিকে, একটা তার শোবার আর একটা পড়ার ঘর। এছাড়া এই বসবার ঘরের ঠিক পিছনে খাবার ঘর। আধুনিক কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসবার ঘর, খাবার ঘর এক জায়গায় রাখেনি—এতেই ধন্যবাদ দিয়ে গেছেন রেণুকা এর আগের বারে এসে। এটাকে ও'র অসভ্যতা বলে মনে হয়। এর ওদিকটাতে বাথরুম রান্নাঘর, চাকরবাকরদের ঘর এবং একটা গেস্টরুম বা বাড়তি শোবার ঘর, দৈবাৎ যদি কেউ এসে পড়ে কোনদিন। মীনাক্ষীরা দোতলার এই পুরো ফ্ল্যাটটা নিয়েই থাকে, নিচেটা ভাড়া দিয়েছে।

সবই জানা, ওঘর তো ভাল করেই দেখা শোবার—তবু আজ বিশেষ ক'রে নজরে পড়ার কারণ হ'ল মধ্যের পর্দাটা আজ সরানো, এইখানে দাঁড়িয়েই ওঘরের খাটদুটোর একাংশ, একটা বেডসাইড টেবিল দেখা যাচ্ছে।

কী মনে হ'ল—বোধহয় আর কোন আসবাব বেড়েছে কিনা, কিংবা নতুন কি ভাবে সাজিয়েছে, দেখার কৌতূহল—পায়ে পায়ে এগিয়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

আর ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল—এবং সঙ্গে সঙ্গে অকারণেই বুকটা ধ্বক ক'রে উঠে মনে হ'ল হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এখনই বন্ধ হয়ে যাবে—স্টীলের বড় আলমারিটার পাল্লা আধভেজানো, চাবির গোছা তাতেই ঝুলছে।...

বুকের স্পন্দনই শুধু থেমে যাওয়ার অবস্থা হয়নি, দেহটাও—বিশেষ পা-দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে।...মাথার মধ্যে যেন প্রচণ্ড একটা শব্দ হচ্ছে—দুটো মালের ওয়াগন ধাক্কা লাগার মতো ঝনাৎ-ঝন-ঝন আওয়াজ!

অথচ কেন যে এই বৈকল্য রেণুকা বুঝতে পারেন না।

অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। মীনাক্ষী চিরদিনই এইরকম—আলুথালু, অগোছালো। বিনা আয়াসে, বিনা আকৃতিতেই অনেক পেয়েছে—অখিলপুর পেয়েছে যাকে বলে—তাই তা রক্ষার জন্য সতর্ক হয়ে থাকার প্রয়োজন বোঝে না। তাছাড়া বাড়িতে কেউ নেই, ঝি-চাকরও বোধহয় বিশ্বাসী, এত হুঁশ রাখবেই বা কেন?......

অন্যায় হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে। এখানে দাঁড়ানো আদৌ উচিত নয়। এখনই ওখানে ফিরে গিয়ে স্থির হয়ে বসা উচিত।

এর পর যদি কিছু হারায়—ওঁকেই দায়ী করবে হয়ত। বারবার মনকে বোঝাতে লাগলেন।

কিন্তু তবু নড়তে পারলেন না। শুধু যে দেহটাই ওখানে আটকে গেছে তাই নয়—চোখদুটো আর মনটা ঐ চাবির গোছা ও আধখোলা পাল্লাটায় আটকে গেছে যেন। একটা কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা অদ্ভুত প্রভাব ও'কে অপ্রতিহত আকর্ষণে টানছে ওদিকে।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ তা জানেন না রেণুকা—মনে হ'ল এক যুগ—ঐ ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে। তারপর—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই—যন্ত্রবৎ পা-পা ক'রে ঐ দিকে এগোতে লাগলেন।

আলমারির দরজাটা ভাল করে বন্ধ হয়নি, তার কারণ ভেতরের লকারটার চাবিগুলোই লকারের মুখে লাগানো আছে। সেটা বন্ধ ক'রে চাবি সরিয়ে না নিলে বাইরের পাল্লা ভাল ক'রে বন্ধ হবে না। বোধহয় লকারে কিছু রাখতে রাখতে কোন কাজে বাইরে চলে গেছে, তারপর আর মনে নেই।

এই রকমই মীনাক্ষী বরাবর।

আলমারি খুলে এটা ওটা দেখতে লাগলেন রেণুকা। না, এমনিই চোখ বুলোনো। প্রাণপণে রেণুকা নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই আলমারির মধ্যে এই যে রেশমে ধুতিতে, শাড়িতে জামায় ন্যাপথার বাকসে কুলপ দিতে একাকার হয়ে আছে, এইগুলোই দেখছেন শুধু।

ফটো : বিশ্বনাথ গোস্বামী

কিন্তু সেই অকল্যাণকর প্রভাবটাই এক সময় তাঁর হাতটাকে ঐ একক চাবিটার দিকে টেনে নিয়ে গেল।

খুলিয়েও ফেলল লকারের ডালাটা—

তারপরই মনে হল যেন কাঁকড়া-বিছের ছোবল মারল ও'র হাতে।

বাক্স কি কোন কেস-এ নয়—বিশেষ নির্দেশ দিয়ে তৈরী করানো বড় লকারটার ভেতর স্তূপাকার করে ঢালা রয়েছে কতকগুলো গহনা—একরাশ। রাজা-মহারাজার ঐশ্বর্য।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মীনাক্ষীর যে স্বভাব ওর কাপড়-জামা রাখায় প্রকাশ পেয়েছে—সেই স্বভাবেরই পরিচয় এখানেও। সোনা ও জড়োয়াতে মিশিয়ে—হারে চুড়িতে বালায় কানের টব ও দুলএ। সেটা বড় কথা নয়, বিস্ময় এই প্রাচুর্যে। প্রায় গরিব ঘরের মেয়ে রেণুকা, সেইরকম ঘরেই বিয়ে হয়েছিল—দশ-পনেরো ভরি সোনাই ও'দের কল্পনার সর্বোচ্চ সীমা। ও'দের যখন বিয়ে হয়, তখন এত দাম ছিল না সত্যি কথা—তেমনি টাকাও ছিল দুর্লভ।...কোন এক-জনের যে এত সোনা থাকতে পারে—এত হীরে জহরৎ—বিশেষ এই সংস্কাটের দিনে তা ওর স্বপ্নের কল্পনারও অগোচর।

সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন, বিহ্বল দৃষ্টি হাত-পা অবশ হয়ে আসছে—সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে কাঁপছে—কিছুই ভাল করে দেখার কি বোঝার অবস্থা নয়—তবু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সচেতনতা কাজ ক'রে গেল—ওপর ওপর চোখ বুলিয়েই মনে হ'ল : তিন-চার জোড়া বালা, চার-পাঁচ রকমের চুড়ি—প্রত্যেকটিই দশ-বারো গাছা করে—আট-দশটা হার বা নেকলেশ, কানের গহনা যে কত তার সংখ্যাই নেই। মান-তাসা, বাজুবন্ধ, বউটি, কঙ্কণ—এ বেশী নয়, তবে প্রত্যেকটিই একাধিক হবে নিশ্চয়।

এসব সোনার। এছাড়া জড়োয়া—সেও কোনটা বড় বড় পান্নার কাঁথি বসানো নেকলেশ, কোনটা হীরে ও পান্নায় মেশানো (হীরে বলেই মনে হল রেণুকার, সে ঠিক চেনে না। শুনেছে আজকাল জারকন বলে এক পাথর বেরিয়েছে, অনেকটা হীরের মতো দেখতে), বড় বড় মুক্তোর মালা, কণ্ঠী, কলার, পান্নার ডিমের মতো বড় বড় মুক্তো চারিদিকে কুন্দনের দিয়ে বাঁধানো তারই নেকলেশ, সাধারণ জড়োয়া নেক-লেশও কটা রয়েছে, এছাড়া রিস্টলেট, আর্মলেট, মুক্তোর চুড়ি, হীরে পান্নায় মেশানো চুড়ি, নবরত্নের সেট—আরও কত কি, আরও কত কি; আরও কত!

এত বেশী প্রয়োজনের তুলনায়, হিসেব রাখার সামর্থ্যের তুলনাতেও এত অধিক যে—এ থেকে দু'চারখানা সরে গেলেও, অন্তত বহুদিন পর্যন্ত কেউ টের পাবে না।...

মীনাক্ষী বোধকরি ভাল করে মিলিয়ে দেখেও না কোনদিন, বহুকালের মধ্যে হয়ত দেখার কথা মনেও পড়বে না তার।...

অনেক বেশী। প্রয়োজনের বহুগুণ অতিরিক্ত। সম্পদের রীতিমতো অপচয়—এইভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা। এ পাপ। সামাজিক অপরাধ।

যুক্তির প্রশ্ন অমন কুমন্ত্রণা রেণুকার মনের এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে।

নিজের প্রয়োজন, অপরাধ-কল্পনা সংক্রমিত মনকে প্রবোধ দেয়। এই অন্যা-ভাবিক প্রবলতায় হয়ে কৈফিয়ৎ খোঁজার চেষ্টা করেন।

মাত্র দু-আড়াই হাজার টাকা হলেও কোনমতে এখন রেণুকার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়। তার পরের কথা পরে।

অন্যথায় ও'কে আত্মহত্যা করতে হবে। এবং সে কালই। আর কোন পথ

নেই। তাতে একটা প্রাণই শুধু নষ্ট হবে না, একটা সংসারও। জীবনে আর ছেলে-মেয়েরা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

টাকা ধার চাইলে মীনাক্ষী কি দেবে? নানারকম বায়নাক্কা করবে হয়ত, স্বামীর দোহাই দেবে। নিদেন বলবে, 'উনি আসুন, জিজ্ঞেসা করি ওঁকে—তার আগে তো ভাই কিছু বলতে পারছি না।'

কথাগুলো ভাবার সময়—খুব দ্রুত চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে দিয়ে খেলে গেলেও—হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই, সে তার কাজ করে যাচ্ছে। বেছে বেছে সবচেয়ে ভারী যে কানজোড়াটা তুলে নিয়েছে, সেই সঙ্গে ভারী একটা মফচেন। সব মিলিয়ে দশ ভরির কম হবে না। বেশীও হতে পারে।...

এবার ঠিক তেমনিভাবেই লকারের ডালাটা চেপে দিয়ে আলমারির দরজাটা ঠিক তেমনি অল্প খোলা রেখে ফিরে এসে আগেকার আসনটিতে বসলেন আবার।

বুকের মধ্যে যে কী করছে! এখনই হয়ত বুকের এই স্পন্দনটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

হে ঈশ্বর, তাই করো তাই করো। এ লজ্জা এ দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি দাও। আর তিনি পারেন না, আর পারবেন না। রক্ষা করো তুমি।

একটু পরেই খট করে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মীনাক্ষী।

'এই তোর দশ-পনেরো মিনিট।' স্নিগ্ধ অনুযোগ করেন রেণুকা। সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে যান নিজের আশ্চর্য অভিনয়-দক্ষতা দেখে। কত অনায়াসে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। কেমন সহজভাবে কথা কইছেন। এত শক্তি তার মধ্যে সত্যিই ছিল?

'কেন, বেশী লেগেছে নাকি?'

অকপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মীনাক্ষী।

'আধঘন্টারও বেশী। অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট।' ক্ষমাসুন্দর হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে তুলে হলের বড় ঘড়িটা দেখান রেণুকা।

'তা হবে। কে জানে, অত হিসেব থাকে না। আমার তো মনে হ'ল এই ঢুকলুম। ওমা, তা এতক্ষণ কাটল, আম্মের মা এখনও এল না। আশ্চর্য। দাঁড়া, আমিই চা চাপিয়ে আসছি—'

'না ভাই, আর একটুও বসতে পারব না এখন। মেয়ের বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি...এই চিঠি রইল—মিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাবি—অবশ্য অবশ্য।'

'তাই নাকি? মেয়ের বিয়ে? কোথায় রে? ছেলে কি করে?'

'এই সাধারণ ছেলে। যেমন আমরা তেমনিই। হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ।...যাস কিন্তু নিশ্চয়ই—হ্যাঁ?'

আশ্চর্য। কেমন সহজে সহজ হবার অভিনয় করে যাচ্ছেন রেণুকা। কত অনায়াসে।

ও'র এই অসামান্য শক্তি ছিল—তা কে জানত!

'ও মা, তা সত্যিই একটুও বসবি না? এই দুপুরবেলা অমনি মুখে চলে যাবি—?'

'না ভাই। একা মুখতেই তো পারছিস। এখনকার দিনে ট্রামে বাসে রিকসায় ঘুরে নেমন্তন্ন করা—একা মেয়েছেলে। উঠতেই পারি না ভীড় ঠেলে।— এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে রে।— চা আর একদিন তখন এসে খেয়ে যাব। আজ আসি—'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন রেণুকা।

বড্ড তাড়া তাঁর। তিনি একা। একাই সব করতে হবে।

কোনমতে বাড়িটা থেকে একটু দূরে চলে এসে একটা ট্যাকসী ডাকেন। যতদূর মনে পড়ছে ব্যাগে এখনও সাত-আটটা টাকা আছে—ট্যাকসী ভাড়া দিতে পারবেন।

ট্যাকসীতে উঠে বসে বললেন, বৌ-বাজার। কবে যেন কার মুখে শুনেছিলেন, বৌবাজারে কোন কোন দোকান আছে যারা সোনা কেনে, মানে কিছু বেশী-কমদামে পেলে—কোন অনাবশ্যক অবান্তর প্রশ্ন করে না।

কথাগুলো কেমন সাজানো থাকে মনে, প্রয়োজনের সময় ঠিক নেমে আসে ওপরের তাক থেকে।

এরপর নির্বিঘ্নে বিয়ে চুকে যাবে—সেই তো স্বাভাবিক।

যা বাকী রইল, পরে দিলে হবে—তাও ঢের। কিন্তু সেজন্য রেণুকা ভাবেন না। বিয়েটা বিয়ের মতোই হল—মানে যেমন বিয়ে হচ্ছে আজকাল, চারধারে যা দেখছেন। খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবল, আলমারির দানের বাসন—সবই দিয়েছেন। ছেলে ঘড়ি দিতে বারণ করেছিল, তা বাদে ছেলেকেও যা দেয় কিছু দিতে ত্রুটি করেননি— বোতাম আংটি গরদের জোড়। গয়নাটাই খুব কম হয়ে গেল। ব্রোঞ্জের চুড়ি আর হালকা হার। তবু শেষ মুহূর্তে একজোড়া বালা কিনে তাই মান রক্ষা হল— একেবারে নিরাভরণ অবস্থাটা ঢাকা পড়ল।

নীতা বিস্মিত হয়েছিল নাকি? খুবই বিস্মিত হয়েছিল।

প্রশ্নও করেছিল, 'এসব কি করে হল মা? কোথায় এত ধার করলে। শেষে অপমান হবে না তো। এত শুধবে কি করে? তোমার জন্ম কেটে যাবে তো এত দেনা শোধ হতে। এতদিন অপেক্ষাই বা করবে কে? তাইটার যে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না?'

রেণুকা ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আজ আর এত কৈফিয়ৎ দিতে পারছি না। তুই চুপ কর এখন। বিয়েটা মিটে যাক আগে—তারপর এসব ভাবতে বসব।'

তারপর অবশ্য বিয়ের আনন্দে, হাসিতে খুশিতে উৎসবের নেশায় ভুলেই গিয়েছিল নীতা। বিয়েটা যে এমন পূর্ণাঙ্গ আয়োজনে হবে, হতে পারবে—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
(শ্রীম কথিত)
সাধারণ—৩০. কাপড়ে—৩৫.
কথামৃত ভবন
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৬

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬৫এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন-৫৫-২৫৭৭, ৫৫-৬৯৬৫

তা সে একবারও ভাবেনি। তাই, চিন্তা যা-ই আর যতই থাক—খুশী হয়েছিল সেও। উৎসবের রঙ ধরেছিল তারও মনে।...

কিন্তু বিবাহ শেষে বাসরঘরে আসবার পথে একটা কথা কানে যেতে হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল নীলা।

কথাটা বলছিলেন ওর বড় মাসিমা, রেণুকার জাঠতুতো বোন সুষমা। তিনি মীনাক্ষীদের চেনেন। মীনাক্ষীর স্বামী আর বড় মেসোমশাই দুজনেই এক অফিসে ছিলেন এককালে। সুষমা বলছিলেন, তুই মীনাক্ষীদের নেমন্তন্ন করিস নি?'

'কেন করব না। নিজে গিয়ে বলে এসেছি।' স্বাভাবিকভাবেই বলেন, কিন্তু নীলার মনে হয় সহসা যেন মা বড় বেশী বিবর্ণ, ক্লান্ত হয়ে ওঠেন—চোখের নিমেষে।

বড় মাসিমা বলছিলেন, 'আমি তো তাই জানি। তবে আজ আসবার আগে যেমন করে শুনলে—একটা বড় বকে। কোনরকম নিজে না-আসার। তা তাই সন্দেহ হল—সে হয়ত তুই বলিস নি, বলতে পারিসনি—সেটা এভাবে ঢেকে নিলে।'

রেণুকা সুষমাকে অনুযোগ ব্যর্থ করে দিয়ে নিরুত্তর রইলেন। কোন প্রশ্ন করলেন না, কৌতূহল প্রকাশও না।

তাতেই সুষমা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, বলে, সোমা কে একজন বন্ধু এসেছিল নাকি ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে—সে চলে যেতেই দেখেছে আলমারি নাকি আধখোলা পড়ে, তাতে গোটাকতক গয়না নেই। তখন নাকি আর কেউ ছিল না সেখানে, বাড়িতেই কেউ ছিল না। ঝগড়াকে বাসন্তী মীনু নাকি বাধরুমে ঢুকেছিল চান করতে।...তাই ওর মন মেজাজ খুব খারাপ—ঠিক করেছে আর

কোন বন্ধুর বাড়ি যাবে না। কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।'

এই বলে কেমন এক ধরনের স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সুষমা বোনের মুখের দিকে। তারপর একবার ছাদের ওপরের ম্যারাপ—ও বিবাহসভার আসবাবপত্রের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

রেণুকা এবার কি করবে, পারবে স্বাভাবিক চালিয়ে যেতে? সহজ হবার অভিনয়?'

নিজেকে অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন মনে মনে রেণুকা—এর ভেতরই।

পারেনও শেষ পর্যন্ত।

মুখের বিবর্ণতা না কাটুক কণ্ঠস্বর সহজ হয়ে ওঠে। বলেন, 'ও। তাই নাকি? তা ভাল—বেশ কেমন বোঝে!...আমার বলা কর্তব্য বলেছি—আসে না আসে সে বুঝবে।...বন্ধুদের বাড়ি তো কত আসছে আর কত সম্পর্ক রাখছে।... না এলে মহাভারত কারও অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

তারপরই যেন একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলেন, 'গিছলুম তো আমিও নেমন্তন্ন করতে। আমাকেই চোর ভাবছে না তো আবার। এই দ্যাখো!... বড়লোকের বাড়ি যাওয়াই অন্যায়, আমাদের মতো গরিব লোকের!'

উৎসব বাড়ির কোলাহল স্তিমিত হয়ে এলে নীলা বাসর ছেড়ে উঠে এসে মার কাছে দাঁড়ায়।

রেণুকা তখন নিভে আসা উনুন-গুলোর সামনে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—নীলার বেনারসী শাড়ির খসখসানিতে চমকে চোখ খুললেন।

নীলা ওকে কোন প্রশ্ন করার অবসর দিল না, কান্নায় ভেঙে-পড়া চাপা গলায়

বলে উঠল, 'কেন, কেন এ কাজ তুমি করতে গেলে মা? কী দরকার ছিল এ মিথ্যে আড়ম্বরে। ...এ আমার কী বিয়ে দিলে তুমি! এই পাপের বোঝা এই অপরাধের বোঝা ঘাড়ে তুলে দিয়ে আমাকে তুমি কোন নতুন জীবনের পথে পাঠালে! কেন, কেন! এর চেয়ে ভিখিরীর মতো শ্বশুর-বাড়ি যেতুম—সেও তো ঢের ভাল ছিল মা!'

রেণুকা নিমেষে জ্বলে ওঠেন যেন! কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'কী করেছি আমি?... কি, বলতে চাস শুনি? কী ভেবেছিস তুই আমার সম্বন্ধে—কি করেছি বলে তোর ধারণা?'

স্থির জ্বলিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মেয়ের চোখের দিকে।

সে চোখে অপরিসীম দাহ, অপরিমাণ কাঠিন্য। আর স্পর্ধা। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত যেন সে দৃষ্টি, বিশ্ব-সংসারের এই অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে।

চোখে পলকও বুঝি পড়ে না—এমনই স্থির উন্মত্ত চাহনি।

সে চোখের সামনে মাথা নামিয়েই নিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

মায়ের অবস্থাটা কি বুঝতে পারে নীলা? ওর মনটা কি দেখতে পায়? কে জানে।

তবে তার আশঙ্কা বা অনুমান যে কী—সেটা আর কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না। শব্দ কটা শেষ অবধি উচ্চারণ হয় না—ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে যায়।

মাথা নামিয়ে আবার আস্তে আস্তে বাসরঘরের দিকেই ফিরে যায় একসময়।

পিছনে যে আগ্নেয়গিরি গলে জল-প্রপাতে পরিণত হয়েছে কখন তাও দেখতে পায় না আর।

সখের দলের অভিনেত্রী

সুমথনাথ ঘোষ

যেদিন অভিনয় থাকে, শেফালী আর রান্নাঘরে ঢোকে না। নির্মলই সব করে।

ভোরে উঠে আগে স্টোভ জেনে ওকে 'বেড-টি' করে দেয়, তারপর বাথ-রুম থেকে ঘুরে এলেই, চায়ের সঙ্গে দুখানা মরিচ টোস্ট আর আমুলে বাটারে ভাজা একটা ডবল ডিমের ওমলেট, কিছু পিঁয়াজকুচি ও কাঁচালঙ্কা, প্লেটে সাজিয়ে ওর বিছানার পাশে সাইড-টেবিলের ওপর নিঃশব্দে রেখে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, শেফালী তখন উপুড় হয়ে শুয়ে, বুকে একটা বালিশ দিয়ে, দু-হাতের পাতার ওপর মুখটা চেপে, একাগ্রমনে নাটক থেকে কপি করা ওর পার্টটুকু, যেসব লম্বা লম্বা লাইন-টানা কাগজে লেখা, একের পর এক ওল্টাতে থাকে।

রাত্রে যেগুলো মুখস্থ করে শুয়েছিল, এখনো সব মনে আছে কিনা, পরীক্ষা করার জন্যে, আবার একবার চোখ বুলিয়ে নেয় আগাগোড়া।

যখন একই পাতা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার পড়েও মুখস্থ হতে চায় না, কেবলি ভুলে যায়, তখন এতটুকু গোলমাল বা ছেলেমেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কথা যদি বলে ভেতরে, তাহলেই সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে ওই নির্মলের ওপর। যেন এর জন্যে সব অপরাধ তার।

বলি, কানের মাথা খেয়েছো নাকি, শুনতে পাচ্ছো না কিছু। একটা দিন একটু সামলাতে পারো না, ছেলেমেয়ে-দুটোকে। তারপর রাগটা দমন করতে গিয়ে গজরাতে থাকে, তুমি ত কেবল পয়সাটাই চিনেছো! কি করে মুখের রক্ত তুলে আমায় রোজগার করতে হয়, চোখে দেখেও কি দেখতে পাও না!

এই চুপ চুপ! বলে ছেলেমেয়েকে শাসন করে নির্মল। থামিয়ে দিলেও তাদের একজনের বয়েস ছয় আর এক-জনের সাড়ে সাত, একটু জোরে কথা বললে মায়ের কেন এত রাগ হয় বুঝতে পারে না।

তাই নির্মল উপায়ান্তর না দেখে, একটু আগেই ওদের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। তারপর মুখে গায়ে পাউডার মাখিয়ে চুল আঁচড়িয়ে খাইয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম পরিয়ে 'ডাসেব কিনডারগার্টেন স্কুলে দিয়ে আসে। আর ফেরার পথে বাজার করে এনে, মাছ তরকারী কেটেকুটে ধুয়ে আবার স্টোভ জ্বালে।

রান্না চড়াবার আগে, আদা, গোল-মরিচ, লবণ, তেজপাতা একসঙ্গে ভাল করে ফুটিয়ে ছেঁকে একটা কাপের ওপর ডিস ঢাকা দিয়ে শেফালীর টেবিলের ওপর রেখে আবার তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে এবং দরজার কপাটদুটো আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দেয় বাইরে থেকে। সে জানে, অভিনয়ের দিন সকাল থেকে কারুর সঙ্গে কথা বলে না শেফালী। যে পার্ট তাকে অভিনয় করতে হবে কেবল তারি চিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। শেফালী আজ কেবল নাটকের নায়িকা নয়। যেন এক

অন্য জগতের মানুষ। নাটকের নকল স্বামী নকল সংসার ছাড়া আর কিছু যেন সে ভাবতে পারে না: তার ধ্যান জ্ঞান কল্পনা ওইখানে। নাটকের ওই কল্পিত চরিত্রে!

অবশ্য এর জন্যে নির্মলের মনে কোন ক্ষোভ নেই। এতটুকু রাগ বা অপমানও বোধ করে না। বরং খুশি হয়! সে জানে এ সাধনার মূল্য কতখানি। আসছে শুক্রবার কি তার পরের কোন এক শুক্রবারে সংবাদপত্রের আমোদ-প্রমোদ পৃষ্ঠায়, কোন এক অফিস ক্লাবের নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সব প্রথম নায়িকার ভূমিকাতে শেফালীর উচ্চ-শ্রেণীর অভিনয়ের প্রশংসা হয়ত ছাপা হবে। তখন স্বামী গর্বে কেবল তার বুকটা ফুলে উঠবে না। ভবিষ্যতে শেফালীর চার্জ দুশো টাকা থেকে বাড়িয়ে দুশো পঁচিশ স্বচ্ছন্দে করতে পারবে। এছাড়া ফুল রিহার্সালের দিন অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা এবং অতিনারী রিহার্সালের জন্যে দৈনিক কুড়ি টাকা, আর যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া, টিফিন ত আছেই।

শুধু নির্মলের নিছক কল্পনা নয়, এই তিন বছর হলো অফিস ক্লাবে ভাড়া খাটতে নেমেছে শেফালী এবং প্রথম পঞ্চাশ টাকায় শুরু করেছিল, তারপর ধাপে ধাপে অভিনয়ের খ্যাতি যেমন বেড়েছে, নির্মলও তেমনি চার্জ পঁচিশ তিরিশ করে বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনি করে এখন প্রতি মাসে একটা দুটো নয়—কখনো কখনো তিন-চারদিনও কাজ পায়।

ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে, সংসার করে মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে এতটা টাকা ঘরে আনা বোধহয় অন্য কোন-ভাবেই সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, শেফালীর মত মেয়ে যার লেখাপড়ার দৌড় পার্ট ওয়ান পর্যন্ত, গানের গলা থাকলেও গীতশ্রী উপাধি বা রেডিয়ো-গায়িকা ইত্যাদি কোন বিশেষণে বিভূষিত নয়। একমাত্র সম্বল বলতে চেহারাটা। ছিপছিপে একহারা, চোখ-মুখ যেমন ভাল, রংও ফর্সা—যে কোন পার্টে মানায়, বিশেষত আধুনিক নাটকের নায়িকার ভূমিকায়। ইংরেজি কথাগুলো যেমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারে, তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের কাছে হাততালিও পায়। আবার করুণ দৃশ্যে নিজে চোখে জল এনে দর্শকদের মন ভেজাতেও পারে অতি সহজে।

অফিস ক্লাবগুলোতে তাই ওর পসার দিন দিন বেড়েই চলে। প্রথম দিকে নির্মল অফিসে গিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতো। বায়না নিয়ে শেফালীর হয়ে সই করে রসিদ দিয়ে আসতো। তারপর যেমন রিহার্স্যাল দিতে নিয়ে যেতো আবার ফিরিয়ে আনতো স্ত্রীকে সঙ্গে করে। অভিনয়ের দিন রাত্রে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফেরার সময়, শেফালী গলগল কণ্ঠে বলতো, জানো আজকে সবাই বলেছে আমার অভিনয়টা নাকি ভাল হয়েছে, অন্য সব মেয়েদের চেয়ে. তোমার কি মত?

হাঁ। ঠিকই বলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাও গুল মারতে হবে না! তুমি ত স্টেজের ভেতরে বসে থাকো। অভিনয় ভেতর থেকে কখনো বোঝা যায়? এবার থেকে তুমি অডিটোরিয়াম-এ গিয়ে বসবে। ভেতরে কেন থাকো? আমার লজ্জা করে, লোকে হয়ত ভাবে পাহারা দিতে এসেছে স্ত্রীকে!

লজ্জা কিসের? সব মেয়েদের অভি-ভাবকরা কারুর মা, কারুর ভাই, কারুর বাপ সবাই ত দেখি ভেতরে থাকে।

তারা মেয়েকে গার্ড দিতে যায়। এর মধ্যে অনেকেই থাকে আইবুড়ো কুমারী মেয়ে কিনা।

আমি চাই তোমার মুখ থেকে শুনতে, অভিনয় কি রকম লাগল তোমার। অন্যে হয়ত মন রেখে বলবে। তুমি ঠিক দোষ-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলে আমি শুধরে নিতে পারবো ভবিষ্যতে। বুঝতে পারছো না কেন বলছি!

এরপর থেকে অবশ্য নির্মল দর্শকের আসনে বসে তার অভিনয় দেখতো। কিন্তু ক্রমশ শেফালী উপলব্ধি করে, ফেরার পথে কেমন যেন মন গুমরে থাকে নির্মলের। টাকাটা ওর হাতে গুঁজে দিলে, আগে যেমন বেশ খুশিতে ঝলমল করতো ওর মুখটা, এখন যেন তেমন দেখায় না।

অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে মুখহাত ধুয়ে পোষাক ছেড়ে নিজের শাড়ী পরে টাকাটা নিয়ে রসিদটাতে সই করে দিয়ে চলে আসার সময়, দুটো খাবারের বাক্স ফুলের মালা ওর গাড়ীতে এসে তুলে দিয়ে যায়, অফিসের দারোয়ান।

সেদিন গাড়ীটা ছাড়তেই মালাটার সঙ্গে টাকাগুলো যথারীতি নির্মলের হাতে তুলে দিয়ে আগেই একটা বাক্স খুলে ফেললে শেফালী। বললে, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে—এসো একটু খেয়ে নেওয়া যাক আগে। বাড়ীতে একটা নিয়ে গেলেই হবে ছেলেমেয়েদের জন্যে।

নির্মল বললে, তুমি খাও। বলেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

আমি ত খাচ্ছি। তুমি এই রাজভোগ সন্দেশটা খাও। ভারী ভাল করেছে সন্দেশটা। মস্তবড় অফিস ত? ভারী ভদ্র ব্যবহার সকলের। আমাকে চারবার চা দিয়েছে। আর খাবার জন্যে কতবার যে অনুরোধ করেছে। যত বলি আমি শো-টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাবো না, কিছুতেই শোনে না। ওঁর মধ্যে দুটো সন্দেশ, ম্যানেজার নিজে আমায় জোর করে খাইয়ে গেছেন।

খাও! কি হলো। চুপ করে আছো কেন? তোমারও তো খিদে পেয়েছে খুব। সেই পাঁচটায় বাড়ী থেকে পাঁচটা আর আলুর দম খেয়ে বেরিয়েছো। এখন রাত্তির সাড়ে দশটা হলো, খিদে পায়নি?

না। বলছি ত তুমি খাও।

কেন তুমি কি কিছু খেয়েছো নাকি রেস্তোরায়?

এবার মিথ্যে করে নির্মল বললে, হাঁ।

তাই বললেই ত হয়! বাবা, তোমার পেটে ডুবুরী না নামালে কথা টেনে বার করা যায় না। সেই এক স্বভাব, এখনো বদলালো না!

খুব খিদে পেয়েছিল শেফালীর। গপগপ করে নিমেষে খাবারের বাক্সটা শেষ করে ফেললে। সকলের শেষে চম-চমটায় যখন কামড় দিয়েছে শেফালী, হাঁ গো, আজকের অভিনয় তোমার কেমন লাগল? জানো ওদের অফিস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ চিমনভাই ভেতরে গিয়ে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, আমি বাংলা পড়তে পারি না কিন্তু কথা-বার্তা সব বুঝি। আমি বিলেতে দশ বছর ছিলুম। ওখানকার অভিনয়ও দেখেছি, কিন্তু আপনার এই ন্যাচারাল অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। 'ওয়ানডারফুল'! একচোখে জল আর একচোখে হাসি। স্বামীর বুকে মুখ রেখে যখন সন্তানের কথা চিন্তা করছেন ওর তুলনা হয় না?

এতক্ষণ ধরে যে কথাটা বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছিল, অথচ মুখ দিয়ে বার করতে পারছিল না নির্মল, এই সুযোগে হঠাৎ বলে ফেললে, হাঁ, দেখো, হাজার হোক, যাদের সঙ্গে তুমি অভিনয় করছো তারা পরপুরুষ, বিশেষ করে তোমার স্বামী সেজেছিলেন যিনি তার তো খুবই কম বয়েস—ইয়ংম্যান—

হাঁ, নাটকেতে, তার বয়েস দেখিয়েছে পঁচিশ-ছাব্বিশ। খুব নাকি ম্যাচ করে-ছিল আমার সঙ্গে:

ম্যাচ করেছিল বলেই একেবারে, তার বুকের ওপর ওইভাবে মুখ গুঁজে কাঁদতে যাওয়াটা ঠিক উচিত হয়নি। পাবলিক স্টেজে পেশাদার অভিনেত্রীদের যা শোভা পায়, ভদ্রঘরের মেয়েদের এতটা বাড়াবাড়ি করা কি উচিত?

বাড়াবাড়ি! তার মানে?

মানে তুমি হয়ত বুঝতে পারোনি যে তোমার বুকটা ওর বুকের সঙ্গে লেগে ছিল যতক্ষণ তুমি ফুলে ফুলে কাঁদছিলে।

তাই নাকি? ওই রকম নাটকীয় পরিস্থিতিতে অভিনয়ের কথাটাই সব-সময় মনে করেছি, দেহের কথাটা এক-বারও মনে পড়েনি বা ভেবে দেখার অবকাশ হয়নি! তাছাড়া সবটাই তো অভিনয়—শুধু দেহের স্পর্শ লেগেই পাপ কি এসে গেলো! তুমি বললে, বলেই প্রথম কথাটা আমার মনে পড়ল, নইলে একবারও তো ওদিকটা চিন্তা করিনি।

কণ্ঠে রাগ চেপে জবাব দেয় নির্মল, [illegible] তো! অভিনয় করতে

বলে ওই রকমভাবে তোমার দেহটা যদি অন্য একটা যুবকের দেহের সংগে লেগে যায়, তাহলে অশোভন হবে না? এর জন্যে আগে থেকে নিশ্চয়ই নিজের সতর্ক হওয়া উচিত। কৈ কলেজগার্লের পার্ট করছিল যে মেয়েটি, পার্কের বেঞ্চিতে নির্জনে বসে প্রেমালাপ করার দৃশ্য, যতবার ছেলেটি ওর কাঁধে হাত দিতে গেছে, সুকৌশলে হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। অভিনয় করছি বলে, বাস্তবের রূপ দিতে চেষ্টা করেনি তো সে!

কে কি করেছে জানি না! কিন্তু অভিনয়কে অভিনয় হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। যে আমার স্বামী হয়েছিল স্টেজে, তাকে আমি চিনি না, জানি না—জীবনে হয়ত আর কোনদিন দেখা-সাক্ষাতও হবে না। অথচ এই ক'ঘন্টার জন্যে এমনি অভিনয় স্বাভাবিক করতে হয়েছে যাতে দর্শকরা মনে করে সত্যিকারের দম্পতি।

সবই মানি। তা বলে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করছো বলে কোন বাধা থাকবে না? কিসিংকে চেক করা উচিত। ভাবের আতিশয্যে ভেসে যাওয়া ঠিক নয়!

এবার আর রাগ সামলাতে পারে না শেফালী। বলে, তোমার মনে কেন এ চিন্তা, আমি জানি। ছেলেটি ইয়ং, তার ওপর দেখতেশুনতে ভাল। কিন্তু ভীড় বাসে-ট্রামে উঠে যখন ওই রকম কত ইয়ং ছেলের দেহের সঙ্গে পিষে চিপটে যাতায়াত করতে হয়! কৈ তখন তো এরকম চিন্তা তোমার মনে উঁকি মারে না? তখন যদি তোমার বৌয়ের দেহে কলঙ্কের স্পর্শ না লেগে থাকে তাহলে স্টেজেও লাগবে না স্থির জেনো!

নির্মলের মুখে আর কোন জবাব জোগায় না। গুম হয়ে বসে থাকে। তখন তাকে রাগাবার জন্যে শেফালী বলে, জানতো 'পেটে খেলে পিঠে সয়'। এতই যদি স্ত্রীর প্রতি প্রেম, তাহলে তার দেহের পবিত্রতা যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করলেই পারতে। তিন বছর ধরে বেকার ঘরে বসে আছো, বলেই তো আমাকে এমনিভাবে রোজগার করে এনে সংসার চালাতে হচ্ছে। যেটা তোমার করা উচিত ছিল, সেটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে তুমি উপার্জনের চেষ্টা করলেই পারো। কোন মেয়ে সাধ করে মুখে চুনকালি মেখে হাজার হাজার দর্শকের সামনে পরপুরুষের গলা ধরে 'প্রাণনাথ' 'প্রিয়তম' বলে!

তুমি তো ইচ্ছা করেই, এ লাইনটা বেছে নিয়েছো। আমার তো মনে হয় এর-চেয়ে অনেক সম্মানের ছিল, আর্টিস্টের 'মডেল' হওয়া। এক-একটা সিটিংয়ে পঞ্চাশ টাকা করে দিচ্ছিল, তাতে তোমার আত্মসম্মানে এমন কি লাগল তুমি ছেড়ে দিলে।

প্লিজ চুপ করো! পুরোনো কাসুন্দি আর ঘেঁটো না। অনেক শুনেছি। দোহাই তোমার!

এবার দুজনেই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে। নীরব থাকলেও কিন্তু ভুলতে পারে না শেফালী সেই সব পুরনো কথা। মনের কোন ছিদ্রপথে সেই চাপা ক্ষোভাগ্নির যেন দু-চারটে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। শেফালী একদিন ঠিক এইরকম কথা উঠলে নির্মলের মুখের ওপর বলেছিল, কি করবো, আত্মসম্মান জিনিসটা এমন যে ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করা যায় না, ওটা নিয়ে মানুষ জন্মায়! আমি কোন ঘরের মেয়ে, আমার মা বাবার কি পজিশন সবই ত তুমি জানো। জাতকুল ভেঙে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে, তোমার গলায় মালা দিয়েছিলুম, নইলে আজ আমার ভাবনা কি! যেখানে তাঁরা আমার বিয়ের ঠিক করেছিলেন, বাপের এক ছেলে, বিলেত ফেরৎ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, বাপের অগাধ পয়সা, নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ী, গাড়ী কি চাকর—অর্থাৎ আমার রাজরাণী হবার কথা?

থামো! ওই কথাটা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। সব মেয়েরই বিশেষ করে প্রেমে পড়ে যারা বিয়ে করে, তাদের মুখের ওই এক বুলি, আমার রাজরাণী হবার কথা! তার মানে আর কিছু নয়। নিজের দর বাড়ানো! অর্থাৎ তোমার জন্যে আমি কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছি, কত নীচে নেমেছি এটা মনে করিয়ে দেওয়া।

এর উত্তরে জবাব দিতে পারতো শেফালী কিন্তু চেপে গিয়েছিল। সব অপমান মাথা পেতে নিয়েছিল। এখন আর পুরনো কথা তুলে মিছিমিছি অশান্তি বাড়ানোর কোন অর্থ হয় না। নইলে তার ঠোঁটের ডগায় এসেছিল, ওর বাবা-মা যেদিন সব জানতে পেরেছিলেন, ওকে চুপি চুপি, একদিন রাত্রে গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরতে বাকী রাখেননি। বলেছিলেন, তুমি সরে যাও, ওর জীবনের পথ থেকে। যদি সত্যি ওকে ভালবেসে থাকো, তাহলে ও যাতে প্রকৃত সুখী হয় সেটাই তো তোমার করা উচিত। প্রেম মানে ত তাই! প্রকৃত প্রেমের জন্যে কত লোক এমন কত আত্ম-ত্যাগ করছে! কিন্তু তুমি তার জবাবে বলেছিলে, শেফালীকে আমি দেহে প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারবো না। আর যদি জোর করে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেন, তাহলে তাকে খুন করে আমি নিজে আত্মহত্যা করবো নিশ্চিত জানবেন। শেফালীকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না! আমার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব!

এতদিন কথা বার না করে শেফালী চুপ করে গেলেও কিন্তু নির্মল রাগ সামলাতে না পেরে একদিন ওর মুখের ওপর বলে দিলে, হাঁ মাতৃগর্ভে আর পড়ে থাকার জায়গা পায়নি। লেখাপড়ায় তুমি এম-এ বি-এ পাশ নও, রাজ্যের প্রেমচাঁদ স্কলার, গান-বাজনাও তেমনি শুভলক্ষ্মী কি লতা মঙ্গেশকরের ওপরে যাও! বলে একটু থেমে কন্ঠে যেন [illegible] বলেছিল, যেটুকু গর্ব তোমার ওই চেহারার তো? গড়িয়াহাটের চৌমাথায় সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখো তোমার চেয়ে অনেক বেশী রূপসী মেয়েরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অশান্তির আগুনে ঘৃতাহুতি না দিয়ে দুহাত জোড় করে অনুরোধ করে শেফালী, দোহাই তোমার চুপ করো। আমি তোমার কাছে আর কোনদিন একথা বলবো না কিন্তু তুমিও আর কখনো একথা মুখে আনবে না প্রতিজ্ঞা করো। আমার কিছু নেই, কোন যোগ্যতা নেই, স্বীকার করছি, মেনে নিচ্ছি।

নির্মল রাগ চাপতে চাপতে বলে, আমার কি দোষ, তুমিই তো রাজরাণীর কথা তুললে।

আচ্ছা, স্বীকার করছি আমার সব দোষ! হয়েছে ত! এখন দয়া করে ক্ষান্ত দাও! ওর তো কোন প্রমাণ প্রয়োগ বা সাক্ষী নেই, যে তোমার সামনে এনে হাজির করবো। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় করো না। ব্যস। চুকে গেল ল্যাঠা! আজকে আর বাসী কথা তুলে নিজেদের জীবনে অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি! তাছাড়া তোমাকে ত বলেই দিয়েছি, যেদিন তোমার চাকরি হবে, আমিও এ উঞ্ছবৃত্তি থেকে বিদায় নেবো।

হঠাৎ ট্যাক্সিটা গলির মোড়ে এসে থামতেই শেফালীর চিন্তায় যেন ছেদ পড়ে। ট্যাক্সি ভাড়াটা নির্মল তৎক্ষণে চুকিয়ে দেয়। খাবারের বাক্সটা হাতে নিয়ে শেফালী ঘরে এসে ঢোকে। বলা বাহুল্য এরপরে তিনটে বছর কেটে গেছে, তবু কোনরকমের একটা চাকরী জোটাতে পারেনি নির্মল। তবে বাধ্য বেকার জীবন যাপন করে।

সেদিন ছিল স্টার বোর্ডে, [illegible] এণ্ড মরক্যান কোম্পানীর কেরাণীদের

২য় বর্ষ চলছে পাক্ষিক
বনগাঁ বার্তা
সম্পাদক : শ্রীউদয়চন্দ্র সিংহ
দাম : দশ পয়সা
শেঠ মার্কেট, মতিগঞ্জ
বনগাঁ : ২৪ পরগণা

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

'সাজাহান' অভিনয়। শেফালীকে তাতে পিয়ারার পার্ট করতে হবে। ঐতিহাসিক নাটক এর আগে কোনদিন সে অভিনয় করেনি। এই প্রথম।

গ্রীনরুমের দেওয়ালজোড়া বড় আয়নাটার সামনে সাজগোজ করে এসে যখন দাঁড়ালো সে যেন নিজেকে চিনতেই পারে না! বেশ মানিয়েছে। শাহ সুজার উপযুক্ত মহিষী।

সুজার পার্ট করছেন যে ভদ্রলোক তাঁর চেহারাটাও ভাল। তবে একটু বয়েস বেশী হয়েছে ভদ্রলোকের। মেক-আপ দিলে মানিয়ে যাবে কিন্তু বেশ মোটা। ওর পাশে তাঁকে রীতিমত বে-মানান ঠেকবে।

মনে মনে যখন এই কথাটা চিন্তা করছে শেফালী তখন দরজাতে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন আপিস ক্লাবের ডিরেক্টর মিঃ চৌধুরী। বললেন, মিসেস রায় রেডি তো?

হাঁ। এই তো দেখুন না? কেমন মানিয়েছে বলুন ত? এই প্রথম ঐতিহাসিক নাটকে আমি নামছি।

খুব ভাল। হাঁ, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি, সুজার পার্ট যাঁর করবার কথা, মিঃ মিত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ফলে হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে ফিরেছেন। প্রেসারটা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ডাক্তার বেড রেস্টের ব্যবস্থা করেছেন। সাতদিনের ছুটি নিয়েছেন তিনি অপিস থেকে। কাজেই আপনাকে একটু মানিয়ে নিতে হবে, মিঃ চ্যাটার্জী, আমাদের কোম্পানীর ওয়েলফেয়ার অফিসার, খুব শিক্ষিত বিলেত ফেরৎ মানুষ, এর আগে কখনো থিয়েটার করেননি। তাঁর চেহারাটা খুব সুন্দর বলে আমরা সবাই মিলে অনুরোধ করে তাঁকে রাজী করিয়েছি। দু-দিন অফিস কামাই করে বাড়ীতে বসে বসে পার্ট মুখস্থ করেছেন। কাজেই আপনি একটু মানিয়ে নেবেন যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়।

একেবারে এই প্রথম নামছেন? বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে শেফালী।

হাঁ, পাবলিক বোর্ডে এই প্রথম। তবে ছাত্রাবস্থায় নাকি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একবার এই সুজার পার্ট করেছিলেন এবং খুব প্রশংসাও পেয়েছিলেন। একটা দিনও যদি আপনার সঙ্গে রিহার্সাল দিতে পারতেন তাহলে এতটা ভাবতুম না। মিঃ চ্যাটার্জী পোষাক পরে এই সময় উইংস-এর পাশে এসে দাঁড়াতে মিঃ চৌধুরী শেফালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করতে গিয়ে শেফালীর চোখদুটো হঠাৎ যেন আটকে যায় ওর মুখের ওপর। মনে মনে বলে উঠলে, বাঃ কি সুন্দর মানিয়েছে!

মিঃ চ্যাটার্জী তখন বলে উঠলেন, আমি কিন্তু একেবারে 'র' শুনেছেন নিশ্চয়। এঁরা জোর করে আমায় নামিয়েছেন। আপনার পার্ট আমার জন্যে খারাপ হলে কিন্তু আমার অপরাধ নেবেন না!

'সারা সকালটি বসে বসে শুধু,
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
পরাবো বলিয়া তোমার গলায়
মালাটি আমার গেঁথেছি।'

যেমন গানে তেমনি অভিনয়ে এই দৃশ্যটা ওরা দুজনেই এত ভাল করলে যে দর্শক-দের করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো।

ভেতরে এসে শেফালীর হ্যান্ডসেক করে মিঃ চ্যাটার্জী বললেন, আপনি আমাকে খুব উৎরে দিয়েছেন।

সে কি!

হাঁ আপনার অভিনয়, গানের সঙ্গে অপূর্ব ভঙ্গিমাসহকারে আমার গলায় মালাটা পরিয়ে দেওয়ার তুলনা হয় না। আমার কথা ভুলে গিয়ে আপনার দিকেই আপনি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এটা আপনি বেশী বেশী বলছেন। আপনার অভিনয়ও খুব ভাল হয়েছে। তা নাহলে দর্শকরা এত 'চিয়ার আপ' করতেন না।

সবই আপনার দৌলতে। বলে হেসে ফেললেন, মিঃ চ্যাটার্জী। ড্রামাটিক ডিরেক্টর মিঃ চৌধুরী হুইসিল বাজিয়ে পরের দৃশ্যটা আরম্ভ করে দিয়েই ছুটে এসে ওদের দুজনকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। মিঃ চ্যাটার্জীকে তোষামোদ করার জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন আপনি ত মশাই 'ফিনিশড আর্টিস্ট'—এই প্রথম বোর্ডে নেমেছেন, কে বলবে।

না—না যদি ভাল হয়ে থাকে তো সে পিয়ারার জন্যে। মিসেস রায়কে ধন্যবাদ দিন। বলে সলজ্জভঙ্গীতে একবার শেফালীর মুখের দিকে তাকালেন।

শেফালী ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি টিপে চোখটা নামিয়ে নিলে।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে, মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে পিয়ারা যখন শাড়ী পরে শেফালীর বেশে এসে দাঁড়ালো সেই দুঃসাহসী চৌরিঙ্গির সাহেব সাহেব পাইপ-মুখে মিঃ চ্যাটার্জীর পাশে ফটো তোলার জন্যে। তখন ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে বার বার আড়চোখে শেফালীর মুখের দিকে মিঃ চ্যাটার্জী তাকাতে লাগলেন। যেন আগে কোথায় দেখেছেন এই মুখ—একেবারে হুবহু এই চেহারা—ঘন ঘন পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যেখানে দাঁড় করিয়ে ফটোগ্রাফার যখন বললেন, দয়া করে নড়বেন না। সকলে মুখটা ঘুরিয়ে তাকান একবার ক্যামেরার দিকে তখন ঝিলিক মেরে ওঠে মিঃ চ্যাটার্জীর স্মৃতিপটে, বছর দশেক আগের একটি দিনের কথা। আশ্চর্য যোগাযোগ ত! এতদিন পরে এক স্টেজে উনি সুজা আর তাঁর স্ত্রী পিয়ারা সেই মেয়েটি! যাকে দেখে সেদিন ওর মনে সত্যিকারের কামনা জেগেছিল। যাকগে। মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিলেন, সে পুরনো স্মৃতি!

ফটো তোলা হয়ে গেলে, শেফালী মিঃ চ্যাটার্জীর কাছে বিদায় নিতে গেলে, তিনি তার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে, পাইপটা মুখ থেকে খপ করে সরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন?

বেলেঘাটায়!

ওঃ দ্যাট ডার্টি প্লেস! কিছু মনে করবেন না। বাস্তবিক ও-রকম নোংরা রাস্তা আমি আর দেখিনি। বিলেত থেকে ফিরে সেবছর ওখানে আমার এক পিস-তুতো ভাইয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিলুম!

আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চাই তাহলে—

তাহলে আপনাকে আমায় ওখানে যেতে হবে না। আপনি যেদিন বলবেন, আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি। আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

দ্যাটস্ ফাইন।

এই নিন আমার ঠিকানা এতে আছে। বলেই ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে একটি ছোট্ট সাদা নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড ওর হাতে দিয়ে চলে গেল।

এমনি করেই ওর পার্ট কারুর ভালো লাগলে, তাঁর মারফৎ অনেক সময় অন্যত্র শেফালী 'কল' পায়।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। দিন আটেক পরে একটা চিঠি পেলো শেফালী মিঃ চ্যাটার্জীর কাছ থেকে। যোধপুর পার্কের ঠিকানায় তাঁর বাড়ীতে শনিবার সন্ধ্যায় দেখা করার জন্যে।

ঠিকানা খুঁজে বাড়ীটার ফটকে গিয়ে দাঁড়াতে শেফালী ও নির্মল দুজনেরই মুখে আর কথা জোগায় না। যেমন বিরাট অট্টালিকা তেমনি সামনে লম্বা ফুলের বাগান।

ওদের দেখেই দরোয়ান ছুটে এলো। বললে, কি চাই?

মিঃ চ্যাটার্জী আছেন?

হাঁ, কিন্তু কি দরকার আপনাদের? বার বার দারোয়ানটা ওদের বেশভূষার দিকে তাকাচ্ছিল। ভাবটা এই যেন, এ বাড়ীর ভেতরে ঢোকার মত যোগ্য মানুষ তোমরা নও, চট্ করে ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে কার্ড বার করে দারোয়ানের হাতে দিয়ে শেফালী বললে, এইটে দাওগে সাহেবকে। তিনি আমাদের দেখা করতে বলেছিলেন, তাই এসেছি।

নির্মল চুপিচুপি শেফালীকে বললে, টাকাটা কিন্তু এবার বাড়িয়ে বলো, ওঁরে আড়াইশো দিয়েছিলো, তুমি তিনশো তো নেবো। তারপর যদি বলেন কিছু কমাতে, পঁচিশ টাকা ছেড়ে দিয়ো না হয়।

'রেট' সম্বন্ধে আমি কিছু মুখে বলবো না। তোমাকে দেখিয়ে দেবো, তুমি যতটা পারো বাড়িয়ে দিয়ো।

বেশ। কিন্তু তার আগে, কোন বইয়ে অভিনয় করতে হবে, কি রকমের পার্ট, কতখানি তোমার মেহনত হবে—সেগুলো ত জানা দরকার।

নিশ্চয়ই।

দারোয়ান এসে ওদের দুজনকে নিয়ে লম্বা ফুল বাগানটার ভেতরে দিয়ে লাল-রংয়ের কাঁকর-বিছানো ঘোরানো পথ মাড়িয়ে একেবারে ড্রয়িং রুমের দরজায় হাজির হয়ে ভারী পর্দাটা সরিয়ে বললে, বাইরে, অন্দরমে বইঠিয়ে।

হালফ্যাশানে সাজানো ওই সুন্দর কক্ষে ঢুকে ওদের মাথা যেন ঝিমঝিম করতে থাকে। দেওয়ালে, ঘরের মেঝেয়, ছাদের ওপরে যেদিকে তাকায়, চোখ যেন আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। মাথার ওপর মূল্যবান ঝাড়লন্ঠন, চকচকে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো কতরকমের ছবি দেওয়ালে, দেওয়ালে, পুরু কাশ্মিরী কার্পেটে পা যেন ডুবে যায়, ডানলোপিলোর গদিমোড়া সোফা কাউচ, তারি দুপাশে ফুলদানিতে ফুলের তোড়ার বদলে, গাছে তাজা ফুল ফুটে রয়েছে। একপাশে একটা বিরাট পিয়ানো, মনে হয় যেন সদ্য কেনা, চকচক করছে মেহেগনি পালিশ তার সারা গায়। আবার এককোণে কৃত্রিম একটা চৌবাচ্চা, কাঠের ফ্রেমের ওপর বসানো, তাতে তিন-চারটে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, পদ্মপাতা ভাসছে জলের ওপর।

সত্যিকথা বলতে কি এরকম ধনীর ড্রয়িং রুম, তারা এর আগে কখনো চোখে দেখেনি, জীবনে এই প্রথম।

মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে যখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শেফালী, একটা চাকর এসে তাকে বললে, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

দোতলায় যে ঘরটায় শেফালীকে নিয়ে গিয়ে লোকটা বসালে, সেটা ছোট, কিন্তু আরো মূল্যবান, রুচিসম্মত বিলিতী আসবাবপত্রে সাজানো।

একটু পরেই পাইপ মুখে দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জি এসে ঢুকতেই, শেফালী উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

বসুন, বসুন। বলতে বলতে চ্যাটার্জি সাহেব একবার শেফালীর সামনে মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজে বসলেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন, বাড়ী খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি ত?

কেন? কিসের অসুবিধা? এত সুন্দর জায়গায় আপনি থাকেন!

না: অনেকটা দূর থেকে আপনাকে আসতে হলো, নিশ্চয়ই খুবই কষ্ট হয়েছে। বেলেঘাটা তো আর এখানে নয়। এই বলে খপ্ করে পাইপটা হাতে টেনে নিয়ে, তিনি শেফালীর মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বললেন, দেখুন নেহাত ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে

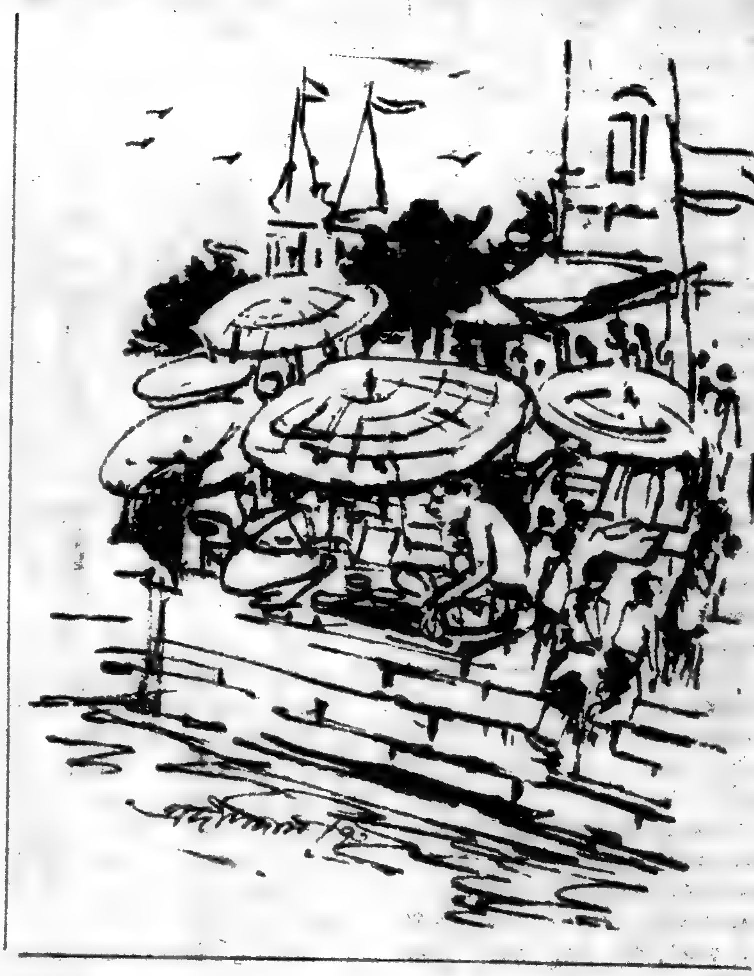

আজ এখানে এতদূরে ডেকে এনেছি বলে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত জুড়ে শেফালী কপালে ঠেকালো। ছিঃ ছিঃ ওকথা বলবেন না। আপনি কত বড় মানুষ। আপনার কাছে আমি নেহাত তুচ্ছ, নগণ্য। আপনাদের দয়াতেই কোনরকমে টিকে আছি। তাও সব মাসে কাজ জোটে না। আমাদের লাইনেও আজকাল খুব কম্পিটিশন! বহু ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ে আজকাল অপেশাদার ভাবে অভিনয় করতে নেমেছে।

পাইপটা মুখে গুঁজে দিয়ে এবার প্রশ্ন করলেন মিঃ চ্যাটার্জি, তা মাসে গড়ে কটা কল আপনি পান? আজকাল অবশ্য অধিকাংশ অফিসই ড্রামাটিক সেকশন' হয়েছে।

ম্লান হেসে জবাব দেয় শেফালী, কোন মাসে হয়ত দুটো কি বড়জোর তিনটে, তেমনি কোন কোন মাসে একেবারেই জোটে না!

আপনার স্বামী কি করেন? কিছু মনে করবেন না, আপনাদের এতকথা জিজ্ঞেস করছি বলে।

এবার একটু চুপ করে থেকে শেফালী বললে, তিনি কিছুই করেন না। আজ তিন বছর বাড়ীতে বসা। বেকার। তাই ত আমাকে আজ এই পেশা নিতে হয়েছে! আপনি যদি দয়া করে আমার স্বামীকে আপনাদের অফিসে কোন-রকমের একটা কাজ দেন—দপ্তরী, কি বেয়ারা যেমন হোক না কেন, তাহলে আমি চিরজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। যা দিনকাল পড়েছে, ছেলে-মেয়ে দুটোকে মানুষ করবো কি করে সেটাই হয়েছে সবচেয়ে বড় চিন্তা!

পাইপটা এবার দাঁতে চেপে ধরে চ্যাটার্জি সাহেব বলে উঠলেন, আপনার বুঝি ওই দুটি ছেলেমেয়ে?

অপরাধিনীর মত মাথা নীচু করে শুধু জবাব দিলে শেফালী, আজ্ঞে হাঁ।

এবার মুখ দিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে-দের এই বড় দোষ! চাকরী-বাকরীর পাকা ব্যবস্থা না করে মা-বাপ হবার সখ যায়! বিলেতে আমি অনেকদিন ছিলুম, কিন্তু ওখানের ইয়ংম্যানরা এসব বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার। বিশেষ করে মেয়েরা। যাইহোক আপনি যখন বলছেন আমি চেষ্টা করবো, কাজের জন্যে।

দেখুন অনেক অফিসেই ত আমি অভিনয় করতে যাই। সকলেই মুখে এরকম আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজে কিছুই করেননি।

আপনার স্বামী আগে কোন অফিসে

চাকরী করছেন। তাঁর 'কোয়ালিফিকেশন' কি?

এবার মাথাটা নীচু করে শেফালী ধীরে ধীরে জবাব দেয়। 'কোয়ালিফিকেশন' বলার মত কিছু নেই। মানে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেই এখা কোম্পানীতে চাকরী পেয়ে যান। 'মেশিন ও টুলস'-এ। মাইনে মাস গেলে, ওভারটাইম, নাইট ডিউটি সব জড়িয়ে চারশো সাড়ে চারশো পেতেন। এছাড়া বোনাস, বছরে তিন মাসের মাইনে! কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপলো, ধর্মঘট, 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে মালিকদের 'ঘেরাও', গালমন্দ করাতে শুধু ওঁর নয়, ওঁদের দলের অধিকাংশ লোকেরই ছাঁটাই হয়ে গেল। সেই থেকে তিনটে বছর কেটে গেছে আর কোথাও কোন কলকারখানায় একটা চাকরী জোগাড় করতে পারছেন না। তাই আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করেন, তো বেঁচে যাই। আমি শুনেছি, আপনি ইচ্ছা করলে যে কোন একটা চাকরী দিতে পারেন, আপনাদের অপিসে।

পাইপটা এবার মুখ থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে হেসে উঠলেন। তারপর একপ্রকার অর্থপূর্ণ হাসি। বললেন, অনেকের ধারণা তাই বটে।

এই বলে একটু ইতস্তত করে শুরু করলেন, হাঁ, আসলে যে কথাটার জন্যে আপনাকে ডেকেছিলুম, দেখুন আপনি কি চিনিশখো তেথছি সাধের গোছায় না, মানে এপ্রিল, মেতে গোহাটী গিয়েছিলেন?

হাঁ। কেন বলুন ত? সেখানে আমার মেসোমশাই চাকরী করতেন। ওই মাসীমার কাছে গিয়ে এক মাস ছিলুম। শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল বলে গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হলে, চেঞ্জে গিয়েছিলুম। ওখান থেকে আবার শিলঙে গিয়ে এক সপ্তাহ ছিলুম।

আচ্ছা, ওই সময় গোহাটী পাবলিক লাইব্রেরীতে একটা কি ফাংশান হয়েছিল, তাতে আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন মনে পড়ে?

হাঁ। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে শেফালী, কিন্তু এতসব আপনি জানলেন কি করে?

আচ্ছা, ওই সময় সেখানে আপনার বিয়ের একটা প্রস্তাব উঠেছিল। আর আপনার মেসোমশাই আপত্তি করেছিলেন, আপনার বয়েস কম, সবে আই-এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন বলে। কিন্তু আপনার মাসী, চিঠি লিখে তখনি সেখানে আপনার মা-বাবাকে আনিয়ে একেবারে কথাবার্তা পাকা এমনকি বিয়ের দিনও স্থির করে ফেলেছিলেন, মনে আছে?

মুখটা নীচু করে জবাব দিলে শেফালী, হাঁ।

পাইপটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বারকতক টান দিয়ে এবার প্রশ্ন করলেন চ্যাটার্জি সাহেব, নিশ্চয় যার সঙ্গে আপনার বিয়ের সব স্থির করে ফেলেছিলেন আপনার মা-বাবা, তাকে আপনি চোখে দেখেছিলেন?

না!

সেকি, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কিছুই শোনেননি?

হাঁ, বাবা-মা যখন পাশের ঘরে আলোচনা করছিলেন তখন শুনেছি। আমি নাকি রাজরাণী হবো। পাত্তরা খুব বড়লোক। বাপের একমাত্র ছেলে। বিলেত ফেরৎ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, বারোশো টাকা মাইনের চাকরী করে। কলকাতায় বাড়ী-গাড়ী ও বিষয়সম্পত্তি অনেক।

চ্যাটার্জি সাহেব এবার বলে উঠলেন, সবই দেখছি মিলে যাচ্ছে, কেবল একটা ছাড়া। আপনি বলছেন, পাত্রকে চোখে দেখেননি। অথচ আমি যতদূর জানি, আপনি নিজে হাতে চা জলখাবার তাঁর সামনে টেবিলের ওপর দিতে এসেছিলেন।

হাঁ, ঠিকই শুনেছেন কিন্তু ভয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাইনি, বিশ্বাস করুন।

ভয়ে! চমকে উঠলেন চ্যাটার্জি সাহেব। সত্যি তাই, না অন্যকিছু?

এবার মাথাটা তুলে চ্যাটার্জি সাহেব-এর দিকে তাকিয়ে শেফালী বললে, ওটা বলতে পারবো না। মাপ করবেন।

পাইপটা জোরে দাঁতে চেপে শেফালীর চোখের ওপর পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চ্যাটার্জি সাহেব। স্পন্দনহীন, নীরব নিস্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র!

তারপর দৃঢ় অথচ ধীরকণ্ঠে বললেন, ওই কথাটাই আপনার মুখ থেকে শুনবো বলেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

ওকথা শুনে আপনার লাভ! শেফালীর কণ্ঠে যেন সন্দেহের সুর বাজে!

নিমেষে যেন সমস্ত আবহাওয়াটা পালটে যায়।

ভয় নেই! 'ব্ল্যাকমেল' করবো না। স্রেফ কৌতূহল! বলেই অদ্ভুত ধরনের এক রুক্ষ হাসি হেসে উঠলেন তিনি। তারপর সহসা হাসিটা থামিয়ে, নীচু সুরে বললেন, কার কোথায় কতটুকু লাভ, আর কতটুকু লোকশান সে-হিসেব না দিয়ে যদি বলি, সেদিন যাঁর দিকে ভয়ে তাকাতে পারেননি, আজ সেই ব্যক্তি আপনার সামনে বসে, আর তার চোখের ওপর চোখ রেখে আপনি, আপনার স্বামীর জন্যে যে কোন রকমের একটা চাকরী, ভিক্ষা করছেন!

এাঁ! কি বলছেন! আপনি সেই-ই ...শেফালীর চোখদুটো যেন আটকে যায় ওঁর মুখের ওপর। সারা দেহের শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত যেন উদ্দাম উত্তাল হয়ে ওঠে। মুখ থেকে যেন একটা কথাও বেরোয় না। কেমন যেন এক বিভ্রান্ত বিহ্বল ভাব।

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, না? বলে, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যের সেই স্বচ্ছ যবনিকাকে যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, একদিন যে ঘরে রাজরাণী হয়ে বিরাজ করার কথা, আজ সেখানে...

হঠাৎ তাঁর কথায় বাধা দিয়ে শেফালী উঠে দাঁড়ালে। আচ্ছা তাহলে আসি। বলে কোনরকমে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নীচে নেমে এলো।

অধীর আগ্রহে নির্মল অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখামাত্র বলে উঠলো, এত দেরী কেন? কত টাকায় সব সেটল হলো! কবে অজিনয়, কোন অপিসে?

ওসব কোন কথাই হয়নি। তখনো যেন সে বিহ্বলভাবটা যায়নি, ওর মুখ থেকে।

তবে এতক্ষণ ধরে কি করছিলে ওপরে? নির্মলের গলার স্বর একটু চড়ে ওঠে!

শেফালী বললে, আরে ও-কথা তোলার আগেই এক নাটক হয়ে গেল। কে জানতো যে এই মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গেই আমার একদিন বিয়ের সব ঠিক করেছিলেন। সেই যে বাবা-মা বলতেন, আমি একদিন রাজরাণী হবো, ইনিই সেই ব্যক্তি!

যোৎ আর গল্প মারার জায়গা পেলে না। কে বলেছে!

আমি বলেছি। বলে পর্দা সরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। তারপর পাইপটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আপনার চাকরীর কথাটা বলবো বলে ওঁর পিছনে পিছনে আমি নেমে এসেছিলুম। তারপর আপনাদের কি কথা বলছেন শুনে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। হাঁ, এই মাসের শেষে, অপিসে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাদের চাপদানীর ফ্যাক্টরীতে একটা চাকরী যাতে সামনের মাস থেকেই হয়, আমি চেষ্টা করবো। বলেই পাইপটাতে ঘন ঘন টান দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মলের মুখের ছবিটা তখন বাঁধিয়ে রাখার মত। বজ্রাহত, বিহ্বল কি হতভম্ব! কি যে, তা বলা যায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে শেফালী বললে, ভাগ্যিস তোমার চাকরীর কথাটা প্রথমেই ওঁকে বলেছিলুম! যাই হোক, মানুষটা কিন্তু খুব ভাল, কি বলো!

হাঁ কি না, কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এবার শেফালী ছেলেমানুষের মত হেসে ওর হাতে একটা চিমটি কেটে বললে, কেমন এখন বিশ্বাস হলো তো! আগে যখন বলতুম আমার কত বড়লোকের ঘরে বিয়ে হবার কথা ছিল, তখন কে হেসে উড়িয়ে দিতে? এখন হাতে হাতে প্রমাণ পেলে তো?

যাও সবসময় ইয়ারকি ভাল লাগে না! বলে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে, আবার যেন কি চিন্তায় মগ্ন হলো।

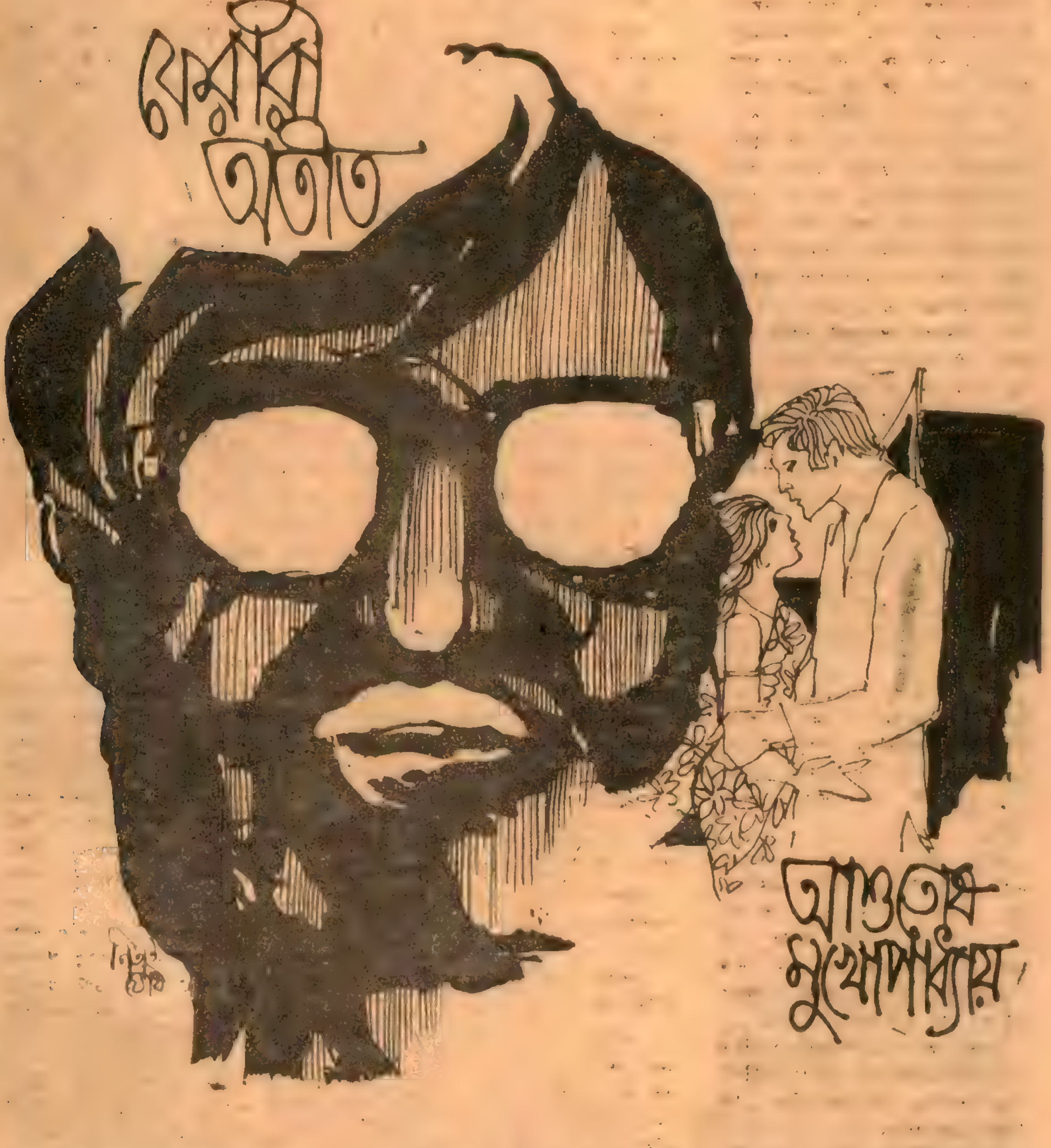

তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি, বিশ হাত দূরে চোখ চলে না। কামরার মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন উঠতে রামকৃষ্ণবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনে পাশে পিছনে ফটাফট জানলা খোলার শব্দ।

পামবান ব্রিজ আসছে। গাড়ির গতি কমেছে। ওই ব্রিজ পার হলে খানিকক্ষণের মধ্যে রামেশ্বরম—সাদা বাংলায় রামেশ্বর। যাত্রীদের এই ব্রিজ সম্পর্কে একটু বাড়তি আগ্রহের কারণ আছে। এই সেতু পেরুলে মহামোক্ষ ক্ষেত্র। সেতুর এধারে বন্ধন ও-ধারে মুক্ত। ওই সেতু উত্তরণের আগে পার্থিব জগতের যা-কিছু, সব ওধারেই ফেলে এসো।

ক'জন সত্যিই তাই আসে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না। তবু নির্লিপ্ত মুখে তিনিও সামনের জানলাটা খুললেন। ট্রেন ব্রিজে উঠলেই অন্যরকম শব্দ। এদিকের সবই ছোট লাইনের ছোট ট্রেন। তা সত্ত্বেও ব্রিজে ওঠার আগে থেকেই গাড়িটার শম্বুকগতি একবারে। এটা কোনো নিরাপত্তার কারণে কি যাত্রীদের সুবিধার্থে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না।

আবছা অন্ধকার ভেদ করা একটা একাগ্রতা নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনিও। শতসহস্র সেতুর মতোই একটা; তবে নীচে নদীর বদলে সমুদ্র—সমুদ্রের ফালিও বলা যেতে পারে। সেতুটা বিশাল বটে, অনেকক্ষণ লাগল পার হতে। কামরার মধ্যে মেয়ে-পুরুষদের সমুদ্রে পয়সা ফেলার হিড়িক পড়ে আছে। লোভ কাম মোহ মাৎসর্যের প্রতীক দুনেয়া তিন নয়া পাঁচ নয়া দশ নয়া সিকি আধুলি বিসর্জন দিয়ে মুক্ত মন নিয়ে মহাধামে পদার্পণের প্রেরণা কিনা এটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানেন না। একটি মহিলায় তাঁর দেড় বছরের শিশুকে দিয়েও সমুদ্রে পয়সা ফেলার উদ্দীপনা লক্ষ্য করে নিজের মনেই হেসেছেন।

রামেশ্বরে গাড়ি থামল যখন, চারদিক বেশ পরিষ্কার। যাত্রীদের নামার তাড়ায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রামকৃষ্ণবাবু অপেক্ষা করলেন খানিক। তাঁর কোনো তাড়া নেই। তিনি তীর্থ করতে আসেননি। কোনো মানত নিয়েও আসেননি। এখানে এক দিন থাকবেন কি তিন দিন নিজেও জানেন না। ভালো লাগলে দু'তিন দিন কাটাবেন,... না লাগলে আবার বেরিয়ে

পড়বেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালই লাগছে তাঁর। জীবনের এই প্রৌঢ় প্রহরে থার্ড ক্লাস কামরার সর্বসাধারণের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে দিতে পেরে বেশ একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ উপভোগ করছেন। এদের কেউ তাঁকে চেনে না, কেউ জানে না, কেউ ঈর্ষা করে না, কেউ তোষামোদ করতেও আসে না। নামের মোহ, নামের যশখ্যাতি, প্রতিপত্তির খোলস থেকে একটা মুক্তির স্বাদ যে এভাবে অনুভব করা যায়—রামকৃষ্ণবাবু দীর্ঘদিনের আরাম-ঘরে বন্দী থেকে সেটা যেন ভুলতেই বসেছিলেন।...বাড়ির গাড়িতে মেয়ে আর ছোট ছেলে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে মাদ্রাজ মেলের ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ কামরায় তুলে দিয়ে গেছেন। বড় আর মেজ ছেলে খুবখুব বলছিল একার মনস্থিরে গেলেই ভালো হত। তিন বউমা শোরগোল করে যাত্রার সুবন্দোবস্তে উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু শেষ পর্যন্ত একটা হোল্ড-অল আর ছোট স্যুটকেস ভিন্ন আর কিছুই নিতে রাজি হলেন না দেখে তারা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করেছে। শ্বশুরের একটু বিবাগী মনোভাব লক্ষ্য করে ভিতরে ভিতরে যেন উতলা হয়েছে তারা। ফার্স্ট ক্লাস থেকে বেরিয়ে থার্ড ক্লাস কামরায় এ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি জানলে তাদের চোখগুলো কপালে উঠত।...মেয়ে বার-বার করে বলে দিয়েছে, দু'দিন পরে পরে একখানা করে চিঠি দেবে বাবা, নইলে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় থাকব। বড় বউমা বলেছিল, ঠিকঠিক খবর না পেলে কিন্তু আপনার ছেলে কাজকর্ম ফেলে মাদ্রাজ ছুটবে। তখন অন্য বউমাদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণবাবুর মনে হয়েছে এ-রকম কথা ওদেরও বলার ইচ্ছে ছিল।

...মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি টেলিগ্রামে পৌঁছা-সংবাদ এবং কুশল সংবাদ দিয়েছেন। তারপর সাতদিনের মধ্যে অনির্দিষ্ট পর্যটনে বেরিয়ে পড়ার আগে তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এত ভালো আছি যে এক জায়গায় আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। বেরিয়ে পড়ছি, কখন কোথায় থাকব এরপর ঠিক নেই, নিয়মিত চিঠিপত্র না পেলে একটুও চিন্তা কোরো না।

...দেখলে কেউ বলবে না রামকৃষ্ণবাবুর বয়েস এখন সাতাত্তর। শরীর শক্ত মজবুত এখনো। চুলের তলায় তলায় কিছুটা পাক ধরেছে, একটা দাঁত নড়েনি বা পড়েনি। এখন তাঁর পোশাক ঢোলা পা-জামা আর ঢোলা রঙিন পাঞ্জাবি। এই পোশাকে বয়েস আরো কম দেখায়। এ-ভাবে বেরিয়ে পড়ার পর রামকৃষ্ণবাবু যেন একটা ভারী মহার্ঘ জিনিস ফিরে পেয়েছেন। সেটা তাঁর যৌবন আর যৌবন-স্মৃতি। শক্তসমর্থ লোকের মতোই ঘোরাফেরা করছেন—কারো মুখাপেক্ষী নন, সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভরশীল। ...দীর্ঘদিন ধরে এই আত্মপ্রত্যয়টুকুই তিনি খুইয়ে চলেছিলেন। ছেলেমেয়ে বউমা নাতি নাতনি পরিবৃত হয়ে তিনি যেন অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ একটা খোশ মেজাজের জন্ম নিয়ে অপ-ছিল তাঁর ভিতরে বাইরে।

...প্রত্যয়ের এই নতুন স্বাদে ভরপুর হয়ে স্ত্রীর কথাও চিন্তা করেছেন বইকি। অন্ত পাশে সে, শুধু সে, থাকলে বেশ হত। স্ত্রীর বেড়াবার ঝোঁকও ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু তখন সাফল্যের ভরা জোয়ারে ভাসছেন। এই জোয়ার থেকে কেউ তটে এসে বিরাম চায় না।...

গাড়ি ফাঁকা। যাত্রীরা সব নেমে গেছে।

রামকৃষ্ণবাবু উঠলেন। কুলির মাথায় হোলড-অল আর ছোট স্যুটকেস তুলে দিয়ে প্রথমে রেলওয়ের রিটায়ারিং রুমের সন্ধানে এলেন।

সিঙ্গল রুম ভাড়া হয়ে গেছে, ডাবল রুমের ভাড়া বেশি—সেটা খালি আছে। রামকৃষ্ণবাবু সেটা বুক করে মালপত্র রেখে নিশ্চিন্ত।

রামেশ্বরে এসে সমুদ্রস্নান না করলে আসাটাই অসমাপ্ত। পুণ্যের লোভ না থাকলেও সমুদ্রস্নানের ইচ্ছে আছে রামকৃষ্ণবাবুর। মুখ-হাত ধোয়া চা-খাওয়া ইত্যাদির পর গামছা আর নতুন একপ্রস্থ পা-জামা পাঞ্জাবি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলেন। রামেশ্বরের মন্দির এবং স্নানের জায়গা কাছাকাছি। স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দেওয়ার বিধি।

টমটমে করে স্নানের বাঁধানো চাতালের সামনে নামলেন। স্টেশন থেকে তিন কোয়ার্টার মাইল পথ হবে—রোদ চড়া তখন।

এ-সময় সমস্ত মানুষেরই গন্তব্য স্থান ওই একটি। টমটম থেকে নামতেই দু'জন পাণ্ডার চেলা দু'দিক থেকে এগিয়ে এলো। এদিকের পাণ্ডার সাঙ্গ তাদের তফাত হল তারা বিনীত বেশ। রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন, পাণ্ডার দরকার নেই। একটু চেষ্টা করে একজন সরে গেল, আর একজন ছোকরা কিন্তু লেগেই থাকল। সে আবার জামা জুতো রাখার ভার নেবে, পুজোর সব ব্যবস্থা এবং দর্শনাদি করিয়ে দেবে, এমন কি আজকের বিশেষ পুণ্যদিনে এই যে মাতাজি এসেছেন রামবাগ্রো থেকে তাঁরও দর্শনলাভের এবং আশীর্বাদলাভের ব্যবস্থা করে দেবে।

সমুদ্রের ডানদিক ঘেঁষা উঁচু বিশাল বাঁধানো চাতালের একদিকে হাত তুলে দেখালো সে। সেখানে দস্তুরমতো মেয়ে-পুরুষের ভিড়। অর্থাৎ মাতাজীর দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভ করছে তারা।

রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু লোকটা নাছোড়। সবিনয়ে বলতে লাগল, দেব-স্থানমএ এসেও ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য পুজো দেবে না এ কেমন কথা বাবুজী—ভগবানের কাছে তোমার দাও ছেলেপুলের ভালো হবে।

এইবার রামকৃষ্ণবাবু থমকালেন। ছেলে-মেয়ের কল্যাণ তিনি চান, মঙ্গল চান। পুজো দিলে কতটুকু কল্যাণ বা মঙ্গল হবে জানেন না। কিন্তু না দিলে ক্ষতি হবে কিনা কে জানে। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাননি, কোথায় কি আছে, কোন্ জায়গায় কি স্থানমাহাত্ম্য কে জানে?...কাতারে কাতারে লোক সমুদ্রে স্নান করছে, সকলেই তারপর পুজো দেবে। কিছুই যখন জানেন না কি হয়, আত্মাভিমান নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার দরকার কি? তাছাড়া এখানে কে চিনছে, কে জানছে তাঁকে? পরে ছেলেমেয়েদেরও জানার দরকার নেই...এই আত্মপসন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার দরকার কি।

চেলার হাতে জামাকাপড় জিম্মা করে কোমরে গামছা জড়িয়ে তিনি সমুদ্রে নামলেন। তার আগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন, পাণ্ডার চেলা তরতর করে ওই বাঁধানো উঁচু চাতালে উঠে গেল। মন্ত্র-মোক্ষদাতারা সব ওখানেই বসে।

অনেকক্ষণ ধরে চান সেরে উঠে এলেন। নুন-জলে গা চটচট করছে। ঘরে ফিরে আবার একদফা চান করতে হবে। কিন্তু খুব তাজা লাগছে এখন, আর বয়েসটা যেন আরো কম ঠেকছে নিজের।

ডালি হাতে পাণ্ডা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে। ভিজে জামা-কাপড় বদলানোর নামে সে ঘনঘন মাথা নাড়ল। সিদ্ধ বস্ত্রে পুজো দেওয়ার বিধি। বলল, চাতালের ওই পুরোহিতের কাছে মন্ত্রপাঠ শেষ করে মন্দিরে যেতে হবে। তারপর আদেশ

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস. এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কালচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৪এ, সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
মফিস ৬.৫০ পয়সা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

পেসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ত্রী অনেকেই হয়
সহধর্মিণী হয় কজন
মূল্য—৬·১০
দে বুক স্টোর্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ।

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর কষ্টের ঝঞ্ঝাটও আসে

জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনার অসময়ে কাজে আসে

আপনি নিশ্চয়ই কলেজের কোনো উৎসব থেকে বাদ পড়তে চান না! ধরুন কলেজে কোনো ভালো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে আর আপনি কোমরের যন্ত্রণা আর অস্বস্তির দরুণ প্রায় শয্যাশায়ী! এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবে জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন!

অ্যানাসিনের গুণ অনেক। এ যে শুধু যন্ত্রণা থেকে আরাম দেয় তাই নয়—যন্ত্রণার দরুণ যে হতাশভাব আসে তাও দূর করে দেয়। আপনাকে চটপট আরাম আর স্বস্তি দিয়ে, অ্যানাসিন আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এই অসহায় দিনগুলিতে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করে পড়ে থাকবেন না। আজ যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনাকে চটপট আরাম দেয়, চাঙ্গা করে তোলে। আপনি অক্লেশে আপনার রোজকার কাজকর্ম করতে পারেন।

মেয়ে হয়ে জন্মানো মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি অ্যানাসিনের সাহায্যে সে ঝঞ্ঝাট দূর করে—জীবনের সকল আনন্দ পুরো উপভোগ করতে পারেন। প্রয়োজনের জন্যে হ্যাণ্ডব্যাগে সবসময় অ্যানাসিন রাখুন—মস্ত বড় সুবিধে!

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

A-59 A

কুন্ডের মিঠে জলে স্নান করে দর্শন এবং পুজো শেষ করতে হবে।

মিঠে জলের স্নান ছাড়াও নিজের সাহিকতা যাচাইয়ের ইচ্ছেও হল। নেমে গেছেন যখন রামকৃষ্ণবাবু—সব ঠিক আছে।

এগারোটি টাকা আগে গুনে দিয়ে পুরোহিতের সামনে আসনে বসলেন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, কার কল্যাণে পুজো?

একটু ভেবে রামকৃষ্ণবাবু তিন ছেলে আর মেয়ের নাম করলেন। মনে মনে তাদের সুমতি প্রার্থনা করলেন। পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র আওড়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই বিমনা হয়ে পড়লেন। ছেলেদের মেয়ের বউমাদের একে একে সকলের মুখগুলো চোখে ভাসল রামকৃষ্ণবাবুর। আর কিছু না চেয়ে শুধু সুমতি চাইলেন কেন? ...না, বাইরের আচরণে কোনোদিন কারো ওপর বিরূপ হননি রামকৃষ্ণবাবু। কিন্তু চাপা খেদ বা ক্ষোভ একটু ছিল বইকি।... নিজের স্ত্রীর মেজাজ-পত্র খুব ভালো ছিল না। হয়তো একটু অল্পেতেই রেগে যেতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু ঠিকই অনুভব করতেন ছেলেরা বা বউমারা তাদের মা বা শাশুড়ীর ওপর তুষ্ট ছিল না খুব। ওদের আচরণে আঘাত পেয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় কাতর দেখেছেন। ছেলেদের অথবা ছেলের বউদের কিছু বলতেন না, স্ত্রীকেই বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মনের ব্যথা মনেই চাপা থাকত।

...শাশুড়ীর পরে কর্তৃত্বের হাত-বদল হয়েছে। ছেলেরা চোখ রাখে তাঁর ওপর, বউমারা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করে, মেয়ে একদিন অন্তর একদিন এসে বাপের খবর নেয়। তবু সে-সবের কোনো তাপ যেন বুকের তলায় স্পর্শ করে না। উল্টে টুকরো টুকরো এক-একটা ব্যাপার মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু সে-হাসি খুব সুখের নয়।...বাড়িটা তিন ছেলের নামে লেখাপড়া করে দেবার পর মেয়ে-জামাইয়ের মুখ শুকনো-শুকনো মনে হয়েছে। বাড়িটার দাম ধরে তার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ টাকা মেয়ে-জামাইয়ের নামে চালান করার সময় আবার ছেলেদের বা বউমাদের মুখে তেমন উৎসাহ চোখে পড়েনি।

...গল্প উপন্যাস মিলে কম করে দেড়শ বই আছে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর: এই সাতান্ন বছর বয়সেও সম্পাদক আর প্রকাশকদের তাগিদের জ্বালায় অস্থির হতে হয়। সিনেমার প্রযোজক পরিচালকরা এখনো বাড়িতে হানা দেয়। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস-গল্প এ-যাবত ছবি হয়ে গেছে—আরো অনেক হতে পারে। এ ছাড়াও ওই মেজাজ গল্প-উপন্যাসের বইগুলো বেশির ভাগই সচল এখনো। মাস গেলে মোটা রয়্যালটি আসে। এইসব বই কি-ভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হবে ছেলেদের আর মেয়ের মনে সেজন্যে একটু প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ আছে মনে হয়। ছেলেরা একবার হালকা কথা-বার্তার ফাঁকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও করেছিল।

হঠাৎ সচকিত রামকৃষ্ণবাবু পুরোহিতের মন্ত্র পড়ানো কখন শেষ হয়েছে কে জানে। বাবুকে ভাব-তন্ময় মনে করে পুরোহিত আর তাঁর চেলা নির্বাক।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। চাতাল অনেকটা ফাঁকা এখন। কোণের দিকের মাতাজীর সামনে মাত্র পাঁচ সাতটি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে এখন। বাতাসে তাঁর লাল-পাড় শাড়ির আঁচল উড়ছে। একটু উঁকি দিলেই রামকৃষ্ণবাবু মাতাজীর মুখ দেখতে পেতেন। কিন্তু সে-রকম কোনো আগ্রহ হলো না।

চেলা মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দক্ষিণভারতে বহু মন্দির কল্পনাতীত স্থাপত্যমাহাত্ম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। রামেশ্বরের মন্দিরও তার ব্যতিক্রম নয়। এর করিডরটাই শুনেছি চার হাজার ফুট।

পুরী বারাণসী গয়াধাম ইত্যাদি দ্বাদশ কূপের চব্বিশ বালতি মিঠে জল তাঁর মাথায় ঢালল পাণ্ডার চেলা। স্বচ্ছ জল, ভালো লাগল। তারপর সেই ভিজে জামা-কাপড়ে চল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর দর্শন এবং পুজো শেষ।

গায়ে ভিজে জামা-পাজামা, খালি পা, বাইরে মাটি তেতে আছে, মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। এবারে একটু ক্লান্ত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু। চেলার সঙ্গে চাতালে এসে উঠলেন আবার—সেখানেই শুকনো জামা-কাপড়। কোণের মাতাজীর সামনে জনা তিনেক লোক তখন। রমণী এদিকেই চেয়ে আছেন—সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে রামকৃষ্ণবাবু আড় চোখে তাকালেন একবার—কালোকুলো মুখের একপাশ দেখতে পেলেন। রমণী তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন মনে হল, কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুর তখন ঘরে ফেরার তাড়া। সোজা চাতালের আড়ালে চলে গেলেন। জামা-পাজামা বদলে ভিজেগুলো হাতে তুলে নেবার আগে একজন স্থানীয় লোক এসে চেলাটির কানে কানে কি বলতেই সে ব্যস্তসমস্ত মুখে চলে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু সোজা চাতাল থেকে নেমে এলেন। চেলার প্রাপ্য সে আগেই পেয়েছে। মাতাজীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সে কথা বলছে। মাথায় কাপড় তোলা মাতাজীর কালো মুখের একটু আভাস মাত্র পেয়েছেন। তা দক্ষিণভারতে রূপসী রমণীর দর্শনলাভ একটা বিরল ব্যাপার।

বিকেলে আবার বেড়াবার জন্য রাস্তায় নামলেন। পায়ে পায়ে টাঙ্গা আর মোটর ছেঁকে ধরছে—এখানকার যাত্রীদের পাঁচ পা হাঁটতে দেখলেও ওরা বরদাস্ত করতে চায় না। সমুদ্র বা মন্দিরের দিকে এগোতে মালা-অলা আর শাঁখ-অলারাও সঙ্গ নিতে ছাড়ে না।

—রামঝরুকা—বাবুজী রামঝরুকা চলিয়ে!

কম করে দশটা টাঙ্গাঅলার মুখে এই একই হাঁকডাক শুনলেন রামকৃষ্ণবাবু। রামঝরুকা কি ব্যাপার বোধগম্য হল না।

এক ছোকরা টাঙ্গাঅলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামঝরুকা কেয়া হ্যায়?

সাগ্রহে টাঙ্গা থেকে নেমে এসে ও বলল, রামজীকো চরণ দর্শন হোগা, পাস্ হো তো মাতাজী কো গানা ভি শুনিয়েগা—আইয়ে সাব, বৈঠিয়ে।

উঠে বসেই পড়লেন।

দুদিকের তেঁতুল-সারির মাঝখান দিয়ে সুন্দর পাকা রাস্তা। মাইল তিনেক বাদে রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের সামনে এসে থেমেছে। সামনে এক-তলা সমান প্রশস্ত বাঁধানো চাতাল, তার ও-পাশে এক-তলার মতো সিঁড়ি ভাঙলে মন্দির।

চাতালের সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো। সেটা পড়ে হাসিই পেয়ে গেল। জায়গা বা মন্দিরের নাম হল রামজী ঝরুকো। অর্থাৎ সীতা অন্বেষণের পথে রামজী এখানে থেমে ছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে স্বর্ণলঙ্কার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন।

মন্দিরে উঠলেন। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বাঁধানো চাতালের মাঝখানে ছোট মন্দির। সেখানে রামজীর পাষাণ-চরণ-চিহ্ন। সেই দর্শন সারতে এক মিনিটও লাগে না। চাতালের চারদিকে ঘুরে সমুদ্র দেখাটা সত্যিই লোভনীয়। সেই উদ্দেশে সবে দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন—সেখানকার একজন লোক তাঁর কাছে এসে সবিনয়ে জানালো, মাতাজী বোলাতে'।

এ আবার কি বিড়ম্বনা রে বাবা। মাতাজী তাঁকে ডাকেন কেন! গানের সমজদার ভেবেছেন নাকি! চারদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁহা মাতাজী?

মন্দিরের পিছনটা দেখিয়ে লোকটা তাঁকে রেলিংঘেরা চাতাল ধরে পিছন দিকে নিয়ে চলল।

লালপেড়ে শাড়িপরা সকালের সেই রমণী বসে। সোজা সামনের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ। পিছন থেকে কালো দেহের আঁট বাঁধুনী দেখে খুব বেশি বয়েস মনে হল না মাতাজীটির। ইনি ওখানে বসে রামকৃষ্ণবাবুর এই স্থানে আগমন টের পেয়ে লোকমারফৎ ডেকে পাঠালেন কি করে? হয়তো আসার সময় দেখে থাকবেন।

—নমস্তে।

—নমস্কার। বসো। বলতে বলতে তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন মাতাজী।

সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যে এই পৃথিবীটাই বুঝি উল্টেপাল্টে যেতে লাগল রামকৃষ্ণবাবুর। কিন্তু বাইরে পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে দেখছেন। দেখার পরেও বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানেন না। ... তেইশ বছরের একটা মেয়ের মুখে চোখে সর্ব অঙ্গে তিরিশটা বছর জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায়? কেমন দাঁড়ায়? অথচ আশ্চর্য, এঁর সামনে এসে দাঁড়ালে, ভালো করে একটু তাকালে তিরিশ বছর আগের সেই তেইশ বছরের মেয়েকে চিনতে একটুও সময় লাগে না। রামকৃষ্ণবাবুর সময় লাগল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

মাতাজী এবারে খানিকটা ঘুরেই বসলেন তাঁর দিকে। হাসিমাখা স্নিগ্ধ মুখ। ...তিরিশ বছর আগে ওই মুখে সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেদিনও মুখের হাসিটুকু ভালো লাগত, আজ সেটা স্নিগ্ধ কমনীয় লাগছে।

—চিনতে পারছ না?

দাঁড়িয়ে থাকার দরুন মাথার চুল আরো বেশি উড়ছে রামকৃষ্ণবাবুর। মাথা নাড়লেন। পারছেন।

সামনের ঝকঝকে মেঝে দেখিয়ে মাতাজী বললেন, তাহলে বোসো—সকালে রামেশ্বরের ঘাটে দেখার পর থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

বাহ্যজ্ঞানরহিতের মতো রামকৃষ্ণবাবু বসলেন। চেয়েই আছেন মুখের দিকে। এভাবে সামনে বসতে, মুখের দিকে চেয়ে থাকতে এ-বয়সে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ থাকার কথা নয়। তার ওপর ইনি মাতাজী এখানকার। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-দর্শনে যারা আসছে, অলিন্দ ঘুরে তারা একবার মাতাজীকেও দর্শন করছে—তফাতে দাঁড়িয়ে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে। হয়তো তাঁর নির্দেশেই মন্দিরের ভক্ত দুটি আপাতত কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না।

মুখের ওই হাসি এখন আরো অদ্ভুত লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর।...তাঁর থেকে চার বছরের ছোট, অর্থাৎ তিপান্ন হবে বয়েস এখন। তেতাল্লিশও দেখায় না। কালো মুখের চামড়ায় যেটুকু ভাঁজ পড়েছে তাও জরার দাগ মনে হয় না। দুই ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসি দুই গালের দিকে ছড়িয়ে ওই ভাঁজের মধ্যে পড়ে যেন অদ্ভুত চিকচিক করছে—তারপর উপছে উঠে চোখের কালো তারার দিকে ধাওয়া করছে। বাতাসে বিশৃঙ্খল হয় বলেই হয়তো চুলের বোঝা টান করে পিছনে এনে গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্ধনীর নীচে এক পিঠ চুল কোমরের নীচ পর্যন্ত তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে। কান দুটো চুলে ঢাকা পড়েনি, ওই হাসি যেন শেষে কানের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়েছে।

খুব হাল্কা সুরে বললেন, এ-জায়গাটার মাহাত্ম্য আছে, একদিন রামচন্দ্র রুকেছিলেন এখানে, আজ রাম-কৃষ্ণ রুকলেন।

রামকৃষ্ণবাবু বলতে পারতেন, রামচন্দ্র সীতা সন্ধানে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণর কোনো হারানো-প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই।

কিছুই বললেন না। চেয়ে আছেন। দেখছেন।

—রামেশ্বরের ঘাটে দেখলাম বেশ ধর্মে কর্মে মতি হয়েছে।...একবার ফিরেও তাকালে না।

রামকৃষ্ণবাবু আত্মস্থ করলেন নিজেকে। এ-রকম বিড়ম্বনা ভোগ করার তাঁর অন্তত কোনো কারণ নেই। জবাব দিলেন, কলকাতার শুভা গাঙ্গুলি এখানে মাতাজী হয়ে বসে থাকতে পারেন এটা কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না—

রমণীর মুখে সেই অদ্ভুত সুন্দর নিঃশব্দ হাসিটা আরো যেন বেশি উপছে পড়ছে।—তাছাড়া চেহারাটাও ফিরে তাকানোর মতো নয়।

কেন যে হঠাৎ আবার বিরত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু, জানেন না। কোনো একদিন দেখা হলে কৈফিয়ত তো তাঁরই নেবার কথা। ঘরে আর একজনকে আনার পরেও এই এক রমণীকে দীর্ঘদিন ভুলতে পারেন নি। ভুলবেন কি করে, নিরুদ্দেশ হবার পরেও কম করে তিন চার বছর পর্যন্ত রেডিওতে আর রেকর্ডে তার গান বাজার কামাই নেই। তারপর অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হয়েছেন।

যে লোকটি তাকে মাতাজীর কথা বলে তাঁকে এদিকে নিয়ে এসেছিল, সে অদূরে এসে দাঁড়াল। তাদের মাতাজী সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে সে জানান দিল, টঙ্গাঅলা বাবুজীকে ডাকছে।

স্পষ্ট হিন্দীতে মাতাজী নির্দেশ দিল, আমার নাম করে তাকে বলে দাও অনেকক্ষণ বসতে হবে—বাবু ডবল ভাড়া দেবেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলিয়ে তাঁর চোখে চোখ রেখে দেখলেন একটু। —তোমার তাহলে তিন ছেলে আর এক মেয়ে এখন?

ঈষৎ বিস্ময়ে মাথা নাড়লেন রামকৃষ্ণবাবু। তাই।

—না মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, যে পান্ডার মারফত ওদের কল্যাণে পুজো দিলে তার কাছে শুনলাম।...তা একা তীর্থে এলে, স্ত্রীকে নিয়ে এলে না কেন?

—তিনি অনেক বড় তীর্থে চলে গেছেন।

মহিলা থমকালেন একটু।—কতদিন আগে?

যশোরের চিরুণী মানেই কিরণ

৪৬ বছরের বাজারের সেরা চিরুণী। মজবুত ও টেকসই বলে আপনার খরচ বাঁচবে চুল আঁচড়ে আরাম পাবেন।

কিরণের চিরুণী আপনার চিরুণীর সমস্যা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯

—বছর দেড়েক।

শুভ্রা গাঙ্গুলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।—ভাগ্যবতী বলতে হবে।...ছেলেমেয়েদের সব বিয়ে থা হয়ে গেছে?

মাথা নাড়লেন। হয়েছে।

—তারা কেমন?

—ভালো।

—এ বয়সে একলা তোমাকে তীর্থ করতে ছেড়ে দিলে?

—তীর্থে বেরোইনি আমি—মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ ঘোরাঘুরির নেশায় পেয়ে বসেছে।

ভিতরটা ভয়ানক উসখুস করে উঠছে রামকৃষ্ণবাবুর। কৈফিয়ত চাইবার সময় আর প্রয়োজন বহুকাল আগে ফুরিয়েছে। এখন শুধু কৌতূহল একটু।...প্রতিশ্রুতি ভুলে, ভবিষ্যত ভুলে, গান ফেলে তিরিশটা বছর আগে শুভ্রা গাঙ্গুলি হঠাৎ কার সঙ্গে ওভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছল, আর এখন সেই মানুষের খবর কি? ঠোঁটের ডগায় বার বার এই প্রশ্নটাই আসছে শুধু।

...তিরিশটা বছর অনায়াসে চোখের সামনে থেকে সরে গেছে রামকৃষ্ণবাবুর। তিরিশটে কেন, তারও ঢের বেশি।

...ন' দশ বছর বয়েস থেকেই নিজের কালো কুৎসিত বয়েস সম্পর্কে সজাগ ছিল একটা মেয়ে। তার নাম শুভ্রা —শুভ্রা গাঙ্গুলি। রামকৃষ্ণবাবুর দিদির ভাসুরের মেয়ে। মধ্যবিত্ত অবস্থার মানুষ। সেই কুৎসিত মেয়েটা এমন কিছু গুণের অধিকারিণী হতে চেয়েছিল, যার আলোয় রূপের খেদ চাপা পড়ে যেতে পারে।

......সে রকম গুণের অধিকারিণী হতে পেরেছিল। গান। চৌদ্দ বছর বয়সে তার গানের প্রথম রেকর্ড হয়। তেইশ বছরের মধ্যে তার রেকর্ডের ছড়াছড়ি। বড় বড় সব জলসা থেকে ডাক আসে, সিনেমা প্লে-ব্যাকের ডাক আসে। শেষের দুটো বছর রেকর্ড আর প্লে-ব্যাকের দরুন অবিশ্বাস্য টাকা এসেছিল সেই মেয়ের হাতে।

......আর যে ছেলেটার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে তার হৃদ্যতা, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শুভ্রার মা নেই, ভাসুর ভাদ্দরবউ বাস দিদির কাছেই। ...ওই মেয়ে তার লেখকজীবনের প্রথম প্রেরণা। তার সঙ্গে প্রতিটা লেখা নিয়ে কত আলোচনা, কত মতভেদ।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ওই মেয়েকেই বিয়ে করবেন স্থির করেছিল রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

......বাইরেটা কুৎসিত কিন্তু ভেতর তো সুন্দর। চোখ বুজে গান শোনে যখন, স্থান কাল ভুল হয়ে যায়।...... তাছাড়া বয়সেরও একটা রূপ আছে, সেই রূপই চোখে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। শুভ্রার গানের কদর চারদিকে যতো বাড়ছে—রূপের প্রশ্নটা ততো গোপ ভাবতে চেষ্টা করেছে রামকৃষ্ণ।

কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে মেয়েটা হাসে শুধু। হাঁ না কিছুই বলে না। কালো মুখে রঙের ছোপ লাগে সেটা অবশ্য রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর চোখ এড়ায় না। ওদিকে গানের টাকা আসছে—ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে—রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী অন্তত চারজনকে জানে, যাদের যে-কোনো একজন শুভ্রার একটু চোখের ইশারা পেলে বিয়ে করে তাকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠাট্টা করে ওদের নিয়ে। শুভ্রা গাঙ্গুলি হাসে খুব। বলে, স্টুডিওতেও অন্য তিনেক আছে যারা পাগল করে ছাড়লে।

মনস্থির করে ফেলার পরেও ওই মেয়ের সাড়া না পেয়ে ভিতরে ভিতরে রামকৃষ্ণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। অথচ মেয়েটা যে তার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে সেই আভাসও পেয়েছে। গানের জন্যে যে মেয়েকে সাধ্যসাধনা করতে হয়, সেই মেয়ে নিরিবিলিতে তাকে দশখানা গান শোনাতেও আপত্তি করে না।

......ছেলেটার সাতাশ আর মেয়েটার তেইশে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওই মেয়ে প্রশ্রয় না দিলেও প্রেমিকের সংখ্যা বাড়ছে দেখে ছেলেটার ইদানীং মেজাজ চড়া প্রায়ই।

...বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল সেই রাতে। দিদি জামাইবাবু কোথাও বেরিয়ে আটকে গেছেন বোধহয়। তিন তলার ঘরে চোখ বুজে একের পর এক গান শুনে যাচ্ছিল রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এক-একটা গান শেষ হলে শুভ্রার চোখে চোখ মিলাচ্ছিল। হঠাৎ উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল ছেলেটা। শুভ্রার মুখে শংকা, চোখে বিস্ময়। —কি?

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এগিয়ে এলো। খুব কাছে। তানপুরা সরিয়ে দিল। তারপর শক্ত দুই হাতে একেবারে বুকের ওপর টেনে আনল ওকে। —আমাদের বিয়ে হবে কি হবে না?

—ছাড়ো, আঃ!

বাধা পড়ল। দুটো পুরু ঠোঁটের মধ্যে শব্দটা হারিয়ে গেল। অসহিষ্ণু তাড়নায় মেয়েটাকে বুঝি গ্রাসই করে ফেলবে। —বিয়ে হবে কি হবে না?

সমস্ত মুখের বেগুনে রং শুভ্রার। কাঁপছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। —কি করছ! ছাড়ো, কেউ এসে গেলে—

আবার আসুরিক বাধা পড়ল। তারপর আবার সেই প্রশ্ন।—আমাদের বিয়ে হবে কি হবে না?

হাল ছেড়ে ওই মেয়ে কালো টানা দুই অসহায় চোখ তার মুখের ওপর রাখল। —হবে। ছাড়ো।

এই ঘটনার ঠিক পাঁচ দিনের মাথায় ওই মেয়ে নিখোঁজ।......যে চারটে ছেলে তার প্রত্যাশায় বাড়িতে আসত, তাদের দেখা মিলেছে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আর তাদেরও ধারণা, স্টুডিওরই কোনো একান্ত গুণগ্রাহীকে নিয়ে শুভ্রা গাঙ্গুলি উধাও হয়েছে। দিদির মুখে শুনেছে, যাবার আগে ওই পাঁচ দিনের মধ্যে ব্যাংক থেকে নিজের নামের সব টাকাও তুলে নিয়ে গেছে।

......তিরিশ বছর বাদে এই দেখা।

রামকৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছ?

তেমনি হাসিমুখে মহিলা জবাব দিলেন, তোমাকেই দেখছি।......তিরিশটা বছর কেটে গেল এ যেন বিশ্বাস হয় না, মনে হয় সব সেদিনের কথা। চোখ বুজে তোমার সেই গান শোনা আজও যেন চোখের সামনে দেখছি।

রামকৃষ্ণবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পুরনো দিনের স্মৃতির শুধু এটুকুই চোখে ভাসার কথা নয়।

রমণীর কালো মুখে খুশিভরা কৌতুক। —আচ্ছা, তোমার বউ রূপসী ছিলেন নিশ্চয়?

—রূপসী না হোক, মোটামুটি ভালোই ছিলেন দেখতে। জবাবটা দিতে পেরে মনে মনে খুশী হলেন রামকৃষ্ণবাবু।

মুখ টিপে হাসছেন মহিলা। আবার কি মনে পড়ল হঠাৎ। মুখে সেই রকমই কৌতুকের মিষ্টি ছটা।—আর তোমার পরের সব বইয়ের নায়িকারাও কি প্রায় সুন্দরী নাকি?

এবারে আর রামকৃষ্ণবাবু জবাব দিলেন না। ভিতরে ভিতরে কেন যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন জানেন না। পুরনো স্মৃতি সবই মুছে গেছল, তিরিশ বছর বাদে আবার সেটা তাজা করে তোলার ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। ভিতরে ভিতরে তাঁর একটাই কৌতূহল। শুভ্রা গাঙ্গুলিকে আজ তিনি এখানে এই বিজনে এ অবস্থায় দেখছেন কেন? অথচ কালো মুখের ওই হাসির সঙ্গে যেন সবার যোগ—শিক্ষনে

যা ফেলে এসেছেন তার জন্যে যেন এতটুকু খেদ নেই, ক্ষোভ নেই।

প্রশ্নের সুযোগ মহিলাই দিলেন। বললেন, এতকাল পরে দেখা, আমার কোনো খবর জিজ্ঞাসা করলে না তো?

—জিজ্ঞাসা করলে বলবে?

—ও মা, না বলার কি আছে!

—এই জীবনে অভ্যস্ত হতে তোমার কতদিন লেগেছে?

—বেশি দিন না। গানের কল্যাণে ভারী সহজেই সব সয়ে গেল।

—অর্থাৎ যার জন্য তোমার এতখানি আত্মত্যাগ তিনি অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে গেছেন?

জবাব দিলেন না। রামকৃষ্ণবাবুর আবার মনে হল, কালো মুখের তলায় তলায় আবার সেই বিচিত্র হাসির উৎসমুখ যেন খুলে গেছে। কালো বুকের ভিতর দিয়ে সেই হাসির তরঙ্গও বুঝি দুচোখ মেলে দেখার মতো।

—জবাব দিলে না। রামকৃষ্ণবাবু বললেন, তবু আরো একটু কৌতূহল আমার। —আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে মানুষটিকে সেদিন অনুগ্রহ করেছিলে তাকে কি আমি চিনি?

সমস্ত মুখেই হাসি চিকচিক করছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর। এবারে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লেন মহিলা। অর্থাৎ চেনেন।

—নাম বলবে না বোধ হয়?

—বললে কি করবে, তিরিশ বছর বাদে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটবে?

—না, শুধু জানার ইচ্ছে। আর সত্যিই তুমি সুখী কি না।

কালো মুখে সেই হাসির নিঃশব্দ তরঙ্গের ছেদ নেই। হাসিমাখা দুই চোখ তাঁর চোখের ওপর অপলক কৌতুকে স্থির হয়ে আছে। তেমনি মিষ্টি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর মহিলার। বললেন, তাঁর নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী—যে ভদ্রলোক চোখ বুজে আমার গান শুনত আর কল্পনার জোয়ারে ভাসত, যার গল্পের নায়িকারা সকলেই সুন্দরী, আর, যে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে আমার গানকে বিয়ে করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। আমি সরে এসে তাকে রক্ষা করতে পেরেছি, নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি—আমার মতো সুখী কে আছে!

মুহূর্তের মধ্যেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল বুঝি রামকৃষ্ণবাবুর ভিতরে ভিতরে। তারপর নির্বাক, নিস্পন্দ, বিমূঢ় একেবারে।

কালো মুখের হাসির আলো মিলায়নি একটুও। ঈষদুচ্চ স্নিগ্ধ গলায় ডাকলেন, লছমন!

স্থানীয় সেই লোকটি এগিয়ে এলো।

মহিলা সুন্দর হিন্দীতে বললেন, বাবুজী যাবেন এখন, অন্ধকার হয়ে আসছে, সঙ্গে গিয়ে টঙ্গায় তুলে দিয়ে এসো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, হাসির তরঙ্গ কমেছে, কিন্তু সমস্ত মুখে তার কমনীয় রেশ ছড়িয়ে আছে। বললেন, ভজনের সময় হল, আমার আর বসার জো নেই—

যন্ত্রচালিতের মতো উঠলেন রামকৃষ্ণবাবুও। বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছেন তেমনি। চোখে পলক পড়ে না।

...শুভ্রা গাঙ্গুলি তিরিশ বছর আগে মুছেই গেছে।

সামনে যাঁকে দেখছেন তিনি মাতাজী।

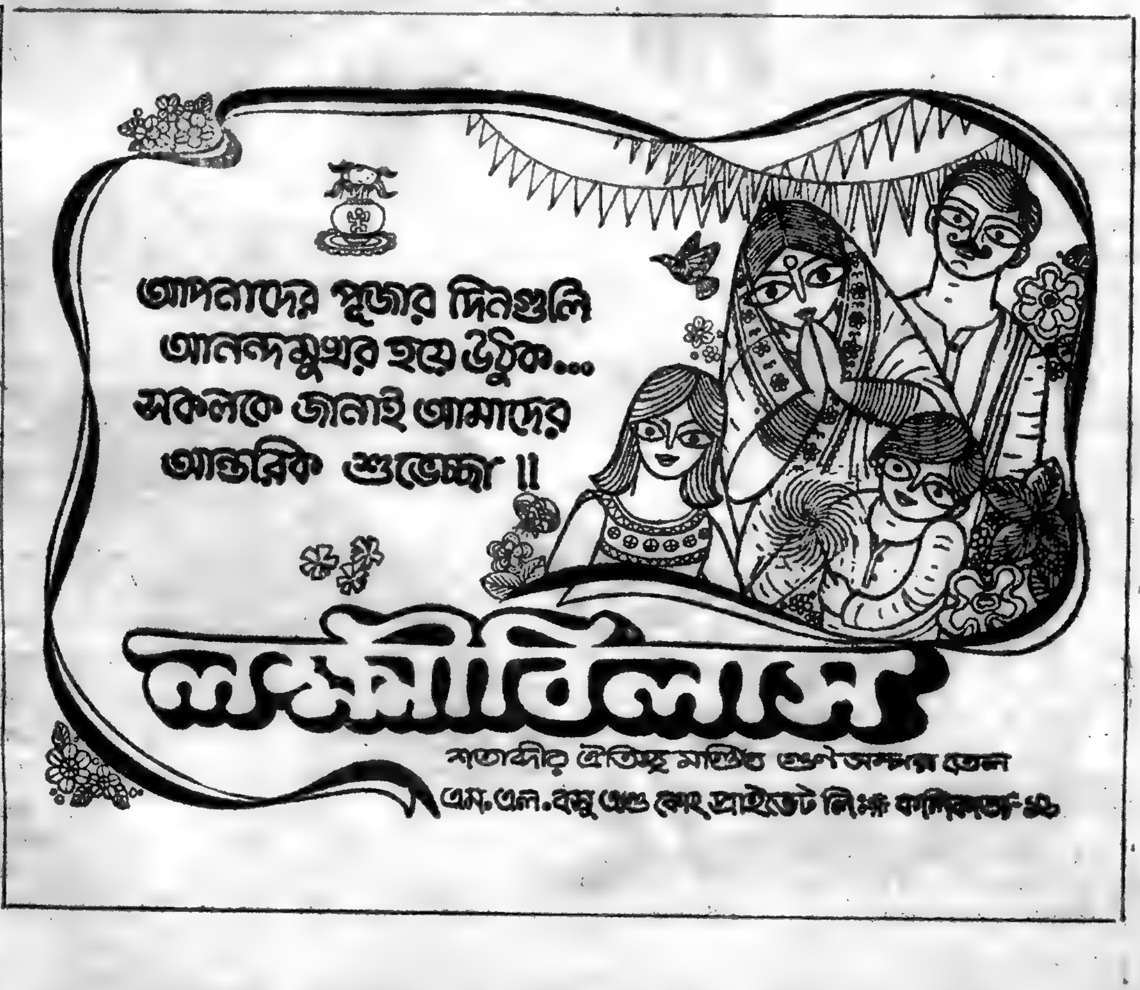

সুন্দর বিষাক্ত ফল

উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। এক ।।

—তাকে দেখলে আপনার সহজ মনে হত না। সে সহজ মেয়ে ছিল না।

এই বলে গগন তার সত্তর বছরের প্রাজ্ঞ চোখ দুটোর দৃষ্টি নদীর ওপারে রাখল। এখন সে আকাশ দ্যাখে, নাকি সবুজ পাটক্ষেত, বোঝার উপায় নেই। নদীর জল কূলে কূলে ভরা। সেই হলদে গাঢ় জলের ওপর অনেকক্ষণ থেকে একটা শঙ্খচিল ঘুরঘুর করছে। সওয়ারীবাহী ঘাটের নৌকোর ওপর দিয়ে তার ছায়া বারবার চমক দিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ দেখল, শঙ্খচিলটা ছোঁ দিয়ে ছোট্ট কী মাছ তুলল ঠোঁটে। আর ঠিক সেই সময়ই ওপারের গাছপালা থেকে একজোড়া শিকরে বাজ ছুটে আসছে। শঙ্খচিলটা উজানের বাঁক লক্ষ্য করে পালাতে থাকল। তার পালানোর মধ্যে যে অসহায় ভাবটুকু অনুমান করা যায়, প্রিয়নাথকে তা হাসাল।

গগন বলল—হাসির কথা তো বটেই। ধরিত্তি খুব সহজ মেয়ে ছিল না। ওই যে বটতলা দেখছেন, ওখানে তাকে ফেলে দিয়েছিল। শেয়াল শকুনে খায়। তারপর থেকে দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে কেউ একলা ওখানে যেতে সাহস করে না। এমন কি, এই যে আমাকে দেখছেন, আমিও না।

প্রিয়নাথ শিকরে বাজদুটোকে অনেকটা ঘুরে ফিরতে দেখছিল। সামনে ওপারে শিমুলগাছটায় হয়তো ওদের আস্তানা। মৃগাঙ্কবাবুর কথাটা এ মুহূর্তে মাথায় এসে গেল তার। গাঁয়ে ঢুকেছেন কতক্ষণ হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই। মৃগাঙ্কবাবুর পিঠে বন্দুক আছে। কথা আছে, দুজনে ওপারের বিলে পাখি মারতে যাবে। ঘাটের বটতলার নিচে বাঁশের মাচায় বসিয়ে রেখে গেছেন। গেছেন তো গেছেন।

—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? গগন দ্রুত জাল বোনা শুরু করে ফের। তার বিশাল ফ্যাকাশে থাবায় কাঠিটা ছটফট করতে থাকে। —ধরিত্তির মেয়েকে দেখেও ধরিত্তিকে বুঝতে পারলেন না? হাড়ে-হাড়ে মায়ের অভ্যেসগুলো নিয়ে জন্মেছে। বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখতে পাইনে। রাতবিরেতে নৌকো নিয়ে বেরোইও না। তাহলে অনেক খেলা দেখতে পেতুম। কুসমি মাকে পেয়েছে।

—কী নাম বললে? ধরিত্তি? প্রিয়নাথ আনমনে শুধোয়।

—হুঁ।

—তার মানে—ধরিত্রী?

—তাই হবে। বঙ্কুবাবু—আপনার মিগাংবাবুর বাবা নাকি ওই নাম দেন। আমরা জানতাম ধরা। কেউ বলত ধরি। আমার বিয়ের বছর ওরা এসেছিল বিহার থেকে।

প্রিয়নাথ একটু কৌতূহলী হয়। —বিহার থেকে?

—হ্যাঁ। জাতে চাঁইমোড়ল। ওই যে দেখছেন—ওই বাড়িগুলো, ওদেরই। শাকসব্জী ফলমূলের চাষ করে। ধরিত্তি তাদেরই একজনা ছিল। কিন্তু হলে কী হবে? রূপে কী একটা ছিল ওর। স্বামীটা ছিল থুথুড়ে বুড়ো। হাঁপানির রুগী। সে আমলে তো এমন পাকা রাস্তাঘাট ছিল না। মোটরগাড়ি তো দূরের কথা, সাইকেলও দেখা যেত না। তবে বঙ্কুবাবুর কথা আলাদা। জোতজমিওলা শিক্ষিত মানুষ। তিনিই যা সাইকেলে চেপে নক্রোশ ভেঙে শহরে যেতেন। আর ছিল ঘোড়া। তো ধরিত্তি তার স্বামী বুধরামকে টাট্টু চাপিয়ে এনেছিল। বুধরামের দূর সম্পর্কের ভাই তখন এই কালুখাঁর দিয়াড়ে এসে জুটেছে। বঙ্কুবাবুর মাটি। ধরিত্তি কী মোহিনী জানাল, দেড়বিঘে মাটি পেয়ে গেল। শুনেছি, এক পয়সাও সেলামী লাগেনি। সেলামী তো ধরিত্তির সেই কীরকম চোখজোড়া। বলে গগন চাপা হাসে।

প্রিয়নাথ বাঁদিকে ঘুরে গ্রামের দিকে তাকায়। মৃগাঙ্ক-বাবুর দেরী হচ্ছে। ঘন সবুজ আম কাঁঠাল আর শিমুল বাগানে ঘেরা সুন্দর ছবির মতো গ্রাম। অবশ্য কিছুদিন আগেই বর্ষায় পচে ভূত হয়েছে। কাদা থিক থিক করছে এখনও অনেক জায়গায়। তবে এই দেশের নরম মাটির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা প্রচণ্ড। ডাইনে মাঠে পাকা আউশ সবে তুলে নিয়েছে। কোথাও কোথাও পাট কাটা হয়ে গেছে। সাদা বকগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে সেখানে। বাবলাবনের বন-চড়ুইদের কিচিরমিচির শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। এই সকালেই রোদ বড্ড চড়া হয়ে যাচ্ছে। ঘাম ফুটছে। অবশ্য নদীর ধার এবং বটের ছায়া বলে আরামও আছে কিছু। বাতাস খুব শান্তভাবে বইছে। একটু তফাতে চার পাঁচটা চা পান বিড়ি আর খাবারের দোকান। সেখানে ভিড় নেই বিশেষ। যা জমেছিল, বাস ছেড়ে যাওয়ার পর কমে গেছে। বাসটা ফিরবে সেই দুটোয়। তিনটেয় ফের রওনা হবে। শেষ পাড়ি দিয়ে ফিরবে একেবারে রাত আটটায়। পাশেই একটা তিনদিক ঘেরা আটচালায় ওদের আপিস। সেখানে পাটের গাইট পাহাড় জমে রয়েছে।

গগন বলে—চোখ দেখে মানুষ চেনা যায়, কী বলেন? আমার মাঝে মাঝে মনে হত, ধরিত্তি মানুষ ছিল না। হ্যাঁ—তা একদিক থেকে ছিল না বলা যায় বৈকি। আপনি ডাইনী দেখেছেন কখনও?

—না তো।

—সে আমলে পাড়াগাঁয়ে ডাইনী জন্মাত। মায়ের কোলে সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দেখলে তার চোখ দিয়ে রক্ত শুষে খেত। ছেলে নীল হয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে মারা পড়ত।

—হ্যাঁ, সেসব গল্প অনেক শুনেছি।

—কিন্তু সেসব ধরিত্তি যৌবন ফুরোলে শুরু করেছিল। একবার রক্তের স্বাদ পেলে যা হয়। তার যৌবনে সে উলঙ্গ হয়ে—বিশ্বাস করুন, একেবারে উলঙ্গ হয়ে মাথায় ডালা চাপাত। তাতে থাকত ধুপচি। ধুপচিতে আগুনের আঙার। মুঠো মুঠো ধুপোগুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে রাতদুপুরে বেরিয়ে পড়ত মাঠে বা পথঘাটে। সেকালে লোকে এত ভীতু ছিল, ভাবতে পারবেন না। ওই দেখে সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটত।

প্রিয়নাথ আরও কৌতূহলী হয়। —এমন কেন করত ও?

গগন আনমনে মুখ নামিয়ে বলে—জানি না। হয়তো তন্তরমন্তরের ব্যাপার, হয়তো খাপ্পা।

—খাপ্পা কেন?

ধরিত্তি গোড়ার দিকে অন্দরে ছিল চুনী। সেবার গাঁয়ে মড়ক লেগেছে প্রচণ্ড। শীম পায়খানা আর মরণ। দাহ হয় না, গোর পায় না—সব মড়া নদীর ধারে ওইখানটায় ফেলে দেয় সবাই। রাতদুপুরে ভাবলাম, যা হবার হবে—মাছটাছ গাঁয়ে কেউ খায় না বটে, শহরে গেলে বেচা যাবে। ঘরে অনটন চলছে। জাল নিয়ে বেরোলাম। বেশ জোছনা হয়েছে। চাঁদ টগবগ করছে মাথার ওপর। ওই পথে নেমেছি, কী একটা দৌড়ে আসছে দেখলাম। পাশ দিয়ে [illegible] চেরা গলায় কীরকম ডাক ডেকে দৌড়ে গেল—উলঙ্গ, মাথায় এলো চুল, জোছনায় স্তনদুটো দুলতেও দেখলাম। আমার গা বাজল। কিন্তু রাগ হল ভীষণ। ধরিত্তিকে চিনতে পেরেছিলাম কি না। অমনি জাল ফেলে তাড়া করলাম। সে কী দৌড় ওর! মাঠে গিয়ে ধরে ফেললাম। হুঁ—ধরিত্তি!...... গগন চুপ করল। ঠোঁটের কোণায় হাসির ঝিলিক।

প্রিয়নাথ বলল—তারপর?

—আপনি ভদ্রলোক মানুষ। শুনতে খারাপ লাগবে। তারপর, কী হওয়া উচিত বুঝে নিন। তবে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল ধরিত্রি। আমি শুনিনি। আমার রাগ হয়েছিল প্রচণ্ড।

—কেন অমন করে, বলল না?

—বলল। বলল, আগের জন্মে কামাখ্যার ডাকিনী ছিল। সেই অভ্যাস। তবে কী, সাংঘাতিক মেয়ে দেখুন, কী বিশ্বাসঘাতনী! বঙ্কুবাবুর বাড়ি গেছে একদিন রাত্রিবেলা। তখন ওনারা খেয়ে শুতে যাবেন। গরমের মাস। উঠোনে বারান্দায় গল্পগুজব করছেন। আচমকা ধরিত্রি উলঙ্গ হয়ে ঢুকে ওর সেই অমানুষী ডাকটা ডাকল। অমনি সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটল। বঙ্কুবাবু সে রাতে ছিলেন না—শহরে মামলা চলছিল। উকিলবাড়ি ছিলেন। তা ধরিত্রি করল কী, যতসব এঁটো থালাবাসন ছিল রান্নাঘরের বারান্দায়, সব নিয়ে পালাল। বঙ্কুবাবু ফিরে এসে কী করেছিলেন, মনে নেই। কী বা করবেন? ওনাকে তো গোড়াতেই গিলে খেয়েছিল।

প্রিয়নাথ একটু আগে খেয়া পেরিয়ে যেতে দেখেছে সেই ধরিত্রীর মেয়ে কুসমি বা কুসুমকে। এখন সেই চেহারা দেখতে পায়। ছোটো, নিটোল গড়ন, একটু হালকাও বটে, ছিপছিপে আর মজবুত। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টানা চোখ দুটো—ঠিকই বলেছে গগন কী যেন অমানুষিক দৃষ্টির আভায় ঈষৎ ধূসর, ঈষৎ নীল। রোশিয়ার ছিল কি? প্রিয়নাথের মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, আশ্চর্য সুন্দর একটি যুবতী সে দেখেছে।

—নাই পেতে পেতে অবশেষে ধরিত্রির যা হবার হল। দুষ্টু সব চেলাও জুটিয়ে ফেলল। ওই যে শ্মশানের বটগাছটা দেখছেন, যে রাতে আমি ওর ডগায় আগুন জ্বলতে দেখেছি—তার সকালেই শুনেছি এলাকায় কারো বাড়ি ডাকাতি হয়েছে। সে অবিশ্যি ধরিত্রির পাকাচুলের বয়সের কথা। অবশেষে পুলিশের টনক নড়ল। ফাঁদ পেতে ধরিত্রীকে ধরা হল। জেল খাটল দু' বছর। ফিরল যখন, তখন থুত্থুড়ে বুড়ি, কুঁজী। তাড়া করার সময় ওর কোমর ভেঙে দিয়েছিল পুলিশ।

—ওর মেয়ে কোথায় ছিল তখন?

—মেয়ে মানাবর মোড়লের বাড়িতে ছিল। সবাই জানে, বঙ্কুবাবু ভরণপোষণ দিতেন গোপনে। ধরিত্রি ফিরলে মেয়েকে গছিয়ে দিল সে। তবে, ধরিত্রির চরম লাঞ্ছনার বাকি ছিল। বঙ্কুবাবু নেই—মারা গেছেন। কুঁড়েঘরে ধরিত্রির মড়া পচে ভূত হচ্ছে। কুসমি সবার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। জাতে ওরা চণ্ডীমোড়ল। আমাদের কেউ তো ছোঁবে না। ওদিকে ওর জাতও ওকে কবে থেকে পতিত করে বসে আছে, তারাও ছোঁবে না। তখন কী হল জানেন? ধরিত্রির পায়ে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বের করল কুসমি। বাড়ির নিচে নদী। গরমের খটখটে মাস। দিব্যি ফেলে দিতে পারত চড়ায়। পুঁতেও দিতে পারত। তা সে করল না। টানতে টানতে গাঁয়ের রাস্তা ঘুরিয়ে এখানে আনল। তারপর এখান থেকে নিয়ে গেল ওই শ্মশানে। কত লোক দেখল হাঁ করে। আমিও দেখছিলাম। ধরিত্রির মুখটা আকাশপানে—খোলা চোখ, সেই অমানুষী দৃষ্টি—আর সাদা চুলগুলো ঘষা খাচ্ছে মাটিতে, প্রায় উলঙ্গ শরীরটা—থুঃ!

থুথু ফেলে গগন হঠাৎ থামে। তারপর ভুরু কুঁচকে দূরের কিছু দেখতে দেখতে ফের বলে—আমি ধরিত্রির মড়া পোড়ানোর খরচ দিতাম। কুসমি আমাকে তো কিছু বলেনি।

প্রিয়নাথ একটু হাসে। —ও তোমাকে বাবা বলে ডেকে গেল, শুনলাম।

—এ্যাঁ? হ্যাঁ। কুসমি আমাকে বাবা বলে। এমনিতে ভারি মিষ্টি মেয়েটা। ভারি ভালো। কিন্তু হলে কী হবে? মাই ওকে খেয়েছে। মধ্যে মধ্যে ভর ওঠে। চুল নাড়া দিয়ে মাথা দুলিয়ে খেলতে বসে। কীসব আজগুবি কথা বলে।

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে। —সে কী!

—তাইতো বলছিলাম এতক্ষণ। সেই হিস্ট্রিটাই তো শোনালাম। কুসমির চোখ দুটো দেখলেন না? আমার তো ভয় হচ্ছিল, যেভাবে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল। নতুন মানুষ আপনি। ...গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ওঠে।

—ওর চলে কীভাবে?

—কেন? সেই দেড় বিঘে ক্ষেত ভিটের সঙ্গে। শাকসব্জী ফলায়। ছাগল পোষে। সপ্তায় দুদিন হাটে যায়। ভালই চলে।

—বিয়েটিয়ে করেনি?

—একবার করেছিল। ও তো জাতছাড়া—একঘরে। যাকে বিয়ে করেছিল, সে ওর জাতের নয়। শহর থেকে এনেছিল ছোকরাকে। কদিন পরেই কুসমির কাণ্ডকারখানা দেখে—নাকি কেউ বলে, বেধড়ক পিটুনি খেয়েই পালায়। আর আসেনি। ও ডাকিনী বাবুমশাই, কামরূপ কামাখ্যা ছাড়া ওর যোগ্য জুড়ি নাই। ......গগন জোরে হেসে ওঠে ফের।

প্রিয়নাথ কুসমি বা কুসুমকে স্মরণ করে। কোথায় গেল খেয়া চেপে?

এতক্ষণে মৃগাঙ্ককে দেখা গেল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাকা সড়কে উঠল। তার পাশে পাশে একটা কালো সিড়িঙ্গে মতো লোক আসছে। তার দুহাতে দুটো মোরগ। সে মৃগাঙ্ককে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মৃগাঙ্ক নির্বিকার আসছে।

কাছে এসে মৃগাঙ্ক বলল—প্রিয়বাবু, মোরগ খাবেন নাকি?

—মোরগ? প্রিয়নাথ একটু হাসল। ...কেন? বেরোবেন না তাহলে?

—নিশ্চয় বেরোব। মানে বেরিয়ে তো পড়েইছি। তবে এই মোরগ দুটোও কান্টিডিতে রেখে দেওয়া যায়। খালি হাতে ফিরলে কাজ দেবে। রাখব?

—আপনার ইচ্ছা। কত দাম বলছে?

—দশ টাকা।

প্রিয়নাথ অবাক হল। অতবড় দুটো মোরগ মাত্র দশ টাকায়! অথচ মৃগাঙ্ক যেন দরাদরি করতে চায়।

মোরগওলা প্রিয়নাথের দিকে ঘুরল। —রেখে দিন স্যার, খুব ভালো জাত। এত সস্তায় আর হয় না। নেহাৎ অভাবে বেচে দিচ্ছি। শহরে নিয়ে যেতে পারলে ডবল দাম হত।

মৃগাঙ্ক বলল—হত। কিন্তু খরচাটা হিসেব করেছিস তো? চাকের দায়ে মনসা বিক্রির সামিল। যা, আমার খামারে নিয়ে গিয়ে রেখে আয়। নবীনকে বলবি, বেঁধে রাখবে।

লোকটা বলল—যাচ্ছি বাবু। টাকাটা?

মৃগাঙ্ক খচে গেল। —টাকা তোর জন্যে পকেটে নিয়ে বেরিয়েছি ব্যাটা! ওবেলা গিয়ে নিয়ে আসিস। উঠুন প্রিয়বাবু।

লোকটা কাচুমাচু মুখে বলল—বাবু, টাকাটা এখন পেলে ভালো হত। আপনার দিব্যি, বিশ্বাস করুন—একটা নয়াপয়সাও নাই ঘরে। চালডাল কিনতে হবে। রাতউপোস দিনউপোস চলছে।

মৃগাঙ্ক আরও বিরক্ত হয়ে বলল—তোদের অভাব ঘোচা এ জীবনে আর ঘুচবে না। ...তারপর ওপাশে চায়ের দোকানটার দিকে ঘুরে কাকে চেঁচিয়ে বলল—এই ফটিক! একে দশটা টাকা দে তো বাবা। যা—ওর কাছে নিগে। আর সোজা খামারবাড়ি চলে যা। নবীনকে বলবি রেঁধে রাখতে।

লোকটা চলে গেল। প্রিয়নাথ মাচা থেকে নেমে বলল, আপনার নিজের একটা নৌকো থাকা উচিত ছিল মৃগাঙ্কবাবু।

—বাবার ছিল একটা পানসী। আমার দরকার হয় না। ...বলে মৃগাঙ্ক হেসে উঠল। ...আমি মশাই পিঁপড়ে মানুষ। আরও দশ বিশটে হাত পা থাকলে বেঁচে যেতুম। আরে, হালদারমশাই যে! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি!

গগন নমস্কার করে বলল—বিলপারে চললেন বুঝি? যান—খুব হাঁস নামছে শুনলাম। নতুন বাবুকে দেখিয়ে আনুন আপনার রাজত্ব।

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ ও গগনকে দিল। নিজে ধরাল। তারপর বলল, হুঁ—কী বলছিলে যেন হালদারমশাই! রাজত্ব না কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজত্ব।

—বলেছ বেশ! তবে রাজত্ব রাখা বোধ করি আর সম্ভব হচ্ছে না হে হালদারমশাই। বাইশ বিঘে পাট ছিল ওপারে। প্রায় অর্ধেকটা ইতিমধ্যে চোরে সাবাড় করেছে। আউশও বিশেষ তুলতে পারিনি। ডগাশুদ্ধ নিকেশ করেছিল। হঠাৎ এত চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না।

গগন মাথা দুলিয়ে রহস্যময় হাসল।—বছর বিশেক আগে এ-তল্লাটে এইরকম হঠাৎ চুরিডাকাতি বেড়ে গিয়ে ছিল। আপনার বাবা তখন বেঁচে। আপনি তখন পেণ্টুলপরা ছেলে। মনে নিশ্চয় নাই। তবে কথা হল এই যে, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে, তাঁর মতো মানুষেও টের পাননি। নাকি—সব জেনেও চুপচাপ ছিলেন।

ধুরন্ধর মৃগাঙ্ক হাসল।—ধরিত্রীঠাকরানের কথা বলছ হালদারমশাই?

—হুঁ। এতক্ষণ নতুনবাবুকে সেই গল্পই বলছিলাম। ধরিত্রি খুব সহজ মেয়ে ছিল না—তাই বলছিলাম।

খেয়ানৌকোটা ঘাটে এসে লেগেছে। কয়েক বোঝা খড় নিয়ে জনা দুই 'মেসেড়া' বা ঘাসকাটা লোক নামল। তিনটি মেয়ে একবোঝা করে পাটকাঠি মাথায় নিয়ে সাবধানে নেমে এল। মৃগাঙ্ক তাদের সবার দিকে সন্দেহাকুল চোখে তাকাচ্ছিল। ওরা চলে গেলে সে বলল, হালদারমশাই, মেয়েগুলো কোন পাড়ার চেনো নাকি?

গগন সেদিকে তাকিয়ে বলল — চোখদুটোর মাথা খেয়েছি। পাটকাঠি নিয়ে গেল—ওদের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কুনাইপাড়ার হবে। একবোঝা তো কেতে রাখবার জো নাই ওদের জ্বালায়। দিনে দিনে মানুষের অভাব যা বাড়ছে—এর পর দেখবেন নিজের ঠ্যাংদুটো কেটেই খেয়ে থাচ্ছে।

খেটেল ডাকছিল।—বাবু, পার যাবেন নাকি?

—যাব। আসুন প্রিয়বাবু। বলে মৃগাঙ্ক পা বাড়াল।

কূলে কূলে ভরা ভৈরব। তবে স্রোতের টান অনেকটা বেড়ে গেছে। ওপারে ডাইনে অনেকটা ধস ছেড়েছে। নৌকোয় উঠে প্রিয়নাথ বলল—গগনকে হালদারমশাই বলেন নাকি?

—হ্যাঁ। ওকে এখন সবাই তাই বলে। কেন শুনবেন? দুই ছেলেকে বি-এ পাশ করিয়েছে। ভাবতে পারেন—জেলের ছেলে! বড় মহেন্দ্র এখন দুর্গাপুরে প্ল্যাণ্টে চাকরী করে। ছোট সত্যেন্দ্র ভগীরথপুর হাই স্কুলের টিচার। অবশ্য সবই বাবার উদ্যোগে হয়েছে বলতে পারেন। ওই স্কুলটা ঠাকুর্দা করে যান। তারপর দুই পুরুষ ধরে আমরা ছেলেধরা হয়ে লড়ে গেছি!

প্রিয়নাথ বলল—সেসব শুনেছি।

—কে বলল? গগন?

—না। অন্য লোকের কাছে। গগন আমাকে একটা অদ্ভুত গল্প শোনাচ্ছিল।

ধরিত্রীঠাকরানের গল্প?

—হ্যাঁ। খুব অদ্ভুত লাগল।

মৃগাঙ্ক সিগ্রেটটা স্রোতে ফেলে দিয়ে বলল—গগন খানিকটা বাড়াবাড়ি নিশ্চয় করেছে। ও তাই করে। ওসব তন্ত্রমন্ত্র ডাইন-টাইনেতে আমার কোনকালেই বিশ্বাস নেই, মশায়। ভাবতে পারেন—একটা মেয়ে স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে এলাকার লোককে ভয়ে চুপ করিয়ে রাখল সারাজীবন? এখনও তার জের মেটেনি। এখনও শুনবেন, ধরিত্রীর ভূতটা সমানে জ্বালাচ্ছে। সেদিন বাবুক মণ্ডলের বউকে ভূতে ধরেছিল। ধরিত্রীর নাম বলেছে নাকি! মৃগাঙ্ক হো-হো করে হেসে উঠল।

—ধরিত্রীর তো মেয়ে রয়েছে। কুসুম না কী যেন নাম।

—হ্যাঁ? হ্যাঁ—কুসমি।

—একটু আগে ওপারে গেল দেখলাম, এই নৌকোয়।

মৃগাঙ্ক চমকে উঠল যেন।—তাই বুঝি?

—গগন বলল। তা না হলে আমার চেনার কথা নয়। মেয়েটি গগনকে বাবা বলল শুনলাম।

—ধরিত্রীর সঙ্গে নাকি গগনের খানিকটা সম্পর্ক ছিল। পুলিশ এক সময় গগনকে যখন-তখন ধরে নিয়ে যেত। বাবা না থাকলে গগনেরও জেল হত।

কার্তিকের সকালে নদী আর ওপারের গাছপালা জীবনের কী একটা সহজ ব্যাপার নিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে—প্রিয়নাথের এরকম লাগে। দূরে বাঁকের দিকে যাবলা বনে তখনও মনে হচ্ছে কুয়াশার আলোয়ান রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কোথাও ঘুঘু ডাকছিল। প্রিয়নাথের মগজে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকল সেই ডাকটা। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

—কী ভাবছেন? মৃগাঙ্ক ডাকে।

প্রিয়নাথ তাকায়।

—খারাপ লাগছে না তো?

—কী?

—আমাদের লাইফটা এখনও বেশ প্রিমিটিভ। চাষবাস জলজঙ্গল নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে উত্তর ঠেলে চলে যাই পদ্মার দিকে। চরে কাটিয়ে আসি। আপনাকেও নিয়ে যাব'খন। দেখবেন।

মাঝারি গড়নের নদী। কিন্তু স্রোতের টান থাকায় বেশ খানিকটা ভাটিয়ে যায় খেয়ানৌকোটা। তারপর লগির খোঁচা মেরে ধারে-ধারে উজোন বেয়ে ঘাটে পৌঁছয়। সাদা দুধের সরের মতো মাটি। কাদা হয় না। প্রথমে লাফ দিয়ে নামে মৃগাঙ্ক। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয়—আসুন।

প্রিয়নাথ তার হাত ধরে পাড়ে নামে। ঘেটেল বলে—বাবুদাদা, সিগারেট দিয়ে যান।

মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট দিতে থাকে ওকে। তৎক্ষণে প্রিয়নাথ সোজা গিয়ে বাঁধে ওঠে। বাঁধ থেকে এক বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপ নজরে পড়ছিল। কোথাও কোথাও কাচের টুকরোর মতো জলা, বাদবাকী সবুজ—কোথাও কিছু হলুদ নিবিড়তা। পাটক্ষেতের ওপর কুয়াশা লেপটে আছে। কোথাও কিছু মানুষ। ওই বিশাল রহস্যময় দুর্গম পৃথিবীতে তাদের তুচ্ছ লাগছিল।

—চলুন। মৃগাঙ্ক এসে যায়। তারপর দক্ষিণ দিকে বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে দুজনে—মৃগাঙ্ক আগে, পেছনে প্রিয়নাথ।

বাঁধের ওপাশে গভীর নয়ানজুলি। কালো প্যাটপচা জলের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে। পাটের জাগ দেওয়া হয়েছে সেখানে। ওপরে কচুরিপানা আর ঘাসের চাবড়া। একটা-দুটো বাঁশের খুঁটিতে মালিকানার চিহ্ন। আবার খানিকটা ফাঁকা—সেখানে প্রচণ্ড কালো জল। কী সব পোকামাকড় ভনভন করে উড়ছে। নয়ানজুলির পাড়ে রাশীকৃত সাদা পাটকাঠির স্তূপ। চলতে চলতে মৃগাঙ্ক বলে—একবার চাঁদনী রাতে এখানটায় ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ভুট্টা লাগানো ছিল শত বিঘে জমিতে। শুওরের উপদ্রব হত। অগত্যা একটা মাচা বেঁধে ওপরে ছাউনি দিয়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম। একা। সারাটা রাত দড়ি টেনে টিনে টন টন আওয়াজ করা ছিল কাজ। তখনও বন্দুক পাই নি। তো এক রাতে নদী পেরিয়ে এখানটা আসতেই আমি হতভম্ব। মুসলমানদের মড়া কবরে দেওয়ার আগে দল বেঁধে নামাজ পড়তে দেখছেন? হঠাৎ দেখি, চাঁদনী রাতে ওই জমিটায় হাজার হাজার লোক মাটিতে মাথা গুঁজে নমাজ পড়ছে। কোন শব্দ নেই। আর—ওরা মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে তো আছেই। বয়স ছিল কম। মনে হল, এই লোকগুলো মাথা তুলে আমাকে দেখতে পেলেই একটা কিছু করবে যেন। অলৌকিক ভয়। মৃগাঙ্ক খিক-খিক করে হাসল।

—তারপর? প্রিয়নাথ অন্যমনে শুধোয়।

—তারপর টের পেলাম সাদা সাদা জিনিসগুলো পাটকাঠি। এমনি করে কতবার কত কিছু দেখে-টেখে শিখে ছিলাম—আসলে অলৌকিক বলতে তেমন কিছু পৃথিবীতে নেই। সবই লৌকিক।

—হ্যালুসিনেসান! প্রিয়নাথ মন্তব্য করে।

—একজ্যাকটলি! হ্যালুসিনেসান। এই জঙ্গলে মাঠ ভর বিলে কত রাতে যে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেছি, ভাবতে পারবেন না। কত সব অদ্ভুত আলো—হাউই। এমন কি নানা রকম আজগুবি আওয়াজ। একবার কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল। ডেকে-ডেকে এক সময় থেমে গেল। একবার একটা লোককে পাটকাটা চোর ভেবে সারা মাঠ পিছনে দৌড়লাম। বিলের জলে গিয়ে সে ডুবে গেল।

—ডুবে গেল? সে কী!

—তাছাড়া কী বলব? স্বপ্নে আপনি যা দেখেন, তা বর্ণনা করতে পারেন? মানুষের ভাষা একটা নেহাৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর বন্দোবস্ত। সব ব্যাপার প্রকাশ করা যায় না। মানুষ নিজের হাতে যা সব বানিয়েছে, তার প্রায় সবটাই সে বর্ণনা করতে পারে। যা বানায়নি, তা পারে না। আপনি ক্লেয়ারভয়েন্স মানেন?

—ভেবে দেখিনি।

—আমাদের একটা কুকুর ছিল। সে বাড়ির বাইরে পাঁচক্রোশ আন্দাজে কেউ এলেও টের পেত। যাক, সে একসময় হবে। তবে একবার সত্যি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম, বুঝলেন?

—ভূত নাকি? প্রিয়নাথ একটু হাসে।

—না। ধরিত্রী। ওইখানটায় একটা খাল আছে। সে ডুব দিচ্ছিল আর কী তুলে খাচ্ছিল তলার পাঁক থেকে। পাটবনের ভিতরে লুকিয়ে দেখছিলাম। আমার বয়স তখন এগারো-বারো। মনে হচ্ছিল, ওর কথায় রক্ত দেখতে পাচ্ছি। একটু পরে সে পুরো উলঙ্গ অবস্থায় উঠে এল জল থেকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

—কী খাচ্ছিল?

—সেটাই তো বুঝতে পারিনি। এখনও ধাঁ ধাঁ লাগে ব্যাপারটা। আসুন, এখানে নামতে হবে আমাদের।

বাঁধটা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে ঘুরেছে। নদীর সমান্তরাল। নদী ও বাঁধের মধ্যে বড় বড় গাছপালা আছে। মাঠের দিকে নেমে আলপথে ওরা হাঁটতে থাকে। বুক সমান উঁচু তেজী ধারাল পাতা চিতিয়ে আখক্ষেতগুলো যোদ্ধাদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও শূন্য আউষের ক্ষেত হলুদ ভিজে নাড়ার ওপর বক চরছে। শামুকগুলো রোদ পোহাচ্ছে। একটা খেঁকশিয়াল কী খাচ্ছিল। দেখামাত্র পাটবনে গিয়ে ঢুকল। ওরাও এবার পাটবন পেরোতে থাকে। সরু আল হবধব করছে—তার বুকে ছায়ার কাটাকুটি নকশা। কেন্নোইনগুলো বিছে পেতে কেউ, কেউ গুটিসুটি হচ্ছে। পাট প্রায় সাত ফুট উঁচু। কালো কালো ফল ধরেছে ইতিমধ্যে—কিছু ফল এখনও সবুজ। ততক্ষণ কোন কথা হয় না। শিশিরে জামা ভিজে যায় দুজনেরই।

ফাঁকায় পৌঁছে মৃগাঙ্ক বলে, ওই ঢিবিমতো জায়গাটা দেখছেন—ওটার পিছনে একটা জলা আছে। দু-চারটে হাঁস প্রায়ই দলছুট হয়ে বিল থেকে চলে আসে ওখানে। দেখা যাক। আর সিগ্রেট খাবেন নাকি? এরপর কিন্তু কিছুক্ষণ এমার্জেন্সি মশাই—নো স্মোক।

—দিন। আমারও আছে অবশ্য।

—থাক। নিন। মৃগাঙ্ক সিগ্রেট দেয়। লাইটার বের করে জ্বালে। প্রিয়নাথেরটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—বলেছিলাম গামবুট নিন। কথা শুনলেন না।

—আপনি তো নেন নি।

—অভ্যেস। এই বুনো মাটিতে অনেক হেঁটেছি খালি পায়ে। তবে মশাই—কিছু যদি মনে না করেন, জুতো দুটো আপনার জিম্মায় রেখে আমি কাজে নামব।

—ঠিক আছে।

—নাকি আপনিও একটু আধটু থ্রিল নিতে চান? ছোটাছুটি করবেন?

—মন্দ কী! ভালো লাগবে।

—গ্র্যান্ড! তাহলে প্যান্ট গুটিয়ে ফেলুন। জামা খুলুন। দেখুন—আমি যা যা সব করি। গায়ে কাদা লাগতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে হেঁটে এগোতে হয় অনেকসময়। আর একটা কথা বলে দিই। খুব দেখেশুনে হাঁটবেন। সাপটাপ দেখা দিতে পারে। ঘাবড়াবেন না। পাথরের টুকরো ভাববেন নিজেকে—গায়ের ওপর বেতে দেবেন, যদি বেতে চায়।

প্রিয়নাথ একটু শিউরে উঠল। তবু ভাল লাগার টানে আমল দিল না সেই ত্রাসটুকু। শুধু বলল—একটা লাঠিকাঠি হাতে নেওয়া যায় না?

—নিশ্চয় যায়। অবশ্যই। থামুন—একটা ডাল কেটে আনছি।

কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছুরি বের করে এগোল মৃগাঙ্ক। ফাঁকা ঘাসের জমির ওপর ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ চিনতে পারে গাছগুলো। বেত, নাটাফল, কুঁচ এইসব কাঁটা ঝোপ। তাদের ফাঁকে একটা ছড়ানো ভাঁদুলে গাছ সবে মাথা তুলছে। মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে একটা মোটা সরল ডাল নুইয়ে ধরে। ছুরির কোপ বসায়। তারপর নিয়ে আসে। পাতাগুলো কেটে ফেলে। বেশ একটা লাঠি হয়ে ওঠে। এগিয়ে দিয়ে বলে—নিন।

তারপর দুজনে প্যান্ট গোটায়। জামা খুলে ফেলে। বন্দুকটা মাটিতে পড়ে থাকে। বসন্ত বাঘের পিঠ দেখলে ওইরকম টানটান লাগে। প্রিয়নাথের হাত নিসপিস করে। কিন্তু হঠাৎ কেমন

শূন্যতা তার মাথার খুলির মধ্যে টের পায়। দু চোখে কুয়াসা আর খাপচা-খাপচা সবুজ রং ভাসে।

কয়েকটা কার্তুজ পকেটে ভরে খোলা জামাকাপড় জুতো মৃগাঙ্ক নিয়ে যায় সেই ঝোপে। রেখে এসে বলে—চলুন। নেমে পড়া যাক।

প্রিয়নাথ একটু সংশয়ী হয়ে বলে—কেউ নিয়ে পালাবে না তো?

—না। চলুন। এদিকে বড় একটা আসে না কেউ।

ফের একটা পাটবন পেরিয়ে ঢিবির কাছে পৌঁছয় ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—সচরাচর আমি উড়িয়ে দিয়ে গুলি করি। তাতে রিস্ক কম। জলাটা যা জঙ্গুলে। ঠিকমতো বাগে পাওয়া যায় না— এম করা কঠিন। আপনি কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন মশাই। শিকার কুড়োনোরও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

ঢিবিটা কাঁটাঝোপে ভর্তি। কাশ-ঝোপও রয়েছে। ফুলে-ফুলে ভরা। বাঘ-নখার গাছ আছে কিছু। আকন্দঝাড় ধরে অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ ওঠে মৃগাঙ্কের পেছনে। এখনও শিশির শুকোয়নি। ঘাসের ফুলে দু জোড়া রোমশ পা ভরে যায়। পোকা কুটকুট করে। আর অনবরত মাকড়সার ভিজে জাল মুখে বুকে জড়িয়ে যায়। কোন জালে শিশিরের ফোঁটা টলটল করে। অস্বস্তি কিংবা কিসে গা ঘিনঘিন করে প্রিয়নাথের। ঢিবিটা যেখানে শেষ হয়েছে, নিচে একটা জলার শুরু। নানা-রকম দামে তার জল ঢাকা। দামের ওপর শ্যাওলার ঝাড় গজিয়েছে। প্রিয়নাথ কিছু দেখতে পায় না। মৃগাঙ্ক তার ঘাড়ে হাত রেখে বসতে ইসারা করে। তারপর উপুড় হয়ে ঘাসের মধ্যে সে সাপের মতো এগোতে থাক। বন্দুকটা ঘাসে ডুবে থাকে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে। কিছু দেখতে পায় না সে। একটা দলপিপি পিঁ পিঁ করে উড়ে যায় হঠাৎ। অনেকটা দূরে একটা হিজলের গাছে থরে-বিথরে সাদা বকের ঝাঁক দেখতে পায়। মুহূর্তের অন্য-মনস্কতায় প্রিয়নাথ কুসুমের কথা ভাবে। চেহারা ও শরীরটা ভোলা যায় না। কী যেন আছে। ওই চোখে, ওই শরীরে—পৃথিবীর খুব পুরনো ব্যাপার।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হয়। আচমকা এই শান্ত নির্জন নিসর্গ খানখান হয়ে পড়ে। বারুদের গন্ধে বাতাস কটু হয়। আঁক আঁক চিৎকার আর ডানার শব্দ খুব কাছেই মাথার ওপর শুনে প্রিয়নাথ মুখ তোলে। ফের বন্দুকের শব্দ হয়। একটা ঝড় বইতে থাকে যেন। দূরের হিজলগাছ থেকে বকগুলো উড়ে পালায়। দল-পিপির ডাক শোনা যায়। কোথায় হটিটি পাখি চেঁচিয়ে ওঠে—টি টি টি...... টি টি টি। মৃগাঙ্কের গর্জন শোনা যায়—প্রিয়বাবু। দেখুন—দেখুন। লক্ষ রাখুন।

কিছু না ভেবেই প্রিয়নাথ ওঠে। একটা হাঁস বাঁদিকে পাটক্ষেতের ধারে পড়ে ডানা ঝটপট করছে। আরেকটা পাটক্ষেতের ওপারে কোথায় হঠাৎ নেমে গেল। সে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে ঢিবি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়তে থাকে। সামনের হাঁসটা ধরে ফেলে। তার ঠোঁটের ফাঁকে রক্ত। হাঁসটা নিয়ে সে মৃগাঙ্কের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক ইশারা করে —ওদিকে ওদিকে।

হ্যাঁ—সেই হাঁসটা। প্রিয়নাথ পাটবনে ঢুকে পড়ে। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়বার চেষ্টা করে। বনচড়ুইয়ের ঝাঁক ফরফর করে উড়ে পালায় মাথার ওপর। এক হাতে হাঁস, অন্য হাতে সবুজ পাটগাছ ঠেলে-ঠেলে সে হাঁটে।

কিন্তু পাটবনটা শেষ হতে চায় না। কতদূর, কতদূর। একটা বেজি দৌড়ে পালাল। একটা চ্যামনা সাপ সরসর করে চলে গেল বাঁদিকে। দম আটকে আসছিল প্রিয়নাথের। সামনে একটা শেয়াল নীল জ্বলজ্বলে চোখে তাকে একটুখানি দেখেই সরে গেল। অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল সে। ভুল করে ঘুরে মরছে না তো? সে বাঁদিকে ঘুরল।

একটু পরেই ফাঁকা একটা জমিতে গিয়ে পড়ে সে। প্রায় এক একর জায়গার পাট কেটে নেওয়া হয়েছে। একদিকে বাবলা-বন, বাকি তিনদিকে পাটক্ষেত। বাবলা-বনের দিকেই আন্দাজে এগোয় প্রিয়নাথ। হাঁসটা খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। অসম্ভব। এখন সেই ঢিবিতে ফিরে যাওয়াই এক সমস্যা। নরম মাটিতে নিজের পায়ের দাগ লক্ষ্য করে ফেরা যায়। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে ফের পাটবনে ঢুকতে। দম আটকে এবার মরেই যাবে।

বাবলাবনের কাছে এসে সে ভাবল, চেঁচিয়ে মৃগাঙ্ককে ডাকবে। মৃগাঙ্ক এসে তাকে নিয়ে যাক। এ এক বিশ্রী ব্যাপার হল দেখা যাচ্ছে। নাঃ, আর শিকার দেখতে আসবে না সে।

প্রিয়নাথ বুক ভরে দম নিয়ে ডাকতে গিয়েই থেমে যায়। তার হৃৎপিণ্ডে রক্ত আচমকা ছলাৎ করে ওঠে। ডানদিকে পাটবনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীর মেয়ে কুসুম। তার একহাতে একটা কাটারি, অন্য হাতে সেই হাঁসটা। সে প্রিয়নাথকে দেখছে নিঃশব্দে।

এমন নিষ্পলক চোখ প্রিয়নাথ কখনও দেখেনি।

আর সম্পূর্ণ চবচবে ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম। খুব পাতলা স্বচ্ছ কাপড় চামড়া বা মাংসের ভাঁজসমেত শরীরকে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে যেন। হ্যাঁ—ব্রেশিয়ার বা জামা কিছুই গায়ে নেই ওর। দুটো স্তন—ঈষৎ ঝুলে পড়া, স্পষ্ট এবং লজ্জাশূন্য। ওর দুই ঊরু অকপট, সন্ধিস্থলে রক্তাক্ত শুসর হাঁসটা ঝুলছে, যার ফলে প্রিয়-নাথের মনে হয় কিছু আরু রক্ষা পেয়েছে। বাহু দুটো রসাল ফুটির মতো। প্রিয়নাথ বাঘ হতে পারলেও এই আদিম বনভূমিতে কিছু কর্তত্ব কিনা বলা যায় না। ফের যখন চোখে চোখ পড়ল, প্রিয়নাথ নিজের খুলির মধ্যে একটা নীল বিদ্যুৎ ঝলসাতে দেখল। চোখের সামনে ছোপ ছোপ সবুজ রঙের ওপর কী রকম কালো কালো ধ্যাবড়া দাগ পড়ল। এবং হঠাৎ বালকের মতো ভয় পেল প্রিয়নাথ।

সে ঘুরল অন্যদিকে। সারা শরীর ঠাণ্ডা আর ভারী মনে হচ্ছিল তার। সেই সময় কানে এল—বাবু, হাঁসটা নেবেন?

প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে গেল।

—ইচ্ছে হলে নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—তাহলে ধরলে কেন?

কুসুম হাসল একটু।—সামনে পড়ল, তাই ধরলাম। মৃগাঙ্কবাবুর হাঁস আমার হজম হবে না। নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ইতস্তত করে বলে—থাক। ধরেছ যখন, তুমিই নাও।

—বাবু, আপনার কপালটা দেখি!

হঠাৎ তাকে কাছে আসতে দেখে প্রিয়নাথ অবাক হয়। সে বলে—কী আছে কপালে?

কুসুম ভুরু কুঁচকে ওর দিকে এমন-ভাবে তাকায় যে প্রিয়নাথের অস্বস্তি লাগে। কুসুম ঠোঁটের কোণে হেসে বলে —আপনার নাম কী শুনি?

—কেন? নাম নিয়ে কী হবে?

—আহা, বলুন না।

—প্রিয়নাথ।

—প্রিয়নাথ?

—হ্যাঁ।

—বললে রাগ করবেন না তো?

—না। কী বলবে?

—আপনার জন্মের সময়টা খুব অপয়া ছিল। (আঙুল তুলে) ঠিক ওই খানটায় চাঁদ ছিল। ঈশান কোণায় একটা প্যাঁচা ডেকেছিল, বায়ু কোণায় একটা শেয়াল ডেকেছিল। আপনার মায়ের

যন্ত্রণা উঠলে সাপে ব্যাঙ ধরেছিল। টিকটিকির লেজ খসে পড়েছিল। আর শুকনো ডালে কাঁমখোর ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান করছিল। আর শুনবেন বাবু?

প্রিয়নাথ হাসি চেপে বলে—হুঁউ। আর কী হয়েছিল?

কুসুম মাথা দোলায়।—এখন সব বলা যাবে না। আমার আস্তানায় যাবেন—সব বলব।

—বেশ, তাই যাব। পয়সা লাগবে নাকি?

—আপনি নতুন মানুষ, লাগবে না।

—ভালো। যাব।

—বাবু, আপনি এদেশে কেন এলেন?

—আসা ঠিক হয়নি বুঝি?

—না। আপনি এসেছেন বলে দেশে আকাল লাগবে। ঈশান কোণায় পেঁচা ডাকবে—বায়ু কোণায় শেয়াল। টিকটিকির লেজ খসে পড়বে। সাপে ব্যাঙ ধরবে। কাঁমখোর ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে কথা বলবে। বাবু, আপনি অপয়া।

হাসতে গিয়ে সামলে নেয় প্রিয়নাথ। গম্ভীর হয়। বলে—তুমি সব দেখতে পাও বুঝি?

—হ্যাঁ, পাই। বাবু, আমার চোখের দিকে তাকান।

প্রিয়নাথ তাকানোর চেষ্টা করে।

—কী দেখছেন?

—দুটো চোখ।

—আরেকটা চোখ দেখতে পাচ্ছেন না?

—ড্যাট! প্রিয়নাথ বিরক্ত হয় এবার।

—আপনার মধ্যে আঁধার জমে আছে বাবু। যাবেন আমার ঘরে, দেখিয়ে দেব। আমি ওই চোখ দিয়ে সব দেখতে পাই। আপনার পিছনে—

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে।

—আপনার পিছনে ছায়া চলছে বাবু, সাবধান। ওই ছায়া আপনাকে সাপ হয়ে দংশাবে।

প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বেশ মজার ব্যাপার করা গেল এতক্ষণ। মৃগাঙ্ক অপেক্ষা করছে। হয়তো ভাবছে তার জন্যে।

—বাবু, আপনি কেন এসেছেন এদেশে?

—আমার ইচ্ছে। বলে প্রিয়নাথ হাঁটতে থাকে ফাঁকা জমিতে।

—আপনার ইচ্ছে মিটবে না, ফিরে যান।

—আচ্ছা। যাব।

—মৃগাংকবাবু সহজ মানুষ নয় বাবু, সাবধান।

প্রিয়নাথ ফের চমকে উঠে পিছন ফেরে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে তার। মাথার ভেতরে নীল আগুনের হল্কা ছুটে যায়। কিন্তু কুসুম অদৃশ্য। একেবারে মুছে গেছে সে।

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ। ভারি আশ্চর্য তো! কাছাকাছি কোন ঝোপঝাড় নেই। দশ-বারো হাত দূরে পাটক্ষেত। ওখানেই ঢুকেছে সম্ভবত। সে পাটক্ষেতটার ডগা লক্ষ্য করতে থাকে। কেউ চললে ডগা দুলবেই। পাখির ঝাঁক উড়বে। কিন্তু না—তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রিয়নাথ টের পেল, সে প্রচণ্ড ঘেমেছে। এতক্ষণ কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল হয়তো। তার মনে হয়, হাতের এই গুলিবিদ্ধ হাঁসটার মতো তার শরীরও অন্য কার বিশাল হাতে দুলছে। একটা সবুজ ব্যাপকতা তাঁর চেতনায় জরজর হয়ে তাকে ঘিরেছে এবং কোটি কোটি চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। প্রিয়নাথ নিজেকে বোঝাল, এত অকারণ নর্ভাস হয়ে পড়ার কী আছে! বস্তুত এও কতকটা মৃগাঙ্কবাবুর মতো হ্যালুসিনেশন ছাড়া কিছু নয়। সে পিশাচী ডাইনী ইত্যাদির গল্প অনেক শুনেছে এখানে এসে। পিশাচীরা আবার বউ সেজে থাকে এবং মড়া কচমচিয়ে খায়। ভাগ্যিস কুসুম হাঁসটা কচমচ করে চিবুচ্ছিল না।

—প্রিয়বাবু!

প্রিয়নাথ দ্রুত ঘোরে। মৃগাঙ্ক বন্দুক হাতে পাটবন ঠেলে বেরিয়ে এল।

—পেলেন?

—না।

—ওদিকে কী দেখছিলেন এতক্ষণ?

—আপনাদের কুসুমকে।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে তাকায়।

—কুসুম? এখানে কী করছিল মাগী?

—হাঁসটা ধরে ফেলেছে। আর ...

মৃগাঙ্ক পা বাড়িয়ে বলল—হাঁসটা ধরেছে? ছুঁড়ীর সাহস তো কম নয়। কেড়ে নিলেন না কেন?

প্রিয়নাথ পাংশুমুখে হাসল।—কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছিল। কোন মানে হয় না। শেয়াল প্যাঁচা সাপ ব্যাঙ ডাকিনী—আরও কী সব।

—আপনিও যেমন! ওতেই তাক লাগিয়ে কেটে পড়ল? আসুন তো দেখি?

মৃগাঙ্ক যেভাবে পা বাড়ায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ তাকে অনুসরণ করে। মৃগাঙ্ক ফের বলে—কোনদিকে গেল?

—দেখিনি? এই যে, এখানে দাঁড়িয়েছিল। তারপর পিছন ফিরে চলে আসছিলাম—তখন ডাকল।

ঘাসগুলো জলে চকচক করছে এখানে। কেউ একটু আগে দাঁড়িয়েছিল, তার ছাপ আছে। ঘাসগুলো শুয়ে পড়েছিল—সবে সোজা হতে শুরু করেছে। একটা শীষালো ঘাস ডগাক করে সোজা হতেই প্রিয়নাথ শিউরে উঠল।

ঝুঁকে পড়ে কুসুমের গতিপথ খুঁজছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টে মৃগাঙ্ক। মনে হচ্ছে যেন বাঘটাঘের ব্যাপার। তার মুখটা লাল টকটক করছে। আর কার্তিকের রোদ এবার খর হয়েছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। প্রিয়নাথ বলে—খুব আশ্চর্য লাগল। চোখের পলকে মুছে গেল মেয়েটি। কোন লজিক খুঁজে পাচ্ছিনে।

—হুঁ, লজিক থাকে না ওর বেলা। মৃগাঙ্ক ঘাসের অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে হাঁটে।

—মৃগাংকবাবু!

—উঁ?

—ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেব কী বলছেন মশাই! একটা হরবার দাম কত হয়েছে জানেন?

প্রিয়নাথের মনে হল, মৃগাঙ্কর অন্য কোন ব্যাপারে গভীর রাগ আছে নির্ঘাৎ। মৃগাঙ্ক পাটক্ষেতের দিকে এগোচ্ছে তখন। বড্ড বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে সে। প্রিয়নাথ বলে—চলে আসুন!

মৃগাঙ্ক অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে—এই দেখুন, এই দেখুন!

—কী?

—পায়ের দাগ।

পাটক্ষেতটা এখানে আচমকা বাঁয়ে ঘুরে গেছে। দু মিটার জায়গা কোণাকুণি পাট ঠেলে এগিয়ে মৃগাঙ্ক গর্জে উঠল—এ্যাই কুসমি!

প্রিয়নাথ দৌড়ে গেল। ওপাশে ব্যানাকাশের জঙ্গল রয়েছে। পাটক্ষেতের আলের নিচেই একটা মস্তো গর্ত। সেখান থেকে কুসুম লাফিয়ে উঠেছে। খরগোসের মতো কয়েকটি লাফে ওদিকে আখের ক্ষেতে সে ঢুকে গেল।

মৃগাঙ্ক বন্দুক তুলেছিল। হাসতে হাসতে নামাল। —দেখলেন কাণ্ড? মাগীর সত্যি কোন তুলনা নেই!

প্রিয়নাথও হাসে! —আমি ভাবছিলাম......

—গর্তে বসে হাঁসটা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে?

—সেইরকম কিছু।

—হ্যাঁ, তাতেও অবিশ্বাস্য কিছু নেই ওর পক্ষে। মাংসের লোভ ওর প্রচণ্ড।

দুজনে খড়ের জঙ্গলটা পেরিয়ে অনেকটা ঘুরে সেই ঢিবিতে পৌঁছল। মৃগাঙ্ক জামাজুতোর পুঁটলিটা সবসুদ্ধ ব্যাগে ঢোকাল। প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। কাঁধে ঝোলাল।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। গোঁফটা একবার সযত্নে পাকিয়ে নিয়ে বলল—আসুন, আজ আর হাঁসটাস হবে না। হরিয়াল বা ঘুঘু পাই নাকি দেখা যাক।

খালের ধারে-ধারে ওরা হাঁটে। পশ্চিম-দক্ষিণে এগিয়ে যায়। একটু পরে মৃগাঙ্ক বলে—ওই গাছপালার জটলা

দেখছেন, ওখানটা হল আমলাবাগ। আমলাবাগের নাম শোনেননি?

—শুনেছি মনে হচ্ছে।

—লালগোলার মহারাজাদের পূর্ব-পুরুষ ভৈরবের পাড়ে বাহান্ন একর জায়গায় আম-কাঁটাল-লিচুর বাগান করে-ছিলেন। দেখাশোনার অভাবে সব জঙ্গল হয়ে যায়। জন্তুজানোয়ার এসে জোটে। বাঘ শুয়োর হায়েনা—কত রকম। ভালো জাতের আম ফলত একসময়। এখন উচ্ছন্নে গেছে। অনেক কেটে বিক্রি করা হয়েছে যুদ্ধের সময়। আমার ঠাকুর্দার আমলে নাকি একজোড়া হরিণও ছাড়া হয়েছিল। তাছাড়া হাজারটা ভূতের গল্প আছে। এমন এলাকা বাংলাদেশে আর নেই, মশাই। শুধু ভূত, ডাইনী, পিশাচী আর অলৌকিক ব্যাপারের রাজত্ব। আসলে—আমার মনে হয়, এখানকার মানুষ কোন অজ্ঞাত কারণে বড্ড বেশি রোমান্টিক আর কল্পনাপ্রবণ। আমলা-বাগের ওদিকে একটা গ্রাম আছে শিমু-লিয়া। সে গাঁয়ে সবাই ভূতের ওঝা আর তান্ত্রিক। বেলায়-বেলায় বউঝিদের পটা-পট ভূতে ধরে। আবার ছেড়ে দেয়। এক-দিন নিয়ে যাব—দেখবেন। তাক লেগে যাবে। তবে আমলাবাগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি টের পেয়েছিলাম। ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

—কী?

—একটা আশ্চর্য গন্ধ। মোটামুটি এলাকার সবরকম ফুলের গন্ধই আমার জানা। গাছপালাও চিনি। কিন্তু কোন-কোন সময় ওখানে একটা সুগন্ধ মাত্র দু-এক মিনিটের জন্যে—হ্যাঁ—এক বা দু মিনিট বড় জোর এসে আবার মিলিয়ে যায়। গন্ধটা খুবই অচেনা। অনেক খুঁজে তেমন কোন গাছ বা ফুল দেখতে পাইনি। আর গন্ধটা পেলে একটা দারুণ রিঅ্যাক-শন ঘটে যায়। একরকম অস্থিরতা—উত্তেজনা।

প্রিয়নাথ একটু চুপ করে থাকার পর বলে—আমার পিসেমশাই-এর বাড়ি বর্ধ-মান জেলার মঙ্গলকোটে। বনেদী বড় গ্রাম। পাশে কুনুর নদী আছে। মাইল দুই উত্তরে অজয়ের সঙ্গে মিলেছে। ওখানেই কোগ্রাম—কবি কুমুদরঞ্জনের বাড়ি। তা—তাই কুনুরের পাড়ে একটা বড়ো জঙ্গুলে বাগান দেখেছি—লোকে বলে আতরের বন। কেন জানেন? ওখানে কোন কোন সময় আতরের গন্ধ পাওয়া যায়।

—আপনি পাননি?

—হুঁ-উ। তখন আমার বয়েস চোদ্দ পনের হবে। ভীষণ রোমান্টিক স্বভাবের ছিলাম।

—এখন আপনার বয়েস কত হল?

—কী মনে হয় আপনার?

—আমার চেয়ে অনেক ছোট আপনি। আমার ছত্রিশ হয়েছে।

—আমি আপনার ছ-সাত বছরের ছোট।

'পুস্তকশ্রীর' বই মানেই ক্ল্যাসিক

অধ্যাপক ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও স্বকীয় 'বাসুদেব' নামক কণ্ঠভাষায় রচিত ব্যাখ্যা সমন্বিত—

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বের মহাগ্রন্থ

শ্রীমদানন্দ বর্ধন বিরচিত

ধ্বন্যালোক (লোচন টীকাসহ)

প্রথম উদ্দ্যোত—১৫্ টাকা মাত্র • দ্বিতীয় উদ্দ্যোত—১০্ টাকা মাত্র

শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত

সাহিত্য দর্পণ (তর্কবাগীশ টীকাসহ)

সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ — মূল্য ২৫্ টাকা মাত্র

উভয় গ্রন্থেই মূল্যবান বিস্তৃত ভূমিকা এবং আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের মূল্যবান মুখবন্ধ গ্রন্থ দুইটির মূল্য ও গৌরব অশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসাধন্য।

ডঃ বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত

ভারতচন্দ্র কবি ও শিল্পী

মধ্যযুগের শেষ কবিশিল্পীর সাহিত্যিক নব মূল্যায়ন।

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

(আদি, চতুর্থ ও মধ্য-অষ্টম অধ্যায়)

সম্পাদনা, ব্যাখ্যা ও আলোচনা—ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

সমগ্র চৈতন্যতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—বি-এ অনার্স ও এম-এ পরীক্ষার্থিগণের একান্ত উপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

মূল্য—৭্ টাকা মাত্র

সংস্কৃত সাহিত্যের দুইটি ক্ল্যাসিক গীতিকাব্য—অমরুশতক ও শৃঙ্গার শতকের একত্রে যুগ্মরূপ।

দুইটি প্রণয়শতক

মূল সংস্কৃত সহ ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এম-এ পি আর এস, ডি-লিট, আই এ এস কর্তৃক সুললিত পদ্যে অনূদিত।

মূল্য—৮্ টাকা মাত্র

পুস্তকশ্রী

৩০এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

মৃগাঙ্ক পিছু হটে ওর কাঁধে হাত রাখে। —মাই ইয়ংগার ব্রাদার! হুঁ—তাহলে তো মুখখিস্তি করতে বাধবে মশাই!

প্রিয়নাথ বলে—না, স্বচ্ছন্দে।

সেই বাঁধে গিয়ে ওঠে ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলে—কুসমিকে দেখে তাহলে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলেন?

—না তো। কেন?

—ইচ্ছে হয়?

—কিসের?

—ওকে পেতে?

প্রিয়নাথ আচমকা সোজা হয়—বাঘ চলে যাওয়ার পর ব্যানার নুয়েপড়া শীষ যেমন স্প্যাং করে ওঠে। সে বলে—যান! কী যে বলেন! ভ্যাট!

—গত খরায় এক অফিসার এসেছিলেন আপনার বয়সী। টিউবওয়েল দিয়ে সেচের ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে। তিনি কুসমির প্রেমে পড়ে যান।

—তারপর?

—তারপর কিছু নেই। প্রায়ই ওর বাড়ি গিয়ে বসে থাকতেন। উপলক্ষ—বউয়ের দুরারোগ্য ব্যাধির ফয়শালা। যদ্দুর জানি, কুসমি ওঁকে একগোছা চুল কাঠিতে জড়িয়ে দিয়েছিল নাকি। জলে চুবিয়ে জলটা বউকে খাওয়াতে বলেছিল। ...মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

প্রিয়নাথের মন বিরূপ হয় মৃগাঙ্কর প্রতি। সে কোন কথা বলে না। তার এতক্ষণে মনে হয় মৃগাঙ্ক তার প্রতি তুখোড় বসের মতো আচরণ করছে। সে মৃগাঙ্কর কৃষিখামারে নতুন ট্রাকটার আর কিছু হার্ভেস্টার কম্বাইনের সঙ্গে নতুন আমদানি কর্মচারী—নিতান্ত ট্রাকটারচালক। তাকে বন্ধুভাবে নিল, বলেছিল মৃগাঙ্ক। নিয়েছে কি? মনে হচ্ছে কুকুরবেড়ালের সঙ্গে মৃগাঙ্ক খেলছে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় প্রিয়নাথের।

অবশ্য আর কী প্রত্যাশা জীবনে করার আছে তার? ডাক্তারের ছেলে—ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবে—হয়নি। হয়েছিল নিতান্ত কারিগর। তবে তার এক্সপার্ট হিসেবে একটা উপাধি জুটেছিল এই যা! মৃগাঙ্ক সেই মর্যাদাটুকুও যেন আর দিচ্ছে না।

দুঃখিত প্রিয়নাথ দূরে ও কাছে সবুজগুলো দেখতে থাকে। সেই সময় আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা বিশাল গাবগাছের (এলাকায় প্রচুর গজায়) তলায় কুসুমকে দেখতে পায়। এদিকে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণে সে গাছটার ওধারে সরে যায়। মুছে যায়। প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে সে খবর দিল না।

।। দুই ।।

ওখানে মা গঙ্গা, এখানে ইনি বাবা ভৈরব। এ নদীর এরকম একটা পরিচয় দিয়েছিল গগন হালদার। মাঝখানে আঠারো মাইলের ছাড়াছাড়ি—সমান্তরাল দুটি প্রবাহ। গ্রীষ্মে দুজনেরই চেহারা এক। খড়খড়ে ধুসর ছাইমাখা শান্ত সন্ন্যাসী গড়ন। কালো স্বচ্ছ জলে অনেক শান্তি থাকে। কিন্তু ভৈরব পুরুষ। স্বয়ং রুদ্রদেব। তাই বর্ষায় চেহারা বদলে যায় দ্রুত। প্রচণ্ড গর্জন করে দুধারের মাটি থাবায় টেনে নেয়। গগন বলেছে, বর্ষায় বহরমপুরের ঘাটে গিয়ে দেখে আসুন। মা তখনও শান্ত হয়ে হাসছেন। আর এ ব্যাটার ক্ষ্যাপামি চূড়ান্ত।

নদীর ধারে বসেছিল প্রিয়নাথ আর মৃগাঙ্কের বোন স্বাধীনের স্বামী স্কুলমাস্টার বিজয়েন্দু।

এখন কোন শব্দ নেই। নদীর ছলছল শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়েছে। চাঁদটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফিকে সোনালি রঙ চুইয়ে পড়ছে এবার—তা জ্যোৎস্না বলা ভুল। কাঁপা কাঁপা নদীর জলের তলায় তাকে দেখা গেল। মাঝে মাঝে হয়তো মাছ নড়ে ওঠার জন্যেই জায়গায় জায়গায় গুলানো ধাতুর হলুদ আভা ছড়াতে থাকল। সেই বিস্ময়কর প্রাতিভাসিক বিস্ফোরণের দিকে প্রিয়নাথের দৃষ্টি বারবার আটকে যেতে থাকল।

আর, মশা আসতে শুরু করেছে। সুই ফোটাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ও কপালে হাত চালাচ্ছিল প্রিয়নাথ—চুপচুপ। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে ছেলেবেলার গল্প করে যাচ্ছে। এ এক ঝামেলায় পড়া গেল। প্রিয়নাথ এতক্ষণে কাসল। —এবার উঠলে হত জামাইবাবু!

বিজয়েন্দুর দাঁত দেখা গেল। চাঁদের দিকে উজ্জ্বল মুখ। —আপনিও জামাইবাবু বললেন?

—বা রে! আপনি আমাদের জামাইবাবু না?

—উঠতে ইচ্ছে করে না। বেশ শান্ত জায়গা। কিন্তু মশা সুঁই দিচ্ছে।

—হ্যাঁ, মশা। আর শিশির পড়ছে প্রচণ্ড। মাথায় হাত দিয়ে দেখুন। চবচব করছে।

—তাহলে ওঠা উচিত। কিন্তু কী লাভলি, গ্রেট!

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়। —কী? সিনারি?

—চাঁদ।

—আর চাঁদ! চাঁদে মানুষ যাচ্ছে আজকাল। চলুন। সাবধান—আপনার ওপাশে বিষাপ পড়ে দেখছিলাম। এদিকে আসুন।

বিজয়েন্দু তাকে অনুসরণ করে। বাঁধে উঠে দুজনে পাশাপাশি ডাইনে চাঁদ নিয়ে হাঁটে। সোজা খেয়াঘাটের দিকে এগোতে থাকে। খামারের পথে বাঁশ আর ঝোপজঙ্গল পড়বে। সঙ্গে টর্চ নেই কারো। তবে পঞ্চাশ মিটার জঙ্গলে পথটা পেরোলে আলো মিলবে খামারে—বৈদ্যুতিক আলো। এক মাইল পথ ভগীরথপুর থেকে খামার অব্দি লাইন এনেছে মৃগাঙ্ক। অনেক হাঁটাহাঁটি অনেক সাধাসাধি এবং খরচখরচার পর এটা সম্ভব হয়েছে।

সোজা উত্তরে খেয়াঘাটের কাছে গিয়ে ওরা পাকা রাস্তায় ওঠে। বটতলার মাচায় কারা পাটের দর নিয়ে তর্ক করছে। 'সুপারিগোলার হাট' কথাটা বারবার শোনা যাচ্ছিল। সে তো পদ্মার ধারে। প্রিয়নাথ শুনেছে। মৃগাঙ্ক বলেছিল, সেখানে ভীষণ জুয়ার আসর চলে। রাজ্যের জুয়াড়ী গিয়ে স্থায়ী ডেরা পেতে বসেছে। ফি রাতে গানবাজনার আসর বসায় তারা। লোকেরা এসে ভিড় করে এবং জুয়ার টানে ভেসে যায়।

ঘাটে বিদ্যুৎ নেই। পুরনো জ্যোৎস্না আর অন্ধকার ঘুরেফিরে আসে। পশ্চিমমুখো পীচের পথের ওপর সটান শুয়েছে তারা—সেই জ্যোৎস্না ও অন্ধকার গলাগলি। তিন-চারটে দোকান মাত্র। টিমটিমে আলো জ্বলছে। আলো ঘিরে অজস্র পোকা থিকথিক করছে। বাসটা গাছের নিচে হাতির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথে চলাফেরা করছে অল্পস্বল্প লোক—চাপা গলায় কথা বলছে তারা। সবই ষড়যন্ত্রসঙ্কুল মনে হয়।

প্রিয়নাথের চা খেতে ইচ্ছে করছিল হাওলদারের দোকানে। দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে সে জানাল কথাটা। বিজয়েন্দু বলল—তো চলুন না আমার সঙ্গে! গিয়ে চা আর গল্পসল্প করা যাবে। এখন তো কাজ নেই আপনার?

—নেই।

—তাহলে চলুন। একটা রিকশো নেওয়া যাক।

—থাক। হাঁটতে হাঁটতেই যাই। ভালো লাগছে।

—আমারও ভালো লাগছে।

সামনে একটা আলো দুলতে দুলতে আসছিল। কাছে এসে লোকটা হেরিকেন তুলল মুখের কাছে। —নতুন বাবু!

গগন হালদার। প্রিয়নাথ বলে—হালদারমশাই কোত্থেকে?

সত্যেন্দ্র গিয়েছিল ভগীরথপুর। ভাবলাম, আলো নিয়ে যাই—এগিয়ে আনি। তা শুনলাম, ও কখন আগেই চলে এসেছে। ঘাটের দিকে দেখলেন নাকি?

—না তো!

—তাহলে আপনাদের খামারেই বা গেল?

—হয়তো। যাও, দেখে এস।

বিজয়েন্দু সরে এসে বলল—কী হালদারমশাই আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না!

গগন অমনি হেরিকেনসুদ্ধ ডানহাত কপালে ঠেকাতে চেষ্টা করে। —জামাইবাবু যে! ইস্কুলের মিটিঙে যাননি? সত্যেন্দ্র গিয়েছে।

বিজয়েন্দ্র মাথা দোলায়। তারপর প্রিয়নাথকে ডাকে—আসুন।

গগন বলে—এগিয়ে দিই জামাই-বাবু?

—না, না। জ্যোৎস্না আছে। তুমি সন্তোষকে দেখো হালদারমশাই।

—উঁহু। পথে আজকাল ইনিসাপ-গুলো ওঠে বড্ড। তিন-চারটে দেখলাম। গগন আগু বাড়িয়ে ওদের আলো দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করে, যেদিক থেকে এসেছে ফের সেদিকেই। —তবে ইনি সাপের বিষ নাই। একপাশের নয়ানজুলি থেকে অন্যপাশের নয়ানজুলিতে যাবেই ব্যাটারা। পায়ে উঠলে তখন যদি আকুলি-বিকুলি দশাটা দেখেন, হেসে বাঁচবেন না। একসুতো এগোতে একশোবার ছটফট করবে। ...গগন খুব হাসে।

পচা জলের দুর্গন্ধ আর মশার একটানা আওয়াজের মধ্যে তিনজনে হাঁটে। গগনের খালি গা, হাঁটুঅবধি ধুতি পেঁচিয়ে পরা, খালি পা—হাঁসের মতো থ্যাবড়া আর ফ্যাকাসে। গগন বকবক করে সমানে। ইস্কুল, পাটের দর, তেজারত মোড়লের সঙ্গে ইনু পাইকারের মামলা, চক ইসলামপুরে তাঁতীরা রেশম পাচ্ছে না, ব্লক আপিস ঘেরাও করেছিল উন্মাদ। তারপর গগন প্রিয়নাথকে জিগ্যেস করে—আপনি তো বাবু রাঢ়ের লোক—না কী?

—হ্যাঁ। কেন?

—কোন জায়গার?

—সিউড়ি।

—সাঁইথে একবার গিয়েছিলাম আকালের বছরে। পঞ্চাশ সনে। তখন আমি বয়েসে কাঁচা।

—মাছ বেচতে নাকি?

—মাথাখারাপ! তিরিশ কোশ রাস্তা হেঁটে মাছ বেচতে? গিয়েছিলাম এক সাধুর সঙ্গে। তখন পয়সার দাম ছিল নতুনবাবু। মোটরবাসে চাপিনি। তখন সাধুরাও চাপত না। পায়ে হাঁটত।

—খুন কী হালদারমশাই! সাধুর সঙ্গে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। খেয়াল হল, চলে গেলাম। সাধু পদ্মাপার থেকে এসেছিল। এসে শ্মশানবটতলায় আখড়া করেছিল। খুব গাঁজা খেত। আমিও খেতাম। তখন ধরিত্তি বেঁচে। সবে মুখিয়ে উঠেছে। ডাটালো ছিপছিপে গড়ন। হ্যাঁ—আগের বছর টাট্টু চেপে ওর শ্বশুরকে নিয়ে কাল্দ্বার দিয়াড়ে এসে জুটেছিল। ভেবেছিল, খেয়েপরে বাঁচবে। নদীর ধারের জয়াট মাটি—সুফলা।

যেন ধরিত্রীর কথা! প্রিয়নাথের খারাপ লাগে। বুড়ো জেলে আর কোন কথা জানে না—শুধু ওই খুড়ো নিয়ে বেঁচে আছে যেন।

বিজয়েন্দ্র আনমনে ছিল। সে বলে—ধরিত্রী?

গগন বলে—হ্যাঁ, ধরিত্তি। তা সাধু বলেছিল, ধরিত্তি একজন ভৈরবীই বটে। তবে ওর জাত গিয়েছে। ওকে কাম জয় করেছে। শুধু জয় করেছে না—ওর মাথার খুলিতে গোঁজ পুঁতেছে। ওর উদ্ধার নাই।

প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে—আর তুমি কি ওর উদ্ধারের জন্যে সাধুর সঙ্গে গেলে?

—কে কাকে উদ্ধার করে নতুনবাবু! আমি গেলাম একটা কাজে। এখন হাসি লাগে। যৌবনে মানুষ কী করে, কী মাথায় ঢোকে! এখন বলতে লজ্জা নাই। আমি গিয়েছিলাম বশীকরণ লতা আনতে।

—ওরে বাবা! বশীকরণ লতা! এরা দুজনে একসঙ্গে হাসে।

—হ্যাঁ। সাঁইথে থেকে আরও পশ্চিমে কী এক পাহাড় আছে। সেখানে অমা-বস্যার রাতে লতার ফুলটি ফোটে। ফুলসুদ্ধ লতা উপড়ে আনতে হয় এক নিঃশ্বাসে—সাধু বলেছিল।

প্রিয়নাথ বলে—পরে তো ধরিত্রীর সঙ্গে ভাবটাব হয়েছিল হালদারমশাই?

—হুঁউ। হয়েছিল। খুব—খুব।

—বিনা বশীকরণে তো?

—হুঁউ। বশীকরণ লাগে না ওতে।

—কী লাগে হালদারমশাই?

গগন আনমনে বলে—উঁ?

—কী লেগেছিল ধরিত্রীকে জয় করতে?

—গপ্পটা তো আপনাকে সেদিন বলেছি। ওর কারচুপি তুকতাক একমাত্র আমিই জানতাম, সব গপ্পা। আমার কাছে চাবিকাঠিটি ছিল। তাই আমার বশ হয়েছিল। তবে সে খুব সহজ মেয়ে ছিল না। অমন মেয়ে দুটো-একটা জন্মায়। ধরিত্তি হয়তো মানুষই ছিল না, নতুনবাবু।

প্রিয়নাথ বিজয়েন্দ্রকে বলে—বুঝতে পারছেন তো? হালদারমশাই ওকে আসলে ব্ল্যাকমেইল করত।

বিজয়েন্দ্র মৃদু হেসে চাপাগলায় বলে—আরেকজনও করতেন।

—কে?

—শ্বশুরমশাই।

রাস্তার ধারেই বিশাল এলাকা পাকা পাঁচিলে ঘেরা—'রায়ভবন।' গেটের মস্তো কপাট প্রায় ভাঙাচোরা—নির্জন ও নিঃশব্দ। ভিতরে প্রাঙ্গণে অজস্র গাছপালা—আম লিচু কাঁটাল আর কিছু শিরীষ আমলকী কৃষ্ণচূড়া দেবদারু। ফুলবাগান একটা ছিল। এখন অযত্নে ঝোপঝাড় হয়েছে। তবু ফুল ফোটে। মিঠে গন্ধ ভাসে হাস্নুহানা আর শিউলির। বিদ্যুতের আলো আছে। একতলা বাড়ি। সামনেই ঠাকুরঘর ও ছোট্ট উঠোন। ধাপ আছে উঠোনের চার-দিকে। মধ্যে একটা পুরনো হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। সিঁদুরের ছোপে ভয়ংকর লাগে। একসময় একশো পাঁঠা বলি হত।

গগন ঠাকুরবাড়ির দরজায় গিয়ে বলে—তাহলে যাই?

—আসুন। বলে বিজয়েন্দ্র পা বাড়ায়। কলিগের বাবাকে সে মর্যাদা দেয় যথেষ্ট। তারপর প্রিয়নাথের হাত ধরে টানে—আসুন প্রিয়বাবু।

ঠাকুরঘরের বারান্দা দিয়ে অন্দরে ঢোকে ওরা। ফের একটা উঠোন। চার-দিকে অনেকগুলো ঘর। দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দার একদিকে আলো আছে। বিজয়েন্দ্র ডাকে—নিবারণ!

স্বাধীন বেরিয়ে বলে—নিবারণকে বাইরে পাঠিয়েছি। পরক্ষণে ঘোমটাটা একটু তোলে। তারপর একটু হাসে। —ও, প্রিয়বাবু। আসুন, আসুন।

মৃগাঙ্কের সঙ্গে দুদিন এবাড়ি এসেছিল প্রিয়নাথ। স্বাধীন খুব আলাপী মেয়ে। সঙ্কোচের ধার ধারে না দেখেছে। আর—সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠাও হয়তো যায় তার কাছে।

বিজয়েন্দ্র বলে—তুমি চা-টা নিয়ে এসো। আমার ঘরেই বসছি আমরা।

ঘরটা বেশ বড়ো। লেখার টেবিলটার ওপাশে হাল্কা একটা সোফাসেট রয়েছে। প্রিয়নাথ ঢুকেই সেখানে গিয়ে বসে পড়েছিল। একটা ইজিচেয়ার আছে ডোরাকাটা—সেখানে বিজয়েন্দ্র হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসল। বলল—এদেশে সব ভালো। শুধু মশাটাই যা খারাপ। ফ্যানটা বাড়িয়ে দেব? মশা কামড়াবে।

—থাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে। তবু এত মশা কেন, কে জানে!

—ওই দেখছেন না, জানলায় সব নেট লাগানো হয়েছে। তাও রেহাই নেই। গান শুনবেন?

—কে গাইবে? আপনি গাইলে শুনব।

—না। রেকর্ড। আমি ওই নিয়েই আছি। দেশী বিলাইতী সবরকম গান অনেকগুলো আছে।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—তুমি সব নিয়েই আছ জামাইবাবু! সে সিগ্রেট ধরায় এবং গ্লোসট্রে খোঁজে। বিজয়েন্দু একটা কোর্টিং ঢাকনা এগিয়ে দেয় টেবিল থেকে। তারপর বলে—শেষ অবধি জেনে দেখেছি, সঙ্গীতই শাশ্বত—সঙ্গীতই হয়তো ঈশ্বর।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—সুখে আছ জামাইবাবু, ঈশ্বরটিশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। সে প্রকাশ্যে বলে—আপনাদের চিড়িয়াখানাটা আমার দেখা হচ্ছে না। কোথায় সেটা?

—পিছনে। যাবেন এখন?

—চলুন না!

ট্রেতে দুটো প্লেট নিয়ে ঢুকছিল স্বাধীন। বলে—এখন কী দেখবেন? দিনে আসবেন, তেমন কিছু নেই। মন দিতে পারিনে। হরিণের বাচ্চাটা আনালাম অত খরচ করে—বাঁচবে না হয়ত।

প্লেট দুটো রাখবার সময় তার হাত-কাটা ব্লাউজের অনেকটা পাশ থেকে দেখতে পায় প্রিয়নাথ। সে চোখ ফেরাতে পারে না। বিজয়েন্দু বলে—নিন, খাওয়া যাক। স্বাধীন চমৎকার পারেন করে।

প্রিয়নাথ আনমনে প্লেট তুলে নিয়ে যায়। স্বাধীনকে এত সুন্দরী তো মনে হয়নি আগের আগের বার। দিনে দেখেছিল বলে? রাত্রি একটা মায়া আনে নিঃসন্দেহে? এখন স্বাধীন সেজেগুজে আছে। কপালে লাল টিপ, চোখে কাজলের রেখা, চুলগুলো অবশ্য এলো-খোঁপা। সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। যেন লালরঙের ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কামড়ে বসে আছে, মরণকামড়। ক্রমশ সুন্দরতর হল স্বাধীন। দুধসাদা রডলাইটের আভায় ধবধবে পরীমূর্তি। সরু সরু সবুজ পোকাগুলো আলোর গায়ে থিকথিক করছে আর কিছু সাদা পোকা উড়ে এসে গায়ে বসছে, মুখে বসছে এবং স্বাধীন হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে।

[illegible] চলে যেতেই ঘরটা শ্মশান হয়ে গেল যেন। আসবাবপত্রগুলো শসনকে পোড়াপোড়া দেখাল এবং হয়খান।

প্রিয়নাথ একবার ঘুরে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতে চেষ্টা করে। তার শরীরটা মোটমুটি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্য প্রবল। সাদা হাতের ওপর নীলচে রোমগুলোর সবুজ পোকা ঢুকোছল, ছাড়িয়ে ফেলে। হঠাৎ তার মনে হয়, সে খুব অযোগ্য মানুষ নয় পৃথিবীতে। হাত বাড়ালে কিছু না কিছু তুলে আনতে পারেই। এতকাল হাত বাড়ায় নি, ভুল হয়েছে।

বাইরে কার সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলছিল স্বাধীন। বিজয়েন্দু হঠাৎ মুচকি হেসে চোখ টিপল প্রিয়নাথের দিকে। তারপর উঠল। পা টিপে টিপে জানলার কাছে গেল—ভিতর দিকের জানলায়। এখান থেকে পর্দা ফাঁক করে কিছু দেখে ফের মুখ ঘুরিয়ে চোখ টিপল। তারপর ফিরে এল ইজিচেয়ারে। চাপা গলায় বলল—কুসুম।

প্রিয়নাথ সোজা হয়ে বসে।—কুসুম!

—হ্যাঁ। প্রায়ই আসে তো। রাত্রেই আসে।

—কেন?

—বলছিলাম তো। আমার স্ত্রী সুপারস্টিশনের ডিপো। ভূতপ্রেত-মন্ত্রতন্ত্রের খুব ভক্ত।

—ও। বলে চুপ করে যায় প্রিয়নাথ।

একটু পরেই চা নিয়ে আসে স্বাধীন। মুখটা এবার গম্ভীর। চা রেখে সে বাইরে দিকে কাকে গলা চড়িয়ে বলল—কুসুম মা বাইরে বসো। আমি আছি। তারপর একটা মোড়া টেনে নিয়ে একটু তফাতে বসে। এবার তার মুখে হাসি ফোটে। স্বাভাবিক লাগে তাকে।

বিজয়েন্দু বলে—কী খোকার কুসুমের?

—এ্যাঁ! স্বাধীন চমকায় যেন। তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলে—এসেছিল। নতুন কাপড় চাইতে। নতুন কাপড় এখন কোথায় পাব? কাল আসতে বললাম।

—কী হবে নতুন কাপড়?

—সে তোমার শুনে কাজ নেই।

প্রিয়নাথ বলে—আপনি এসব বিশ্বাস করেন বুঝি?

—কী?

—মন্তরতন্তর?

স্বাধীন মুখ টিপে হাসে।—আপনি বুঝি করেন না?

—কীভাবে করব? তেমন দেখা-শোনার সুযোগ হয়নি। দরকারও পড়ে না।

স্বাধীনের চোখদুটো মুহূর্তে চকচক করে উঠেছিল। সামলে নিল।—না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়। আপনাদের মাস্টারমশাইকে জিগ্যেস করতে পারেন, কী হয় বা না হয়।

—আপনি কী রাগ করলেন আমার কথায়?

স্বাধীন ফের নির্মল হাসল।—না।

বিজয়েন্দু বলল—কুসুম একটা ম্যাজিক দেখিয়েছিল।

প্রিয়নাথ শুধোয়—কী ম্যাজিক?

স্বাধীন তেড়েমেড়ে বলে—ম্যাজিক? ওটা ম্যাজিক? শুনলেন প্রিয়বাবু? তখন বলছিল, সারাটা দিন শরীর খারাপ করেছে। আমি কত বকলাম কুসুম এলে। তখন ও সব ঠিকঠাক করে দিল।

—কী ব্যাপারটা শুনি?

বিজয়েন্দু বলে—ব্যাপারটা নিশ্চয় ভাববার মতো। আমার দুই ভ্রূর মাঝখানে আঙুল ছুঁইয়ে জিগ্যেস করল, কিছু টের পাচ্ছেন? তখন তাজ্জব হয়েছিলাম কিন্তু। আমার সারা শরীর অবশ লাগছিল। জাস্ট ইলেকট্রিক শক!

—বলেন কী?

—হাঁ। তারপর আঙুল তুলে নিল। কিন্তু রাত্রে ভালো ঘুম হল না। খুব খারাপ সব স্বপ্ন দেখলাম। পরের দিনটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। স্কুলে যেতে পারলাম না। জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন লাগে। মুখ বিস্বাদ। কিছু খেতে ভাল লাগল না। রাত্রে আবার কুসুম এল। ও বকাবকি করল। তখন ফের আঙুল রাখল আমার সেই জায়গায়। সে রাত্রে ঘুম ভাল হোল। শরীরও ঠিক হোয়ে গেল পরদিন।

—আশ্চর্য তো!

—পরে ভেবেছি, ব্যাপারটা জাস্ট সাইকোলোজিক্যাল। নিজেরই সাবকনশাস মাইণ্ডে উইকনেস ছিল কিছু। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা হয় না। আমি আপনাকে একটা বই দেখাতে পারি। দা ফিজিক্স অফ পারসেপসান। মার্গোপন্টির লেখা। চমৎকার ব্যাখ্যা আছে এইসব ব্যাপারে। তাছাড়া হ্যালুসিনেসানের ব্যাখ্যা আছে। উইচডক্টর বা ওঝা তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কেও ধারণা হবে। একে বলা হয় উইচ-কাল্ট। এদিকে সাইকোলোজিস্ট ইয়ুং বলেছেন—

স্বাধীন বলে—পাণ্ডিত্যটা রাখো। ওঁকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আন। রাত বাড়ছে।

বিজয়েন্দু ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে—হাঁ। যান প্রিয়বাবু। দেখে আসুন।

কবি বিশ্বনাথ মৈত্রের
একখানি চিরায়ত কাব্যগ্রন্থ
মনোরমা ও বৃদ্ধচারণ
পুজোর আগেই বেরুচ্ছে।
দৈনন্দিন প্রকাশনী
বনগ্রাম : ২৪ পরগণা

রাণী ধূপ
প্রস্তুত কারক:- কাবেরী প্রডাক্টস্

—আপনি চলুন?

—ভয় নেই। মালিক নিজে যাচ্ছেন সঙ্গে। আর চিড়িয়াখানার বাঘটাও পোষা তো হয় না!...হো হো করে হেসে ওঠে বিজয়েন্দু।

স্বাধীন বিছানার তলা থেকে একটা টর্চ বের করে বেরিয়ে যায়। প্রিয়নাথ একটু ইতস্তত করে তাকে অনুসরণ করে। যাবার সময় বিজয়েন্দুর মুখটা দেখে যায়। সে চোখ বুজেছে। হাসিটা তখনও ধরা আছে ঠোঁটে।

বারান্দা ঘুরে খিড়কির দরজা খোলে স্বাধীন। নেমে যায় ওদিকে। টর্চ জেলে বলে—আসুন।

ওদিকে কোন আলো নেই। বাগান-বাড়ি যতো। কিন্তু গাছপালা নেই বিশেষ। ঘাসের ওপর শিশির এবং জ্যোৎস্না। এদিকে-ওদিকে দূরে গাছ-পালার ছায়া দুলছে অল্প হাওয়ায়। স্বাধীন হঠাৎ ঘুরে বলে—ও এল না?

—না।

—আসুন।

সে শিশিরের ভয়ে কাপড় তুলে হাঁটে এবং টর্চের আলো প্রিয়নাথের উদ্দেশ্যে নিজের পা থেকে প্রিয়নাথের পায়ের দিকে গোল করে রাখে। প্রিয়নাথ তার গোলাপী সুন্দর পা, আলতার দাগ, হাঁটুর নিচেকার সুদৃশ্য ভিমালো মাংসে কিছু রোমশ ভ্রূকুটি লক্ষ্য করে। কী ঘটে যায় তার মধ্যে। ওই পা দুটো বুকে নিতে ইচ্ছে করে। এই দুর্দান্ত ইচ্ছে তার ভব্যতা ও যুক্তিকে অনবরত উত্যক্ত করে মারে। সে বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে চাঁদের দিকে তাকায়।

তারের জালে ঘেরা একটা মস্তো আটচালার সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বলে—এই দেখুন। এখন ডিসটার্ব করতে চায় না বেচারাদের। ওই দেখুন হরিণটা, দেখতে পাচ্ছেন? আমার কাছে ওইটা। ওই ময়ূর দুটো। বাঁদর দেখবেন? বেজায় দুষ্টু। বাবার আমলে বাঘও ছিল। কেন্ট, ও কেন্ট! ঘুমোল নাকি,

ওপাশে একটা ছোট্ট টালির ঘর থেকে সাড়া আসে—যাই মা! তারপর হেরিকেন হাতে এক কালকুষ্টে বুড়ো বেরিয়ে আসে।

স্বাধীন বলে—আমাদের মালী। বাবার আমলের লোক। আসলে দেখা-শোনা ওই বেশি করে। কেন্ট, তারতীকে দুধটা খাইয়েছিলে? কেন?

কেন্ট মাথা দোলায়। প্রিয়নাথ বলে—তারতী কে?

স্বাধীন হাসে। —হরিণটার নাম। দাদী। বাবার আমলের সব তো মারা গিয়েছিল। কবার আগে দাদা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে। এখন ওর একটা জোড়া আনতে হবে। শুধু ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আনছি না। আর-বাঘও যা [illegible]।

চাপা কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ বলে—পাখি নাকি?

—হ্যাঁ, মুনিয়াই বেশি।

—সাপ নেই?

স্বাধীন ঘুরে দাঁড়ায়। —সাপ!

—হ্যাঁ। সব আছে, সাপ নেই?

স্বাধীন হেসে ওঠে। বলেছেন ঠিকই। কিন্তু সে ট্রেনিং তো বাবা দিয়ে যাননি। হ্যান্ডল করতে পারব না যে। তখন বেঁধে পুষতে হবে। কেন্টদা, তুমি শোও গিয়ে।

কেন্ট সম্ভবত গাঁজা খায়, প্রিয়নাথের মনে হল। লাল চোখে ঢুলতে ঢুলতে চলে গেল।

স্বাধীন তার চিড়িয়াখানার সামনে আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে—রাত্রে কী দেখাবেন! অবশ্য দেখার কিছু নেই। বরং দিনে এলে বাঁদরটার দুষ্টুমি দেখে আনন্দ পাবেন। ওরে বাবা, কী বিচ্ছু কী বিচ্ছু! আমার কাঁধে উঠে একদিন পটাপট চুল ছিঁড়তে শুরু করল! কিছুতে নামানো যায় না! —খিল খিল করে হেসে কাঁপতে পড়ছিল সে।

প্রিয়নাথের নাকে একটা সুগন্ধ আসছিল কতক্ষণ থেকে। কোন ফুলের কিংবা স্বাধীনের ব্যবহৃত সেন্টের, ঠিক করতে পারল না। —চলুন। বলে সে পা বাড়ায়। তারপর ফের বলে—ভারি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। কিসের?

—ফুলটুল হবে। আচ্ছা প্রিয়বাবু!

—বলুন।

—আপনার ফ্যামিলি আনবেন না?

প্রিয়নাথ অবাক হয়। —কেন?

—ওই খামারবাড়িতে মাঠের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে আপনার?

—লাগে বইকি। আপনার দাদাও তো থাকেন!

—দাদার কথা ছেড়ে দিন, ও ছন্নছাড়া মানুষ।

—আমিও ছন্নছাড়া।

—যান!

—হ্যাঁ। আমার কোন ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই।

টর্চ নিভিয়ে জ্যোৎস্নায় স্থির দাঁড়ায় স্বাধীন। —সত্যি?

—মিথ্যে বলে কী লাভ।

—বাবা মা?

—নেই।

—ভাইবোন?

—ভাইটাই নেই। এক বোন আছে। রামপুরহাটে বিয়ে হয়েছে।

—দাদারই মতো! উপগ্রহ জোসর জুটেছেন তাহলে! স্বাধীন হেসে ওঠে। তারপর ফের বলে—বিয়ে করেননি না কেন? বিয়ে করে ফেলুন। তাহলে দুঃখ-দুঃখ ভাবগুলো আর থাকবে না।

—আমার দুঃখ-দুঃখ ভাব আছে নাকি? আমার কী?

—ওইরকম দেখেছিলুম প্রথম দিন। এখনও লাগে।

—আপনার চোখের ভুল। আমি সুখী মানুষ।

—কী বললেন? আরেকবার বলুন, আরেকবার বলুন শুনি?

—সুখী মানুষ।

—সুখী মানুষ, তাই অত আস্তে কথা বলেন—অমন নির্জীব। চুপচাপ! চালাকির জায়গা পাননি।

হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে হয়, তার সামনে এই নির্জন বাগানের জ্যোৎস্নায় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। স্বচ্ছন্দ এক স্বাধীনতার নদী—তার পাশে সে, খুবই কাছে দাঁড়িয়েছে সে। নদীটি খরস্রোতা। বিপুল টান।

স্বাধীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে। শোনা যায় তার শব্দটুকু। [illegible] প্রিয়নাথ টের পায়। সে শুধু নাকের ফুটো দুটো দিয়েই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছে। বড় আটকানো ভাব। সে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে।

—কী হল হঠাৎ প্রিয়বাবু?

—কিছু না। চলুন, উনি একা বসে আছেন।

দুজনে যখন ঘরে ঢুকল [illegible] মুখটা গম্ভীর। বিজয়েন্দু টেবিলে বসে

কী সব লিখছিল। ঘুরে বলে—দেখা হল?

প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। এবার আমি চলি জামাইবাবু। রাত বেড়ে যাচ্ছে।

স্বাধীন বলে—আপনিও জামাইবাবু বলছেন? বাঃ বেশ।

প্রিয়নাথ একটু হাসে। —আসি তাহলে।

—যাবেন? কিন্তু আলোকাকো আনেননি দেখছি। টর্চটা নিয়ে যান বরং।

—থাক। জ্যোৎস্না আছে।

বিজয়েন্দু বলে—আচ্ছা, আসুন। স্বাধীন, শীগ্‌গির—আমি এগিয়ে দিতে যাচ্ছিনে। ভীষণ মড এসে গিয়েছে। কেটে যাবে। শীগ্‌গির!

প্রিয়নাথ বলে—থাক, এগোনোর কী দরকার?

স্বাধীন পা বাড়িয়ে বলে—না। লোকধর্মীর ব্যাপার। বেরোতে পারবেন না। সে আমলে চোর ডাকাতের ভয়ে অন্তত গোলমেলে বাড়ি করেছিলেন ঠাকুর্দা। ঢোকা সহজ, বেরুনো কঠিন।

ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে প্রাঙ্গণে নামে ওরা। গেটঅব্দি নিঃশব্দে এসে টর্চটা হাতে গুঁজে দেয় স্বাধীন। বলে—এখান থেকে ম্যানেজ করুন, আমি যেতে পারব।

আলোটা ধরে থাকে প্রিয়নাথ। সেই উজ্জ্বলতার মধ্যে পরীমূর্তি চলে যায়। তারপরও কতক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ হুঁস ফেরে তার। তখন আলো নিভিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামে। হনহন করে হাঁটে।

একটু পরে পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘোরে। আলো ফেলেই স্তম্ভিত হয়। কুসুম দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে—আঃ! কী করছেন নতুনবাবু!

প্রিয়নাথ বলে—তুমি! এখনও কী করছিলে? কোথায় ছিলে?

—আপনাদের কাছেই ছিলাম। আহ, আলো নিভিয়ে দেবেন না।

প্রিয়নাথ আলো নেভায়। কুসুমকে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে মনে হয় যা কিছু দেখছে—কোনটাই বাস্তব নয়।

—দাঁড়ালেন কেন?

—তুমি চলে যাও, তারপর আমি যাব।

—পিছনে গেলে ভয় লাগবে বুঝি? কুসুম অস্ফুট হাসে।

—তোমাকে আমার ভয় লাগে না। বলে প্রিয়নাথ পা বাড়ায়।

—বাগানে দুজনে কী বলছিলেন শুনি?

—তুমি তো দেখেছ। ছবিগুলো দেখছিলাম।

—আপনি ছবিগুলো দেখেননি। বলুন তো কী কী দেখলেন? পারবেন না!

কুসুম, তুমি আমার পিছনে লেগেছ কেন?

—আপনার পিছনে ছায়া পড়েছে বাবু, তাই পিছুপিছু করছি।

—কাজলোমি রাখো।

—নতুনবাবু!

—বলো।

—স্বাধীনদিকে কেমন লাগল?

—ভালো। কেন?

—জামাইবাবুকে?

—খুব ভালো। কেন একথা জিগ্যেস করছ?

—আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনদি উঠোনে দাঁড়িয়ে আপনার কথা ভাবছেন! ভাবতে ভাবতে চাঁদের গায়ে আপনার চেহারা দেখছেন।

—বাঃ চমৎকার। আর জামাইবাবু?

—তিনি লেখাপড়া করছেন কিন্তু মন বসছে না। তিনিও আপনার কথা ভাবছেন। কাগজে আপনার নাম লিখছেন আর তারা কেটে দিচ্ছেন। তাতে মানুষের ক্ষতি করা হয়।

—শুনে খুশী হলাম, কুসুম।

—আপনারা যখন বাগানে ছিলেন, একটা গন্ধ পাননি, খুব মিষ্টি গন্ধ?

—হ্যাঁ, পাচ্ছিলাম।

—গন্ধটা আমি দিয়েছিলাম।

—তাই বুঝি? তুমি গন্ধ দিতে পারো?

—পারি। ওই গন্ধ শুঁকে আপনি স্বাধীনদিকে, স্বাধীনদি আপনাকে মনে মনে সবসময় খুঁজবেন। দুজনের চোখে ঘুম হবে না। একটু-আধটু হলে স্বপ্ন দেখবেন দুজনে দুজনকে। কোন কাজে মন বসবে না। সব খারাপ লাগবে। একদণ্ড কেউ কাউকে না দেখলে কথা না বললে থাকতে পারবেন না। খুব কষ্ট হবে মনে।

—ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছ তাহলে?

—প্রিয়নাথ কিছু ব্যঙ্গ ও কৌতুকে একথা বলেই পিছন ফেরে এবং কুসুমের জলজলে চোখ দুটো দেখতে পেয়ে চমকে যায়। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! এমন চোখ তো জন্তুদের দেখা যায়। সে আর তাকাতে পারে না। ফের পূর্ববৎ। জামাইবাবুর ভুরুর মধ্যে আঙুল ছুঁইয়ে অবশ করার কথাটা তার মনে পড়ে যায়।

—ঠাট্টা নয়। আমি দুজনের মধ্যে ভাব জন্মে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে একটা কাজও করেছি বাবু। জামাইবাবুর মাথায় ধোঁকা ঢুকিয়ে দিয়েছি। একটা গন্ধ পোকাকে বলেছিলাম, গন্ধ হ—হল। একটা কুচুটে পোকাকে বললাম জামাইবাবু হাই তুললে মুখে ঢোক—ঢুকে গেল। আপনাদের ভাব হল আর জামাইবাবুর মনে কু ঢুকল।

—তুমি অনেককিছু পারো তাহলে!

—পারি।

—বলতো মৃগাঙ্কবাবু এখন কোথায় কী করছেন?

—বহরমপুর থেকে বেরিয়েছেন। পাকা রাস্তায় ওনার গাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছি। খুব জোরে আসছেন।

—তোমাকে সরকারের লাখ টাকা মাইনে দিয়ে রাখা উচিত।

—বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা। দেখবেন পরে।

প্রিয়নাথ হঠাৎ দাঁড়ায়। ঘুরে বলে—তুমি জামাইবাবুকে আঙুল ছুঁয়ে অবশ করেছিলে শুনলাম। পারো আমাকে অবশ করতে?

—অবশ করবেন?

—হ্যাঁ।

—কষ্ট পাবেন।

—আমি পাবো। এসো দেখাও তোমার শক্তি।

কুসুম এগিয়ে এসে খুব কাছে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ডান হাতটা ম্যাজিশিয়ানের মতো তোলে। তারপর তর্জনীটা চাঁদের ওপর দিয়ে এনে তার ভুরুর মধ্যে রাখতেই প্রিয়নাথ তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ পায়। মুহূর্তে সে দিশাহারা হয়ে তাকে দুহাতে বুকে চেপে ধরে। কুসুম সেমিজ পরেনি টের পায় এবং তার কঠিন দুটি স্তন বুকে অনুভব করতে করতে সে তীব্র আবেগে ওর মুখের দিকে মুখ নিয়ে যায়। কুসুম এত জোরে তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে যে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেড়ে দেয় প্রিয়নাথ। কুসুম সরে যায় না। জ্যোৎস্নায় তার চোখ দুটো আরও জলজলে নীল দেখায় এবং দাঁতগুলো ঝকঝক করে ওঠে। সে ফের কামড়াতে আসছে ভেবে প্রিয়নাথ সাবধান হয়। কুসুম কি হাঁফাচ্ছে? সে বলে—আসুন! কী হল নতুনবাবু? পারবেন না?

ঠোঁটে হয়তো রক্ত। মুছে প্রিয়নাথ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তুমি কি কাঁচা মাংস খাও? রাক্ষসী কোথাকার!

কুসুম নিঃশব্দে হাসছে। তার দাঁতগুলো আরও ঝকঝক করছে। চোখের নীল আলো আরও জ্বলছে। চুলগুলো খুলে এলিয়ে কিছু বুকের দিকে কিছু পিঠে গিয়ে পড়েছে। প্রিয়নাথের এবার সেই পাটক্ষেতে যেমন হয়েছিল, একটা চাপা আতঙ্ক গুরগুর করে ওঠে মনে। সে দেখে কুসুম ওইভাবে দাঁড়িয়ে এবার একটু একটু দুলছে—শরীরের উপর দিকটা শুধু। তারপর মাথাটাও দুলতে লাগল। তারপর আরও জোরে শুরু হল দোলা। চুলগুলো এদিকওদিক জ্যোৎস্নায় ছলকে পড়তে থাকল। প্রিয়নাথ ভয়ে এদিকওদিক তাকায়। কোথাও কোন মানুষ নেই। রাস্তার ওপর গাছের ছায়াগুলোও দুলছে। দূরে কোথাও গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে গাড়োয়ানের গান।

হঠাৎ কুসুম পড়ে গেল ঠাণ্ডা ভিজে ঘাসের ওপর। হাত পার খেঁচুনি হল একটুখানি। এই সময় তার কোলের কাছ থেকে একটা পুঁটুলি ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর টানটান শরীর ধনুকের মতো বেঁকে চিত হয়ে গেল। কিন্তু জলজলে নীল চোখ আর শব্দহীন হাসি রয়ে গেল যেমন ছিল। তারপর প্রিয়নাথের মনে হল, সে কিছু বলছে—চাপা বিড়বিড় অস্পষ্ট কী সব কথা। পালাতে পারল না প্রিয়নাথ। ভয় পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার জেদ তাকে নড়তে দিল না। সে ঝুঁকে পড়ল। ডাকল—কুসুম, কুসুম! এই কুসুম!

কুসুম অস্ফুট বলতে থাকে—তুই অপেয়ে, লক্ষ্মীছাড়া, হাভাতে। তোকে গন্ধপোকার গন্ধ দিলাম। তুই আমাকে চিনলি না। তুই চলে যা দেশ ছেড়ে। তোর জন্যে আকাল লাগবে দেশে। বিষ্টি হবে না। নদীর জল শুকিয়ে যাবে। মড়ক লাগবে। পেঁচা ডাকবে। শেয়াল শকুন মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। কালিখোর ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান গাইবে। তুই যা, চলে যা। দূর দূর দূর! যা—যা!

কী একটা কষ্টের ঢেউ বুক থেকে ঠেলে ওঠে প্রিয়নাথের। সে ডাকে—কুসুম, কুসুম! এই কুসুম!

সেই সময় বাঁকের মুখ থেকে তীব্র আলো আসতে থাকে। মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা যায়। প্রিয়নাথ স্যাৎ করে উঠে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক নয় তো? ভাবতেই কুসুমের কথাটা মনে পড়ে যায়। সে নিসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

মোটরসাইকেলটা কাছে এসেই দাঁড়ায়।—প্রিয়বাবু! ওকি? কুসমি না? কী ব্যাপার?

—জামাইবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম। ফেরার পথে দেখি এভাবে পড়ে আছে।

—মাসীর মৃগীরোগী আছে। চলে আসুন। থাকে বসুনে। ফিরতে দেরী হল—যা ঝামেলা লেগেছে।

প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করে। —কিন্তু ও এমনভাবে......

—হারামজাদীর ঢং। কী মতলব আছে। চলুন আসুন তো মশাই।

॥ তিন ॥

সেরাত্তে ভালো ঘুম হয়নি প্রিয়নাথের। শুধু মনে হচ্ছিল, ওভাবে কুসুমকে ফেলে চলে আসা ঠিক হয়নি।

ফার্মের নৈঋত কোণে যে গাব গাছটা আছে, শেষরাতে ঘুম ও জেগে থাকার কুয়াশাময় আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রিয়নাথ যেন শুনছিল ডাকিনীটা চেরা গলায় কী বলতে চেষ্টা করছে— কাঁপা কাঁপা সুর, গোক্ষুরসাপের ডাকের মতো গভীর।

সকালে প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে শুধিয়েছিল—কাল কিসের শব্দ হচ্ছিল বলুন তো, কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজটা...

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল—পাখিটাখি হবে।

কিন্তু কুসুমের তেমন কিছুই ঘটেনি তা পরে জানতে পারল। ঘাটের মাচায় বসে গগন হালদারের মুখে শুনল কুসুম রেজলাপাড়ার হাটে গেছে। মাথায় শাকসব্জীর ঝাঁকা ছিল। পরনে নতুন কোরা শাড়ি—তার পাড় ডগমগে লাল। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ছিল বড়। সকালে ভৈরবে চান করেছিল। ভিজে চুল এলিয়ে দু-মাইল দূরের হাটে বসতে গেছে সে।

কয়েকটা দিন চৈতালীর জন্যে ফার্মে ব্যস্ততা চলেছে। বিকেলেও মৃগাঙ্কের সঙ্গে জমিতে নামে প্রিয়নাথ। শস্য বোনা হয়েছিল সারের জন্যে। সব উল্টে দেওয়া হয়েছিল। পচধরা ভুটভুটে মাটি শুকিয়ে এসেছে। মাটি পরখ করা হচ্ছে প্রতিদিন। মজুর-মজুরনীরা মাষকলাই তুলছে। ভুট্টার গাছগুলো সাদা হয়ে রয়েছে। এক ট্রাক ভুট্টা চালান গেছে কদিন আগে। শুকনো গাছগুলো কাটা হচ্ছে। ক্যাতকেলথ, নামক ধান হার্ভেস্টার কম্বাইনে কেটে মাড়াই করা হল। এসব নিয়ে প্রিয়নাথ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মনে সেই গন্ধপোকার গন্ধ। মন মউমউ করে।

এক সন্ধ্যায় আর পারে না সে। সোজা চাষীপাড়া চলে যায়। চাঁদ উঠতে দেরী আছে অনেক। ধোঁওয়া আর কুয়াশায় পাড়ার আকাশ ঘন নীল হয়ে রয়েছে। দাতিবেরকরা ছোট ছোট কুঁড়েঘর সব। হতশ্রী। খড় তালপাতা বা কোড়াপাতার চাল। দেয়াল পাটকাঠির—ওপরে মাটির চাবড়া আছে। ঝগড়াঝাটি বেলায় বেলায় ভীষণ হয় এ পাড়ায় গগন বলেছিল। বলেছিল এক হাজার শাকচুন্নী আর ডাকিনীর বাসা। চিল শকুন ওড়ে সব সময়। সেটা ঠিক। সুর ধরে গালা দিচ্ছে কে কাকে, নেচে নেচে খোট্টাই ভাষায় খিস্তি করছে। পুরুষগুলোর পাত্তা নেই। হয়তো এখনও গাঁওয়াল সেরে আসেনি।

প্রিয়নাথকে কেউ গ্রাহ্যও করে না। আজকাল এমন মানুষ সবখানে দেখে দেখে চোখ ভোঁতা হয়ে গেছে। একটা কমবয়সী মেয়েকে জিগ্যেস করলে সে বলল—ঘাটকা পাশ। হুই থাকে তলায়ে—হুই ঘরঠো।

গেল না সঙ্গে। কুসুম একঘরে প্রিয়নাথ শুনেছে। তার আগুনজলী বদ্য। কিন্তু আজকাল এ দিয়ে কেউ জব্দ হয় না সবাই জানে। প্রিয়নাথ একটা পোড়ো জমি, ঝোপঝাড় আর একটা সব্জী-ক্ষেতের আল দিয়ে পাটকাঠির বেড়ার-ঘেরা বাড়িটিতে পৌঁছয়। এদেশে এত গাবগাছ কেন গজায়, কে জানে। গাবগাছটা উঠোনের কোণায়। বিশাল আর অন্ধকার। নির্জন খাঁ খাঁ চারদিক। আলো কমে গেছে দিনের। বেগুনক্ষেতে একটা মড়ার খুলি লাঠিতে আটকানো দেখছিল। বেড়ার একখানে আগড়। কাটার আগড়। এবং চমকে উঠে প্রিয়নাথ দেখল আগড়ের মাথাতেও একটা মড়ার খুলি। উঠোনটা ঝকঝক করছে। দুধারে লঙ্কাগাছে লঙ্কার লাল টুকটুকে রং এখনও মোছেনি অন্ধকার। শশা লাউ ইত্যাদির মাচান এবং মড়ার খুলি। আর অনেক ফুলের গাছ। জবা, যূঁই টগর, কাঠমল্লিকা—নানারকম। তারপর উঁচু ছোট্ট দাওয়া—দাওয়ার পিছনে পরিচ্ছন্ন ঘরের দেওয়ালে কী সব আঁকা রয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করে ডাকতে। ঘরে কোন আলো নেই, বাইরেও নেই। কুসুম আছে তো? সে ভাবল, গগনকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। কে কী ভাববে হয়তো।

হঠাৎ কানে এল গুনগুন করে কে গেয়ে উঠেছে—

সাঁঝ দে লো সনকোমণি
সাঁঝ বইয়া যায় গে...
সাঁঝ দে লো ॥

সুরটা অদ্ভুত—খুব পাড়াগেঁয়ে খুবই পুরনো, রহস্যময়। কারণ, এ যেন অন্ধকারের গান অন্ধকার ছাড়া এ মানায় না অর্থবহ হয় না। গাবগাছের ওপরে প্যাঁচা ডেকে উঠল ক্যাঁও ক্যাঁও ক্যাঁও! কতকগুলো জোনাকি জ্বলে উঠল ঝোপেঝাড়ে। পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল। তারপর খস করে দেশলাই জ্বলল গাবতলায়। হ্যাঁ, কুসুম। হেঁট হয়ে একটা পিদিম জ্বালছে।

জেনলে করজোড়ে প্রণাম করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'এই মা গো মা!' বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে প্রায় লাফ দিয়ে ফাঁকা উঠানে চলে এল।

প্রিয়নাথ তখনও চুপ। সে ভাবছিল, কুসুমের ব্যাপারগুলো কি সত্যি লোক-দেখানো, ধোঁকাবাজী, রোজগারের ধান্দা? আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু একটা নিয়ে ও আছে এটা ঠিকই। সে কাস্‌ব ভাবল পারল না। কুসুমকে চমকে দিতে ইচ্ছে করছিল না তার।

তারপর সে দেখে, কুসুম হন হন করে আগড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়াল। তখন প্রিয়নাথ দেখল তার হাতে একটা বাঁকা-মতো কী রয়েছে। কাটারি!

—ও! নতুনবাবু! আমি ভাবলাম... আসুন। বলে সে কাটারি জটিল আগড়টা সরাল।

প্রিয়নাথ ঢুকলে সে আগড়টা বন্ধ করল। প্রিয়নাথ বলল—থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। সেরাতে তোমাকে অমনভাবে রাস্তায় ফেলে চলে আসতে হল। তুমি কি রাগ করেছিলে?

কুসুম কিছু জবাব না দিয়ে দাওয়ায় একটা চটের আসন বিছিয়ে দিল।—বসুন নতুনবাবু।

—কুসুম আলো জ্বালবে না?

—আলো আমার ভাল্লাগে না।

—কুসুম!

কুসুম দরজার কাছে সবু থাপটায় বসল। —উঁ?

—সেরাতে...

—তাই বলতে এসেছেন নাকি? আমার অমন হয়। ছোটলোকের মেয়েরা সব পারে, তা জানেন না? কুসুম একটু হাসে।

—এখন তো চমৎকার কথা বলছ দেখি। মাঝে মাঝে অমন পাগলামি কেন করো কুসুম?

কুসুম তারও জবাব দেয় না। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—একটা সিগ্রেট দিন না, টিনি।

—খাও তুমি?

—মাঝে মাঝে।

প্রিয়নাথ সিগ্রেট দেয় ওকে। কুসুম তার বুকের কাছ থেকে দেশলাই বের করে বলে—আপনি খাবেন না? থামুন, দেশলাই আছে—জেলে দিই।

প্রিয়নাথেরটা জেলে দেয়। তখন প্রিয়নাথ তার মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই কুসুম হাসে। এত সুন্দর লাগে ওকে! এ কি ভালবাসা, না নিতান্ত কাম? প্রিয়নাথ অন্যমনা হয়ে পড়ে।

কুসুম সিগ্রেট টেনে বলে—সিগ্রেট আমি ভালবাসি।

—কুসুম, তোমার সেই কথপোকা তো কোন কাজ দিল না। আমি স্বাধীনকে বা স্বাধীন আমাকে পাবার জন্যে মোটেও ছটফট করছে না!... প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে কথাটা।

—সেজন্যেই এলেন নাকি?

—ধরো, তাই।

—কাজ হল না বলছেন?

—উঁহু।

—তাহলে আমার আর কিছু করার নাই, নতুনবাবু।

এমনভাবে কুসুম একথা বলে যে প্রিয়নাথ চমকে তার দিকে তাকায়। অন্ধকার দাওয়া। মশা কামড়াচ্ছে। শুধু সিগ্রেটের আগুন ছাড়া আলো নেই। কিন্তু কোথায় গেল ওর সেই জ্বলজ্বলে নীল তীব্র চোখ দুটো? সেই অমানুষী ডাকিনী হাবভাব একটুও নেই কেন?

প্রিয়নাথ বলে—বোঝা গেল তোমার ক্ষমতার দৌড়!

কদিন থেকে আমার মন ভালো নাই, ওকথা ছেড়ে দিন।

—কেন মন ভালো নয়? কী হয়েছে শুনি?

—বাণমারা কী, জানেন?

—শুনেছি।

—কেউ আমাকে বগাবাণ মেরেছে।

—বগাবাণ! সে আবার কী?

—দুরকম বাণ আছে: বগাবাণ, বগীবাণ। বগাবাণ মারলে পাল্টা বগীবাণ মারতে হয়। আচ্ছা নতুনবাবু, সেরাতে রাস্তায় যখন আমাকে ধরলেন, মাথার ওপর কী ঘারেকাছে সাদা বক দেখছিলেন?

—লক্ষ্য করি নি।

—আমার পরে মনে হয়েছে, আপনি যখন আমাকে চেপে ধরলেন, মাথার ওপর বক উড়ে গেল!

—আবার তুমি হেঁয়ালি করছ কুসুম!

—না নতুনবাবু। আমি...আমি কদিন থেকে অবশ হয়ে আছি। মাথা ঘোরে, ঝিমঝিম লাগে, কিছু ভাল্লাগে না!

—তোমাকে কি কেউ কোনদিন ধরে ফেলেনি কুসুম—আমার মতো? মিথ্যে বলো না।

—হুঁউ, মিথ্যে কেন বলব? গরীব-গুরবো মেয়ে—পেটের দায়ে বনবাদাড়ে যাই, হাটেমাঠে যাই। বাগে পেয়ে অনেকে ধরতে এসেছে—ধরেছেও। পারে নি। আমার জোর আছে। কিন্তু কেউ আমাকে ছুঁতে পারে নি। আমাকে আপনি এঁটো করে দিয়েছেন যে! আমার এঁটো হওয়া বারণ।...কুসুম অস্পষ্ট শব্দে হাসে।

—কুসুম, আমি হয়তো তোমাকে...

—হুঁ, বলুন।

—আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

—ওকথা অনেক বাবু অনেকবার বলেছে আমাকে। আমার শরীরটা ওদের খুব পছন্দ—তা বুঝতে পারি। আমি লেখাপড়া জানি না, ছোটলোক জাত। তবু বুঝি সব। আমার আরেকটা চোখ আছে। কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। ক্ষিদে পেলে সবাই যা পায়, খায়। কিন্তু বাবুরা সখ করে বনের ফল পেড়ে খেতে চায়। কোন ফল দেখতে সুন্দর, বনে ফলে—কিন্তু বিষের কোয়ায় ভরা।

—বাঃ, তুমি এখন কত ভালো কথা বলছ কুসুম। কিন্তু মাঝে মাঝে ওসব এলোমেলো বকো কেন?

—কী বকি?

—আমি অপয়া। আমার জন্মের সময় কী সব ডেকেছিল...

—আমি বলি?

—হ্যাঁ। মনে পড়ছে না বুঝি?

—কে জানে! শিকারে বেরিয়ে সাপ সামনে ছায়া পড়লেও দংশায়!

—তুমি তখন শিকারে বেরিয়েছিলে তাহলে? কী শিকার? সেদিন পাটক্ষেতে—তারপর রাতে রাস্তার ওপর—...

—মাঝে মাঝে আমার কেমন হয়। আর কী বলব?

—কুসুম?

—উঁ?

—তুমি এখানে একা থাকো! এমনি করে চিরকাল একা থেকে যাবে? ভালো লাগে?

—বাঁজা ডাঙায় কাঁকর ছাড়া কিছু কি ফলে নতুনবাবু?

—ড্যাট! তুমি অত ভালো মেয়ে!

—পাথরে জল শোষে না, তা জানেন তো? আমি পাথর।

—কেন?

—আমাকে জ্বালাবেন না। অন্য কথা বলুন। চা খান তো বলুন, করে দিই। দুধ চিনি চা সব আছে ঘরে। আমি চা না খেয়ে থাকতে পারি না। আমি গেলেই স্বাধীনদি বড়ো গেলাসের এক গেলাস চা করে খাওয়ায়। ওই একজনই আমাকে সত্যি করে ভালবাসে। ...বলে কুসুম ওঠে।

—থাক। চা খাবো না। তুমি বসো।

কুসুম বসে পড়ে।

—তোমার মায়ের কথা বলো।

—হঠাৎ ওকথা কেন শুনি?

—তোমার মায়ের সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনেছি।

—হুঁ, শুনবেন। মা ডাকাতের দল করেছিল। জেল খেটেছিল। সেসব তো মিথ্যে নয়। মা বউরূপী সাজত। মা ডাইনী ছিল—কাঁচ ছেলের রক্ত চুষে খেত। সেও মিথ্যে নয়। মায়ের কাছে

কী সব ছিল। আমাকে কিছু কিছু দিয়ে গেছে মা।

—কী সেগুলো?

—অত বুঝিয়ে বলতে পারিনে। ওই গাবগাছটার তলায় সেজন্যেই তো সাঁঝ জ্বালি।

—আচ্ছা কুসুম, তোমার মায়ের মড়া কেউ ফেলেনি। তুমি নাকি পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে...

হঠাৎ কুসুম দুহাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল। প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত। কী বলবে, ভেবে পায় না।

একটু পরে সে হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ছোঁয়। —কুসুম, কুসুম!

কুসুম মুখ তোলে। আঁচলে চোখ ও নাক মোছে। তারপর বলে—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

—চলে যাব, বলছ?

—হ্যাঁ। লোকে দুষবে আপনাকে।

—আমি পরোয়া করিনে, কুসুম। আমি এক ছন্নছাড়া মানুষ। সংসার করিনে যে ভয় পাব। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমি অপয়া, লক্ষ্মীছাড়া, হাভেতে। সেজন্যেই তো মরীয়া হতে পারি। তুমি ভেবো না।

একদমে কথাগুলো বলে প্রিয়নাথ টের পায়, সেদিনের মতো শুধু নাকেই শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে তার। তখন সে একটু হাঁ করে বাতাস ভরে নিতে থাকে।

কুসুম বলে—একটা ছোটলোকের মেয়ের মধ্যে এত কী পেলেন নতুন-বাবু? মনটা বেঁধে রাখতে এত সাধ কেন তার কাছে?

—জানি কিংবা জানি না।

—আপনাকে স্বাধীনদি খুব ভালবাসে। বিশ্বাস করুন। সব সময় আপনার কথা বলে। আমি বুঝতে পারি। আপনি তার সঙ্গে ভাব করুন না! খুব সুখ পাবেন!...অস্ফুট হাসে সে।

—সুখ! কী আছে সুখে?...বলে ফের সিগ্রেট বের করে প্রিয়নাথ।—তুমি আর খাবে?

—না। আপনি খান। আমি জেবলে দেব?

—দাও।

সিগ্রেটটা জেবলে দিয়ে কাঠিটা মেঝেয় ঘষে নেভায় কুসুম। তারপর বলে—আপনি মদ খান না?

—একটু আধটু। কেন?

—খাবেন?

প্রিয়নাথ অবাক হয়। —তুমি কোথায় পাবে মদ? খাও নাকি তুমি?

—আপনার মতোই একটু আধটু খাই।

—বল কী!

—ছোটলোকের মেয়ে তাড়িমদ খাবে না? এদেশে সবাই খায়। পরবের সময় তো তাড়িই আমাদের খাবার। তবে মদ আমি নিজে তৈরী করি। চাল কলা গুড় লাগে। এক বোতল হলেই আমার মাস চলে যায়। বেশি তো খাই নে। আমাদের খেতে হয়—নিয়ম আছে। মা শিখিয়ে-ছিল। খাবেন? দেব?

—দাও।

কুসুম উঠে ঘরে ঢোকে। দেশলাই জ্বালে। একটা লম্ফ জ্বলে ওঠে। ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পায় না প্রিয়নাথ। একটু পরে কুসুম ফুঁ দিয়ে লম্ফ নিবিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা বোতল তার হাতে আবছা দেখা যায়। একটা কাচের গেলাস সামনে রাখে সে। তারপর কিছু ঢেলে দিয়ে বলে—খান। সুপুরি আছে, দেব। আমি সুপুরি মুখে না দিলে পারিনে।

প্রিয়নাথ গেলাসটা তুলে গন্ধ শোঁকে আগে। দিশী মদ। উৎকট ঝাঁঝ। খুব জোরালো জিনিস তা সে বুঝতে পারে। একটু ইতস্ততঃ করে গলায় ঢেলে দেয়।

—কেমন বলুন তো? ভালো জিনিস না?

—তোমার হাতের জিনিস। অমৃত ছাড়া কী হবে?

—সুপুরি নিন।

হাত বাড়িয়ে সুপুরি নিতে গিয়ে কুসুমের হাতটা সে ধরে।—কুসুম, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

কুসুম খিলখিল করে হাসে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ভালবাসার চেষ্টা করলেই আমার জ্বর উঠবে। জ্বর পেয়ে যাবেন। ওকথা থাক, নতুনবাবু।

প্রিয়নাথ বলে—আরও খেতে ইচ্ছে করছে।

—খান। কিন্তু মানী মানুষ—নতুন মানুষ। নিজের মান রেখে চলবেন, সাবধান।

—হ্যাঁ! সে তুমি ভেবো না। এত-টুকুতে কিছু হয় না আমার।

কুসুম আরও খানিকটা ঢেলে দিয়ে বলে—কিন্তু এ জিনিস খুব সহজ নয়। সামলাতে পারবেন না। এর বেশি আমি আপনাকে দেবও না। নিন।

প্রিয়নাথ খায়। সিগ্রেটটা জোরে জোরে টানে। এত অল্পে এত শিগগির নেশা ধরে গেল। কী আছে ওতে? সাংঘাতিক কিছু নেই তো? সে একটু অস্বস্তিতে পড়ল। হ্যাঁ, নেশাটা বেশ তেজী মনে হচ্ছে। আফসোস হল, ঝোঁকের মাথায় না খেলেও পারত।

—বাবু, ও নতুনবাবু? কী ভাবছেন গো?

—তোমার কথা।

—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কুসুম খালি? ঘর কথা ভাববার, তাকে ভাবুন।

—কুসুম, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—যেখানে খুশি। আমি তোমাকে ভালবাসি কুসুম!

—আপনার নেশা হয়েছে! চলে যান।

—কুসুম!...ওর দিকে হাত বাড়ায় প্রিয়নাথ।

কুসুম দ্রুত সরে বসে। ওর কণ্ঠ-স্বরে একটা আতঙ্ক আছে মনে হয়। ও বলে—বাবু, নতুনবাবু! দোহাই আপনার—আপনি ওসব কথা বলবেন না? সে অসছে! গাবগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন! না—না, ছোঁবেন না আমাকে, ছোঁবেন না।

প্রিয়নাথ চাপা গর্জায়। —ওসব আমি মানিনে!

আর সেই মুহূর্তে গাছের পাতায় সর সর আওয়াজ হতে থাকে। প্যাঁচাটা ফের ডেকে ওঠে ক্যাঁও ক্যাঁও ক্যাঁও! হঠাৎ কী হয়, গাবতলার পিদীমটাও নিভে যায় দপ করে। নদীর ধারে খুব কাছে শেয়াল কিংবা কোন জানোয়ার চেঁচায়—আ উ উ-উ! জোনাকিগুলো ছোটাছুটি শুরু করে ঝোপঝাড়ে।

কুসুম হাঁসফাঁস করে বলে—পালান, আপনি পালান!

সেই সময় বেড়ার বাইরে একটা লম্ফ হাতে কে এসে ডাকতে থাকে—কুসমি, ও কুসমি গে! তেরা ছাগলঠো ছুটি গেইলা গে, সব বিনাশ কারলে।... দেখ্ গে বেটিয়া!

প্রিয়নাথ অবশ হয়ে খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে। সোজা হয়ে বসে। কুসুম লাফ দিয়ে নেমে যায়। —কোন গে? সরলা-মাসি?

—হাঁ বেটিয়া, দেখ্ না ইধার!

—মেরা ছাগল নেহী মাসি। বাঁধকে রাখা গোহিলমে।

—সাচ?

—তেরা কিরিয়া মাসি।

—তো ফির দেখ্ গে, ভাগ্‌সে গিয়া গাদুম...

—আরী নেহী মাসি! তেরা চোখ অন্ধা। যা যা, ঘর চলা যা। উও লোক্ না, চিল্লাইসে।

—চিল্লাইসে? কাঁহা রী?

—তু কানমে ভি কালা। যা যা, ঘর যা, ভাগ্!

বুড়ি হাড়াগিলের মতো লম্ফ হাতে চলে যায়। কাকে গাল দিতে দিতে যায়। কুসুম উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ তুলে নক্ষত্র দেখে হয়তো। প্রিয়নাথ টলতে টলতে নামে দাওয়া থেকে। সত্যি, প্রচণ্ড নেশা হয়েছে। এতটুকু মদে এমন অবস্থা হয়ে গেল? সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ভারি গলায় বলে—তুমি কী খাওয়ালে কুসুম? মনে হচ্ছে, শুধু মদ নয়—আরও কিছু মিশিয়েছ। মদে তো এমন লাগে না।

—আপনার শরীর খারাপ করছে?

—গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে।

—জল খাবেন?

—তোমার হাতে জল খেতে ইচ্ছে করছে না আর। তুমি কী খাওয়ালে আমাকে?

—বিষ! বলে চাপা হাসে কুসুম।

—বিষ! আঁতকে ওঠে প্রিয়নাথ।

—বিশ্বাস করতে পারছেন না তো কী বলব?

প্রিয়নাথ অন্ধকারে ওর মুখ দেখার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরছে, অজস্র শব্দ নিজ্ঞা ঠিকরে পড়ছে যেন, সব জ্বলো মনে হচ্ছে। তাকে কী খাওয়াল কুসুম? সে স্থির থাকবার চেষ্টা করে।

—যেতে পারবেন না মনে হচ্ছে? তাহলে খানিক শুয়ে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা প্রিয়নাথের সঙ্গত মনে হয়। সে টলতে টলতে ফের দাওয়ায় চলে যায়। মেঝেতেই শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে।

একটু পরে কুসুমের সাড়া পায়। —কই জল খান। হাঁ করুন, ঢেলে দিচ্ছি।

শিশুর মতো হাঁ করে প্রিয়নাথ। জল খেতে গিয়ে উঠে বসে। কাসে।

তারপর 'থাক, আর না' বলে শুয়ে পড়ে।

এইবার প্রিয়নাথের মনে হয়, সে শূন্যে ভাসছে। তার চারপাশে নক্ষত্র। পালে পালে রঙীন মেঘ—লাল নীল হলুদ সবুজ, এসে তাকে ঘেরে। মেঘ কখনও সবুজ হয়? মেঘগুলো সরে যায়। একটা লম্বা ছড়ানো ডালপালা-ওলা শুকনো মরা গাছ শূন্যে দাঁড়ানো দেখতে পায়। তার ডালে বসেছে কুসুম, হাসছে, এলোমেলো চুল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে বোবাধরা গলায় চেঁচায় সে। পালাতে পারে না। আবার লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘগুলো এসে পড়ে। না, মেঘ নয়। গগন হালদারের জাল। গগন ভয়ঙ্কর চেহারায় কিছু বলছে। —হালদারমশাই, হালদার-মশাই, আমি এখানে! প্রিয়নাথ চেঁচায়। জিভ জড়িয়ে যায়। হাড়গিলে লম্ফ হাতে বুড়ি ধরিত্রী! ধরিত্রী এসে বলতে থাকে চেনা গলায়—এই নে বাদুড়ের নখ আর প্যাঁচার ঠোঁট আর ভালুকের রোঁয়া! এই নে টিকটিকির লেজ আর সাপের চোখ আর কাকলাশের ঠ্যাঙ! তোকে আমার সব দিলাম। তুই কী দিবি শুনি বাছা? ধরিত্রী একথা বলে এগোয় আর বলে—দিবি না? দিবি না? তোর চোখ গেলে দেব। তোর রক্ত শুষে খাব। তোর নাড়িভুঁড়ি খামচে বের করব। প্রিয়নাথ গোঁ গোঁ করে।...

কখন একবার প্রিয়নাথ শোনে, নিমগলায় চাপাস্বরে কে খুব কাছে গান করছে। কী মিষ্টি সুর।

পুব থেকো ডাকিনী এসো
বসল গাছের ডালে
অবেলাতে ডাকে কাগা (কাক)
কী আছে কপালে।।
উখুসুখু (রুক্ষশুষ্ক) মাটি ফাটে
মাঠে নাইকো ধান
নদীতে জল নাইকো মা গো
কুথায় করব চান।।
সাঁঝ দে লো সনঝেমাণ...

প্রিয়নাথ হাত বাড়ায়—হাতড়ায়।

—কুসম কুসুম! শিয়রে নরম কিসে হাত পড়ে। হাতটা সরিয়ে নেয় না। রাখে সেই নরম জিনিসটার ওপরে। কেউ সরিয়ে দেয় না। গানটা কানে আসে একটানা।...সাঁঝ দে লো সনঝেমাণ সাঁঝ বইয়া যায় গো...

আবার শূন্যে ভেসে যায় প্রিয়নাথ। লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘ। শুকনো গাছটা।

মধ্যে আরেকবার টের পেয়েছিল, তাকে কে বা কারা ধরাধরি শূন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে হাতপা ছোড়া-ছুড়ি করেছিল। বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল। কারা সব কথা বলছিল। একবার কী একটা শব্দ হয়েছিল প্রচণ্ড—বন্দুকের আওয়াজ? মৃগাঙ্ক বলছিল—ছেনাল কুত্তীন, খানকী!

মৃগাঙ্কই কি? আবার ... পথ সব ছেড়ে রঙীন মেঘের মধ্যে চলে গিয়েছিল ছেঁড়া শুকনো পাতার মতো।..

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে প্রিয়নাথ দেখে, সে তার বিছানায় শুয়ে আছে। পাশের বিছানায় বসে মৃগাঙ্ক গেলাসে চা খাচ্ছে। তাকে তাকাতে দেখে সে হেসে বলে—উঠে পড়ুন। আবার কী!

ঘড়ি খোঁজে সময় দেখবার জন্যে—হাতে বেঁধেই শোয় প্রিয়নাথ। না দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু কী অবশ শরীর! মগজ নেই মনে হয়। সে হেলান দেয়। বাইরে তাকায়। কার্তিকের উজ্জ্বল রোদে কজন মেয়ে মাঝকলাই ঝাড়ছে কুলো দিয়ে।

মৃগাঙ্ক বলে—ঘড়ি খুলে রেখেছি। উঠতে পারবেন না? কী মনে হচ্ছে?

—পারব। বলে প্রিয়নাথ সাবধানে পা দুটো বিছানা থেকে নিচে নামায়। চটি খোঁজে।

—নাড়ু ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। এসে যাবেখন।

প্রিয়নাথ সপ্রশ্ন তাকায়।

মৃগাঙ্ক ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে এবং হেসে বলে—আর মেয়ে পেলেন না দেশে, ওই হারামজাদীর বাড়ি গেলেন? ছুট্! দেশঘোরা এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ মশাই আপনি! অমনি করে যারতার কাছে মালটাল খায়? আজকাল কত মাতাল মারা পড়ছে, কাগজে পড়েন না? ছুট্ ছুট্! আপনাকে অত করে বললুম সেদিন, মেয়েটা ভালো নয়। ওর মধ্যে মার্ডার ম্যানিয়া আছে। ওর চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় তা। কী? পারবেন—নাকি ডাকব কাকেও?

প্রিয়নাথ টলতে টলতে বেরোয়। মৃগাঙ্ক ওঠে না। ডাকে—নবীন, নবীন! তোদের বাবুকে ধর্। বাইরে জল রেখে-ছিস তো? পেস্টফেস্ট নিয়ে যাস।

নবীন দৌড়ে এসে প্রিয়নাথকে সাহায্য করতে হাত বাড়ায়। প্রিয়নাথ বলে—থাক।

ল্যাট্রিনটা সামান্য দূরে। সেদিকে যেতে যেতে সে একটা হরগৌরীর গাছের কাছে একবার দাঁড়ায়। দিগন্তঅব্দি মাঠের পারে কুয়াসা। এখনও জমে রয়েছে। আকাশ শূন্য ঘন নীল। কিছু শকুন উড়ছে অনেকটা উঁচুতে। একটা প্লেন যাচ্ছে—আবছা আওয়াজ কানে আসে। অড়হরের ক্ষেতের পাশে কয়েকটা গরু চরছে। শনের ক্ষেতে হলুদ ফুল ধরেছে থরে থরে। এতদূরে থেকেও প্রজাপতি ওড়া দেখা যায়। একটি বাচ্চা মেয়ে শনফুল তুলছে। শনফুল খায় লোকে। প্রিয়নাথও খেয়েছে সেদিন। একটু পরে সে টের পেল, মনের ব্যালান্সটা নেই।

ল্যাট্রিনে অনেকক্ষণ অকারণ থাকার পর সে বেরিয়ে এল। উঁচু বারান্দায় বসে

পুরুষ ও নারীর অভিনব ঔষধে রোগ

আরোগ্য

একজিমা, সোরাইসিস, বাতরক্ত, শ্বেত-চর্ম, শরীরের নানা রঙের দাগ, স্পর্শ-শক্তিশূন্যতা প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের অব্যর্থ নূতন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে শত শত রোগী রোগমুক্ত হইয়া নবজীবন ফিরিয়া পাইতেছেন। পত্রে অথবা সাক্ষাতে বিবরণ জানুন। এবং আপনিও রোগ-মুক্ত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা :
পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট,
হাওড়া—৭১১১০১
শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০০০৯
হ্যারিসন রোড, পূরবী সিনেমার পাশে

দাঁতে ব্রাশ করতে থাকল। তখন গগন হালদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিজয়েন্দু এল। গগন নিচে সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকল। বিজয়েন্দু উঠে গেল বারান্দায়। ঘর থেকে মৃগাঙ্ক বলল—এস মাস্টার।

বিজয়েন্দু শ্যালকের দিকে মিষ্টি হেসে প্রিয়নাথের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার মশাই? চারদিক তো ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে। আমি—

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—কিসের?

গগন বলে—এ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন। একটুকুতেই তিলটি তাল হয়। কুসমি নতুনবাবুকে তুক করতে গিয়ে মেরে ফেলার দাখিল করেছে নাকি!...গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।...আর বলবেন না! সেই রাতদুপুরে মিগাংবাবু গিয়ে আমাকে বিছানা থেকে ওঠাল। তারপরে তো কুসমির বাড়ি গেলাম। টর্চের আলো পড়তেই দেখি, কুসমি আপনার মাথার কাছে বসে শকুন-টকুনের ডানা বুলোচ্ছে আপনার কপালে। মিংগাবাবু যেই ডেকেছে আপনার নাম ধরে, মেয়েটা লাফিয়ে ঘরের পিছন দিয়ে বেড়া টপকে পালাল। আমরা গিয়ে দেখি, আপনি অজ্ঞান। চোখের তারা থির। গোঁ গোঁ করছেন, কষায় ফেনা জমেছে। তা, মিগাংবাবু থানায় খবর দিতে যাচ্ছিলেন। বলেকয়ে থামালাম। ও লাইন আমার তো ভালো জানা আছে! যদে একরকম শেকড় বাটা দেয়। খুব বড়ো মাতাল ছাড়া তা সামলানোর সাধ্যি কারো নাই। ধরিত্রীর অমলে আমিও তো খেয়েছি মশাই—বিষফিষ না। তুকতাকও নয়। তবে বেভাম (বিভ্রম) লেগে যায় বটে। কতরকম আজগুবি ওলটপালট দেখা যায়। ও কিছু না। সরষের তেল মেখে বসে চান করুন, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমোন। ও বেলায় ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বিজয়েন্দুর দিকে মুখ তুলে গগন বলে—মেয়েটা মিগাংবাবুকে যমের মতো ডরায়। হয়তো এখন একটানা দুটো দিন বাড়িই ঢুকবে না ভয়ে। ওপারে বন-জঙ্গলে কাটাবে!

মৃগাঙ্ক বলে—হালদারমশাই থাকতে ওর ভাবনা? খানিক পরেই দেখা যাবে, হালদারমশাই গিয়ে ছুঁড়ির ছাগলটাগল বের করছে। নদীর ধারে খুঁটি পুঁতে চরতে দিচ্ছে।

গগন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—কপাত হয় বাবা, করতে হয় ওটা। আপনারা একালের ছেলেছোকরা মানুষ, অনেক জিনিস বোঝেন না। আর কটা দিনই বা বাঁচব—করে যাই।

[illegible] হালদারমশাই, ধরিত্রী [illegible] গেল—বাবা তার মেয়েকে [illegible]. তুমি নাওনি [illegible] মৃগাঙ্ক [illegible] বলে কথাটা। [illegible]

সন্তানের মা বেঁচেছিল তো। জালের খোঁটো দিয়ে পেটাত। হাড়গোড় ভেঙে দিত!

—না, না। অসুবিধে ছিল অন্যরকম। মানাবর মণ্ডল বেঁচে থাকলে বলত আমিও কুসমিকে খোরাকপত্তর দিয়েছি কি না। পুজোয় জামাকাপড় দিয়েছি কি না।

মুখ ধুয়ে প্রিয়নাথ উঠে যায়। বিজয়েন্দু তার বিছানায় গিয়ে বসে। গগন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়—মুখটা গম্ভীর।

মৃগাঙ্ক বলে—বুড়ো খচে গেছে। মরুক গে! তা ওহে মাস্টার, স্কুল নেই আজ?

বিজয়েন্দু বলে—আছে। ছুটি নেব। একবার বহরমপুর যাব ভাবছি। সাড়ে দশটায় বাসটা ঘাট থেকে ছাড়ে না? তুমি নবীনকে একবার পাঠাও। সামনের দিকে সিট বলে আসুক।

মৃগাঙ্ক নবীনকে ডেকে ভগ্নীপতির সিটের ব্যবস্থা করতে পাঠায়। যাবার আগে নবীন এক জগ চা রেখে যায় টেবিলে। মৃগাঙ্ক দুটো কাপে চা ঢেলে বলে—প্রিয়বাবু, আসুন! মাস্টার, নাও। বিস্কুট বের করি। প্রিয়বাবু, খালি-পেটে চা খাবেন না কিন্তু। এক মিনিট।

ড্রয়ার থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে সে প্রিয়নাথের বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। তারপর বলে—নাড়ুডাক্তার দেরী করছে কেন? আমাকেও একবার বেরোতে হবে। রুকইসলামপুর যাব।

বিজয়েন্দু চা খেতে খেতে বলে—প্রিয়বাবু একেবারে নীরব!

প্রিয়নাথ হাসিমুখে বলে—কী বলব?

—হয়েছিল কী বলুন তো? স্বাধীন কোন মেয়ে না মেছুনীর কাছে ভোরে শুনেছে। শুনেই বলে, তুমি একবার খোঁজ নাও দিকি। প্রিয়বাবুকে কুসুম না কে বিষ খাইয়েছে নাকি—

প্রিয়নাথ আড়চোখে দেখল, মৃগাঙ্ক বিজয়েন্দুর দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছে।

—স্বাধীনের ধারণা, কুসুম নয়, অন্য কেউ। আসল ব্যাপার তো বুঝতে পারছি, কুসুম নিরপরাধ কিনা জেনে এসো, এই হচ্ছে ওর মোটিফ।

মৃগাঙ্ক বলে—স্বাধীনকে নিয়ে আর পারলাম না! এবার দেখছি, বোনের জন্যেই আমাকে জেলে যেতে হবে।

বিজয়েন্দু আঁতকে ওঠে। —কেন, কেন মৃগাঙ্কদা?

—ডাইনী মাগীটাকে দেশছাড়া না করলেই নয়। তুমি তো সদাশিব ভোলানাথ হে মাস্টার! কবে মাগী স্বাধীনকে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমাকে কিছু খাওয়াতে না বসে।

—সর্বনাশ! কেন? আমাকে কী খাওয়ানোর দরকার হবে?

মৃগাঙ্ক জবাব দেয় না। কিন্তু প্রিয়নাথ বুঝতে পারে সেটা কী। স্বাধীন ছেলে-পুলে চায়। এবং বিজয়েন্দুও টের পায় নিশ্চয়। তাই শুধু হাসে—হাসিটার তলায় কী কাদুনো ছিল। প্রিয়নাথ টের পায়।

মৃগাঙ্ক বাইরে যায়। কার সঙ্গে কথা বলছে শোনা যায়। প্রিয়নাথ কাপটা রেখে বিজয়েন্দুর দিকে ঘোরে।—তাহলে আমার খবর নিতেই এলেন?

—হ্যাঁ। যাবার পথে বাস থামিয়ে মেটে বলে যাব। নিবারণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বলব, প্রিয়বাবু বহাল তবিয়তে আছেন। বিষ নেই। খাওয়ার হজম করেছেন। প্রিয়বাবু নীলকণ্ঠ!...তারপর একটু ঝুঁকে আসে বিজয়েন্দু।—সত্যি কী হয়েছিল বলুন তো?

—কিছু না। মদ খেয়েছিলাম খানিকটা। অভ্যাস নেই তাই একটু বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম।

—কুসুমের কাছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?

—হ্যাঁ।

নাড়ুডাক্তার এলেন সাইকেল চেপে। বারান্দায় সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে উঠে আসেন।—কই রে মৃগাং, কোথা গেলি? তোর পেসেন্ট কোথা?

মৃগাঙ্কের সাড়া আসে বাইরে থেকে।— সোজা ঢুকে যান। পেয়ে যাবেন। আমি যাচ্ছি।

ঘরে ঢুকে ডাক্তার বলেন—আরে আরে। জামাই যে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। বসুন।

—কার কী হয়েছে?

—এই যে আমাদের প্রিয়নাথবাবুর।

ডাক্তার তড়াক করে এগিয়ে প্রিয়নাথের কপালটা ধরে ঠেলে শুইয়ে দেন। তারপর চোখ, জিভ, নাড়ী, পেট এবং স্টেথিসকোপ। প্রিয়নাথ হাসিমুখে টেপা-টিপি সয়। এসময় মৃগাঙ্ক এসে বলে—মজাচ্ছাই! টেপা-টিপি না করে আগে শুনুন, কী হয়েছে?

নাড়ুডাক্তার কানে স্টেথিসকোপ রেখেই চশমার ওপর দিয়ে তাকান।—কী হয়েছে?

—বিষাক্ত মদ খেয়েছিল রাতে। অজ্ঞান—মরার দশা একেবারে।

—এখন তো দিব্যি আছে!

—তা তো আছে। ব্যাপারটা কোন রি-অ্যাকশান ঘটে না হয়, ওষুধ বা ইনজেকশান যা লাগে দিন।

—কী বললে? বিষাক্ত মদ খেয়েছিল? কোথায়?

—খেয়েছিল এক জায়গায়। সে

বিরক্ত মুখে নাড়ুডাক্তার বলেন—কেন যে ছাই-পাঁশ যেখানে সেখানে খেলেন মশাই? চোলাই নিশ্চয়?

মৃগাঙ্ক বলে, হ্যাঁ।

—তাহলে তো বমি করাতে হবে!

—রাত্রে বমি অনেক হয়েছে।

—হয়েছে বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে।

—মিগাং তোর একরোখা স্বভাবটা নিজে কর দিকি। বয়স বাড়ছে, না কী?

—কী করলাম?

—এত ধমকাচ্ছেন কেন? ও মশাই, ইঞ্জেকশান নিতে পারবেন?

প্রিয়নাথ সশব্যস্তে বলে—না। খাবার ওষুধ দিন।

—পায়খানা হয়েছে?

—হয়েছে।

—মিগাং, পাঁচটা টাকা আর শিশি নিয়ে ক্যাশেও আমার ডিসপেন্সারিতে পাঠিয়ে দে। একটু দেরী করে পাঠাবি। আমি একবার চাঁইপাড়ার কলটা সেরে যাব।

নাড়ুবাবু চলে গেলেন তক্ষুনি। তিনজনে খুব হাসাহাসি করল। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—এখন অবশ্য হাসছি। আমার ছেলেবেলারই তল্লাটে এই একটিমাত্র ডাক্তার। বাবা ওঁকে এনেছিলেন। বাস্তুজমি শুধু নয়, ঘরবাড়ি সমেত ডিসপেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। পাশকরা ডাক্তার নন—ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এক দাতব্য হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। তখন লোকে অসুখবিসুখে ওঁকেই ডাকত। [illegible] আগের কথা হল তো—প্রায় পনের-কুড়ি বছর আগে। দেশের সবচেয়ে নেগলেকটেড এরিয়া তো! বনবাদাড়-ভূতপ্রেত-ওঝা-ডাইনী নিয়ে সমানে রাজত্ব করে আসছে। এতদিনে না হয় অনেক চেষ্টার পর একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হল। তো [illegible], সেও এক হাস্যকর ব্যবস্থা। না আছে ওষুধ, না ভালো ডাক্তার। তার চেয়ে আমাদের নাড়ুবাবুই ধন্বন্তরী। নবীন এলি রে? ও নবীন!

—এসেছি।

—সাঁট বলেছিস?

—হ্যাঁ।

—একটু পরে টাকা আর শিশি নিয়ে ভগীরথপুরে যাবি বাবা। প্রিয়বাবুর ওষুধ আনবি।

প্রিয়নাথ বলে—না, না। ওষুধ কী হবে?

—পাগল! [illegible] না খান, ফেলে দেবেন। কিন্তু ওষুধ না আনলে নাড়ুডাক্তার ক্ষেপে যাবে। নবীন, যাস বাবা—হেঁটে? সাইকেলটা নিয়ে যাস। [illegible] হয়ে। [illegible] হাওয়া [illegible] নিস মোটর-

সাফ করে নে। কী হে মাস্টার, উঠবে না কী?

বিজয়েন্দু ঘড়ি দেখে বলে—দশটা। এখনও আধঘণ্টা।

—তাহলে তুমি গল্প করো। আমি বেরোই। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে প্রিয়বাবু, বুঝলেন? খাবার বারণ করেছি। আপনি খেয়ে নেবেন। বড় বড় সরপুঁটি মাছ দিয়ে গেছে হেমন্ত জেলে। মাংস হলে ভালো হত আপনার। ঠিক আছে, ওবেলা এসে দেখব।

প্যান্ট-জামা বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নেয় মৃগাঙ্ক। বন্দুকটাও পিঠে নেয়। বেরিয়ে যায়। একটু পরে তার মোটরসাইকেলের আওয়াজ পাওয়া যায়।

বিজয়েন্দু বলে—আজ আর হাঁটাহাঁটি করবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

প্রিয়নাথ হাই তুলে বলে—হাঃ!

আরও কিছুক্ষণ প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার পর বিজয়েন্দু উঠে যায়।...

দুপুর থেকে বিকেল গভীর ঘুম হল প্রিয়নাথের। স্বপ্নবিহীন ঘুম। সূর্য ডুবতে যাচ্ছে, তখনও মৃগাঙ্ক ফিরল না। তখন সে খামারের পুবদিকের বেড়া গলিয়ে ঝিলের ধারে চলে গেল। সেই শ্মশানের কাছে দূর্বাঘাসের ওপর বিষাপপড়ের সার থেকে তফাতে বসল। মাথার ভিতর শূন্যতা। শরীর দুর্বল হয়ে রয়েছে এখনও। সে রাতের ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করল। একটু পরে সূর্য ডুবে গেলে ঠাণ্ডা ধূসর একটা অন্যরকম আলো কাদম্বীর বিরাজের মাঠে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জলহাঁস উড়ে গেল। প্রিয়নাথ ওপারের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে কে এদিকে আসছে। পাড় বসে রয়েছে ওদিকে। শেকড় উঁচিয়ে কিছু ঝোপ জলে পড়েছে। তাদের কাঁপন এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। সেখানে এসে সে সড়াৎ করে কুমীরের মতো পিছলে জলে পড়তেই প্রিয়নাথ চিনল—কুসুম!

নদীর জলের তলায় চোখ পড়ল এবার। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! লাল নীল হলুদ সবুজ রঙবেরঙের মেঘ চাপ চাপ জমে আছে। তাকে ছত্রখান ভাংচুর করে ভেসে আসছে কুসুম। ব্যাপারটা আকাশে ঘটছে এবং জলের তলায় তার প্রতিবিম্ব পড়ছে কিনা দেখতে—নাকি প্রিয়নাথ নিজেই তার [illegible] উল্টো হয়েছে, টের পাবার জন্যে সে আকাশে তাকায়। কিন্তু [illegible] মা। [illegible] মেঘগুলো [illegible] করে [illegible] এক [illegible]

করে। কুসুম যত কাছে আসে, তত সে বিচলিত হয়ে পড়ে। মাঝামাঝি এসে কুসুম একবার মুখ তোলে। চুল বেঁধে নেয় তারপর। এবার কিছু ভঙ্গিতে সন্তরণ সে। দক্ষিণে দহের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে আকন্দগাছটা টেনে ধরে। তারপর সাপের মতো বুক পেড়ে ওঠে। বাঁধের নিচে একবার বসে। হয়তো দম নেয়। তারপর উঠে দাঁড়ায়। এবং প্রিয়নাথের দিকে এগোতে থাকে।

পঞ্চবনে যেমন দেখেছিল, সেইরকম ভিজে শরীর কুসুমের। স্তনদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কাঁপছে, দুলছে। কাপড় কাচের মতো স্বচ্ছ এবং আব্রু বিনষ্ট। তার মতোই যেন শুধু নাক দিয়েই শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে কুসুম।

প্রিয়নাথ নিষ্পলক তাকায়। কুসুম ধুপ করে সামনাসামনি একহাত দূরে বসে পড়ে। দূর্বাগুলো ভিজে প্যাচপেচে হয়ে যায়। সে এখনও হাঁফাচ্ছে—আর কোন কষ্ট হয়নি তো? ভাঙাগলায় এই প্রশ্নটা করে সে বুকটা ভেজা কাপড়ে ঢেকে ফেলে।

—নতুনবাবু! প্রিয়নাথ কথা বলে না দেখে সে ফের ডাকে।

—উঁ!

—শরীর কেমন?

—ভালো।

কুসুম এদিকওদিকে তাকিয়ে বলে—কাল রাত থেকে বাড়ি ঢুকিনি। ওপারে একটা গাঁ আছে, মকুন্দপুর—সেখানে আমার পাতানো মা আছে। তার বাড়িতে ছিলাম। ছাড়লে না, দুপুরে খেয়েদেয়ে ভাতঘুমটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমবাগানে সাঁঝ কাটিয়ে বাড়ি যাব ভাবলাম। তা হঠাৎ চোখ গেল এখানে—দেখি, আপনি বসে আছেন একা। মিগাংবাবু আসবে না তো?

—ওকে এত ভয় কেন তোমার?

—এমনি। সত্যি, বলুন না—আসবে নাকি মিগাংবাবু?

—জানি না। সে সকালে চকইসলামপুর গেছে। বিকেলে ফেরার কথা—এখন ফিরেছে কিনা জানি না।

কুসুম হাসিমুখে ওর দিকে তাকায়। —আমার ওপর রাগ করেছেন, নতুনবাবু?

—উঁহু।

—না, আপনি রাগ করেছেন। ভালো করে কথা বলছেন না। আপনার দিব্যি, আমি জেনেশুনে কোন ক্ষতি তো আপনার করিনি। কতক্ষণ মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছি, বাতাস করেছি ......

—করেছ, জানি।

—তাহলে কেন রাগ করেছেন, বলুন?

—আমার রাগ নিজের ওপর কুসুম।

—হুঁ, আমারও কি নিজের ওপর রাগ কম হয়? আমি মাথা ঠুকি নতুনবাবু, চৌকাঠে মাথা ঠুকে সাপ-সাপান্ত করি। জ্বালা তো আমার কম নয়। কিন্তু আমি যে অন্যের হাতে ধরা আছি, উপায় কী? যদ্দিন না মরব, তদ্দিন এই ছটফটানি! কুরে কুরে খাবে শত্রুর পোকা!

প্রিয়নাথ তাকায়। কুসুম কি কাঁদছে? মুখ নামিয়ে কাপড়ের পাড় খুঁটছে সে। একটুখানি চুপচাপ থাকার পর প্রিয়নাথ বলে—কার হাতে ধরা আছ তুমি?

কুসুম মাথা দোলায়।—জানি না। মা মরার সময় বলে গেল, তোকে তার হাতে জিম্মা দিয়ে রেখেছি জন্মের সময় থেকে। খবরদার, তুই কোন পুরুষ নিসনে কুসুম, অপঘাত হবে।

—তুমি তো বিয়ে করেছিলে?

—হ্যাঁ। মায়ের কথা অমান্য করেছিলাম। মাকে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম দেখি না কী হয়। আর—আমিও তো মেয়ে বটি, আমার সাধআহ্লাদ ঘর-সংসার ছেলেপুলে। দম টেনে সামলে নিয়ে সে ফের জানাতে থাকে—তা পুরুষ আমার সইল না।

—কেন, কী হল?

—বিশ্বাস করবেন বললে?

—করব।

—প্রথম রাতেই শুতে গিয়ে দেখি ঘরে সাপ ঢুকেছে। শোওয়া হল না। সাপটা খুঁজে বের করতে পারলাম না। দরজা বন্ধ করে দাওয়ায় শোর, আমি মাদুর পাতছি, আমার পুরুষ গেল পেচ্ছাপ করতে উঠোনের জবাগাছের কাছে—হঠাৎ কী দেখলে সেখানে, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সারারাত ওকে নিয়ে কেটে গেল—জ্ঞান হল না। নিজে যা কিছু বিদ্যে ছিল, চালিয়েও কিছুতে কিছু হল না। তখন শিমুলিয়ার ওঝা ডেকে আনলাম। ওঝা বললে, অমানুষের ছটা লেগেছে। আর আমাকে বকাবকি করে বললে, তুমি গুনিনের বেটি গুনিন হয়েও অসুখ চিনতে পারছ না? এ বাঁচবে না। এর গায়ের রক্ত হলদে হয়েছে। আর সাতদিন মেয়াদ। বিকেলে একবার পেটের ধান্দায় স্বাধীনদির বাড়ি গেলাম—ফিরে এসে দেখি, পুরুষ পালিয়েছে।

—আর সাপটা?

—সাপটা? ঘরের কপাট খুলে চৌকাঠে লম্ফ রেখেছি। উঠোনে রান্না চাপিয়েছি। বসে থাকতে থাকতে আড়-চোখে দেখি, সাপটা লম্ফর সামনে ফণা তুলল। ফণাটা অনেকক্ষণ দোলালে। তারপর মুখ নামিয়ে সরসর করে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল। দাওয়া থেকে নেমে গাবতলায় গিয়ে ঝোপে ঢুকল।

—তুমি তোমার পুরুষের সঙ্গে চলে গেলেই পারতে? কোথাকার লোক সে?

—বহরমপুরের। সেখানে রিকসা চালাত। ভেবেছিলাম এখানেও রিকসা-টিকসা চালাবে। আমি যা করে খাচ্ছি, তাই করব। চলে যেতে হেসেখেলে।

—আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না। শুনেছিলাম, রোগে ভুগে-ভুগে নাকি মারা পড়েছিল।

—কতদিন আগের কথা?

—তা দেড়-দু বছর হল।

—কুসুম!

—উঁ?

—আমি একবার দেখতে পারি, তুমি যদি রাজী হও।

—কী?

—তোমাকে বিয়ে করি!

কুসুম মুখ নামিয়ে বলে—ছি! আমি কি আপনার যুগ্যি মেয়ে? আপনি উঁচু জাত—ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ। আমি ছোটজাত—লেখাপড়া জানিনে...

—ওসব কিছু নয়। কথা বলি শোন। এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। এমন জায়গায় নিয়ে যাব...

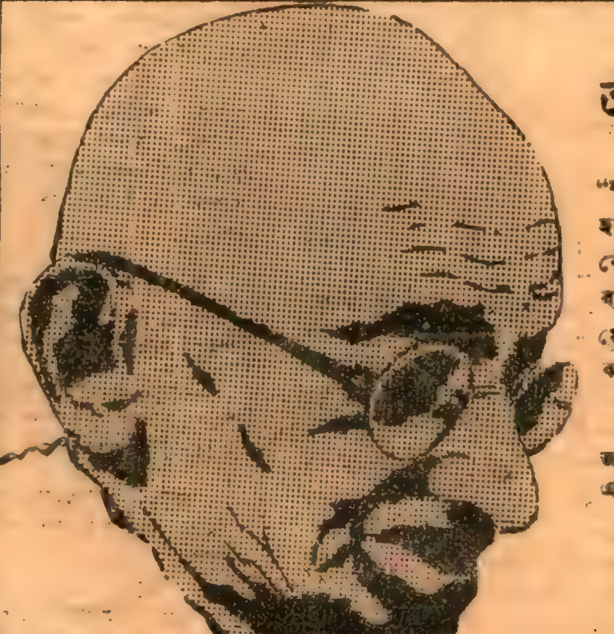

আনন্দের সঙ্গে সেবা

"যদি আনন্দের সঙ্গে সেবা না করা হয় তবে তার কোন অর্থ ই হয় না। যখন কেবলমাত্র জনমতের ভয়ে বা লোক দেখানোর জন্য সেবা করা হয় তা কেবল মানুষকে অভিভূতই করতে পারে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।"

—মহাত্মা গান্ধী

জাতির সেবা করা আমাদের মহান লক্ষ্য এবং সেই সুযোগ আমরা পেয়েছি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

—কোথায়?

—অনেক দূরে। ধরো—কলকাতা।

—হুঁ, তারপর সাধ মিটে গেলে জলখাবার দিয়ে পথে বের করে দেবে। ...কেমন হাসে কুসুম।—এদেশে অনেক এমন হয়েছে, নতুনবাবু—অনেক। চণ্ডী-চৌকিদারের মেয়েকে এক শহুরে বাবু এসে নিয়ে গেল। এখন শুনি সে মেয়ে বাজারের গলিতে সেজেগুজে সাঁজসকালে দাঁড়িয়ে থাকে।

—আমাকে কি তুমি তাই ভাবছ?

—আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না, নতুনবাবু। মায়ের শিক্ষা। মা পইপই করে বলে গিয়েছে—অমানুষকে বিশ্বাস করিস কুসুম, মানুষকে নয়।

প্রিয়নাথ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে—ঠিক আছে। বিশ্বাস করো না। করবে না? তাহলে কেন আমাকে ডেকে এনে এখন? বেশ তো বসেছিলাম চুপচাপ।

সন্ধ্যা নেমে গেছে। অন্ধকার হয়েছে কিছুটা। কুসুমের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে প্রিয়নাথ। সেই জ্বলজ্বলে নীল চোখ! তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে কুসুম। প্রিয়নাথ মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে বলে—সিগ্রেটের ধোঁয়া?

কুসুম বলে—বাসায় যান নতুনবাবু। স্বাধীনদা আপনাকে দেখতে এসেছে।

—কুসুম! ধমক দেবার চেষ্টা করে প্রিয়নাথ।

—স্বাধীনদা লোক পাঠাচ্ছে, আপনাকে খুঁজতে। এক্ষুনি এসে পড়বে—চলে যান।

—তুমি কী করবে?

—নতুনবাবু, পালান।

বিরক্ত হয়ে প্রিয়নাথ বলে—ড্যাট! তুমি মাঝে মাঝে পাগলামি কর কেন কুসুম? বেশ বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছ। সব তোমার বজ্জাতি—মিথ্যে!

কুসুম হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর শ্মশানবটের দিকে দৌড়ে চলে যায়। প্রায় শূন্যে ভেসে যাওয়ার মতো—এবং অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সময় জোরালো টর্চের আলো পড়ল বাঁধের ওপর কিছুটা দূরে থেকে।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়।—কে?

প্রিয়বাবু এসেছেন। অন্ধকারে একা কী করছেন ওখানে?

মৃগাঙ্ক। বাঁধে উঠে প্রিয়নাথ বলে—কখন ফিরলেন?

—এইমাত্র। স্বাধীন এসেছে। কে ওকে বলেছে—প্রিয়বাবুর অসুখ বেড়ে গেছে। ওর আবার ওইরকম স্বভাব। আমার লোকজনের কার অসুখ, কার কী সমস্যা—সব খোঁজ ওর পাওয়া চাই। ভাবখানা এমন—যেন আমি কোন কর্তব্যই করিনে। ...হো হো করে হাসে মৃগাঙ্ক।

প্রিয়নাথ চুপচাপ হাঁটে।

—প্রিয়বাবু!

—বলুন?

—কে ছিল আপনার কাছে? কুসুম না?

—হ্যাঁ।

—বিপদে পড়বেন, এখনও বলছি—ওকে এ্যাভয়েড করুন। ও ভীষণ ডেঞ্জারাস মেয়ে!

॥ চার ॥

সে রাতে স্বাধীন বেশিক্ষণ বসেনি খামারে। প্রিয়নাথকে শরীর সংক্রান্ত দু-চারটে প্রশ্ন করে সব জেনে রিকশোয় বাড়ি ফিরে যায়। স্বাধীনের ঠোঁটে একটা বিশেষ ধরনের হাসি ছিল তা লক্ষ্য করেছিল প্রিয়নাথ। অর্থাৎ—কী, এখন টের পেলেন তো কুসুমের সত্যি সত্যি অলৌকিক শক্তি আছে না নেই? অবশ্য মদ খাওয়াটা চেপে জল খাওয়ার কথাটাই মৃগাঙ্কের বুদ্ধি-মতো চালাতে হয়েছিল। স্বাধীন মদের ব্যাপারে ভীষণ চটা নাকি, মৃগাঙ্কের হুঁশিয়ারি ছিল।

পরদিন দুপুরে প্রিয়নাথের নেমন্তন্ন ওবাড়ি। মৃগাঙ্ককেও পইপই করে বলে যায় স্বাধীন। মৃগাঙ্ক বলেছিল—সময় পেলে যাবো। মাষকলাই পাঠাবো এক ট্রাক। সঙ্গে হয়তো আমাকে যেতে হবে।

তাই দাঁড়ায় শেষঅব্দি। সোনারপুর মার্কেটিং কোঅপারেটিভের দিকে ট্রাকের সঙ্গে রওনা দেয় মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ একটা রিকশো করে ভগীরথপুর গেল নেমন্তন্ন রাখতে।

ভেবেছিল, বিজয়েন্দু নিশ্চয় থাকবে—বাড়িতে অতিথি আসছে যখন। কিন্তু সে স্কুলে গেছে। এটা ভাবেনি প্রিয়নাথ। ঠাকুরবাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল স্বাধীন,—অপেক্ষা করছিল তার? একটু বিস্মিত নয় প্রিয়নাথ। সে তো 'অমানুষ' নয়—নিতান্ত মানুষ। অলৌকিক শক্তি তার কাছে নেই—চোখে নেই উজ্জ্বল নীল কোন বাতি! তার দৃষ্টি শূন্য—খসখসে, শুকনো গাছের মতো নিরর্থ। স্বাধীন কি সত্যি সত্যি কিছু পেল তার মধ্যে?

নাকি কুসুমের গন্ধপোকার মউমউ জ্বলা সোঁদগন্ধে আকৃষ্ট স্বাধীন অনুরাগিণী? মনে মনে একটু হেসে প্রিয়নাথ।

—আসুন আসুন! দাদা এল না? স্বাধীন আজ আর ঘোমটাটা তোলে না মাথায়। এলোচুল পিঠে একটা প্রগলভতার মতো ঝাঁকালো।—হুঁ, জানতুম, আসবে না। এদিকে আমার কর্তাবাবুও ছেলে ঠ্যাঙ্গানো ছাড়া থাকতে পারেন না। কাল একটা কামাই করেছে, মাস্টারী চলে যাবে না?

—শ্বশুরের স্কুলে জামাইয়ের মাস্টারি চলে যাবে কী?

স্বাধীন দারুণ হাসে।

সেই ঘরে নিয়ে যায় তাকে। বিছানার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে।—আরামে হাতপা ছড়িয়ে বসুন। চানটান তো করেছেন মনে হচ্ছে।

প্রিয়নাথ একটু ভদ্রবেশে এসেছে। নতুনকাচা প্যান্টশার্ট পরনে, পালিশ-করা কুয়োভেটিস জুতো। সে একটু ভেবে নিয়ে বিছানাতেই বসে—তাকিয়া টেনে নেয় কোলে। মিষ্টি হাসে।—একা একা খাবো! কী কাণ্ড দেখুন তো! মৃগাঙ্কদা অদ্ভুত মানুষ—

বাধা দিয়ে স্বাধীন বলে—অদ্ভুত তো আপনাদের মাস্টার ভদ্রলোকটিও। জেনেশুনে—মরুক গে। আপনি এসেছেন তো তাহলেই হবে।

একটা—এ্যাসট্রে চাই।

—দিচ্ছি। বলে স্বাধীন কোণার শোকেস খুলে পুতুলের রাজ্য থেকে একটা শামুকের এ্যাসট্রে এনে দেয়। তারপর সামনে মোড়ায় বসে। পায়ের ওপর পা তুলে দেয়।—রান্নাটান্না একঘণ্টা আগে শেষ। এখনই খাবেন—না একটু দেরী করব?

—থাক্। বলে প্রিয়নাথ সিগ্রেট ধরায়।

স্বাধীন ঠোঁট টিপে হাসছিল। যতক্ষণ প্রিয়নাথ প্রথম ধুঁয়ো নিজের ডানদিকে সাবধানে ছাড়িয়ে দিতে থাকল, কিছু বলল না। প্রিয়নাথ ঘুরলে তখন বলে সে—কুসুম কী খাইয়েছিল? স্রেফ জল? আরেকবার বলুন তো, শুনি?

প্রিয়নাথ মিটমিটি হাসে শুধু।

—আপনি মদ খান কেন?

—নাঃ তেমন কিছু নয়। একটু-আধটু। সেও কেউ অফার করলে। আমার কোন হ্যাবিট নেই।

—কুসুম ডেকেছিল, নাকি নিজে থেকে গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?

—ডাকেনি। নিজেই গিয়েছিলাম—নিছক কিউরিওসিটি!

স্বাধীন হাসতে হাসতে বলে—হুঁউ, কিউরিওসিটি! ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

—এ্যা! প্রিয়নাথ চমকে ওঠে এবং হতভম্ব হয়ে পড়ে।

—লজ্জার কিছু নেই। আপনি সত্যি কথাটা বলুন না মশাই, তারপর আমি যা বলার, বলছি। বিয়ে করবেন বলেছিলেন ওকে?

—কে বলল আপনাকে? কুসুম?

—আমিও কুসুমের মতো ডাকিনী-বিদ্যা জানি। আপনি স্বীকার করুন আগে।

—হ্যাঁ। বলে থাকতে পারি। মদের নেশায়।

—মদের নেশায়? সজ্ঞানে নয়—তাই না?

—তাছাড়া কী বলব?

—আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। কুসুমের কোন উপায় নেই। ওর এই বয়েস—ফ্র্যাঙ্কলি বলছি ভোগআহ্লাদের বয়স। কিন্তু ওর মা হারামজাদী ওর সর্বনাশ করে গেছে। আপনারা তো সুপারনেচারাল পাওয়ারে বিশ্বাস করেন না—আমি করি। ওর জন্মের পরই কোন প্রেতশক্তিই বলুন কিংবা অন্য কিছু, তার কাছে জিম্মা দিয়ে রেখেছে ওকে। কুসুমকে সে কিছুতেই অন্যপুরুষের ছায়া লাগতে দেবে না। আপনি—পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।... স্বাধীন কণ্ঠস্বরটা চাপা করে এবার।—দুষ্ট বদমাসের তো অভাব নেই দেশে। অজস্র লম্পট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই বুনো মেয়ে মাঠেজঙ্গলে ঘোরে। অনেকে এ্যাটেম্পট নিয়েছিল, কুসুমই বলেছে—তারা কী ভীষণ শাস্তি পেয়েছে ভাবতে পারবেন না। ক মাস আগে নদীর ওপারে জঙ্গলে বাউরীদের একটা লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গায়ের রং কেমন কালো—বাজ পড়লে বা সাপে কাটলে যেমন হয়। সবাই তো সাপেকাটা ভেবে আর উচ্চবাচ্য করলে না। পরে কুসুম আমাকে যা বলল শুনে আমি তো ভয়ে কাঠ। হতভাগিনী কুসুম! কী সর্বনাশের সঙ্গে ওকে ঘর করতে হচ্ছে!

প্রিয়নাথ চুপচাপ সিগ্রেট টানে।

—ওকে বেইজ্জত করতে গিয়েছিল লোকটা। আর—রেজলাপাড়ার সেই মুসলমান ছোকরাটি? বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বন্দুক আছে ওদের। বিলে গেল পাখি মারতে। ফিরল। বোবা একেবারে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কথা বলতে পারে না। জড়ভরত হয়ে গেল দিনে দিনে। এখন তো চলাফেরাও করতে পারে না। হাত-পা প্যারালেসিসে অবশ। কত খরচ করল চিকিৎসায়—কলকাতায় গিয়ে থাকল কতদিন। কিছু হল না।

প্রিয়নাথ মুখ তোলে।

—আবার কী? কুসুমের কীর্তি। কুসুমকে ধরেছিল! পরে কুসুম ডিটেলস ঘটনাটা বলে আমাকে। এগুলো কিন্তু কেউ জানে না। জানলে হতভাগিনী মেয়েটাকে খুন করে ফেলবে। আরও ইনসিডেন্ট আছে এরকম। সাবধান, আপনি কিন্তু ভুলেও এসব বলবেন না কাকেও।

—মৃগাঙ্কদাকে ও কেন অত ভয় করে?

ফটো : ভি সোনা

স্বাধীন কেন কে জানে মুখটা নামায়। তারপর আস্তে বলে—আমি জানিনে। দাদাকেই জিগ্যেস করবেন।

—করেছিলাম। স্পষ্ট জবাব পাইনি।

—আপনার খাবার ব্যবস্থা করি।... [illegible] হঠাৎ ওঠে স্বাধীন। বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ডেকে নিয়ে যায় নিবারণ নামে চাকরটা। পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিল রয়েছে। সম্ভবত বিজয়েন্দুর জীবনযাপনপ্রণালী শহুরে এবং মডার্ন যাকে বলে। প্রিয়নাথ বসে পড়ে। —একা খাবো? আপনি বসবেন না?

—নিশ্চয় বসব। আমারও খিদে পেয়েছে।... বলে স্বাধীন মৃদু হেসে সামনাসামনি বসে।

সন্ধ্যা অব্দি তাকে আটকে রাখে স্বাধীন। তারপর ডাকে—আসুন। বাগানে যাই।

না গিয়ে পারে না প্রিয়নাথ। কিন্তু ক্রমশ তার মনে একটা সংশয় খচখচ করতে থাকে—তাকে নিয়ে কী যেন নিষ্ঠুর খেলা খেলছে মৃগাঙ্কবাবুর বোন। স্বাধীনর নির্বিকার আচরণ বা ভদ্রতা বা অতিথিসৎকারের মধ্যে একটা খেলো-খেলো ভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে যেন।

কুসুমকে ভালটালো বাসার সরল স্বীকারোক্তি কি সত্যি সত্যি কোনরকম অদ্ভুত হিংসে (ঈর্ষা নয়) জাগিয়ে দিয়েছে মহিলার মনে? এ যেন লোভে খেলানোর ব্যাপার। এ যেন ওর উগ্র অভিসন্ধি নিয়ে বোঝাবুঝির চক্রান্ত। আরও গভীরতর স্বীকারোক্তি চাই কি আপনার, স্বাধীন? প্রিয়নাথ মনে মনে উদ্বেগ নিয়ে বলে। আপনি কি মারাত্মক আঘাত হানার চূড়ান্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন, পারছেন না—তাই এবার নির্জন বাগানে জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার কাছে নিয়ে এলেন আমাকে?

বাঁদরের খাঁচা খুলতেই বাঁদরটা এক-লাফে এসে কোলে চাপে স্বাধীনের। পিটপিট করে তাকায় সে প্রিয়নাথের দিকে। স্বাধীন চাসতে হাসতে বলে—কী মটরবাবু, ভদ্রলোককে দেখে কী মনে হচ্ছে? উঁ?

সে বাঁদরটার মুখের কাছে কান রেখে তারপর ফের বলে—হুঁ, কী বলছে জানেন? বলছে— ভদ্রলোকটি অতিশয় গোবেচারা লাজুক মানুষ। সে কী মটরবাবু? ও কী বলছিস? মোটেও না—মোটেও না। উনি কী করেছেন জানিস? ...স্বাধীন প্রিয়নাথের দিকে একবার চটুল তাকিয়ে ফের শুরু করে—উনি এদেশে এসেই কেউটে সাপ ধরতে হাত বাড়িয়েছেন। না রে বাবা না—তুই জানিসনে, বিষাক্ত সাপ ধরা অভ্যাস ওঁর আছে। তাই ধরতেই তো এসেছেন!

প্রিয়নাথ এইসব কথা কানে না নিয়ে ময়ূরদুটো দেখতে থাকে। অনর্গল ওই-ধরনের চটুল রসিকতার পর বাঁদরটা আচমকা প্রিয়নাথের গায়ে ফেলে দেয় স্বাধীন। প্রিয়নাথ শশব্যস্ত ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেও পারে না। বাঁদর তার কাঁধে চড়ে বসে। অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ—আর স্বাধীন হাসিতে লুটোপুটি খায়।

হঠাৎ প্রিয়নাথ লক্ষ্য করে বাঁদর তার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে রোমশ ছোট্ট হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু দুপায়ে কাঁধ আঁকড়ে দুটো হাত চালিয়ে ব্যাটা তার গলায় নাকে মুখে হাল্কা খামচাখামচি শুরু করে। প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি রাখতে হয়। স্বাধীন হেসে ভাঙে। তার শাড়ি পিছলে যায়, ফুটে ওঠে গলার নিচের উজ্জ্বল মাংস আর সবুজ ঢাকনা ঠেলে-ওঠা স্তনাম্বর, বগলে আর নরম বাহু জোয়ালো অনুরাগ ছড়াতে থাকে—মনে হয় নারীদের নোনা স্রাবে ভিজে উঠছে ঘাস। ওদের মরচেধরা খাঁচা, দিনশেষের বাগান, আর নির্জনতা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠছে সেই তীব্র নারীদের স্মরণে।

চকিত বিহ্বলতায় প্রিয়নাথ তখন করে কী, সে দুহাতে বাঁদরটা ধরে শরীর থেকে ছাড়িয়ে, গাছ থেকে ডালপালা ছাড়ানো টানে, ঝুঁকে যায় স্বাধীনের দিকে—কড়া গলায় বলে, আপনার মটরবাবুকে নিন তো।

এর ফলে তার ও স্বাধীনের একটা অনিবার্য শারীরিক সংযোগ ঘটে যায়। স্বাধীন বাঁদরটা নিতে গিয়ে একবার প্রিয়নাথের চোখ দুটো দেখে মুখ নামায়। বাঁদর তার বুকে যায় ফের।

একটু সরে যায় প্রিয়নাথ। জামা ঝাড়পোছ করে রুমালে। চুল ঠিকঠাক করে। —যা বলেছিলেন! ভীষণ দুষ্টু তো আপনার মটরবাবু।

—আপনার লাঞ্ছনার এখনও বাকি রইল।

—বুঝতে পেরেছি।

—আরেকদিন হবে।

—পাগল! আর আমি ওর ত্রিসীমানায় আসছিনে।

—না এসে পার আছে ভাবছেন? জন্তুজানোয়ারের সংস্পর্শে একবার গেলে বারবার না গিয়ে উপায় থাকে না। একটা কিছু চরম ঘটে না যাওয়া অব্দি রেহাই নেই।

—কে জানে!

খাঁচায় বাঁদরটা ভরে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে স্বাধীন বলে—ওদের বেলাতেও তাই। বাবা বলতেন, বুনো জন্তু একবার কোনভাবে মানুষের টাচে এসে পড়লে তাকে অনবরত অশান্ত হয়, যতক্ষণ না মারা পড়ে। বাবা বড় শিকারী ছিলেন—দাদার চেয়ে। আমলাবাগে অনেক বাঘ শুওর হায়েনা থাকত সে আমলে। হায়েনার দাঁতের বিষেই বাবার পা পচে গিয়েছিল। তিনচার মাস ভুগে কলকাতার হাসপাতালে মারা যান।

—শুনেছি।

—আপনি জানেন, বুনো হিংস্র জন্তুরা অসুখবিসুখ হলেও অনেকসময় মানুষের কাছে চলে আসে? রোগা বাঘ একটা নাকি এসেছিল, ঠাকুর্দার আমলে। ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে মেরে ফেলেন বাবা। পরে পস্তেছিলেন। তখন বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। ঠাকুর্দা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর—আমি নিজেও সুন্দরবনে দেখেছি রোগা হিংস্র সাপ ঘরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তৈরবে ফ্লাড হলেও এমন ব্যাপার হয়। নদীর এলাকায় যারা থাকে, তারা জানে।...

প্রিয়নাথ এ সময় আড়চোখে দেখতে পায়, উত্তরের জানলায় পর্দার ফাঁকে কে মুখ রেখেছে। কুসুম নাকি? কুসুম ভেবে সে চাকতে দৃষ্টি পুরো ফেলল সেখানে।

না—বিজয়েন্দু তার ধবধবে সাদা চিবুক, লাল ঠোঁট ও কুচকুচে কালো গোঁফ দেখা গেছে। পর্দা সরে ঠিকঠাক হল ফের। সরে গেল বিজয়েন্দু।

স্বাধীন উল্টোদিকে তাকিয়ে ছিল। সে দেখল না। প্রিয়নাথের মাথার ভিতরটা আবার খালি লাগে। শরীরে ক্লান্তি নামে। কিন্তু সে স্বাধীনকে বলতে পারে না তো—আপনার স্বামী এসে আড়ি পেতেছেন! সে শুধু বলে—বিজয়েন্দুবাবু এতক্ষণ এসে গেছেন নিশ্চয়।

—কে? ও—হ্যাঁ। বলা যায় না।

—এবার চলি তাহলে?

—প্রিয়বাবু!

—বলুন।

—না বলেও থাকা যায় না। অথচ নতুন মানুষ আপনি, সব এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব নয় এত শিগগির।

—নির্দ্বিধায় বলুন না।

—বেচারা কুসুমকে আপনি আর তাতাবেন না। ও কষ্ট পাবে।

প্রিয়নাথ হাসে একটু। —কী মুশকিল!

—ওকে রেহাই দিন।

প্রিয়নাথ গুম হয়ে যায়।

—আজ সকালে এসেছিল কুসুম। আপনার ব্যাপারটা খুলে বলেছে। ও আমাকে কিছু লুকোয় না। মনে হল, ওর মনে চাঞ্চল্য এসে গেছে। সে তো স্বাভাবিক। ও আমার পরামর্শ চাইছিল।

—কিসের?

—আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন ওকে!

—সে কি!

—চালাকি করবেন না প্রিয়বাবু। আপনি বলেন নি ওকে, কলকাতা নিয়ে যাবেন?

—ও, হ্যাঁ।

—কেন এ লোভ দেখালেন ওকে? পারবেন এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য জংলী মেয়েটাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে সমাজে? পারবেন ওর সঙ্গে মন মিলিয়ে ঘরসংসার করতে? একটা সাংঘাতিক ফারাক কী দিয়ে ভরাবেন বলুন তো? শুধু প্রেমভালবাসা দিয়ে? তা হয় না। আর—তাছাড়া, ও তো মোটেও সুস্থ প্রেমের মেয়ে নয়, অস্বাভাবিক ওর সব কিছু। মেজাজ রুচি চালচলন—কোনটাই মিলবে না আমাদের চেনাজানা জীবনের সঙ্গে।

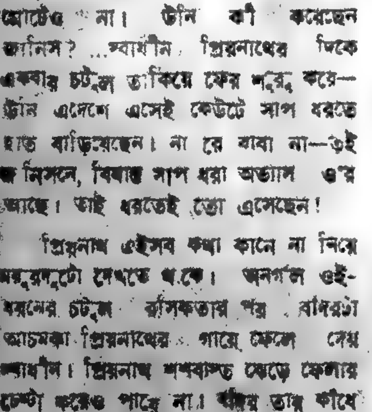

বাবার ... কাটবে। তখন নিজেই সমস্যায় পড়বেন—লজ্জা পাবেন। ওকে ঘৃণা করবেন।

—একথা বলার জন্যেই কি এতক্ষণ সময় নিলেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে স্বাধীন বলে—এদিকে যা বুঝতে পেরেছি, কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মেয়েটার মনে জোর লেগেছে। অস্থির হয়ে পড়েছে। সত্যি তো, ও যেভাবে বেঁচে থাকে—তা কি কেউ পছন্দ করবে? ও উদ্ধার পেতে চায়। আফটার অল, ও মানুষ—মেয়ে। আর আপনি ওর চোখে একজন জোরালো—কী বলব? —সুন্দর পুরুষ! আপনাকে অনেক মেয়ে মনে-মনে চাইলে তাদের দোষ দেব না!

—হ্যাঁ. হয়তো আমি কন্দর্প!

দুজনেই একটুখানি চাপা হাসে এখন। তারপর স্বাধীন পা বাড়িয়ে বলে—কী? যা বললাম, মনে থাকবে?

—দিব্যি করাতে চান নাকি?

—অত জোর কোথায় আমার?

—আপনি কি কুসুমের ম্যাল গার্জেন? আপনার বাবার মতো?

শেষ বাক্যটা বলা হয়তো উচিত হল না—প্রিয়নাথ বলার পর বিব্রত হয়ে ভাবে। কিন্তু স্বাধীন ওটা বিশেষ গায়ে মাখল না যেন। সে বলে—হ্যাঁ। বাবা আমাকে বলে যান, ওকে যতটা পারি সাহায্য করতে—সব ব্যাপারেই। দাদাকেও বলে যান। মরার সময় আমি পাশে ছিলাম না—দাদা গিয়েছিল কলকাতা। ওকে বাবা কীসব বলেছিলেন। কিন্তু দাদা অদ্ভুত ভোলানাথ মানুষ। অগত্যা, আমি যা পারি, করে যাই। তবে কুসুম আমার তত ধার ধারে না— ও নিজের খুশিতেই চলে। নাকি ওর মায়ের দেওয়া প্রেতশক্তির ইচ্ছেমতো ওকে চলতে হয়।

—প্রেতশক্তি! চমৎকার বলেছেন। বলে জোরে হাসতে হাসতে প্রিয়নাথ সিঁড়ি বেয়ে খিড়কিতে ওঠে।

বারান্দায় আলোতে পায়চারি করছিল বিজয়েন্দু। ঘুরে দাঁড়ায় সে। হাসিমুখে বলে—শুনেছি, আপনি রয়েছেন। কিন্তু ভীষণ মুড এসে গিয়েছিল। প্রেতশক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল নাকি?

স্বাধীন পাশ কাটিয়ে কিচেনের দিকে যায়। —নকড়ি, কী সব হচ্ছেটচ্ছে রে?

প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। ভূতপ্রেতের দেশে এছাড়া আর কী আলোচনার আছে বলুন!

—গতকাল বহরমপুর গিয়েছিলাম তো! একটা বইয়ের অর্ডার দেওয়া ছিল। অদ্ভুত সাবজেক্ট। প্যারাসাইকলজির কথা আজকাল খুব ছড়াচ্ছে দেশেবিদেশে। খুব ইন্টারেস্টিং। প্যারাসাইকলজি মানুষের অতিরিক্ত একটা শক্তি—আই মিন, সুপ্রা-সেনসুয়াল ব্যাপার নিয়ে গড়ে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় বলতে পারেন। টেলিপ্যাথীর কথা নিশ্চয় শুনেছেন? চাঁইপাড়ার মেয়েটি মাঝে মাঝে অদ্ভুত টেলিপ্যাথীর নমুনা দেখায়। আমি তো তাজ্জব হোয়ে গিয়েছিলাম। প্যারাসাইকলজি বলছে—আসলে আমাদের ভাবনাগুলো একরকম ব্রেনওয়েভ। বুঝলেন? জাস্ট আলো যেমন এক ধরনের ওয়েভ। শব্দ যেমন আরেক ধরনের ওয়েভ। ব্রেনওয়েভেরও মাপ আছে। রেডিওর মতো স্পেসে ছড়িয়ে যেতে পারে।

প্রিয়নাথ ফিকে হেসে বলে—চলি?

—সে কী? আর বসবেন না? ও স্বাধীন, প্রিয়বাবু চলে যাচ্ছেন!

স্বাধীন বেরোয় না। এক মিনিট অপেক্ষা করে দুজনে। তারপর প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বিজয়েন্দু ঘরে ঢুকে টর্চ নিয়ে দ্রুত হেঁটে তাকে ধরে ফেলে ঠাকুরবাড়িতে। —চলুন, একটু এগিয়ে দিই।

—থাক। বলে প্রিয়নাথ চলে যায়।

বিজয়েন্দু দাঁড়িয়ে থাকে সদর

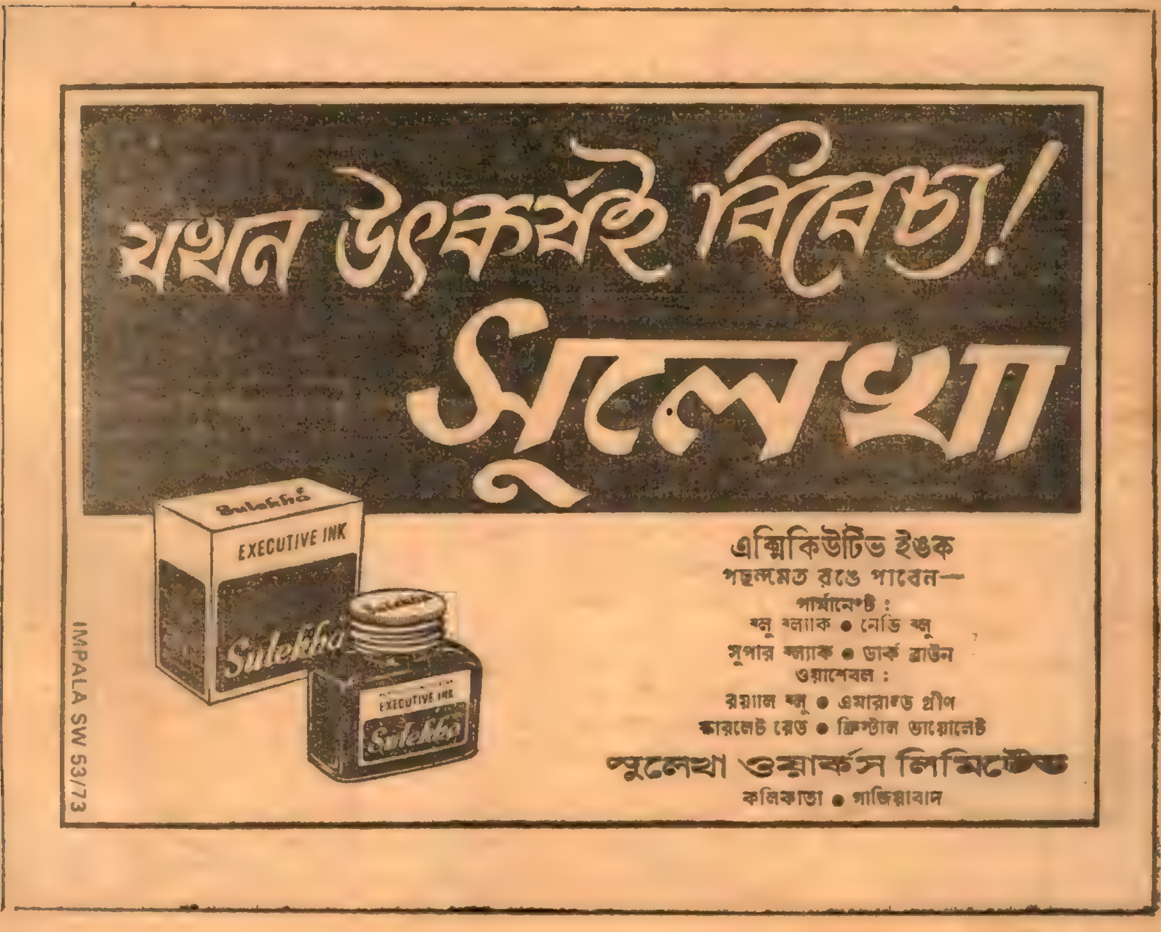

দরজার সিঁড়িতে। আলো জেলে রাখে লেটআপ। খুব লম্বা পা ফেলে প্রিয়নাথ আলোটা এক নিশ্বাসে পেরিয়ে যায়।...

মৃগাঙ্ক ফিরেছে। দাবা খেলছে গগন হালদারের ছেলে সেই মাস্টারমশায় সতোনের সঙ্গে। দাবার ছকে চোখ রেখে বলে—কেমন হল খাওয়া-দাওয়া? আমি তো ভাবছিলাম, আবার নাড়ু-ডাক্তারকে না ডাকতে হয়। ওরে নবীন, তোর বাবু এসেছে। সুস্থ না অসুস্থ দেখে যা।

রাতে খেল না প্রিয়নাথ। মৃগাঙ্ক আর সতোন পাশের বিছানায় দাবা খেলল একটানা রাত বারোটা অব্দি। চোখ বুজে প্রিয়নাথ ততক্ষণ এলোমেলো ভেবেছে, শশধীনের ওটা আদৌ না শুনেছে। ভেবেছে কুসুম, আর রঙীন সব হালসিনেসানের মেঘগুলোর কথা। বিজয়েন্দ্রর চোখদুটো পর্দার ফাঁকে কেন দেখাচ্ছিল তাদের? তারপর কখন ওদের খেলা শেষ হয়েছে। মৃগাঙ্কের মাথার কাছের টেবিলে ঢাকা বাতিটা জ্বলছে ঘুমময় ধূসর আলো। মৃগাঙ্ক হয়তো সতোনকে এগিয়ে দিতে বেরিয়েছে। প্রিয়নাথ ভাবছিল, যথেষ্ট রাত হল, এবার না ঘুমোলে তার কষ্ট হবে। সে তখন কাত হল।

সেইসময় বাইরে মৃগাঙ্কর চাপা হাসির শব্দ শোনে সে। সতোনের গলা শোনা যায়। এখনও ফার্মেই আছে ওরা? তারপর মৃগাঙ্ক বাইরে থেকে ডাকে—ও প্রিয়বাবু, ঘুমোলেন নাকি মশাই?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়নাথ সাড়া দেয়।

—আরে, আসুন, আসুন। ভূত দেখে যান—শিগগির! ও মশাই—প্রিয়বাবু?

প্রিয়নাথ ওঠে।

—কুইক! মৃগাঙ্ক ডাকে ফের। চাপা হাসির শব্দ হয়।

অগত্যা প্রিয়নাথ বেরোয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার?

—আলো জ্বালাই! এখানে আসুন। দেখে যান।

প্রিয়নাথ নিচে নামে। মৃগাঙ্ক ও সতোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁদিকে নদীর ওপর আধখানা চাঁদ সবে উঠেছে। ঘন কুয়াশা জমে আছে দূরে। প্রিয়নাথ বলে—কই ভূত?

মৃগাঙ্ক দেখায়—ওই শ্মশানের দিকটা দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

—কী?

—আলোর চালাচাল্লি! আমাদের দেশের ভূতগুলোর কী অগ্রগতি! ভাবা যায় না।

প্রিয়নাথ এতক্ষণে দেখতে পায়। তার মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটা বিদ্যুৎ—তারপর বুক থেকে নেমে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। শিরশির করে ওঠে শরীর। শ্মশানঘাটের কাছে—হয়তো বাঁধের ওপর কী একটা অর্ধবৃত্তাকার ছোট্ট চালচিত্রের মতো আলোর পকেট—ঝলমল এদিক-ওদিক আনাগোনা করছে। হঠাৎ সেটা চোখেপড়া কঠিন। কারণ এখনও জোনাকিগুলোর মরশুম শেষ হয়নি নিসর্গে। আলোর চালচিত্রটা স্থির হল একটুখানি। তারপর দ্রুত চলতে থাকল দক্ষিণে। কিছুদূরে গিয়ে থামল। আবার ফিরল উত্তরে। মিনিট পাঁচেক তিনজনে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

তারপর সতোন বলে—চলি মিগাংদা। খুব দেখা হল ভূতের খেলা।

—যাবে? এগিয়ে দেব?

—না, না। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন।

সতোন টর্চ জ্বালতে জ্বালতে চলে যায়। প্রিয়নাথ বলে—আপনার টর্চটা জ্বালুন না! কী ওটা?

—ভূত মশাই, সেন্ট পারসেন্ট ভূত। কখনও দেখেন নি, ভৈরবের গাড়ে দেখলেন। সারা জীবন গল্প করবেন।

—ওটা ভূত নয়।

—কী তাহলে?

—চলুন না, দেখে আসি।

—পাগল হয়েছেন? আমার আর কাজ নেই, দুপুররাতে ভূতের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে মরি। আসুন, শুয়ে পড়া যাক।

প্রিয়নাথ গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মৃগাঙ্ক হাসতে হাসতে ওকে ফের ডাকলেও নড়ে না। তখন মৃগাঙ্ক বলে—মজা দেখবেন? ভূতটাকে ভয় পাইয়ে দেব?

সে দ্রুত ঘরে যায় এবং বন্দুক নিয়ে আসে। প্রিয়নাথ কিছু বলার আগেই সেদিকে নল তুলে গুলি ছোড়ে। প্রচণ্ড আওয়াজে রাতের কুয়াসা জোৎস্না ও স্তব্ধতা চাওচুর হয় কয়েকটা মুহূর্তে! তারপর আর আলোটা দেখা যায় না। অনেক খুঁজেও কিছু দেখতে পায় না প্রিয়নাথ।

খামারবাড়ির লোকেরা অবশ্য নির্বিবাদে ঘুমোতে থাকে। ফসলচোরদের সতর্ক করতে প্রায় রাতে মৃগাঙ্ক বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে। কালু খাঁর দিয়াড় এতে অভ্যস্ত। প্রিয়নাথও।

মৃগাঙ্ক বন্দুক নামিয়ে চাপা গলায় বলে—দেখলেন তো? ভূতও ভয় পেতে জানে।

এতক্ষণ ধরে যে সংশয় খোঁচা দিচ্ছিল প্রিয়নাথকে, এবার তা তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সে বলে—মৃগাঙ্কবাবু! ব্যাপারটা কী, বুঝেছি মনে হচ্ছে।

—বুঝেছেন তাহলে?

—হুঁউ।

—খুব দেরী হল বুঝতে।

—কিন্তু ও কেন এসব করে?

মৃগাঙ্ক তার হাত ধরে টানে। —আসুন, ভীষণ শিশির পড়ছে। তারপর ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে বলে—কেন করে, তা বলা মুসকিল। হয়তো আমাকে ভয় দেখাতে চায়, কিংবা নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মজা পায়। পার্ভার্সান এক ধরনের। হয়তো সেক্সুয়াল পার্ভার্সান।

—এর আগে কখনও দেখেছেন?

—হ্যাঁ। অনেকবার। আরও অনেকে দেখেছে। তারা অবশ্য ভূতপ্রেত বলেই মনে করে।

—হালদারমশাই কী বলে?

—সেটা কাল ওকে জিগ্যেস করবেন। ও একবার ধরিত্রীঠাকরানকে ধরে ফেলেছিল নাকি। ওই শ্মশানের ওখানটাতেই।

—আলোটা কিসের?

—বুঝলেন না? স্রেফ জোনাকি! একগাদা জোনাকি ধরেছে। একটা মুকুটের গড়ন হাল্কা শোলাটোলা দিয়ে ফ্রেম বানিয়েছে। তাতে আঠা দিয়েছে। তারপর জোনাকিগুলি বসিয়ে দিয়েছে সারসার। এবার ওই আলোর মুকুট মাথায় পরে মাঠেঘাটে বেরিয়ে পড়লেই দারুণ একটা অলৌকিক ব্যাপার হয়। যত্তসব! শুয়ে পড়ুন।

প্রিয়নাথ শুয়ে আস্তে বলে—এসময় ও সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কী না কে জানে! হাতে-নাতে তো ধরেন নি কখনও। ধরেছেন?

—না। ধরতে পারিনি। আমি এগোলেই লুকিয়ে পড়ে। কীভাবে টের পায়, এটাই আশ্চর্য। মাগীর অ্যাবেকটা ইলেকট্রনিক চোখ আছে যেন। অন্ধকারেও দেখতে পায়। আর সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কি না বলছেন—আমার তো মনে হয়, ও সজ্ঞানে জেনেশুনেই ওসব করে।

—আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, এমনও তো হতে পারে যে ওটা ওর কোন অনুষ্ঠান? কোনরকম আচারও হতে পারে?

ভুট্, ভুট্। কিসের আচার মশাই? আচেন—না, ফুলের?

—না বিজয়েন্দ্রবাবু উইচ-কাল্ট বলে একটা কথা বলছিলেন সেদিন।

—মাস্টারের কথা ধরবেন না। ও একটা পাগল, পাগল।

—মৃগাঙ্কবাবু!

—উঁ? শুতে শুতে জবাব দেয় মৃগাঙ্ক। চোখ বোজে। পা দোলায়।

—এমনও তো হতে পারে, যা করছে, ও টের পায় না—অবসেসানে থাকে।

—আপনাকে পেয়েছে প্রেতটা। ঘুমোন।

* * *

সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ দেখল, গগন হালদার নবীনের সঙ্গে গল্প করছে। তাকে দেখে গগন এগিয়ে আসে।

—কোথায় গিয়েছিলেন মক্কুলবাবু?

—তারপর খবর কী? প্রিয়নাথ এমনি কথার কথা বলে একটা।

গগন চাপা গলায় বলে—কুসমি আপনার খোঁজ করছিল।

—তাই নাকি?

—হুঁ। বিশেষ দরকার বলছিল। খুলে কিছু বলল না।

—আমার সঙ্গে কী দরকার?

—আছে হয়তো কিছু। সময়মতো একবার দেখা করবেন। এখানে তো আসতে পারবে না।

—আমার সময় হবে না, বলবেন।

গগন একটু দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তারপর বলে—আমাকে বলতে এলোছল, বললাম। এখন আপনার ইচ্ছে। তবে কী—মেয়েটাকে কেউ বুঝতে পারল না। ওর কপাল!

গগন চলে যায়। মৃগাঙ্ক মুখ তোলে প্রিয়নাথকে দেখে। —কী বলছিল হালদারমশাই?

—কিছু না।

সে-রাতে আর ঘুম আসে না প্রিয়নাথের। শ্মশানের দিকে কারা মড়া পোড়াচ্ছে। হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একবার ভাবল, কুসুমের বাড়ি যাবে—উচিত তাই হচ্ছিল, পরে আলস্য এল। মৃগাঙ্ক অবশ্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে মশারির মধ্যে।

প্রিয়নাথ শিশিরে দাঁড়িয়ে রইল। শিগগির শীত এসে যাবে মনে হচ্ছে: কুয়াসা বেড়েছে। অন্ধকার পক্ষ চলছে . . . . . . বস্যা। শেয়াল ডাকল কিছুক্ষণ। পেঁচাও . . . . . .। নবীন শুতে যাবার আগে ল্যাম্প্রন থেকে ফেরার সময় বলে যায় উঠে আসুন সার, খুব হিম পড়ছে।

প্রিয়নাথ শ্মশানের দিকে তাকিয়ে ছিল

হঠাৎ একট কিছু চোখে পড়ে তার। সেরাতের মতো একটা ছোট্ট আলোর চাল—কিংবা ওইরকম কিছু—যা নড়াচড়া করছে।

কাঠের বেড়ার কাছে গিয়ে সে দেখতে পায়, আলোটা ফার্মের দিকেই আসছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছিল। জোনাকি গাঁথা মুকুটের মতো—মুকুটের ছেঁদে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে দেখতে থাকে।

বেশ কিছুটা কাছে এসে আলো দাঁড়ায়। অন্তত তিনচার মিনিট। তারপর ফের এগোয়। তখন প্রিয়নাথ বেড়ায় ওঠে। ওপাশে খাল আর ঝোপঝাড়ে-ভরা জমি খানিকটা। খালটা পরিত্যক্তশেষ। ফার্মে ভৈরব থেকে জলও আনা হয়। এক কোমর জল থাকা স্বাভাবিক তবে ডাইনে দক্ষিণে জমি ঘুরে গেছে একটা ছোট্ট গেটমতো আছে। ওখানে একটা কাঠের তক্তা পাতা রয়েছে। ওই পথে হেঁটেই শ্মশানের দিকে যাওয়া যায়।

কিন্তু ঝোঁকের বশে খালেই নামল প্রিয়নাথ। প্যান্ট উরু অবধি ভিজল। মাঝখানে পেরিয়ে পাড়ে ভর দিয়ে ওপারে ওঠল। ঝোপের ওপাশে সেই অলৌকিক তখনও স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে প্রিয়নাথ বলে—কী, টের পাচ্ছ না কিছু? আমি এত কাছে চলে এসেছি, তাও বুঝতে পারছ না?

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতেই সে দেখে, অলৌকিক দ্রুত সরে যাচ্ছে। তখন উঠে দাঁড়ায় প্রিয়নাথ। দৌড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু আর দেখতে পায় না।

বাঁধে গিয়ে চারপাশে খোঁজে। আশ্চর্য তো! এবার প্রিয়নাথ একটু ভয় পায়। মৃগাঙ্ক যা বলেছিল, তা কি সত্যি? মৃগাঙ্ক নিশ্চয় ভুল বলেছে: সে গোঁয়ার—কিছু বিশ্বাস করে না।

গতকাল শ্মশানে মড়া পোড়ানো হয়েছে। কে জানে, আজ রাতটা অমাবস্যার কিনা। ভূতের ভয়ে সত্যি আক্রান্ত হয় সে।

কিন্তু না—ফের সেই আলোটা দেখা যাচ্ছে। নদীর একেবারে ধারে ধারে চলেছে। প্রিয়নাথ নিশিপাওয়া মানুষের মতো দৌড়ে যায়। তারপর চাপা গলায় ডাকে—কুসুম, কুসুম!

অলৌকিক থামে না। সেই দুর্বাঘাসে ঢাকা চটান পেরিয়ে দক্ষিণে বাঁধের দিকে এগোয়। প্রিয়নাথ বাঁধ থেকে নামে। আছাড় খায় মাঝে মাঝে, হাঁচড়-পাঁচড় করে ওঠে, তারপর দৌড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, নাগাল পায় না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে। সবটাই চোখের ভুল নয় তো?

আলোটা থেমেছে। যেন তাকে যেতে বলছে। প্রিয়নাথ ফের দৌড়ে যায়। —কুসুম, কুসুম!

আলো স্থির। একেবারে কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় প্রিয়নাথ। অমনি জলে ঝাঁপ দেবার শব্দ হয়। অন্ধকার জলে আলোর চালটা ডুবে যায়। ফের ভেসে ওঠে।

রাগে দুঃখে প্রিয়নাথ ছটফট করে। এখানটায় দহ। বারোমাস গভীর জল থাকে নাকি। ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি। বুজরুকি ভেঙে দেয় মেয়েটার। এসবের মানে কী? এই আলোর মুকুটপরা, ঠান্ডা জলে ঝাঁপ!

সে ফের ডাকে—কুসুম, কুসুম!

স্রোতে একটাকিছু ধস্তাধস্তি করছে, টের পাওয়া যায়। নক্ষত্রের আলো তিরতির করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কালো কিছু নড়ে উঠছে। কিন্তু তার বেশি কিছু বোঝা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ একটা আতঙ্ক প্রিয়নাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে? মানুষ নয়—নিশ্চয় মানুষ নয়। জৈবনের পাড়ে এক অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার পুরনো—অনেক পিছনের একটা আদিম সত্তার সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ নয় তার পক্ষে। সে-ভাষা তার জানা নেই। সে নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা। পুরনো পৃথিবীতে পা বাড়ানোই তার ভুল হচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে পারে ওরা।

বুকে ভয় আর দুঃখ নিয়ে প্রিয়নাথ দৌড়ে পালিয়ে যায়।...

।। পাঁচ ।।

মৃগাঙ্ককে ঘটনাটা বলেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু মাথার ভিতর ঘুরে ঘুরে মগজ খেতে থাকে কী একটা বিবপোকা। একদিন ঘাটের মাচায় দুপুরবেলা গগনের সঙ্গে দেখা হয় তার। গগন জাল বুনছিল অভ্যাসমতো। ঘাটটা তখন প্রায় নির্জন বলা যায়। গগন তাকে দেখে একটু হাসে। —কী বাবা, আর দেখি না যে আজকাল? খুব চেঁতেপাঁ করা চলছে বুঝি?

প্রিয়নাথ পা ঝুলিয়ে বসে। —কী জাল এগুলো?

—বেসাল। দেখেন নি? দুদিকে দুখানা বাঁকা হালকা বাঁশ, মধ্যিখানে জাল?

—দেখেছি।

—এ আমার নেশা। মরার সময় হাতে দেখবেন সুতোর ডকিল ধরা আছে।

—হালদারমশায়ের বাড়িতে তো এ পাট নেই। তবে জাল বুনে কী হয়?

গগন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—হুঁ, অভ্যেস। তবে বেচি—যা দু পয়সা হয়!

—তোমার আবার পয়সার অভাব হালদারমশাই? ছেলেরা চাকরিবাকরি করছে।

—আমি ছেলেদের পয়সা নিইনে। আপনার মিগাংবাবু জানে—শুধোবেন। থাকি মাথেক পাটকাঠির ঘরে। সত্যেন্দ্ররা ইটের একতলা বানিয়েছে। মহেন্দ্র তো দুর্গাপুরে থাকে। সত্যেন্দ্র বউ-ছেলেপুলে নিয়ে দালানে থাকে। আমি নিজের জায়গায়। হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই।

প্রিয়নাথ অবাক হয়। —সে কী! তাহলে বলব—বউমার সঙ্গে শ্বশুরের বনিবনা নেই!

গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। ...নাঃ। কথাটা তা নয়। সত্যেন্দ্র খুব সাধ্যসাধি করে। আমি বরদাস্ত পারি নে। চিরকাল যা খেয়েছি, তা ছাড়া ভালো খাবারদাবার রুচবা আমার সয় না। আমি তো জলের জীব, ডাঙার নই। জল আমাকে টানে। তাই এখানটায় এসে তাকিয়ে বসে থাকি।

—তাহলে নৌকোয় থাকলেই তো ভালো হত হালদারমশাই!

RUBY DUST
স্বাদ আর আমেজে ভরে তুলুন
উৎসবের দিন আর অবসরের মুহূর্তগুলি
LIPTON
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LIPTON'S
RICHBRU TEA
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA

—সে আর বলতে? সারাজীবন প্রায় নৌকোতেই কেটেছে। তখন তো পুব-পাড়ে বাঁধটাধ ছিল না। দেদোক ছিল জলা আর জঙ্গল। মনের সুখে রাজত্ব করেছি বাবা। ...দীর্ঘশ্বাস ফেলে গগন। —তবে কী, লোভ মানুষকে খেলে। আর মানুষও ক্রমে ক্রমে বেশি জন্মাতে লাগল। এরপর কী হবে, ভেবে ভয় পাই। আমি বুঝিনে গো, সত্যি, বুঝিনে—মানুষের এর বুদ্ধিই বা ক্যানে, ক্যানেই বা এত লটবহর! এও সব মোটরগাড়ি বিদোবুদ্ধি!—হুঃ! কিসে লাগে?

হঠাৎ প্রিয়নাথ বলে—আচ্ছা হালদার-মশাই, তুমি তো ডাইনীর কারবার অনেক দেখেছ। মাথায় জোনাকির টোপরপরা কাকেও দেখেছ?

—হুঁউ। ধরিত্তি পরত। অমাবস্যার কদিন আগে থেকে ওদের এস্যা ব্রত-ব্রত আছে। অমবস্যার রাতে তা শেষ হত। তখন ওরা চানটান করে চুল এলিয়ে উলঙ্গ শরীলে বাড়ি ফিরত। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিত মস্তো। অনেক দেখেছি। এসময় ধরিত্তির কুচুটেভাবটা আর থাকত না। আহা, মাটির মানুষ তখন। যে যা চায়, দিতে দেরী করবে না।

—তার মানে?

—মানে?...গগন মুখ নামিয়ে বলতে থাকে। —সে একটা গুহ্যকথাও বটে। ধরিত্তি বলত, অমাবস্যার নিশিপালনে ওদের পরপুরুষের সঙ্গ করতেই হবে। না হলে ভণ্টো (ভ্রষ্ট) হবে। তাই মনের মতো পুরুষটিকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলবেন—পাবে কোথায় অত রাত্তিরে? তাই না?

—হ্যাঁ।

—পায়। পেয়ে যায়। পছন্দ যাকে, তার বাড়ির আনাচেকানাচে গিয়ে আলোর মটুক পরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছু একটা হয়—আজও বলতে পারব না, বশীকরণের টান না কী মন্তরতন্তরের কাজ, পুরুষটি সুড়সুড় করে চলে আসে। ঘোর লাগে চোখে। নিশির ডাক নতুনবাবু।

—নিজে দেখেছ, নাকি সব শোনা কথা বলছ?

গগন রহস্যময় হেসে ভুরু কুঁচকে তাকায় তার দিকে। তারপর বলে—আমার নিজের কাণ্ড শুনতে চান?

—নিশ্চয়!

—দুই দহে নৌকো বেঁধে আছি। ফি রেতে দেখি এদিক-ওদিক আলোর মটুক মাঠে নেচে বেড়াচ্ছে। সে রাতটা ছিল অমাবস্যার—জানতাম না। নৌকোর খুব কাছে এল যখন, লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলাম। দেখি তো মাগীর দৌড়!

—ধরিত্রী তা জানতে পেরেছিল?

—গগন রাতবিরেতের মানুষ, বাবা। আজ না হয় চোখের সেই আগুন নিভে রাত-কানা হয়েছে।

—তারপর?

—কিছুদূর দৌড়ে জলে ঝাঁপ দিল। আমিও দিলাম। ধরলাম। দেখি, শালী-বেটি উলঙ্গ একেবারে।

—তারপর, তারপর?

—বললাম, ডাঙায় ওঠ। ও যাবে না। বলে—জলেই। মাটি ছোঁবে না—ওই অবস্থাতেই ধরিত্তি পুরুষকে ভোগ করবে। ওই নাকি নিয়ম।

—ব্রিলিয়ান্ট! তারপর?

—হল। তারপর হঠাৎ দেখি ধরিত্তি অন্যমূর্তি। পিশাচী একেবারে। আমার গলা টিপে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করল। প্রথমে ভেবেছিলাম, খেলা—পরে বুঝলাম, না, অন্য সাংঘাতিক মতলব মাগীর মাথায়। ভয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু তখন আমি জোয়ান মানুষ, গায়ে আট-নটা হাতির জোর ছিল। বেকায়দা দেখে ও স্রোতে ভেসে পালাল। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে পাড়ে উঠলাম। অন্য কেউ হলে ঠিক মেরে ফেলত ধরিত্তি।

—কেন, কেন?

—সেটা আজও সন্দিস্যে, নতুনবাবু। বলতে পারব না ক্যানে।

প্রিয়নাথের হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গেল যেন। গলা শুকিয়ে গেল। সে-রাতে কুসুম কি তাহলে তাকে ভোগ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

—পরে কথাটা একশোবার শুধিয়েছি ওকে। বলেছে—ছি ছি! ও কী কথা! পায়ে হাত দিয়ে কেঁদেও ফেলেছে। আসলে—হয়তো তখন মানুষ থাকে না ওরা। জানতেও পারে না যে কী ভাল-মন্দ করছে।

অবসেসন? প্রিয়নাথের মনে পড়ে বিজয়েন্দুর কথা। 'অবসেসন', 'নির্জ্ঞান মনে হত্যার বাসনা', এইসব কী আলোচনা করেছিল একদিন ওই শ্মশানের ধারে। কিছু কান করেছিল—কিছু করেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু সেক্সের সঙ্গে হত্যার কী সম্পর্ক? সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

—নতুনবাবু, কী ভাবছেন?

—ভাবছি, তাহলে ধরিত্রী তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?

—তাছাড়া কী?

—পারল না বলে নিশ্চয় ভ্রষ্ট হল? ডাকিনীবিদ্যা কী বলে?

গগন হাসে আবার। —ধরিত্তি তো ডাকিনীকুলে ভণ্টো মেয়ে ছিল। ও না হল খাঁটি ডাকিনী হতে—না পারল মানুষ হতে। ওর মধ্যে মানুষের লোভ-টাই ওজনে বেশি ছিল। তাই শেষঅব্দি ডাকাতদলের সর্দারণী হল। কিন্তু কোথায় সোনাদানা? একপয়সাও তো রেখে যায়নি। কুসুম মেঝে খুঁড়েছিল—মাটিতে কিছু পোঁতা আছে নাকি দেখতে। বেচারী একটা কানাকড়িও পায়নি। আমার ধারণা, ধরিত্তি ডাকাত-দের শুধু খোঁজখবরই যোগাত। বুঝলেন? হিস্যে হয়তো পেত সামান্য কিছু। পোড়া পেট মানুষের! ওকে ঠকিয়ে ফুর্তি করেছে ডাকাতব্যাটারা।

—কুসুম আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, বলেছিলে। কেন? আর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে?

—হয়েছে।

—বলেছিলে, আমি দেখা করতে চাইনি?

—হুঁউ।

—শুনে কী বলল?

—হাসল।

—হাসল?

—হুঁউ। তারপর চলে গেল। ওর ছাগলটার অসুখ হয়েছে। বাঁচবে না।

—হালদারমশাই, ডাকিনীরা — মানে ধরিত্রী, গায়ে অত জোর পায় কোথায় যে পুরুষমানুষকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে?

গগন একটু ভেবে বলে—সেটা সন্দিস্যে। তবে দেখেছি, ভূতেধরা রোগা লিকলিকে মেয়ে দাঁতে জলভরা পেতলের কলসী কামড়ে দৌড়ে যায়। জলিল মণ্ডলের বউকে একবার ভূতে ধরল। শিমুলিয়ার নাড়ু ওঝাকে ডাকা হল। ওদের বাড়ির সামনে পাড়বাঁধানো কুয়ো আছে। ভূতটা ছেড়ে যাবার সময় নাড়ু হুকুম দিলে —কুয়ো পেরিয়ে যা। বউটা অমনি একলাফে কুয়ো পেরিয়ে গেল। সবাই দেখেছে। কোত্থেকে অত জোর আসে গায়ের বলতে পারব না। ভূতের ব্যারাম উঠলে চারপাঁচজন বলবান পুরুষ আটকে রাখতে পারে না রুগীকে। এমন কত দেখেছি।

ছেলেবেলায় শোনা কথা বরাবর মনে থাকে। বিজয়েন্দুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতেও ইচ্ছে করে না আর। ওরা স্বামীস্ত্রী দুজনেই হঠাৎ কেন যেন এড়িয়ে চলছে প্রিয়নাথকে। কুসুম বলে-ছিল গন্ধপোকার গন্ধ আর কুটে পোকার কুটের কথা। অবিশ্বাস্যভাবে সেই কার-বার! কিন্তু স্বাধীন তাহলে কেন এড়িয়ে থাকবে?

গগন কথকের ঢঙে বলে ওঠে— এ হল ভূতিনীপ্রেতিনীডাকিনীযোগিনীর দেশ, নতুনবাবু। এই মন্দিরটা দেখছেন, ভৈরব। বাবা ভৈরব। মা গঙ্গা ওখানে শুলেন উত্তরশিয়রে, তো বাবাও এসে একটু কায়াকে মজা করে উত্তরশিয়রে শুয়ে পড়লেন। বাবার সাঙ্গপাঙ্গ — ওইসব ভূতিনীডাকিনী-যোগিনী বাবার সঙ্গে এসে জুটল। বাবা এলেন, ওরা না এসে পারে? আপনি ভৈরবের মন্দিরে যাবেন, ওখা তন্তরমন্তর ডাক-ডাকিনীর বাসা দেখবেন দুই পাশে।

গগন চুপ করে যায়। প্রিয়নাথ ওর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, গগন জেলের চোখের সামনে এক-খান মায়াজগতটা হুড়মুড় করে ভেঙে

পড়ছে, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ও খুঁজছে কাকেও—খাঁজাকেই হয়তো।

প্রিয়নাথ একটু পরে বলে—কুসুমের সঙ্গে আমি দেখা করব, গাদাধরমশাই।

উঁ? কাকে?

—দেখা করতে চেয়েছিল, বলছিলে যে?

—হুঁ।

—এখন কি বাড়িতে আছে সে?

গগন মাথা দোলায়। জানে না। তারপর জাল বুনতে শুরু করে সে। গম্ভীর হয়ে গেছে হঠাৎ।

প্রিয়নাথ উঠে পড়ে। ঘাটে পাট-বোঝাই নৌকো ভিড়েছে। লোকেরা উদোম ভিজে গায়ে ওপারে পাট কেচেছে সকাল থেকে। হাতে কাঠের গোঁজা। এখন বিশ্রাম করছে। খুশমেজাজে হুঁকো।

প্রিয়নাথ নদীর ধারে ধারে ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে যায়। সেরাতের ঘটনাটা এখনও খুবই উত্তেজিত করে তোলে। কুসুম কি তাহলে ওদের প্রথমতো উজ্জ্বল জিন? জলে নামতে পারেন প্রিয়নাথ—সে গগন নয়। অতখানি বন্য আবেগ তার রক্তে নেই। জলে ঝাঁপ দিলে কি কুসুম তাকে আমন্ত্রণ জানাত এবং তারপর মেরে ফেলত? অবিশ্বাস্য লাগে। আবার বিশ্বাস করতেও সাধ যায়। স্বাধীন বলেছে কসুমকে এড়িয়ে চলতে—লোভ দেখাবেন না। কিন্তু লোভ তো কুসুমই দেখাচ্ছে তাকে। পালিয়ে নালিশ করে এলে কী হয় স্বাধীনের কাছে?

সবজীক্ষেতের বেড়া ঘুরে গাব-গাছটার কাছে পৌঁছয় প্রিয়নাথ। দিন-দুপুরে গাছটা এবং কুসুমের কুঁড়েঘরের সব রহস্য মুছে গেছে। একটা প্রচলিত দারিদ্র্য ঘিরে আছে জায়গাটা। একটু সঙ্কোচ লাগে।

সে-রাতে ঘর বা পরিবেশ স্পষ্ট ছিল না। এখন স্পষ্ট। প্রিয়নাথ কোন মায়া দেখে না সেখানে। ওই পাটকাঠির বেড়ার ঘর—কাদায় ছিটে দেওয়া দেয়াল, তালপাতা আর খড়ের চাল, হতশ্রী, তার মধ্যে কুসুম থাকে। একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য এখানে বনের অন্ধকারে পচে শেষ হয়ে যাবে, নির্জন বাসনার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ছারখার হবে! চোয়াল শক্ত হয় প্রিয়নাথের। মনে মনে বলে—কার হাতে ধরা আছো কুসুম? তাকে আমি দেখতে চাই মুখোমুখি। তার সঙ্গে লড়তে চাই।

আর, সেইসময় ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে কুসুম এদিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে যায়।

প্রিয়নাথ বেড়ার ওপার থেকে একটু হেসে বলে—ডেকেছিলে?

কুসুম বেশ দেরী করে জবাব দিতে। সে লঙ্কাঝাড়ের মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে আসে ওর দিকে। তারপর একটু হাসে।

—আসবেন না বলেছিলেন। কেন এলেন?

—কথা আছে।

—আমার কথা ছিল, শোনেন নি। আমি কেন শুনব, নতুনবাবু?

—তুমি আমাকে ভেতরে ডাকছ না, কুসুম!

—আপনি কি আর আসবেন ভেতরে? জাত যাবে না? মিগাংবাবু বন্দুক নিয়ে হামলা করতে আসবে না?

—না।

একটু চুপ করে থাকার পর কুসুম চাপা হেসে বলে—পারেন তো বেড়া টপকে আসুন। সদর দরজায় আস্টে-পিস্টে কাঁটা দিয়ে রেখেছি। ওদিকে এলে আমি কথা বলব না আপনার সঙ্গে।

প্রিয়নাথ বেড়ার দিকে তাকায়। কাঁটায় ভর্তি। প্রায় বুকসমান উঁচু। হাইজাম্প অভ্যাস ছিল কিশোর বয়সে। এখন আর সে দম হয়তো নেই।

—কী? পারবেন না?

—এখানেও তো কাঁটা তোমার।

—একটু কাঁটার খোঁচা লাগবে না কুসুমের কাছে আসতে? কুসুম কি কাঁটাছাড়া গাছের ফল?

প্রিয়নাথ তার হাত আর ঠোঁট দেখায়। —এই তো লেগেছে। এই সেরা দাগগুলো কিসের চিনতে পারছ না?

—কিসের?

—যে-রাতে পাকারাস্তায় ধস্তাধস্তি করলাম তোমার সঙ্গে! কটা চুড়ি ভেঙেছিল কুসুম?

—দাম দেবেন নাকি?

—চাইলে দেব।

—দেরী হয়ে গেছে। কই, চলে আসুন! লাফ দিন না!

প্রিয়নাথ সদর দরজা অর্থাৎ আগড়টা খোঁজে। সেরাতে ওই কাঁটার আগড় পেরিয়ে ঢুকেছিল। ডাইনে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। চারদিকে শুধু ঝোপ-ঝাড় গাছপালা আর মাঝে মাঝে সব্জী-ক্ষেত। সে ঘুরে যেতে পারে—সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু কুসুম তার সঙ্গে কাঁটার বেড়া নিয়ে খেলা করতে চাচ্ছে দেখেই যে পাছিয়ে যায় এবং দৌড়ে এসে লাফ দেয়। প্যান্ট-জুতো কাঁটার আঁচড় থেকে বাঁচাল তাকে। কিন্তু কিছু লঙ্কাগাছ তার শরীরের তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে গেল। অমানুষিক ধরনের খেলা যেন।

কুসুম খিলখিল করে হাসে।—বাঃ! পারলেন! আপনি অনেককিছু পারবেন।

—অপয়া মানুষ সবই পারে। বলে ধুলোমাটি খড়কুটো আর কাঁটা ঝেড়ে ফেলে প্রিয়নাথ।

কুসুম লঙ্কাগাছগুলো সযত্নে সোজা করে দেয়। —দিলেন তো সব নষ্ট করে।

দুজনে দাওয়ায় ওঠে। তারপর কুসুম বলে—ভেবেছিলাম, রাগ করে চলে যাবেন। কাঁটার বেড়া টপকে কি ভদ্রলোক আসে? কিন্তু এলেন।

—আমি ছোটলোক তাই।

—ছিঃ, আমি তা বলিনি! বলে মাদুর পাতে কুসুম। —বসুন।

প্রিয়নাথ বসল। —তুমি সে-রাতে জেলাকির ঢোঁপর পারে কী করছিলে?

মুহূর্তে কুসুমের মুখটা ছাই হয়ে গেল। সে চোখ রাখল নিজের পায়ের দিকে।

—তুমি যেন আমাকে ডাকছিলে। আমি গেলাম। দৌড়ে ধরতে পারলাম না। তুমি নদীতে ঝাঁপ দিলে। তখন আমি ফিরে এলাম। যদি ঝাঁপ দিতাম, কী করতে কুসুম?

সে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখের পাতা দ্রুত কাঁপল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

প্রিয়নাথ জেদের স্বরে বলে—তোমার রক্তের খেলার সঙ্গী হতে পারিনি আমি। হয়তো সে সাহস আমার ছিল না। কিন্তু ও কি খেলা তোমার কুসুম? কেন তুমি অমন করো? কেন তুমি মানুষের মতো আমার সঙ্গে মিশতে পারছ না?

একটু চুপ করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করে সে। কুসুমের চুলগুলো হঠাৎ বুকের ওপর ডান কাঁধ পেরিয়ে খুলে পড়ে—কুণ্ডলী ছাড়িয়ে সাপের সোজা হবার মতো। কিন্তু সে মুখ ফেরায় না। বাঁ কাঁধে চিবুক রেখে মুখটা ঘুরিয়ে চুপ করে থাকে।

প্রিয়নাথ ফের বলে — তোমার স্বাধীনদা আমাকে নিষেধ করেছেন তোমাকে যেন এড়িয়ে চলি। তোমাকে রেহাই দিতে বলেছেন উনি। আমি কোন জবাব দিইনি তাঁকে। কী জবাব দেব? আমি তোমাকে মানুষের মতো পেতে চেয়েছি। এ চাওয়া থেকে আমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। ...বেশ। ধরে নিলাম, আমি তোমার অযোগ্য। তাহলে বলো, কীভাবে তোমার যোগ্য হবো?

কুসুম কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে—আপনি শিগগির চলে যান, নতুনবাবু।

—কেন? তোমার ভূতটার ভয়ে? আমি আজ মরীয়া হয়ে এসেছি, কুসুম।

—কেন এলেন?

—কেন তুমি সে-রাতে অমন করে আমাকে ডাকলে?

—আমি ডাকিনি।

—মিথ্যে বলো না। দেখ, কুসুম—একটা মনগড়া মিথ্যের ফাঁদে পড়ে থেকে অমন তাজা জীবনটাকে কেন তুমি নষ্ট করবে?

কুসুম পলকে ঘোরে। চোখে জল, তীব্র চাহনি—কিন্তু ডাকিনীর নীল উজ্জ্বলতা অবশ্য নেই এখন। ফোঁস করে ওঠে সে। —মিথ্যে!

—হ্যাঁ মিথ্যে। ভীষণ মিথ্যে।

আফগান স্নো আপনার স্বপ্নকে রূপায়িত করুক
একমাত্র নিখুঁত সৌন্দর্য প্রসাধনী আপনার বর্ণ-সুষমাকে লাবণ্য-মণ্ডিত করে। এর কোমলস্পর্শ ত্বককে মসৃন এবং নিমেষে আপনার সুপ্ত সৌন্দর্যকে বিকশিত করে।
AFGHAN SNOW
E. S. PATANWALA, BOMBAY-86

কুসুম তীব্রভাবে মাথা দুলিয়ে বলে —না, মিথ্যে নয়। আপনি জানেন না, কে আমার কাছে আছে। এসব কথা বললে আপনার বিপদ হতে পারে নতুন-বাবু, বলবেন না।

প্রিয়নাথ হাসে।—এই তো আমি বসে আছি, হোক না বিপদ।

কুসুম কী করবে ভেবে না পেয়েই যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মুখটা ফের ঘুরিয়ে নেয়। ভাঙা গলায় বলে—আমারও সাধ যায়, ভালো কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি, শহরে যাই, সিনেমা দেখি, স্বামীর ঘরসংসার করি। পেটে-কোলে দুটো আসুক, আমাকে মা বলুক। কিন্তু আমার সে পথে যে কাঁটা দিয়ে গেছে, নতুনবাবু। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। কী দিয়ে বোঝাব? আপনি যান, ভগবানের দোহাই আর লোভ দেখাবেন না!

প্রিয়নাথ নিষ্পলক চোখে তাকে দেখতে থাকে।

কুসুম ফের বলে—আমারও কত সাধ ইচ্ছে আছে, আপনার যেমন আছে। যখন থেকে আপনাকে দেখেছি, কী যেন মনে হয়েছে—বুকটা কেঁপেছে, বিশ্বাস করুন। বলতে লাজ নেই আমার। কুসুম বেহায়া মেয়ে, সবাই জানে। হ্যাঁ, আমারও লোভ হয়েছে আপনাকে দেখে। কিন্তু তার জন্যে সাজা তো কম পাচ্ছিনে সেদিন থেকে। আমার রক্ত কালি করে দিলে! যখনই আপনার কথা ভাবি অমনি কী সব হয়। কী যেন...

—কী, কুসুম? কী হয়?

—মাথায় ভিতর ঠান্ডা বরফের হাত পড়ে। যেন মগজটা তুলে ফেলবে মনে লাগে। আমাকে স্থির থাকতে দেয় না।

—কে সে?

—তাকে কি চিনি, না দেখেছি? তবু সে আছে। তার চোখ থেকে এক-দণ্ড তো বাইরে যাবার জো নেই! সে আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জানেন না!

প্রিয়নাথের হঠাৎ মনে হল, গাব-গাছটায় কোত্থেকে এতক্ষণে বাতাস এল। হলুদ কিছু পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেল ঝরঝর সরসর থরথর। কোথায় টানা সুরে চিল ডেকে উঠল। কী যেন ধূসরতা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল আস্তে আস্তে। রোদ ফিকে হলুদ হয়ে পড়ল। প্রিয়নাথ একটা অশরীরী অস্তিত্বকে ঝেড়ে ফেলতে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু কিছুতেই এই বিদঘুটে ভাবটা এড়ানো গেল না। নিজের সঙ্গে এক তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে তার।

পরক্ষণে প্রিয়নাথ আরও চমকে ওঠে। ও কি! কুসুমের ভিজে চোখদুটো আবার এখন সেইরকম নীল হয়ে উঠেছে যে! তার ঠোঁটে এখন কেমন হাসি। নিষ্পলক নীল চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এ হাসি সহজ নয়। মানুষেরও নয়।

মুহূর্তে হৃদপিণ্ডে রক্ত শিটিয়ে উঠেছিল। তক্ষুনি সামলে নেয় প্রিয়নাথ। দ্রুত চারদিকটা দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই।

সে কুসুমকে দুহাতে ধরে ফেলতেই কুসুম কাঁপতে কাঁপতে সে-রাতের মতো পড়ে যায়। তখন তাকে এক হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ঘরে নিয়ে যায় সে। ছোট্ট ঘর। সুন্দর নিকানো মেঝে। একটা বেদি কোণে। মাটির পিদিম আছে। কিছু সিঁদুরের ছোপ। একটা মড়ার মাথা। ধরিত্রীরই মাথার খুলি সম্ভবত।

ওকে শুইয়ে দরজাটা এঁটে দেয় প্রিয়নাথ। হাঁফাতে হাঁফাতে নিজেকে তৈরী করে নেয়। কুসুমের চোখদুটো খোলা রয়েছে—তেমনি উজ্জ্বল নীল। আশ্চর্য সুন্দর লাগে মেয়েটাকে। বুকের কাপড় সরে ফিকে লাল জামা আঁটো দেখা যায়। হয়তো স্বাধীনেরই জামা।

তারপর সে কুসুমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারপর সত্যি সত্যি কী এক অমানুষিক শক্তির সঙ্গে তার অনিবার্য লড়াইটা শুরু হয়ে যায়। কুসুমের নখের আঁচড়ে তার মুখ গলা বুক ফালাফালা হয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছিটকে পড়তে হয়। ফের সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফের ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। শব্দহীন দুটি ঠোঁটই—কিন্তু বিকৃত ফোটে মুহূর্মুহু। শ্বাসপ্রশ্বাসের চরম শব্দে ঘরটা যেন বেলুনের মতো টান-টান ফুলে ওঠে। তাপে তেতে ওঠে। জানালাবিহীন এসব ঘর। তাই ভিতরে এখন আবছা অন্ধকার দিনদুপুরেই। তার মধ্যে মরাবাঁচার বীভৎস ধরনের লড়াইটা দু-পক্ষ সমানে চালিয়ে যায়। একসময় প্রিয়নাথ কুসুমের দুটো বাহু চেপে মাটির সঙ্গে প্রাণপণে ধরে থাকে এবং পেটের ওপর হাঁটুর চাপ দিলে কুসুম হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে যায়। নাকিস্বরে কীসব বলতে থাকে অস্ফুট উচ্চারণে—নাকি ওদের খোট্টাই চাই-বোলিতে—কিছু বোঝা যায় না। প্রিয়-নাথ আদর করে জাগাতে চায় তাকে।...

একটু পরে প্রিয়নাথ বেরিয়ে আসে।

দরজা ফাঁক করে আগে দেখে নিয়েছে, কেউ কোথাও আছে কিনা। কেউ নেই। এদিকটা গাঁয়ের শেষপ্রান্ত। নদীঅব্দি ঝোপঝাড় রয়েছে।

নদীতে নেমে সে হাতমুখ ভালো করে ধোয়। প্রচণ্ড জ্বালা করতে থাকে ঠোঁট, নাক, গাল আর গলার কাছটা। বিষিয়ে যাবে কি না কে জানে। বাসায় ফিরেই অ্যান্টিসেপটিক কিছু লাগাতে হবে। ফার্স্টএডের বাকসো একটা আছে ফার্মে। ওরা শুধোলে কী বলবে?

হ্যাঁ, ওপারে বেড়াতে গিয়েছিল আমলাবাগে। হায়েনার পাল্লায় পড়েছিল। সম্প্রতি শিমুলিয়ায় হায়েনার উৎপাত হয়েছে। মৃগাঙ্ক বলছিল। তার হায়েনাটা মারতে যাবার কথা আছে। একটা জাঁকালো গল্প বলা যাবে।

অনেক ঘুরে ফার্মের দক্ষিণগেট হয়ে ঢোকে প্রিয়নাথ। সোজা কেউ দেখার আগে প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে ঢোকে। ভাগ্যিস, মৃগাঙ্ক নেই। নাটকটা থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া গেল। এখন ওষুধ লাগিয়ে চুপচাপ শোবে। চাদর মুড়িও দেওয়া যায়। মৃগাঙ্ক এলে তখন দেখা যাবে বরং।

যথাসময়ে প্রিয়নাথ শোয়।

কিন্তু জ্বালা, ডাকিনীর নখের বিষ, মৃত্যুভয়, অনুশোচনা—যা এতক্ষণ নদীর ধারে তাকে অনুসরণ করেছিল, সব ক্রমশ মুছে যায়। এবং অতি ধীরে জেগে ওঠে একটা গভীর তৃপ্তির ভাব। মনে হয়, জীবনে এই এক আশ্চর্য পাওনা মিলে গেল। গাঢ় তৃপ্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে প্রিয়নাথের। প্লাস্টারকরা মুখ নিয়ে সে যেন হিস্টিরিয়ার ফিটে তলিয়ে যায়—নির্জন দেশে।

এবং যাবার শেষমুহূর্তঅব্দি একটি ভার তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় : কুসুমকে তার ভাল লেগেছিল।

তাই ঘাসের ফুলের মতো একটা খুবই ছোট্ট হাসি তার বিক্ষত নিচের ঠোঁটের কোণায় জেগে থাকে কতক্ষণ।...

নবীন এসে জাগায় তাকে। তখন কালুখাঁর দিয়াড়ের মাঠে সন্ধ্যা নেমেছে। —স্যার, নতুনবাবু। উঠুন, চা খান।

প্রিয়নাথ তাকায়। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। তারপর সব মনে পড়ে। সে বলে —রাখো। মৃগাঙ্কদা কোথায়?

—পার্টের সঙ্গে বহরমপুরে গেছেন, সেই দুপুর বেলা। আপনাকে খুঁজলেন, পেলেন না। ট্রাক-ড্রাইভার তাড়া লাগাল। অমনি চলে গেলেন। কোথায় ছিলেন?

—ওপারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ নবীনের চোখে পড়ে প্লাস্টারের ফালিআঁটা ক্ষতচিহ্নগুলো। সে চমকে ওঠে। —আরে, ও কী? অত কাটাকুটি করলেন কিসে?

প্রিয়নাথ একটু পরে জবাব দেয়—দাড়ি কাটতে কেটে গেছে।

হায়েনার চেয়ে এটাই স্বাভাবিক—অন্তত আঁচড়ের দাগ যেভাবে রয়েছে। নবীন চলে যায়। উঠতে গিয়ে শরীর কেমন আড়ষ্ট লাগে প্রিয়নাথের। একটু শীতশীতও করছে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহের দিকে সন্ধ্যাবেলাগুলো হিমেল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। বাইরে পাখিদের প্রচণ্ড হল্লা হচ্ছে গাছপালায়। বছরের

এ সময়টা ওরা সন্ধ্যাবেলায় এত চেঁচামেচি করে কেন, ভাবতে ভাবতে প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেয়। হাতটারও ওজন হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে।

দরজার বাইরে ফার্মের বিশাল ক্ষেতখামার এখন ধূসর। মজুর-মজুরনীদের ছায়া ক্রমশ সরে যায় একে-একে। তারপর আলো জ্বলে ওঠে কিছু অংশে। ধবধবে সাদা মাটি কিছু কিছু ম্যানকলাইয়ের স্তূপে ঢাকা—তার ওপর একটা কুকুর দৌড়ে পালায়। নবীনের আওয়াজ শোনা যায়—ভাগ, ভাগ, পালা! তারপর থলথলে গরিলার মতো প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে গগন হালদারকে দেখা যায় আসতে।

প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে ইচ্ছে করে না। অবসাদ আর আড়ষ্টতা শরীরকে ভারি করেছে এতক্ষণে। ক্ষতগুলো টনটন করছে। গগন দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলে—এখনও শুয়ে আছেন?

—এস হালদারমশাই।

গগন ঢুকে দুই বিছানার মাঝখানে একটা টুলে বসে পড়ে। প্রিয়নাথের দিকে কেমন চোখে তাকায়।

প্রিয়নাথ হেসে বলে—কী দেখছ?

গগন সেকথার জবাব দেয় না অবশ্য। গম্ভীর হয়ে ঘরের দেয়ালগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখার পর বলে—জ্বরটর নাকি?

—নাঃ। কেন?

—চাদর গায়ে চড়িয়েছেন!

—একটু শীতশীত করছিল। তোমার শীত করে না? দিব্যি খালিগায়ে রয়েছ দেখছি!

—শীতবর্ষা আমার নাই, নতুনবাবু। আমি জন্মমানুষ।

প্রিয়নাথ একটা আড়ামোড়া দেয়। তারপর মনে মনে অবাক হয় যে গগন তার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না। তাই সে মুখে হাত বুলিয়ে বলে—কী সব বাজে ব্লেড বেরিয়েছে! দাড়ি কাটতে গিয়ে আজ মুখোতিক্ত কাটাকুটি করে ফেলেছি।

—ওষুধ দিয়েছেন দেখছি।

—হ্যাঁ। বলা যায় না, সেপটিক হতে পারে।

—পরে বইকি?...গগন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে—ওটা বঙ্কুবাবুর ছবি না?

—হ্যাঁ।

উঠে গিয়ে মৃগাঙ্কের বিছানার পিছনের দেয়ালে জানালার ওপর বঙ্কুবাবুর বড়ো ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ন্যাবড়া আঙুল বুলিয়ে কিছু পরখ করে। তারপর সরে এসে বলে—কাচে ঢাকা।

প্রিয়নাথ শুধু হাসে।

—বঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিল সা বিষিয়ে। অমনি—আপনার মতো সারা মুখ গাল গলা ফালাফালা হয়েছিল। নাড়ু-ডাক্তার ওষুধও দিয়েছিল। কিন্তু কিছু হয়নি। রাতারাতি মুখ হাঁড়ির মতো ফুলে গেল। জ্বর হল প্রচণ্ড। ভুল বকতে লাগল সারাটা রাত। তারপর সকালে শহরে নিয়ে গেল। আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে। সেখানে কিছু হল না বলে কলকাতার বড়ো হাসপাতালে তুলল মিগাং। কদিন পরে মারা গেল।

প্রিয়নাথের বুকটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। আড়ষ্ট হেসে সে বলে—বাঁদরে আঁচড়ে না কামড়ে দিয়েছিল শুনেছি।

—বাঁদর? বলে একটু চুপ করে থাকে গগন। ফের বলে—তাই রটানো হয়েছিল বটে।

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়।—রটানো হয়েছিল মানে?

—হ্যাঁ। মানী লোক। মানের দাম লাখ টাকা তার।

—বাঁদর নয় তাহলে?

গগন মাথা দুলিয়ে নিষ্ঠুর আর চাপা হাসে। —নাঃ, বাঁদর নয়।

—তাহলে কী?

—মানুষ।

—মানুষ! সে কী?

—মানুষ বলতে পারেন, আবার অমানুষও বলতে পারেন। একই কথা।

প্রিয়নাথ আধখানা উঠে বসে। —হালদারমশাই, খুলে বল তো কী হয়েছিল বঙ্কুবাবুর?

—আপনি ভয় পাবেন নতুনবাবু।

—কেন? আমি ভয় পাব কেন হালদারমশাই?

—পাবেন না তো?

—না।

—ধরিত্রি তখন বেঁচে আছে। কুসমি মান্নাবর মোড়লের বাড়ি থাকে, খায়, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মাঈর কুঁড়েঘরেও আসে। ঘরের মধ্যে থান আছে, তন্তরমন্তর পালন করতে হয় তাকে। মায়ের হুকুম। তা এক খরার নিঃঝুম দুপুরবেলা তার খোঁজে বঙ্কুবাবু সেখানে হাজির হল। কুসমি তখন বেশ ডাগর। বুক উঠেছে। শাড়ি ধরেছে! দেখলে মানুষের চোখ সরে না। ধরিত্রির গাছের ফল—যেন মায়ের চেয়েও ঝলমল করে। বাঘের নোলায় টসটস করে জল ঝরে। বঙ্কুবাবুর কুবুদ্ধি—মাথায় কামের পোকা কটকট করছিল। তাকে বাগে পেয়ে ধরল। আমি সেই সময় নতুন জালে গাবের কষ মাখাবো বলে ওদের গাবগাছে চড়ে আছি ঘন ডালপালার মধ্যে। গাব পাড়ছি ঠুসি (একরকম আঁকশির মাথায় ছোট্ট জালের থলি) নিয়ে। সব দেখছিলাম। হায় রে কাম! তোর আগুনের নাই—সব সমান! কুসমি তো যেমনই জগৎসংসার। মেয়ে হতে পারে বঙ্কুবাবু, ভুলে গেল। মনে মনে গাছ থেকে সেই কথাটি বললাম বঙ্কুবাবুকে।

প্রিয়নাথ আস্তে বলে—তোমারও মেয়ে হতে পারে! বলার পর সে ভেবে পেল না, কেন একথা হঠাৎ মাথায় এল তার।

গগন বলে—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। সে ধাঁধা আমার এখনও ঘোচেনি। ধরিত্রির পুরুষ ছিল হেঁপো রুগী। অক্ষম অথর্ব।

—তারপর?

—তারপর আর কী? বঙ্কুবাবুকে দেখলাম মুখখানা ফালা ফালা লাল করে বেরিয়ে আসতে। নদীর দিকে দৌড়লেন। গিয়ে ধরে ফেললাম। এ কী হল বাবুদাদা, সুন্দর মুখখানা অমন হল কিসে গো? বঙ্কুবাবু দু-হাত চেপে ধরল। গগন, তোর কত উপকার করেছি, এখনও করছি—ঠিক কিনা বল। আমার মান তুই বাঁচা ভাই। হ্যাঁ, উপকার করেছিল বটে। ছেলেদুটোকে লেখাপড়া শেখানোর সব ভার নিয়েছিল সে। আমি কথা রাখলাম। আজঅব্দি কাকেও বলিনি।

—আমাকে বললে যে?

—ক্যানে বললাম জেনেও কি জানেন না নতুনবাবু? আমি সব দেখেছি আজ।

প্রিয়নাথ তার দিকে তাকিয়ে মুখ নামায়।

—তো সেকথা যাক। আপনার কপাল আপনার নিজের। বঙ্কুবাবুর কথা শুনুন। সে তো কলকাতার হাসপাতালে মারা গেল। সেখানে মরার সময় বুদ্ধির ভুলে কী বলতে কী বলে বসল ছেলে মিগাংকে। মিগাং ফিরে এসে একদিন ওপারের বিলে কুসমিকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করল। গুলিও ছুঁড়েছিল—লাগেনি। কুসমি পালিয়ে এসে আমার পা ধরে কেঁদে পড়ল। তো কী করতে পারি আমি? সামান্য মানুষ। মিগাং বড়লোক জোতদার। তাকে একলা পেয়ে হতভাগী মেয়েটার হয়ে কমাভিক্ষে করলাম। মিগাং শুনবেই না। তখন আমি বললাম—মিগাং, তাহলে পস্টাপস্টি কথা শোন বাবা। যদি কুসমির কিছু ভালমন্দ হয়, আমি ইসলামপুর থানার দারোগাবাবুর কাছে ডাইরি এপোর্ট (রিপোর্ট) করে আসব।

প্রিয়নাথ অস্ফুটস্বরে বলে—ব্ল্যাকমেল।

গগন কান করে না। —মিগাং জব্দ হল। বলল—ঠিক আছে। তোমার কথা রাখলাম। কিন্তু কেউ যেন আর শোনে না। বাবার নাম আছে তল্লাটে। সে নাম যেন নষ্ট হয় না হালদারখুড়ো। কথা আমি রেখেছি, নতুনবাবু।

—আমাকে কেন বললে?

—বললাম। আপনি সাবধান হোন। এক্ষুনি বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে আসুন। কুসমির নখে সাংঘাতিক বিষ আছে।

প্রিয়নাথ কী বলবে, বুঝতে পারে না।

—ব্যথা আছে নাকি? জ্বরটর লাগছে?

প্রিয়নাথ রুষ্টভাবে বলে—কিছু নেই। বাজে কথা বলো না হালদারমশাই। আমার কিছু হয়নি। তোমাকে অত ভাবতে বলিনি তো আমি।

গগন উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগিয়ে ফিরে আসে। তারপর বলে—একটা গরীবগুরবো ছোটজাতের মেয়ে। আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনারা কত ভালো ভালো কথা বোঝেন নতুনবাবু, শুধু বুঝতে পারেন না—ভগবান কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্যে রেখেছেন। তাতে কারো দখল চলে না।

গগন তার কালো বিরাট শরীরটা নিয়ে হাঁসের মতো থ্যাবড়া পা ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। প্রিয়নাথ কাঠ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর ক্রমশ তার অস্বস্তি হতে থাকে। অস্বস্তি বেড়ে চলে। রঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিলেন কুসুমের নখের আঁচড়ে? এই জোরালো কথাটা তার ওপর আছড়ে পড়ে। সে ছটফট করে—হয়তো ভয়ে, হয়তো দুর্ভাবনায়। আর নির্যাতর মতো কী যেন তাকে একটা গভীরতর যন্ত্রণার দিকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলে।...

মৃগাঙ্ক ফিরে এল, তখন রাত দুটো প্রায়।

সে এসেই চমকে ওঠে। নবীন গণেশ আর আতাহার প্রিয়নাথের হাত-পা শক্ত করে ধরে বসে রয়েছে। প্রিয়নাথ বিছানায় ছটফট করছে। তার চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল। গোঁ গোঁ করছে। কী সব ভুল বকছে। আর তার ঠোঁট, গাল, গলা—সবখানে ছত্রখান ওল্টানো প্লাস্টার-এর ফালি, রক্ত চোঁয়াচ্ছে টানা সব ক্ষতচিহ্ন থেকে। বীভৎস! মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে প্রিয়নাথের।

নবীন রুদ্ধশ্বাসে বলে—সাংঘাতিক কান্ড দাদাবাবু! নতুনবাবুর গোঙানি শুনে এঘরে এসে দেখি, দরজা হাট করে খোলা—ঘরে আলো জ্বলছে। আর উনি দু-হাতের নখে মুখখানা আঁচড়াচ্ছেন। গায়ে আগুন জ্বলছে একেবারে। এ কী কান্ড হল হঠাৎ?

মৃগাঙ্ক প্রিয়নাথের ক্ষতচিহ্নগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কপালে হাত রেখে ডাকে—প্রিয়, প্রিয়নাথ! প্রিয়নাথ!

অনেক ডেকেও সাড়া পায় না সে। তখন নবীনকে তেড়ে যায়! —হতচ্ছাড়া! তা এতক্ষণ নাড়ুবাবুকে খবর দিস নি কেন?

—আপনার অপেক্ষায় ছিলাম দাদাবাবু!

মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে ওঠে—যত শালা অমানুষ বুদ্ধু জুটেছে আমার চারপাশে। আতাহার! শিগগির আমার গাড়ি বের করে দে! শালারা আর মানুষ হল না!

মৃগাঙ্ক অমন ক্ষেপে গেল কেন, এরা বুঝতে পারে না। আতাহার দৌড়ে বেরিয়ে যায়। নবীন কাঁচুমাচু মুখে বলে—বিকেলে, না বিকেলে না তো—সন্ধ্যায় চা দিতে এসে ঘা দেখলাম। বাবু বললেন, ব্লেডে কেটেছে!

—থাম্ শালা।

মৃগাঙ্ক লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাড়ি উঠোনে বের করেছে আতাহার। মৃগাঙ্ক বেগে মোটরসাইকেলটা নিয়ে গেটের কাছে যায়। —আরে উল্লুক! ফটক খুলবি না কী?

আতাহার ফটক খুলে দিয়ে ভয়ে ভয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

পাকা রাস্তায় একটা হেরিকেনের আলো। মৃগাঙ্ক কাছে গিয়ে দেখে গগন হালদার। —কী? মাথায় টনক নড়েছে বুড়ো মাগীর? মহাকালের চেলা যেন!

বলেই সে বোঁও করে চলে যায়। স্তব্ধ হেমন্তের রাত মোটরসাইকেলের শব্দে গুরুগুরু কাঁপে। আলোর ফালিতে কুয়াসা দুলতে দেখা যায়। গগন একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ফার্মের দিকে হেঁটে আসে।

—কে? হালদারমশাই নাকি?

—আতাহার? কী হয়েছে রে? মিগাং কোথায় গেল এত রেতে?

—নতুনবাবুর প্রচণ্ড অসুখ।

—হুঁ।

গগন দ্রুত হেঁটে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। দরজার কাছে, বাইরে হেরিকেন রেখে ভিতরে ঢোকে। প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে মাথাটা দোলায় সে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। ফের মাথা দোলায় আপনমনে।

প্রিয়নাথ বিড়বিড় করছে তখন।... তুই অপয়া। তুই চলে যা—পালা এ দেশ ছেড়ে। তুই থাকলে নদীর জল শুকোবে। মাঠে ফসল ফলবে না। মাটি ফাটবে। শেয়াল শকুন মানুষের মড়া খাবে কচমচিয়ে। আর কামিখের ডাকিনী এসে শুকনো ডালে বসে বাতাসের সুরে কথা বলবে।......

কার কথা এসব? গগন কান করে শোনে। এ নতুনবাবুর কথা নয়। কুসমির বুলি।

প্রিয়নাথ হি হি করে হাসে। হাসতে হাসতে হাত তুলে মুখের কাছে আনবার চেষ্টা করে। নবীন আর গণেশ শক্ত করে ধরে রাখে হাত দুটো।

—আমি তার হাতে ধরা আছি গো! মা আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জানো না তোমরা? নয়তো—আমারও তো কত সাধআহ্লাদ ছিল। ভাল কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি পেটেকোলে একটা এসে মা বলে ডাকে! আমার কিছু হল না মা গো (গো), কুছ নেহী হুয়া—সাম দেতেদেতে সাঁঝ চা ল গেইলা মা গো! উঃ......

ককিয়ে কেঁদে ওঠে প্রিয়নাথ। ফুঁপিয়ে কাঁদে।

আর গগনের দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে কেন। সে লম্বা প্রশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে।

নবীনের চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠেছিল। সে গণেশ আর গগনের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছিল। এবার চাপা গলায় বলে ওঠে—হালদারমশাই!

—উঁ?

—বুঝতে পারলে কিছু?

—হুঁ!

—কুসমি বাণ মেরেছে নতুনবাবুকে। ডাক্তার-টাক্তারের কাজ নয় হালদারমশাই, শিমুলিয়া থেকে নাথুকে ডেকে আনতে হবে।

গণেশ রাগে ফুঁসে ওঠে। —মা ওস্তাটকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল। মেয়েও যে জ্বালাতে শুরু করলে রে বাবা! এর একটা প্রতিবিধান করা উচিত।

নবীন বলে—এ কালটা যে অন্যরকম। সে আমলে এমন হলে হেঁটেকাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে সবাই পুঁতে ফেলত। আজকাল সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে। আইনের ভয় দেখাবে। তবে আমাদের বাবুর হাতে এবার আর নিস্তার নাই মাগীর। বাবু খুব ক্ষেপে গিয়েছেন।

গগন শুধু বলে—কে? মিগাং?

—হ্যাঁ। আরে, আরে! ধর ধর, গণশা! শক্ত করে ধর।

প্রিয়নাথ উঠে বসতে চেষ্টা করছিল। তারপর শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যায় বারবার। গোঙানি বাড়ে। দুজন সামলাতে পারে না।..

কতক্ষণ পরে নাড়ুডাক্তারকে ব্যাকে বসিয়ে মৃগাঙ্ক ফেরে। ডাক্তার এসেই থমকে দাঁড়ায়। —সর্বনাশ! এ যে [illegible] খেয়েছে! ও মিগাং, [illegible]র ব্যাগপত্তর দে। এই ছোঁড়া, জল গরম করতে পারবি? এক্ষুনি?

নবীন বলে—হ্যাঁ। হিটার আছে।

—বং, শিগগির নিয়ে আয়।

মৃগাঙ্ক গগনকে বলে—কেমন দেখছ হালদারমশাই? বাঁচবে না— না?

গগন মাথাটা দোলায় শুধু। কী তার কথা ঘোলাটে চোখ দেখে বোঝা কঠিন।

গণেশ চাপা গলায় মৃগাঙ্ককে বলে—দাদাবাবু, নতুনবাবুকে কুসমি বাণ মেরেছে।

মৃগাঙ্ক তার দিকে লাল চোখে তাকায়।

—একটু আগে চাইবুলিতে কথা বলছিল নতুনবাবু।

—কী বুলিতে?

—কুসমিদের জাতের বুলিতে।

মৃগাঙ্ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে তার সারা মুখে আগুন আর ধোঁওয়া নাচানাচি করে। সে হঠাৎ তার বিছানার মাথার দিক থেকে হ্যাঁচকা টানে বন্দুকটা বের করে। তারপর প্রায় লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তখন গগনও থপ থপ করে বেরোয়। বারান্দায় রাখা তার হেরিকেনটা তুলে দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর উঠোনে নেমে ডাকে—মিগাং, মিগাংবাবু!

মৃগাঙ্ক হনহন করে গেট পেরিয়ে চলেছে। গগন দৌড়তে থাকে। —মিগাং, মিগাংবাবু, কোথা যাও? হেই মিগাংবাবু!

বুড়ো গলার হাঁকডাকে অন্ধকার নিঃঝুম রাতটা কেঁপে ওঠে, কালো ড্রামের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত আওয়াজ গম গম করে। মৃগাঙ্ক এবার ঘুরে দাঁড়ায়। —চোপ শুওরের বাচ্চা! তোকে-সুদ্ধ গুলি করে মারব।

—তা মারো। মরবে বইকি মিগাং! তোমার হাতে বন্দুক, বাবা। তবে কথাটা তো শোন। —গগন হাঁফায়। সত্তর বছরের ফুসফুস হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করে। —কাকে মারতে যাচ্ছ, মিগাং? কুসমিকে? হুঁ—তার ওপর তোমার অনেক রাগ। তোমার বাবাকে খেয়েছিস। এবারে তোমার প্রিয়বাবুকে খেলে। আর কুসমিকে ছাড়া যায় না। কেমন কি না? তো বাবা মিগাং, এ্যাদ্দিন কোন অমানুষী (অলৌকিক) মানিনি—তুমিও মানো না। আজ এই শেষবেলাতে আমি তাকে মেনেছি—তুমিও তাকে মানো। সে আছে বাবা, তাকে আমি আজ এ্যাদ্দিনে দেখেছি। দেখেই তোমার খামারে আবার গিয়েছিলাম। সেই কথাটাই বলতে গিয়েছিলাম, বাবা।

মৃগাঙ্ক কোন কথা না বলে হনহন করে এগোয়। তার পায়ের চাপে শুকনো পাটকাঠি মচমচ করে ভাঙে। ঝোপে ঘাসে শিশির চবচব করে আর ছপছপ শব্দ হয়। গগন হেরিকেন হাতে তার পিছনে পিছনে দৌড়য়। থ্যাবড়া পায়ে ভিজে খড়, পাটের ফেঁসে আর ঘাস জড়িয়ে যায়।

গগন কথা বলতে বলতে যায়। —কুসমির মা ধরিত্তি আমাকে বলেছিল, কামিখ্যে থেকে এক ডাকিনী গাছের ডালে বসে গাছ উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ভৈরবের পাড়ে। নিশিরেতে তার নাম ধরে বাতাসের সুরে ডেকেছিল। সেই ডাক শুনে ধরিত্তি নাকি গেল। আর ডাকিনী এলোচুলে উলঙ্গ শরীলে তার ওপর ঝাঁপ দিলে। ধরিত্তি সেই থেকে দেয়াশিনী হল। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর মিগাং, এখানেই কোথায় সেই অচেনা গাছটা নাকি আছে বলে সবাই বিশ্বাস করে। ধরিত্তি আমাকে চিনিয়ে দেয়নি। কিন্তু আজ আমি চিনলাম বাবা!

ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠে গগন। মৃগাঙ্ক একবার ঘুরে তাকায়। হঠাৎ দাঁড়ায়।

—মিগাং, তোমাকেও সেই গাছটা চিনিয়ে দেব। এসো, আমার সঙ্গ ধরো। এদিকে এসো—না, না! এদিকে।

বুড়ো মৃগাঙ্কের একটা হাত ধরে ফেলে। —তবে কথা কী, ভয় পেয়ো না। মিগাং, তুমি আমার পানের সখা বুন্দুবাবুর ছেলে। তোমার সাহস আছে। তুমি বন্দুকবাজ। বাঘ মেরেছ, শুওর মেরেছ, হায়েনা মেরেছ। আমলাবাগের জঙ্গল খালি করে দিয়েছ। তুমি বড় বীর। তবে কথা কী, ভয় পেয়ো না।

বাঁদিকে ঘোরে গগন। মৃগাঙ্ক চিনতে পারে। কুসমির বাড়িই বটে। কুসমি বাড়ির চারধারে পুরু কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে বরাবর। ওই কাঁটা আনতেই সে প্রতিদিন নদীর ওপারে যেত। মৃগাঙ্ক হেরিকেনের আবছা আলোয় ঘন জমাট কাঁটার বেড়া দেখতে পায়। এই কাঁটার দুর্গে লুকিয়ে থাকত ডাইনীটা! কেন? কার ভয়ে? মৃগাঙ্কের? মনে হয় না তা।

—বাবা মিগাং! এবারে তাকাও। এই সেই গাছ। এর তলায় সাঁঝবাত্তি দিত কুসমি। এ্যাদ্দিন বুঝিনি, আজ বুঝলাম এই গাবগাছটাই ডাকিনী এনেছিল কামিখ্যে থেকে। মিগাং বুকে বল বাঁধো। এবারে মুখ তুলে তাকাও। হুঁ, ভয় পেও না বাবা। তুমি সেই উলঙ্গ ডাকিনীকে দেখতে পাবে—এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে মনে হবে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। তাকাও, তাকাও!

হেরিকেনটা তোলে গগন। মুহূর্তে মৃগাঙ্কের শরীর শক্ত হয়ে যায়। তার মাথা ঘুরে ওঠে। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যায়। সে চোখ বুজে আতঙ্কে অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সত্যি সত্যি এইমাত্র উলঙ্গ এক ডাকিনী এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিল তার দিকে। সে চেঁচিয়ে উঠল—ও কে?

গগন ভাঙা স্বরে বলে—দেখলে মিগাং? দেখলে? আমার মেয়ে কুসমি।

মৃগাঙ্ক চোখ খোলে। ওপরের দিকে তাকায়। না, ডাকিনী ঝাঁপ দিতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেছে। ঝুলেছে। মৃগাঙ্ক বন্দুকের নল দু-হাতের মুঠোয় ধরে মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুজে থাকে।

গগন ডাকে—আর কী! চলো এস মিগাংবাবু।

পিণ্ডদান

মহাশ্বেতা দেবী

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের জ্যোৎস্নায় কঙ্কালটা ধবধব করছিল। অকলঙ্ক শুভ্রতা করোটিকা থেকে পাদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা পর্যন্ত জুঁইফুলের পাপড়ির মত স্নিগ্ধ আভা ছড়াচ্ছিল। খেঁটে গাছখানায় শরীরের ভর রেখে কঙ্কালটাকে দেখতে দেখতে দশরথের বৃদ্ধ, লোলচর্ম দেহ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানাপচা জল ঝরছিল। চোখ থেকে বিফলতার দুঃখে ঝরছিল সরযূ নদীর ধারা।

বড় দুঃখ দশরথের মনে। এ কঙ্কালটাও আস্ত নয়, নিখুঁত নয়। যত-দিন শরীরে পেশী-রক্ত-মাংস-চামড়া থাকে, ততদিন বোঝা যায় না গো। কত কষ্ট দশরথের। প্রথমে পালবাবুকে খবর দিতে হয়। বলতে হয়, 'হোথা দেখলাম ঘাট ছেড়ে সব আঘাটায় লেনে লাইতে লাইতে সিটাই ঘাট করে লিছে বাবু। তবে ঘাটে পঁতা আছে মনে লেয়।'

পালবাবু বলেন, 'শালা, আড়াই বছরে কতগুলান মরছে দশরথ? শালার একটা পুষ্কর্ণী বাকি নাই?'

ঘোষবাবু বলেন, 'মেরেছে, আর পাথর ইঁটের থলিতে পুরে পাঁকে ফেলছে

দাদা। তা বাবা দশরথ, যাতে মড়া পতুত্তে বজে আঘাটায় বউ ঝি চানে নামে এ তুমি মোদাম ধরিছিলে।'

একথা শুনে দশরথ হাসে। তারপর রাতে-ভিতে জলে নামে। কঙ্কাল তোলে এবং সযত্নে চুনে ও ব্লিচিং-এ মুছে সাফ করে। কঙ্কালগুলি দেখলেই দশরথের মনে প্রজ্বলন্ত স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা ধুগপৎ কেলি করতে থাকে। তরুণ কঙ্কাল সব, সেই জন্যে স্নেহ। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে পেঁছে দিলেই টাকা পায় দশরথ, সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা। টাকা পেলেই দশরথ সর্বাগ্রে মদ কেনে।

কুসি ওর গায়ে মদ মালিশ করে দেয়, বোতল থেকে ঢেলে দেয়। দশরথ বলে, 'কব্জি মোটা হয়নাই। গোড়ালি মোটা হয়নাই, বুঝি দানা ছিল জগতে? আহা, মায়ের ছেলা গো! বাপ পিণ্ড পাবেনাই, ই কি কম দুস্ক?'

কুসি বলে, 'তো খালভরার কথায় তরিবৎ নাই। ছেলাগুলো অকালে মরে তার তরে দুস্ক করিস না?'

দশরথ হ হ করে হাসে। বলে, 'আমি কি বলি তোরা খেয়ে মরগা? তবে মর-ছিল বুল্যে তোর কোমরে গোটাদানা উঠল না কি বল?'

'মর যা, পিচাশ।'

দশরথ ভেবে পায় না ও কিসে পিশাচ হল। ও মারে নি ছেলেদের, পুকুরে ডোবায় ফেলেনি। ও ত শুধু কঙ্কাল তোলে, পালবাবুদের দেয়, নিজে কমিশন নেয়। এই কাজ ও আগেও করত, এখনো করে। অযোধ্যার কোন গ্রামে ওর বাড়ি ছিল, প্রসন্নতোয়া সরযূর তীরে ছিল জনাইয়ের খেত, এখন আর মনে পড়ে না কিছু। তিন বছর বয়স থেকে ও এই শহরে। মেডিক্যাল কলেজে বেওয়ারিশ মড়া পচিত করে শ্বেতশুভ্র কঙ্কাল বের করে নিতে ওর জোড়া ছিল না। তখনো রামের মা ওকে ঘেন্না করত, কাছে আসতে দিত না। অথচ দশরথ জানে কঙ্কাল হল মানবশরীরের স্থির ও পবিত্রতম পরি-ণতি। আর সবই পচনশীল, অশুচি, অস্থায়ী।

রামের মা মরে গেছে। রামের জন্যে দশরথ ভাবে না। রাম দু বছর হল জেল খাটছে। কোন জেল, তা দশরথ জানে না। কিন্তু পালবাবু বলে রাম ভাল আছে। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ওর পাখা গজিয়েছিল। জেলখানায় পাথর ভেঙে রাম ধীরে ধীরে শান্তিতপক্ষ হচ্ছে।

'সব ঠিক আছে।' পালবাবু বলে।

'হু' বাবু।' দশরথ মাথা নাড়ে। পালবাবুতে ওর অগাধ বিশ্বাস। তাছাড়া, ছেলের ধার ধারে না দশরথ। এখনো ও চাল কেনে, খাসীর মাংস, মদ। এখনো ও কুসির বিগতৌবনা দেহে সাপ খেলাতে পারে। ছেলে জেলে আছে। ভাল আছে। দশরথের বাবাও কুসির মত একজনকে নিয়ে ভাল থাকত। ছেলের ধার ধারত না। দেহ জরাবলি হবার পরও তার শরীরে পৌরুষ ছিল। দশরথেরও আছে। বাপ মরেছে খবর পেতে দশরথ পিণ্ড দিয়েছিল। রামও দেবে।

তবে জেল থেকে রাম বেরোলেই দশ-রথ বলবে, 'তু বিয়েটা করে লে বাপ। টাকা আমি দিব।' বিয়ে করলে রাম হয়ত থিতোবে। অমন দাপিয়ে বিশ্ব-সংসারকে শব্দ করে তুলবে না। কিন্তু টাকা যেন জমতে চায় না।

একটি নিখুঁত কঙ্কাল পায় না দশরথ। যারা পৃষ্ঠবংশ-গলাবক্ষ-হৃৎপিণ্ড-মস্তিষ্কে ছুরি নিয়ে মরেছিল; অস্থিসংস্থান যাদের অটুট ছিল। সেই নিষ্কলঙ্ক কঙ্কালগুলো যে কারা নিয়ে গেল! দশরথ যাদের টেনে টেনে তোলে, তাদের করোটিকা-অক্ষকাস্থি-জঘন-কপাল উর্বাস্থি-অংসফলক-পঞ্জরাস্থি চূর্ণিত, ভঙা, খুঁতো। কোন কোন কঙ্কালের শরীরের প্রতিটি অস্থি চূর্ণিত, তাও দশরথ দেখেছে।

সে কঙ্কালে বেশি টাকা পায় না দশরথ।

আজ পূর্ণচাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না-ধোওয়া কঙ্কালটি দেখে দশরথ তাই কাঁদল। পা ও হাতের আঙুলের একটি হাড় নেই, পাঁজরায় শামুক আটকে আছে। কবে দশরথ একখানা আস্ত কঙ্কাল পাবে, কবে পাবে একখানা বড় নোট? চোখ মুছে দশরথ সযত্নে কঙ্কালটি বস্তায় পুরল। মোড়ের পাগড়িকে একটা টাকা দিল, কুসির ভাইটার জন্যে একটা টাকা কানের পেছনে গুঁজল। তারপর চলে গেল পালবাবুর বাড়ি।

পালবাবুর ঘরে সারারাত বাতি নেভে না। সমানে কঙ্কাল আসে আর যায় এ-ঘরে, তাই বাতি জ্বেলে পালবাবু বসে থাকেন আর মদ খান। রাত হলেই উনি ঘুমোতে ভয় পান। কেবলই মনে হয় দশরথ বা নিধিরাম বা চৈতন্য ওঁকে জাগ্রত না পেলে চলে যাবে দত্তরায়বাবুর

ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

কাছে। জীবনে যাদের নিয়ত ক্রোধ হত, মনে হত তারা না জন্মালেও দেশের দশের চলে যেত, বেশ, মনে হত উত্তর-চাল্লিশ লোকগুলোর আরো সুখভাগের পথে তারা কাঁটা, মৃত্যুতে তারা বড় দামী। জীবনে যারা ঘাতকতাড়িত হয়ে একটি দরজা খোলা পায় নি, মৃত্যুতে তাদের জন্যে দরজার পর দরজা খোলা।

তাই পালবাবু রক্তরাঙা চোখে বসে থাকেন, আজও ছিলেন। কঙ্কালটা দেখে বললেন, 'আস্ত মাল ল' দেখি দশরথ। তুই পাস না। অরা পায় ক্যামনে?'

'আনব বাবু।'

দশরথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর বলল, 'মাল দেন, খাই। ই শালারে উঠাতে চারবার ডুব দিয়েছি জানেন? বুক দিয়ে শিক ফুঁড়ে কাদোয় পুঁতা করেছিল, তা শালা উঠতে আর চায় না।'

পালবাবু মদ দিলেন। বললেন, 'ভাল মাল না পাইলে আর আনবি না।'

'না।'

দশরথ যেন শপথ নিল। টিউবের আলোয় বড় অপরিচিত দেখাল ওকে, আদিম যুগের প্রেত যেন। দীর্ঘদেহ, চামড়ায় জরা, চোখে লালসা, মাথা নেড়া, সিক্ত কটিবস্ত্রে খাঁজ। চোখ লাল, ঘোলাটে, স্ফীত। পালবাবুর ভয়ভয় করল। মনে হল অনেক মদ খেয়ে ওকে একটা গোপন সংবাদ দিয়ে ফেলেন সাহস হল না।

'কাল সি ওষুধকোম্পানীর দীঘিতে যাব। হোথা মাল আছে।'

'মাল ত সবোই, কি মাল?'

'পুলিশের খবর আজ্ঞা, ভাল মাল হবে।'

'দেখ।'

'ছেলেটো কবে খালাস হবে বাবু?'

'দেখি, খোঁজ নেই।'

পালবাবু চোখ নামালেন। অস্বস্তি হয়। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'ছেলের তরে মন পুড়ায়, দশরথ?'

'না বাবু। মন পুড়ায় কই। আমার বাপ মোরে দেখে নাই। আমিও উয়ারে দেখি নাই। আমি আমার দমে জীইব। উ উয়ার দমে জীইবে। মরব যখন, পিণ্ড দিবে।'

'দিবে?'

'দিবে। নইলে মোর গতি হবে নাই, তা উ জানে।'

'ল, এখন যা।'

ওষুধকোম্পানীর বাগানে পুরাতন মালিকদের স্থাপিত নগ্নিকা অপ্সরা, দেবশিশুর মূর্তি। প্রতিপদের চাঁদ। রক্ষীটি অদূরে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে মারা যাচ্ছিল। অভিপ্রেত এক নিখুঁত কঙ্কালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দশরথ যে কি দেখছে আর দেখছে।

'চল দশরথ, যা।'

'যাই।'

দশরথ মুখ তুলল। ওর মুখে বিচিত্র হাসি, না কি? হাসি নয়? কঙ্কালের গলা থেকে অতি যত্নে ও রুপোর হারটা খুলল। একটা পদক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিল। দশরথ আঙুলে বোলাল। 'রামলাল' লেখাটা এখনো খোদাই করা আছে। হারটা ও গেঁজেয় পুরল।

তারপর, রক্ষীটিকে মূঢ় ও ভীত করে দশরথ বড় যত্নে কঙ্কালটিকে কাঁধে ফেলল, হাত বোলাল করোটিকায়। বলল, বস্তাটা পাল বরাবর ফেড়ে ঢেকে দাও কেনে?'

কঙ্কালটি সযত্নে ঢেকে নিয়ে দশরথ পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। বুকের মধ্যে পর্বততুল্য তরঙ্গ আছড়াচ্ছে। দশরথ বলল, 'আমায় বুঝাছিল তু জেলে আছিস বাপ। বাপো আমার, আমি জানতাম তু জেলে আছিস?

যে মাংস-পেশী-রক্ত-শিরা-চুল চামড়াকে দশরথ এতদিন অপবিত্র বলে জেনেছে, এখন তার জন্যে বুকে অভিশপ্ত প্রেতরা হাহাকার করল। যে কঙ্কালকে মনে হত মানবশরীরের চরম ও পবিত্রতম পরিণতি, এখন তাকেই মনে হল অপচয়। দশরথের চোখে সরযূ নদীর ধারা। আর সে পিণ্ড পাবে না। চরম দৈহিক ভোগসুখে লিপ্ত থেকে মরে যাবার ইচ্ছে ছিল ওর, জেনে মানুষ ইচ্ছে ছিল পৃথিবীতে কোথাও ওর নাম বেঁচে থাকবে, কেননা রাম রইল। দশরথ নিষ্ফল শোকে মাথা নাড়ল। আবার বলল, 'কখুনো জানি নাই বাপ আমার' কত স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরথ এমন করে আলিঙ্গন করেনি।

পালবাবু ওকে একশো এক টাকা দিলেন।

দশরথ নিধিরামকে ডাকল, চৈতনকে মদ কিনল দশ বোতল, লাথি মেরে ও শুঁড়িকে ডেকে তুলল।

কুসি বলল, 'এত রাতে পিঁয়াজ কাটব, সবাই মদ খাবা? তুমি কি পাগল হয়েছ?'

দশরথ বলল, 'চুপ যা মাগী। ই মদ লয়, আমারে আমি পিণ্ডি দিছি। রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়্যাছে, তু জানবি কি? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।'

স্ত্রী

নিমাই ভট্টাচার্য

আইন-আদালতের কলমে একটা মামলার রিপোর্ট পড়েই ক' বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল।

পার্লামেন্টের ইলেকশনের আগে রাজস্থানে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে এলাম আজমীঢ়। সার্কিট হাউসেই উঠেছি। পরদিন খুব ঘুরলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে লুনি নদীর বাঁধে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। তারপর সার্কিট হাউসে ফিরে স্নান করলাম। রিপোর্ট টাইপ করলাম। খেলাম। বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে আনা সাগরের শোভা দেখলাম অনেক রাত্রি পর্যন্ত। তারপর ঘুমুতে গেলাম।

পরের দিন সকাল বেলায় বেয়ারার ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি বেশ জ্বর হয়েছে। তবু উঠলাম। বারান্দায় চা খেতে বসলাম। হঠাৎ হাতটা কেঁপে চায়ের কাপটা হাত থেকে পড়ে যেতেই বারান্দার ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। 'এনিথিং রং ?'

শুকনো মুখে একটু কৃতজ্ঞতার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, নাথিং রঙ কিন্তু কাল রাত্রে বেশ জ্বর হওয়ায় এখনও বড় উইক ফিল করছি। তাই বোধহয়.....'

মিঃ দাশগুপ্তর সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ। পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আই-পি-এস। ডেপুটেশনে দিল্লী এসেছেন। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে বলে বাড়ীতে সবারই মন খারাপ। তাই মা আর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভেবেছিলেন পুষ্কর দেখে একদিন আজমীঢ়ে কাটিয়েই চলে যাবেন কিন্তু আনা সাগরের পাড়ে থাকতে ভাল লাগছে বলে পুরো একটা সপ্তাহ কাটিয়েই দিল্লী ফিরবেন।

শরীরটা ভাল না থাকায় আমিও কদিন আজমীঢ়ে রইলাম। মিঃ দাশগুপ্তর স্ত্রী আর মা দুবেলা পুষ্কর যেতেন ব্রহ্মার মন্দিরে পুজো দিতে, আরতি দেখতে। আমরা দুজনে সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে বসে গল্প করতাম। নানারকমের গল্প। আমি পার্লামেন্টের আড্ডাখানার গল্প বলতাম, ভি-আই-পিদের কথা বলতাম। উনিও অনেক মজার মজার ঘটনা, বিচিত্র কাহিনী শোনাতেন। ইতিমধ্যে সদ্যবিবাহিত এক দম্পতি একদিনের জন্য সার্কিট হাউসে উঠলেন।

'ইয়াং কাপল দেখলেই আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।' আনা সাগরের দিক থেকে দৃষ্টিটা আমার দিকে ঘুরিয়ে এনে মিঃ দাশগুপ্ত বললেন।

'কি হয়েছিল ? বিয়ে না করেই বুঝি স্বামী-স্ত্রীর মতন সংসার পাতিয়েছিল ?'

উনি হাসলেন। 'এতো হামেশাই ঘটছে।......

'তবে ?'

মিঃ দাশগুপ্ত শুরু করলেন, আমি তখন মেদিনীপুরে। কয়েক মাসের মধ্যে দীঘাতে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল বলে আমি নিজেই একবার ওখানে গেলাম।......

'তারপর ?'

'দু-তিনদিন পরে একজন ইয়াং ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো—

'নমস্কার। একটু জরুরী ব্যক্তিগত

'সে ডায়েরী কি দিল্লীতে?'

'বোধহয় নিয়ে এসেছি।' মিঃ দাশগুপ্ত আবার একটু হাসলেন। 'বাইরে বেরুলেই দু-চারটে পুরানো ডায়েরী নিয়ে আসি। সময় পেলেই পড়ি। তাছাড়া পুরানো দিনের ডায়েরী পড়তে বেশ ভালই লাগে।'

'তা তো লাগবেই।'

মিঃ দাশগুপ্ত উঠে গিয়ে ঘর থেকে ডায়েরীটা বের করে এনে আমাকে দিলেন, নিন, পড়ুন।

হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা নিয়ে চিঠিটা পড়লাম—আমি অঞ্জলি। তোমার অঞ্জু। তোমাকে এই আঘাত দেবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আমার ছিল না কিন্তু তবু দিতে বাধ্য হলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি জানি ঘুম থেকে উঠে তুমি আমাকে খুঁজেছো, চেয়েছো কিন্তু ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একজনের দেখা পেলাম যে তাকে আর শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে আমাদের পরিচয়। বোধহয় ভালবাসাও। আমি জানি নি, বুঝি নি ও আমাকে কতটা ভালবাসে। কোন দিন কিছু দাবী করা তো দূরের কথা, মুখ ফুটে কিছু বলেনি। আজ ভোরবেলায় হঠাৎ ওকে দেখে চমকে উঠলাম। শুনলাম আজ এক মাস ধরে বাড়ীর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। এভাবে পাগলের মত ঘুরে বেড়ালে ও নিশ্চয়ই বেশী দিন বাঁচতো না।

ডায়েরীর পাতা ওল্টালাম।

'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। স্বামী হিসেবে তুমি আমাকে সবকিছু দিয়েছ। স্ত্রী হিসেবে আমিও তোমাকে অপূর্ণ রাখিনি। আমি তোমাকে যা দিয়েছি, অন্য অনেক মেয়েই তোমাকে তা দিতে পারবে। মোটামুটি যে কোন শিক্ষিতা, সুন্দরী যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে পেলেই তোমার মন ভরবে। কিন্তু যে নিঃস্ব কেরানীর সঙ্গে আমি যাচ্ছি, সে শুধু আমাকেই চায়। পৃথিবীর আর কোন মেয়েকে দিয়ে তার অভাব পূর্ণ হবে না।

জানি তোমার অনেক সমস্যার সৃষ্টি করলাম। কলকাতায় ফিরে বলো আমি সমুদ্রে ডুবে গেছি। তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই তোমার আবার বিয়ে দেবেন। আমিও অনুরোধ করছি তুমি বিয়ে করো। বিয়ে না করে তুমি থাকতে পারবে না। আমাদের বাড়ীতেও একটা খবর দিও। দু-চারদিন কান্নাকাটি হবে কিন্তু তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবার ডায়েরীর পাতা ওল্টালাম।

সব শেষে একটা অনুরোধ। তুমি সরকারী অফিসার। থানা-পুলিশ করলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আমরা ধরা পড়ব। লক্ষ্মীটি, থানা-পুলিশে রিপোর্ট করো না। মামলা-মোকদ্দমা করার মত অর্থের জোর আমাদের নেই।'

ডায়েরীটা বন্ধ করতেই মিঃ দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিটা পড়লেন?

'হ্যাঁ কিন্তু এরপর কি হলো?'

'মিঃ সরকার সত্যিই কোন রিপোর্ট করলেন না। আমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন।'

'দেন হোয়াট নেক্সট্?'

'পরের দিনই উনি কলকাতা ফিরে গেলেন।'

'তারপরে ওদের আর কোন খোঁজ-খবর পাননি?'

'কয়েক বছরে আমি যখন দার্জিলিং-এ পোস্টেড তখন মিঃ সরকার ওখানে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার ছিলেন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আবার বিয়ে করেছিলেন?'

'না।'

আমি অবাক হলাম, বিয়ে করেননি?

'বিয়ে করা তো দূরের কথা, প্রত্যেকটা ঘরে তিনটে-চারটে করে স্ত্রীর ফটো ছিল...

'রিয়েলি?'

মিঃ দাশগুপ্ত হাসলেন। 'শুনলে অবাক হবেন, প্রত্যেক বছর বিজয়া, নববর্ষ আর মিঃ সরকারের জন্মদিনে অঞ্জলি ওকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখতো।'

গদ্যপদ্য ও একালের জীবন

কৃষ্ণ ধর

বাকু শহরে এক সন্ধ্যায় কবিতা বিষয়ে আলোচনায় তরুণ আজারবাইজানী কবি ওয়াহিদ আজিজের কাছে প্রশ্ন ছিল আমার: শ্রেণীহীন বিরোধহীন সমাজে কবিতার বিষয়বস্তু কোথায় পায় কবি। তরুণ কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সে প্রশ্ন শুনে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সে যা উত্তর দিয়েছিল তাও প্রাসঙ্গিক। বাইরের দিক থেকে সামাজিক সংঘাত লুপ্ত হলেও: কবি তার হৃদয়ের সংঘাত খুঁজে পান, শুধু নিজের দেশ নিয়েই যে তিনি লেখেন না। তিনি সমকালের পৃথিবীর কবি। তাই যেখানে বিরোধ, সেখানে যন্ত্রণা কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি। আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে গেল। জানি না এই কবি রবীন্দ্রনাথের কতটুকু পড়েছে। তিনিও তো জীবনের উপান্তে এসে এই ঘোষণা করে তৃপ্ত হয়েছিলেন আমি পৃথিবীর কবি।

কবিতা মানুষ যেদিন আবিষ্কার করেছিল; তার লক্ষ্য ছিল আনন্দ ও কর্মের সহযোগিতা। প্রয়োজনেই এসেছিল ছন্দ এবং সুর। শ্রমজীবী, মৃগয়াজীবী আদি মানুষের সেই মন্ত্রোচ্চারণের মন্ত্র ধ্বনিই কবিতারও আদি জননী। জাদুর সঙ্গে ছিল কবিতা সৃষ্টির আত্মীয়তা। মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে জয় করার জন্য নিজের বাহুবলের পাশাপাশি আশ্রয় নিয়েছিল শব্দের আদি সংগীতের যার পরবর্তী রূপ কবিতা।

সব সাহিত্যেরই আদিতে কবিতা। সভ্যতা ও সমাজের অগ্রগতির পর সাহিত্যে এসেছে গদ্যের প্রবেশাধিকার। আবেগকে যদি বলা যায় কবিতার উৎস পর্যবেক্ষণ ছিল গদ্যের প্রাথমিক প্রেরণা। যতই দিন যাচ্ছে গদ্য ও পদ্যের সীমানা হয়ে আসছে সংকুচিত। কবিতা তার কৃত্রিমতা বর্জন করে গদ্যের সরলতায় নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছে। কাব্যগুণান্বিত হবার সাধ গদ্যেরও এবং নাটকেরও। সুতরাং আঙ্গিকের বিরোধ আজ অবান্তর। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতেই তার বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বলতা। কবিতা তার কৃত্রিম কাব্যপনা বর্জন করে সংহত ও সুতীব্র হতে চাইছে; গদ্য তার ব্যবহারিক রুক্ষতা বর্জন করে কাব্যের সুষমা আনতে চাইছে শরীরে। আসলে এ হচ্ছে সমকালের জীবনেরই সাযুজ্য ও সমীকরণের আকাঙ্ক্ষা। দ্বন্দ্ব ও বিরোধ যত তীব্র; সাযুজ্যের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি প্রবল। মানুষের তৈরি ভাষা এবং তার স্টাইলে এই সাযুজ্যের প্রয়াস সমকালের জীবনেরই শৈল্পিক প্রতিফলন বলা যায়।

শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি কবিতাকে অবান্তর করে তুলছে এমন আশঙ্কা অনেক দিন থেকেই কারো কারো মনে প্রকাশ পেয়েছে। সে আশংকা কবিতার আবেদনের জন্য নয় তার আঙ্গিকগত জটিলতার জন্য। কবিতার আবেদন বা শিল্পের আবেদন বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদদের কাছে কম নয়। নেভাদা মরুভূমিতে যখন আমেরিকা প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায় হিরোশিমা, নাগাসাকিকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে তখন সেই মহাবিস্ফোরণের আগুনের লীলা দেখে পরমাণু বোমার জনক ডঃ রবার্ট ওপেনহাইমারের মনে পড়েছিল গীতার ছন্দোবদ্ধ একটি শ্লোকের কথা—সহস্রসূর্যের চেয়ে জ্যোতির্ময় সেই অগ্নিশিখা। বিজ্ঞানীকে বিশেষ মুহূর্তে ভাবপ্রকাশের জন্য কবিতারই আশ্রয় নিতে হয়।

প্রথম মহাকাশযাত্রী ইয়ুরি গাগারিন নক্ষত্রলোক থেকে মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন মহাকাশ তার কবি আর শিল্পীর জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রতিদিনের জীবনে কবিতার ডাক পড়ে না হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে। গদ্য তার কাছে আরও স্পষ্ট আরও চেনা আরও কাছাকাছি। গদ্যে সে অপরের চোখ দিয়ে চেনা জগতকে দেখে। কবিতা তাকে অপরের মন দিয়ে ভাবতে বলে। হয়তো প্রতিদিনের সংগ্রামে, কঠোরতায় বর্ণহীন রুক্ষতায় সে ভাবনার চেয়ে দেখতেই ভালবাসে। কিন্তু কবিতাও তো এই মানুষকে নিয়েই। প্রত্যেকের মনেই কবির খণ্ডাংশ বাস করে। কবিতা সেই কবিসত্তাকে জাগিয়ে তোলে। সে হয় কবিতার পাঠক।

কবিতা শিল্পকলা বা সংগীত পাঠক শ্রোতা ও দর্শকের অনুভূতিকে সেই অন্তর্দৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করে যা দিয়ে এই বস্তুজগতের কোনো একটা দিক তার কাছে প্রথম সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে অনাবৃত হয় মানুষের চোখে তার নতুন অর্থ ধরা পড়ে। কবিতাকে তখনই আমরা সুন্দর বলি সার্থক বলি যখন পাঠকের মনেও কবিসত্তাকে সে জাগিয়ে তুলতে পারে। কবি নিজে তো আর কখনই তার কবিতা ব্যাখ্যা করার জন্য পাঠকের কাছে আসেন না। পাঠকই তার অর্থ আবিষ্কার করে কবির ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হন। তখনই কবির সঙ্গে পাঠকের সহৃদয় সামাজিকতার বন্ধন।

সব সময় যে পাঠক কবির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন এমন কোনো নিশ্চিতি নেই। ব্রাউনিং-এর সময়ে তাঁর চেয়ে বেশি গৌরব ও হাততালি পেয়েছিলেন টেনিসন। ব্রাউনিং-এর স্বীকৃতি এসেছে পরে, বলা যেতে পারে তার পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকের কাছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েও কি দ্বিজেন্দ্রলালের গানের আদর বেশি ছিল না? আমাদের আগের যুগের লোকের মুখেই রবিবাবুর গানের সুর যত না শুনেছি তার চেয়ে বেশি শোনা যেত ডি এল রায়ের গান। এ হল রুচির প্রশ্ন এবং রসবোধের প্রশ্ন। বলার কিছু নেই। আজ রবীন্দ্রনাথ যেখানে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছেন, বিশের দশকে কিংবা ত্রিশের দশকেও তা ছিল সীমাবদ্ধ।

এদিক দিয়ে মাইকেল ছিলেন ভাগ্যবান। তিনি প্রচলিত সংস্কারের মূলে আঘাত করেছিলেন জীবনচর্চায় এবং কাব্যচর্চায়। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন শুধু বিদ্বজ্জন-সভায় নয় বৌবাজারের সাধারণ দোকানদার পাঠকের কাছেও।

গদ্যলেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নেমেই পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। বলা যায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই এসেছিলেন। এমন ভাগ্য সবার হয় না। বার্নার্ড শ'র মতো নাট্যকারকেও স্বীকৃতি পাবার জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সমারসেট মম তো দুঃখ করে বলে গেছেন গল্প লেখার কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করলেও আমি কোনোদিনই গ্রেট রাইটার হিসেবে চিহ্নিত হব না। মাইনর গ্রেট হয়েই বিদায় নিতে হবে। জনপ্রিয়তা দিয়ে অবশ্য লেখকের মহত্ত্ব নির্ধারণ করা যায় না। স্টাইল এবং

কনটেন্ট নিয়ে সে কারণেই কবিতা ও গদ্যের লেখক উভয়কেই ভাবতে হয়। মহাত্মাতি টলস্টয়ের লেখা নিয়ে বিপ্লবের পর রাশিয়ার তাত্ত্বিকরা যখন বিচারে বসলেন, লেনিন তখন বলেছিলেন, রাশিয়ার কৃষক জীবনকে এই মহান শিল্পীর মতো এমন নিখুঁতভাবে আর কে দেখেছেন? তত্ত্বের ঊর্ধ্বে উঠে গেল তলস্তয়ের সাহিত্য। তিনি চিরকালের লেখক। তেমনি লেনিনের কাছে পুশকিন আদরণীয়। যদিও বিপ্লবের পর তরুণ মায়াকভস্কির কবিতায় নতুন রাশিয়া মাতাল হয়েছিল তাঁর আবেগের দীপ্তিতে নবজীবনের গানে।

আজকের যুগে অনেক সময়ই প্রশ্ন করা হয় মুদ্রিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি? মহৎ সাহিত্য পড়ার মতো মানসিক স্থিরতা কি এই দ্রুতগামী যুগে মানুষের আর অবশিষ্ট থাকবে? কবিতা তো চিরকালই ছিল নির্বাচিতদের জন্য। একালে কবিতা কি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না জীবন থেকে? তা ছাড়া একালে সত্যিই কি মহৎ কবিতা আর রচিত হবে? গদ্যও তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বৃত্তে আবর্তিত হয়ে তার বিশাল সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। এইসব প্রশ্ন সমালোচকদের কাছ থেকে আসছে।

এর উত্তর দেবেন লেখকরাই। যুক্তি দিয়ে নয় রচনা দিয়ে। আধুনিক মানুষের কাছে আজ প্রযুক্তিবিজ্ঞান নিত্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

তার কাছে মহাকাশ আজ আর দূরের বিষয় নয়। এই বৃহৎ বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যদি সাহিত্য বা শিল্প তার সম্ভাবনাকে মেলাতে না পারে তাহলে তার সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতে সে একদিন আটকে পড়বেই।

অবশ্য সামাজিক মানুষ হিসেবে কবি শিল্পী বা গদ্যলেখক তার পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ে সচেতন না হয়ে পারেন না। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়েও উদাসীন নন তাঁরা। কবিতার ভাষায় তার ছায়া পড়েছে। গদ্যে তো এই পর্যবেক্ষণ আরও স্পষ্টই। বিশ শতকের কবিতার বিষয়ে একালের আধুনিকতার গুরুস্থানীয় এজরা পাউন্ড অনেক বছর আগেই একটা কথা বলেছিলেন যা আধুনিক কবিতার লেখক ও পাঠকরা এখন স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন বিংশ শতাব্দীর কবিতা দীর্ঘ সংগ্রামের পর এমন একটা উন্নতির স্তরে পৌঁছুবে যখন তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হবে এমন সব পাঠক যারা হেনরী জেমস বা আনাতোল ফ্রাঁসের গদ্য পড়েন এবং ডিবুসির সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত।

গদ্য ও পদ্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে আলাদা হলেও তার আবেদন আজ মননশীল ও সচেতন পাঠকের কাছে সমান। কবিতা বিষয়ে এখন শিক্ষিত বঙ্গালীর আগ্রহ ব্যাপক নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও নয়। আধুনিক কবিতা পড়তে দিলেই তাদের মুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখা যায়। বিনয় করে বলেন এ কি আর আমরা বুঝব? অথচ তারা বাংলা গদ্য পড়েন এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের লেখার সঙ্গে ভালই পরিচিত। কবিতা বিষয়ে এই অহেতুক অবিশ্বাসের কোনো কারণ পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় আমাদের স্কুল কলেজে কবিতা পড়ানোর ত্রুটি এর একটি কারণ। কবিতা যে শুধু মিলযুক্ত কতকগুলো পংক্তি নয় কিংবা শুধু বায়বীয় কল্পনা নয় এই সংস্কার থেকে অনেক সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সহজে মুক্ত হতে পারেন না; গদ্যের বিষয়টি তাদের কাছে যতটা অর্থপূর্ণ হয় কাব্যের বিষয় ততটা নয় অনেকের কাছেই। কবিতা ও গদ্য লেখক আজ আর দুই ভুবনের অধিবাসী নন। পরস্পরের কাছে তারা ঋণী। কবিতার লেখকরা উত্তম গদ্যশিল্পের মনোযোগী পাঠক না হয়ে পারেন না। গদ্যলেখকের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ তার সহায়ক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য কি কবিতার মহিমাকে স্পর্শ করেনি? 'দিবারাত্রির কাব্য' কিংবা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কোন কবিমন আপ্লুত ও আবিষ্ট না হয়ে পারে? তেমনি বিষ্ণু দে'র 'সন্দীপের চর' কিংবা 'সাত ভাই চম্পা'য় বিশ্লেষণী ও ইতিহাস-সচেতন গদ্যলেখক পাবেন তার সমাজবিশ্লেষণের আশ্চর্য উপকরণ। হেনরী জেমস জেমস জয়েস কিংবা কাম্যু গদ্য পদ্যের বন্ধনরেখা মুছে দেন আশ্চর্য শক্তিতে।

জীবনের চিত্রশালায় গদ্য পদ্য ও চিত্রশিল্প আজ পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে। পিকাসোর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি। শিল্পী বলতেন, কবিরা হল শিল্পের যথার্থ ব্যাখ্যাতা। এলুয়ার কি আরাগ'র কাছে তিনি নিজের ছবির ব্যাখ্যা শুনে অনেকবারই নিজের শিল্পসৃষ্টির নতুনতর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। যা ছিল শিল্পীর অবচেতন মনে কবির দৃষ্টিতে তা আলোকিত সংজ্ঞা লাভ করেছে।

বিজ্ঞান যতই আশ্চর্য শক্তি মানুষের করায়ত্ত করে দিক না কেন, তার মনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য কবিতা ও কথাসাহিত্যের চিত্রকলা ও সঙ্গীতের কাছে তাকে অঞ্জলি পাততেই হবে। সে তৃষ্ণা মানুষের নিঃসঙ্গ সত্তার যা সামাজিক সত্তার সঙ্গে মিশে নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়। বিজ্ঞান-মন মানুষের শিল্পীমনেরই অন্য এক স্তর। জিজ্ঞাসা থেকেই বিজ্ঞান; জিজ্ঞাসারই অন্য রূপ মানুষের শিল্পীসত্তা। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। যেহেতু বিজ্ঞানী যদি স্বাপ্নিক না হতেন তাহলে এই বিশ্বের অনন্ত রহস্য তাকে আকর্ষণ করত না। শিল্প তো সেই স্বপ্নেরই শরীরে নিজেকে আবিষ্কার করে—কবিতায়, কথাশিল্পে কখনো বা চিত্রকলায় ও সঙ্গীতে। গদ্য ও পদ্য জীবনের বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের পরিপূরক। সে তার বিরোধী নয়। কেননা স্বপ্ন দেখাই সভ্যতার স্বভাব সহধর্মী তাই তার জীবন ধারণের অবলম্বন। আজকের সভ্যতার বিবর্ণতা বা তার ভবিষ্যতের শঙ্কা বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে, মানবিক বোধের উন্মোধনে যদি দূর করতে হয় তাহলে সেই জাগরণ ও আত্মবিশ্লেষণের জন্য বিংশ শতাব্দীর কবি ও কথাশিল্পী চিত্রকলাকার ও সঙ্গীতবিদের ভূমিকাও উপেক্ষিত হতে পারে না।

৫০ বৎসরের উপর
অক্ষুণ্ণ সুনাম
বিদ্যমান

প্রখ্যাত চা ব্যবসায়ী

বি, কে, সাহা
এণ্ড ব্রাদার্স
প্রাইভেট লিমিটেড

ভারতীয় চায়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
৫, পোলক স্ট্রীট
২, লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১

যেখানে মন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কথাবার্তা সবই প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে যে এমনি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা মোটে ভাবাই যায়নি।

শেষ পর্যন্ত বাতিলই করতে হলো প্রস্তাবটা। বাতিল না করে কোনো উপায় ছিল না।

ছেলের বাপ নিজ হাতে কানমলা খেয়ে ক্ষমা চাইলেন। কাঁদতে কাঁদতে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ তাঁর কথা প্রত্যাহার করে নিলেন। এর পর আর কী করা যেতে পারে? কিছু করার আর থাকতেই পারে না সমস্ত ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলা ছাড়া।

তেমনি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন পরিমল ভট্টাচার্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেই তো হয় না, এরূপ ক্ষেত্রে সবকিছু ভুলে যাবার সিদ্ধান্তকে চট্ করে রূপ দেওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

একেবারে প্রায় শেষ পর্যায়ে গিয়ে একটা আকস্মিক প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লে, অতিক্রম করে আসা আগের অধ্যায়গুলি কি বিস্মৃত হওয়া যায়? যায় না। অবশ্য পরিমলবাবু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে ক'দিন ধরেই বলছিলেন, যা হবার হয়ে গিয়েছে. ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না।

কিন্তু মুখে অমন বললে কী হবে. মন মানলে তো।

সেদিন বিকেলে গা-হাতপা ধুয়ে হার্মোনিয়ামটা নিয়ে যথারীতি গান গাইতে বসেছিল অরুণা। সবেমাত্র গানটা ধরেছে, প্রথম কলিটি গাইতেই চমকে উঠলেন পরিমলবাবু।

দেখা হয়েছিল দু'জনে—
পড়ে মনে, পড়ে গো মনে।

অরুণা ত হলে জানে না এখনো যে সম্বন্ধটা বাতিল হয়ে গেছে! তাকেও নিশ্চয়ই ভালো করে জানিয়ে দেওয়া উচিত সমস্ত ব্যাপারটা। এ যে ভালোই হয়েছে তার পক্ষে সেটাই তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সংস্মা হলেও মনীষা যে সেটা ভালোভাবেই পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই পরিমলবাবুর।

•

মাত্র সপ্তাহখানেক আগে দুই বন্ধুকে নিয়ে প্রণবেশ দেখে গিয়েছে অরুণাকে। বেশ কয়েকখানা গানও শুনেছে অরুণার। তিনজন অতিথি শ্রোতাই প্রত্যেকটি গানের প্রশংসা করেছে।

তারপরে অরুণা যে একটু বেশি জলি হয়ে উঠবে সে তো স্বাভাবিক।

তাই ঐ গানটি সেদিন সে ধরেছিল যা শুনে বাবা তার অমন চমকে উঠলেন। তাকে আসল ঘটনাটা জানিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন।

একটু কনজারভেটিভ সংসারের মেয়ে হলেও, অরুণার একটা অহংকার

ছিল। সেই অহংকারেই সে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, যিনিই তাকে প্রথম দেখতে আসবেন, তাঁরই তাকে পছন্দ হয়ে যাবে। তার বাবাকে তার জন্যে আর দ্বিতীয় সম্বন্ধ খুঁজতে হবে না।

অরুণার এ-অহংকারের মূলে যে কোনো যুক্তি ছিল না তা নয়। যাকে বলে দুধে-আলতায় রঙ, অরুণা ঠিক তাই। রীতিমতো লাবণ্যময়ী। দেখে কেউ অপছন্দ করবে এমন হতেই পারে না। লেখাপড়ায়ও মোটামুটি ভালোই। গ্রাজুয়েট। তার ওপর বাস্তবিকই সে সুধাকণ্ঠী গায়িকা।

ধনী পরিবারের না হলেও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের এমনি একটি গুণী মেয়েরই সন্ধান করছিলেন মোহনপুরের অবন্তী ঘোষাল তাঁর ছোট ছেলের জন্য।

এককালের নামকরা জমিদার বংশ হলেও মোহনপুরের ঘোষালদের এখন আর সেই জমিদারীও নেই এবং সেই প্রতাপও নেই। তা হলেও এখনো বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব চলে, বহিরাঙ্গনে চৈত্রসংক্রান্তির এবং রথের মেলা বসে। ধুমধাম আগের থেকে অনেকখানি কমে গেলেও, মোহনপুরের বাবুর বাড়ির নাম করলে একবারেই সবাই চেনে। এমনি নামমাহাত্ম্য এই পুরনো জমিদার পরিবারের।

তাই ঘটক এসে কখন হঠাৎ একদিন সকালবেলায় পরিমলবাবুর কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্যে অবন্তী ঘোষালের ছোট ছেলের নাম পাত্র হিসেবে উপস্থিত করলেন, তিনি এক কথাতেই ঐ প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হতে রাজী হয়ে গেলেন।

এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি যদি এ-সম্বন্ধ ঠিক করে দিতে পারেন, তাহলে ভালো পুরস্কারই দেবো, আপনাকে নিশ্চয়ই খুশি করবো।—এমনি আশ্বাস দিয়ে গরীব ঘটকমশাইয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন পরিমলবাবু।

বাপের সে-কথাটা কানে গিয়েছিল অরুণার। তার বিয়ের জন্যে বাপ একটি পয়সাও অন্যায়ভাবে খরচ করতে গেলে সে তার বিরোধিতা করবে, এ সে বাপ-মাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তবে ঘটক লোকটি গরীব মানুষ। ছেঁড়া জুতো, তাপ্পিমারা ছাতা আর পরণের ময়লা কাপড়ই তার দারিদ্র্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সেই লোকটিকে পরিমলবাবু পুরস্কৃত করে খুশি করবেন, এ শুনে অরুণাও খুশি। কিন্তু বাবা তার এমনি ভালো মানুষ, মেয়ে দিয়ে দেবার আগ্রহে পণ দিতেও রাজী হয়ে যেতে পারেন, সেটাই তার ভয়।

সেই ভয়েই অরুণা প্রথম সুযোগেই পরিমলবাবুকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, দ্যাখো বাবা, ঘটককে তুমি গরীব মানুষ হিসেবেও যেমন ইচ্ছে অর্থ সাহায্য করতে পার তাতে আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। কিন্তু তুমি যদি মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে পণ দিতে রাজী হয়ে যাও, তাহলে কিন্তু ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে, তোমার মেয়ে তেমন বিয়ের ধারকাছ দিয়েই যাবে না।

সে কিরে, আগে থেকেই এসব কি বলছিস তুই?

মেয়ের কথায় অবাক হয়ে যান পরিমলবাবু। সেই থেকে তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এমনভাবে তৈরী করে রাখতে চান যাতে ঘোষালদের সম্বন্ধটা হাতছাড়া হয়ে না যায়।

ঘটকমশাইয়ের মাধ্যমেই পরিমলবাবুর বাড়িতে দু'পক্ষের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যাবার পর আরো কয়েকবার এবাড়ি-ওবাড়ি করে উভয় পক্ষই ফাইনালটা করে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময়েই অভাবনীয় এমন একটা বিভ্রাট ঘটে গেল যার ফলে এতো দিনের দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি সবকিছুই সম্পূর্ণ পণ্ড হয়ে গেল।

বিয়েটা শ্রাবণে হবে, না অঘ্রাণে—এ নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পারলেও পাকা দেখার তারিখটা পাকা করে ফেলেছিলেন দু'পক্ষেরই কর্তারা মিলে।

পাকা দেখার তারিখ ঠিক হয়ে গেলেই পরিমলবাবু চেয়েছিলেন বিয়ের দিনটাও পাকা করে ফেলতে। মেয়ের বাপ তো, তাঁর প্রস্তুতির কাল চাই। যে বাজার।

কিন্তু প্রস্তুতির আবার কী আছে? এই প্রশ্ন তুলে ছেলের কাকা সুধেন্দুবাবু বললেন, আমাদের তো কোনোরকম দাবীদাওয়া নেই। মেয়েটি সবরকমে পছন্দ হয়েছে, ওকে আমাদের সংসারে নিয়ে গিয়ে আমরা নতুন লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করবো। এতে আপনার তো কিছু করার থাকতে পারে না। শুধু মা লক্ষ্মীর সব দায়-দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দেওয়া—এই তো আপনার কাজ।

তবুও কিছুটা সময় আমার চাই-ই।—ছেলের কাকার কথার পিঠে দাবী তুলেছিলেন পরিমল ভট্টাচার্য।

ঠিক আছে, শ্রাবণে তারিখ ফেললেও আপনি ঢের সময়ই পাচ্ছেন। গোটা আষাঢ়টাই তো এখনো পড়ে আছে। আষাঢ় মাস শেষ হবে, তবে তো শ্রাবণ।

না, না, সুধেন্দুবাবু, শ্রাবণে নয়: বড্ড জল-বৃষ্টির দিন। আমার বাড়ির প্রথম কাজ। সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে শ্রাবণের [illegible]।—পরিমলবাবু এমনভাবে তাঁর আপত্তি জানালেন যার পরে ছেলের পক্ষ থেকে বিয়ের তারিখ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই তোলা হলো না।

অবন্তীবাবু খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে হলেও শেষ করেছিলেন। একটি যুক্তির অবতারণা করে ওই বিষয়ের সমস্ত বিতর্ক অন্তত সাম-

তিনি বললেন, বাস্তবিকই বিয়ের তারিখ ঠিক করা, সে তো অনেক পরের কথা। আগে সম্বন্ধটা পাকাপাকি হয়ে যাক, তারপর দিনক্ষণ ঠিক করার প্রশ্ন উঠবে। তার আগে দু' পক্ষকেই সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। তা না হলে পাকাপাকি হবে কিসের ওপর ভিত্তি করে?

ঠিক বলেছেন ঘোষালমশাই।

পরিমলবাবুকে আর বাক্য ব্যয় করতে না দিয়ে অবন্তী ঘোষাল আবার বলছিলেন, মেয়ে দেখে এবং মেয়ের বাপ-মার সঙ্গে আলাপ করে আমরা খুশি হয়েছি। এবার আপনারা ছেলে দেখুন, ছেলের চাকরিবাকরির এবং বাড়ির অবস্থার খোঁজখবর নিন ভালো করে। তাছাড়া যে পরিবারে আপনি মেয়েটিকে দেবেন, সে-সংসারের লোকজন সব কে কেমন তাও তো আগে থেকেই জেনে নিতে হবে।

আপনাদের বাড়ির লোকদের কী আবার খোঁজখবর নেবো? আপনাদের পরিচয় সবারই জানা। তাছাড়া আপনাদের দু' ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই বুঝতে পারছি, আমার মেয়ের ভাগ্যেই এমন সজ্জনদের সঙ্গে আমার নতুন আত্মীয়তা হতে চলেছে।

না, না, পরিমলবাবু, ও কোনো কথা নয়। ছেলেটি সম্বন্ধে পুরোপুরি খোঁজখবর নিয়ে, তার বাড়ির অবস্থা দেখেশুনে সন্তুষ্ট হয়ে তবেই অগ্রসর হবেন। এসব ব্যাপার অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেওয়ার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না।

ছেলের বাবার মুখের এ-কথাটি খুবই মূল্যবান বলে মনে হলো কন্যের বাবার।

পরিমলবাবু তাই বলছিলেন, ঠিক আছে, রথযাত্রার দিন তো এখনো অনেকটা দূরে। এরই মধ্যে দেখা-শোনার পর্ব আমরা সব শেষ করে নেবো। আপনাদের মধ্যে আরো যদি কেউ মেয়ে দেখতে চান, তাহলে রথযাত্রার পূর্বেই তা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রস্তাবটি শুনে অবন্তীবাবু বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, ভালো বলেছেন। দিনকাল এখন অনেক

পাল্টে গেছে। ছেলেই বলুন আর মেয়েই বলুন, একালে ছেলেমেয়েরা অন্ধ বাপ-খুড়ো বা অন্য অভিভাবকের পছন্দ-মতো নিজ নিজ জীবনের পার্টনার খোলা মনে মেনে নিতে পারে না। ওদের দু'জনকে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়।

বেশ তো, তাতে আর অসুবিধে কি। একটা দিন আগে আমায় শুধু জানিয়ে দেবেন প্রণবেশ কবে আসতে পারবে এবং কখন আসবে। সে যদি তার কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় নিয়ে আসে আমরা সানন্দে তাদের মেয়ে দেখানোর জন্যে প্রস্তুত থাকবো।

মোটামুটিভাবে সেদিনের মতো কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু ঘোষালমশাইয়ের ছোট ভাই সুখেন্দুবাবু বিদায় নেবার মুখে দাদাকে বললেন আরেকটু বসে যেতে যাতে অন্তত আরেকখানা ভক্তিমূলক গান শুনে যেতে পারেন অরুণা মায়ের মুখ থেকে।

পাশের ঘর থেকে মায়ের পাশে বসে সবই শুনতে পেয়েছিল অরুণা। বাপের ডাকে বৈঠকখানায় এসে হার্মোনিয়াম নিয়ে বসে পড়লো সে। তার সঙ্গে সঙ্গত করতে বসলেন পাড়ারই বিখ্যাত তবলচি ধীরু গাঙ্গুলী। অরুণা গান ধরলো—

না চাহিতে অতো দাও কেন প্রভু,
চাহিনা বলেই বুঝি;
কী আর চাহিব কী মোর অভাব
তুমি যার আছ পুঁজি।

গানটি শেষ হতেই 'অপূর্ব, অপূর্ব' বলে দুই ঘোষাল বাহবা দিলেন অরুণাকে। ছোট ঘোষাল বললেন তাকে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রোজ মায়ের এমনি সব ভক্তির গান শুনে কান জুড়োবো। আজ আর তোমার কষ্ট দেবো না মা। আবার আসবো।

এই বলে বিদায় নিলেন ঘোষালেরা। অরুণা তার আগে ওদের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো। পরিমলবাবু ওঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন।

পথে অনেক কথাই হল দু' ভাইয়ের মধ্যে। একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য।

বড়ো ভাই অর্থাৎ ছেলের বাপই বলছিলেন ছোট ভাইকে, দ্যাখ সুখেন্দু, আজ যেন মেয়েটিকে আরো ভালো লাগলো। তোরও তাই মনে হয়নি?

অরুণার সাজপোশাকের কথা বলছো দাদা? অমন প্রতিমার মতো সুন্দরী মেয়ে, তার আর জমকালো শাড়ি গয়নার কীইবা দরকার?

ঠিক বলেছিস, তবে ঘরে পরার আটপৌরে শাড়ি পরে ভাবী স্বামীর বাপ-খুড়োর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে তার মনের জোর কতখানি তা একবার ভেবে দ্যাখ দেখি।

সে তো বটেই।—এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে দাদাকে সাপোর্ট দিয়ে আরো বললেন সুখেন্দুবাবু, আজকের জমাটি গানখানিও কিন্তু দরাজ গলায় অপূর্ব গেয়েছে অরুণা।

তা আর বলতে? প্রাণ আমার শীতল হয়ে গেছে একবারে!—এটুকু বলতে বলতেই বিগলিত ধারায় অশ্রুপাত শুরু হয়ে গেল অবন্তীবাবুর দু'চোখ জুড়ে।

দাদাকে শান্ত করতে বেগ পেয়েছিলেন সেদিন ভোগ করতে হয়নি ছোট ভাই সুখেন্দু ঘোষালকে।

এমন সুন্দরী একটি বৌমাকে অবন্তীবাবু ঘরে আনতে চলেছেন, এ তারই আনন্দাশ্রু। তবু সেই আনন্দের বেগ সামলানো কি কম কথা বুড়ো ঘোষালমশাইয়ের পক্ষে!

মেয়ের বাপের অবস্থাও তো মোটামুটি ভালোই মনে হলো। ছোট বাড়ি হলেও, বেশ ছিমছাম সাজানো-গোছানো। সাজসরঞ্জামও সবরকমই চোখে পড়লো। পরিমলবাবুর ব্যবসা-পত্তর ভালোই চলে বলতে হবে।

তা ওঁর ব্যবসাপত্তর ভালো চলুক খুবই ভালো কথা। তবে ও নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। আমাদের তো কোনো দাবী নেই, বরং যে বাপ-মায়ের কোল থেকে মেয়েটিকে নিয়ে আসবো, তাঁদেরই সিন্দুকে গিয়ে হানা দেবো, এমন পৈশাচিক কাজ মোহনপুরের জমিদার বংশে কেউ কোনোদিন করেনি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না।

সুখেন্দুবাবুর জবাবে বড়ো ঘোষাল যা বললেন তাতে যথার্থই গর্ববোধ করলেন তাঁদের বংশের এই অনুকরণীয় ঔদার্যের জন্যে। তবে তাঁদের মোহনপুরের বাড়ির সদর দরজায় এসে গাড়ি থেকে নামতে নামতে ছোটকর্তা শুধু একটি কথাই বললেন, দাদা, আমরা তো মোটামুটি সবই একরকম ঠিক করে এলাম, শ্রীমান আবার বেঁকে না বসে!

সেই তো ভাবনা!—এই বলে টাক-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাড়িতে ঢুকে পড়লেন অবন্তী ঘোষাল। ছোট ঘোষালও এলেন তাঁর পিছে পিছে।

একটু পরেই দেখা গেল বড়ো ঘরের ঝুলবারান্দায় হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় বাড়ির গিন্নীদের ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুই কর্তা বৈঠকে বসে গেছেন। সেখানে অনুপস্থিত শুধু প্রণবেশ। কারখানা থেকে ফিরতে রোজই তার একটু বেশি রাত হয়।

এই বেশি রাতে বাড়ি ফেরা বন্ধ করার জন্যেই তো প্রণবেশকে সুন্দরী সুলক্ষণা বউ এনে দেওয়ার জন্যে এমন তোড়জোড় চলছে মাস ছয় ধরে।

কিন্তু যথার্থ চোখে ধরার মতো মেয়ের সন্ধান পাওয়া কি সহজ ব্যাপার? আর শুধু সুন্দরী হলেই তো হবে না, ঘোষাল বাড়ির বৌ'কে শিক্ষিতা হতে, তাকে গানবাজনা জানতে হবে, আরো কতো কি!

এর আগে দু'-দুটো চমৎকার সম্বন্ধকে বড়ো কর্তার বড়ো ছেলে অবিনাশের বৌ সুরমা নাকচ করে দিয়েছে ও দুটি মেয়ের একটিরও ফিগার তেমন ভালো নয় বলে।

কিন্তু ফিগার ব্যাপারটা যে কী, কী যে ওরা বলতে চায় তা দু' কর্তাই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ছোট ঘোষাল ও নিয়ে সেদিন খুব রেগেই গিয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন সুরমাকে, আচ্ছা বড়বৌমা, আমরা যা বুঝি না তোমরা কেবল সেই ফিগারের দোহাই দিয়ে সব সম্বন্ধই বানচাল করে দাও, তাহলে তো দেখছি প্রণবেশের বিয়েই আমরা দিতে পারবো না।

ছোটকর্তা আরো বলেছিলেন, আচ্ছা বড়ো বৌমা, বলতে পারো ঐ ফিগার বলতে তোমরা কী বোঝাতে চাও। এবারের প্রস্তাবটাও আবার ভেস্তে যাবে না তো সেই একই অজুহাতে?

খুড়শ্বশুরের প্রশ্নে লজ্জায় প্রথমটায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সুরমা। ফিগারের বিষয় নিয়ে কী করে সে আলোচনা করবে শ্বশুরদের সঙ্গে। যাই হোক, পরক্ষণেই সে সোজা হয়ে বসে উত্তর বলেছিল, না কাকাবাবু, এবারের পাত্রী আমাদের সবারই পছন্দ হয়েছে। সবদিক থেকেই মেয়েটি এ-বাড়ির বৌ হবার উপযুক্ত।

তোমাদের সবারই ভালো লেগেছে তো?

হ্যাঁ, বাবা সবারই।

সুরমার এ-উত্তরে বড়ো ঘোষালের চোখ দুটো আনন্দে চিকচিক করে উঠলো।

তিনি এক মুখ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বড়ো বৌমা, বলতে পারো অরুণাকে পছন্দ হবে কিনা প্রণবেশের?

তা হবে কিনা এখনই বলতে পারছি না, তবে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তো রাজী করেছি মেয়েটিকে দেখে আসতে। আসছে রবিবার ঠাকুরপো

তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বরানগরে পরিমলবাবুদের বাড়িতে যাচ্ছেন বেলা চারটে নাগাদ। সে-কথা ও-বাড়িতে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে ফোনে। গলা শুনে মনে হলো, মেয়েটি নিজেই ফোন ধরেছিল।

খুবই ভালো কথা, খুবই ভালো কথা!—বলে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোট ঘোষাল আর তাঁর দাদা। মা জগদম্বার নাম স্মরণ করে দু' হাত মিলিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন ওঁরা দুজনেই।

সেদিনের মতো ঘোষাল বাড়ির বৈঠক ভেঙে গেল।

অবশ্য সেই থেকে লেগে আছে প্রণবেশের পেছনে। রবিবার বিকেল চারটের এ্যাপয়েন্টমেন্টটা যাতে ঠিক থাকে, কোনোরকমে গড়বড় না হয়ে যায়, সে তাগিদই সে দিয়ে চলছে দিনে-রাতে দু'বার করে।

ওদিকে পরিমলবাবু তাঁর এক চৌকস বন্ধুকে নিয়ে প্রণবেশদের বেহালা কারখানায় গিয়ে হানা দিয়ে এসেছেন।

না, লুকিয়ে পালিয়ে পাত্রের কর্মস্থল দেখে আসা নয়। কারখানার পাঞ্জাবি মালিক হরকিষেণ লালের সঙ্গে এবং প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার মাথুর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করে ও কথাবার্তা বলে খুবই খুশি হয়ে এসেছেন পরিমল ভট্টাচার্য ও তাঁর খাস বন্ধু অনিল সমাদ্দার।

লাল ইন্ডাস্ট্রিজের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার প্রণবেশ ঘোষালকে স্বয়ং মালিকই ডেকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর অফিস ঘরে অতিথিদের সামনে। সন্দেহের যাতে কোনো কারণ না থাকে সেজন্যে প্রণবেশকে কাছে বসিয়েই হরকিষণ লাল বলছিলেন, এতো ইয়ং বয়েসে খুব কম ছেলেকেই এমন উন্নতি করতে দেখা যায়। এখনো পর্যন্ত পুরো দু'বছরও হয়নি ওর চাকরি জীবনের। আমার কারখানায় মাত্র মাস সাত হলো এসেছে বম্বে থেকে। জার্মানী থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা নিয়ে প্রণবেশ আমার দাদা সুন্দরলালের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা 'সুন্দর মেশিনারিজ'-এ এসে যোগ দেয় বম্বেতে। হঠাৎ মায়ের ভীষণ অসুখের খবর পেয়ে প্রণবেশ চাকরি ছেড়ে দিয়েই মায়ের কাছে চলে আসতে চাইলে দাদা তাকে আমার কারখানায় ট্রান্সফার করে দেন সেই পদে এবং সেই মাইনেতেই।

বাঃ, চমৎকার লোক তো আপনার দাদা!

হ্যাঁ, দাদা প্রণবেশবাবুকে খুবই ভালোবাসেন। প্রণবেশের মায়ের ব্যামো সেরে গেলে দাদা ওকে আবার নিজের কারখানায় নিয়ে যাবেন। আমাকে লিখেছেন, ওকেই জেনারেল ম্যানেজার করে দেবেন, আবার বিলেত পাঠাবেন। মাইনে তখন ডবল হয়ে যাবে।

এখন কতো রোজগার প্রণবেশের?

তা মাসে প্রায় হাজার দুই টাকা হবে।—পরিমলবাবুর সরাসরি প্রশ্নের জবাব দিলেন হরকিষেণ লাল।

মালিকের মুখে এ-কথা শোনার পর বন্ধুর সঙ্গে আরেকবার চোখ চাওয়াচাওয়ি হলো পরিমলবাবুর।

এদিকে কাজের চাপের অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়েছে প্রণবেশ।

চা-পান পর্ব শেষ হয়েছে। অতিথিদের বিদায় নেবার মুখে একটি খুব অর্থপূর্ণ কথা বললেন হরকিষেণলাল।

এমন ছেলেকে জামাই হিসেবে পাওয়া বাস্তবিকই এক দুর্লভ প্রাপ্তি। কিন্তু প্রণবেশ কি বিয়ে করবে? —হরকিষেণলালের এ-প্রশ্নে চমকে গেলেন ভটচায এবং সমাদ্দারবাবু।

পরিমলবাবু জিজ্ঞেসই করে বসলেন, এ প্রশ্ন কেন তুললেন হরকিষেণজী? প্রণবেশ কি বলেছে কিছু আপনাকে?

না, না, তা কিছু নয়। ও আমার একটা অনুমান। ওর কলিগদের কাছ থেকেও অমনি রিপোর্টই পেয়েছিলাম। —জবাব দিলেন হরকিষেণ।

কিন্তু প্রণবেশ তো মেয়ে দেখতে যেতে রাজী হয়েছে। পরশু রবিবারই সে যাবে আমাদের বাড়িতে।—জানালেন পরিমলবাবু।

সে তো খুব ভালো কথা। এখানে মেয়ের সম্বন্ধ যদি ঠিক করে ফেলতে পারেন সেটা বাস্তবিকই খুব সৌভাগ্যেরই হবে।

মনে কেমন একটা খটকা লেগে গেল পরিমল ভট্টাচার্যের হরকিষেণ লালের শেষ কথাটিতে। তার ওপর আবার বিয়েতে প্রণবেশের অমতের কথাও শোনা গেল। দুই বন্ধু পান চিবোতে চিবোতে লাল ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এমন ভাবতে ভাবতেই গিয়ে ট্যাকসিতে উঠলেন।

ট্যাকসি ছাড়তেই সমাদ্দার মুখ খুললেন, যাই বলো ভাই, অনেক জন্মের পুণ্যফলেই এমন জামাই জোটে বাবা। যেমনি চেহারা, তেমনি স্মার্ট। একেবারে সাহেবের বাচ্চার মতোই দেখতে। তবে ছেলেটা হাতছাড়া না হয়ে যায়, তাই দেখতে হবে।

বন্ধুর শেষ মন্তব্য শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন পরিমলবাবু। বললেন, এর পর আমাদের আর কীই বা করার থাকতে পারে? সবই এখন ঈশ্বরের হাত। দেখা যাক কী হয়।

ঠিকই বলেছ ভাই। পরশু চার-চোখ হবার পর যেমন পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা বুঝেই আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে।

ঠিকই তাই। এ-দুটো দিন চুপ-চাপই থাকা যাক।—জবাবে বললেন পরিমলবাবু এবং দেখতে দেখতে গাড়িও বাড়ির সামনে এসে থামলো।

শনিবারটা যেন আর কাটতে চায় না!

পরিমল ভট্টাচার্যের বাড়িতে সবারই ভীষণ ব্যগ্রতা রবিবারটাকে তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে।

সন্ধ্যা হলে কী হবে, মনীষা তাঁদের ছোট্ট বাড়িখানাকে একেবারে মন্দিরের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছেন পরদিন অরুণকে তার প্রস্তাবিত বর বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতে আসবে বলে।

শারদীয় অভিনন্দন
জানাচ্ছেন
কিং এণ্ড কোং
১৮৯৪ সাল হইতে জাতির সেবায় নিয়োজিত প্রাচীনতম ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
●
প্রধান কার্যালয় :
১০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০৭
ল্যাবরেটরী :
৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা
৭০০০১২

রবিবার ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই নতুন একখানা অ্যাম্বেসেডার গাড়ি এসে দাঁড়ালো অরুণাদের বাড়ির সামনে।

প্রণবেশ তার তিন বন্ধুকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই পরিমলবাবুর দাদা সুনির্মলবাবু ও বন্ধু অনিল সমাদ্দার তাদের চারজনকে ঘরে নিয়ে এলেন সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে।

আলোচনা জিজ্ঞাসাবাদ চললো কিছুক্ষণ ধরে। পরিমলবাবু একটু পরে এসে যোগ দিলেন তাতে। কফি খেতে খেতে গল্প আরো জমে উঠলো। প্রণবেশ সম্বন্ধে যা-কিছু জানার তার মুখ থেকেই প্রায় সব শোনা হয়ে গেল।

ভেতর থেকে জানলার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনীষা এবং অরুণাও সব শুনলো। সবাই খুব খুশি ছেলের কথাবার্তায়, তার সুন্দর ভদ্র ব্যবহারে।

এদিকে মা-মেয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে অরুণা কোন শাড়িখানা পড়বে তা নিয়ে। মনীষা কিছুতেই বেনারসী নীলাম্বরী-খান মেয়েকে পরাতে পারলেন না। শেষে নিবৃত্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। প্রণবেশকে পর পর দু'বার ঘড়ি দেখতে দেখে পরিমলবাবু ভেতরে এলেন একবার। অরুণাকে ডাকলেন কাছে। সে সেজেই ছিল সাদাসিধেভাবে, সেভাবেই সে তার বাবার সঙ্গে বৈঠকখানার আসরে এসে বসলো। বিকেলী আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল শান্তশ্রী অরুণাকে।

আপনারা ওর গান শুনবেন দু'-একখানা।—জিজ্ঞেস করলেন অনিল সমাদ্দার।

নিশ্চয়ই। অন্তত একখানি গান না শুনে আমরা যাচ্ছিনে।—বললে প্রণবেশের এক বন্ধু।

বেশতো, খুবই আনন্দের কথা—সমাদ্দার এই উত্তর দিয়ে বললেন অরুণাকে, তুমি মা কবি নিশিকান্তের ঐ গানখানা গাও। ভারি ভালো লাগে তোমার মিষ্টি গলায়। কী অপূর্ব আকুলতা।

অরুণা গান ধরলো—

প্রিয়তম হে।

আজি জীবন মম প্রস্ফুট কর
প্রেম-অরুণ রাগে ঃ
নব গগনে—শুভ লগনে
যেন রাশি রাশি হাসি-কিরণ-লগন
ভুবন জাগে—
তব প্রেম-অরুণ রাগে।

প্রণবেশ মাথা নিচু করে গানখানি শুনছিল। তার বন্ধুরা হার্মোনিয়াম থামতেই বলে উঠলো, অপূর্ব! চমৎকার গলাই বটে।

আরেকখানা গাইবে, রবীন্দ্রসংগীত বা অন্য কিছু?

না, না, আর কষ্ট দেবো না ওঁকে। উনি যেতে পারেন।—প্রণবেশের বন্ধুরা প্রায় একই সঙ্গে সমাদ্দারের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দিলে।

অরুণাও চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে ভেতরে চলে গেল। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল অরুণার। কী ভয়ই না পেয়েছিল সে। কিন্তু ভারি ভদ্রলোক ওঁরা। খুবই তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়েছে। মনে মনে অরুণা ওঁদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে সেজন্যে।

এরপর খাওয়াদাওয়ার পালা চলেছে কতক্ষণ ধরে। প্রণবেশ কিছুই খায়নি বলতে গেলে। শুধু বসেছে মাত্র। শরীরটা ভালো নয় বলে হাত তুলে চুপচাপ থেকেছে। বন্ধুরা অবশ্য পুরোটা তার পুষিয়ে নিয়েছে। ঢেকুর তুলে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে আর সম্ভব নয়, যথেষ্ট হয়েছে।

একটু বিশ্রামের পর একটি করে পান মুখে পুরে প্রণবেশ যখন তার তিন বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবে ঠিক সে-সময়েই অনিল সমাদ্দার ওঁদের বললেন, আপনাদের মতামতটা জানিয়ে গেলে বড়ো ভালো হতো।

সেসব বাবা বা কাকার কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ঠিক হবে।—এই বলে সবাইকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো প্রণবেশ এবং গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো।

'বাবা বা কাকার কাছ থেকে জেনে নেওয়াই হবে', প্রণবেশের এই কথাটা কেমন যেন একটু বেসুরো ঠেকলো সবার কাছে।

কেউ তবু তা নিয়ে কোনো কথা তুললেন না সে-সময়ে। পাছে আবহাওয়াটা নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে।

মাঝখানে আরেকটা দিনও ছেড়ে দেওয়া হলো।

ভটচায বাড়িতে কেমন একটা থমথমে ভাব। কি হয়, কি হয়। ছেলে কী মত জানায় তার বাপ-মায়ের কাছে!

তা জেনে আসার জন্যেই পরিমলবাবু তাঁর দাদাকে পাঠালেন মোহনপুরে। সঙ্গে দিলেন তাঁরই ব্যবসার সহকারী পতিতপাবনবাবুকে, যিনি প্রথম দিনই ঘোষাল বাড়ি ঘুরে এসেছেন তাঁর অনিলের সঙ্গে।

সকাল সকাল খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সুনির্মলবাবু পতিতপাবনকে নিয়ে, ফিরে এলেন মোহনপুর থেকে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়।

বাড়িতে সবাই উদগ্রীব মোহনপুরের খবর শোনবার জন্যে। কিন্তু মুখ কালি করে ফিরেছেন যে ওঁরা দু'জনেই।

সুনির্মলবাবু ভাইকে নিরিবিলি একটা ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, ও-আশা ছেড়ে দাও। তবে ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। প্রণবেশ আগেই বিয়ে করে বসে আছে। সে বিয়ে করেছে বম্বের ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা 'সুন্দর মেশিনারিজ'-এর মালিকের মেয়ে জয়ন্তীকে। সেই মেয়েটিকে নাকি চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলে একটা স্যুট ভাড়া করে এনে রেখেছে প্রণবেশ। তার শ্বশুর সুন্দরলালই নাকি হোটেলের সব খরচ ছ'মাস ধরে বহন করে আসছেন।

সে কি কথা, এর পরেও অবন্তী ঘোষালমশাই এতদিন ধরে আমাদের সঙ্গে এমন একটা প্রতারণার অভিনয় চালিয়ে গেলেন?

না, না, তা ঠিক নয় ভাই। বড়ো ঘোষাল বা তাঁর ছোট ভাই কিংবা বাড়ির অন্য কেউ যে এ-ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও জানতো না আমরা ঘোষালবাড়ির আজকের অবস্থা দেখেই তা বেশ বুঝে এলাম। অবন্তীবাবু আমাদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয়ে নিজ হাতে কানমলা খেয়ে তাঁর অপরাধ, সংসার পরিচালনায় অক্ষমতার জন্যে মার্জনা চাইলেন।

কিন্তু একি মার্জনার বিষয় দাদা?

মার্জনা ছাড়া কীইবা করবে তুমি? আজই ব্যাপারটা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে যার জন্যে ঘোষাল-বাড়িতে আজ দুপুরে হাঁড়ি চড়েনি। কেবল কান্নাকাটি চলেছে। ছোট ঘোষালের একমাত্র ছেলে বিশ বছরের হিরণ্ময়ই একমাত্র লোক যাকে প্রণবেশ সব জানিয়েছিল। সেই হিরণ্ময়ের কাছ থেকেই প্রণবেশের পুরো গুপ্ত-কাহিনী জেনে এসেছেন ওঁরা আর ওঁদের কাছ থেকে সে-কাহিনী শোনার পর ভটচায বাড়িরও খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ হয়ে গেল সেদিনের মতো।

রেজিস্ট্রি বিবাহ
মোট ১৬ টাকায়
ম্যারেজ অফিসার
এন, ঘোষ জাস্টিস অফ পিস্
ম্যারেজ অফিস :
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮

অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন বাড়ি পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো। গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে স্কুলটি উঠে এল। ডাফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন এওয়ার্ট। স্কুলের জন্য নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের উদ্যোগও এই সময়ে শুরু হলো—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারী হেদুয়ার পূর্বদিকে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ডাফ স্বদেশ থেকে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে টাকা পাঠালেন (গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে জমি কেনা হয়েছিল দাম পড়েছিল ষোলশো পাউন্ড)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো নতুন বাড়িতে।

ডাফ দ্বিতীয়বার কলকাতা ফিরে এলেন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। এবার তাঁর কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তারিত হয়েছে। স্কুলে পড়ানোর সঙ্গে চলেছে ধর্মপ্রচার। কিন্তু ক্রমশ তা আর স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে, ডাফ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের বিতর্কে। ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও দিয়েছেন ডাফ। অবশ্য অনেক বাঙালীদের সঙ্গে ডাফের পরিচয় বেড়েছে—অনেক বাঙালীকে তিনি বন্ধু হিসাবে পেয়েছেন।

বাঙালীর কাছ থেকে প্রতিকূলতাও তিনি কম পাননি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা মনে পড়বে; যিনি বড়দিন বা ইংরেজী নববর্ষে 'ডফকে' (ডাফ) স্মরণ করেছেন কখনো শুধুই কৌতুক; কখনো তীব্র শ্লেষ—

'এ বি' পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাদা-গাদা ডেস্কের উপরে।।

অন্যত্র,

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডফের টবে চ্যাপেলেতে যাব।।

বলা বাহুল্য ঈশ্বর গুপ্ত ডাফকে পছন্দ করতে পারেন নি। ডাফের ইংরেজী শিক্ষাদানের আগ্রহকেও তিনি সন্দেহের চোখে দেখেছেন; 'হেদো বনের কেঁদো বাঘ রাঙা মুখ যার', সে আসলে ধর্মান্তরিত করতে এসেছে এদেশে, সুতরাং বাঙালী অভিভাবকদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত:—

বিদ্যাদান ছল করি মিশনারী ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব।।
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
যীশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব।।
শিশু সবে ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত ভাবে গোড়ে ডুব দেয় টবে।।

সেকালে হেদোর সঙ্গে ডাফের নাম অনিবার্যভাবে একসঙ্গে উচ্চারিত হতো। হেদোর ধারে কলেজ বলতে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনই বোঝাতো। তবে ঈশ্বর গুপ্ত একটি কবিতায় কলেজটিকে 'কুইন্স কলেজ' নামে অভিহিত করেছেন,

যখন হেদোর জলে করিয়াছ স্নান।
কুইন্স কালেজে গিয়া পাইয়াছ মান।।

কুইন্স কলেজ নামটি আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে, কিন্তু সেকালে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' অর্থেই 'কুইন্স কলেজ' নামটি প্রচলিত ছিল। আর ডাফ সাহেবের কলেজ যে সেকালের শ্রেষ্ঠ কলেজ তাতে আর সন্দেহ কি? ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Reis and Rayyet পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে,

"the fine institution which unaccountably, probably from its dignity in the machinery of High Education for natives, was, as it still is, popularly called the Queen's College'. ১৫ জুলাই, ১৮৮২ পৃঃ ৩৩১)।

শুধু পদ্য নয়, গদ্যেও ঈশ্বর গুপ্ত ডাফের শিক্ষাপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করেছেন, 'শিক্ষাসংসদের অধীন বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়িতে হয় না। কিন্তু মিশনারি স্কুলে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য। শিক্ষাসংসদের এই কাজ সুবিবেচনার পরিচায়ক। কারণ বুদ্ধি মার্জিত হইলে যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান সম্ভব। ...যাহা হউক, ডাফ সাহেব বিভিন্ন পত্রে শিক্ষাসংসদের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। তাহাতে কোন ফল হইবে না বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু শিক্ষা-সংসদের অধীন বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উচ্চ। তাহার প্রমাণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ। রাজকার্যে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন, মিশনারি স্কুলের ছাত্ররা নয়।' (সংবাদ প্রভাকর, ২৭ এপ্রিল, ১৮৫০)। ডাফের ছাত্র ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ তা বলা কঠিন, তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ডাফ সরকারী কর্মচারী সৃষ্টিতে উৎসাহী ছিলেন না।

আসলে ডাফের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের প্রধান অভিযোগ ছিল, ডাফ কলকাতায় আসার পর থেকেই অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে ডাফ প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করেননি, ডাফের সমসাময়িককালে অন্যান্য খৃষ্টান মিশনগুলিও ধর্মপ্রচারে বিরত ছিল না। কিন্তু ডাফ ধর্মপ্রচারকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন, এবং যা তিনি মনে করতেন তা তিনি কোনোদিন গোপন করেন নি। অন্যদিকে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন উচ্চমানের পঠন-পাঠন, নিয়মশৃঙ্খলা ও নীতি-শিক্ষার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল, এবং এরই ফলে ক্রমশ ছাত্রসংখ্যা বেড়েই চলেছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পরবর্তীকালে উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক ধর্মান্তরিত হওয়া (১৮৪৫) ব্যাপারটি হিন্দু সমাজে আরও প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। উমেশচন্দ্র জেনারেল অ্যাসেমব্লিজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর পিতা রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবারের 'সরকার' ছিলেন, কলকাতায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এই ধর্মান্তরিত করার ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রকম উত্তেজিত হয়েছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর 'আত্ম-জীবনী'তে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র একাধিক সংখ্যায় ডাফকে অতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। ডাফের 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মিশনস' গ্রন্থটিও হিন্দু সমাজে প্রবল আপত্তি-বোধ জাগিয়েছিল।

আকাশে বাতাসে আজ শারদ
উৎসবের আগমনী
তাই আপনার গৃহকেও
আনন্দোচ্ছল
ও
সঙ্গীতময় করে
তুলতে আমন্ত্রণ জানাই।

এইচ. এম. ভি

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

আলেকজাণ্ডার ডাফ ও বাঙালী সমাজ

অলোক রায়

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দুবার জাহাজডুবির বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ২৭ মে ডাফ কলকাতা এসে পৌঁছুলেন। চব্বিশ বছরের এক যুবক অপরিচিত এই শহরে বাসা বাঁধলেন। স্কটল্যান্ড থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল ভারতবর্ষে একটি খৃষ্টান স্কুল স্থাপনের জন্য। সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সব কটি ধারায় পাঠগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিশেষ আগ্রহ ধর্মতত্ত্বে আর তাই ছাত্রজীবনের শেষে চার্চে যোগ দিলেন। অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস, জানবার ও জানাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডাফ চাইলেন ভারতবর্ষে আসতে। কলকাতায় এসেই এই শহরকে ভালোবাসলেন তিনি, তারপর কখনো কলকাতা ছেড়েছেন আবার ফিরে এসেছেন, শেষবার যখন অসুস্থ হয়ে ফিরে যেতে হলো নিজের দেশে সেখানে বসেও কলকাতাকে ভোলেননি ডাফ। এই শহর এবং এখানকার মানুষদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

স্কটল্যান্ড থেকে ডাফকে খুব স্পষ্ট করেই বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল যে কলকাতায় যেন তিনি স্কুল স্থাপন না করেন, কলকাতার আশেপাশে মফঃস্বলে কোথাও স্কুল করতে হবে। ডাফও এখানে আসার আগে সেই রকমই ভেবেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় এসে ডাফ মন পরিবর্তন করলেন। তাঁর লক্ষ্য খৃষ্টধর্ম প্রচার, কিন্তু সমাজের অশিক্ষিত অন্ত্যজ মানুষের মধ্যে নয়, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই তিনি খৃষ্টধর্ম দান করবেন। এর ফলে খৃষ্টধর্ম কেবল বিশেষ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাবে সমাজের সর্বস্তরে। ডাফের আগে পর্যন্ত খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা কাজ শুরু করেছিলেন সমাজের নীচের তলায়; তাঁরা মনে করেছিলেন উপরের তলা থেকে নীচের তলায় ধর্মান্তরিত করা সহজ। তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত ছিল না, শুধু বাংলাদেশে নয় বোম্বাই ও মাদ্রাজেও তাই মিশনারীরা

শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে মিশন ও স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ডাফ সহজকে ছেড়ে কঠিনকে গ্রহণ করলেন. তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে এদেশে অন্যান্য মিশনারীদের ঘোরতর আপত্তি জেনেও কলকাতাতেই তাঁর স্কুল স্থাপন করলেন। ডাফ দ্রুত সিদ্ধি অর্জন করতে চান নি। তিনি স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে চেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন বাঙ্গালীই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী অনুভব করেছিল। ডাফ যখন কলকাতায় এলেন তার অনেক আগেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই কম। তবে ডাফের কিছু অসুবিধাও ছিল: হিন্দু কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না. তিনি চেয়েছিলেন একই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম প্রচার। কিন্তু অজ্ঞ মূর্খ সুবিধাবাদী কয়েকজনকে খৃষ্টান করায় তাঁর উৎসাহ ছিল না তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আগে দৃষ্টিদান এবং তারপর চক্ষুষ্মানকে নূতন ধর্মের সন্ধান দেওয়া। জোর করে বা ভয় দেখিয়ে তিনি কাউকে ধর্মান্তরিত করতে চাননি। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের উপর তিনি আগে জোর দিলেন. হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে কারণে তিনি শুধু পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবল কুসংস্কার দূর করা নয়: সুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত করা। হিন্দু কলেজ শিক্ষাদানের সমগ্র দায়িত্ব পালন করেনি। তাই ডাফ হিন্দু কলেজের পাশেই এই কলকাতা শহরে নূতন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৩ জুলাই ডাফ কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন. চার্চের নামে নামকরণ হলো জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। কলকাতায় খৃষ্টানী স্কুলের জন্য বাড়ি পাওয়া সহজ ছিল না খৃষ্টানী স্কুলে ছাত্র পাওয়া ছিল তারও কঠিন। সম্ভবত এইসব কারণেই অন্যান্য মিশনারীরা ডাফকে নিরুৎসাহ করতে চেয়েছিলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাফ সহায় পেলেন রামমোহন রায়কে। রামমোহন চিৎপুরে ব্রাহ্মসভার উপাসনাগৃহটি (ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি) ডাফের জন্য ছেড়ে দিলেন পাঁচজন ছাত্রও জোগাড় করে দিলেন। ডাফ ছাত্রদের বাইবেল পড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প: ছাত্রদের ভীতি ও সংস্কার কাটাতে সাহায্য করলেন রামমোহন। এরপর ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা বেড়েই চললো। স্কটল্যান্ড থেকে ডবলু এস ম্যাকে-কে পাঠানো হলো ডাফকে সাহায্য করার জন্য।

কিন্তু শুধু স্কুল স্থাপন করে ডাফ ক্ষান্ত হলেন না। খৃষ্টধর্ম প্রচারও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কলেজ স্কোয়ারে যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে সর্বসাধারণের জন্য বক্তৃতার আয়োজন করলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাও উৎসাহী হয়ে এল বক্তৃতা শুনতে। কলকাতা শহরেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। এরই পরিণাম হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৩২)। তারপর গোপীনাথ নন্দী ও আনন্দচাঁদ মজুমদার ধর্মান্তরিত হলেন। ডাফ যে জন্য কলকাতা এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার চার বছর পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বদেশে ফিরে গেলেন (জুলাই ১৮৩৪)।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই ততোন্ত বেড়ে যাওয়ায় জেনারেল

কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষাব্রতী ডাফকেই বাঙালী মনে রেখেছে। তৃতীয়বার যখন ডাফ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন (১৮৫৬) তখন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লেখেন, 'সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার ডফ সাহেব কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিয়াছেন, আমরা পীড়িত প্রযুক্ত ঐ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই..। ডফ সাহেব মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু মনুষ্য নহেন: তাঁহার কর্মসকল অলৌকিক কেবল পৃথিবীর উপকার করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করিয়া পৃথিবীর চিরস্মরণীয় হইলেন বিশেষত মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান বিষয়ে তিনি যাহা করিলেন পূর্বে ২ রাজারা এবং বর্তমানকালীন ভূপালেরাও এরূপ করিতে পারেন নাই, ডাক্তার ডফ সাহেব ধনী নহেন অথচ যে দেশে যান সেই দেশের ধন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আইসে কিন্তু এই অতুল ধনের কিয়দংশ আত্মসুখে সংযুক্ত করেন নাই কেবল চীরবস্ত্র ধারণ ও দরিদ্র লোকেরদের ন্যায় সামান্য ভোজনেতেই জীবনযাপন করিলেন এবং ভারতবর্ষীয় মনুষ্যগণকে মনুষ্যকরণার্থই প্রায় সকল ধন দিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা বুঝিতে পারিলেন না জন্ম-জন্মান্তরীয় পিতা স্বরূপ ডফ সাহেব তাঁহারদিগের উপকার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' (সম্বাদ ভাস্কর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)। এই ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি সম্ভবত ডাফ ছাড়া আর কোনো বিদেশী মিশনারী বাঙালীর কাছ থেকে পাননি। এমনকি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতেও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে ডাফের সক্রিয় ভূমিকা সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত হয়েছে, 'আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত সোমবার দিবসে শিমলা নিবাসি স্বর্গবাসি আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে সুবিখ্যাত সর্বমান্য শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড ডফ সাহেবের স্থাপিত অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনীবৃন্দের প্রথম বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য অতি উৎকৃষ্ট [এবং] সমারোহ পূর্বক সুনির্বাহ হইয়াছে।.. এতৎ বিষয়ের জন্য আমরা প্রথমতঃ শ্রীযুত ডাক্তার ডফ সাহেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে শ্রীমতী গুণশালিনী বিবিধ বিদ্যানিপুণা উপদেশদায়িনী মিস টগুড, এবং সম্বিদ্বান সুশীল সদুপদেশক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ সেন মহাশয়কে মহানন্দে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু ইঁহাদিগের পরিশ্রম ও শিক্ষাদানের সুপ্রণালী ও সুযত্নে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে সুফল উৎপাদন করিয়াছে, বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্তা পাদ্রি সাহেব যৎকালে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা সকলের মন মোহিত করেন, তৎকালীন স্বীয় মুক্তকণ্ঠেই এবিষয়টি স্বীকার করিয়াছেন।' (সংবাদ প্রভাকর, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫)।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগবে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদকীয় পড়লে। দ্বারকানাথ খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারকে আদৌ প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি, কিন্তু তিনিও ডাফের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ও ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'যদি বল তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি আছে, প্রাচীনকালের ডিমস্থিনিস ও সিসিরোর কথা দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালের বার্ক ও সেরিডান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তিনি কি বক্তৃতাশক্তিতে ডাক্তার ডফের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল? তাঁহার ধর্মানুরাগ কি ডাক্তার ডফের অপেক্ষা প্রবল? কয়জন লোকে ডাক্তার ডফের চরণরেণু লেহন করিতেছেন, আর কয়জন লোকেই বা তাঁহাকে অবতার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার চরণাবনত হইতেছেন?' (সোমপ্রকাশ, ৫ পৌষ ১২৭৫)।

ভারতবর্ষ থেকে ডাফ শেষবারের মতো বিদায় নিলেন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ছাত্রদের কাছে শেষ বিদায় বক্তৃতায় তাঁর অন্তরের কথাটি প্রকাশ পেয়েছে, তিনি বলেছেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি যেখানেই থাকুন, যাহাই করুন সব সময়ে ভারতবর্ষের কথা তাঁর মনে থাকবে, ভারতবর্ষেই পড়ে থাকবে তাঁর হৃদয়, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি কাজ করে যাবেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি থাকবে তাঁর একান্ত শুভেচ্ছা, এবং যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন সমাধিস্তম্ভের উপর তাঁর এই পরিচয়টুকুই লেখা থাকবে,

'By profession a missionary; by his life and labours, the true and constant friend of India'.

ডাফ ভারতবর্ষে এসে কয়জনকে খৃষ্টান করতে পেরেছিলেন সে কথা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ডাফ ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন সে কথা আমরা চিরকাল মনে রাখবো।

বাঁশের বোঝা

অদ্রীশ বর্ধন

নাগিনী-নৃত্য জমেছে নাচঘরে।

সনাতনী নাগিনী-নৃত্য নয়। মাথায় ফণা-তোলা মুকুট, সর্বাঙ্গে সাপের খোলসমার্কা আঁটসাঁট পরিচ্ছদ আর সরীসৃপের লম্বা বেণী দুলিয়ে সর্পিণী-নৃত্যও নয়। এ নৃত্য মার্কিন মুলুক থেকে ধার করা।

নাচঘরের পালিশকরা মেঝের ওপর দেখা যাচ্ছে কেবল জোড়া জোড়া নগ্ন পা। জোরালো সার্চলাইটে উদ্ভাসিত শুধু মেয়েলী পা। এক-একটি পা এক এক রং-এ রাঙানো। সাপের গায়ে যে বিচিত্র বর্ণের বাহার, নগ্ন পাগুলিতেও অবিকল তেমনি বর্ণসমাবেশ। এক-একটি পা যেন এক-একটি হিলহিলে সাপ। জীবন্ত। উন্মত্ত। নৃত্যপর।

রঙীন সার্চলাইট সীমিত কেবল জংঘা পর্যন্ত। ত্রিকোণ বিকিনি থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অন্ধকারে বিলীন। আলো-আঁধারির মধ্যে ছায়া-শরীরের আদলগুলো কেবল চোখে ভাসছে...যেন এক-দঙ্গল মায়াবিনী আঁধার হতে আবির্ভূত হয়েও আঁধারে থাকতে চাইছে...উদ্দাম তাদের চরণ... উদ্দাম তাদের সর্বাঙ্গ... নাচের তালে, নাচের ঘূর্ণিপাকে, নাচের ছন্দে বিস্রস্ত সব কিছুই...

স্নেকটাইল ড্যান্স আধুনিক মার্কিন মুলুকের এক আশ্চর্য আবিষ্কার। উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীরা মারিজুয়ানা সিগারেটের নেশায় যখন পোক্ত হয়ে পড়ে, যখন এল এস ডি'র অবাধ কল্পনায় বল্গাহীন উদ্দামতায় গা ভাসিয়ে দেয়, ঠিক তখন সরীসৃপ নৃত্য ওদের রক্তে যে আদিম-নাচন জাগায়, এক কথায় তা অতুলনীয়।

ঢুলুঢুলু চোখে পিয়ানোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ। টানাটানা চোখে যেন স্বপ্নের কুহেলী ভাসছে। মুগার পাঞ্জাবি আর চুনোটকরা ধুতিতে আজ দেড়শ টাকা দামের ফ্রেঞ্চ সুরভি স্প্রে করে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এ সুরভির মহিমা অনেক। মনকে শুধু

আমেজে ভাসায় না—শিরায় শিরায় কামনা জাগায়। সেক্স-স্টিমুল্যান্ট পার্ফিউম। মদন দেবের মডার্ন শর!

ডায়মণ্ড প্যাটার্নের সুরাপাত্র হাতে আবিল চোখে জোড়া জোড়া রঙীন পায়ের উদ্দামতা দেখছিল ইন্দ্রনাথ। অন্ধকার ঘরে এদিকে-ওদিকে ডিভান-সোফায় বসে আরও অনেকে—যারা পাকা তেলাকুচা ফলের মত ঠোঁটওয়ালা দেখে মনে মনে আবৃত্তি করছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা—'স্তনের বুকে, দুটি পাকা ফল ভরেছে রসে কিংবা ঠুকরিয়ে খাই দুটি ঠোঁট ফলের মত।'

কানফাটানো বাজনা অবশেষে বিপুল ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে ক্লাইম্যাকসে পৌঁছোলো। শেষ হল নৃত্য। দপ করে জ্বলে উঠল আলো। মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়তে চাইল নাচঘর।

নাগিনীদের স্পষ্ট দেখা গেল এবার। সামান্য দু ফালি রঙীন বস্ত্র আবৃত করে রেখেছে প্রতিটি নারীর লজ্জাস্থান—টুপিস বিকিনি যার কেতাদুরস্ত নাম। এছাড়া সারা গায়ে ভেসেলিন জাতীয় তৈলাক্ত ক্রীমের প্রলেপ। সর্পিনীর মত তেল-তেলে হিলহিলে পিচ্ছিল প্রতিটি তনু। স্বেদধারায় আরো মোহময়ী হয়ে উঠেছে লজ্জাহীনা যুবতীর দল। হেলে-দুলে নাচের ছন্দে ওরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজন যুবকের প্রসারিত বাহুর মধ্যে।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হল যে যুবতীটি, আজকের নাচের আসরে তার চাইতে সেরা সুন্দরী বুঝি আর নেই। সারা অংগ যেন দুধে ধোওয়া, মাখনে আবৃত এবং চোখের তারায় যেন দামিনী ঝলকিত।

মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে সোফার ওপর আলগোছে নিজেকে ছেড়েদিল ইন্দ্রনাথ। পাশের তিন্বতী তেপায়ায় হীরক প্যাটার্ন মদিরাপাত্র রাখল। শুধোলো খাটো মৃদুকণ্ঠে :

—'আইভরি, পেয়েছো?'

চিকমিক করে উঠল চোখের পাতায় অভ্রকুচি। শুক্তির বুকে মুক্তো হেসে উঠল যেন। বলল 'শার্লক হোমস ক্লাব'এর মিস আইভরি লাহা—'ওস্তাদ, এরকম শিষ্যা আর দুটি পাবেন না।'

'আসলটা হাতসাফাই করোনি তো?'

'না। এটা নকল।'

'কোথায়?'

'আমার বুকের খাঁজে—বিকিনির ফাঁকে।'

'দুষ্টু!'

দুই চোখে কপট তিরস্কার আনল ইন্দ্রনাথ। দু আঙুলে দিয়ে টেনে নিল যুগল-দাড়িম্বর খাঁজ থেকে ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজটা।

কিছুক্ষণ পর খোলা হাওয়ায় তারার নীচে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। উদ্যোগ-পর্ব সফল হয়েছে।

পকেটে এসে গেছে বাঁশের বোমার কন্ডালী ক্ষেত্রে ঠিকুজী কুষ্টি।

দু'চোখ কপালে তুলে কবিতা বলল—'সেকি ঠাকুরপো, ঐ বোমবাজদের আড্ডায় তুমি একা যাবে?'

কাঁচি টানতে টানতে বলল ইন্দ্রনাথ—'দোহাই তোমার, এই নিয়ে মেয়েমহলে যেন মুখ খুলো না। তাহলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না।'

'অত কাঁচা মেয়ে আমি নই। আইভরির মত দুঁদে না হতে পারি,' মুখ-টিপে বলল কবিতা, 'পেটে কথা থাকে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না ইন্দ্রনাথ। বলল—'সারা পশ্চিমবঙ্গ কাঁপছে বাঁশের বোমার উৎপাতে। থানা উড়ছে, সরকারী অফিস পুড়ছে, ট্রেন উল্টোচ্ছে—ব্যালা-স্টিক এক্সপার্টরা তাজ্জব হয়ে গেছে বাঁশের বোমার প্রলয়ংকর ক্ষমতায়। সরকার এখান থেকে ওখান থেকে কিছু কিছু স্টক উদ্ধার করছে—কিন্তু মূল কারখানার সন্ধান পায়নি—আমদানী সূত্রের ঠিকানা পায় নি। পেয়েছি কেবল আমি—একার চেষ্টায়—আইভরির সহযোগিতায়।'

'বুঝলাম' বলল কবিতা। 'অনেক কোটিপতির রুজিনীতির কারবার বন্ধ হবে বাঁশের বোমার আমদানী বন্ধ হলে—তাও বুঝলাম। কিন্তু একা এতবড় ঝুঁকি—'

'বৌদি, একটা কথা বুঝছো না কেন। যে কোটিপতিরা এত বড় একটা কারবার চালাতে পারে মাদ্রাজ আর বাংলার মধ্যে, তারা পুলিশ মহলেও চর মোতায়েন রাখতে পারে?'

'তা আর আশ্চর্য কি। সিলভার টনিকে সব হয়!'

'সেই জন্যেই পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়ে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাই না বৌদি। আমি মলে তোমায় ডিটেক-টিভ গল্প শোনাবে কে? তোমার ঐ কলমভাঙা লেখক স্বামীদেবতার গল্পের প্লটই বা আসবে কোত্থেকে?'

'বালাই ষাট!' বলল কবিতা।

'ইন্দ্রনাথ!' গর্জন করলাম আমি।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র ততক্ষণে রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

এই পর্যন্ত গেল গৌরচন্দ্রিকা রচনায়। যে-গল্প আজ লিখতে বসেছি তার চাইতে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আজ পর্যন্ত লেখার সুযোগ আমার হয়নি। 'শার্লক হোমস ক্লাব' মামলায় ইন্দ্রনাথ রুদ্র দুর্দান্ত পাবলিসিটি পেয়েছিল সারা দেশজুড়ে। পুরো পুলিশ বাহিনীকে এবং শার্লক হোমস ক্লাবের বাঘা বাঘা পোকা গোয়েন্দাদের নাকের জলে চোখের জলে করবার পর ইন্দ্রনাথের লাভ হয়েছিল দুটি : হাটেবাজারে গল্পের গোয়েন্দাকে নিজে কল্পনা করা আর আইভরি লাহার মত একজন রূপসী বোমাকে সহকারিণী লাভ।

এরপরেই হাতে এল বাঁশের বোমা' কেস।

মাদ্রাজ। নিরাপত্তার খাতিরে বিশেষ অঞ্চলটার নাম গোপন রাখছি। কালী-পূজোর সময়ে এখান থেকেই বহু লক্ষ টাকার আতসবাজী চালান হয় কলকাতার ক্যানিং স্ট্রীটে।

শহরের বাইরে মস্ত মাঠে সার্কাসের ছাউনী পড়েছে। মাদ্রাজী সার্কাসের সুনাম এখন দেশ-বিদেশে। বিশেষ এই সার্কাসটি তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বারোমেসে আড্ডা গেড়েছে মাঠটায়। এখান থেকেই ছোট ছোট ক্যারাভান যায় নানা প্রদেশে। বাংলায় আসে পূজোর মরসুম শুরু হলেই।

সার্কাস প্রাঙ্গণে মুভী ক্যামেরার বিবিধ সরঞ্জাম কাঁধে দারুণ স্মার্ট একজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে কদিন ধরে। মুখে পাইপ, চোখে ধোঁয়া চশমা, আর সর্বাঙ্গে মার্কিনী পরিচ্ছদের বাঁধা। মানুষটি নিজেও একজন ধাঁধা। বাংলা গোয়েন্দাসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য একনজরেই বলে দিতে পারেন লোকটির ধাঁধা-রহস্য। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। পুনরায় রহস্য-মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে ক্যামেরাম্যানের ছদ্মবেশে। সৌখীন ক্যামেরাম্যান। অঙ্গ-ঘিরে অষ্টপ্রহর ভুরভুর করে ফ্রেঞ্চ সুগন্ধি। আশ্চর্য এই খোশবাইয়ের মহিমার বুঝি শেষ নেই। নারী জাতি যেন কস্তুরী মৃগের মত পাগল হয়ে ঘোরে গন্ধবাহকের সন্ধানে। মদনাহত হয় এতটুকু আঘ্রাণেই।

সার্কাস প্রাঙ্গণের সবার কাছেই তাই দু-দিনেই প্রিয় হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। জাল পরিচয়পত্র অনুসারে ওর নাম অবশ্য বিমান ব্যানার্জি— ফিল্ম ডিভিশনের ভ্রাম্যমান ক্যামেরাম্যান। সার্কাসের ওপর ডকুমেন্টারী উঠাচ্ছে ফসেল ফান্দীর জন্যে। তাই—

তাই সর্বত্র ওর অবাধগতি। ফার্ণান্দিজের ট্র্যাভেল ভ্যানে আড্ডা জমে একটু বেশী মধুর। কারণ দুটি। ফার্ণান্দিজের উপপত্নী যোশুয়া। আর একটি মর্কট।

ফার্ণান্দিজ বড় বিপজ্জনক খেলা দেখায় এ সার্কাসে। পশুমহল যেন ওর কথায় ওঠে বসে। এক-একটা মানুষের এমনি অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি দিয়ে তারা যেন পশুপাখীর মনের কথা বুঝতে পারে, নিজেদের কথাও বোঝাতে পারে।

ফার্ণান্দিজ বাঘ-সিংহকে নাচায়, খেলায়, ছোটায়, বসায়। ফার্ণান্দিজ বাঘ-সিংহের মুখে মাথা ঢোকায়, তাদের পিঠে সওয়ার হয়, কান ধরে ডিগবাজী খাও-য়ায়। ফার্ণান্দিজকে দেখলে বেয়াদব শ্বাপদও বশ মানে, কথা শোনে।

এ-হেন ফার্ণান্দিজ আরো দুটি জ্যান্তা প্রাণীকে বশ করেছে। চতুষ্পদ প্রাণী নয়—দ্বিপদ। মর্কট আর যোশুয়া।

যোশুয়ার জন্ম সার্কাসে। দড়ির ওপর হাঁটিতে পোক্ত। এছাড়াও আরও একটা খেলায় সে পোক্ত। পুরুষ নাচানোয়।

শিবপদ শিম্পাঞ্জীটার জন্ম আফ্রিকায়। সার্কাস পার্টি নিয়ে নাইরোবি গিয়েছিল ফার্ণান্দিজ। এক কাফ্রীর কাছ থেকে বিস্তর অর্থমূল্যে সংগ্রহ করে শিম্পাঞ্জীটিকে।

অনুকরণ বিদ্যায় পারঙ্গমতার জন্যেই শিম্পাঞ্জীরা আজ জগদ্বিখ্যাত। তারা মানুষের মত সিগারেট খায়, গাড়ী চালায়, চা-পান করে। কিন্তু ফার্ণান্দিজের অতি প্রিয় এই শাখামৃগটিকে ঈশ্বর আর একটা বাড়তি গুণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন শিবপদ সংসারে। হয়ত, পূর্বজন্মে চিত্রশিল্পী ছিল মর্কট-প্রবর। এ জন্মে সেই শিল্পসৃষ্টির সংস্কার নিয়েই তার মর্কট-জন্ম।

অবিশ্বাস্য! কিন্তু প্রকৃতির আলয়ে এমনি অবিশ্বাস্য অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনা নিত্য ঘটছে। শুনলে ফ্যানটাসটিক মনে হবে, দেখলে চোখ কপালে উঠবে।

ফার্ণান্দিজের শিম্পাঞ্জী অসাধারণ চিত্রশিল্পী। সামনে ব্ল্যাকবোর্ড-খড়ি, কাগজ-পেন্সিল রাখলেই হল। যাকে যে অবস্থায় দেখবে, সেই অবস্থায় তার পোর্ট্রেট এঁকে দেবে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায়। ছবি শেষ হলে মুখের আদল দেখে স্পষ্ট চেনা যাবে ছবি কার, কি অবস্থায়, কি ভাবে মুখের ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছে সেই মুহূর্তে।

ফ্যানটাসটিক এই শিম্পাঞ্জীর আকর্ষণেই ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নিত্য আগমন ঘটতে লাগল ফার্ণান্দিজের ট্রাভেল-ভ্যানে।

সেইসঙ্গে মুভী ক্যামেরায় ছবির পর ছবি উঠতে লাগল যোশুয়ার—বিভিন্ন পোজে।

ইন্দ্রনাথের মতলব বোঝা ভার। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সুদূর তামিলনাড়ুতে তার আবির্ভাব। অথচ বাঁশের বোমার উৎপত্তি-রহস্য নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না। সারা গায়ে দেড়শ টাকা দামের ফরাসী সেন্ট স্টিমুল্যান্ট পারফিউম স্প্রে করা, কারণ অকারণে ফার্ণান্দিজের ট্রাভেল-ভ্যানে আসর জমানো আর ক্যামেরা কাঁধে পশুপাখী থেকে মানুষ বাঁদর পর্যন্ত সব কিছুর পেছনে ঘুরঘুর করা নিয়ে মহাব্যস্ত সে।

কিছুদিন পর আর এক ধাপ এগুলো ইন্দ্রনাথ। ফার্ণান্দিজের অবর্তমানে আবির্ভাব ঘটতে লাগল ট্রাভেল-ভ্যানের মোবাইল সংসারে! এমন কি রাত্রেও! ট্রাভেল-ভ্যান মাৎ হয়ে রইল তার ফরাসী সেন্টের হিপনোটিক খোশবাইতে।

ফার্ণান্দিজ লোকটাকে দেখে মনে হয় না বিপদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় সে সিদ্ধহস্ত। একহারা পাতলা চেহারা। অমায়িক হাসি লেগেই আছে ঠোঁটের কোণে। টকটকে লাল রং আর ধূসরাভ চক্ষু দুটি দেখলে অবশ্য মনে হয় বিড়াল জাতীয় প্রাণীকুলের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য লুকিয়ে আছে তার। হয়ত ঐ চোখ দুটিই দায়ী এই ধারণার জন্যে।

আর যোশুয়া? লাস্যে হাস্যে কটাক্ষে যে নারীরা যুগযুগ ধরে অনর্থ ডেকে এনেছে সংসারে—যোশুয়া সেই জাতের মেয়ে। দেহভরা স্বাস্থ্য তার, দেহভরা ক্ষুধা। ফার্ণান্দিজ তার কাছে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) নারীপটিয়সী বিদ্যা নিয়ে, সারা গায়ে নারীপটিয়সী আতর ছড়িয়ে হাজির হল এ-হেন যোশুয়ার সামনে। পছন্দের দাঁড়িপাল্লায় দুই পুরুষকে চাপিয়ে তুল্যমূল্য বিচার করল যোশুয়া। তারপর...

তারপর ঘটল অঘটনের পর অঘটন। সে কাহিনীর বর্ণনা নাই বা রইল এ-কাহিনীর মধ্যে!

সন্দেহ দেখা দিল ফার্ণান্দিজের মনে।

একদিনে নয়—বহু দিন বহু রাত্রি ধরে তিল তিল করে সন্দেহ দানা বাঁধল ফার্ণান্দিজের ভয়াল চরিত্রে। বাঘ-সিংহ যার হুকুমের বশ, হিংস্র শ্বাপদও যার রক্তচক্ষুর দাস—তার বিবরে হানা দেওয়ার স্পর্ধাও কারো থাকতে পারে—এ যে কল্পনারও অতীত।

সন্দেহের সূত্রপাত অবশ্য ভুরভুরে সেই গন্ধটা থেকে। বহু রাতে ট্রাভেল-ভ্যানে ফিরে ফ্রেঞ্চ পারফিউমের বিশেষ গন্ধটির অস্তিত্ব টের পেয়েছে ফার্ণান্দিজ—পায় নি কেবল গন্ধের মালিককে।

তক্কে তক্কে রইল ফার্ণান্দিজ।

এল অমাবস্যার সেই রাত। রোজকার মত সেদিনও তাঁবুতে প্র্যাকটিস করতে গিয়েছে ফার্ণান্দিজ। ট্রাভেল ভ্যানের ভিতরে নরম বিছানায় আবেশে চোখ বুজে যোশুয়া। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। মার্বেল পাথরের মত সাদা দেহ, নীলাভ আলোয় নীল পাথরের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে নীল পাথরে খোদাই অপরূপ স্ট্যাচু শায়িতা মখমল-কোমল শয্যায়।

অনেক ক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষা করছে যোশুয়া। বহু দিবসের প্রতীক্ষা আজ সফল হতে চলেছে। কথা দিয়েছে বাঙালী ক্যামেরাম্যান, সে আসবে, তারপর......।

কিন্তু আবার ঘটল অঘটন!

মচ-মচ আওয়াজ হল সিঁড়িতে। সশব্দে উন্মুক্ত হল দরজা, বন্ধ হল পরক্ষণে। পদশব্দ স্তব্ধ হল শয্যার পাশে।

তবুও চোখ মেলল না যোশুয়া। লাল ঠোঁটের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি বিছিয়ে রইল প্রতীক্ষায়। ও জানে এরপর কি ঘটবে। শিউরে উঠবে দেহ-বল্লরী! পূর্ণ হবে দীর্ঘ দিনের কামনা...

কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা!

আচম্বিতে বাতাস কেটে নেমে এল লিকলিকে বেতটা।

বাঘ-সিংহ বশ করার তেল চুকচুকে বেত। বহু শ্বাপদ, বহু আপদ টিট হয়েছে যে বেতের জ্বালাময় চুম্বনে—এই সেই বেত।

সশব্দে নেমে এল সেই মূর্তিমান যন্ত্রণা নীলাভ পাথরের মত নিস্পন্দ তন্বী দেহের ওপর।

সপাং করে নরম চামড়ায় কেটে বসে গেল হিলহিলে বস্তুটা। আতীব্র বেদনায় নিমেষে কুঁচকে গিয়ে ছিটকে গেল দিগ্বিজয়ী যোশুয়া।

এর পরের ঘটনা অতীব সংক্ষিপ্ত। এ-রকম একটা রগরগে কাহিনীর ক্লাইম্যাকস যে এত সংক্ষিপ্ত হতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না।

ধূসর চোখে আদিম জিঘাংসা নাচিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল ফার্ণান্দিজ—'বেশ্যা!'

গ্রীক স্ট্যাচুর বুকে বরাবর রক্তরেখা ততক্ষণে ফুটে উঠেছে। সটান দাঁড়িয়ে উঠে নীলাভ নাগকন্যার মতই গর্জে উঠল যোশুয়া—'শাট আপ! আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই। মারলে কেন?'

'বেশ্যা!' বলে আবার গর্জে উঠল ফার্ণান্দিজ। আবার বেত তুলল মাথার ওপর। আবার কঁকিয়ে উঠল বাতাস।

কিন্তু আর্তনাদ করল না যোশুয়া। দুই চোখে সহসা বিচ্ছুরিত হল যেন অগ্নিশিখা। বলল আশ্চর্য শান্তগলায়—'আজকেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। আগে বলো মারলে কেন?'

'বেশ্যা!' তৃতীয়বার যেন বাঘ্নকীর গর্জন শোনা গেল ফার্ণান্দিজের কণ্ঠে। বুকপকেট থেকে খানকয়েক ভাঁজ করা কাগজ টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বিছানায়। হেঁট হয়ে নবকটা কাগজ একে একে যোশুয়া মেলে ধরল বিছানার ওপর।

এবং অবশ হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শিথিল হল শক্ত চোয়াল। কেঁপে উঠল চোখের পাতা।

● একী দেখছে যোশুয়া? ওর ব্যভিচারিণী মনের গুপ্ত কামনা এমনভাবে প্রকাশ করল কোন শয়তান? তিল তিল করে যে লালসার স্বপ্ন দেখে এসেছে সে, বহু অনুকল্পের মধ্যে দিয়ে কে সেই ব্যভিচারের কল্পনাকে এমন নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলল কাগজের বুকে?

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর চোখ পড়ল একেকোণে। রোজকার মত আজ সেখানে নিস্পন্দ দেহে বসে ফার্ণান্দিজের প্রিয় দোসর—ছবি আঁকিয়ে শিম্পাঞ্জী। কিন্তু আজ ওর দুই চোখে ও কিসের আগুন?

ধক-ধক করে যেন চাপা আগুন জ্বলছে শিম্পাঞ্জীর অমানবিক দুই চোখে।

অমানবিক! সত্যিই কি তাই? মানব শিল্পীর মত চিত্র অংকনে যে এত পটু, তাকে অমানবিক বলা যায় কি করে?

তাছাড়া অ-মানবিক ঐ দুইটি চক্ষুর বহ্নিজ্বালার মধ্যে যে বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করছে যোশুয়া, তা যে কেবল মানবীর চোখেই দেখা যায়। এরই নাম তো ঈর্ষার আগুন! কিন্তু...কিন্তু ঈর্ষা তো নারী জাতিরই অঙ্গের ভূষণ?

বিদ্যুৎ ঝলকের মতই চোখের নিমেষে প্রকৃত সত্য ঝলসে উঠল যোশুয়ার বিহ্বল মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

শিম্পাঞ্জীটা পুরুষ নয়—নারী! ফার্নান্দিজকে সে ভালবাসে—ধরা দিতে নারাজ!

কতদিন তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছিল যোশুয়া। বলেছিল 'ও আমার সতীন!'

ধিকি ধিকি ঈর্ষার আগুনের অর্থ পরিষ্কার হল এতক্ষণে!

কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য...ফ্যানটাসটিক...ফানটাসির মতই অলীক!

এতগুলো চিন্তা এক নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল যোশুয়ার মাথার মধ্যে দিয়ে। ঈর্ষাদগ্ধ শিম্পাঞ্জীর পানে তাকিয়ে বলল চিবিয়ে চিবিয়ে—'ও বুঝি তোমার চর?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ও যা এঁকেছে সব মিথ্যে।'

'ও যা দেখে, তাই আঁকে। দেখেছে বলেই এঁকেছে।'

'মিথ্যে... মিথ্যে... মিথ্যে... ফার্নান্দিজ, বিশ্বাস করো, সব মিথ্যে।'

'মিথ্যে তোমার কথা। মেয়েরা জন্ম ইস্তক মিথ্যেবাদী হয়।'

'তোমার শিম্পাঞ্জীও তাই—মেয়ে।'

কথায় হেরে আবার বেত তুলল ফার্নান্দিজ। এবার শঙ্খচিলের মত চীৎকার করে বললে যোশুয়া—'ফার্নান্দিজ, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছো।'

থমকে দাঁড়াল ফার্নান্দিজ- বাঘ-সিংহের খেলোয়াড় ফার্নান্দিজ—একটা কালোছায়া ভেসে গেল পাথর-কঠিন মুখের ওপর দিয়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে যোশুয়া—'তোমার সিক্রেট...তোমার সিক্রেট আমি জানি ফার্নান্দিজ...'

'সিক্রেট!' লক্ষ ভিসুভিয়সের গর্জন শোনা গেল ফার্নান্দিজের কণ্ঠে।

'কৈলাস পাইরোটেকনি ফ্যাক্টরীর বেনামী মালিক আমার সামনে—তা আমি জানি। আমি জানি গভীর রাতে কেন মস্ত বাঁশের প্রয়োজন হয় একটা বাজী তৈরীর কারখানায়। আমি জানি বাঁশের বোমা যায় কোথায়।'

ফার্নান্দিজ চেয়ে ছিল পলকহীন চোখে। মুহূর্তের জন্য সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল মুখ থেকে—পরমুহূর্তে দ্বিগুণ রক্ত ঠেলে এল মুখে। ধীরে ধীরে পাল্টে গেল মুখের চেহারা। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র...ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল শাণিত শ্বদন্ত। বিদ্ঘুটে ভঙ্গিমায় বেঁকে গেল লোমশ ভুরু।

ফার্নান্দিজ নিজেই যেন একটা শ্বাপদ হয়ে গেল। মানবিকতার সব চিহ্ন মুছে গেল ভয়াল মুখশ্রীর থেকে......

ট্র্যাভেল ভ্যানের পাশে জমাট অন্ধকারে নড়ে উঠল একটি মূর্তি...নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কৃষ্ণকায় মার্জারের মতই ক্ষিপ্রবেগে উধাও হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'তারপর কি হল?' উৎকণ্ঠিত স্বর কবিতার। পা নাচাতে নাচাতে সিগার ধরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'তারপর আর কি। বাঘের খোরাক হতে হল বেচারা যোশুয়াকে। পরেরদিন সকালে সার্কাসময় রটে গেল—যোশুয়া বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিল—মারা গিয়েছে অ্যাকসিডেন্টে।

'ইস!'

'কি হল? চোখে জল এসে গেল নাকি?'

'এত নিষ্ঠুর তুমি? মেয়েটার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাতে আটকায় না তোমার?'

'আরে গেল যা! কর্তব্য যে তার চাইতেও নিষ্ঠুর। তাছাড়া আমি কি করে জানবো ফার্নান্দিজ ওকে বাঘের সামনে ফেলে দেব? আমি তো তখন আর্মড ফোর্স নিয়ে কৈলাস পাইরোটেকনি ফ্যাকটরী ঘেরাও করতে ব্যস্ত।'

'অপারেশন সাকসেসফুল?'

'বিলকুল। বাঁশের বোমা এখন ইতিহাসের বস্তু।'

একটু চুপ করে থেকে শুধোলো কবিতা—'ভাঁজ করা কাগজগুলোতে কি আঁকা ছিল ঠাকুরপো? কি এঁকেছিল শিম্পাঞ্জীটা?'

মুচকি হেসে বলল ইন্দ্রনাথ—'বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে ১০৮টি আসন আছে, তার কয়েকটি।'

মুখ লাল হয়ে গেল কবিতার—'একেবারে গোল্লায় গেছো তুমি! শেষকালে যোশুয়ার সঙ্গে—'

'আরে! আরে!' শশব্যস্ত বলল ইন্দ্রনাথ—'ওগুলো সত্যি ছবি নাকি—সব মিথ্যে।'

'মিথ্যে বললেই হল? লম্পট কোথাকার! তুমিই তো বললে শিম্পাঞ্জীটা যা দেখে, তাই আঁকে।'

'তাই তো এঁকেছে, দেখেই এঁকেছে।'

ইয়ার্কি হচ্ছে!

'আঃ, বৌদি, রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। মেয়েরা বড্ড মাথামোটা। আরে বাবা, যোশুয়ার ছবি আর আমার ছবি এক আর্টিস্টের কাছে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম— 'কোনারক - খাজুরাহোর মন্দিরে আদিরসাত্মক মূর্তি দেখে আছ নিশ্চয়। এই দুটি ছবি নিয়ে সেই সব পোজের কয়েকটা পেন্সিল স্কেচ করে দিন। মুখগুলো যেন চেনা যায়। সেই ছবি ধরেছিলাম শিম্পাঞ্জীর সামনে। সে যা দেখেছে, তাই এঁকেছে। এতে অবাক হবার কি আছে?'

হাঁ করে শুনছিল কবিতা। এবার গালে হাত দিয়ে বললে—মাগো, কি উর্বর বুদ্ধি!

সেরা

সুশীল রায়

ভদ্রলোককে শিক্ষা দিতে হবে—সকলে পাকাপাকিভাবে ঠিক করে ফেলল। শিক্ষা না-দিলে চলবেই না, কেন না, এ-জিনিস বাড়তে দিলে কতদূর পর্যন্ত যাবে তার কোনো ঠিক নেই।

সুতরাং অঙ্কুরেই এর বিনাশ চাই।

আমরা বললাম, 'আমরাই অপদার্থ। অঙ্কুরটাও তো গজাতে দিয়েছি আমরাই। এতগুলো ইয়ংম্যান আছি এ-তল্লাটে, আর আমাদেরই নাকের উপর দিয়ে ঐ একজন পরমপ্রৌঢ়, পরম ইয়ে, সে কি না—'

কথায় বাধা দিয়ে টিপ্পনী কাটল সুনীলমাধব, বলল, 'গজিয়ে ফেলল একটা অঙ্কুর? কবে পোঁতা হল বীজ কবে করা হল জলসেচ, সে সব খবরই আমরা রাখলাম না। একেবারে যখন পাড়ার পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বিরাট মহীরূহের একটা ক্ষুদে বংশধর, অমনি আমরা হাতে বংশ নিয়ে হলপ করতে শুরু করলাম—মাথা ভাঙাতে হবে ওর।'

ব্যাপারটা নিয়ে অনেক গুরুতর জল্পনা-কল্পনা চলেছে ক'দিন ধরেই, কিন্তু কিভাবে এর একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যাচ্ছে না।

সুনীলমাধবদের আপত্তি এইখানেই এবং এই জন্যই সে টিপ্পনী কেটে কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু সে নিজেও যে উদ্যোগী হয়ে কোনো ব্যবস্থার প্রস্তাব করছে না—এ কথাটা তার মুখের উপর বলতে ভরসা পাচ্ছে না কেউ।

সুনীল একটু রগ-চটা, এবং একটু স্পষ্টভাষীও বটে। কারোই কোনো মন্তব্য যদি তার মনের মত না হয়, তবে তাকে সে ছেড়ে কথা বলবে না, হয়তো তার মাথাই ভাঙাতে বসবে।

কিন্তু ওরা অবশ্য নিজেদের মাথা ভাঙাতে চায় না, তারা চায় বিনয়কৃষ্ণকে একটু মজা দেখাতে।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে প্রায় ষাট, স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে দিব্য সংসার করছেন। ঐ বুড়ো মানুষটা—তাঁর এই ভিমরতি নিয়েই ওদের এই মাথাব্যথা।

ঐ বিনয়কৃষ্ণ নাকি এ রকম ব্যাপার আরও অনেক করেছেন। তার সব রেকর্ড নাকি আছে হরিপদর শ্যামলের আর শশীর কাছে। কিন্তু এতদিন যা হবার হয়ে গিয়েছে, এবার আর ওঁকে বাড়তে দেওয়া নয়। এবার ওঁকে ঠান্ডা করতে হবে।

'ঠান্ডা?' সুনীলমাধব বলল, 'তোদের কথা শুনে আমার শরীর হিম হয়ে আসছে। যার ওষুধ হচ্ছে লাঠি, তা নিয়ে কেবল কথা কাটাকাটি করলে কাজ আদপে এগোবে না।'

শ্যামল বুঝি বিরক্ত হয়েছে, তিন

গলায় বলে উঠল, 'অত ভারিক্কি লেকচার না-দিয়ে নিজে এগোও না একটু।'

নাস্য নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে, কিন্তু কৌটোটা পকেটে রাখতে-রাখতে বলল, 'এই কথা? তবে এই আমি এগোলাম। সকলে তৈরি হও—আমাকে ফলো করবে।'

সকলে তৈরি হয়ে বসল।

সুনীলমাধব পেশ করল তার প্রস্তাব। সর্বসম্মতিক্রমে তা পাস হয়ে গেল।

পরদিন ডাকা হল মেয়েটিকে।

ঘটনাটি গুরুতর বলে ধরলেই গুরুতর, আবার হেসে উড়িয়ে দিলেও উড়িয়ে দেওয়া চলে।

এই মেয়েটিকে নিয়েই এই হাঙ্গামা। দিন চার-পাঁচ আগে একেবারে এদের দলের মধ্যে এসে বেশ কাঁদো-কাঁদো গলায় মেয়েটি বলেছিল, 'আমাকে বাঁচান।'

ওরা তখন জমাট হয়ে বসে একটা প্ল্যান করছিল। কোথাও বনভোজনে যাওয়া যেতে পারে কিনা—তারই প্ল্যান। তাদের সেই খুশির আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মেয়েটি এল এক খন্ড ঝড়ের মত।

কী ব্যাপার?

মেয়েটি চাপা ও কাঁপা গলায় বলল, 'ঐ বুড়োটা—'

'কোন বুড়োটা?' সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল ওরা।

মেয়েটি নাকি তাঁর নাম ভালোমত জানে না, বলল, 'ঐ যে ওই তিনতলা বাড়িটা। বিজয় না বিনয় কি যেন ওঁর নাম।'

'কী হয়েছে খুলে বলুন।'

সব কথা খুলে বলতে লাগল লাবণ্য। তার নাম লাবণ্য বটে, কিন্তু শরীরে তার লাবণ্য খুব একটা নেই, কিন্তু যা আছে তাও মন্দ না, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য, শরীরটা বেশ ভারিসারি। বয়স পঁচিশও হতে পারে ত্রিশও হতে পারে। আর্থিক অবস্থা যে তেমন সুবিধের নয় তা তার শাড়ির রং দেখেই ধরা যায়।

কিন্তু বিনয়কৃষ্ণর অবস্থা আবার বিপরীত, তবুও তাঁর জামাকাপড়ের রং দেখে ধরাই যায় না যে তাঁর আর্থিক দিক বেশ পুষ্ট। খুব সহজ আর সাধারণভাবে থাকেন তিনি।

কিন্তু কার মনের মধ্যে কী জিনিস লুকিয়ে থাকে তা বলা বড় শক্ত। কার মনে কখন্ কোন্ আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তা বলা বুঝি আরও শক্ত।

বিনয়কৃষ্ণের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে মেয়েটি। বারান্দায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে বসে দেখেন তিনি মেয়েটিকে। মনে মনে হয়তো তারিফ করেন তার স্বাস্থ্যের। মনে-মনে ভাবেন, ওর অবস্থা তো ওর সাজপোশাক দেখেই আন্দাজ করা যায়, দিনে বারকয়েক যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে, হয়তো টিউশনি করে, হয়তো—

বিনয়কৃষ্ণ একটু নড়ে বসেন। ভাবতে থাকেন অন্য কথা। ভাবেন নিজের স্ত্রীর কথা। এত রকমের পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ানো হচ্ছে, এত তদারক-তদ্বির করা হচ্ছে, তবু তার শরীরে স্বাস্থ্যের দেখা নেই। কিসে যে কী হয়, তা ঈশ্বরই জানেন।

সব কথা একে-একে গুছিয়ে বলে যেতে লাগল লাবণ্য। ঐ ভদ্রলোক নাকি তাকে ভীষণ বিরক্ত করছেন। তার চলাফেরা নাকি দায় হয়ে উঠেছে। যখনই রাস্তায় দেখা হবে, তখন তাঁর হাজার প্রশ্ন। 'আর, ইয়ে, যত-সব আজে-বাজে কথা।'

'কি কথা।'

'বিশ্রী রকম কথা। বলতে পারব না।'

ওরা বুঝি আন্দাজ করে নিল সব। শ্যামল আর শশী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। হরিপদর দিকেও একবার তাকাল তারা। চোখে-চোখে ওদের তিনজনের মধ্যে যেন কথা হয়ে গেল অনেক।

শ্যামল আওয়াজ করল, 'হুঁ।'

তারপর বলল, 'আচ্ছা, যান আপনি। আমরা দেখছি। আবার অমন করলে জানাবেন।'

অনেক ভরসা পেয়ে গেল লাবণ্য। অনেকটা নিশ্চিন্তই হল বুঝি সে।

নিজের কথা ভাবতে-ভাবতে সে চলে গেল। ঐ ছেলেরা বোধহয় ভাবছে যে, সে তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তার এই শরীরটাই হয়েছে তার আপদ। তার যোগ্যবয়সী ছেলেরা তাকে করে সমীহ; আর, যারা বয়সে বেশ বেশি, তারা দেখায়—কী দেখায়—? তারা বুঝি দেখায় লালসা।

ওই ছেলেদের মধ্যের কেউ যদি একটু-আধটু এমন-তেমন করত, তাহলে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। কিন্তু তারা তাকে আপনি-আজ্ঞে করতে আরম্ভ করেছে। কী আর বলবে লাবণ্য।

সে যদি একটা সেরা মেয়ে হয়ে উঠতে পারত, তাহলে হয়তো সাড়া জাগাতে পারত একটু। কিন্তু সে যেন সেরা নয়, সে বেসুরো।

দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা ঘরের সামনের বারান্দায় বসে আড্ডা দেয় ছেলেরা। এখানে বসেই এখনো চলছে তাদের বনভোজনের প্ল্যান। হয়তো ইহজীবনে বনভোজন হবে না। কিন্তু প্ল্যান চলতেই থাকবে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার হন্তদন্ত হয়ে তাদের আড্ডাখানায় হাজির হল লাবণ্য।

এতগুলো ইয়ংম্যান একসঙ্গে বসে আড্ডা দেয়, কিন্তু একটুকু বেআড়াপনা নেই। এসব দেখেই সম্ভবত লাবণ্য বেশ সহজেই এদের শরণাপন্ন হতে পারছে।

লাবণ্যকে দেখেই ওরা বলে উঠল, 'কী ব্যাপার?'

ব্যাপার নাকি বিশেষ ভালো না। ওরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ব্যাপারটা।

লাবণ্যর যেন কোনো জড়তা বা সংকোচ নেই। অকপটে সে বলে যেতে লাগল সব কথা। বলতে লাগল, 'আমি আসছি। ঐ-যে আমতলার বাঁকটা ঐখানে দেখি উনি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, দুটো ঘরের ভালো বাসা আছে নাকি তাঁর। কম ভাড়ায় দেবেন। যত বলছি, ঘরের দরকার নেই, তবু—'

সুনীলমাধব শব্দ করে নস্যি টেনে বলল, 'প্রভু, ক্ষমা কর। ক্ষমা কর পাপী-তাপীকে।'

লাবণ্য আপত্তি জানিয়ে উঠল, বলল, 'ক্ষমা? ক্ষমা কেন? অন্যায়ের শাস্তি নেই? তবে, আপনাদের কাছে আসা কেন!'

'খুব ভালো করেছেন। আপনি এসেছেন। আমরাও আছি। আমরাও দেখছি।' বলল সুনীলমাধব।

সুনীলমাধবের মত রগ-চটা না হলেও শশী আর শ্যামল একটু তেজী ধরনের ছেলে। লাবণ্যর কথা শুনে ওরা তেতে উঠল, এবং সেই সঙ্গে সুনীলমাধবের কথা শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে উঠল। সেদিন সুনীল বলেছিল, যার ওষুধ লাঠি তা নিয়ে কথা কাটাকাটি ঠিক না, আজ তার এই ভগবান-ভরসা-সুলভ মন্তব্যে ওরা দুজন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সুনীল, তুমি নাস্য নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে ঈশ্বরকে ডাকো, কিন্তু আমরা এগোচ্ছি, আমাদের পিছু-ডেকো না।'

পূজায় চাই নূতন শাড়ী—তাই
জানাই আমন্ত্রণ
সাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কালেজ স্ট্রীট জং (পূর্ব) কলিকাতা-১ ফোনঃ ৩৪-৪৮৮৩

শশী আর শ্যামল চলে গেল হন হন করে। মেয়েটির কাছ থেকে আর কিছু জানতেও চাইল না, তাকে সঙ্গেও ডাকল না।

শশী-শ্যামলের ওভাবে চলে-যাওয়া দেখে হরিপদ ও সুনীলমাধব লাবণ্যর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর তাকে বলল, 'আপনি আর দাঁড়িয়ে থেকে কী করবেন, আপনি চলে যান। কী করা যায়, আমরা দেখছি।'

লাবণ্য ধীরে-ধীরে চলে গেল। হরিপদ আর সুনীলও বেরিয়ে পড়ল। শশী আর শ্যামল কোথায় গেল হয়তো তা খোঁজ করতেই তারা বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বিনয়কৃষ্ণ তখন গড়গড়া টানছিলেন। মুখের উপর তাঁর পরম প্রশান্তি। জীবনে কোনো অন্যায় করেছেন কিংবা কোনো অন্যায় কখনো করতে পারেন, তাঁর মুখ দেখে তা কখনো ধরা যাবে না। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের কৃতকর্মের অনেক রেকর্ড এদের কাছে আছে ; এবং টাটকা একটা ঘটনার কথাও তারা জেনে এসেছে।

তাঁর সম্মুখে একসঙ্গে দলবেঁধে এদের আগমন দেখে বিনয়কৃষ্ণ একটু সোজা হয়ে বসার ভঙ্গি করে বললেন, 'কি ব্যাপার? ভায়ারা-সব দল বেঁধে যে!'

শ্যামল শশী হরিপদ আর সুনীলমাধব একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'এটা ভদ্রপল্লী।'

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, 'তা তো বটে। তা তো বটেই! তোমরাও সব ভদ্রলোকের সন্তান।'

বিনয়কৃষ্ণ একটু আঁচ করতে পেরেছেন হয়তো, তাঁর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে একটু যেন অস্বাস্তির ভাব আছে, একটু যেন নার্ভাসনেস আছে।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন। বোসো, বোসো, তোমরা বোসো।'

শ্যামল বলল, 'না বসব না। আমরা বসতে আসিনি। আমরা এসেছি একটা খোঁজে।'

'কি খুঁজছ?'

'শুনলাম, আপনার খোঁজে দু-কামরার ভালো বাসা আছে। তাই শুনেই এলাম।'

'আমার খোঁজে?'

'হয়তো ভুল বলেছি। আপনার নিজেরই আছে।'

বিনয়কৃষ্ণ থতমত খাওয়ার মত করে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু, সে খালি হতে তো দেরি আছে অনেক।'

সুনীলমাধব এগিয়ে এসে বিনয়কৃষ্ণের হাত চেপে ধরে বলল, 'বড় বিপদে পড়ে গেছি। লাবণ্যকে আপনি একদিন দিতে চাইলেন আর, আমরা বুঝি আপনার কেউ নই? আপনার পাড়ার ছেলে বুঝি নই আমরা?'

'লা-লা-লাবণ্যকে? কার কথা বলছ তোমরা?'

সত্যিই বার একমাত্র কন্যা তা নিয়ে এমন কথাকাটাকাটি হবার ঠিক না।

বিনয়কৃষ্ণের তোতলামিতে ওদের বেশ মজা লাগল।

শশী বলল, 'উঠে আসুন। আপনার অনেক কাণ্ডের কাহিনী আমরা জানি। আসুন, আপনাকে আজ একটু ঠাণ্ডা করে যাই।'

অট্টহাস্য করে উঠলেন বিনয়কৃষ্ণ। হাসিটা কেবল শব্দ করেই বেজে উঠল, কিন্তু মুখে হাসির আভাস একটুও ফুটল না।

তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছে, এবং এরা এখানে এসেছে সব কথা জেনেশুনেই।

শ্যামল রেগে আগুন হয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, সে বিনয়কৃষ্ণকে একটা চড় মেরে বসল। তার দেখাদেখি অন্যরাও একটু উত্তমমধ্যম দিতে কসুর করল না।

বিনয়কৃষ্ণ-মানুষটি সোজা না। তিনি চীৎকার করে উঠলেন তাঁকে এদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আর্তনাদ করে উঠলেন।

সেই হাহাকার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় ভিড় জমে গেল, পার্ট পার হয়ে সেই ভিড়ের কিছুটা ঢুকে পড়ল ভিতরে।

অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল বাড়ির মেয়েরা।

একটা হুলুস্থুল-কাণ্ড যেন আরম্ভ হয়ে গেল।

ছেলেদের এই ছোট্ট দলটির বেশ সুনাম আছে বেহালার এই ছোট্ট পল্লীতে। পাড়ার লোকেরা এদের এই কাণ্ড দেখে অবাক হল।

ছেলেরা সব বৃত্তান্ত বলার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের আর্তনাদে ও বাড়ির লোকের হাহাকারে তাদের কোনো কথা কেউ শুনতে পেল না।

বিনয়কৃষ্ণের কেবল এক কথা। বাড়ির ভিতরে ঢুকে এই রকম মারধর করা বেআইনী। ঐ কথা বলে তিনি কেবলই শাসাতে লাগলেন।

তারা ভালো ছেলে হতে পারে, তারা পরোপকারী হতে পারে, কিন্তু অন্যায় অন্যায়ই। ছেলেদের এ ধরণের কাজ যে গর্হিত কাজ—দেখতে দেখতে পাড়ার সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল।

কে যে খবর দিল কে জানে দেখতে দেখতে পুলিশ এসে গেল।

আমরা এ ঘটনার কথা লিখতে বসে সুনীল-শ্যামল-হরিপদ-শশীর জন্যে দুঃখ বোধ করছি।

আইন-আদালত হল। তাদের বাঁচাবার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি হল না। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণ অদম্য, তাঁকে নোয়ানো গেল না। তিনি ছেলেদের এই ঔদ্ধত্যের শেষ নাকি না-দেখে ছাড়বেনই না।

বিনয়কৃষ্ণের যে কথা সেই কাজ। আদালতে তিনি জোর লড়ে গেলেন।

ছয় মাস করে জেল হয়ে গেল চারজনের।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর তাদের হয়নি ; এই জন্যে আবার তারা ফিরে এল পল্লীতে—ছয় মাস পরে।

ওরা অনুতপ্ত নয়। কিন্তু একটু আক্রোশ ওদের মনের মধ্যে চাপা আছে। যার জন্যে ওরা একটা ঝুঁকি নিল, তাদের দুঃসময়ে সে একটু এগিয়ে এল না। তারা আশা করেছিল, তাদের বাঁচাবার জন্যে হয়তো সেই একটু চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হল না।

কয়েদ খেটে বেরিয়ে এসে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে যে, একবার ঐ মেয়েটিকে পেলে তারা কড়া কথা না-বললেও তাদের আক্ষেপ তাকে একটু জানাবে।

অথচ তার দেখাই পাওয়া গেল না।

বেহালায় বড় পার্কটি আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন। সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে এটা একটা আদর্শ জায়গা।

ওদের মন ভেঙে গিয়েছে। দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় ওদের আড্ডা আর বসে না। আড্ডাও ভেঙে গিয়েছে। তারা এখন আসে এই পার্কেই। এখানে বসে তারা হাওয়া খায়।

কখনো কোনো বেঞ্চ খালি পেলে তারা বসে পড়ে, খালি না পেলে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জীবনে বুঝি লজ্জা এসে গিয়েছে।

বিনয়কৃষ্ণকে কেউ চিনল না, তাঁকে তারা চিনিয়ে দিতে পারল না—এ আক্ষেপের কথাও মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে হয়।

কিন্তু থাক। কাউকে আর চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব তারা না-নিক। তার চেয়ে এই বেশ। এইভাবে ঘুরে বেড়ানো ; এইভাবে নিজেকে নিয়েই নিজেদের ব্যস্ত রাখা।

আকাশে তারা ফুটে উঠছে...অনেক [illegible] কোনটা ধ্রুবতারা—অকারণেই তারা আকাশে চোখ [illegible]

গল্প করতে-করতে তারা পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শ্যামল। কি যেন ভালো করে দেখার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

স্পষ্ট করে দেখার পর সে চাপা গলায় বলল, 'শশী, ওরা কারা রে?'

মশগুল হয়ে হাসছে আর গল্প করছে ঐ যুগলমূর্তি, কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নেই।

ওরা বেশ ভালো করে দেখল। বিশ্বাস করতে বাধছিল, তবু বিশ্বাস ওদের করতে হল। ওরা দেখল—বৃদ্ধ বিনয়কৃষ্ণ বেশ সৌখিন সাজে সেজেছেন, লাবণ্যর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে চলেছেন, আর, লাবণ্য অনর্গল কথা বলছে আর হাসছে।

অনীশের জন্মদিন

বুদ্ধদেব গুহ

গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল।

অনীশের ঘরের টালির ছাদ ভেদ করে অনেক জায়গায় জল গড়িয়ে পড়েছিল। বাথরুমের বাল্টি, প্লাস্টিকের মগ, রান্নাঘরের ডেকচি সব বিভিন্ন জায়গায় পাততে হয়েছিল মেঝেতে মাঝ রাতে উঠে।

শুধু ওর চৌপাই এবং বিছানাটা শুকনো ছিল। তবে সে জন্যে চৌপাই-টাকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে ঘরের মধ্যে চার-পাশে ঘুরপাক খেতে হয়েছিল।

এতসব ঝামেলা-ঝক্কি পুইয়ে ও যখন বাইরের গাছ-গাছালি, বাথরুমের টিনের চালে এবং মিষ্টি আওয়াজে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন রাত প্রায় দুটো।

চতুর্দিক থেকে পুলকভরা পাখির ডাক শুনতে শুনতে বর্ষা-ভোরের ঠাণ্ডা মিষ্টি আমেজে চাদর গায়ে-দিয়ে-শোওয়া অনীশ যখন চোখ মেলল, তখন ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আজ ওর জন্মদিন।

বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে চাদর-গায়ে দিয়ে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল অনীশ। হাওয়া নেই কোনো—কিন্তু নানারকম গাছ-গাছালি, লতাপাতা পাখ-পাখালির নরম গা থেকে একটা সোঁদা সোঁদা বৃষ্টিভেজা বর্ষার গন্ধ উঠছিল। নানারকম পাতা, ফুল, ঘুঘুর বুকের খসে-পড়া পালক সব পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে এদিকে ওদিকে।

অনীশ চাদরটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে নিজের মনে বলল, আজ আমার জন্মদিন। হঠাৎ, সম্পূর্ণ বিনা কারণে নির্জনবাসের একাকী—অনীশের এই সকালে, এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় ভাল লাগতে লাগল।

জন্মদিন ব্যাপারটা চিরদিনই ওর কাছে একান্ত নিরুত্তাপের ছিল। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে জন্মদিন ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণতঃ কোনো সমারোহ হয় না। অন্ততঃ ওদের বাড়িতে হতো না। বছর বছর জন্মদিনের ভোরে ও একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াত। নিজের মুখ সেদিন সকালের আলোয় নতুন করে দেখত। কিন্তু প্রতি জন্মদিনে ওর ভীষণ খারাপ লাগত। মনে হত, একটা পাতা ঝরে গেল, একটা ফুল ঝরে গেল সাজানো তোড়া থেকে।

প্রতি জন্মদিনে বেলা বাড়লে অনীশ বইয়ের দোকানে গিয়ে একটা বই কিনে তাতে লিখত, 'আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম। ইতি—অনীশ।'

যৌবনে পা দিয়ে প্রথম ও জানতে পেরেছিল যে জন্মদিন ব্যাপারটা, যে জন্মায় তার কাছে ততটা না হলেও, যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কাছে তা স্মরণীয় একটা দিন। ও ওর জীবনে জন্মদিনের প্রথম উপহার পেয়েছিল মুনমুনের কাছ থেকে। এক শ্রাবণের বিকেলে বৃষ্টিভেজা গড়ের মাঠে মুনমুন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। একটা হালকা গোলাপী এবং খুব হালকা নীলের কাজ করা টাই এবং এ কাজের এক জোড়া মোজা নিয়ে। উপহারের উপর মুনমুনের হাতের ভালোবাসার গন্ধ লেগেছিল, ওর বুকের সমস্ত তরুণ নিষ্কলুষ আন্তরিক উত্তাপ সে উপহারে ... ... । এ পর্যন্ত আর কোনোদিন, আর কোনো উপহারে এত খুশী হয়নি অনীশ।

অনীশ তার আদরের মুনমুনের সঙ্গে একদিন ঘর বেঁধেছিল। সেই বাঁধাঘর অনেক বছরের জলে-রোদে কালবোশেখীর ঝড়ে বড় একঘেয়ে, বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন হয়ে গেছিল। আজ মুনমুন ইচ্ছা করলেও আর তেমন করে অনীশকে কোনো উপহার দিতে পারবে না। তা ছাড়া, বোধহয় মুনমুনের সেই ইচ্ছাটাও আজ মরে গেছে।

অনীশের জীবনের খুশীর, ভালো লাগার গ্রাফগুলো চূড়োতে পৌঁছেছিল যৌবনের প্রথম ... প্রথর প্রদোষে। কিন্তু তারপর থেকেই সব উষ্ণতা, সব সুখ, সব আনন্দ নিম্নমুখী ঢাল বেয়ে জোরে নামতে থেকেছে।

আজ অনীশ মধ্য যৌবনের সমতল উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আর কেউ নেই। এই পাখিরা ছাড়া এই ভোরের আশ্চর্য আবেশ ছাড়া, চতুর্দিকের ঘন গহন বন ছাড়া, ওকে আনন্দিত করে বা ওকে নিয়ে আনন্দিত হয় এমন কেউই আর অবশিষ্ট নেই।

তার প্রতি অনেকেরই ব্যবহার দেখে অনীশের মনে মাঝে মাঝেই সন্দেহ জাগত সে ও আদপে জন্মেছিল কিনা। ওর মনে হত ও বোধহয় ভেসে এসেছিল। যে ভেসে আসে, তার কাছে পৃথিবীর কোনো সম্পর্কই কোনো শিকড় রাখে না। জন্মসূত্রে যে-সব আত্মীয়তা ও পেয়েছিল সে সব সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও, ব্যবহারের গুণে সে সব সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠা করেছিল তাতেও বুঝি কোনো শিকড় ছিলো না। তার মনকে সে সর্বতোভাবে অন্য অনেক মনে ওতপ্রোতভাবে, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াতে চাইলেও কোনো মনেই তার সত্তা প্রোথিত থাকেনি। জোরে হাওয়া উঠলেই স্বার্থের ঢেউ লাগলেই, তাদের নিজেদের সুখ, নিজেদের সাধ, নিজেদের ঘরের সঙ্গে কোনো রকম সংঘাত উপস্থিত হলেই তারা সজোরে তার কাছ থেকে সরে গেছে। ফলে অনীশের কেবলি মনে হয়েছে যে ও সত্যিই কোনো ভাসমান অনাদরের উদ্ভিদ, এ পৃথিবীতে ওর সত্যিই কোনো শিকড় নেই—নেই অপত্য স্নেহের উষ্ণ আশ্রয়, নেই প্রেমেরও পরম পেলব মাটিতে।

তাই একা থাকলেই আজকাল বড় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে ওর। ওর নিজের জন্যে একা একা স্বার্থপরের মত ও কখনও কোনোদিন বাঁচতে চায়নি। কেউই হয়ত চায় না। কিংবা কে জানে হয়ত একদল লোক থাকে, সব সময়ই ছিল যারা শুধু নিজেদের জন্যেই, নিজেদের সুখ ও স্বার্থের চরিতার্থতার জন্যেই এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, বাঁচতে চায়। অনীশ যেহেতু তেমনভাবে বাঁচতে চায়নি এবং যেহেতু আজ অনীশের জীবন সম্বন্ধে কারোরই বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—যেহেতু তার নিজের জন্যেই তাকে এ পৃথিবীতে একজন লোকও চায় নি অনীশের কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

অনীশ এমন কোনো বিরাট প্রতিভাবান কেউ নয় যে সে মরে গেলে ময়দানে তার স্ট্যাচু হবে। অনীশের এমন কোনো জাগতিক বা অজাগতিক বিরাট কর্ম ও কর্তব্য নেই করার যে তাকে যে-কোনো ভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবে। তার মত একজন নির্গুণ, সাধারণ সস্তা লোকের বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াতে কারোরই কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় তার জন্যে চোখের জল ফেলার মত একজনও লোক যে নেই তা অনীশ জানে। জানে যে তাকে কেউই মিস করবে না তার নিজের জন্যে, অন্য অনেকের স্বার্থপূরণ করা ছাড়া, নিজের জন্যে কিছুই না পেয়ে, শুধু অন্য অনেক স্বার্থপর লোকেদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে বেঁচে থাকবার কোনো মানে যে নেই, এ কথা অনীশের বার বার মনে হয়।

অনীশ জানে না কেন আজকাল অনীশের কেবলি মরে যেতে ইচ্ছা করে।

কতবার সে কুয়োর সামনে একা একা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে স্থির হয়ে দাঁড়ায়—কতবার বন্দুকের নল কপালে ঠেকিয়ে কি ভাবে ঘোড়া টানবে তা ভাবে।

এই সকালে অনীশ এক প্রাপ্তিহীন জীবন ও বিফল ব্যর্থতা ভরা শীতল মৃত্যুর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবে, আজ ও কি করবে, কি ওর করা উচিত।

কিন্তু জীবন, জীবনের নিরন্তর, প্রবহমান স্রোত কারোর জন্যেই থেমে থাকে না। অনীশের জন্যে ত নয়ই। তাই অনীশকেও উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্রোতে ভাসতে হয়, যতদিন না নিজের চেষ্টায় নিজেকে না ও অকালে থামায়।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল অনীশ। আজ ওদের যেতে হবে চোরীতে। চান্দোয়া-চোরী। সেখানে বড় হাট বসবে শনিবারের। ধানের বীজ কিনতে যাবে ও। বর্ষা নেমে গেছে। এখন না লাগালে আর ধান লাগানো যাবে না। সকলেই বলছে, এবার দেরী করে এলেও ভালই বর্ষা হবে।

চা-জলখাবার খেয়ে চানটান করে তৈরী হয়ে নিয়ে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে মানি এবং মানির নাকরেদকে নিয়ে স্টেশনের দিকে চলল অনীশ।

পথ গেছে উঁচু-নীচু, টাঁড় পেরিয়ে। এখানে ওখানে মহুয়া গাছ কুঁচ ফলের গাছ, পিটিসের ঝোপ ঝাড় বুনো নিম। মাথার উপর মেঘলা বিষণ্ণ আকাশ।

ওদের পায়ের শব্দে চমকে উঠে তিতির উড়ে গেল ঝোপ থেকে ডানা ফরফরিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে অনীশের আবার খুব ইচ্ছা হল মরে যেতে। কেবলি মনে হতে লাগল যে জীবনে বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট কারণ না থাকলে শুধু শুধু বেঁচে লাভ কি? তেমন করে ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকই বেঁচে থাকে, শুধু বাঁচবার জন্যে। কিন্তু তা কি বেঁচে থাকা?

অনীশ সব সময় খুব ভাবে, একা থাকলে বেশী ভাবে। ঐ ওরাওঁদের সঙ্গে জংলী টাঁড় পেরোতে পেরোতে ওর মনটা হঠাৎ এক বিধুর বিষাদে ভরে যায়। ওর জন্মদিনে ওর ভীষণ ভীষণ মরবার ইচ্ছা করতে থাকে।

ট্রেনটা এসে গেল। বাঁশের সঙ্গে বাঁধা দাঁড় এবং ঝুড়ি নিয়ে মানিরাও অনীশের সঙ্গে উঠল। অনীশ ওদের নিয়ে জনাকীর্ণ একটা থার্ডক্লাশ কামরায় উঠে জানলার ধারে বসল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ে, জঙ্গলে, উঁচু-নীচু-বয়ে-যাওয়া পাহাড়ী নদীর শরীরে নিঃশব্দে ভরাট বৃষ্টি পড়ছিল। —ট্রেনটা সেই বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চলল হু-হু করে—মহুয়া মিলন পেরিয়ে।

দেখতে দেখতে এসে গেল চোরী।

ট্রেন থেকে নেমে সব যাত্রীরা খোড়া-ধারা করে হাটে গিয়ে পৌছল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্টেশন থেকে কিছু দূরেই হাট লেগেছে। মুরগী ছাগল, টায়ার-সোলের জুতো, কাচের চুড়ি, তাজা সবজী, ছাতু-ভুজিয়া, নাপিত ডাক্তার রিক-সেলুনে সবই আছে, নেই শুধু ধানের বীজ, যার জন্যে অনীশের আসা।

ওদের সঙ্গে নিয়ে সারা হাট তন্ন তন্ন করে খুঁজল অনীশ, কিন্তু কোথাও বীজ পাওয়া গেল না। ভুল খবর নিয়ে এসেছে সে। ভুল জীবনের মত। এখানে।

এদিকে দুপুর প্রখর হয়েছে। মেঘের আড়ালে-থাকা সূর্যের যে তেজ তা এ বালিতে সূর্যের তেজের চেয়েও অনেক বেশী প্রখর। খিদেও পেয়েছে অনীশের। আজ যাই হোক ওর জন্মদিন, কিছু একটা ভাল মন্দ খেতে হয় তা সেলিব্রেট করার জন্যে। সকলেই তা করে, সে জন্যেই।

ওর সঙ্গীদের অনীশ ছিটের জামা আর টায়ার সোলের চটী কিনে দিল। ওরা মহা খুশী। তারপর ছাতু খাওয়াল ওদের পেট পুরে।

এরপর ওরাই বলল তুই কিছু খেলি না বাবু? ছাতু খাবি?

অনীশ হাসল, বলল ছাতু খেয়ে অভ্যেস নেই।

ওরা দূরের একটা হলুদ ফুল ফুল চাদরের সামিয়ানা-টাঙানো দোকান দেখিয়ে বলল, বাবু, ওখানে যা। গোস্ত-রুটি পাবি।

দোকানের সামনে ভীড় ছিল। মাটিতে একটা চাটাই পাতা। তাতে মিঞাভাইরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে খাচ্ছেন। অনীশের ভীড় ভাল লাগে না। একটু দূরে গাছতলায় বসে ও খাওয়ার ফরমাশ করল।

দূরে একটা অশত্থগাছে অনেক কবুতর ওড়াওড়ি করছিল। একবার উড়ছিল, আর একবার বসছিল। সামনে সারি-বাঁধা খাপ্‌রার চালের ঘরগুলি। পেছনের স্টেশনে মালগাড়ি শান্টিং হচ্ছে। তার গদাম্ গদাম্ শব্দ ভেসে আসছিল। কাছেই একটা লাল-রঙা ঘোড়া চরে চরে নতুন-গজিয়ে-ওঠা ঘাস খাচ্ছিল। ঘোড়াটার নাকের সামনে একটা ঘাস ফড়িং ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

অনীশ গাছতলায় হেলান দিয়ে বসে দূরের কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে নয়; দূরের দিগন্তের বাড়ি ঘর, গাছপালা, আকাশ, সব কিছুর দিকে চেয়েছিল। ওর চোখের লেন্স দুটোকে কোনো অদৃশ্য ক্যামেরাম্যান "ইনফিনিটিতে" ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অনীশ দেখছিল, আবার দেখছিলও না। ও জেগে ছিল, আবার ঘুমিয়েও ছিল। ওর সমস্ত সত্তার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব একই সঙ্গে এক অদ্ভুত অলস অঙ্গে বিরাজ করছিল।

এমন সময় একটা লুঙ্গি-পরা বাচ্চা ছেলে এসে বলল, বাবু।

অনীশ দেখল লাল গোলাপফুল আঁকা কলাইকরা রেকাবীতে লাল দগ্‌দগে গোস্ত—এবং সঙ্গে মোটা রুটি—অন্য রেকাবীতে।

ছেলেটি বলল, খানা লায়া।

অনীশ রেকাবীটা হাতে নিল, দগ্‌দগে গোস্তের দিকে একবার চাইল, ঠিক এমনি সময় একটা সাদা দুধেল গরু পেছন থেকে চরতে চরতে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। গরুটার বড় বড় কালো চোখ, গায়ে গরুসুলভ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। গরুটা দুবার কান নাড়ল পট্ পট্ করে। তারপর চরতে চরতে আবার চলে গেল।

অনীশ ছেলেটাকে ডাকল। বলল, ছোগামিয়া।

রেকাবীতে একটু আমড়ার চাটনী ছিল। চাটনীটুকু রুটির উপর ঢেলে নিয়ে অনীশ একটি রুটি রেখে দিল। আর সব নিয়ে যেতে বলল।

রুটিটা খেতে খেতে অনীশ ভাবতে লাগল সে জন্মে থেকে এপর্যন্ত দারুণ কিছু ভালভাবে না কাটলেও এত খারাপ ভাবেও আর কখনও ওর জন্মদিন কাটে নি। তাকে আজ সবাই ত্যাগ করেছে। তার জন্যে পৃথিবীর কারোই আর কিছুমাত্র নরম অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

রুটিটা গলায় আটকে গেল, তারপর জল দিয়ে দিয়ে কোনোক্রমে খেল সেটাকেও। ওর ভিতরের অন্ধ ইমোশনাল লোকটার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছছিল অনীশ। এমনি সময় দেখতে পেল একজন ভদ্রলোক হাটের ভীড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেন দ্রুতপদে ওরই দিকে আসছেন।

ভদ্রলোকের পরনে একটা সবুজ লুঙ্গী মাথায় তালিমারা একটা ছাতা, হাতে হাট-করার লাল-রঙা কাপড়ের থলে।

ভদ্রলোক কাছে এসেই ছাতাধরা হাতের সঙ্গে অন্য হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। তারপর অবাক গলায় বললেন, আপনি? এখানে?

অনীশ চিনতে পারল না ভদ্রলোককে। বলল, আপনাকে..........।

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, ইন্দিরা গান্ধী কি সকলকে চেনেন?

অনীশ বলল, মানে?

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা বিখ্যাত লোক, আপনাদের অনেকে চেনে তা বলে কি আপনারা আপনাদের সব এ্যাডমায়ারারদের চিনতে পারেন? তা কি সম্ভব? আমাকে আপনি চেনেন না। একবার কোলকাতায় একটা ঘরোয়া সাহিত্য-সভায় আপনাকে দেখেছিলাম।

পরক্ষণেই ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে বললেন, ও কি? আপনি এখানে খেলেন না কি? উঠেছেন কোথায়? করে এসেছেন?

অনীশ বলল, আমি খিলাড়িতে আছি। এখানে এসেছিলাম ধানের বীজ কিনতে। কিন্তু পেলাম না। এ ছাড়া ত খাওয়ার কোনো জায়গা নেই দেখলাম।

ভদ্রলোক একদৃষ্টে অনীশের মুখের দিকে চাইলেন।

বললেন, ফিরবেন ত বিকেলের গাড়িতে? গাড়ি সাড়ে তিন ঘন্টা লেট। বীজ যখন পেলেনই না, ত' চলুন আমার সঙ্গে, আমার কোয়ার্টারে।

অনীশ অবাক হল। বলল, কেন বলুন ত?

ভদ্রলোক রাগ রাগ গলায় বললেন কেন আর? খাবেন, বিশ্রাম করবেন; আর কেন? আমরা থাকতে এই রোদের মধ্যে মাঠে-বসে গোস্ত-রুটি খাচ্ছেলেন আপনি? ছিঃ ছিঃ।

অনীশ হাসল, বলল, খাই নি। মানে কখনও খাই নি যে তা নয়; তবে এখানে বিশেষ করে আজ এ পরিবেশে খেতে পারলাম না।

ভদ্রলোক পাশে পাশে হাঁটছিলেন। অনীশের মাথায় ছাতা ধরে। অনীশ যেন সত্যিই ভীষণ কোনো দামী লোক।

হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, আজ মানে? আজ কি কোনো বিশেষ দিন?

অনীশ ভদ্রলোকের কথায় লজ্জাতে হেসে ফেলল, বলল, বিশেষ দিন কিছু নয়। আজ আমার জন্মদিন।

ভদ্রলোক উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, কী দারুণ খবর শোনালেন আপনি। মা শুনে খুব খুশী হবেন।

অনীশ কোনো কথা বলল না।

মানিদের বলে দিয়েছিল স্টেশনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করে। ট্রেন যখন এত লেট তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেতে ওর কোনো আপত্তির কারণ ছিলো না।

রেল লাইন পেরিয়ে ওপাশে ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়ি মানে কোয়ার্টার। দুটি ঘর, মধ্যে একফালি উঠোন, বাইরে একটু বারান্দা। বাড়ির সামনে বেড়া দিয়ে লাউ-কুমড়ো লাগানো হয়েছে।

ভদ্রলোক বসেছিলেন, আমার নাম অনিমেষ। অনিমেষ রায়।

অনিমেষ দরজার কড়া নাড়লেন।

একটি বাচ্চা ছেলে এসে দরজা খুলল।

অনিমেষ ডাকলেন, মা, ও মা, দ্যাখো কাকে এনেছি। এক্ষুণি পায়েস রাঁধো। আজ অনীশবাবুর জন্মদিন।

অনিমেষ অনীশকে নিয়ে একেবারে মহিলার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ভদ্রমহিলার বয়স পঁয়ষট্টি, ছেষট্টি হবে। উনি জানালার পাশের ইজীচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে অনীশের গায়ে মাথায় হাত বোলালেন।

বললেন, ওমা! এ যে দেখছি, ছেলেমানুষ। তুমি বাবা এমন এমন বই লেখ কি করে? অনিমেষ বলল, মা, উনি কিন্তু খাবেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, খাবেন বৈকী! আমাদের কি সৌভাগ্য বল, দেখি। তুই একে পেলি কোথায়?

অনিমেষ বলল, সে সব বলব মা, তুমি আগে পায়েসটা রেঁধে ফেলো।

বলেই অনিমেষ অনীশকে নিয়ে ওর ঘরে এলেন। বললেন, দেখুন। দেখেছেন?

অনীশ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

দেখল, এই গণ্ডগ্রামে বিহারের এই জঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা ছোট জায়গাতে অনিমেষের ঘরের দেওয়ালের তাকে অনীশের লেখা সমস্তকটি বইই পর পর পাশাপাশি সাজানো আছে।

অনীশ অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। মুখ নীচু করে চুপ করে রইল।

অনিমেষ একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

জানালা দিয়ে অনিমেষের মুখে আলো এসে পড়েছিল। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মুখ, কিন্তু মুখের মধ্যে ভারী একটা শান্ত নির্লিপ্ত ভাব। এ ধরনের মুখে কখনও বিরক্তি দেখা যায় না। এঁরা বোধ হয় বিরক্তি কাকে বলে জানেনেই না।

অনিমেষ নিজেই কথা বলল, বলল, সামান্য একটা চাকরী করি কাঠের বড় ঠিকাদারের কাছে। মা ও ছেলের চলে যায় কোনো রকমে।

অনীশ বলল, বিয়ে করেন নি?

অনিমেষ লজ্জা পেল। বলল, না চাপ ছিল খুব, কিন্তু যা মাইনে পাই তাতে দুজনেরই চলে না ভাল করে। কিছু মনে করবেন না, আমার ভাবতেই খারাপ লাগে যে, একজন জলজ্যান্ত সুশ্রী যুবতী মেয়ে আমার জন্যে, আমারই কারণে কোনো দুঃখ পাবে। সত্যিই ভীষণ খারাপ লাগে, বিশ্বাস করুন। কাউকে আদর করে রাখতে না পারলে এই ব্যাপারটা আমার কাছে স্বার্থপরতা বলে মনে হয়।

তারপর অনিমেষ আবার বলল, আপনার লেখাগুলো পড়লে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু জমজমাট মিলনান্তক লেখা লেখেন না কেন?

অনীশ হাসল। বলল, হয়ত লেখকের নিজের জীবনটা মিলনান্তক নয় বলে।

অনিমেষ উজ্জ্বল চোখ তুলে বলল, আপনার কি কোনো গভীর দুঃখ আছে?

অনীশ কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল, এমন মানুষ কি আছে, যার কোনো-না-কোনো দুঃখ নেই? যার নেই, বলতে হবে তার দুঃখবোধই নেই।

অনিমেষ বলল, জানি না, তবে জানেন, আমার না মাঝে মাঝেই খুব মরে যেতে ইচ্ছা করে। যতদিন মা আছেন, ততদিন অবশ্য উপায় নেই। মা না থাকলে কিছু একটা করেও ফেলতে পারি। বলা যায় না। আমি খুব এমোশনাল, সেন্টিমেন্টাল। আপনার লেখা তাইই বোধহয় পড়তে এত ভাল লাগে। আপনার লেখা পড়লেই কিন্তু আমার খুব বাঁচতে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে, জানেন? বিশ্বাস করুন, আপনার লেখা পড়লে মনে হয় দুঃখেরও একটা মহানুভবতা আছে, ঔদার্য আছে, মনে হয় দুঃখ বোধ হয় শুধু ভয় করারই নয়, সমস্ত দুঃখ ছাপিয়েই বোধহয় কোনো গভীর আনন্দ শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের ঘরে জমা হয়। জানি না কেন, সত্যি বলছি, আমার ভীষণভাবে এ কথা মনে হয়। মনে হয় দুঃখী লোকদের সুখটা কেবল দুঃখী লোকরাই বোঝে।

পরক্ষণেই অনিমেষ ছেলেমানুষের মত অনীশের হাঁটু ছুঁয়ে বলল, দেখুন, আপনার কিন্তু অনেকদিন বাঁচতে হবে, আপনার উপরে আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। বিশ্বাস করুন, বানিয়ে বলছি না। আপনার জন্মদিনে আমাকে কথা দিতে হবে।

অনীশ হাসল। বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ।

অনিমেষ বলল, তা যা বলেছেন। আপনার চেয়ে মোটে দু বছরের বড়।

অনীশ আবার হেসে বলল, এত বেশী এমোশনাল হলে শুধু কষ্টই পাবেন। এমোশনাল হওয়া বা এমোশনাল লেখা কোনো গুণের কথা নয়।

অনিমেষ হঠাৎ চুপ করে গেল। বলল, দোষ গুণ জানি না। বড় ভাল লাগে। যতদিন বাঁচি এমনি করে বাঁচতেই ভাল লাগে।

তারপর একটু থেমে বলল, যাকগে এসব কথা। আপনি যে এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন—এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। জন্মদিনে, সকলে কি যেন বলে, কি যেন বলতে হয়—ঐ যে, কি একটা বলে না ইংরিজীতে, ওঃ মনে পড়েছে, বলেই বলল, মেনী মেনী হ্যাপী রিটার্ণস অফ দা ডে।

অনীশ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল।

অনীশ মনে মনে বলছিল, এমন সার্থক জন্মদিন ওর জীবনে আর বুঝি কখনও আসেনি।

অনিমেষের শীর্ণ, অভাবগ্রস্থ, যন্ত্রণারত সুন্দর সুপুরুষ মুখের দিকে তাকিয়ে অনীশ স্বগতোক্তি করল, বেঁচে থাকবেন অনিমেষ, আপনি আপনারা; আমার মত কোনো হতভাগ্য স্বল্পখ্যাত লেখকের জন্যে, বদলে আমরা বেঁচে থাকব আপনাদের জন্যে। একজন সিনসীয়র পাঠকের দেখা পাওয়ার চেয়ে বড় সার্থকতা, বড় পরিপূরণ, একজন স্বল্পখ্যাত লেখকের জীবনে আর কি থাকতে পারে?

অনীশ বলল মনে মনে, আপনি জানেন না কখনও জানবেন না অনিমেষ, আজকে আপনি কী এক আশ্চর্য উপহার দিলেন। আমার সবচেয়ে বেশী মন খারাপের, একা একা জন্মদিনের সমস্ত মেঘলা আকাশের আদিগন্ত দ্বিধাকে আপনি কি দারুণভাবে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

অনীশ আবারও মনে মনে বলল, এমন উপহার আমাকে আর কখনও কেউই দেয়নি, হয়ত দেবেও না কেউ, কোনো জন্মদিনে।

অনিমেষ এক দৃষ্টে অনীশের মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। কথা বলছিলেন না কোনো। এমনভাবে চেয়েছিলেন যেন অনীশ মানুষ নয় কোনো দেবতা-টেবতা!

ঐ ঘরে বসে, হঠাৎ এক কদাচিৎ কৃতজ্ঞতায় অনীশের সমস্ত মন নুয়ে এল। ও ভাবল, ও মনে মনে বলল, ওর কি সৌভাগ্য ও একটু লিখতে পারে, ওর মনের জমানো কথাকে ও সত্যের কাঠামোতে বসিয়ে কল্পনার তুলি বুলিয়ে কেমন আশ্চর্যভাবে কত অচেনা লোকের মনে ছড়িয়ে দিতে পারে।

অনীশের মনে হল, আজ থেকে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণকেই ও ওর জন্মদিন বলে মনে করবে।

নিজের জন্যে না হলেও, অন্যের জন্যে অনিমেষদের জন্যে ওর বাঁচতে হবে।

নামচেবাজারের পথে

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৪ঠা অকটোবর, ১৯৬৬।

রাত্রি, দিনের পর দিন কাটে,—চোখের পলকে কোথা দিয়ে? হিমালয়ের পথ টেনে নিয়ে চলে অলক্ষ্যের পানে। পাহাড়ের চড়াই আসে, উঠে চলি। ঢালু গায়ে উৎরাই নামি। নদনদী ঝরনা আসে। ক্ষণিকের সঙ্গী করে। আবার, পাহাড়ের অন্তরালে গোপনে কোথায় লুকায়।

এই তো ছয়দিন আগে নেপালে কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা সুরু। মাউন্ট এভারেস্টের পাদদেশে তুষার-ঘেরা রাজ্য। শেরপাদের দেশ। তাই দেখতে যাওয়ার অভিপ্রায়। সেই কতোকালের স্বপ্নে দেখা,—সোলুখুম্বু। সেই মেঘলোকের নামচে বাজার, থিয়াং বোচি! নাম শুনেই যেন মন ছুটে চলে।

চলেছি যাত্রী একা। সঙ্গে গাইড গিরমি দোরজি। আর, ত্রি-মূর্তি পোর্টার।

এমন রাজকীয় ব্যবস্থা করে কখনো হিমালয়-পথে ঘুরি নি, ঘোরবার কথা ভাবিও নি। হিমালয়-যাত্রাপথে জিনিসপত্রের প্রয়োজন আমার সামান্য, আয়োজনও তাই চিরদিনই নগণ্য। যা না হলেই নয়, কেবল সেইটুকুই নেওয়া। কোথাও কোনরূপ বাহুল্য মনকে পীড়া দেয়, অযথা বোঝা বাড়ায়। তবুও, এ-যাত্রায় এই বিরাট আয়োজন ঘটনাচক্রেই ঘটে যায়। কি ভাবে? সে-কাহিনী এখানে নয়।

সঙ্গী গিরমি নেপালের নাম করা শেরপা। ফরসা রঙ। গোল মুখ। ছোট চোখ। যেমন পাহাড়ীদের হয়। লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। রোগাও নয়, মোটাও নয়। ছিমছাম গড়ন। ফিটফাট বেশভূষা। চোখে মুখে দেহে সজীব সক্রিয়তা। অথচ স্থির ধীর। সারাক্ষণই কোন কাজে ব্যাপৃত থাকাই তার স্বভাব। ১৯৫৫ সালে ইভান্স-এর সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যায়। ১৯৫৬তে সুইসদের দলে এভারেস্টে। ১৯৬০ সালে আবার ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেও ছিল। পরে আমেরিকানদেরও সঙ্গে যায়, আটাশ হাজার ফুট ওপরের শিবিরে কয়েকবার মালপত্র নিয়ে ওঠে। সেও নাকি তখনকার এক রেকর্ড। আরও অন্য অনেক অভিযানেও যোগ দেয়। ইউরোপ-আমেরিকাতেও ঘুরে আসে। এমন বহুল কীর্তি, অভিজ্ঞতা,—তবুও সরলমতি, বিনম্র শান্ত স্বভাব। রান্নাবান্নাও জানে। অতো বড় নাম-করা শেরপা আমার এই

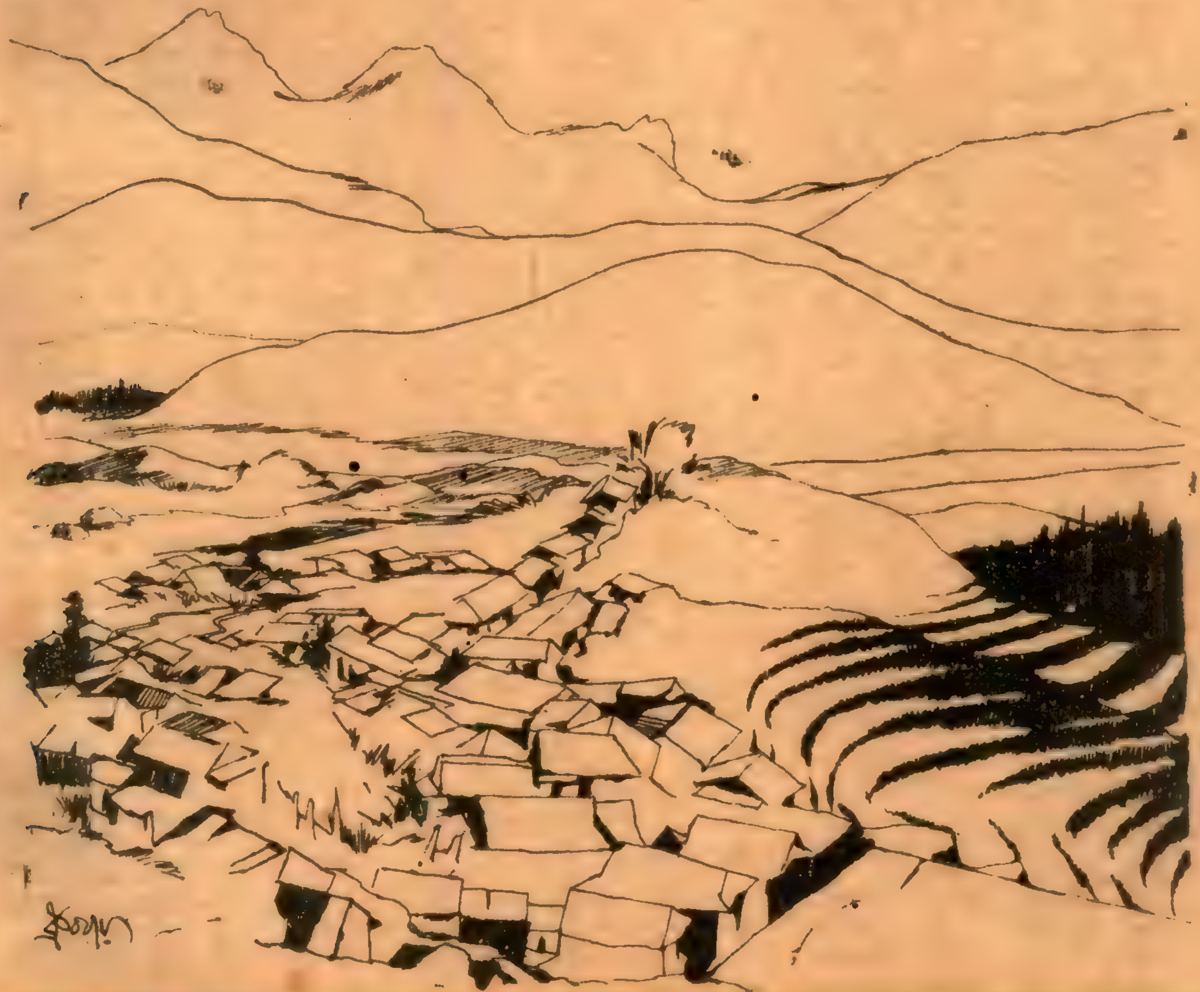

পথে সঙ্গে নেওয়া,—যেন মশা মারতে কামান দাগা। তবুও নিতে হয়,—ডাক্তার ব্যানার্জি'র অনুরোধে। বলেন, গির্‌মি সঙ্গে যাক। কাজ ত দেবেই, আমিও নিশ্চিন্ত থাকব। তা ছাড়া, ঐ নামচে বাজার ছাড়িয়ে শেরপাদের গ্রাম—কুন্ডে,—যেখানে কদিন কাটাবেন,—সেইখানে গির্‌মির ঘরও।

ডাক্তার ব্যানার্জি আমার বন্ধু। তাঁরই আতিথ্যে কাঠমান্ডুতে কদিন কাটাই। তিনি ডাক্তার অর্থে চিকিৎসক নন। উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদ, বটানিস্ট। নেপাল রাজ্যে বটানিক্যাল সার্ভের কাজে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার সেখানে তাঁকে পাঠান। কয়েক বছরই আছেন। আমি কাঠমান্ডু পৌঁছুবার কদিন আগে শেরপাদের ঐ অঞ্চল থেকে তিনি ঘুরে এসেছেন। গির্‌মি তাঁরই সঙ্গে ছিল।

অন্য ভারবাহকদের ব্যবস্থা করে গির্‌মি নিজে। তাদের মধ্যে দুজন শের্‌পা। একজনের নাম আঙ্ দোরজে। বিরাট জোয়ান। গোল মুখ। ঘাড়ে-গর্দানে,—মাংসপেশিতে সারা দেহে যেন ঢেউ-খেলানো। পা দুটোর গোছ—যেন গদার মত। মুখভরা হাসি।

অপর শের্‌পাটি আঙ্ দোরজেরই ভাই। বেঁটে ছোট ছেলে। কিন্তু গাট্টাগোট্টা। তারও গোল মুখভরা হাসি। প্রকাণ্ড মাথা। যেন, ফুটবলের ওপর কটা রেখা টেনে চোখ মুখ ও একটু নাকের ডগা আঁকা। তৃতীয় পোর্টারটি—টামাঙ্ জাতি। মলিন জীর্ণ বেশভূষা। মাল বহা-ই এদের পেশা। শের্‌পারা এই টামাঙ্‌দের একটু নীচু জাতি বলে মনে করে। তাদের সঙ্গে মেলামেশাও কম।

পোর্টারদের ব্যবস্থা শেষ হয়। যাত্রাও সুরু হয়।

কাঠমান্ডুর সেইসব সপ্তাহখানেক আগেকার ঘটনা মনে হয় যেন কাল ঘটেছে। কোথা দিয়ে কেটে গেল পথে পথে ছয়দিন!—এই কথাই আজ ভাবি, বুলুদান্ডার চড়াই-পথে উঠতে।

মাথার উপর আকাশে ঘন কালো মেঘ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। খানিক চড়াই ওঠার পর আবার ঘন জঙ্গল। তারই মধ্যে দিয়ে পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে। পাহাড়ের খাঁজে ঝরনা। তার উপর কাঠের পুল। জলধারার আশপাশে কালো বড় বড় পাথর। কেমন একটা থমথমে ভাব। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড পাথরের মাথায় এক বিরাট মৌচাক। গরুর গাড়ীর চাকার আকারে ওপর থেকে ঝোলে। ভন্ ভন্ গুঞ্জন তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ওঠে। যেন নাচের ঘুঙুর বাজে। দাঁড়িয়ে মাথা তুলে দেখতে থাকি। গির্‌মি দূরে থেকে দেখতে পায়। ব্যস্ত হয়ে ইসারা করে,—তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে। দ্রুত-পদে এসে সাবধান করে,—হাত বাড়িয়ে দেখায়ও,—মৌচাক ঐ একটাই নয়, পাহাড়ের গায়ে অনেক জায়গাতেই ঝুলছে। ইতিমধ্যে কয়েকটা মৌমাছি আমার গায়ে এসেও বসেছে। গির্‌মি উড়িয়ে দেয়। পোর্টাররাও সকলেই খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়। তবুও, ঐ অল্প সময়েই,—মানুষের দেহেও মধুর সন্ধানে কিনা জানি না,—সকলেরই মাথায় ও গায়ে কয়েকটাই মৌমাছি এসে বসে।

আরও চড়াই ওঠা শেষ করে বুলুদান্ডার মাথায় এসে পৌঁছুই। ন হাজার ফুটেরও উপর, তাই গাছ-পালাও বিরল। ঘাসের উপর নানা রঙের ছোট ছোট ফুল,—সাদা, বেগুনি, লাল, নীল। বোল্‌ডার্‌স্-এর আশপাশেও। এদের মধ্যে পরিচিত মুখ দেখি,—প্রিমুলা ও স্যাক্সিফ্রাগা।

পাশ পার হয়ে এলে আরম্ভ হয়, খাড়া উৎরাই। এই পাহাড়ের অপর দিক। আবার কেক'াস ও রোডোডেনড্রনের ঝাড় আসে। তারই মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে খানিকদূর নামতেই হঠাৎ ঘন ফগ্ নিঃশব্দে উড়ে এসে দূরের দৃষ্টি রোধ করে। তাতে ক্ষতি বোধ হয় না, বোধ বোধ করার অবসরও মেলে না। একে উৎরাই, তার উপর পাহাড়ের ঢালু-পথে পিছল মাটি। অতি সাবধানে পা ফেলতে হয়। চলার গতিও আড়ষ্ট হয়। চোখের দৃষ্টি সদাই সতর্ক থাকে, মনও একাগ্র হয়, কোনখানে পা ফেলি, এই বুঝি বা পিছলে পড়ি! পা হড়কায়ও কয়েকবারই। ভাগ্য ভাল, তবু পড়ি না। ফগ্ এসে যেন দুহাত দিয়ে চোখ টিপে ধরে, শুধু দেখতে দেয় পায়েরই তলায়। গির্‌মিরাও কাছে-কাছে চলে। তাদের অস্পষ্ট ছায়ার মত দেহ যেদিকে চলে, আমিও চলি।

এই অস্বচ্ছন্দ গতি সময়ের ও পথের দূরত্বের বোধ হরণ করে। মন আবার জেগে ওঠে, অকস্মাৎ যখন এক সময়ে ফগ্-এর পর্দা ছিঁড়ে দূরের ডাক শোনা যায়। পেঁজা তুলোরাশির মত হাল্কা হাল্কা ফগ্ চারিপাশে উড়ে চলে। পুঞ্জীভূত ফগ্-এর মাঝে মুক্ত বাতায়ন খোলে, ক্রমে সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ দিগন্ত বিস্তৃত হয়। যেন, দূরদিগন্ত ঘন-নীল নয়নের পলক খুলে বিস্ময়ে তাকায়। ফগ্-এর আর চিহ্নমাত্রও কোথাও দেখা যায় না। মনে হয়, স্বপ্ন যেন চকিতে জাগরণে হারায়। অবাক হয়ে দেখি, সুমুখে অপরূপ নূতন রাজ্য। পাহাড়ের আরও নীচে বিস্তীর্ণ মালভূমি। স্নিগ্ধ শ্যামল তরঙ্গিত ক্ষেত। মাঠের পর মাঠ। তারই বুকে ছোট ছোট নদীর সুনীল ধারা। বালুচরের স্বর্ণাভ রেখা। মাঝে মাঝে লোকালয়ের দু'একটা ঘরবাড়ী। দূরে একান্তে লাল ও সবুজ রঙে রঙিন বৌদ্ধ বিহার—মনাস্ট্রি। এসবই যেন পরিচিত ধূলিমলিন জীবন্ত জগতের বাইরে। চারিপাশের পাহাড়ের ফ্রেমে-বাঁধানো ধরণীর-পটে-আঁকা অপূর্ব এক আলেখ্য।

স্তব্ধ হয়ে দেখতেই থাকি। ভাবি, এইমাত্র পিছনে-ফেলে-আসা মৌমাছির আক্রমণ, পথের দুরূহ চড়াই, ভীতি-বহুল পিচ্ছিলতা, ঘন ফগ্-এর পরিব্যাপ্তি,—তারা যেন সেই রূপকথার রাজকন্যার প্রাসাদ-দ্বারের রাক্ষস-প্রহরী। তাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে এখন সুমুখে দেখি, ধরিত্রীর স্বর্ণপালঙ্কে অঘোরে নিদ্রালসা প্রকৃতি মনোরমা।

গির্‌মির মুখে হাসি ফোটে। এগিয়ে আসে। পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখায়। সগর্ব উৎসাহে বলে, চিয়াংগমা!

তার উচ্ছ্বাসের কারণই বটে। এ যে তার স্বদেশে প্রবেশ। তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি স্মরণে আসে :

"Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land"

ভাবি ঠিকই তো! ডঃ ব্যানার্জি'র টাইপ-করে-দেওয়া যাত্রা-সূচিতে লেখা,—চিয়াংগমা প্রকৃত শের্‌পা-দেশের সিংহদ্বার। এর আর এক নাম ভন্ডারা।

কাঠমান্ডু থেকে যাত্রা করার আগে ব্যানার্জি সাগ্রহে বলেন, চলেছেন শেরপা-দের মুলুকে, আসুন, ভাল করে ম্যাপে দেখিয়ে দিই, ওদের দেশ বলতে নেপালের কোন্ অঞ্চলগুলি বোঝায়। সাধারণ ধারণা, শেরপাদের দেশ সোলুখুম্বু। কিন্তু 'সোলুখুম্বু' কোন একটা স্থান-বিশেষের নাম নয়। এক অঞ্চলের নাম সোলু, অপর আর এক অঞ্চল খুম্বু। খুম্বু এভারেস্টের পায়ের কাছে, বরফের পাহাড়ের রাজ্যে। নামচে, থিয়াংবোচি—সেই খুম্বুতে, যেখানে আপনি চলেছেন। আর সোলু হচ্ছে পাহাড়ের আরও নীচের দিকে। আপনার যাবার পথে পড়বে। বলে ম্যাপ পেতে ভালভাবে বুঝিয়ে দেন শেরপাদের বসবাসের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি ও তাদের বিশিষ্টতা।

এখন আমরা প্রবেশ করি শেরপাদের সেই সোলু অঞ্চলেই। এখানকার উচ্চতা মাত্র ৬,৫০০ ফুট। তবে হিমালয়ের অনেকখানি অভ্যন্তরে, তাই শীতের কিছু প্রখরতা আছে।

শেরপা-ভূমিতে প্রথম পদক্ষেপ মনে বিপুল উৎসাহ জাগায়। প্রকৃতির রমণীয় শোভা অন্তরে আনন্দ-তরঙ্গ তোলে। দেখতে দেখতে উৎরাই পথ শেষ হয়। এবার পাহাড়ের গায়ে সোজা সহজ পথ এগিয়ে চলে। ডানদিকে অল্প নীচে বিশাল শ্যামল প্রান্তর। তারই মাঝে নদীর সর্পিল গতি। সূর্যের আলো পড়ে দেখায় যেন রূপা গলে বয়ে চলে। সমতল ক্ষেত্রের বিশাল বিস্তৃতি দেখে ভাবি, কবে হয়ত প্লেন নামবে এই অঞ্চলে।

এগিয়ে চলি মনের আনন্দে। দূরে-দেখা মনাস্ট্রি নিকটে আসে। কিন্তু সেদিকে যাই না। গির্‌মির দিকে তাকাই, কোন্ দিকে চলেছি আমরা? সে জানায়, আরও এগিয়ে গ্রাম, সেইখানে থাকব।

পথের বাঁ পাশের পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খাড়া কালো একটা পাথর, যেন

দুংপ্রাংমের ভগ্নাবশেষ। তারই কাছে এসে পথ ঘুরে যায়। তখন দেখতে পাই, বাঁদিকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে আর এক উপত্যকা, অপর ধার এক পাহাড়ী নদী। সেদিকেও ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ। নদীর ধারে গ্রামের ঘরবাড়ী, সাদা সাদা তিব্বতী চোরটেন—বৌদ্ধ স্তূপ। মনাস্টির নিকটে পৌঁছে ভেবেছিলাম, গ্রাম বুঝি এসে গেছে। এখন দেখি, আরও আধ মাইলের উপর যেতে হবে। হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই, চলার কোন কষ্টও নেই। মনভরা অফুরন্ত উদ্দীপনা।

...পৌঁছে গেলাম বেলা আড়াইটার মধ্যেই। চারিপাশে চাষের জমি। ফসল কাটা হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, ভুট্টা লাগিয়েছিল। আলুর ক্ষেতও আছে। নদী থেকে খানিক উপরে খোলা জায়গায় ক্ষেতের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ী। খালি পড়ে আছে। নীচে একখানা লম্বা ঘর। উপরেও তাই। নিকটে নলে জলের ধারা। সেই বাড়ীতেই গিরমি ওঠার ব্যবস্থা করে। এতদিন যত গ্রাম পাওয়া গেছে, থাকবার ব্যবস্থা করতে গিরমিকে প্রায়ই বেগ পেতে হয়েছে। সেই সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার সহৃদয়তার পরিচয় পাই নি। এখানে এসে দেখি, আপজনের মধ্যে গিরমিরা জমিয়ে বসে, চেনা লোকজন দেখা করতে আসে। হাসি-ঠাট্টা-গল্পের আসর জমে।

একতলার ঘরে গিরমিরা রান্না চড়ায়। দোতলার ঘরে আমার রাত-কাটাবার ব্যবস্থা। কাঠের তক্তা-পাতা মেঝে। পাথর-গাঁথা দেওয়াল। ঘরে ঢোকবার প্রকাণ্ড দরজার ফাঁক, দেওয়ালেও জানলা বসাবার ফাঁকা জায়গা, কিন্তু কোথাও পাল্লা নেই, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। হু হু করে বাতাস ঢোকে। এ-সবে এ-পথে আপত্তি চলে না। মুড়িসুড়ি দিয়ে রাতটা কাটানো। মাথার উপর আচ্ছাদন আছে, এই যথেষ্ট।

শয্যা খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে বসি। পায়ের বুট খুলতে গিয়ে দেখে চক্ষুস্থির! কলকাতা থেকে যাত্রার আগেই নতুন হান্টিংবুট কিনি। কয়েক বছর থেকে এই ধরনের বুটই পাহাড়ে ব্যবহার করছি। ভালই কাজ দেয়। বছর তিন-চার টেকেও। কিন্তু আশ্চর্য! নতুন জুতার এক পাটির গোড়ালির নীচে হিল্-এর রবার খুলে আসছে, যেন মুখ হাঁ করতে চলেছে। চটি ছাড়া আর অন্য জুতাও সঙ্গে নেই। চটি-পায়ে এ-পথে হাঁটা চলেই না। খালি-পায়ে অক্লেশে দোরজে ও টামাং পোর্টার চলেছে বটে, কিন্তু সে-অভ্যাস ত আমার নেই। এখন কি করা যায়, তাই ভাবি। এখুনি এর বিহিত না করলে—এ স্টিচ্ ইন টাইম্ সেভ্স নাইন-এর সতর্কবাণী উপেক্ষা করা হবে। কিন্তু করবই বা কি? রবার-সোলিউশন সঙ্গে নেই। চামড়া বা ক্যানভাস নয় যে সেলাই করবার চেষ্টা করব। অতএব যা হবার হবেই। কাঁটার মত দুশ্চিন্তা মনে খোঁচা দিতে থাকে।

চটি পরে নীচে গিয়ে নলের ধারায় হাত মুখ ধুই। আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখি। দূর-থেকে-দেখা গ্রামের মধ্যের সেই সারি সারি সাদা চোরটেনগুলি এই ঘরের নিকটেই। পথের পাশে। ভক্তদের কপালে বা দেহে যেমন চন্দনের তিলক, বৌদ্ধপ্রধান গ্রামে বা সে-সব অঞ্চলে যাতায়াতের পথে তেমনি এই চোরটেনগুলি ধর্মাচরণের চিহ্ন। তিব্বতে মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথেও এই ধরনের বহু দেখেছি। কোথাও এদের গায়ে বোধিসত্ত্বের বা বুদ্ধদেবের মূর্তি আঁকা, কোথাও বা ওঁ মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্রাদি লেখা। সবুজ, গেরুয়া, লাল, নানা বর্ণে রাঙানও। এগুলি বৌদ্ধ স্তূপেরই মতন। ছোট বড় নানান আকারের। মৃত

ব্যক্তিদের আত্মার উদ্দেশে স্থাপিত, অথবা ধর্মস্মারক স্বরূপ।

চোরটেনগুলির নিকটে দুচারজন গ্রামবাসীকেও ঘোরাফেরা করতে দেখি। তিব্বতী ধরনের ঝলঝলে পোশাক পরিচ্ছদ। আমার দিকে হাসিমুখে সকৌতুক দৃষ্টি ফেলে। হাবভাবে বুঝতে পারি, গিরমির কাছে আগেই খবর পেয়েছে, আমরা নামচে চলেছি। একজন কাছে এগিয়ে আসে, তাদেরই ভাষায় বলে হাতের ইসারা করে দেখায়ও, তাতে বুঝতে পারি,—নীচে নদীর উপত্যকার অপর পারে ঐ যে পূবদিকে আকাশ-জোড়া বিরাট পাহাড়—ঘননীল বরণ দেখায়,—ঐ পাহাড় এবার ডিঙোতে হবে। ওরই মাথায় লমজুরা পাস্—প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। হাতের দুটো আঙুল তুলে বোঝাতে চায়,—এখন দুদিন লাগবে ঐ পাহাড় পার হতে! পথের দূরত্ব ও গুরুত্ব দেখিয়ে ভয় দেখানো নয়, উৎসাহ দিয়ে হাল্কা করা। আমিও হেসে ঘাড় নাড়ি, মাথা তুলে দেখতে থাকি, সুদূরের সেই গাঢ় নীল বিশাল আকার যেন প্রহেলিকাচ্ছন্ন মায়াময় এক মেঘরাজ্য।

ফিরে চলি গিরমিদের রন্ধনশালার দিকে। দূর থেকেই বোঝা যায়, খড়ে আগুন জ্বেলেছে। ওখানেও জানলায় পাল্লা নেই, সেই খোলা-পথে এক রাশ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বাইরে আসে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। গোয়ালঘরের জন্যেই ঘরটার ব্যবহার মনে হয়। তারই একধারে কিছু পরিষ্কার করে উনুনে আগুন দিয়েছে। অল্পর পরই এক প্রস্থ চা আমাদের সবারই খাওয়া হয়েছে, এদের এখন আবার দ্বিতীয় পর্ব চলে। ধূমায়মান মগ হাতে আগুনের পাশে বসে সেই পরস্পর কথা বলা ও হাসির উচ্ছ্বাস চলে। আর এক পাশে টামাং পোর্টার তার নিজের আয়োজন করে।

ফিরে আসি উপরের ঘরে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যাগ্রহণ করি।

৫ই অক্টোবর। সকাল ৫-৪৫-এ আবার হাঁটা সুরু। খানিক উৎরাই নামা। গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর ধারে নামা। ছোট পুল। ওপারে গিয়ে পথ বনের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর সোজা উৎরাই নামতেই থাকে। মেঘলা আকাশ। বন বনের মধ্যে সেই অন্ধকার ভাব। জোঁকের উপদ্রবও। আবার পিছল পথে নামায় সন্ত্রস্ত সতর্কতা। উৎরাই শেষ হয়। গিরি-নদীর স্বচ্ছ ধারা মধুর কলতানে স্বাগত জানায়। পাহাড়গুলিও যেন তাকে সম্ভ্রম করে দূরে সরে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গায়ে চাষ ভূমির স্তরে-স্তরে স্নিগ্ধ রূপের ছটা যেন গড়িয়ে নামে। নদী ধরে পথ এগিয়ে চলে। পুলের উপর দিয়ে দুবার পারও হতে হয়। লিখু খোলা নদী ছাড়িয়ে এসে আবার চড়াই আরম্ভ। পথের নিকটে বড় বড় গাছের ঝোপ। ছোট একটা গ্রাম। মাথার উপর কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলে। গিরমি মাথা তুলে দেখে। বলে, বৃষ্টি নামবে এখন। এইখানেই কোথাও বেঁধে খাওয়া দাওয়া সারা যাক। —কিন্তু কোন কুটিরেই আশ্রয় দিতে চায় না। সেই নেপালী বনাম শেরপা মনোবিবাদ। অগত্যা গ্রামের শেষভাগে একটা শূন্য গোয়ালের সামনে ফাঁকা রোয়াক,—তাতেই উঠে বসি। হাত তিন-চার মাত্র লম্বা-চওড়া। মাথার উপর চাটাই-এর আচ্ছাদন। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিও তখনি আরম্ভ হয়। চাটাই ভেদ করে গায়ে জল পড়ে। ছাতা খুলে বসি। কনকনে জলো হাওয়া হাতে মুখে লাগে। হাসি পায়। ভাবি, গ্রামের লোকের যেমন শক্ত আচরণ, আবহাওয়ারও তেমনি যেন হৃদয়হীন ব্যবহার। গ্রামের নাম জেনতো। নামও যেন শ্রীহীন! বেলা ৯-৪০। চারিপাশে বড় বড় গাছের গাঢ় ছায়া, তার উপর কালো মেঘের ঘনঘটা; সকালেই যেন সন্ধ্যার ছায়া নামায়। চুপ করে ছাতা-মাথায় পা গুটিয়ে বসে থাকি। ভাবি, গিরমিরা

গেল কোথায়? তখনি দেখি, আলাদীনের প্রদীপ-জাত সেই আজ্ঞাবহ দৈত্যের মত কোথা থেকে উদিত হয়, হাতে ধূমায়মান মগ্-এ গরম চা, প্লেটে পাঁপর সেঁকা, বিস্কুট। সামনে রেখে দিয়ে তখনি বৃষ্টির মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়। আমারও চোখে বাদল-বরিষণের আনন্দময় রূপ ফুটে ওঠে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই গরম ভাত ও সব্জিও তৈরি। আজ দুপুরে গ্রামের মধ্যে বসা। তাই, কাঠ কিনতে দামও লাগে এক টাকা। খাওয়া-দাওয়া সারা হতেই তখনি আবার রওনা। যদিও, এখন মাত্র ১১টা ৩০। সম্মুখে লামজুরা পাশ-এর চড়াই-এর এক বড় অংশ। সেও এক কারণ, তা ছাড়া, রোয়াকে লম্বা হয়ে বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই। ভরসার মধ্যে, মেঘ না কাটলেও বৃষ্টি আপাততঃ থামে। মেখলা দিনের আবহাওয়ায় বনপথে একটানা চড়াই উঠে চলি। সেই ধীরে ধীরে পা ফেলা। পায়ের ছন্দে গভীর আনন্দে মন মেতে থাকা। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে পৌঁছে যাই শেতা গুম্ফায়। ৮,৫০০ ফুট উঁচুতে। পথের পাশে ফসলের ক্ষেত। পথ ছেড়ে অল্প ভিতরে গেলেই তিব্বতী গুম্ফা। প্রকাণ্ড একটা কুকুর চীৎকার করে ছুটে আসে। গিরমি লামাকে বলে কুকুরটাকে সরিয়ে নেয়। ক্ষেতের আশ-পাশে খান তিন-চার ছড়ানো বাড়ী। তারই একটার দোতলায় ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় মেলে। পৌঁছানো মাত্রই এক পশলা জোর বৃষ্টি নামে। যেন, জলদেবতা করুণাভরেই পথিকের আশ্রয় পাওয়ার অপেক্ষায় শান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থামে। কিন্তু প্রচণ্ড শীত নামে। এতক্ষণ চড়াই-ওঠার পরিশ্রমে শীতবোধ ছিল না, এখন বিশ্রামরত আরামপ্রিয় দেহ সহজেই শীতকাতর হয়। বিলাস-শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। জানি, অঙ্গ সঞ্চালনেই শীত কাটে। বাইরে এখনও দিনের আলো। বাড়ীর বাইরে এসে আশপাশে ঘুরি। নজরে পড়ে, নিকটে এক বাড়ীর আঙিনায় গাছভর্তি শিম্: থোকা থোকা ঝোলে। কাঁচা সবুজ রঙ। গিরমিকে ডাকি। বলি, কিনে নাও কিছু। আজ রান্না হবে,—নতুন সব্জি। সঙ্গে পথের জন্যেও কিছু নিয়ে রেখো। ঘরের বাইরে একটা নেপালী মেয়ে দাঁড়িয়ে। গিরমি তাদের ভাষায় কি যেন বলে,—শিম্ও দেখায়। মেয়েটা চোখ পাকিয়ে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়, মুখে বলে, 'ছুই না'। —আমি হেসে বাংলাতেই বলি, 'ছুই না' কিরে? গাছ-ভর্তি শিম্, আর বলিস 'ছুই না'! দে-না কিছু, টাকা মিলবে।

সে ঘাড় নাড়ে, আবার জানায়, 'ছুই না'। টাকা বার করে দেখাই। তবু ঘাড় বেঁকিয়ে 'শিম নেই' জানিয়ে পিছন ফিরে চলে যায়।

মনে পড়ে যায়, কলকাতায় এক ধনী ব্যবসাদারের মুখে শোনা এক মন্তব্য: জগতে টাকায় হয় না, এমন কোন কিছুই নেই। শুধু কতো দিতে হবে, তাই নিয়েই প্রশ্ন। ভাবি, এ-জগৎ তাদের টাকার জগতের বাইরে।

গিরমি হেসে বলে, আমাদের কোন মতেই দেবে না। বকে লাভ নেই।

কিন্তু সন্ধান করে গিরমি দুধ জোগাড় করে।

ওদিকে সন্ধ্যাও নামে। কনকনে শীতও পড়ে। স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে আরামে রাতও কাটে।

৩ই অকটোবর। ভোরে উঠতে শীতবোধ হয়। তবু শয্যা ছাড়ি। শুধু আয়েশের লোভে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা, এ-পথে মনে স্থানই পায় না।

৬টার সময় পুনরায় যাত্রা। আজই লামজুরা পাশ পার হওয়া। খাড়া চড়াই পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতেই থাকে। সকালে এ-দুর্গম চড়াই-ও কষ্টকর লাগে না। প্রফুল্ল মনে সোৎসাহে চলি। ভোরের সেই শৈত্য ভাব অন্তর্হিত হয়। বহু নীচে দুই পাহাড়ের মাঝে নদীর উপত্যকা। কিন্তু নদীর রেখাও দেখা যায় না, দুই পাহাড়ের তলদেশও নয়। মেঘের মত পুঞ্জীভূত বাষ্প সেখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। মনে হয়, অদৃশ্য কোন্ পাতালপুরীতে কারা বুঝি বা শীতের জোরে বিরাট ধুনি জ্বেলে, আগুন পোহায়। তারই অজস্র ধূম্ররাশি মেলাকারে নিঃশব্দে উঠে আসে উপর দিকে। পথের নিকট পৌঁছে পেঁজা-তুলার মত ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। দূরের পাহাড়-পর্বত ঢাকতে চোখের আড়ালে লুকায়। নিকটের গাছপালা, সম্মুখের পথরেখাও ঝাপসা হয়ে আসে। দেখায় যেন জাপানী শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। অল্প পরেই ফগ্ সরে। আবার সব সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। নতুন ফগ্ আবার আসে। চারিদিক আবার ঘেরে। এ-যেন পাহাড় পথে লুকোচুরির খেলা। কোন অদেখা সাথীর সঙ্গে, কি জানি। মন বিভোর থাকে তারই আনন্দে।

চারিদিকে গাছের জঙ্গল। রডোডেনড্রন ও এসার্সই বেশি। মাঝে মাঝে স্প্রুস ও এবিয়েস। ছোট চারা-গাছও বহু। ফুলের বাহারও ক্রমে দেখা দেয়। পোটেন্টিলাস-এর ছড়াছড়ি। কোথাও বা প্রিমুলাস। ভাবি, এ বুঝি বা দেবাদিদেবের পাদপদ্মে ছড়িয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ ভক্তের দেওয়া অঞ্জলি।

দু'ঘণ্টা চড়াই ওঠার পরও পাশ্-এ পৌঁছুই না। তাতে ভাবনাও থাকে না। সবে আটটা বাজে। কিন্তু গিরমিরা থেমে পড়ে। বলে, এইখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে হবে। খেয়েদেয়ে আবার একটানা চলা। শুনে হাসি পায়, এ-পথের মজা মন্দ নয়, সকালেই দুপুরের খাওয়া!

তখনি আবার মনে পড়ে, এককালে শহরের কর্মজীবনে এও তো অভ্যাস ছিল! সেই সকাল নটার মধ্যেই নাকে-মুখে ভাত গুঁজে সারাদিনের কাজে বেরুনো। কিন্তু সে-জীবন, আর এ-জীবন! সভ্য-জগতের কর্তব্যের বর্মে-বাঁধা মানুষ, আর প্রকৃতির কোলে স্বাধীনমতি স্বচ্ছন্দ বিহারী হিমালয়-পথিক!

কিন্তু তাতো হোল, কোথায় বসা যায় এখানে? পাহাড়ের ঢালু গা কেটে রাস্তা। হাত তিনেক মাত্র চওড়া। সেইটুকুই সমতল। গিরমিরা তারই উপর পাথর সাজিয়ে উনান বানায়। আশপাশে দুর্বকায় রোডোডেনড্রন গাছ—স্টান্টেড অ ডোয়ার্ফ রডোডেনড্রন। শেওলায় সবুজ তার গা। কুঠার দিয়ে তারই কাঠ কেটে আনে। গতরাত্রের বৃষ্টিতে সব ভেজা। জ্বলতে চায় না। কোনরকমে অল্প আগুনে জেলে সেই কাঠ শুকিয়ে নেয়, তবে উনান ধরে।

হাত কয়েক পথ ছেড়ে পাহাড়ের গড়ানো গায়েই ফুলের রাজ্যে প্লাস্টিক সীট পাতি। পা ছড়িয়ে আরামে বসার চেষ্টা করি। পুষ্প শয্যায় মন বসলেও দেহ কেবলি গড়িয়ে আসে। ভারকেন্দ্র কোনপ্রকারে রক্ষা করা মনের একটা খেলা হয়ে ওঠে। শিশু যেন নিদ্রাতুর মায়ের কোলে আশ্রয় খোঁজে, মা কেবলি সরিয়ে দেন। ওদিকে নীচে থেকে ফগ্ ওঠারও বিরতি নেই। মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়, আবার একটু পরেই চারিদিক ঘিরে ফেলে। হাত দশেক দূরে গিরমিদেরও

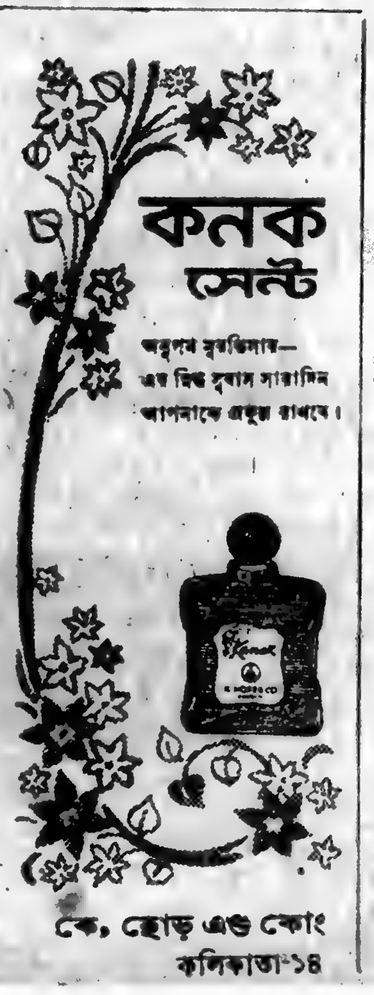

স্পষ্ট দেখা যায় না। যেন, ছায়াছবি নড়ে, হাসে, কথা বলে, আগুনের লাল শিখা জ্বলে।

যথারীতি গরম চা আসে। দশটার মধ্যে আহারের পাটও শেষ হয়, গরম ভাত, সব্জি। সাড়ে দশটায় আবার পথে নামা। প্রতিদিন দুপুরে যাত্রার আগে এক মগ্ জল পান করি। আজও গিয়াম এনে দেয়। মগ্ ধরতেই বুঝতে পারি, আজ ঈষদুষ্ণ করে আনা। সন্তুষ্ট নয়নে তার দিকে তাকাই, মৃদু হাসি। সে কিন্তু নির্বিকার। খালি মগ্ হাতে নিয়ে ফিরে চলে। নিজেদের মধ্যে অমন হাসিখুশি, প্রাণবন্ত; কিন্তু আপনবিচার অনুযায়ী কর্তব্য পালনে সে নির্বাক যন্ত্রচালিত। প্রশংসাদির মর্ম বোঝে না।

পথের দুপাশে রোডোডেনড্রনের বন। কোথাও বা বেটুলাস। এক নাগাড়ে চড়াই ওঠা। টিপটিপে বৃষ্টিও সুরু হয়। গায়ে বর্ষাতি পরি। জলও আটকায়, শীতও কম বোধ হয়। মাথার উপর ছাতাও খুলি। মেঘ ও বৃষ্টির বিন্দু চারিদিক ঝাপসা করে তোলে। তারই মধ্যে পথ চলে কোন্ সময়ে চড়াইও শেষ হয়। পাহাড়ের মাথায় পথ পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে এবার সোজা সমতলে চলে। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। তবু সহজ সরল পথ। এগিয়ে যেতে আরাম বোধ হয়। লামজুরা পাশ্-এ পৌঁছুই ১১টা ৪৫-এ। যেদিকে তাকাই, বড় বড় পাথর। তারই খাঁজে খাঁজে দু'এক জায়গায় সাদা বরফ জমে আছে। হয়ত গতকালের বৃষ্টি এখানে তুষারপাতের রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের ও পাথরের চেহারা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বছরের অনেক সময়েই এ-জায়গা বরফে আচ্ছন্ন থাকে।

গিয়ামরা বিশ্রাম নিতে বসে। আবার সেই পরস্পরে দু'একটা বাক্যালাপের টিপ্পনি, হো-হো-রবে হাসি। আমাকেও অপেক্ষা করতে হয়। ১২টা ১৫-তে আবার হাঁটা। এবার পাহাড়ের অপর দিকে নামা। সুন্দর কনিফেরাস সরলবর্গীয় গাছের বন। সংগে ও এ বয়েস। এক ঘণ্টা একটানা নামার পর গ্রাম আসে। পাহাড়ের এপাশে এখন মেঘহীন সুনীল আকাশ। সোনালী রোদ। সকালের সেই মেঘ্-এর খেলা এখন শুধু অতীত দিনের স্মৃতি। পথও সোজা এগিয়ে যায়। একটা ব্লক ফেন্স্-এর পাশ দিয়ে আসার অল্প পরেই সম্মুখে জুনবেশি ভ্যালির মনোরম দৃশ্য হঠাৎ-ই চোখে পড়ে। কে যেন সাগরের নীল জলে ডুব-সাঁতার কেটে সহসা মাথা তুলে ভেসে ওঠে। দুই পাশে ঘন সবুজ ঢেউখেলানো পাহাড়। মাঝখানে বয়ে আসে জুন-বেশি খোলা,—পাহাড়ী নদীর সুনীল ধারা। নদীর দুই তীরে কোথাও গাঢ় নীল পাইনের বন, কোথাও বা তরঙ্গ-ভঙ্গো মাঠের পর মাঠ, কোমল সবুজ ঘাসে ছাওয়া। দূরে পিছনে মাথা তুলে নুম্বুর তুষার শিখর। ২২,৮২৪ ফুট উঁচু।

জুনবেশি পৌঁছে যাই ২টা ৪৫-এ। ন'হাজার ফুট উঁচু। অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার ফুট নেমে আসা লামজুরা পাশ থেকে। ছোট নদী। তারই কোলে খান-কয়েক পাথরের ঘর। শেরপা-গ্রাম। তাই পরিচ্ছন্নও। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সেই জঙ্গলকীর্ণ কর্দমাক্ত দুর্গন্ধ গ্রামগুলি থেকে কতো পৃথক। গ্রামের মধ্যে দুটো বড় বাড়ী। কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি। সাদা চুনকাম করা দেওয়াল। দুটোই গুম্ফা, বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। একটার চাকচিক্য ও নতুন রঙ দেখে বোঝা যায়, নতুন তৈরি। অপরটি পুরানো। তারই দোতলায় আশ্রয় নেওয়া হয়। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। বৌদ্ধ দেবদেবীর বর্ণাঢ্য চিত্র চারিদিকে। নীচের হল-এ প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি। বেদির উপর ধূপ ও বাতি জ্বলে। শান্ত পবিত্র পরিবেশ।

কিন্তু শান্তিতে থাকা সেও বোধ করি ভাগ্যের বিষয়।

উপরে বিছানা পেতে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করি, হঠাৎ দুই লামার আবির্ভাব হয়। ঝলমলে লাল তিব্বতী পোষাক। জোব্বার সামনের দিকে বুকের নীচে পেটের কাছে ঝোলার মত ফুলে থাকে। একজন জামার বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে বার করে এক পোর্সেলিনের বাটি। পায়ের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য, রঙেরও বৈচিত্র্য। দেখেই চিনতে পারি, চীনদেশের সামগ্রী। কেনবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই। তবুও কৌতূহল হয়, দাম জিজ্ঞাসা করি। বলে, পঞ্চাশ টাকা। বলি, চাই না। তবু সে ছাড়ে না, দরাদরি করতে চায়। কোনরকমে তাদের বিদায় করি।

ভাবি, আপদ গেল। অল্প পরেই আর এক লামার উদয়। তিনিও এসে হাসিমুখে জোব্বার ভিতর হাত পোরেন, ম্যাজিকের মত বার করে আনেন, ছোট্ট একটা কুকুর ছানা। চমৎকার দেখতে। পশমের তৈরি খেলনার মতন। তিব্বতী মাস্টিফ কুকুরের বাচ্চা। বিক্রী করতে চায়। আর দাম জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল থাকে না। মুখে হাসি টেনে জানাই, কোন কিছুই কেনবার আমার শখ নেই। তবু সে পেড়াপীড়ি করে। আরও দু'তিন-জন এসে হাজির হয়। তাদেরও বোধ করি বেসাতি করার জিনিস আছে।

ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। আমার উৎসাহের অভাব দেখে অবশেষে সবাই চলে যায়।

আমিও নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিই।

গিয়াম এসে জানায়, দুধ পাওয়া গেছে। আলুও সঙ্গে কিছু কিনে রাখছে।

আহারান্তে গাঢ় ঘুমে রাত কাটে।

৭ই অক্টোবর। ৬টার মধ্যেই আবার সবাই প্রস্তুত। যাত্রাও সুরু। পথই যেন ঘর। চলাই যেন জীবন। পুল পার হয়ে আবার চড়াই। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ওঠা। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলা। চড়াই-শেষে পাহাড়ের

শারদীয়ায়
লহ অভিনন্দন !!
গণেশ অপেরা
প্রো:- শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ
প্রযোজক—শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩১১ রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬
বনফুল'এর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
হাটে বাজারে
পালারূপ : হারু রায়
সুর : প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভক্তিমূলক
কবি বিদ্যাপতি
সুর : পঞ্চানন মিত্র
আনন্দময়ের
সম্ভ্রম
সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সংযোজক : মধু বড়াল

গা ঘুরে সমতল পথ। পিছন ফিরে তাকাই। দূরে গিরি-শিরে গতকালের পার-হয়ে-আসা সেই নামজুরা পাশ্। এখন স্বপ্নে দেখার মত মনে হয়। সুখ-স্মৃতির বিলাস জোগায়। পথের আর এক বাঁক ঘুরতেই সম্মুখে অদূরে সুন্দর শিবটি এক গিরিচূড়া,—অচেনা দেশের কুহক ভরা।

সোজা পথ বনের মধ্যে এগিয়ে যায়। বাঁ দিকে অল্প নীচে পাহাড়ী নদী। ডানদিকে পাহাড়ের গা মাথার পানে ওঠে। গিরমিরা দেখি মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢোকে। শুকনা কাঠ সংগ্রহ করে। মনে মনে ভাবি, পান্থ-নিবাসে এবার দুপুরের খাওয়ার জন্য বাজে। ঠিক তাই। ৮-৩০তেই থামে। আবার পথের উপর উনান পাতে। আজ আর গতকালের মত পাহাড়ের ঢালু গায়ে বসবার স্থানের অভাব নয়। পাহাড় স্তরে স্তরে উঠে গেছে। তাই ফালি ফালি সমতল ভূমি। এখানেও ছোট ছোট ফুলে ভরা। কিন্তু চারপাশেই ছড়ানো ছোট-বড় পাথর। গিরমি এসে পাথর সরিয়ে ফুলেরই উপর প্লাসটিক বিছায়। আরামে পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিই। হিমালয়-জীবনের এই রীতি,—চলতেও আনন্দ, বসেও তৃপ্তি। চারপাশে পাহাড় ঘেরা। চোখের আড়ালে পাহাড়ী নদীর নেমে-যাওয়ার পদধ্বনি। প্রকৃতির প্রশান্ত নিভৃতি। অন্তরও গভীর শান্তিতে নিমগ্ন থাকে। হঠাৎ কানে ভেসে আসে ঘড়ঘড় এক শব্দ। অপরিচিত নয়, অথচ এই পরিবেশটনে অপ্রত্যাশিত। যেন, নিরালা গ্রামাঞ্চলে নিঝুম নিস্তব্ধ দুপুরে ঘরের ভিতর সহসা ভিমরুল উড়ে এসে বোঁ বোঁ শব্দ তোলে। হিমালয়ের প্রসুপ্ত প্রকৃতির শান্ত আকাশের ভিমরুলই বটে। শব্দ এগিয়ে আসে। গিরমিরা রান্না ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখ তুলে আকাশ পানে তাকায়. এধার ওধার দেখে। ঐ-ঐ-যে! আঙুল তুলে দেখায়—দুই পাহাড়ের ছিদ্র-পথে ছোট এক প্লেন উড়ে আসে। দেখে ভাবি, ধ্যানমগ্ন মহামৌন শুভ্রকেশ হিমালয়ের প্রতি অর্বাচীন এক বালক ছুটে এসে উপহাস করে, অট্টহাসি তোলে, দ্বরিৎগতিতে আবার উধাও হয়। পাহাড়ের অন্তরালে প্লেন অদৃশ্য হলেও শব্দ অনেকক্ষণ ভেসে আসে। তারপর, আবার চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। যোগীন্দ্র তেমনি অবিচলিত ধ্যানরত।

গিরমি চা দিতে এসে বলে, লুকলায় গেল ঐ প্লেন। আমাদেরও ফেরবার কথা ঐ রকমই প্লেনে।

শুনে, কি জানি কেন, মনে উৎসাহ পাই না। অন্তরে কীসের এক বেদনার কাঁটা বেঁধে।

১০টা ৩০। আবার চলা। বনের মধ্যে বড় ঝরনা। পার হয়ে অনেকখানি সোজা পথ। নিস্তব্ধ বনে প্রাণী চলাচলের শব্দ ওঠে। পথের দিকেই এগিয়ে আসে। চমকে উঠি। মানুষের গলা শুনে আশ্বস্ত হই। গ্রামের লোক কাঠ কেটে নিয়ে চলে। এবার এই পাহাড়ের অপর দিকে নামা। সুন্দর উপত্যকায় পৌঁছুই। রিংমো গ্রাম ছাড়িয়ে চলি। শেরপাদের সেই সোলু অঞ্চল দূরে এখনও যাওয়া। চারি পাশে গগনস্পর্শী পাহাড়। কিন্তু এদিকের শেরপাদের বসবাস পাহাড়ের নিম্ন দেশে নদীর উপত্যকায়। নিকটে বড় বড় গাছ-পালার বন জঙ্গল। নদীর দুই তীরে উর্বর জমি। নানা ফসলের চাষ। স্নিগ্ধ সবুজ। শেরপারাও সাধারণ পাহাড়ীদের মতন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। নদীবহুল হিমালয়ও প্রসন্নমুখে আপন অফুরন্ত রাজ-ভান্ডার খুলে দেন। কৃষি-প্রধান এই সোলু-অঞ্চলের শেরপাদেরও তাই চাষ-বাসই প্রধান পেশা। খুম্বুর শেরপাদের থেকে এদের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম জীবন যাপন। তবুও এরাও জাতিতে শেরপা, ধর্মে বৌদ্ধ। তাই উভয় অঞ্চলবাসীদের মধ্যে মেলা-মেশা বিবাহ আদিও চলে। যদিও খুম্বুর শেরপারা নিজেদের উন্নততর শ্রেণীর বলে মনে করে।

একাই এগিয়ে চলি। প্রশস্ত একটাই পথ। ভুল করার আশঙ্কা নেই। গ্রামের আশ-পাশে ক্ষেত। ছোট নদী। ভাঙ্গা পুল। পার হয়ে গ্রামের নিকটে পথের দু তিনটে শাখা। সবগুলিরই উপর লোক চলাচলের পদ চিহ্ন। সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলি নিশ্চিন্ত মনে। হঠাৎ পিছনে ডাক শুনি। গিরমি ছুটে আসে। পথ-নির্বাচন আমার ভুল হয়েছে। ভাবি, ভাগ্যে সময়মত দেখেছিল! না হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে হয়রানি হোত যথেষ্ট। অবশ্য সময় যেতো, বেশি হাঁটার কথা ছেড়েই দিই। ফিরে এসে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলি।

গিরমি জানায়, কাঠমাণ্ডু থেকে এ-অঞ্চলে আসার অন্য আর একটা পথও আছে। ওখালধুংগা হয়ে সোলু-ভ্যালির মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে সেই পথ আসে। এই রিংমো গ্রামের নিকটে সেই পথ এ-রাস্তার সঙ্গে যোগ দেয়। ঐ পথ ধরেও যাত্রীরা কেউ কেউ এসে থাকেন। আবার কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা না করে, যারা জয়নগর হয়ে নামচে আসতে চান, তাদের পথও সেই ওখালধুংগা-খুধিং হয়ে খারিখোলায় চলে যায়, এই পথের সঙ্গে মিশে।

সামনেই আবার চড়াই দেখা দেয়। রিংমোর উপত্যকা ছেড়ে তাকসিন্দুর উপত্যকায় গিয়ে নামতে হবে। মাঝখানে এই পাহাড় প্রাচীর সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে। ভাল কথাই। আবার ওঠো চড়াই। ক্ষণিকের সঙ্গ দিতে আবার সুগা ও এবিয়েস-এর বন বন আসে। বনভূমি পার হয়ে তাকসিন্দু পাস-এও পৌঁছুই। প্রায় ১০,৫০০ ফুট উঁচু। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ময়দান। সমতল পথ। দুপাশে ছোট ছোট পাথর জড় করে স্তূপ. রঙিন কাপড়ের টুকরা বাঁধা। বাতাসে পতাকার মত ওড়ে। কোথাও বা সারি সারি চোর্টেন। দূরে নীল আকাশে সাদা বরফের পাহাড় দিগন্ত উজ্জ্বল করে রাখে।

পাশ অতিক্রম করে অপর দিকে আবার নামা। সেদিকেও গহন বন আসে। রোডোডেনড্রন ও ওক-ই বেশি। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ ঘুরে ঘুরে নামে। বনের মধ্যে পথের উপর এঁটেল মাটি। নামার মুখে কেবলি পা পিছলায়। আস্তে ধীরে সাবধানে পা ফেলি। গিরমিরা পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে পাকদণ্ডী ধরে সহজেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। টাম্বাং পোর্টারের পিঠে প্রকাণ্ড ভারী বোঝা। গাছপালার মাঝ দিয়ে খাড়া পথে নামা তার হয়ত সম্ভব নয়। আমার আগে আগেই চলে। খালি পা তার। তবু কেমন স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে পিছল পথে পা ফেলে। আমি চলি, অস্বাভাবিক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। মনে পড়ে যায়, শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর কথা। রূপনারায়ণের তীরে। একেবারে নদীর ধারে। দিউলটি স্টেশনে ট্রেন থেকে মাইল দেড় দুই হাঁটা পথ। ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গেলে দূরত্ব কম হয়। সময়ে-অসময়ে প্রায়ই

তাঁর কাছে যাই। সেবার গিয়েছি ভরা-বর্ষার মাঝে। স্টেশনের নিকটে এক দোকানে জুতো রেখে খালি পায়ে চলি। মাঠ-ক্ষেত ভরা। বাঁধের রাস্তা ধরে ঘুরে যেতে হয়। বাঁধের উপর এঁটেল মাটি। কেবলি পা হড়কায়। অথচ, পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে গ্রামের লোক এগিয়ে যায়—খালি পায়ে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে। আমি চলি যে-কোন মুহূর্তে পড়বার ভয়ে পায়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে পৌঁছুতে আধ ঘন্টার জায়গায় দেড় ঘন্টা লেগে যায়। কাদা-মাখা পায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন, খুশীও হন, বলেন, এই বর্ষাবাদল, জল-কাদায়ও এসে গেছ, চল, পুকুরে পা ধুয়ে আসবে।

হেসে বলি, আশ্চর্য! গ্রামের লোকরা কিন্তু ঐ কাদাতেও কিরকম অনায়াসে আসছে!

তিনি চাপা-হাসি গম্ভীর মুখ করে তখনি বলেন, ওঃ! তুমি ভাল করে দেখ নি বুঝি? ওদের পায়ে যে বর্ষাকালে খুর গজায়। তুমিও বর্ষাকালে আসা সুরু করলে, তোমারও গজাবে, ভাবনা নেই। —বলে এবার হেসে ওঠেন।

টামাং পোর্টারের পায়ে, কিন্তু নিশ্চয় খুর গজায় নি। সশব্দে বোঝা সমেত পথের উপর পিছলে পড়ে। গিরমিরা নীচে কিছুদূরে তখন বিশ্রাম নিচ্ছে, গাছের ফাঁকে দেখা যায়। তাদের চেঁচিয়ে ডাকি। তখনি উঠে আসে। হাসাহাসি করে। টামাং উঠে দাঁড়ায়। পিঠের বোঝা মাটিতে পড়ে। কেমন এক করুণ মুখে সবার দিকে তাকায়। মুখে তার নানান ভাবের অভিব্যক্তি। পথে-পড়ে-থাকা বোঝার দিকে দেখে আমার পানে চোখ ফিরায়—ভয় ও লজ্জা-মেশানো দৃষ্টি। অপ্রতিভ ভাব। আবার তখনি গিরমিদের দিকে তাকিয়েই তাদের হাসির প্রত্যুত্তরে নিজের মুখে হাসি ফোটাবার প্রয়াস করে। সহসা আঘাত পাওয়ার ব্যথাও মুখে সুস্পষ্ট ছায়া ফেলে। তখন তাকিয়ে দেখি, পাথরের খোঁচা লেগে তার পায়ের আঙুলে রক্ত ঝরে—কাদার উপরও লাল রক্তের ছাপ। যেন রক্ত রাঙা কেঁচো আঙুল থেকে সড় সড়িয়ে মাটিতে নামে। হাত ধরে তাকে পথের পাশে পাথরের উপর বসাই। গিরমিকে বলি আমার ঝোলা খুলতে। ক্ষত-স্থান পরিষ্কার করে মারকিউরোক্রোম লাগাই। স্টিকিং প্লাস-টার আটকে দিই। গিরমিদের বলি ওর বোঝার ভার কিছু কমিয়ে দিতে ওরাই নিয়ে চলুক। তাদের হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারি এর এই বিপত্তি ওরা দুর্ঘটনাই মনে করে না—এ-যেন অতি সাধারণ ব্যাপার। তবু আপত্তি করে না। পালোয়ান দোরজে এর পুরো বোঝাটাই তুলে নেয়। নিজের বোঝার উপর অক্লেশে বেঁধে নিয়ে আপন পিঠে চাপায়। এগিয়ে এসে টামাং-এর হাত ধরে যা বলে তার মর্মার্থ বুঝি—চল তুই

ফটো : ডি সোনা

খালি-পিঠেই চল!—বলে আবার সবাই হেসে ওঠে।

আবার পথ চলাও সুরু হয়। হঠাৎ এতক্ষণে মনে পড়ে আমার জুতোর কথা। তাকিয়ে দেখি, জুতোর ছিল আরও হাঁ হতে আরম্ভ করেছে। ভাবি, এতক্ষণ যে চলেছে, এই যথেষ্ট। কিন্তু তখনি আবার চিন্তা জাগে, তা তো হোল; কিন্তু এখনও যে কদিন পথচলা বাকি। মনের মধ্যে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে। ঐ তো স্টিকিং প্লাসটার! সেটে লাগলাম টামাং-এর ক্ষতস্থানে। জুতোর ক্ষতেও ব্যবহার করলে কেমন হয়? আজই সন্ধ্যার আশ্রয়ে বসে তারই সাহায্য নিতে হবে। হাসি পায় ভেবে, সেই ছেলেবেলার খেলাধুলোয় হাত-পা মচকালে মালিশ করা হোত—হর্সেস এম্ব্রোকেশান—আজ জুতোয় লাগাব স্টিকিং প্লাসটার! এ-সব পথে এ-ও এক বুদ্ধির খেলা—যা সঙ্গে আছে, বা আশপাশে সহজে মেলে, তারই সাহায্যে কাজ চালানো।

পথ নেমে এসে আবার সোজা চলে। বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে-আসা ঝরনা পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে। সে-সব জায়গায় ঝরনার জলের তলায় পথের চিহ্ন হারায়। চারপাশে ছোট বড় কালো কালো পাথর। তাই ঘিরে ঘিরে বয়ে চলে জলের বিভিন্ন ধারা। কুলকুল কলধ্বনি। ছোট ছেলেমেয়ের খিলখিল হাসি। আট-দশ হাত দূরে ঝরনার অপর পারে দেখা যায় পথ আবার জেগে উঠে বনের মধ্যে চলতে থাকে। এ-যেন জল ও পাথরের আড়ালে ক্ষণিকের জন্য মুখ লুকিয়ে আবার মুখ খুলে চাওয়া। পথ ছেড়ে পাথর থেকে পাথরে সাবধানে পা ফেলে জল ডিঙিয়ে ওপারে উঠি। আবার পথ ধরি। সমতল পথ। বনময় শান্ত, মন-ভোলান পরিবেশ। হিমালয়ের প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে পথ চলার আনন্দ। অজানিতে গতিবেগ বাড়ে। গিরমিরা পিছনে পড়ে থাকে। একা এগিয়ে চলি। মনের গোপন কোণে লুকে-থাকা কত পরিচিত গানের সুর বাজতে থাকে: পায়ে হাঁটার ক্লান্তি নেই। দেহের কোন ভার বোধ নেই। অনাবিল আনন্দ স্রোতে আপনা থেকেই ভেসে চলি প্রয়াসহীন ভঙ্গিতে। আবার ঝরনা এসে গতিরোধ করে। আবার ওপার থেকে হাতছানি

দিয়ে পথ যেন ডেকে নেয়; চলার আবেগে চলতেই থাকি। ঝরনার পর ঝরনাও আসে। জলের বুকে পাথরগুলিও যেন পরিচিত হয়ে ওঠে। নির্ভয়ে পা ফেলে সমান গতিবেগে পার হয়ে যাই। আবার আর এক ঝরনা। আত্মভোলা হয়ে অসাবধানে পাথরে-পাথরে পা ফেলি। তখনি ফল ভোগও করি। দুরন্ত অস্থির এক পাষাণ মধ্য ঠেলায়। তখনি কাত হয়ে পড়ি জলের উপর। সামান্যই গভীরতা। এক বিঘতও নয়। শুধু প্যান্ট ও জামা অল্প ভেজে। পাথরে পায়ে সামান্য আঘাতও লাগে। নিমেষে উঠে দাঁড়াই; তখনি চোখের উপর ফুটে ওঠে, টামাং-পোর্টারের সেই করুণ অপ্রতিভ মুখ। তাকিয়ে দেখি চারিপাশে। কোথাও কেউ নেই। তাই, হাসির রোল ওঠে না। জলেরই শুধু খিলখিল হাসি। দাঁত বার করে আর একজনও নিঃশব্দে হাসেন। দেখে গা জ্বলে। জুতোর হিল্ আরও মুখ হাঁ করে। রুমাল বার করে কোন রকমে বেঁধে রাখি। চলার গতিবেগ সংযত করি। পায়ের আঘাত তেমন কিছুই নয়।

আরও কিছুদূর যাবার পর অরণ্য এলাকা শেষ হয়। সামনে তাক্‌শিন্দু দেখা দেয়। পাহাড়ের কোলে ঘরবাড়ী, চাষের জমি। আজকের মত যাত্রা শেষ ভেবে আগ্রহে এগিয়ে চলি,—জুতোর হিল কখন খুলে বা বিঘ্ন জাগায়।

গ্রামে ঢোকবার আগে পথ ধনুকের আকারে বেঁকে যায়। বাঁকের মুখে দেখি তিনটি শেরপা যুবতী। পিঠে ঘড়া। হয়ত জল নিয়ে ঘরে ফেরে। দেখি, হঠাৎ পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পরস্পরে খুব ঠেলাঠেলি করে,—এগুতে চায় না,—হাসাহাসি করে। নিকটে এসে পড়ি। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে তারা। তাদের এড়িয়ে পথ ছেড়ে পাশে ঘাসের ওপর দিয়ে এগুতে যাব,—সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে ওঠে, ভয় চকিত কণ্ঠে। কি বলে বুঝি না। তবে যেতে নিষেধ করে তা বুঝতে পারি। আবার তারই মধ্যে হাসতে থাকে। গতি শিথিল করে তাদের দিকে তাকিয়ে অর্থহীন হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে আমি এগিয়ে চলি। ওরা হাত বাড়িয়ে পথ রোধ করে,—যেতে দেয় না। চোখে তাদের ভীত-চাহনি, অথচ মুখে হাসি। ভাবি, হোল কী? এরা চায়-ই বা কী?—একজন তখন সম্মুখ দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। তারও অর্থ বুঝি না। হাত পঁচিশ দূরে পথের আর একটা বাঁক। একফালি ছোট মাঠ। তারপরই দু'একটা চালাঘর। মাঠে কয়েকটা মহিষ ঘোরে। একটা মহিষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ী গাভীর সাদৃশ্য ছিল। তাই দেখে আমি আরও এগোতে যাই, ওরা ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। গিরমি এসে পড়ে। উত্তেজিতভাবে একসঙ্গে তারা গিরমিকে কি বলে। গিরমি দূরের মোষটার দিকে তাকায়। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। পথের পাশ থেকে কয়েকটা টুকরা পাথর তোলে। মোষটার দিকে একটা ছোঁড়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য। মোষটার গায়ে লাগতেই মাথা দুলিয়ে শিং নেড়ে এগিয়ে আসতে চায়। গিরমি তখনি আরও একটা ছোঁড়ে। আবার লাগে। মোষটা এবার পিছু হটে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথা তুলে কটমট করে তাকায়। গিরমি আবার আর একটা পাথর ছোঁড়ে অতো দূরে। সেটাও ঠিক গিয়ে গায়ে লাগে। মোষটা আরও খানিক সরে যায়। গিরমি তখন জানায় চলুন এবার এগিয়ে। পাগলা মোষ ওটা। অল্প আগেই একটা লোককে গুঁতিয়েছে।

মেয়েগুলিরও উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি। গিরমির দিকে সপ্রশংস মুগ্ধ নয়নে তাকায়, আমাকেও কি যেন বলে খিলখিল করে হেসে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকি। সুন্দর বাড়ীগুলি। একে একে ছাড়িয়ে যাই। তবু গিরমি দাঁড়াবার লক্ষণ দেখায় না। অগত্যা জিজ্ঞাসা করি, আজ এইখানেই থাকবার কথা না?

সে বলে হাঁ। কিন্তু এখানে থাকব না। বেলা রয়েছে। আরও খানিক এগুনো যাক। সোজাই ত রাস্তা। গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই আবার খানকয়েক বাড়ী-ঘর। ছোট গ্রাম। নাম শুনি ঝোড়বু। পথের বাঁদিকে একতলা সুশ্রী একটা বাড়ী। সম্মুখে পথের ধারে বেড়া, ছোট গেট। তারই ভিতর দিয়ে গিরমি নিঃসংকোচে ঢোকে, যেন নিজেরই বাড়ী। বাড়ীর এলাকার মধ্যে বাঁদিকে ক্ষেত। বোধ হয় আলুর চাষ হয়েছিল। এখন খালি জমি এবড়ো খেবড়ো। ডানদিকে জমি-ভর্তি মানুষ-উঁচু প্রকাণ্ড মাচান। সবুজ লতায় ছাওয়া। সুপুষ্ট স্কোয়াস ঝুলছে অপর্যাপ্ত। গিরমিকে দেখাই। বলি দেখ না যদি কিছু কিনতে পাওয়া যায়—আবার 'হুই না' বলে!

গিরমির মুখে মৃদু হাসি ফোটে, ঘাড় নাড়ে, ভাবটা যেন—হবে হবে এখানে সবই মিলবে।

বাড়ীর ভিতর থেকে এক শেরপা মহিলা বেরিয়ে আসেন। গিরমিকে দেখে যেভাবে আপ্যায়ন করে কথা বলেন, বেশ বোঝা যায়, আগে থেকেই জানাশোনা।

গিরমিরা গিয়ে ওঠে একটা বড় ঘরে, সেইখানেই এ-বাড়ীর সকলে বাস করেন। আমার স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা হয়, সামনের অপর একটা ঘরে। সাধারণ ঘর নয়। প্রকাণ্ড এক হল্। কাঠের দেওয়াল। কাঠের মেঝে। দু'পাশে বড় জানলা। এক পাশে দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদী। তারই উপর বুদ্ধদেবের মূর্তি। ধূপদীপ সাজানো। দেওয়ালে আঁকা দেবদেবীর নানাবর্ণের চিত্র। অত বড় ঘর তবু আমার বিছানাটুকু পাতবার জায়গা কোথায় পাই, ঘরে ঢুকে তাই ভাবি। এ-যেন সমুদ্রের উপর ভেসে চলি, পানীয় জল দেখি না কোথাও। মেঝের উপর চারিধারে স্তূপাকারে মাল। কাঠের বড় বড় বাক্স, প্রকাণ্ড বস্তা ইত্যাদি ত আছেই, পাহাড়-প্রমাণ রাশিরাশি আলুও। বুঝলাম বাইরের সেই ক্ষেতের ফসল এখন ভাণ্ডার ভরেছে। বুদ্ধদেব এখন তারই পাহারায় রত। আমিও ভাবি তাঁরই চরণে আশ্রয় নিই। গিরমিকে ডাকি। বেদীর নীচে অল্প সরিয়ে বিছানা পাতা হয়। একদিকে বেদী, অপর তিনদিকে আলুর বেড়া হয়ে থাকে। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীর মত আলুও নিশ্চল থাকে না, কেবলি গণ্ডগোল পাকায়, গড়িয়ে বিছানার উপর চলে আসতে থাকে। সারারাত ইঁদুর-বাহিনী যাতায়াত করে, আলুর পাহাড়েও ধস নামে। খসখস ঘড়ঘড় শব্দ হয়। মাথার কাছে বুদ্ধদেবের প্রশান্ত মূর্তি, বরাভয় মুদ্রা। তাই স্মরণ করে আমিও রাত্রের বিশ্রামসুখের সাধনায় মগ্ন থাকি।

এক সময়ে রাতও কাটে।

৬ই অকটোবর। যথারীতি অতি-ভোরে উঠি। তখনও বাইরে অন্ধকার। টর্চ-হাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করার উদ্দেশে বাড়ীর বাইরে চলি। কাল বিকেলে-দেখা আলুর ক্ষেতের এক কোণে একটা জায়গাও মনে মনে ঠিক করাও আছে। বাড়ী থেকে অল্প দূরেই। অন্ধকারে বেশি দূর যেতে হবে না। একে ছোট গ্রাম লোকজন কম তার উপর অতো ভোরে পাহাড় অঞ্চলে কেউ বিছানাও ছাড়ে না। নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বসি। হঠাৎ পিছনে যেন বাতাসের স্পর্শ অনুভব করি। ভাবি পাহাড়ের দেশে ভোরের বাতাস। কিন্তু গরম ঠেকে কেন? বেশি ভাবতে হয় না। পিছন থেকে কে যেন মৃদু ধাক্কা দেয়। চমকে উঠি। হুমড়ি খেয়ে পড়ি বুঝি! কোন রকমে সামলে নিই। ফিরে তাকাই। বিরাট এক তিব্বতী কুকুর! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। টর্চ-এর আলো ফেলি কুকুরের মুখে। ভালুকের মত দেখতে। সেও মুখ তুলে তাকায়। লকলকে জিব বার করে। ভাবি, দেয় বুঝি এবার কামড়ে! নাঃ—সুসভ্য সারমেয়। কিছুই বলে না। চোখমুখের ভাব দেখে মনে হয় সে-ও যেন অবাক! মুখ তুলে বুঝি জিজ্ঞাসাই করে, হোল কী? অমন হকচকিয়ে তড়াক করে উঠলে কেন? ঐ কি 'টেবল-ম্যানারস'?

সেদিনকার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিষয় পরে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে ব্যানার্জির কাছে গল্প করি। তিনি বলেন, এ-অভিজ্ঞতা ঐ-সব অঞ্চলে গেলে সবারই হয়। আমারও জানা আছে। ঐ-কারণেই তো ওদিকের গ্রামগুলোতে নোংরা থাকে না, [illegible]। দেখেন নি?

[illegible] আবার যাত্রা। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত। তাই

মাঝ দিয়ে সরু পথ। দুপাশে কোথাও ডালপালা দিয়ে ক্ষেতের বেড়া, কোথাও বা পাথর সাজিয়ে পাঁচিল। দূরে দূরে ছোট গ্রাম। পাহাড় থেকে পথ ক্রমে নেমে চলে। মাঝে মাঝে জঙ্গল আসে। আবার ক্ষেতভূমি, আবার গ্রাম, আবার জঙ্গল। পথের আশপাশের পট-পরিবর্তন হলেও সবক্ষণই নিম্নমুখী গতি। খাড়া উৎরাই। জঙ্গলের মধ্যে পথ ঢুকলেই সংগোপনে পথ পিছল হয়, গতিবেগেও শিথিলতা আনে। সম্মুখে আকাশের বুকে পাহাড়ের মাথায় বরফের চুড়ো। যেন নীল সরোবরে শ্বেত-শতদল। মাঝে মাঝে দাঁড়াই। বিস্ময়ে তাকাই। তুষার-গিরির স্বপ্নময় রাজ্যের এলাকা আর বেশি দূরে নয়— ভাবতেও মনে আনন্দ লাগে। পথ চলার নবীন উদ্দীপনা আসে। কিন্তু পথ যে নেমেই চলে একটানা। গিরমি বলে, আজই নেমে যাব দুধকোশির ধারে।

দুধকোশি! ম্যাপ-এ দেখা সেই সে-নদী? এভারেস্ট গিরিশ্রেণীর দক্ষিণ অংশের জলভার সংগ্রহ করে নেমে আসে কল্লোলবাহিনী হয়ে? তবে কি এভারেস্টও দেখা দেবে এখনি?

না, তা হবার নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর। অতো সহজে কি তার দর্শন মেলে? নিকটে হলেও দৃষ্টির বাইরে। অন্তরালে থাকা মহাপুরুষদের মত।

কিছুক্ষণ থেকে শব্দ আসে পাহাড়ের নীচের দিক হতে। নদীর জলধ্বনি নয়, লোকজনের কণ্ঠস্বর। বাজনার সুরও। জঙ্গলের পথ। কাউকে দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায়, ক্রমে ক্রমে শব্দ নিকটে আসে স্পষ্টতর হয়ে। আমরাও নেমে চলি। তাই দুদলে দেখাও হয় অল্প পরেই। প্রথম উঠে আসে পাঁচ-ছয় জন লোক, দুটো ঘোড়া। গিরমি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলে। সোৎসাহে তখনি আমার কাছে এগিয়ে এসে জানায়— থিয়াংবোচির প্রধান লামা! এই এখনি উঠে এলেন-বলে এইখানে— বলে পথের নীচের দিকে উদগ্রীবভাবে তাকায়।

তাকাবার কারণই বটে। থিয়াংবোচির লামা! থিয়াংবোচিতেই তাঁকে দেখব, আলাপ করব—কতো কীই না শুনি তাঁর সম্বন্ধে, আর পথে এইভাবে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি। গিরমিকে বলি কোন ব্যাগে 'কাটা' আর ধূপ রাখা হয়েছে— শীগগীর—শীগগীর—বার কর।

'কাটা'—মসলিন কাপড়ের মত—হাত দুই-তিন লম্বা বিঘতখানেক চওড়া। যেন রেশমী গলাবন্ধ—স্কার্ফ। কাঠমাণ্ডুতে ন্যামার্জি বলে দেন দু-তিনটে 'কাটা' কিনে নিয়ে সঙ্গে রাখবেন, কিছু ধূপ, কয়েকটা মোমবাতিও। লামাদের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঐ 'কাটা' তাঁদের গলায় পরিয়ে দিয়ে অভিবাদন করা প্রথা। বাতি ও ধূপকাঠিও সেইসঙ্গে দেবেন। থিয়াংবোচির বড়লামাকে ত দিতেই হবে।

গিরমি তাড়াতাড়ি ঝোলা খুলে বার করে। দোরজেরাও সসম্ভ্রমে পথের পাশে বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লামাও সদলবলে এসে হাজির হন। সবাই হেঁট হয়ে অভিবাদন জানায়, তিনিও হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

বয়স বেশী মনে হয় না। হয়ত তিরিশের কোঠায়। মাথায় লামাদের উঁচু টুপি। পরনে সেই অঞ্চলে জোব্বা— গাঢ় লাল রং। ভাল দামী সিল্কের। পায়ে মোজা, সাধারণ চামড়ার সু-জুতো। হাসিমুখে হেঁটে চড়াই-পথ উঠে এলেন। তাঁরই হাতে ট্রানজিস্টার—যার বাজনা কানে আসছিল। সঙ্গে জনদশেক সঙ্গী। আমিও এগিয়ে গিয়ে 'কাটা' গলায় পরিয়ে দিই। তিনি মাথা নামিয়ে গ্রহণ করেন। হেঁট হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাই। তিনিও সঙ্গীর হাত থেকে আর একটা 'কাটা' নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেন। ধূপ ও বাতিও তাঁকে দেওয়া হয়।

লামার এক সঙ্গী পি ডবলু ডির অফিসার। ইংরাজি জানেন। তাই কথাবার্তার অসুবিধা হয় না। লামা জানতে চান, কোথা থেকে আসছি কোথায় চলেছি, কি কারণেই বা আসা?

উত্তর দিয়ে জানাই, থিয়াংবোচিতে তাঁর দর্শন-লাভও আমার একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনিই ত চলে এলেন এইখানে! ফিরবেন কবে?

তিনি গিরমিকে বলে দেন, থিয়াংবোচিতে লামার ভাই আছেন তাঁর সঙ্গে যেন আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। থাকবার সব ব্যবস্থা তিনিই করিয়ে দেবেন। লামার ফিরে আসতে দিন দশেক দেরি হবে।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে যা বললেন মর্মার্থ বুঝতে পারি— থিয়াংবোচিতে আবার হয়ত দেখা হবে।

মাথা হেঁট করে আবার অভিবাদন জানাই। আমার মাথার উপর হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করেন। সদলবলে এগিয়ে যান। অফিসারটি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলেন। তাঁর কাছে জানতে পারি, এই পাহাড়ের উপর দিয়ে বড় রাস্তা তৈরি হবে, তারই সার্ভে তিনি করছেন।

লামার দল পাহাড়ের উপর দিকে উঠে চলেন। আমরাও নদীর দিকে নামতে থাকি। নেমে চলি পাহাড়ের ঢালু পথে আপন মনে। পিছনে শোনা যায় গিরমিদের সেই পরস্পরে অনর্গল কথা বলা, থেকে থেকে হাসির উচ্ছ্বাস। নদীর উপত্যকার দিকে পথ যত নামে দুপাশের বড় বড় গাছের জটলা তত বাড়ে। সহসা সজোরে বাতাস ওঠে। গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি তোলে। অরণ্যের জড়জগৎ-ও যেন সচেতন হয়ে ওঠে।

জলের হুঙ্কার ধ্বনিও কানে আসে। বোঝা যায় নদী নিকটেই। জলদি জলদি নেমেও আসি।

দুধকোশি। দুধের মত রং। সাদা ধবধবে। কে যেন পাহাড়-ঘেরা কড়াই-এ দুধ জ্বাল দেয়। টগবগ করে ফোটে। কড়াই কাত করে সেই ফুটন্ত দুধ ঢেলে দেয়। উন্মাদ বেগে বয়ে চলে দুগ্ধ-নদীর ধারা। সুন্দর লোহার ঝোলা পুল। সুইস-দের নতুন তৈরি করে দেওয়া শুনি। নদীর অপর পারে পথ যায়। স্তব্ধ পাহাড়ে স্রোতের ভীষণ গর্জন প্রতিধ্বনি তোলে। পথ বাঁকে বেঁকে নদীর ধার দিয়ে চলে। পথের পাশে বনের গাছগুলোর ডালপাতা হঠাৎ সজোরে নড়ে ওঠে, শব্দ তোলে—ডালে ডালে হুড়োহুড়ি পড়ে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি। বানরের পাল। এ-গাছ থেকে ওগাছে লাফায়। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। এ-যেন তাদেরই রাজত্ব—আমিই যেন অনাহূত অবাঞ্ছিত জীব। পথও যেন থমকে গিয়ে নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে পালাতে চায়। সুরু হয় আবার চড়াই।

অথচ, শুনেছি, দুধকোশি নদী এসে গেলে একরকম এভারেস্ট-এলাকাতেই পৌঁছানো। কাঠমাণ্ডু থেকে এতদিন পূর্বমুখী পথ এসেছে, এইবার এই নদী ধরে এগিয়ে যাবে উত্তর মুখে। তাই বটেও। কিন্তু এ হিমালয়-রাজ্য। আজব দেশ। এখানকার ধ্যান-ধারণার মাপকাঠিও তাই স্বতন্ত্র। পথ এবার যাবে নদী ধরে ঠিকই। কিন্তু সব সময়েই যে নদীর তীর দিয়ে এমন নয়। কখন পাশেই দশ হাত দূরে নদীর ধারা—প্রচণ্ড তরঙ্গ-ভঙ্গে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস। আবার কখনো বা নদীর কূল ছেড়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যাওয়া— তখন বহু নীচে নদীর ক্ষীণ ধারা— নীরব নিশ্চল—সাদা রঙের প্রলেপ আঁকা। তবুও যে-উত্তর দিক থেকে নদী নেমে আসে, সব সময়ে সেই দিক লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়া। যেন তরঙ্গসঙ্কুল পর্বত-সাগরে ধ্রুবতারা দেখে তরণী বাওয়া। নদীর পাশে যখন নামি, মনে হয়, পথ যেন নদী-মায়ের আঁচল ধরে হাঁটে। অল্প পরেই কর্মব্যস্ত জননী যেন বলে ওঠেন, সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিস কেন? কাজে বিরক্ত করিস নে এখন। একটু বাইরে খেলতে যা দিকিনি!—অভিমান ভরে পথও তখনি আঁচল ছাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে দু-তিন হাজার ফুট উঠে যায়। নদীও হয়ত তখন চোখের আড়ালে যায়।

সেই মত পাহাড়ের উপরে এক সময়ে পৌঁছে একটা গ্রাম পাই। খোরকু নাম। গ্রাম ছাড়িয়ে চলি। খানিক দূর যাবার পর জঙ্গল থেকে পিরামিডের কাঠ সংগ্রহ সুরু হল। চারপাশে বোল্ডার-ছড়ানো একটু সমতল

জায়গা। প্রকাণ্ড একটা পাথরের রক্ গার্ডেন-এর পাশে মালপত্র নামায়। দুপুরের রান্না তোড়জোড় করে। কিন্তু দুপুর কই? ঘড়িতে দেখি সকাল ৮-৪০ মাত্র! খাওয়া শেষ করে সওয়া দশটার মধ্যেই আবার রওনা।

বেশ বড় চড়াই। হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পর ওঠা, তাই বেশি মনে হয়। পাহাড়ের মাথায় উঠে, আবার অপর-দিকে নামা। দুধকোশি পাশের কোন পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়। অপর আর এক পাহাড়ী নদীর উপত্যকায় নেমে চলি। বোঝা যায়, এ-নদী দুধ-কোশিরই উপনদী। পথও নদী পার হয়ে ঘুরেফিরে আবার দুধকোশির ধারেই যাবে। তবে আজ নয়। কেননা দেখা যায়, পাহাড়ের গা দিয়ে পথ এখন এঁকে বেঁকে চলে অনেক দূরে, নামতেও হবে অনেক নীচে ঐ সেই নদীর ধারে। সহজ পথ। ধীরে নামে। এ-পাহাড়গুলিতে বনজঙ্গল নেই। নীচে গ্রামের বাড়ীঘর। চাষের ক্ষেতও। গিরমি বলে, ওই! খারিখোলা। আজ ঐখানে রাতকাটানো।

মনের আনন্দে এগিয়ে যাই—এখনি ত পৌঁছে যাব ওখানে। সঙ্গীরা পিছনে পড়ে থাকে। দেখতে দেখতে দূরের লোকালয় নিকটে আসে। লোকজনও দেখা যায়। ক্রমে গ্রামও শুরু হয়। পথের দু-পাশে পাথর-সাজান পাঁচিল। কোথাও বাড়ীর, কখনও বা ক্ষেতের এলাকা ঘেরা। মাঝ দিয়ে পথ। নদীর ভ্যালি এখনও পাঁচ ছ'শ ফুট নীচে। সেখানেও ঘরবাড়ী। কিন্তু এখান থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবি, এটা হয়ত ভিন্ন গ্রাম। নীচে নদীর উপর পুলও দেখা যায়। নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে এগিয়ে-যাওয়া পথের রেখাও। পুলের কাছে ঘরে ও নিকটের মেলমেশা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের ডেরায় পৌঁছনোর আগ্রহে গতিবেগ বাড়াই। পিছনে দ্রুতগতি পদধ্বনি শুনে ফিরে তাকাই। দেখি গিরমি আসে। দাঁড়াতে ইসারা করে। এগিয়ে এসে জানায়, যেখানে আজ রাত্র থাকব সে-বাড়ী ছাড়িয়ে এসেছি, ফিরতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি, এখনও তো অনেক-খানি নীচে নামা বাকি। ঐখানে নদীর ধারে বাড়ীতে থাকলেই হয়। এদিকেও থাকা হবে, কাল সকালে প্রথমেই চড়াই ওঠা সহজও হবে। বেলা ত' মাত্র সওয়া একটা।

সে জানায়, খারিখোলা এটাও-ওটাও। কিন্তু ওখানকার লোকজন সুবিধের নয়। জায়গা মিলবে না।

পরে জানতে পারি, নীচে স্থানীয় পাহাড়ী নেপালীদের বাস, উপরে এই-খানে শেরপাদের বসতি। অতএব, গিরমির পক্ষে এইখানেই ব্যবস্থা করা সহজ।

ফিরিয়ে নিয়ে আসে ফেলে-আসা পথের ধারে একটা দোতলা বাড়িতে। তখনি ভাবি, আরে! এই বাড়ীতেই। কী আশ্চর্য!

অবাক হবার কারণ থাকে। একটু আগে এগিয়ে যাবার সময় এই বাড়ী-খানি দেখে মনে ধরে। দোতলা ছিমছাম চমৎকার বাড়ী। রাস্তা থেকে ঢুকে সামনে বাগান, পাথর-গাঁথা বসবার বেদী, তিব্বতী চোরটেন, লাল নীল পতাকাও। চারিপাশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করে। একতলায় সবুজ রঙের কাঠের থাম-দেওয়া বারান্দা, সারিসারি সাজানো টবে ফোটা ফুল। পাহাড়ের গায়ে বাড়ীটা যেন সাজগোছ করে দাঁড়িয়ে একমনে তাকিয়ে দেখে সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য—নেমে-যাওয়া নদীর উপত্যকা, ওপারে মাথা-উঁচু ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সারি, দূরে বরফের চূড়া। আমিও যাবার সময় বাড়ীর রূপে

মুগ্ধ হয়ে থমকে খানিক দাঁড়াই। মনে মনে বলি, ওগো পাহাড়িয়া! দূরদেশী পথিক আমি। রাত কাটানোর আশ্রয় দেবে মরে?

কিন্তু তখনি আবার এগিয়ে যাই। সামনে পথের ডাক শুনি। নীচে ঐ নদীর ধারে যে নামতে হবে। এখন দেখি, নামা নয়, ফিরেই আসতে হয়, আবার ঠিক সেই বাড়ীতেই!

অবাক হয়ে ভাবি, কে যেন মনের গোপন ইচ্ছা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে। অদ্ভুত আনন্দ জাগে মনে। তখন ত আর জানি না, স্বর্ণমৃগ দেখে আপন দুর্ভোগের পথেই পা বাড়াই।

গিরমিরা একতলার এক পাশের ঘরে থাকবার জায়গা করে নেয়। সামনের এক-পাশ-খোলা ঢাকা বারান্দার এক ধারে আমার বিছানা পাতি। কয়হাত দূরেই ফুলে-ভরা বাগান। চোখ মেললেই দিগন্তবিসারী পাহাড়ের সারি। খুচরো জিনিসপত্র বিছানার পাশে সাজিয়ে রাখি। চলে যাই জলের সন্ধানে। সারাদিন সামনে পড়া আকাশ-ভরা রোদ। কাপড়, মোজা,

গামছা ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাচার এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? কেচে রোদে শুকোতে দিই। নিজেও রোদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াই। শেরপা-মেয়েরা রঙীন ঘাগরা পরে ক্ষেতে কাজ করে, কারও বা পিঠে ঝকঝকে তামার কলসী, ঝরনা থেকে জল আনে। পুরুষরা কেউ রোদ পোহায়, গল্পগুজব করে, ঝল-মলে পোষাক পরে কেউ বা কোন কাজে চলে। যে যাই-ই করুক, বিদেশী দেখে সবাই তাকায়। চোখ কুঁচকে, মুখের উপর রেখা টেনে হাসে। একটি বছর ত্রিশের যুবক। সুশ্রী চেহারা। হাসি-খুশী মুখ। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। এগিয়ে এসে কথা বলে। কেউ কারও ভাষা বুঝি না। তাই হাসির উত্তরে আমিও মুখে হাসি দেখাই। এতেই যেন কতো গভীর পরিচয় হোল, —এমনি ভাব নিয়ে সে আপন কাজে চলে যায়। আমিও একা একা ঘুরি।

ক্রমে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। রোদের তেজ কমে। ডেরায় ফিরে শুকোতে-দেওয়া জামা-কাপড় তুলি। গিরমি আবার গরম চা এনে দেয়। বাগানে পাথরের বেদীর উপর পড়ন্ত রোদে বসে পান করি। মনে তৃপ্তি আনে।

উচ্ছলিত স্ফূর্তির প্রতিমূর্তি ধরে দুটি শেরপা যুবতী বাগানে ঢোকে। রঙীন বেশভূষা। গোলাপের মত মুখের আভা। মুখে চোখে হাসির ঝলক। দেহ দুলিয়ে আসে যেন নাচের ভঙ্গিমায়। দুজনেরই মাথায় বাঁধা ফেটিতে পিঠের উপর ঝুলিয়ে আনা দুটি কাঠের কলসী মতন। এগিয়ে এসে বারান্দার নীচে বাগানের ধারে বসে। কলসী মাটিতে সামনে রাখে। অমনি যেন মধুর লোভে মৌমাছির দল উড়ে আসে। শেরপা ছেলে, বুড়ো ভিড় জড় হয়। বাটি, গেলাস হাতে। তখন বুঝতে পারি, সুরা পানের মহোৎসব সুরু হয়। খিল খিল হাসি। অনর্গল কথা বলা। গায়ে গায়ে ঢলে পড়া। গেলাসের পর গেলাস কলসী থেকে ভরানো

চলতেই থাকে। নেশাখোরদের দলও বড়ো। নেশার ঘোরও জমে। মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলিও বাদ যায় না।

অস্বস্তি বোধ করি। সাধের শিলাসন ছেড়ে আবার পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

সূর্যদেব পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হন। রোদ উঠে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠে। এখানে বাড়ীগুলির আড়ে শুধু দিনের আলোটুকু রেখে যায়। দিন শেষের সে-আলো মুমূর্ষু রোগীর মত দেহের উত্তাপ হারায়। হিম-শীতল বাতাস আমারও অঙ্গে শিহরণ জাগায়। ফিরে আসি আপন আস্তানায়।

সুরা-রসের আড্ডায় তখন প্রায় ভাঙা হাট। মাত্র জনাচারেক আছে। ভাবি, ওরাও এবার যাবে। বাঁচা গেল! নিশ্চিত মনে বারান্দায় উঠে বিছানায় বসি। গায়ে কম্বল জড়িয়ে আরাম পাই। জানি না আমিই পথ দেখালাম কিনা— মাতালগুলিও বারান্দায় উঠে আসে। একটি মেয়ের তৃষ্ণা তখনও শূন্য হয় নি। তাকেও টেনে আনে। আমার বিছানা থেকে হাত দুয়-সাত দূরে— কম্বলের আর এক পাশে—তাকে ঘিরে আবার আড্ডা জমায়। মাতলামিও চলে। কোথায় যাই কি করি ভেবেই পাই না। ভাবতেও আর বেশি হয় না। তাদের মধ্যে একজনের জড়িত দৃষ্টি পড়ে বোধ আমারই উপর। চিনতে পারি বিকালে-দেখা সেই সুশ্রী যুবকটি। তার শিথিল হাত কোনরকমে তুলে আমার দিকে ইশারা করে ডাকতে থাকে—যেন বোধ দেবার জন্যে। তখনি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসি। কিন্তু এ-যেন উট-পাখির বালির মধ্যে মুখ টুকু গুঁজে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা। ছোকরা উঠে আসে আমারই বিছানার পাশে। টলতে টলতে উবু হয়ে বসে। আমার পায়ের কাছে কেবলি ঢলে পড়ে মাথা ঠেকাতে চায়। জড়িত ভাষায় কিসব যেন বলতেও থাকে। বুঝতে পারি তার শুধু একটি কথা—পরভু! পরভু! পরভু! তারপর আরম্ভ হয় হাত জোড় করে মুখ তুলে তাকানো আবার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা, ভেউ ভেউ করে কান্না, আর মুখে অনর্গল 'পরভু! পরভু!' ডাক!

ভাবি, মানুষের একী বিকট পরিবর্তন! বিকালে-দেখা সেই বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু! এখন আরক্ত, আবিল। সাধারণ জীবিত মানুষের চোখই নয়। এ-যেন পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ নীল জল—হঠাৎ বর্ষার ঢল নেমে এখন কাদা-ভরা ঘোলাটে স্রোতে ঘূর্ণিপাক খায়।

তার সঙ্গীরা ওদিকে বসে তাকায়। আর হাসে। মেয়েটা তো হাসির দমকে ঢলেই পড়ে।

কি করব বুঝি না। মাতলামি দেখা, নতুন নয়। কিন্তু মাতালের এমনভাবে খপ্পরে পড়ার দুর্ভাগ্য এই প্রথম। অসহায়ভাবে গিরমিকে চেঁচিয়ে ডাকি। সে তখনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটাকে কেন রকমে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে যেতেই চায় না। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আবার আসার জন্য জোর করে আর মুখে সেই এক বুলি 'পরভু' পরভু!'

বারান্দা থেকে বাগানে নামিয়ে ছেড়ে দিতেই আবার আমার দিকে আসবার চেষ্টা করে।

গিরমি আর একজন কাকে ডেকে আনে। প্রৌঢ় শেরপা। দামী পোষাক গায়ে। রাশভারী চালচলন। মাতালটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গেটের দিকে এগিয়ে যান। সে টলতে টলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে চায়, শিথিল হাতের আঙুল তুলে আমার পানে দেখায়,—জড়িত-কণ্ঠে কি সব বলে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে আর একজন লোক দিয়ে বাড়ীর এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেন। তার সঙ্গীদের ও মেয়েটিকেও চলে যেতে বলেন। তারপর, এগিয়ে আসেন আমার দিকে। মুখভরা কৌতুকী হাসি। গিরমি পরিচয় করিয়ে দেয়,—ইনিই গ্রামের প্রধান। এটা পঞ্চায়েত-বাড়ী। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ভদ্রলোক বলেন, কিছু মনে করবেন না এ-সব দেখে। এখানকার এ-সাধারণ ঘটনা। মদ খাওয়াটা আমাদের কাছে আপনাদের জল-খাওয়ারই মতন। তবে ও-ছোকরাটি একটু বেশমাত্রা চড়িয়ে ফেলে। কিন্তু আপনি এখানে বারান্দায় রয়েছেন কেন? ভেতরের ঘরে বা দোতলায় গিয়ে থাকবেন চলুন,— আরাম পাবেন।

ঘরের মধ্যে যাবার কথা ভাবব কি? এঁরও মুখে ভরভর করছে গন্ধ। হয়ত মুখের গেলাস নামিয়ে রেখে এসেছেন এখানে। তবে, হাবভাব কথাবার্তায় জড়তা নেই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, 'পরভু' ডাক ছাড়বেই বা কতক্ষণ! অতএব ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, এখানেও আরামে আছি। রাতটুকু তো কাটানো।

বিদায় নিয়ে তিনি ঘরের ভিতর চলে যান। তাঁর আমন্ত্রণে ঘরের মধ্যে না গিয়ে যে আরও একটা ফাঁড়া কাটে, বুঝতে পারি একটু পরে।

গিরমি রুটি, সব্জি এনে দেয়। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। চোখের উপর তখনও কেবলি জেগে ওঠে সেই ছোকরাটির কাণ্ডকারখানা, তার 'পরভু পরভু' ডাক, আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া। যেন একটা দুঃস্বপ্ন! অথচ বিকেলে ওকেই দেখে মন কেমন প্রসন্ন হয়েছিল। তার ঐ বিকারগ্রস্ত অবস্থা আমার মনেও কি পরিবর্তন ঘটায়! কি রকম এক ঘিনঘিনে ভাব। বিরক্তি, অস্বস্তি বোধ ত' ছিলই। করুণারও হয়ত উদ্রেক হচ্ছিল। কিন্তু কেমন একটা আতঙ্কও যে জাগছিল, সন্দেহ নেই। এখন ভাবতে হাসি পায়। হিমালয় পথের কতো দুর্গম ভয়াবহ অঞ্চলেও যে-মনের উপর কোন ভয়ের ছায়া পর্যন্ত পড়ে না, সেই মনেই সামান্য এক চৈতন্যহীন মানুষের বিকৃত আচরণ ভয় আনে কেন, ভেবে পাই না।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়েও পড়ি, জানি না। জানতে পারি, যখন লোকজনের কথাবার্তায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। মুদিত চোখের পাতার উপর প্রখর আলোর ঝলসানি বোধ করি। তাকিয়ে দেখি, বিছানার পাশে তিন-চারজন বিরাট মূর্তি। একজন ওভারকোট গায়ে, কান ঢাকা টুপি মাথায়। হোমড়াচোমড়া লোক মনে হয়। সেই লোকটিই জোরালো টর্চ-এর আলো ফেলে আমাকে ভাল করে দেখে। পাশে-রাখা আমার জিনিসপত্রের উপরও একবার আলো বুলিয়ে নেয়। তখন দেখি, সেই প্রধানও সঙ্গে আছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলছেন বুঝলাম যে কলকাতা থেকে আসছি থিয়াংবোচি যাব। ভাবটা যেন, আমি-লোকটা খারাপ নয়!

তারা আলো ফেলে কি দেখে নিল, জানি না—কথা বলতে বলতে তখনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। দোতলায় গিয়ে ওঠে, ওপরের কাঠের মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দে তাও বোঝা যায়। তারপর কিছুক্ষণ ধরেই চলে বারান্দা দিয়ে লোক যাতায়াত। আবছা অন্ধকার মাঝে মাঝে টর্চ-এর আলো, বড় বড় চেহারা— চলন্ত জমাট ছায়ার মত বাড়ীর ভিতরে যায়, কেউ বা বাইরে আসে।

কিছু পরে আবার সব শান্ত হয়। শুধু উপর থেকে লোকজনের অস্পষ্ট গলা শোনা যায়। ভাবি, এদের কি সারা-রাতই সুরাপানের মহোৎসব চলে?

গিরমির কাছে পরের দিন ব্যাপারটা শুনি। ওরা সব পুলিসের লোক। থিয়াংবোচি ছাড়িয়ে আর একটা গ্রাম আছে,— পিয়াংবোচি। শেরপাদের বসতি। এভারেস্টের দিকে ঐটেই শেষ গ্রাম। সেখানে তিব্বতীর বেশধারী এক চীনদেশীয় গুপ্তচর ধরা পড়ে। পুলিস তাকে নিয়ে কাঠমান্ডু চলেছে। কাল এখানে রাত কাটালো। তাই অত সতর্কতা!

ভুলেই গিয়েছিলাম এইসব রাজনৈতিক ব্যাপার। ভাবি, এখানেও সেই শনির দৃষ্টি! স্বস্তি কি কোথাও নেই!

১ই অকটোবর। ভোরে উঠে তৈরি হই। গিরমি চা আনে। পোর্টাররা যে-যার মালপত্র পিঠের বেঁধে নেয়। বাইরে রাস্তার উপর তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। ৫-৪৫ মিনিট। চারিদিক শান্ত নিঝুম। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। পশু-পক্ষীরও নয়। ঘুমন্ত শিশুর মত

সময়ের স্রোতও বয়ে যায়। দিনের আলো মিলায়। আমিও ধীর পদে ঘরে ফিরি।

সন্ধ্যার মধ্যেই রাত্রের আহার সাঙ্গ। শয্যার আশ্রয় পথশ্রান্ত দেহে আরাম আনে।

শুয়ে-শুয়েও গিরমিদের গল্প ও হাসির উচ্ছ্বাস চলতেই থাকে। স্মরা-ক্ষণই দেখি তাদের রঙ্গরসিকতার ধারা বয়,—পাহাড়ী ঐ নদীরই মত।

ঘরের আর এক কোণে নিভন্ত উনুনের কোল ঘেঁসে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে টাম্‌ং পোর্টার,—সঙ্গহীন, একাকী।

১০ই অকটোবর। ভোরে উঠে আবার তৈরি। ছড়ানো জিনিস থলিতে ভরা, কিট-ব্যাগে স্লিপিং-ব্যাগ ও কম্বল তুলে বেঁধে রাখা, পথ-চলার জামা-কাপড় জুতা পরা,—যন্ত্রচালিতের মতই কাজগুলি হয়ে যায়। তবুও, নিত্য-নৈমিত্তিক এ-সব কাজের মধ্যেও প্রাণের সাড়া থাকে,—এ যে নতুন-পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি।

৫-৪৫-এ যাত্রা সুরু। পাহাড় নদী বন,—তারাও যেন সদা রক্ত-জাগা চোখে পথের পথিককে আবাহন জানায়। সুরকিয়া ছাড়িয়েই আবার অল্প চড়াই। পাহাড়ের উপর অংশ দিয়ে পথ হলেও এখন স্পষ্ট বোঝা যায়,—দুধকোশির উপত্যকা ধরেই চলেছি। পথের বাঁদিকে নীচে নদীর সর্পিল ধারা প্রায়ই চোখে পড়ে। পথও পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে, যেন নদীরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখানো দিক লক্ষ্য করে।

দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর—৭-১৫-তে বড় গ্রাম আসে। গ্রামে ঢোকবার আগে পথের ডাইনে আর এক শাখা-পথ পাহাড়ের আরও উপর দিকে উঠে যায়। তীর-চিহ্ন-আঁকা বোর্ডে লেখা,—সরাসরি লুকলা এয়ার স্ট্রিপে যাবার রাস্তা। আমরা চলি—সমতল পথ ধরে গ্রামের দিকে। গ্রামের নাম চামরীখরকা বা চৌরীখরকা। নাম শুনেই মনে হয় বুঝি তিব্বতী অঞ্চলে এলাম। পাহাড়ের গায়ে মাঠের উপর, পথের মাঝে কয়েকটা চমরী গাই ঘোরে, নামকরণের সার্থকতা প্রচার করে। প্রকান্ড লম্বা গ্রাম। পথের দুপাশে সারি সারি বাড়ী। পাঁচিল-ঘেরা এলাকা। মাঝে মাঝে পথের মাঝখানে ও আশেপাশে মণিপ্রাচীর ও ডাগোবা। গ্রামের ঘরবাড়ী সুরু হয়ে যেন শেষই হয় না, একটানা দুধারে চলতেই থাকে। ৮,৫০০ থেকে ৭,৭০০ ফুট উঁচুতে গ্রামখানি যেন প্রকান্ড দুই বাহু ছড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সকালের রোদ পোহায়। গ্রামের চারিপাশে শুকনো খটখটে পাহাড়ের গা। তৃণশূন্য, রুক্ষ। রোদ পড়ে বালি, কাঁকর, পাথর ঝকমক করে। অথচ, উপরে পাহাড়ের মাথার দিক ঘন গাছপালা। চামরীখরকা শেরপাদের বড় বসতি। গিরমির সঙ্গে অনেকেরই জানাশোনা দেখি। একটা বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গিরমি একটি শেরপা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসে। গিরমিকে আমন্ত্রণ করে তার বাড়িতে যেতে। পাশাপাশে মাচা-ভরা স্কোয়াস দেখে গিরমিকে কিছু কিনতে বলি। এ আর 'ছুই-না'-র গ্রাম নয়। এক টাকায় প্রচুর পাওয়া যায়। গ্রামের বেশ খানিকটা উপরে—দক্ষিণ-পূর্ব দিকে— পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতল ভাগ। গিরমি তাই দেখিয়ে বলে, ঐ লুকলা এয়ার-স্ট্রীপ।

তারই নিকটে লুকলা গ্রামের কয়েকটা মাত্র ঘরও দেখা যায়। ৯,২০০ ফুট উঁচুতে। ভাবি, ঐখান থেকেই ফেরবার প্লেন ধরতে হবে। এখন ভাবতেও মনে দুঃখ জাগে।

গিরমিদের হাবভাব দেখে বোঝা যায়, এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। হঠাৎ আমার জুতার দিকে নজর পড়ে। সেই স্টিকিং প্লাসটার লাগাবার পর ভুলেই গিয়েছিলাম তার কতদেহের বিষয়ে। এখন দেখি আবার মুখ হাঁ হয়েছে: ক্লান্ত কুকুরের মত জিভ বার করে লকলক করে। আবার রুমাল বার করে জুতার সে-অংশ সজোরে বেঁধে নি। ভাবি, কালই তো নামচে পৌঁছানো। সেখানে গিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। এ-দুদিন এডজাস্ট কি চালানো যাবে না? গিরমিকে জুতার দুরবস্থা দেখাই। বলি, আমাকে আজ আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে, এখানে আর বসব না,—পথ ধরে এগুচ্ছি—

জুতার শোচনীয় অবস্থা গিরমির মনে কোন দুর্ভাবনা বা সহানুভূতি জাগায়, এমন তার ভাব দেখি না। ভাবি, পায়ে জুতা রইল বা রইল না, পাহাড়ীরা তার প্রভেদ বোঝে না। ওদের কাছে জুতা ব্যবহার একটা সৌখিনতা—ধনীর প্রসাধন। আর আমাদের? অভ্যাসে স্বভাব নষ্ট। এসব পথে খালি পায়ে হাঁটার বিপদও থাকে। ধীরে ধীরে পা ফেলে কোন রকমে এ দুদিন কাটানোই আমার কর্তব্য। কিন্তু দেখি, এ দুশ্চিন্তা আমারই, গিরমির নয়। পাছে সে ভুল করে ভাবে যে আমি পথ চলায় ক্লান্ত হয়েছি, তাই তাকে হেসে জিজ্ঞাসা করি, গিরমি তোমার বয়স হোল কত? সে বলে, বছর ২৬।

শুনে বলি, আমার কত জান? ৬৪ পেরিয়ে ৬৫-তে পড়েছি। তবু দেখ, তোমাদের সঙ্গে ঠিকমত হেঁটে চলেছি ত? গত দুদিনই তোমরা একদিনে দেড় দিনের পথ শেষ করছ!

সে নির্বিকারভাবে মুখের দিকে তাকায়। ২৬ ও ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে যে কোন তফাৎ—এতে মানুষের চলবার ক্ষমতার কম বেশির কথা উঠতে পারে—তাও সে বোঝে না দেখি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। গ্রাম শেষ হবার মুখে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে ঝরনা। তামার ঘড়ায় জল ভরে শেরপা মেয়েরা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। ঝরনার পাশে মেয়েদের জটলাও চলে। সেই খিলখিল হাসি, অনর্গল কথা বলা-বলি। যেন ঝরনার কলধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়। মেয়েগুলি দেখতেও সুশ্রী, বেশভূষাও রঙিন।

গ্রাম ছাড়িয়ে উন্মুক্ত ময়দান। চারি-দিকে আবার বৌদ্ধস্তূপ, ডাগোবা। সেগুলি পার হয়ে প্রকান্ড শিলাস্তূপ। তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে গোলক ধাঁধায় যেন পথ হারাই। একটু উপর দিকে উঠে একটা পাথরের উপর বসি। গিরমির জন্য অপেক্ষা করি। কি জানি, যদি ভুল পথেই চলে যাই। নীচে দূরে ছাড়িয়ে আসা গ্রামের ঘর-বাড়ী দেখা যায়। মাঠ দিয়ে টামাং পোর্টার ঐ তো আসছে। একা। বোঝা-পিঠে একমনে এগিয়ে আসে। অল্পক্ষণেই পৌঁছেও যায়। সেই খালি পা। স্টিকিং প্লাস্টারটা কালো হয়ে এখনও আটকে আছে। গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা। এই শীতেও কপালে ঘামের বিন্দু বিন্দু রেখা। কাছে এসে দাঁড়ায়। গিরমিদের খোঁজ নিই। তারা সেই বাড়ীর মধ্যেই ঢুকেছে। এ বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার হাঁটতে সুরু করে। এ-পথে একে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ হয়। আপন মনে একাই চলে, পিঠের বোঝার ভার বয়ে। মনেরও নিশ্চয় এর কোন খোরাক নেই, পথ-চলারও আনন্দ বোধ নেই। পেট চালাবার মত রোজগারের প্রয়োজনেই তার এই অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম। তবুও মুখে বিরক্তির প্রকাশ নেই। কারও বিরুদ্ধে আক্রোশ বা অভিযোগও নেই।

কেমন যেন মায়া জাগে লোকটির সাথীহীন নিঃস্ব অবস্থা দেখে।

সেও এ-পথে নতুন, তবু এরা রাস্তা চেনবার সহজাত বৃত্তি ধরে। ঘুরে ফিরে দেখে বলে দেয়, কোন পথ ধরে যাব। সেই মত আবার চলতেও থাকি।

এদিক দিয়েও একটা পথ চলে যায় উপরে লুকলা গ্রামে ও এয়ার স্ট্রীপ-এ। নামচে থেকে ফেরবার সময় চামরীখরকা গ্রামে না নেমে লুকলা যাবার সেইটেই সোজা পথ।

পাহাড়ের কোল ঘেরে অল্প নামবার পর দুধকোশি নদীর ধারে এসে পৌঁছুই। পার্বত্য নদী ও বিজন বনের রমণীয় শোভা। পথও চলে উপত্যকা ধরে প্রায় সমতলে। কখন নদীর ধারা অতি নিকটে আসে, আবার কখন বা পথ নদী-জলের সঙ্গ ছেড়ে পাশের বনের বড় বড় গাছের আড়ালে লুকোয়। সেখানেও হয়ত নতাপরা ঝরনার ধারা। উপলময় জল-স্রোতের আত্মসজ্জা। আবার বন ছেড়ে পথ বাইরে আসে দুধকোশির সঙ্গ ধরে। যেন, শ্যাম ও কূল দুই-ই রাখে। দুরন্ত চড়াই উৎরাইও নেই। পাহাড়ী পথের

অন্তত বাচ্চাদের কথা ভেবে খাঁটি মশলা কিনুন—
সানরাইজ
হ'ল সেই মশলা-
১০০% খাঁটি-
স্বাদে গন্ধে ভরপুর
শুধুমাত্র স্বাদের জন্যই নয়—মশলা তৈরীর ব্যাপারে আমরা সবার আগে বিশুদ্ধতার দিকে নজর দিই। খাঁটি কাঁচামাল কেনা হয়—আধুনিক মেশিনে তৈরী হয় সানরাইজ মশলা—নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হয়। তাইতো সানরাইজ আজ দেশের সেরা মশলা।
EXPORT QUALITY
SUNRISE
TURMERIC 250 Gms
PURE POWDER SPICES
PRAKASH BROTHERS
দোকানে খাঁটি মশলা চাইলেই
সানরাইজ পাবেন।
প্রকাশ ব্রাদার্স ৭৪/৭, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা-৭
Newfields P.B. 12.73.

ভক্তি-মমতারই ওঠা-নামা। প্রাণে অপার আনন্দ জাগে পথ চলতে। চরণও চোর আবেগে সজোরে চলতে চায়। শুধু, ছেঁড়া জুতোই বাধা জাগায়। সন্তর্পণে ধীরপদে চলতেই হয়। তবুও; পাথর-জড়ানো পাহাড়ী পথে বুঝি পাদুকার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। পিছনে গিরমিদের হাসামুখের কথাবার্তা কানে আসে। অপেক্ষাকৃত তারা এসেও পড়ে। হনহন করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। গিরমিকে আবার জুতোর শোচনীয় অবস্থা দেখাই। জিজ্ঞাসা করি, দুপুরের বিশ্রাম আজ কোনখানে?

বলে, আর বেশি দূর নেই, রাস্তাও সোজা। নদীর ধারে ঘাটে-গ্রামে খাওয়া হবে।

বলি ঠিক আছে। তোমরা গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করো,—আমাকে আজ এই-ভাবেই আস্তে যেতে হবে।

তারা আবার গল্প হাসির সুরে ধরে এগিয়ে যায়। টামাং-ও তাদের সঙ্গ নেয়। রান্নার সাজ-সরঞ্জাম তারই কাছে। আমি আবার আপন মনে পথ চলি, ধীরে ধীরে।

বনভূমি শেষ হয়। সম্মুখে দেখি, পথ নেমে যায় একেবারে নদীর ধারে, তারপর সোজা চলে নদীর কূল ধরে,—সমান্তরাল রেখায়। অদূরে নদী তীরে ঘাটে-গ্রামের ঘরবাড়ী। নদীর উপর পুল। দূরে উপত্যকার প্রান্তে ঊর্ধ্বশির তুষার শিখর। সামনের সরল সোজা পথ, পাশে দুধকোশির স্বচ্ছ প্রবাহ, ঐ দেখা যায়—গ্রামের বাড়িঘর আশ্রয়,—আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়গুলির কমনীয় দৃশ্য,—অনাকাঙ্ক্ষিত [illegible] আকর্ষণ করে। অচিরে গ্রামের নিকট পৌঁছেও যাই। বেলা মাত্র ১টা ১৫। মেঘশূন্য আকাশ। রূপালী রোদে [illegible] নদীর জলে ঝিকিমিকি আলোর খেলা চলে। ভাবি, আজ দুধকোশিতে অবগাহন স্নানের সুযোগ হবে।

পুলের মুখে আসি। এপারে খানদুই মাত্র ঘর। ওপারেই প্রকৃত গ্রাম। উপত্যকা হলেও ৮,০০০ ফুট উঁচুতে। রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে পুলের উপর দিয়ে অপর পারে যায়। এপারেও নদীর তীর ধরে আর একটা পথ এগিয়ে চলে। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবি, কোন পথ ধরি। দু পথেই লোক চলাচলের পায়ের ছাপ। এদিক ওদিক তাকাই, গিরমিদের যদি দেখতে পাই। না, তাদেরও কোন সাড়াশব্দ নেই, অন্য কোন লোকও নিকটে নেই। অপর পারে, গ্রামে দু-একজনকে দেখা যায়। এমনি সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পুলের মুখে পথের উপর সেই গতানুগতিক মণিপ্রাচীর ও ডাণ্ডোবার সারি। চোখে আঙুল দিয়ে তারা যেন দেখায়, দূরগামী প্রাচীন পথের এ-অঞ্চলে আমরাই তো প্রমাণ। দাঁড়িয়ে ভাব কি?

মনে মনে হাসি। ভাবি, সত্যিই তো. এতক্ষণ এটা নজর করি নি কেন?

নিশ্চিন্ত হয়ে পুল পার হই। গ্রামে ঢুকি। গিরমিদের সন্ধান করি। কোথাও দেখতে পাই না। তখন মনে হয়, গ্রামের মধ্যে দিনের বেলায় ওরা বিশেষ বসে না। নিশ্চয় গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় একান্ত কোথাও আস্তানা পেতেছে। পথ ধরে এগুতে থাকি। এখানেই পথের মধ্যে সেই মণিপ্রাচীরের সন্দেহ-হীন চিহ্ন। তবুও, সম্মুখে এক গ্রামবাসীকে দেখে প্রশ্ন করি, এ-পথ কি নামচে যায়?

প্রশ্নের ভাষা না বুঝলেও অর্থ বোঝে। ঘাড় নেড়ে জানায়, হাঁ, নামচে—নামচে।

নিঃসন্দেহে আরও এগিয়ে চলি। নদীর তীরে দৃষ্টি রাখি। জলের ধারে বড় বড় পাথর, কোথাও বা একটুকরো খোলা জমি, গাছের ছায়া,—পথক্লান্ত পথিকের ক্ষণিক বিশ্রামের জন্যেই সযত্নে যেন আসন পাতা। প্রলুব্ধ নয়নে তাকাই। এই বুঝি গিরমিদের হাসিখুশি মুখ-গুলি দেখা যায়। ঐ তো ওদিকে গাছ-গুলির আড়ালে কারা যেন নড়ে চড়ে। দুর্ভাবনা কাটে। উৎসাহবশে সবেগেই চলি। পায়ের ছেঁড়া জুতো আরও ছেঁড়ে। এগিয়ে গিয়ে নিরাশ হই। কোথায় গিরমির দলবল? অপরিচিত মুখ। জিজ্ঞাসা করি, পোর্টারদের যেতে দেখেছ কিনা।—ঘাড় নেড়ে বলে, না। এই ত' নামচের পথ?—আবার জিজ্ঞাসা করি। জানায়, হাঁ।

তবে আবার কী! চল আরও এগিয়ে। কিন্তু, ওদিকে বেলাও তো বাড়ে। [illegible] করে। তৈরি রান্না পাব, বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা যাবে। কাজ নামচে পৌঁছানো, জুতোর ব্যবস্থাও যা হোক হবে। খাঁড়ার কাঁটা ঘোরে। পায়ের পর পা-ও পড়ে। ঘাটে-গ্রাম ছাড়িয়ে দূরেও আসি। তবু [illegible] পাই না। গেল কোথায়? বললে—ঘাটে-গ্রামে বসা হবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর তাদের দেখা পাই। হাঁ,—ওরাই বটে। কোনই সন্দেহ নেই। [illegible] ঐ ওখানে টামাং। সবই নির্ভুল। তবু পথের উপর স্তম্ভিত হয়ে থেকে দাঁড়াতে হয়। হারানো-সঙ্গীদের পাওয়ার আনন্দ নয় দুর্ভাবনায় মন ভরে ওঠে। কী কাণ্ড! ওরা যে নদীর অপর পারে! মালপত্র পাশে রেখে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। পথ ছেড়ে এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়াই। যথাশক্তি চীৎকার করি। আমার দৃষ্টি-আকর্ষণের নিষ্ফল প্রচেষ্টা। মাত্র [illegible] হাতের ব্যবধান। কিন্তু এ-দুরন্ত পার্বত্য ধারা পার হয়, সাধ্য কার। শুধু, [illegible] উন্মত্ত উচ্ছ্বাস মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠ [illegible] রুদ্ধ। [illegible] কোনই স্বর ফোটে না। অগত্যা পাগলের মত হাত নাড়ি, ছোট ছোট পাথর তুলে জলে ছুঁড়ি। মনে পড়ে কলকাতার লিলি-পুটিয়ানদের ময়দানে গ্যালিভারের [illegible] ভাঙ নোর প্রহসন।

আমার চেষ্টার ফলে নয়, ভাগ্যক্রমেই গিরমির অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ে এইদিকে। আমাকে দেখা ত নয়, এ-যেন মাথায় তার বাজ পড়ে। আর-সবাইকে তখনি ডাকে। আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। কর্ম-ব্যস্ত সচল লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এপারে আমি। ওপারে ওরা। মাঝখানে দুধ-কোশির মায়া-মমতাহীন দুস্তর প্রবাহ। যে তরঙ্গিনী তার সৌন্দর্য-সম্ভার নিয়ে ক্ষণিক আগেই মনে আনন্দের দীপ জ্বালে, এখন মনে হয়, তার স্রোতের উচ্ছ্বাসে যেন খলখল হাসির নিষ্ঠুর ধ্বনি!

ভাবি, প্রকৃতির রূপ-দর্শনে আনন্দ-উপভোগ, সে যেন দর্পণে-দেখা মানুষ-মনের ছায়া। মায়াবস্তু এক খেলা।

মনে অদ্ভুত ভাব জাগে। ভাবনা ত আছেই। বিরাগ ও রাগের কালো মুখও এই সুযোগে উঁকি মারতে চায়, দমিয়ে রাখি। কৌতুকময় হাসিও পায়। ইসারা করে গিরমিকে দেখাই, নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে যাব নাকি?

ওরা ভয় পায়, তাই-ই বুঝি বা করি। সবাই একসঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে সতর্ক করে, হাত নেড়ে দেখায়,—না, না, না!

গিরমি ইসারা করে বোঝায়, আবার ঘাটে-গ্রামে ফিরে গিয়ে পুল পার হয়ে তাদের কাছে যেন যাই।

ওভাবে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। জড় প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করে ঐ নদীর ধারারই মতন সময় নিস্পৃহভাবে বয়ে যায়। অতএব, যা করণীয়, তখনি মন-স্থির করি।

ভাবি, ঘাটে-গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক এগিয়ে এসেছি। আবার সেখানে ফিরে ওপারে আরও মাইল দেড়েক যাওয়া ওদের কাছে—অর্থাৎ তিন মাইল এখনই আরও হাঁটা। ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার এই তিন মাইল ফিরে এসে নামচের এই পথই ধরা। বেলা দশটা বাজে। সময়ও অনেকক্ষণ যাবে, ছ' মাইল অতিরিক্ত হাঁটাও হবে। ছেঁড়া জুতোর প্রতিবন্ধকতা ত রয়েছেই। থাক বরং আমার এ-বেলার খাওয়ার পাট। এগিয়ে যাই যেমন চলেছি ধীরে ধীরে এই পথে। ওরা গিয়ে বসল কেন ওপারে অতো দূরে গিয়ে? যখন ভয় ওরাই জোরে হেঁটে এসে ধরে ফেলবে আমাকে।

হাতের ইসারা করে সেই [illegible] মর্ম গিরমিকে বোঝাই—আমি এগিয়ে চলেছি এই পথ ধরেই তোমরা খাওয়া সেরে চলে এস তাড়াতাড়ি।

পথে উঠে এসে দাঁড়াই। তাকিয়ে দেখি, তারা তখনও একদৃষ্টে আমাকে

দিকে তাকিয়ে মাস্টারজী বলেন, এ হোল ডাকপিয়ন, এও নামচে চলেছে। এখনি রওনা হবে। আপনি এর সঙ্গে যেতে পারেন।

ভাবি, অলক্ষ্যে বসে কে খেলা করেন, কি জানি। সমস্যাও আসে, সমাধানও হয়। পিয়নের সঙ্গ নিই। মাস্টারজীকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাত্রা করি।

এবার নিশ্চিন্ত মনে পা ফেলে চলি। হেঁড়া জুতোটা শুধু আপাততঃ ভাবায়। আশ্চর্য মানুষের মন। সেই একই পথ। একটু আগে মনে ভাবনা তোলে। এখন ঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ আনে।

পিয়নের নাম গণেশ বাহাদুর। ভাবি, এখানেও কার্তিক-গণেশের প্রভাব। আর্য সভ্যতার কি সুদূর বিস্তার। কিন্তু গণেশের সঙ্গে আলাপ জমে না। অল্পই হিন্দী জানে। বছর পঁচিশ বয়স। জোয়ান ছেলে। নীচের গ্রামে ঘর। সুর্কিয়া থেকে সেও আজ যাত্রা করেছে। আজই নামচে পৌঁছবে। বলে, চলুন, আপনিও পৌঁছে যাবেন। পথে আবার রাত কাটাবেন কেন? জুতোর দুরবস্থা দেখাই। বলি, তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব হবে না। সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তুমি বরং পরে জোরে হেঁটে এগিয়ে যেও। সে খুসি মনেই রাজি হয়।

পথ আবার পাহাড় থেকে নামতে থাকে। মাইল দুই যাবার পর আবার একটা বড় ঝরনা। তারই নিকটে পাহাড় ধ্বসে পথ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। সেইখানে গণেশ বাহাদুর দাঁড়ায়। ডান-দিকে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পাকদণ্ডী পথ নীচে নদীর পানে নেমে যায়। দেখিয়ে বলে, এই পথ দিয়েই ওরা আসবে। এরই নীচে নদীর ওপর নতুন পুল তৈরি হচ্ছে। এখান থেকে দেখা যায় না।

ভাবি, ভাগ্যে সঙ্গে ছিলে! না-হলে এ-জায়গা চিনতাম কি করে? তখনি মনে হয়, গিরুমিরা এরই মধ্যে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে?

গণেশ বাহাদুরকে বলতে হয় না। তার মনেও সেই একই প্রশ্ন ওঠে। যে শ্রমিক দল রাস্তা মেরামতের কাজ করছিল, তাদের কাছে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে এসে জানায়, নাঃ। এখনও মোট নিয়ে কোন শেরপারা এখান দিয়ে যায় নি। আমার মতে, এইখানে অপেক্ষা করাই ভাল। নিকটে জল। গাছের ছায়াও। রান্নার সুবিধা হবে।

তাই করা হয়। আধ ঘণ্টার উপর কেটেও যায়। তবুও গিরুমিদের দেখা নেই। ভাবি, এত দেরীর কারণ কি? খাওয়া-দাওয়া সেরেই আসছে হয়ত। কিন্তু গণেশ বাহাদুরকে আর আটকে রাখাও ত ঠিক হবে না, যাবে সেই নামচেতে। অথচ, গিরুমিদের দেখা পাওয়ার আগে তাকে ছাড়াও কি ঠিক হবে?

তাই বলি, চল, আমরা এগুতে থাকি। আমার খাওয়া না-হয় এবেলা নাই হোক। এ লোকগুলিকে বলে যাও, আমরা যে এগিয়ে গেছি তারা এলে যেন জানিয়ে দেয়।

গণেশ বাহাদুর বলে, ভাল কথাই। আরও খানিক এগিয়ে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেইখানে বসবেন। আর ইচ্ছা হয়ত আজ রাতও সেখানে কাটাতে পারেন।

অতএব আবার পথ চলা। তবে সোজা পথ। চলার কষ্ট নেই। গ্রামে পৌঁছাই। নাম শুনি, বেনকোর। ৮,৯০০ ফুট। খান পাঁচ ছয় মাত্র ঘর। পথ ছাড়িয়ে অল্প দূরে ক্ষেতের পাশে একটা বাড়ীতে গণেশ নিয়ে যায়। এক শেরপা মহিলার সঙ্গে কথা বলে। আলু ছাড়া আর কোন কিছু খাদ্য তাঁর কাছে নেই। তাই আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারেন। বলি, চল, রাস্তার ধারে গিয়ে বসি, আলু-পোড়া খেতে গিয়ে ওদিকে গিরুমিরা না এগিয়ে যায়।

পথের পাশে পাথরের পাঁচিলের উপরে বসি। ভাবি, পথে বসাই বটে। সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায় এক গেলাস চা ও রাতের রাখা একখানা রুটি খাওয়া। তখন ত জানি, নটার মধ্যেই আবার অন্ন জুটবে। সাড়ে-নটায় সেইমত পৌঁছেও যাই। কিন্তু কোথায় কি? এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। কখন ওরা পৌঁছবে, কখনই বা রাঁধবে?

বসে বসে এই সব ভাবনাই জাগে। আবার মনকে নিজেই প্রবোধ দিই, যা হবার হবেই, মিথ্যে ভাবা কেন? তোমার হেঁটে আসার কথা, তাই এসেছ। এখন ওদের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার, তাই করছ।

বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না। গিরুমিরা এসে যায়। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে। পাশ দিয়েই। আমি যে পথের পাশে বসে,—এমন যে ছাড়াছাড়ি ঘটে গেল, অকারণ সময়ের অপচয়ও হোল, এ-সবে যেন তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। কেন যে এমন ঘটল তার কৈফিয়তেরও যেন প্রশ্ন নেই। যেমন অন্যদিনও হাসিগল্পে মেতে পাশ কাটিয়ে চলে, আজও তেমনি যায়। অঘটন কিছুই যেন ঘটে নি। আমিও কথা না বলে পিছু নিই। কি হবে অযথা বাক্যব্যয়ে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু একী! এরা যে গ্রামও ছাড়িয়ে চলে! আজ কি রান্নার পাট বন্ধ? বাধ্য হয়ে এবার জিজ্ঞাসাই করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে গিরুমি জানায়, একটু এগিয়ে নদীর ধারে ভাল জায়গা।

প্রকৃতই তাই। বিশ্রামস্থান নির্বাচনে গিরুমি পাকা জহুরী। কয়হাত দূরে নদীর ধারা। চারদিকে বড় বড় পথ। তিন-চারটে বড় গাছ। স্নিগ্ধ ছায়া। আশপাশে ছোট চারাগাছের জঙ্গল। তারই মাঝখানে এক টুকরা খালি জমি। যেন, চারাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পথের নিকটে। অথচ, পথ থেকে দেখা যায় না। যেন গোপন করে রাখা নিভৃতর প্রশান্তি। একটা ছোট ঝরনাই শুধু এই শান্ত সুন্দর স্থান-টুকুর খবর পেয়ে পাশ দিয়ে নেমে যায়, অদূরে নদীর ধারার মেলে। দেখেই প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে। সকালের পথচলার বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে যায়। মানুষের ভয়, ভাবনা কতোই না তুচ্ছ, অলীক মনে হয়।

সেইখানে গাছের ছায়ায় একটা মসৃণ পাথরের উপর আরামে দেহ এলিয়ে দিই। গণেশ বাহাদুরকে ডেকে বলি, এখনি চলে যেও না যেন। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাক, তারপর তুমি এগিয়ে যাও। রান্না এখনি তৈরি হয়ে যাবে। কি বল গিরুমি?

গণেশ বলে, ঠিক আছে। গিরুমিদের সঙ্গে সেও কাজে লেগে যায়। আমিই কেবল অলসশয়নে মনের আনন্দে তাকিয়ে থাকি নদীর স্রোতের দিকে। কানের কাছে মৃদুস্বরে গান শুনায় ঝরনার কুলুকুলু কলধ্বনি।

আধ ঘণ্টা পর। শিলাশয্যা ছেড়ে উঠি। পথ দিয়ে অল্প এগিয়ে নদীর জলের ধারে নামি। সম্মুখে নদীর উপর পুল। দেখি, পথ দুধকোশির অপর পারে যায়। তারপর বাঁ দিক বেঁকে আবার নদীর তীর ধরে। জলস্পর্শ করি। তুষার-শীতল ধারা। হবারই ত কথা। এভারেস্টের অঙ্গ-নিঃসৃত তরঙ্গিনী। চরণামৃতের মত পান করি, মাথায় ছিটাই।

বিশ্রামের পর দেহের উত্তাপ কমে। জলে নেমে অবগাহন স্নানের আগ্রহও হয়। মুখ হাত ধুয়ে ফিরে আসি। আহারও প্রস্তুত। গণেশ বাহাদুরকে ডাকি। সঙ্গে এসেছি, একই সঙ্গে আহারেও বসা যাক। কিন্তু কোথায় গণেশ বাহাদুর? গিরুমি জানায়, আপনি যখন শুয়ে ছিলেন, সেই সময়ে দুজন সঙ্গী পাওয়ায় সে নামচের পথে এগিয়ে গেছে।

ভাবি, না জানিয়েই চলে গেল? মনটা খারাপ লাগে। খেয়ে ত গেলই না। ভেবেছিলাম, কিছু বকশিশ দেব, তারও সুযোগ দিল না। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য কোনও প্রত্যাশাই রাখে না। যেমন হঠাৎ তাকে পাওয়া, তেমনি হঠাৎ-ই হারানো। আকাশে ভেসে-যাওয়া একখণ্ড মেঘেরই মত। রৌদ্রতপ্ত দেহে ক্ষণিক ছায়া ফেলে আবার হঠাৎ-ই মিলায়।

১টা ১৫ মিনিট। আবার পথচলা। গিরুমিকে বলি, জুতোর অবস্থা দেখ। খুব ধীরে ধীরে যাব। তোমরাও একই সঙ্গে চল। আবার সকালের মত ছাড়া-ছাড়ি না হয়! —বলে হাসি।

সে বলে, ঠিক আছে। এখন মাইল দুই মাত্র যাওয়া। জোরশালা গ্রামে আজ রাত কাটানো। কাল সকালেই নামচে পৌঁছানো।

দুমাইল। বাঃ! তা হলে তো কিছুই নয়। পথও তেমনি সহজ, সুন্দর। এ-যেন বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে আসা। হয়ত হঠাৎ পাহাড়ের গা থেকে

সমান্য চড়াই, আবার তখনি নেমে-আসা নদীর কিনারায়। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝরনা। কখনও বা বনের মধ্যে প্রবেশ। আবার অল্প যেতেই ক্ষেতের ভূমি, ছোট ছোট গ্রাম।

চলি মনের আনন্দে। জুতার ছেঁড়া অংশ এই সুযোগে বাড়তেও থাকে। ভাবি, যা হবার হবে, ও-নিয়ে আর ভাবব না। প্রায় দু'মাইল এসে যাই। দুধ-কোশির উপর পুল। অপর পারে জোর-শালা গ্রামও দেখা যায়। পুল পার হয়ে রাস্তা ডানদিকে যায়। গ্রামের দিক থেকে একদল যাত্রী আসে। প্রথমেই এক বিদেশী। পিছনে এক নেপালী অফিসার। এক শেরপা গাইডও। গটমট করে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। আমি একটু এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাই। দেখি, পুলের কাছে গিরমি সেই শেরপা গাইড-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলে। তাকে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে। পরিচয় করিয়ে দেয়, এ আমাদের প্রসিদ্ধ শেরপা, সর্দার,—মিংমা সেরিং, অনেক বড় বড় অভিযানে গেছে। সাহেব হোলেন, হিলারী সাহেবের দেশের লোক, নিউজিল্যাণ্ডের। ওঁর সঙ্গে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে চলেছেন।

আলাপ করে আমি গ্রামের দিকে এগিয়ে যাই, গিরমি গল্প জুড়ে দেয় মিংমার সঙ্গে। তা দিক। আস্তানায় ত পৌঁছে গেছি।

জোরশালা। ৯,২০০ ফুট। নদীর উপরেই গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যাই, গিরমিরা আসুক, কোন ঘরে আশ্রয় নেয়, কি জানি। নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করি। ভাবতেই পারি না, অলক্ষ্যে আবার অশান্তির মেঘ জমে।

গিরমিরা আসে। এসেই জানায়, এখন বেলা ২টা ১৫ মাত্র। আমরা আজই নামচে পৌঁছে যাব। ঘণ্টা দুই-ও লাগবে না। —বলেই হন্ হন্ করে চলতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে পিছু পিছু চলি: আপত্তি না জানিয়ে উপায় থাকে না। জুতার অন্তিম দশা দেখাই। বলি, এ-অবস্থায় আমার পক্ষে তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব নয়, আর অতো হুড়োহুড়ি করে যাবার প্রয়োজনই বা কী? আজ ত নামচে পৌঁছানোর কথাই ছিল না। গত তিনদিন ধরেই দেড় দিনের পথ একদিনে আসা গেছে। দিন-হিসেবে আমরা ত এগিয়ে আছি। কাল সকালে ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। কথা শুনে গিরমিরা খুশী হয় না। না হওয়ার কারণও বুঝতে পারি, ঘরের এত কাছাকাছি পৌঁছে, কেন আবার দোরগোড়ায় রাত-কাটানো? ঐ তো মিংমারা এখনি নামচে থেকেই নেমে এল।

তা হোক। আমি রাজি হই না। হয়ত ধীরে ধীরে পৌঁছতে আমার রাতই হয়ে যাবে।

অগত্যা এখানে রাত কাটানোর ব্যবস্থা তাদের করতেই হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে রাস্তার ওপর কাঠ দিয়ে তৈরি একখানা লম্বা ঘর। তাই দেখিয়ে বলে, এইখানে তা হলে থাকতে হবে।

দেখি, ঘরে কোন দরজা নেই, সামনে রাস্তার দিকে খোলা। মেঝেতে পাতা তক্তাগুলি ও দেওয়ালের কাঠ ফাঁক ফাঁক। নীচে থেকে ঠাণ্ডা ওঠে, পাশ দিয়ে হাওয়ার স্রোত বয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, নতুন ঘর কেউ তোলে। কাজ এখনও শেষ হয় নি।

ঘরের মধ্যেই একপাশে স্তূপাকার তক্তা জড় করা।

হেসে বলি, ঠিক আছে। আপত্তি কি? —ভাবি, গাছতলা হলেও ক্ষতি ছিল কি?

ঘরে ঢুকে একপাশে শয্যা পেতে গুছিয়ে বসি। আর একপাশে গিরমিরা মালপত্র নামিয়ে খুলতে থাকে। দুমদাম শব্দ করে জিনিসগুলো ফেলা, টেনে হিঁচড়ে বাঁধনগুলো খোলা, গম্ভীর মুখের হাবভাব—তাদের মনের ঘোর আপত্তি ও গভীর বিরক্তি ঘোষণা করে। আমি বসে বসে দেখতে থাকি। নজর পড়ে, টামাং পোর্টারটির উপর। সে-ই শুধু সহজ স্বাভাবিকভাবে তার ভারী বোঝা একধারে নামায়। বোঝার গায়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। একটু দম নেয়। গিরমিদের দিকে তাকিয়ে দেখে। আমার পানেও মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কি দেখে কি ভাবে—সে-ই জানে। তারপর সজোরে নিশ্বাস ফেলে যেন দেহের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। আপন মনে নিঃশব্দে তার দৈনন্দিন কাজ শুরু করে। বালতি নেয়। নদী থেকে জল আনতে চলে। খালি পা। ছেঁড়া জামা। দৈন্যের প্রতিমূর্তি। অথচ হাবভাবে চালচলনে অতি ধীর অনুদ্বিগ্ন ভাব। আপন কাজ করতে আসা তাই-ই নিয়ে থাকা। কারও সঙ্গে কথা বলার বা হাস্য-পরিহাসের আমোদের অপেক্ষাও রাখে না। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন বাতাস বয় দিনের আলো নামে রাতের আঁধার ঘনায়

জেনারেলের বই

॥ গল্প/উপন্যাস/ভ্রমণরচনা ॥

● দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়
ছৈতাদিনের ঝরা পাতার পথে ৬·০০
দিনগুলি মোর কোথায় গেল ৬·০০
এতটুকু ভুল ৩·০০

● বোম্মানা বিশ্বনাথম্
ভারতীয় গল্পসংকলন ৪·০০

● চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ফুলমণি ও করুণা ৫·০০

● ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ৩·০০

● অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চার্লি চ্যাপলিন ৩·০০

● জনার্দন চক্রবর্তী
স্মৃতিভারে ৫·০০

॥ নাটক/গীতিনাট্য ॥

● অমিতা রায়
ছুটির খেলা ২·০০

● নজরুল ইসলাম
দেবীস্তুতি (৩টি গীতিনাট্য) ৩·০০

॥ ভ্রমণ-সাহিত্য ॥

● অমিতা রায়
চেনাশোনার বাইরে ৫·০০

● রমা সেনগুপ্ত
তুষারের দেশে ৪·০০

● স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
উত্তরাখণ্ড দর্শন ৩·০০

● ঘণ্টাকর্ণ
হিমালয়ের চিঠি (১ম) ৬·০০
ঐ (২য়) ১২·০০

জেনারেলের বই

॥ কাব্য/সঙ্গীত ॥

● মোহিতলাল মজুমদার
বিস্মরণী ৬·০০

● দ্বিজেন্দ্রলালের গানের
দিলীপকুমার রায় কৃত স্বরলিপি
দ্বিজেন্দ্র-গীতি ৮·০০
হাসির গান ৩·০০

● নজরুলের গানের
মিতালি পাঠক কৃত স্বরলিপি
সঙ্গীতাঞ্জলি (৪ খণ্ড) প্রতি খণ্ড ৫·০০

॥ রবীন্দ্র-চর্চা ॥

● প্রমথ চৌধুরী
রবীন্দ্রসঙ্গীত ১২·০০

● প্রবোধচন্দ্র সেন
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ৫·০০

● ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রচর্চা ১০·০০

● ডঃ অমলেন্দু বসু
সাহিত্যলোক ১০·০০

● অমলেন্দু দাশগুপ্ত
কবি রবীন্দ্রনাথ ৩·০০

॥ বিবিধ ॥

● চিত্রিতা দেবী
[illegible] ৫·০০

● দিলীপকুমার রায়
মহর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ১০·০০

● ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি ৬·০০

● ডঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য
কবিতীর্থ কামারপুকুর ১০·০০

(জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত)

জেনারেল বুকস

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

কারও উপেক্ষা না রেখে—এরও দেখি জীবনের ধারা চলে তেমন নিস্পৃহভাবে।

টাম্রাং-এর খালি পা আমার মনে সাহস জাগায়। ভাবি জুতো গেছে যাক আমিও খালি পায়ে যাব।

চা তৈরি হয়। গিরমি দিয়ে যায়। টাম্রাংকে কাছে ডাকি। তাকেও চা দিতে বলি। বিস্কুটও দিই। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে নেয়। কোন কথাবার্তা নয়। নিঃশব্দে দুজনে বসে চা-খাওয়া। সে আড়চোখে তাকায়। তার মনের ভাব জানি না আমার কিন্তু অন্তর তৃপ্তিতে ভরে থাকে।

গিরমি দূরে থেকে দেখে। দোরজের সঙ্গে কি আলোচনা করে। হঠাৎ উঠে আসে। বিছানার পাশে খুলে-রাখা জুতোটা তুলে ভাল করে দেখে। হাতে করে নিয়ে যায়। ব্যাপার কি বুঝি না। ভাবি, ওদের মনোমত প্রোগ্রামে বাধা পড়ায় কি তার টনক নড়ল? কিন্তু, ওর করবার আছেই বা কী! বাবা-মুস্তাফার সন্ধান জানা থাকলে হয়ত হোত!

ওকি ব্যাপার? গিরমি ফিরে আসে আপর আর এক জোড়া বুট হাতে। বলে, দেখুন তো এটায় চলবে কিনা? দোরজের কাছে এটা ছিল সে এখনও ব্যবহার করে নি। আমাদের সঙ্গে আসবার আগে সে এক সাহেবের সঙ্গে অভিযানে যায় ফিরে এসে সাহেব ওকে এটা দেন।

আপনার জুতোর সঙ্গে মেপে দেখলাম একই মাপের।

হাতে নিয়ে দেখি। বাটার বুটেরই মতন। বিলাতী জুতো। সাহেবের ব্যবহার করা হলেও এখনও ভালই কাজ দেবে। পায়ে দিয়েও দেখি ঠিকই হয়। ভাবি ভাগ্যের পরিহাস! যতক্ষণ জুতা-ভাবনায় মন উৎকণ্ঠিত উপায় মেলে না যেই নির্ভয়ে খালি-পায়ে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিই অমনি জুতোর সহজ সমস্যা মেটে।

জিজ্ঞাসা করি দাম কতো চায়? গিরমি বলে যা খুসি দেবেন। দোরজে চোদ্দ টাকা বলছে।

দোরজে ও-পাশে মিটিমিটি চায়। বেলুনের মত গোল মুখে তোবড়ান হাসি। ঘাড় নেড়ে ইসারা করে নিয়ে নাও—নিয়ে নাও!—দেখে মনে হয় অপরের আপদে সাহায্য করতে উন্মুখ মুখেও তাই আনন্দের প্রকাশ।

জুতা-পায়ে গিরমিকে হেসে বলি চল, এখনি আবার নামচে রওনা হতে পারি।—সে-ও হাসে।

কিন্তু নাটকের এইখানেই যবনিকা-পতন নয়। পরের অঙ্কও থাকে।

খাওয়া-দাওয়া সারি। শোবার জন্য প্রস্তুত হই। গিরমি এসে আর এক সংবাদ জানায়। চিনির ভাণ্ডার নিঃশেষ। সেকী! আশ্চর্য হই। সঙ্গে গিরমির ও আমার অংশটা ত ছিলই আরও তিন-জনের মত অতিরিক্ত এসেছিল। অতো চিনি! এখনও যাত্রা শেষ হতে সপ্তাহ-খানেক বাকি। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

ব্যাপারটা তখনি বুঝতে পারি। এক-কদিন পথে দোরজেদেরও চায়ের যে পাট বসেছে হরদম— আমারই চোখের সামনে— এই চিনিই খরচ হয়েছে। যদিও তা হবার মোটেই কথা নয়।

ভাবি কি হবে এখন এ-কথা তুলে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন কেন আর মিথ্যা অশান্তি টেনে আনা? দোষটা তো আমারই। কখনও ও-সব দিকে নজরও রাখি নি। রাখার কথাও ভাবি নি। আপন মনে নিশ্চিন্তভাবে চলে এসেছি। সে-আনন্দ ভোগের দাম দিতে হবে ত! গিরমি দরাজ মনে সঙ্গী-দের খাইয়েছে। খাইয়েছে খাওয়াক। একটু হিসাব করে দান করলেই পারত। যাক ও নিয়ে এখন আর অনুশোচনা নয়।

নিস্পৃহভাবেই বলি, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে গেছে। উপায় কি? বাকি কদিন চা-কফিতে চিনি খাব না। আমার তাতে কোনই অসুবিধে হবে না।

গিরমি দেখি তৈরি হয়েই এসেছে। উপায়ও তখন বলে দোরজের কাছে কিছু চিনি আছে। চার টাকা পেলেই দিতে রাজি। তাতেই বাকি দিন চলে যাবে। তাই নেব কি?

বলব আর কি? বলি নাও।—দোরজের দিকে তাকাই। সেই মিটিমিটে চাহনি, খুশী-খুশী ভাব। এবার কিন্তু দেখে আমার মনে হয় হাসিটা শয়তানী!

রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। কুঠাত দূরেই গিরমিদের বিছানা। শুয়ে শুয়ে তাদের সেই অনর্গল গল্প থেকে-থেকে হাসি। কিছুক্ষণ সহ্য করি। তারপর বাধ্য হয়ে বলতে হয় গিরমি রাতটুকু ঘুমুতে দাও। কাল আবার দিনভোর হাসি-গল্প কোরো।

অন্ধকার ঘর নিঃশব্দ হয়। আমারও গভীর ঘুমে রাত পোহায়।

১১ই অকটোবর। শেষরাতে চোখ মেলতেই দরজাশূন্য কাঠের ঘরের বাইরে দৃষ্টি পড়ে। তরল অন্ধকার। নির্মল আকাশে ম্লানমুখী তারার বিদায়-চাহনি। স্বচ্ছ সুনীল উষার আভা রেশমী উত্তরীয়ের মত কালো পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে। নেপথ্যে দুধকোশির ধাবার বিরামহীন কলকল গীতিধ্বনি। হঠাৎ মনে পড়ে বহুদিন আগেকার কথা। কল-কাতা সহর। সারারাত জেগে সঙ্গীত জলসায় গান শোনার আনন্দ। সিনেমার প্রকাণ্ড হল। চারিদিক বন্ধ। সহরের মধ্যে সে যেন এক ভিন্ন জগৎ। যেন সুখস্বপ্নঘোরে রাত কাটে। হঠাৎ কোথায় কে হল-এর একটা দরজা খোলে। অমনি চোখে পড়ে বাইরে দিনে আলো ফোটে ঘরের ভিতর তখনও চলে রাত্রিব্যাপী জলসার সর্বশেষ প্রভাতী সঙ্গীত— পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের জলদ গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠে ভৈরো রাগিনীতে শান্ত সুকরুণ সুরের খেলা। যেন অনাদি কাল থেকে অনন্তলোকের আলোক পানে চলতে থাকে সুরের পাখনা মেলে।

ভাবি, আমার হিমালয়-বাস,—দুধ-কোশির ঐ সঙ্গীতধ্বনি—এও যেন সেই আনন্দ-মজলিশেরই আর এক বৈঠক। একই অসীম সাগরের আর এক লহরী।

তখনি মনে আসে আজই না পৌঁছুব নামচে বাজারে। সেই নামচে-থিয়াংবোচি। এভারেস্ট অভিযানের বই-এ পড়া অতি-পরিচিত নামগুলি,—যেন, স্বপনলোকের মায়াপুরী। আজই দেখব আপন চোখে? চলে এলাম পথের শেষে?

শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হই। গিরমিদের ডেকে তুলি। তারাও সোৎসাহে তৈরি হয়। চা-রুটি খেয়ে রওনা হই—৫-৪৫-এ।

দুধকোশির পাশ দিয়েই সোজা পথ। পথ ও নদী যেন হাত-ধরাধরি করে চলে। নদীর দুই কূলের গিরিশ্রেণীও যেন তাই দেখে ঈর্ষাভরে মিলতে চায়। দুদিক থেকে ঝুঁকে আসে। নদীর প্রবাহ বাধা সৃষ্টি করে বয়ে চলে—সঙ্কীর্ণ গিরি-খাতে। দুধকোশির এই-ই বহুখ্যাত সুগভীর গিরিসঙ্কট পথ। মাথার উপর নীল ফিতার মত শুধু এক টুকরা আকাশ দেখা যায়। দুহাত দিয়ে পাহাড় যেন পথিকের দুচোখ চেপে সূর্যের দৃষ্টি বন্ধ রাখে। পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর তীরে

নেমে আসে দল বেঁধে দীর্ঘতনু ঋজু, সরলদ্রুম—পাইনের সারি। পথ ও নদীকে অজস্র আশ্রয় দেয়। নদীর বুকে ও আশ-পাশে বিভিন্ন আকার ও বিচিত্র রঙের উপলরাশি। নিম্নগতি নদীর স্রোতে উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ। এপারের পথ সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে যেন নদীর কোলে ওঠে। সুন্দর নূতন সেতু। ওপারে খানিক গিয়ে আবার আর এক পুলে এপারে ফেরে। ওপার-এপার—নদী ও পথ—পাইনের সারি—পাথরের মেলা—প্রকৃতির সে-এক বিচিত্র খেলা। তাই দেখেই যেন পাহাড়ের রুদ্ধ দুয়ার ভেঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধেয়ে নামে নবীন আর এক নদী। দুধকোশির সঙ্গে মিলন ঘটে। নাম শুনি -ভোটে কোশি। মনে পড়ে, এই একই নামের অপর আর এক নদী পেরিয়েছি কিরানটিচাপ ছাড়িয়ে এসে। পাহাড়ী ভাষায় তিব্বতের নাম ভোট। মাইল পঁচিশ দূরে তিব্বত সীমান্তে নাংপা পাশ-এ এই নদীর উৎপত্তি। তাই হয়ত ভোটে-কোশি নামকরণ। শেরপাদের থামি গ্রাম এই নদীর কিছু উপরে। ৯,৩০০ ফুট উঁচুতে দুধকোশি ও ভোটে-কোশির সংগম। সংগমের কাছেই খানিকটা সমতল ভূমি। তাঁবু ফেলে থাকবার চমৎকার জায়গা। নিকটে দুই নদীর উপর কাঠের পুল। গিরমি বলে দু-বছর আগে—১৯৬৪ সালে—এ দুটো তৈরি। এডমন্ড হিলারী সাহেবের করানো।

শেরপা তেনজিং-এর সঙ্গে সেই প্রথম এভারেস্ট-দুর্গ বিজয়ী হিলারী। আজই তো প্রথম এই পথ থেকে দেখা পাবার কথা—মাউন্ট এভারেস্ট। ঠিক তারই পূর্বে নদী পারাপারের সুবিধার জন্য হিলারীর করে-দেওয়া যেন স্বাগত-চিহ্ন। এ-যেন মন্দির-সিংহদ্বারে এসে পূজারীর নামের ফলক-দেখা।

গিরমি জানায় খুম্বু-অঞ্চল আরম্ভ এই দুই নদীর সংযোগস্থল থেকে। এই-বারই প্রবেশ করা প্রকৃত শেরপাদের নিভৃততম রাজ্যে।

মনে পড়ে, কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জি ম্যাপে দেখিয়েছিলেন দুধকোশি ও ভোটে-কোশির বাহু বেষ্টনের মধ্যে যে ত্রিকোণ পার্বত্য হিমাঞ্চল তাই খুম্বু। এইখানেই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গিরিশিখর এভারেস্টের খাস দরবার উপগিরির অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজদর্পে তাঁর শৈলসাম্রাজ্য চালান।

হিমালয়ের এই অংশের নাম মহালঙ্গুর-হিমল হয় কেন কে জানি। দীর্ঘ-লাঙ্গুল হনুমানদের বাসভূমি নাকি? তারাই কি একালের ইয়েতি—তুষার-মানব?

নদীর ওপারে গিয়ে খাড়া চড়াই। হোলই বা তাই। চড়াই-ওঠার অবসাদের আর অবকাশই নাই। পায়েও এখন মজবুত জুতা। মনের আনন্দে উঠতে থাকি। দুপাশে পাইন-এর বন। পাইনের মধ্যে সুগা ও পাইন ফার-ও দেখা দেয়। ভূর্জপত্র-বার্চ-এর বনও আসে। এ-যেন গিরিরাজ্যের ঊর্ধ্ব-এলাকার সব দূত—সাদরে এগিয়ে এসে জানায় আর কি পৌঁছে গেলে আমাদের দেশে!

মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এভারেস্ট দেখার আগ্রহে। গিরমিকে বলি, যেই দেখা যাবে, বোলো যেন তখনি।

কিন্তু কোথায় সেই তুষার-কিরীট গিরিরাজ? যে-পাহাড়ের গা বেয়ে উঠি, তারই বিশাল দেহ দৃষ্টির অবরোধ ঘটায়। ভাবি গিরিখাতের নিম্নদেশ ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় না পৌঁছলে দেখাই বা সম্ভব কি করে? প্রায় হাজার-খানেক ফুট উঠে আসি। এক ঘন্টা কাটে। পাহাড়ের মাথা এখনও বহু ঊর্ধ্বে। হঠাৎ গিরমি ডেকে বলে, এবার আসুন এই-দিকে এভারেস্ট দেখাই।

পথ ছেড়ে ডানদিকে বনের মধ্যে নিয়ে চলে। সামান্য এগিয়ে যাবার পর এই পাহাড়ের একটা কাঁধের ধারে আসি। সামনে পাহাড়ের অপরদিকের ঢাল নীচে নামে। দূরে দুধকোশির উপত্যকা। তারপরই তুষার-শিখরাবলীর দীর্ঘ প্রাকারের খানিক অংশ। সেই বিশাল গিরিপ্রাচীরের পিছন থেকে একটা চূড়া উঁকি মারে,—গিরমি তাই দেখিয়ে বলে, ঐ-ই এভারেস্ট।

প্রথম দর্শনে মনে পুলক জাগে ঠিকই। কিন্তু, মন ভরে না। ভাবি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর—এত নিকটে এসেও ঐটুকু মাত্র দেখা! কোথায় দেখব, আকাশ-ছোঁয়া বিরাট শিখর, আর এ-যেন জনতার মধ্যে কার মাথার খানিক অংশ দেখা। থিয়াংবোচি পৌঁছে নিশ্চয় আরও ভাল দেখা যাবে। সেখান থেকে কাক-ওড়া-পথে মাত্র তো মাইল দশেক!

নতুন আগ্রহ নিয়ে আবার পথে ফিরে এসে চলতে থাকি। চড়াই শেষ হয়। পাহাড়ের গা দিয়ে সমতল পথ ঘুরে

ঘুরে এগিয়ে যায়। পাইনগুলো কমে আসে। শুধু ধূ ধূ ন্যাড়া পাহাড়। রুক্ষ কর্কশ। যেন ভস্মাবৃত-দেহ নাগা সন্ন্যাসী। মাঝে মাঝে উপর থেকে নেমে-আসা ঝরনা-ধারা। যেন কাঁধ বেয়ে নামে পিঙ্গল জটা।

ধারাগুলির উপর কাঠের পুল। একটা ঝরনার নিকটে জনকয়েক শেরপা মেয়ে পিঠে বোঝা। দেখে ভাবি, কাছেই নামচে হবে। পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই দেখি তাই-ই। সেই ছবিতে-দেখা নামচের কতকালের চেনা মুখ। সামনে অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘুরে-যাওয়া পাহাড়ের গায়ে থাকে-থাকে ঘরবাড়ি। নীরস শুকনো পাহাড়। সাদা সাদা ঘর। কোথাও কালো রং। যেন ডিম-ভরা মৌমাছির চাক। শুধু সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেয় পাহাড়ের পিছনে মাথা তুলে রৌদ্রদীপ্ত তুষার-শিখর,—কোয়াংডে (২০৩০০ ফুট)। নামচেবাজার মাত্র ১১০০০ ফুট উঁচুতে। শেরপাদের মুখে নামচের উচ্চারণ শুনি, নউচে।

গিরমি এগিয়ে এসে বলে, ঐ নউচে—আমাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। খুম্বু-অঞ্চলে ছড়ানো শেরপাদের যত-গুলো গ্রাম, তার যাতায়াতের পথ এই-খানেই মেলে। বাঁদিকে ঐ পাহাড়ের গা ঘুরে যে পথ গেছে দেখছেন—ঐদিকে থামো, থামি, থামোটে তিনটি গ্রাম—একত্র করে বলা হয় থামিচক। ও পথের ওখানেই শেষ নয়। আরও উত্তরে উঠে গিয়ে নাংপাপাশ পার হয়ে চলে যায় তিব্বতে। নউচের ডানদিকে আর একপথ ঐ ওদিকে দুধকোশির ধারে নেমে এগিয়ে যায় এভারেস্টের দিকে। সে-পথে পড়ে থিয়াংবোচি, পাংবোচি, ডাংবোচি গ্রাম-গুলো। আর এই দুইপথের মাঝখানে নউচের বাড়ীগুলোর পেছনে ঐ যে পাহাড় তারই গা বেয়ে আর এক পথ উঠে গেছে দূরে খুন্দে ও খুমজুং গ্রামে। সেখান থেকেও আর এক পথ থিয়াংবোচির রাস্তায় সঙ্গে মেশে। আমরা নউচে ছাড়িয়ে সেই খুমজুং-এর পথ ধরে আজ আরও হাজার দুই ফুট উঠব; তারপর আমাদের গ্রামে গিয়ে ত কদিন থাকবেন এবং দেখবেন এই বরফের রাজ্যে কেমনভাবে আমরা থাকি। শেষে খুমজুং থেকেই যাবেন থিয়াংবোচি দেখতে।

নামচে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি। নামচের পথও শেষ হয়।

এরপর শেরপাদের ও থিয়াংবোচির বিচিত্র কাহিনী অন্যত্র।

শেষ অশ্বারোহী

তারাপদ রায়

জুলাই মাস নাগাদ একটা বর্ষা ভালো করে পেরোবার আগেই যখন পর পর তেরোটা ওয়াইপার চুরি গেলো, সনাতন সরকার স্থির করে ফেললেন, আর গাড়ি নয় এবং সত্যি সত্যিই সাতদিনের মধ্যে জলের দামে গাড়িটা বেচে দিলেন।

গাড়ি বেচে তাঁর বিপদ কিন্তু আরো বাড়লো। থাকেন হাতিবাগানের কাছে। অফিসের সময় সেখান থেকে ট্রামে-বাসে ওঠা যায় না, মিনিবাস কিংবা ট্যাক্সির নাগাল পাওয়া অসম্ভব পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে সনাতনবাবুর, সারাজীবন নিজের গাড়িতে অফিসে যাতায়াত করেছেন এখন এই শেষ বয়েসে নাকালের একশেষ।

দু-একদিন হেঁটে যাতায়াত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ধাক্কায় রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন পনেরো দিন। রোগশয্যায় নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে বসে অবশেষে চিন্তাটা মাথায় এলো তাঁর, 'একটা ঘোড়া কিনলে কিরকম হয়?' সেই কবে ছোটবেলায় পড়েছেন 'হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিম্যাল'—রোগশয্যায় ঘোড়ার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি উত্তেজিত হতে লাগলেন। কত সুবিধে, গ্যারেজের দরকার নেই, প্যাসেজে বেঁধে রাখো, পার্কিং ফি নেই, পেট্রোল-মবিল লাগবে না, একটু ছোলা আর ঘাসজল হলেই হবে, তাও তিনি ঠিক করলেন বিকেলে অফিস থেকে ফিরবার পথে ময়দানে হয়ে একটু ঘাস খাইয়ে আনাও চলবে, এবং সবচেয়ে বড় কথা ঘোড়ার পার্টস চুরি যাওয়ার কোনো ভয় নেই, চুরি গেলে আস্ত ঘোড়াটাই চুরি যেতে পারে, কিন্তু সে প্রায় অসম্ভব, ঘোড়াচোর এখন দেশে আর না থাকাই সম্ভব, অন্ততঃ কলকাতায় তো নেই-ই।

দু-একদিনের মধ্যেই অবশ্য অনিবার্যভাবে পরবর্তী চিন্তা মাথায় এলো তাঁর। প্রথম সমস্যা, ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে? দ্বিতীয় হলো, ঘোড়ার জন্যে লাইসেন্স লাগবে কিনা?

এই দুই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সনাতনবাবু অসুখ ভালো হওয়ার পরে আরো তিন সপ্তাহ ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। প্রথমটির সমাধান তিনি নিজেই করলেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে শেয়ালদা গিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ানদের কাছে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলেন, কাটিহারের কাছে এক হাটে ভালো ঘোড়া পাওয়া যাবে। একজন বুড়ো গাড়োয়ান বললো, দার্জিলিংএ ভালো টাট্টু-ঘোড়া পাওয়া যায়, দামও খুব কম।

কিন্তু দার্জিলিং কিংবা কাটিহার থেকে কে নিয়ে আসবে ঘোড়া? অবশেষে একজন সংপরামর্শ দিলো, এই খিদিরপুরের গোহাটাতেই একবার খোঁজ করে দেখুন না, ভালো ঘোড়া পেয়ে যেতে পারেন হঠাৎ। মোটের উপর, শেয়ালদার সহিস-কোচোয়ান যারা আছে সবাই খুব খাতির করলো সনাতনবাবুকে। বহুদিন তাদের রুজির বাইরের কোনো লোক তাদের কাছে ঘোড়া সম্বন্ধে এত খোঁজখবর করেনি।

সহিসেরা খুব খুশি হলো বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে খুব বিপদ হলো সনাতন সরকার মশায়ের। বিশেষ করে যখন তিনি ঐ দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে ঘোড়ার লাইসেন্স লাগে কি না খোঁজখবর শুরু করলেন, সকলের ধারণা হলো তাঁর সম্পূর্ণ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অনেকেই বললো, 'খুব খারাপ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিলো, আজকাল এরকম খুব হচ্ছে, ব্রেনটা টোটাল ড্যামেজ করে দিয়েছে।' যারা একটু

অচেনা, তারা অবাক হয়ে গেলো, 'কি বললেন, ঘোড়ার লাইসেন্স? ঘোড়ার লাইসেন্স দিয়ে কি করবেন? ঘোড়ার গাড়ি, ভাড়াটে গাড়ি করবেন? নিজে চড়বেন? ঘোড়ায় চড়ে অপিস যাবেন? কোথায় অপিস, এসপ্ল্যানেডে? হাতিবাগান থেকে এসপ্ল্যানেড ঘোড়ায় চড়ে? দৈনিক, দুবেলা?'

একটা সামান্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রশ্নের ঝড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সনাতনবাবু। এবং দু-একদিনের মধ্যে সনাতনবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ঘোড়ায়—অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে কলকাতা শহরের রাস্তায় যাতায়াতের জন্যে ঘোড়া কিংবা তার মালিকের লাইসেন্স লাগে কি না অথবা ঘোড়ার পিঠে যাতায়াতে এই শহরে কোনো বাধানিষেধ আছে কিনা, এই প্রশ্নটি খুব সোজা নয়। এ উত্তর কেউ জানে কিনা তাঁর রীতিমত সন্দেহ হতে লাগলো।

সনাতনবাবু সর্বপ্রথমে লালবাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ডি. সি ট্রাফিকের অপিসে পাঠালেন। ট্রাফিক অপিসে সবাই ধরে নিয়েছিলো তিনি কোনো পাঁচ আইন ভাঙার মামলায় তদ্বিরে এসেছেন, যখন শুনলো, 'ঘোড়া', সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁকে কর্পোরেশন দেখিয়ে দিলেন।

সনাতনবাবু কর্পোরেশনে গেলেন। সেই অপিসটি একটু অন্যরকম, কোথায় অনুসন্ধান করতে হবে সেটা জানতেই তাঁর তিন দিন গেলো। অবশেষে লাইসেন্স সেকশনে যেতে বললেন এক ভদ্রলোক। সেখানে গিয়ে একটু খোঁজ করতেই গো-মহিষ এবং সারমেয় শাখার পাশে অশ্ব-অশ্বতর শাখা খুঁজে পেলেন। সেখানে সবাই বললো, হ্যাঁ, ঘোড়ার লাইসেন্স তাঁরা অনায়াসে দিতে পারেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার লাইসেন্স এ-বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই। এখান থেকে সেরকম কিছু দেয়া হয় না। এখানে নেই এক ভদ্রলোক সনাতনবাবুকে পরামর্শ দিলেন, একবার রেসকোর্সে গিয়ে টার্ফ ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। টার্ফ ক্লাবের লোকেরা বললেন, আমাদের ঘেরা মাঠে ঘোড়দৌড়ের লাইসেন্স আছে। তাঁরা ফাইল খুলে সনাতনবাবুকে সব লাইসেন্স-সার্টিফিকেট দেখালেন। তাঁরা কি ভেবেছিলেন কে জানে, বোধহয় তাঁকে কোনো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের লোক। কর কিংবা লাইসেন্স ফাঁকির ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন বলে ধরে নিয়েছিলেন। খুব ভদ্রতা করলেন, চা-জলখাবার খাওয়ালেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না কলকাতা শহরের রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে যেতে কোনো লাইসেন্স লাগবে কি না?

সনাতনবাবু নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক, তার উপরে বে-আইনী কাজ করতে ভয় পান। বিনা লাইসেন্সে রাস্তায় ঘোড়া চড়া আইনসম্মত কি না এটা তাঁকে জানতেই হবে।

এবার তিনি নিজে থেকেই গেলেন মাউন্টেড পুলিশের দপ্তরে। ওরা তো মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করে, ওরা জানতে পারে। মাউন্টেট পুলিশের দপ্তরে একদিন সন্ধ্যার দিকে সনাতনবাবু উপস্থিত হয়ে হাতের কাছে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট পেয়ে সেই সাহেবকে তাঁর হাতিবাগানী ইংরেজিতে সমস্যাটা যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন। সাহেব চোখ গোল গোল করে সব শুনে কি বুঝলো কে জানে, শুধু একবার জাস্ট ফানি বলে পাশেই একটা নল হাত উঁচু ওয়েলার ঘোড়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল, তার পিঠে সনাতনবাবুকে ঠেলে তুলে দিতে গেলো। সনাতনবাবু কোনো ক্রমে তাঁর হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। একটা সামান্য খবরের জন্য তিনি দিনের পর দিন অপিসে অপিসে, দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন। সবকটা দৈনিক ও

SHEESH MAHAL

আপনার
নাগালের ভেতরেই রয়েছে
কেনা-কাটার
স্বর্গ!

শীশমহলে ঢোকার পর আপনি যে শুধু অলস মন্থরতায় তার বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে বেড়াবেন তা' নয়, তৈরী পোষাক, স্যুটিং, সার্টের কাপড়, শাড়ী, প্রসাধনী, মনোহারী জিনিষ, বই, রেডিও এবং খেলাধুলোর সরঞ্জাম, পুতুল ইত্যাদির ব্যাপক আয়োজন এবং তার নিম্ন মূল্যমান আপনাকে বিস্মিত করবে। এ-ছাড়া রয়েছে আপনার গায়ের মাপ অনুযায়ী তৈরী করে দেবার জন্যে একটি দর্জি বিভাগ, এবং ইচ্ছে করলে আমাদের তৃপ্তিদায়ক স্ন্যাক বারে নিজের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করে নিতেও পারেন ও ছেলেমেয়েদের শিশুদের কিডিজ কর্ণারে আপ্যায়িতও করতে পারেন।

কেনা-কাটায় এত আনন্দ আর কোথায় পাবেন?
শীশমহলের স্মৃতি বহুদিন মনে রাখার মত একটি ঘটনা

SHEESH MAHAL
DEPARTMENTAL STORE
12/1, LINDSAY ST.
CALCUTTA-16
PHONE 24-4727

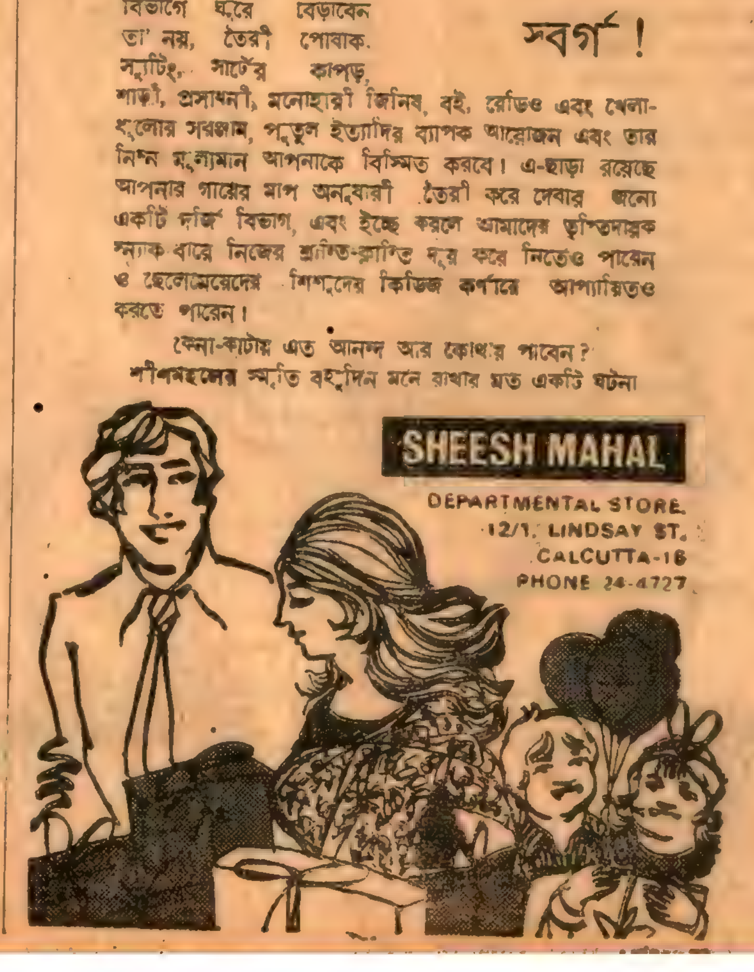

সাপ্তাহিক কাগজে প্রশ্নবোধক চিঠি পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তাঁর চিঠি ছাপালেন না।

বাধ্য হয়ে সনাতনবাবু মুখ্যমন্ত্রী, লাটসাহেব এবং প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি তাঁর সমস্যার দিকে আকর্ষণ করিয়ে পত্র দিলেন। কিছুদিন পরে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে উত্তর এলো; তাঁর আবেদন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর তাঁকে টুরিজম দপ্তরে পাঠালেন। সেখান থেকে খোঁজ করে জানলেন তাঁকে পশুপালন দপ্তরে যেতে হবে, সেখান থেকে বন-বিভাগ, সেখান থেকে কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগ, সেখান থেকে আবার পশু-বিভাগ, তবে এবার পশুপালন নয়, পশু-চিকিৎসা বিভাগ, সনাতনবাবু ক্রমাগত ঘুরতে লাগলেন, আরো দু'মাস ছুটি বাড়িয়ে নিলেন।

এইরকম অনেক ঘাটে জল খেয়ে সনাতনবাবু একদিন পশুক্লেশ নিবারণী সমিতিতে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘোড়াটা কোথায়?' সনাতনবাবু বললেন, 'ঘোড়া এখনো কিনিনি।' তাঁরা তখন বললেন, তাহলে এখন আমাদের কিছু করণীয় নেই। আমাদের এটা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি আপনার খুবই ক্লেশ হয়েছে, কিন্তু আপনার ক্লেশ দূর করার ক্ষমতা আমাদের নেই।' অগত্যা [illegible] দিয়ে সনাতনবাবু চলে এলেন।

এই শেষ ঘটনার পনেরো দিন পরের কথা। ইতিমধ্যে আশ্বিন মাস এসে গেছে। শরতের নীল আকাশে ঝকঝকে আরবি ঘোড়ার মতো সাদা মেঘগুলো গ্রীবা নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইরকম এক সকালবেলায় হঠাৎ হাতিবাগানের লোকেরা দেখলো এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ঘোড়াটি অবশ্য আকাশের মেঘের মত সাদা নয়, বাদামি এবং খুব বড়-ও নয়, তবু তো সত্যিকারের ঘোড়া।

মহাত্মা রাজমোহন মজুমদার
প্রণীত
শ্রীগীতা
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ।
মূল্য প্রতি খণ্ড ১৫·০০
গীতা পরিচয় মূল্য ৪·০০
আর্যশাস্ত্র কার্যালয়
৩৮সি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬, ৩৪-৪৪০৮।

শুধু রাস্তার লোকেরাই নয় জানলা, দরজা, বারান্দায়, ছাদে দাঁড়িয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই সবিস্ময়ে এই অভাবিত দৃশ্য দেখতে লাগলো। কলকাতার জটিল রাস্তায় ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকসা, পদাতিক ইত্যাদির পাশাপাশি কদম চালে এক অশ্বারোহী প্রফুল্ল বদনে চলে যাচ্ছে। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ জিনিসটা বে-আইনী হচ্ছে কিনা বুঝতে না পেরে পকেট থেকে নোটবুক বার করে কি একটা লিখতে গিয়ে খেয়াল করলো ঘোড়ার কোনো নম্বর নেই। [illegible] ট্রাফিক কন্ট্রোল বন্ধ করে দিয়ে অশ্ব এবং অশ্বারোহীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ই এই অশ্বারোহী। [illegible] কি করে ঘোড়া সংগ্রহ করলেন, ঘোড়া এবং কিংবা তার আরোহী অর্থাৎ নিজের জন্যে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা শেষ পর্যন্ত ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাবো না। কারণ সেটা সনাতনবাবুর স্বার্থের বিরোধী হবে।

শুধু এটুকু বলে রাখি, সনাতনবাবু সাহসী লোক। আজ দুদিন হল মাত্র ঘোড়াটি একটি সাময়িক সহিসসহ সংগ্রহ করে এনেছেন। আজ সকালবেলায় সহিস ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। এখন সেও সঙ্গে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু সনাতনবাবু তাকে রেখে একাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে অফিসের দিকে রওনা হয়েছেন। সে কি বলতে চেয়েছিলো সনাতনবাবু তাতে একবিন্দু কর্ণপাত করেননি।

কর্ণপাত করার মত কোনো কারণও দেখা গেলো না। বিবেকানন্দ রোড [illegible] হয়ে সোজা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে কয়েক সহস্র পথচারী এবং [illegible] বিহারী জনতার অভূতপূর্ব [illegible] দিয়ে কলকাতার শেষ অশ্বারোহী এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছালেন।

আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, ধীরে-সুস্থে কার্জন পার্কের পিছন দিক দিয়ে ঘোড়া নিয়ে সনাতনবাবু মেয়ো রোডের এক পাশে একটা ঘাসে-ভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে হাতের ব্যাগ থেকে একটা পাটের দড়ি বার করে ঘোড়াটার গলায় বাঁধলেন. তারপর আরেকটা প্রান্ত বেঁধে দিলেন একটা কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়ির সঙ্গে। এরপর অত্যন্ত সাবধানে, ভয়ে ভয়ে মুখ থেকে লাগামটা ছাড়িয়ে ব্যাগে ভরে নিলেন. ঘোড়াটা আনন্দে পরপর তিনবার হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো।

সনাতনবাবুও খুশি মনে অফিস চলে গেলেন। এতদিনে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তার উপরে পার্কিং ফি লাগছে না।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে মনে একটু শঙ্কা ছিলো, গিয়ে ঘোড়াটা দেখতে পাবেন কিনা। কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পেলেন, ঘোড়াটা গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে পরিচিত ও অপরিচিত মহলে, নানা দিকে সনাতনবাবুর কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। সনাতনবাবু ঘোড়ার কাছে পৌঁছে দেখলেন, ঘোড়ার থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে একটা ছোটখাট জনতা। তারা এতক্ষণ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলো, সনাতনবাবু যেতেই একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো।

কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে অত্যন্ত স্মার্টভাবে সনাতনবাবু ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার আগে হাতের ব্যাগ থেকে লাগামটা বার করে নিয়েছেন। কিন্তু লাগাম পরাতে গিয়ে বুঝলেন, অসম্ভব, সহিস ছাড়া এ-কাজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ঘোড়াটা এমনিতে নিরীহ কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলবে না। আর মুখ না খুললে লাগাম-ও পরানো যাবে না।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সনাতনবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কৌতূহলী জনতাও আস্তে আস্তে কেটে পড়লো, শুধু কয়েকজন তখনো দাঁড়িয়ে। সনাতনবাবু খুব মাথা খাটিয়ে অবশেষে ঘোড়াটার মুখের সামনে আস্তে আস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে ছোট ছোট তুড়ি দিতে লাগলেন। যে কয়েকজন তখনো উপস্থিত ছিলো তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, সনাতনবাবু সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন। তারা কেউ সনাতনবাবুকে বুঝতে পারলো না, সে বুদ্ধিই তাদের নেই। এই আশায় সনাতনবাবু তুড়ি দিয়ে চলেছেন যে তুড়ির শব্দে ঘোড়াটা যদি একবার হাই তোলে সঙ্গে সঙ্গে লাগামটা মুখে গলিয়ে দেবেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ময়দানে ঘন হয়ে এলো। সনাতনবাবুর হাতের বুড়ো আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেলো. আশ্বিন মাসের আকাশের নীচে মেয়ো রোডের কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় কলকাতার শেষ অশ্বারোহী বাঁ হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে অক্লান্ত, অনবরত ঘোড়ার মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে চললেন।

গারো পাহাড়ের ফুলেশ্বরী

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সেবার গাড়োপাহাড়ে জোড়া ভালুক পাওয়া গিয়েছিল। এবারও একটা পেলাম। আর ভালুক শিকারে রুচি ছিল না। বাঘের দেখা পাওয়া যাবে কিনা, জিজ্ঞাসা করতেই রেঞ্জারবাবু বললেন, —গেল বছর তো বেশ বড় বড় বাঘ এসেছিল বলে শুনেছি—তার কি একটাও থেকে যায়নি? খুঁজলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আচ্ছা, মেকংকেই বরং জিজ্ঞেস করে দেখি।

ক্যাম্পে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে দুজনে কথা হচ্ছিল। মেকং ভোরে উঠেই দুধের সন্ধানে বস্তিতে গিয়েছে। দূরে দেখা গেল, একটা ঘটি হাতে নিয়ে মেকং পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে ফিরে আসছে—এসেই বললে—বাবু, এক ঘটি দুধ এক টাকা নিলে।

রেঞ্জারবাবু হেসে বললেন—তা বেশ করেছে। দুধে জল নেই তো?

মেকং-এর চোখ দুটো গোল গোল হয়ে ওঠে —জল দেবে কেমন করে? খাস বাঁট থেকে টেনে নেওয়া দুধ।

সে নুনের মধ্যে আঙুল ডোবাতে গেল। আমি বাধা দিলাম।

—থাক, থাক, এখন বল দেখি, এ জঙ্গলে বাঘ আছে?

—মাল্লাক? হ্যাঁ, তা পারেন বৈকি। তবে এদিকে নয়। উত্তর মুলুকে ধুপ-গিরিপাড়া অঞ্চলে মাল্লাক আনাগোনা করে।

রেঞ্জারবাবু সহাস্যে বললেন, ওই দেখুন, আমাদের মেকং একশোবাঘবতী-ময়। বহুৎ আচ্ছা। তাহলে সেদিকেই চল, আজই রওনা হতে চাই। আমার আবার ছুটি বেশী নেই কিনা—তার উপর ই-এ-সি সাহেব ইনসপেকশনে আসছেন, তাঁর ট্যুর প্রোগ্রামও পেয়েছি।

পথঘাট মেকং-এর নখদর্পণে। তল্পী-তল্পা গুটিয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম। কিছু খাবার তৈরী করে সঙ্গে নেওয়া হল। রঙ্গনাথের মতলব বাঘ শিকারে যেন যাওয়া না হয়। হাচিসনকেও দলে টানবার চেষ্টায় ছিল।

রঙ্গনাথকে সাহস দিলাম,—আরে, বাঘী তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, দুদিন পরে গেলেও চলবে। এসেছি যখন, এক-বার চেষ্টা করতে দোষ কী?

হাচিসনের আপত্তিটা নেহাৎ হাস্যকর। তার সিগারেটের স্টক ফুরিয়েছে, তাই মন-মেজাজ ভাল নেই। আমার ভাণ্ডার থেকে এক কৌটা স্টেট এক্সপ্রেস পেয়েই সে আমার দলে ভিড়ে গেল। শোরগোল তুলে মালপত্র গুছিয়ে রেডী।

পাহাড়ী বন্ধুর পথে আমরা চলেছি। পথে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। অরণ্য-পথে যাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি বাঘ, ভালুক, বুনো হাতীর আক্রমণ বাঁচিয়ে পথ চলতে হয়। গারো কুলিরা তাদের টুকরিতে মালপত্র নিয়ে কপালের সঙ্গে জুড়ির দড়ি এঁটে অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সমতল ভূমিতে এরকম দেখা যায় না, সেখানে বাঁশের বাঁক তৈরী করে দু-পাশে মাল ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট পাহাড়ী নদী পড়ে, সেগুলো পার হতে হয়। যাত্রাপথ মোটের উপর কঠিন এবং ক্লান্তিকর।

একটানা চার ঘণ্টা কাল পথ হেঁটে আমরা ধুপগিরিপাড়া অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। একটা জায়গায় অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়ি।

কী ব্যাপার?

শোনা গেল—গত রাত্রে বাড়ীতে ঢুকে বাঘ একটা গরুর ওপর হামলা করেছিল, নিয়ে যেতে পারেনি। গারো জোয়ানরা হাতে টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে জঙ্গলটা চষে ফেলতে চায়।

আমার মনটাও দুলে উঠল।

রেঞ্জারকে বলি,—আমরাও যোগ দিই, কী বলেন?

—না, এখুনি যাওয়াটা ঠিক হবে না। বাঘ যখন আছে, তখন একটু ধৈর্য ধরে খবরাখবর নিতে হবে। আপাতত কোন সর্দারের বাড়ীতে আস্তানা করা যাক। মেকংও সেই চেষ্টায় আছে।

রঙ্গনাথ হাঁ করে গারোদের দিকে তাকিয়ে ছিল। কয়েকটি যুবতী বিচিত্র পোষাক পরে একপাশে দাঁড়িয়ে জটলা করছে, তার মধ্যে একটি হাস্যমুখরা চটুল দৃষ্টিতে আমাদের দিকেই ভাব-ভঙ্গী করছে। নিটোল দেহ, উচ্ছল যৌবন—রঙ্গনাথ হাঁ করে সেই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে, তার মাথায় একটা টোকা দিলাম—হ্যাংলার মত তাকিয়ে দেখছ কী? চল—

রঙ্গনাথ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—তাই বলে এমন গাঁট্টা মারা উচিত হয়নি তোমার—উঃ আঙুল তো নয়, যেন লোহার রড।

হাচিসন মুচকি হেসে হ্যাভারস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে বললে—টিট ফর ট্যাট!

রেঞ্জার সাহেব মেকং-এর পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সে আসতেই, দু-একটা কথা, তারপরই হুকুম জারি হল—আমরা এই বস্তির মোড়লের বাড়ীতেই আশ্রয় নেব।

তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। মোড়লের বাড়ীতে বাইরের একখানা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। মেকং পানীয় জলের ব্যবস্থা করলে। খাবার সঙ্গেই ছিল। যে যার প্রয়োজন মত খেয়ে নিলে। বাঁশের তৈরী মাচানের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে কোন অসুবিধাই ছিল না।

মেকং একাধারে গাইড, শিকারী এবং আমাদের সুযোগ্য সহকারী।

রেঞ্জার সাহেব ওকে মোটা অংকের বখশিস কবুল করেছিলেন এবং তার উৎসাহটাও মোটামুটি চোখে পড়ার মত।

আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি, কিন্তু মেকং-এর বিশ্রাম নেই। সে তার বন্দুকটা হাতে করে বেরিয়ে গেল। গুলীর বেল্ট নেয়নি, মাত্র দুটো এল জি আর পাঁচটা সট কার্তুজ।

একা একা জঙ্গলে ঢুকে শিকার করা তার অভ্যাস আছে। দু-চারটে বনকুম (ইম্পেরিয়াল প্যাট্রিজ) যদি পাওয়া যায়, তাহলে রাত্রের আহারটা ভালই হবে—এই তার আশা। সে চলে যেতেই আমিও বন্দুকটা হাতে নিয়ে বাইরে একটা কাঁঠাল গাছে হেলান দিয়ে বসলাম।

পর পর দুবার গুলীর আওয়াজ হতেই দাঁড়িয়ে পড়ি। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। তখন বেলা পড়েছে। পড়ন্ত রোদ গাছের মাথায়। জঙ্গলের ভেতরে ক্রমেই অন্ধকার নেমে আসছে।

আমার দারুণ চিন্তা—মেকং-এর কী হল?

জঙ্গলে বাঘ আছে, সে খবর আগেই পেয়েছি। মেকং জঙ্গলে ঢুকেছে—একা—পরপর দুটো গুলীর আওয়াজ। তারপরই সব নিস্তব্ধ!

কী করি ভেবে পাই না। রেঞ্জার সাহেবকে ডেকে তুললাম। সে বললে,

—চিন্তা নেই, মেকং পাকা লোক, সে ঠিক বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে।

আমি কিন্তু তার কথায় আশ্বস্ত হলাম না। হ্যাভারস্যাক খুলে, টর্চ, একটা ছুরি, কিছু গুলী বের করে গুলীর বেল্টে ভরে নিলাম। তারপর বন্দুকটা রেখে আমার ৪৫০।৪০০ রাইফেলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবাইকে বলে দিলাম—আমার পেছু ডেকো না, তোমরা সতর্ক থেকো।

জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। হঠাৎ উপর্যুপরি আবারও তিনটে গুলী। আমি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ি।

তখনও পুরো অন্ধকার হয়নি। জঙ্গলের মধ্যে সরু সরু পথ। তারই একটা পথ দিয়ে মেকং আমার সামনে এসে পড়ল। তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে। একটা বন-মোরগ শিকার করে সে হনুমানের ওপর গুলী চালিয়েছিল। তারপর লতাপাতার দড়ি পাকিয়ে তাই দিয়ে হনুমানটাকে বেঁধে টেনে আনছে। জঙ্গলের মধ্যে সেই সড় সড় শব্দ যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে বিরাট আওয়াজের মত শোনাচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই মেকং ছুটে এল, বলল—ফুরুশ্রী খুগ্রী—কাছেই আছে, আমার পেছু নিয়েছে—গুলী করেছি—আর গুলী নেই—হনুমানটার ওপরে বাঘের নজর—

তাকে আশ্বস্ত করি। —ভয় নেই, এবার আমরা দুজন। রাইফেল, প্রচুর গুলী, সবই আছে।

মেকং-এর দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। বুকখানা যেন হাঁপরের মত—কণ্ঠে উদ্বেগ ও আশঙ্কা।

—বাঘ হনুমানটাকে ধরেছিল। আমি তখনই শেষ 'এল জি'টা ছেড়ে দিয়েছি, আর নেই। বাঘ ভারী চালাক, সামনে দেখা দেয় না, আট-দশ ফুট দূরে দূরে আমার সঙ্গেই আসছে। যে কোনও সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে—

তবু প্রশ্ন করি—তুমি ঠিক জানো, তোমার গুলী খেয়ে বাঘ দাঁড়ায় নি, তোমার পেছনেই আছে?

মেকং জবাব দেয়,—শেষ গুলীটা করতেই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, সে সঙ্গেই আছে। জঙ্গলের আড়াল দিয়ে পথ চলা তার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—আচ্ছা, এসো তো, মরা হনুমানটাকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে, আমরা দুজন ওপাশে ওই বড় গাছের গুঁড়িটার আড়ালে ডালপালা ঘিরে নিয়ে বসে থাকি। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে বাঘ নিশ্চয় আসবে।

সামনের একটা গাছের ডালে হনু-মানটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে আমরা ওপাশের একটা বড় গাছের গুঁড়ির পেছনে ডাল-পালা দিয়ে ঘিরে বসে থাকি।

রাত ক্রমেই এগিয়ে চলে। বাঘের দেখা নেই। দুতিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও

যখন কিছু হল না, তখন ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মেকং ফিস ফিস করে বললে—বাঘ যায় নি, কাছেই আছে, সুযোগ পেলেই আসবে। একবার গুলীর ঘা খেয়েছে তো, তবে ফুলশ্রী কিনা—ছেড়ে কথা কইবে না!

অগত্যা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হল। অপেক্ষা করে যে আক্ষেপ করতে হয়নি, তার জন্যে মেকং-এর অভিজ্ঞতাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সেই সন্ধ্যার মুখেও, জঙ্গলে আর কোনও প্রাণী, এমন কি একটা খরগোশ পর্যন্ত দেখা যায়নি। পাখীগুলো পর্যন্ত চুপচাপ।

কেমন একটা অস্থিরতাময় নিস্তব্ধতা।

কিছুক্ষণ পরেই সামনের জঙ্গলটার মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দিল—চকিতে একটা জানোয়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়েই আবার ঢুকে গেল। তারপর লেজ দুলিয়ে ধীর পদক্ষেপে জানোয়ারটা ঝুলন্ত হনুমানের কাছে এসে একবার পেছনে তাকালে, তারপর পেছনের দু-পায়ে ভর করে ঘাড় বাঁকিয়ে যেই হনুমানটার কোমরে কামড় বসাতে যাবে অমনি টর্চের ফোকাস এবং অভ্রান্ত লক্ষ্যে আমার রাইফেলের গর্জন। চোয়ালে দারুণভাবে গুলীটা লেগেছিল, বাঘ ছিটকে মাটিতে পড়েই একবার ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পর মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আর মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকি, দেখি বাঘটা ওঠার চেষ্টা করে কিনা।

মেকং একটা বিশ্রী গাল দিয়ে বললে,—ব্যাটার মাথা ভেঙে গেছে, আর উঠতে হবে না।

তবুও তাকে বলি,—হঠকারিতার প্রয়োজন নেই। একটা মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মার ওর দিকে, দেখা যাক, সত্যিই মরেছে কিনা।

মেকং একটা বড় মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারলে। সেটা বাঘের গায়ে লেগে ছিটকে গেল, কিন্তু বাঘটা নিষ্পন্দ।

আমি একটু মুস্কিলে পড়লাম। বাঘটাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক নয়, আবার মেকংকেও একলা রেখে যেতে মন সায় দেয় না। শেষে, ঠিক করলাম, মেকং বন্দুকে গুলী ভরে একটা গাছের ওপর বসে থাক, আমি বরং সেই মোড়লের বাড়ীতে খবরটা পৌঁছে দি।

সেই ব্যবস্থাই হল। মেকং গাছে উঠে বসতেই আমিও টর্চের আলোতে পথ চিনে জঙ্গলের বাইরে এলাম।

একখানা মাঠ পার হয়েই মোড়লের বাড়ী। পৌঁছে দেখি, রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে মোড়লের শলা-পরামর্শ চলছে লোকজন যোগাড় করে জঙ্গলে ঢুকবে।

হাচিসন ও রঙ্গনাথ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। রঙ্গনাথ কাঁদো কাঁদো হয়ে অনুযোগ করলে,—এমনি করে ভাবিয়ে দিতে হয়? কোনও খবর না দিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

—জঙ্গলে। কিন্তু তুমি কী করছিলে এতক্ষণ?

হাচিসনের মুখেও কৌতুক। উনি ছিলেন এই মোড়লের বাড়ীতে, মেয়ে মহলে, আসর জমিয়ে—। হরিবল!

সে কথা গায়ে না মেখে রঙ্গনাথের সপ্রশ্ন উক্তি,—একটা আওয়াজ পেলাম যেন?

—একটা কেন, অনেকগুলোই হয়েছে তবে সব শেষে মাত্র একটি। তারপর? এদিকে কী আন্দাজ সংগ্রহ হল?

রঙ্গনাথের রঙ্গ তবু সঙ্গ ছাড়ে না, বললে—হয়েছে বৈকি। কত মজাদার গান শোনালে। তার সঙ্গে অনুপান—এক বাটি দুধ। তবে নাচ-টাচ কিছু দেখালো না—।

দলবল নিয়ে আবার সেই জঙ্গলে। এবার সঙ্গে প্রচুর আলো, প্রচুর লোকজন। অকুস্থলে আসতেই, মেকং গাছের ওপর থেকে নীচে নেমে এল।

পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার গুলীটা বাঘের চোয়াল ভেদ করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। মেকং-এর গুলীর দাগও বাঘের কোমরে, সেখানেও রক্ত জমাট বাঁধা।

মেকং-এর পিঠ চাপড়ে বলি, সাবাস ভাই, আমার গুলীতে বাঘ খতম হলেও, আইন মোতাবেক এটা তোমারই প্রাপ্য।

দূরকে নিকট করার শুভলগ্ন

আকাশে মেঘ ইতিমধ্যেই হালকা হতে সুরু করেছে। লঘুপক্ষ পাখির মতো তাদের আনাগোনা। আন্দোলিত তরুশাখায় দূরের হাতছানি। শান্ত নদীর ঢেউয়েও দেখো যাবার তাড়া। বেরিয়ে পড়ার দিন। ঘরে ফেরার দিন। দূরকে নিকট করার শুভলগ্নও বলতে পারো। সত্যিসত্যিই পূজা এল। নির্বিঘ্ন যাত্রায় পূজার আনন্দ নিশ্চিত হোক

পূর্ব রেলওয়ে

বঙ্গযামিনী

ফরাসী উপন্যাস

ফাদার দ্যতিয়েন

ভারত-ফেরৎ বহু বিদেশী পর্যটক নানা ধরনের ভ্রমণকাহিনী ও দিনপঞ্জি লিখে গিয়েছেন; কোনো কোনোটি অন্তত পর্যন্ত সুখপাঠ্য। কিন্তু স্বদেশ-স্বগৃহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, অন্য বর্ণের অন্য আকৃতি-প্রকৃতির অন্য আচার-ব্যবহারের মানুষজনের মাঝখানে কাল কাটিয়ে—যাদের ভাষা ভিন্ন ধর্ম পৃথক, ঐতিহ্য অপরিচিত—সরাসরি তাদের নিয়ে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করতে বসাটা অসম্ভব না হলেও, দুঃসাহসের কাজ বৈকি। মির্চা এলিয়াদ-এর 'বঙ্গযামিনী' এমনই এক দুর্লভ উপন্যাস।

গ্রন্থটি দস্তুরমতো প্রেমের কাহিনী, শ্বেতাঙ্গ নায়ক ও বাঙ্গালী নায়িকার ব্যর্থ প্রেমের সূচীবদ্ধ কাহিনী। ১৯৩০-এ উত্তম পুরুষে রচিত রুমানীয় পাণ্ডুলিপিটা ফরাসি সাহিত্যে পদার্পণ করে ১৯৫০-এ। 'বঙ্গযামিনী' নামেই আভাসিত হচ্ছে পটভূমির বঙ্গীয়তা: অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী বাঙ্গালী, কাহিনী বৃত্ত ধরেছে এক কলকাতা-নিবাসী বাঙ্গালী পরিবারকে ঘিরে, পাতায় পাতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথমাংশের কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। কাহিনীর মধ্যে প্রায় চরিত্র হিসেবে বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের প্রধানতম গৃহদেবতা 'রবি ঠাকুর', উল্লিখিত হচ্ছেন শরৎচন্দ্র ও 'অচিন্ত্য' রক্তে মাংসে প্রবেশ করছেন নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর। তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই কাল্পনিক।

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে...

না, রাখাল নয়, ইঞ্জিনিয়ার—বিলেতাগত এক ইঞ্জিনিয়ার। নাম তাঁর অ্যালান, রোটারি ক্লাবের সভ্য, আপন জাতীয়তা ও কুলমান বিষয়ে গর্বিত। ভারতে এসেছে ১৯২৮-এ, থাকে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের রিপন ম্যানসন্স এক পারিবারিক হোটেলে, হ্যারল্ড কার নামে এক অর্ধভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে। কাজ করে এক কোম্পানীতে, ড্রাফ্টস্ম্যানের কাজ, প্রখ্যাত এডিনবরা-ফেরৎ পুরস্কারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার নরেন্দ্রনাথ সেনের অধীনে। নরেন্দ্রনাথ রোটারি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতা-ক্লাবের সদস্য, টেনিস খেলেন, গাড়ি চালান, য়ুরোপীয়দের আপন গৃহে নিমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন করে থাকেন, এমন কি অসূর্যম্পশ্যা না রেখে পত্নীকে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করিয়ে দেন। সুদর্শন তিনি নন: ব্যাঙের মতো চোখ, বিরাট মুখ, মাথাটা গোল আর কটাইকৃত, কপাল নীচু, কোঁকড়ানো চুল, আনত কাঁধ, ভিমাকার উদর, ক্ষুদ্র ঠ্যাং। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কিন্তু মন টানে: নরেন্দ্র সেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মৃদু স্বভাব, রসিক ও বিদগ্ধ।

কাজে-কাজেই অ্যালান যখন শুনল, তার এক ফরাসি বন্ধু ভারতবর্ষ নিয়ে একটা বই লিখতে গিয়ে আটকে গিয়েছে 'ভারতের নারী' নামক অধ্যায়ে, তখন বন্ধুকে সে নিয়ে গেল নরেন্দ্রনাথের ভবানীপুরের বাড়িতে, সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। সেন-ভবনে অ্যালানের এই প্রথম পদার্পণ। নরেন্দ্র বাবুর গ্রন্থাগারে সে দেখল তাঁর এক পিতৃব্যের (ইনি ছিলেন সরকারবাহাদুরের 'মুখ্য পণ্ডিত') সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পাশে অসংখ্য ফরাসি উপন্যাস। না, ফরাসি বই তিনি পড়েন না, যদিও দু-দুবার ফ্রান্সে গিয়ে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি—প্রয়োজনবোধে—'উই উই সে সা' ধরনের কথা বাক্যাংশের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার শিখে নিয়েছেন। গৃহবাসীদের মধ্যে আছে নরেন্দ্র-দুহিতা ষোড়শী মৈত্রেয়ী, ওর ছোট বোন দশ-এগারো বছরের ছবু আর ওদের মা ইন্দিরা দেবী। ভদ্রমহিলাটির পদযুগল অলক্তে রঞ্জিত, ওষ্ঠাধর তাম্বুলে রক্তাভ। ইংরেজি তিনি জানেন না, নীরব থেকে স্মিত হাসি হাসেন। লাজুক, সতেজ, যৌবনে পরিপূর্ণ।

ছেলেটিকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লেগে গিয়েছিল। বিদেশী ছেলে, কত দূর থেকে শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য নিয়ে ভারতবাসীদের চিনতে এসেছে, কিন্তু ভুল জায়গায় তাঁবু গেড়েছে বলতে হবে। ঐ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আস্তানা, আর চারপাশে ফিরিঙ্গি মেয়েদের চক্রব্যূহ, ওর মধ্য থেকে অ্যালান নিজেকে খোয়াচ্ছে, সত্যিকার ভারতবর্ষকে ভালোবাসার সুযোগ হারাচ্ছে—এই মর্মে অ্যালানকে তিনি সতর্ক করে দিতে ছাড়েন না।

ম্যালেরিয়া। ব্যাধির প্রকোপে দীর্ঘকাল হাসপাতালে অ্যালানকে শয্যাশায়ী হতে হল। রোগাক্ত ও আরোগ্যকালের দীর্ঘতা দুঃসহ ও ক্লান্তিকর, বিশেষত অ্যালানের মতো এক যুবকের পক্ষে, স্বভাবতই যে স্বাস্থ্যবান, ইতিপূর্বে আধিব্যাধির সঙ্গে যার মুখচেনা বড় একটা ঘটে নি। চীনেপাড়ার চাওচাও আর কাফে'র ব্যঞ্জনা দূর থেকে হাতছানি দেয়। হাসপাতালে মন-কেমনে-ভোগা বন্দীকে প্রায়ই দেখতে আসেন নরেন্দ্রনাথ। কখনো সখনো বাপের সঙ্গে আসে মৈত্রেয়ী। আর আসে বন্ধু হ্যারল্ড কার। নরেন্দ্রনাথকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, অ্যালানকে বোঝায়—আসল মতলবটা বুঝলে না, বন্ধু? ...নির্ঘাৎ তোমাকে মেয়ের সঙ্গে ভেড়াতে চায়...।

অবশেষে একদিন আমন্ত্রণ এল সরাসরি। এল অন্দরমহল থেকে, নরেন্দ্র-গৃহিণীর উদ্যোগে। নরেন্দ্রনাথ বললেন, আর কেন, তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেই থাক, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে থাকবে না, পয়সার অপচয় কমবে, বছরখানেকের মধ্যে একবার দেশ ঘুরে আসার মতো টাকাকড়ি জমিয়ে ফেলতে পারবে, দেখে নিও...। অ্যালান রীতিমতো দোটানায় পড়ল। একদিকে রহস্যময় ভারতীয় জীবনের রহস্যাবৃত অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি—আর তদুপরি ঐ স্বল্পপরিচিতা রহস্যময়ী তরুণী মৈত্রেয়ীর দৈনন্দিন সাহচর্যের সম্ভাবনা, আরেকদিকে তার মুক্ত নির্বন্ধ জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ার বেদনা—পান, ফুর্তি, সিনেমা-র বিসর্জন।

...নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে তল্পিতল্পা বেঁধে উঠল অ্যালান। প্রথম-প্রথম মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দেখাশোনা কমই হত। প্রথম আলাপে মৈত্রেয়ী শুধু বলেছিল: আপনাদের দেশের আবহাওয়া নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা। আপনাদের গায়ের রং তাই এমন সাদা...। বাড়ির হিন্দুস্তানি-ভাষী চাকরটি অবশ্য নানা প্রশ্নে সর্বদা মুখর: বিছানা আরামপ্রদ তো? মশারি ঠিকঠাক আছে কিনা? কাঁচা দুধ মহাশয়ের ভালো লাগছে? দেশে ওঁর ভাইবোন আছে? মন-কেমন করে বাড়ির জন্য?... অ্যালান বুঝতে পারে, প্রশ্নগুলো আসলে আসছে অন্দরমহল থেকে, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে আছেন স্বয়ং এ-বাড়ির কর্ত্রী। কিন্তু মৈত্রেয়ী?......

ঈপ্সিতার পদার্পণ ঘটল শেষ পর্যন্ত। হাঁ, অ্যালানের ঘরে একদিন আপনা থেকেই এল মৈত্রেয়ী। কিংবা আপনা থেকে নয়, কেননা ঘরে ঢুকেই সে বলল: 'মা আমাকে পাঠালেন একটা কথা জিগেস করতে। আপনি তো এখানে নিজের ঘরেই ঘন্টার পর ঘন্টা বড় একা বসে থাকেন, একটুও আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ পান না...

'তা করবটা কি, আমি যে এখানে নির্বান্ধব'......

'ইচ্ছে করলে আপনি এসে আমার সঙ্গে গপ্পোসপ্পো করতে পারেন।'

কত কথা বলে চলে মৈত্রেয়ী! দুঃখ করে, বাড়ির চিঠির বাক্সের চাবি থাকে তারই কাছে, অথচ তাকে চিঠি লিখবার কেউ নেই...। বলে রুশ ঔপন্যাসিক লেভ তলস্তয়ের কাহিনী—বিত্তসম্পদের মধ্যে কাটিয়েছেন সারা জীবন, অথচ দেখুন, বৃদ্ধ বয়সে সব-কিছু ছেড়ে ছুড়ে কেমন বানপ্রস্থে চলে গেলেন, ঠিক যেন ভারতীয়...। বলে ছোট বোন ছবুর কথা—ও তো কালো, ওর বিয়ে দিতে খরচ পড়বে খুব...। সে রাতে অ্যালান নিজের ডায়েরিতে লেখে: 'মৈত্রেয়ীর সঙ্গে প্রথম আলাপ-সালাপ। ওর কথাবার্তায় ছেলেমানুষির লক্ষণ নির্ভুল। অল্প বয়সে অতিপঠনের ফল।'

নরেন্দ্রনাথের কাছে অ্যালান জানতে পারে, মৈত্রেয়ী কবিতা লেখে—দার্শনিক কবিতা, 'ওর লেখা পড়ে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।' মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যালান কথাটা পাড়ে। সবই স্বীকার করে মৈত্রেয়ী। হাঁ, সে ভাবুক স্বভাবেরই বটে: 'আমি স্বপ্ন দেখি, চিন্তা করি

ফটো ঃ কুম্ভরেশ বিশ্বাস

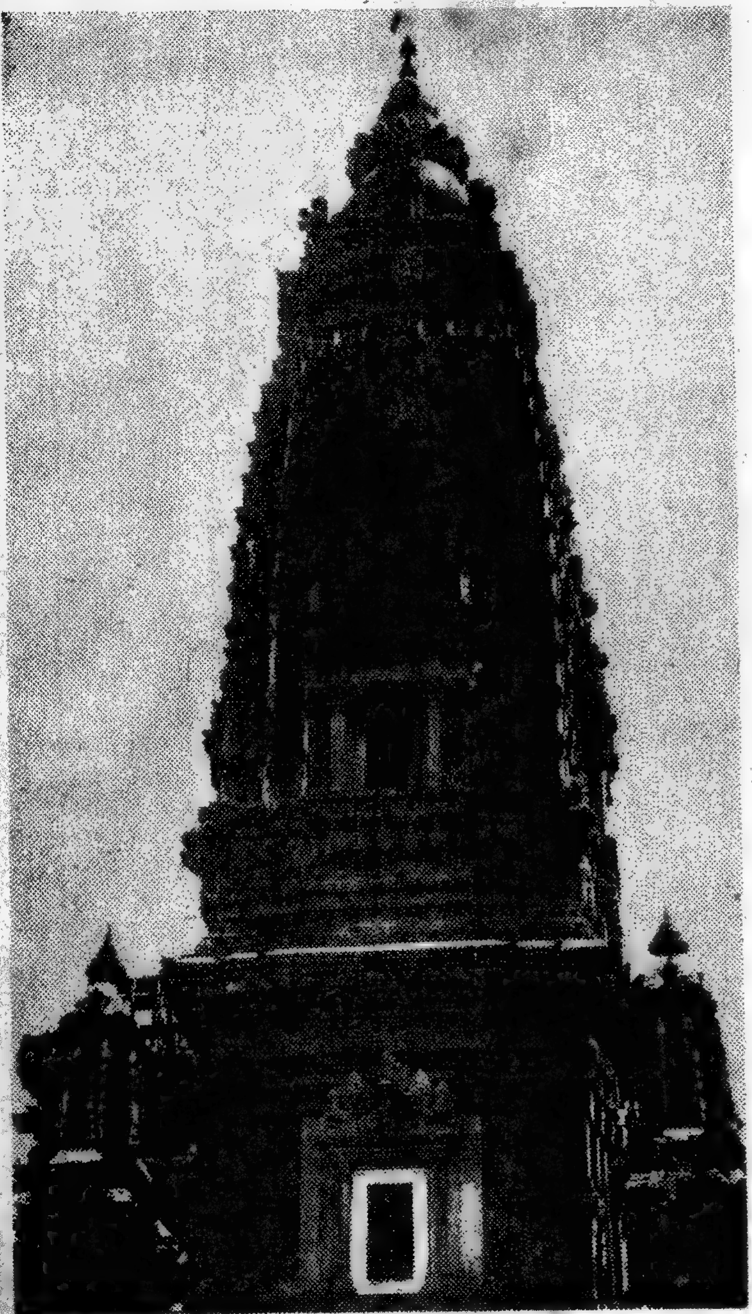

কবিতা লিখতে ভালোবাসি।' তারপর বলে ঃ জানেন, আমি না একেবারে বুড়ো হয়ে যেতে চাই, রবি ঠাকুরের মতো বুড়ো। বয়স হলে লোকে ভালোবাসে বেশ, কষ্ট পায় কম...।' অ্যালান ঘরে ফেরে লঘু, আর খুশি মন নিয়ে, নতুন আবিষ্কারের রোমাঞ্চে সে পুলকিত। ডায়েরি খুলেও চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ সূচীমুখ ঝর্ণাকলমটাকে শূন্যে বাড়িয়ে, তারপর কিছুই না লিখে হঠাৎ বলে ওঠে, 'যত সব বোকামি...' আর বলেই বন্ধ করে দেয় ডায়েরি।

সেন-ভবনে তার অবস্থিতির এই প্রথম মাসগুলিতে অ্যালানের মনের মধ্যে ভালোবাসার কোনো রঙিন উন্মেষ উঁকি দেয় নি; মৈত্রেয়ীর স্বভাবের দ্বারা সে আকৃষ্ট হয়েছিল, মৈত্রেয়ীর সান্নিধ্য তার দিনগুলিকে আনন্দিত ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছিল। তার চিন্তা গুঞ্জন তুলত তার মনে, ডায়েরি ভরা থাকত তার উক্তিতে, তার উল্লেখে।

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে

আরো ঘনিষ্ঠ হবার উপলক্ষ রচিত হল একসময়। এক আদান-প্রদানের প্রস্তাব এল মৈত্রেয়ীর দিক থেকে। আলান তাকে ফরাসি শেখাতে পারে না? বিনিময়ে সে তাকে শেখাবে বাঙলা। কিছু কিছু শব্দ অ্যালান অবশ্য ইতিমধ্যেই শিখে উঠেছে ; মৈত্রেয়ীর বহু-ব্যবহৃত 'যাচ্ছে' কথাটা সে বোঝে, 'কি ভীষণ'-এর বিস্ময়ও তার কাছে দুর্গম নয়, কথোপকথন-গ্রন্থে শব্দগুলো সে যাচাই করে নিতে দেরি করে নি। শিক্ষদানের কাজটা প্রথম প্রথম শুরু হয়েছিল পারিবারিক লাইব্রেরি-কক্ষে, নরেন্দ্রনাথ নিজ থেকেই একদিন অ্যালানের নিজস্ব ঘরটিতে ক্লাশরুম উঠিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ঃ তোমার ঘরেই নিরিবিলি পড়াশুনোর সুযোগ পাবে বেশি...। বোঝা যাচ্ছে, মিঃ সেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব চান, নিজের মনেই ভাবে অ্যালান। মিসেস সেন প্রশ্রয় দেন খুব, বলতে গেলে একটু বেশিই দেন। তবে কি ওঁরা সত্যিই......সত্যিই আমাদের দুজনকে প্রণয় তথা পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চান? কিন্তু তাহলে তো ওঁদের জাত খোয়াতে হবে।

এদিকে শিক্ষণ-পালা শুরু হতে অ্যালান অবিলম্বেই দেখে, মৈত্রেয়ী শেখাতে যেমন অযত্নশীল, শিখতেও তেমনি অমনোযোগী ঃ 'আমাকে পড়াবার সময় সে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, কি বলছে আর দিকে নজর না রেখে...। আমি তাকে যখন সর্বনামের পাঠ দিচ্ছি, সে হঠাৎ দুম করে আমায় জিগ্যেস করল ঃ আচ্ছা, 'আমি এক তরুণী মেয়ে' এ কথাটা ফরাসি কি হবে?......' আমি পড়িয়ে চলি, আর সে আপন মনে তার খাতায় পেন্সিল বুলিয়ে লিখে চলে 'রবি ঠাকুর......রবি ঠাকুর'...অজস্রবার। কখনো লেখে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে 'কলকাতা' কিংবা 'বেলা হল...' কখনো বাঙলায় পদ্য গাঁথে...কখনো নানারকম ফুলের আঁকিবুকি কাটে। হঠাৎ কখনো ঘোষণার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'আমি কি ঠিক করেছি, জানেন? ছবুকে আমি ফরাসি শেখাব।...' আবার পরমুহূর্তেই আরেক আচমকা প্রশ্ন, 'পাঁচ বছরে আপনার বয়স কত হবে, বলুন দেখি।' জবাব দিই, 'একত্রিশ'। 'ওঃ তাহলে ওঁর বয়সের অর্ধেকও নয়... ...' বলে সে আবার আঁচড় কাটতে থাকে—বাংলায় ও ইংরেজিতে —'রবি ঠাকুর... রবি ঠাকুর'...সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের প্রতি এই তীব্র আসক্তি আমাকে বিমূঢ় করে।'

কি চায় মেয়েটা? অ্যালান ভেবে পাই পায় না। ঘোল খাওয়াতে চায় তাকে? জেনে রাখুক, অ্যালানের মতো যুবককে বোকা বানানো ষোলো বছরের পুঁচকে মেয়ের কর্ম নয়...। নাকি তার প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে মৈত্রেয়ী? এই সম্ভাবনাটা অ্যালানের প্রীতিপ্রদ ঠেকে; কিন্তু না, নিজের মনের ভিতর কান পেতে সে প্রেমের পদসঞ্চার শুনতে পায় না। তার ভালো লাগছে, এই পর্যন্ত, বাস। এই সব সাত পাঁচ ভাবছে অ্যালান, মৈত্রেয়ী ঘর থেকে চলে গেল। যাবার আগে আলানকে দিয়ে গেল ওর নিজের হাতে তোলা বারান্দার একটা ফুল।

উত্তমকুমার

সোনা দে

মাধবী চক্রবর্তী

দীপঙ্কর দে

আলোকচিত্র—সুকুমার

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা সেন

রঞ্জিত মল্লিক

আলোকচিত্র—সুকুমার রায়

'পরের দিন প্রাতরাশের টেবিলে নেহাৎ হেলাচ্ছলেই মৈত্রেয়ী আমাকে জিগ্যেস করল, ফুলটা কোথায়। আমি বললাম, অ্যালবামে এ'টে রেখেছি। মিথ্যে কথা অবশ্য (ওটা আমি জানলা দিয়ে ছ‍ুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম), কিন্তু একটা প্রেমোপাখ্যান গড়ে উঠছে, এটা ওকে ভাবতে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

ক্লাশে এসে ও দাবি তুলল, 'কৈ ফুলটা দেখান তো!' আমাকে রহস্য বানিয়ে তুলে বলতে হল, 'ওটা আমি দেখাতে পারি না।' ক্লাশ শেষ হতেই বারান্দা থেকে অনুরূপ আরেকটা ফুল কুড়িয়ে এনে অ্যালবামে সেঁটে রাখলাম। সেদিন ডিনারের পরেও ও যখন আমার পিছু পিছু এসে ফুলটা ফেরৎ দেখার জন্য করুণভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, অ্যালবামটা মেলে ধরলাম ওর সামনে; কম্পিত হাতে ফুলটাকে তুলে নিয়ে ও নিরীক্ষণ করল, তারপর হো হো করে হেসে উঠল : এ ফুল নয়, এ ফুল নয়, আমারটাতে আমার একগাছি চুল জড়ানো ছিল।'

আরেকদিনের কথা। কোথায় যেন মৈত্রেয়ীর বক্তৃতা ছিল সেদিন, 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' সম্পর্কে গম্ভীর দার্শনিক এক বক্তৃতা, বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা নাকি মৈত্রেয়ীর প্রথম বক্তৃতা নয়; অ্যালানের বাংলা ভাষায় জ্ঞান আরও একটু সড়োগড়ো হলে সে-ও এতে নিমন্ত্রিত হত। যখন ফিরে এল, বেশ খানিকটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল মৈত্রেয়ীকে। নরেন্দ্রনাথ বললেন, শ্রোতৃবর্গের সর্বাংশ থেকে তেমন সাড়া মেলে নি, ভাষণের সারগর্ভতা-ই সর্বজনগ্রাহ্যতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজের মেয়ের উপর নরেন্দ্রনাথের অপার আস্থা; মেয়েকে তিনি মনে করেন প্রতিভাময়ী—আর বাপের এই অন্ধ বিশ্বাস অ্যালানের বিরক্তি জাগায়। ফিরে এসে মৈত্রেয়ী আশ্রয় নিয়েছিল চারতলায় তার নিজের ঘরটিতে। সেখান থেকে অ্যালানের কাছে ডাক এল, 'ভালো লাগলে উপরে আমার ঘরে চলে আসুন, গল্প করব।' এই আমন্ত্রণে অ্যালান আশ্চর্যই হল : এর আগে মৈত্রেয়ীর ঘরের চৌকাঠ সে কখনো পেরোয় নি। সেদিন সকালেই মৈত্রেয়ীর কাছে পূর্বোক্ত ভারত-গবেষক ফরাসি বন্ধুটির সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের দুটি কপি এসেছে সম্পাদকের কাছ থেকে। মৈত্রেয়ী সে-দুটি অ্যালানের সামনে মেলে ধরে প্রস্তাব করল, পরস্পর পরস্পরকে একটি করে কপি উৎসর্গ করবে তারা—কিছু না কিছু উৎসর্গ-লিপি লিখে। অ্যালান লিখল : আমার বন্ধু, ছাত্রী তথা শিক্ষয়িত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে'। মৈত্রেয়ী শুধু লিখল : 'আমার বন্ধুকে'। অ্যালান বলল, 'কিন্তু বইটা যদি চুরি যায়?' উত্তর এল : 'তাতে কি এসে যায়? যে নেবে, সেও তো আমার বন্ধু হতে পারে।'

'আজ থেকেই আমরা দুজনে দুজনের সত্যিকার বন্ধু হয়ে উঠলাম, তা-ই না? এই সময়েই শুধিয়েছিল মৈত্রেয়ী।

অ্যালান বলেছিল, 'আমাদের সেই প্রথম আলাপের দিন থেকেই তো আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছি।'

মৈত্রেয়ী : 'আমরা যদি প্রকৃতই বন্ধু হতাম, তাহলে আমি আমার দুঃখ আপনাকে বলতাম...' তারপর খানিক নীরব থেকে; হঠাৎ : 'জানেন রবি ঠাকুর আজ আমার বক্তৃতায় আসেন নি!'

দিন যায়। নরেন্দ্রনাথের এক সম্পর্কিত ভাই, মন্টু, দিল্লি থেকে কলকাতায় আসে। এখানেই সে কাজ নেবে—সরকারি সদাগরি স্কুলে অধ্যাপকের কাজ। এই বাড়িতে থাকতে থাকতে তার বিয়েও হয়, পাত্রীর নাম লীলু; বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে সেন-ভবনেই থাকবে। বিয়ের উৎসবে অ্যালান যোগ দেয় রেশমী ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভূষিত হয়ে, সারাটা সময় নির্ভেজাল বাংলা বলার চেষ্টা করে, রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েও ওঠে। আর তার দিক থেকে সে-ও স্বীকার করে : 'আমাকে মানতেই হবে ভারতীয় সমাজ আমার মনোমতো, ভারতীয় সখ্য আমার গভীর ভালোবাসার ধন। এক বিচিত্র প্রেমানুভূতি মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসে, নিজের মধ্যে অনুভব করি নারীমাত্রেরই প্রতি মাতৃভাবের স্ফুরণ। এই যে মিসেস সেন—ও'কে আমার মায়ের মতো ঠেকে, মনে হয় আমি সেন ও'দেরই ছেলে...। মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে ভাবি : আমার প্রতি এই যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত-সংকেত, এ-সবই কি কৌতুকবশে করা, নাকি এর মধ্যে দিয়ে সেন-দম্পতির কোনো সযত্ন-সাধিত পরিকল্পনা উঁকি দিচ্ছে? ও'রা কি ও'দের মেয়ের সঙ্গে সত্যি আমাকে বিয়ের বাঁধনে বাঁধতে চান? বাঙ্গালী অভিজাত সম্প্রদায়ে আমার চেয়ে ঢের ভালো পাত্র তো ওর জুটত!'

এদিকে ইতিমধ্যে অ্যালানের মনে আরেক সন্দেহ দেখা দিয়েছে নিজের সম্পর্কেই : এক দরিদ্র আত্মীয়, নাম খোকা, মন্টুর বিবাহ উপলক্ষ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে সেনেদের বাড়িতে, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তার উচ্চ-হাসি অ্যালানকে ঈর্ষান্বিত করে। 'আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়েছি 'শকুন্তলা'। রাত্রে শুতে যাবার আগে বারান্দায় ও 'মহুয়া' থেকে কবিতা আবৃত্তি করে...। আমি কি মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসি?'

অ্যালানের এই সমস্যাকার সংশয়াকুল মনোভাব তার ডায়েরির পাতায় পাতায় পরিস্ফুট হয়েছে :

'রাত এগারোটা পর্যন্ত মৈত্রেয়ীর ঘরে 'বলাকার' অনুবাদে ও আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম আমরা...। এক গুচ্ছ পদ্ম তাকে উপহার দিলাম...। আমাকে সে নিশ্চয়ই ভালোবেসে ফেলেছে, আমার

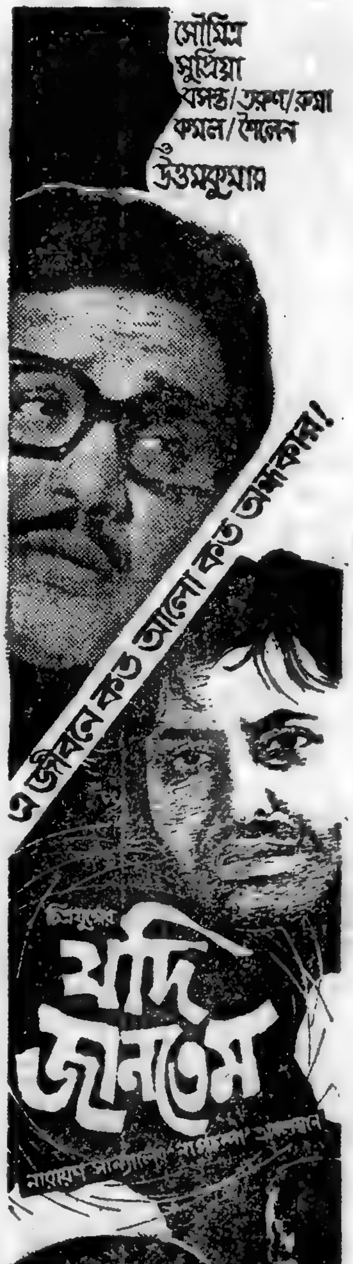

পরিচালনা যাত্রিক/সংগীত হিমাংশু বিশ্বাস
সম্পাদনা অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী/ মিতালী পরিবেশিত

মুক্তি প্রতীক্ষায়

জন্য কবিতা লেখে সে, সারাদিন আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। আমি তাকে ভালোবাসি না, সম্ভ্রম করি শুধু। সে—তার দেহ ও মন—আমাকে প্রতিহত করে…। যদি কখনো অন্যদের, এমন কি তার মা-কেও, আমি ফুল এনে দিই, তার চোখে ঈর্ষা। ঝিলিক দেয়…। মন্টু বোধ হয় আমাদের ঘনিষ্ঠতাটা বুঝে ফেলেছে: আমরা যখন একা থাকি, সে এসে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে পড়ে এবং চট করে বিদায় নেয় না।'

'ওঁরা অবশ্যই আমাদের বিয়ের পরিকল্পনা করে চলেছেন। দিনকে দিন তার নতুন নতুন প্রমাণ পাচ্ছি। মিসেস্ সেন আমাকে মাতৃচক্ষে দেখেন, মিঃ সেন আমাকে বলেন 'মাই চাইল্ড'…। গত রাত্রে খাওয়ার টেবিলে মিসেস সেনের অভিযোগ: আমি ওঁকে এখনও 'মা' না বলে 'মাদার' সম্বোধন করি কেন?… অনুযোগে-ইঙ্গিতে আমি ব্যতিব্যস্ত। মন্টু তো চায় আমি ওকে খুড়ো ডাকি, সতেরো বছরের একফোঁটা লীলু পর্যন্ত আমার কাছ থেকে খুড়ি সম্বোধন দাবি করে। মজা লাগছে বেশ…।'

'আজ রাতে ও আমাকে বলল ওর হতাশার কথা: রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনো চিঠি আসেনি। কবি ওর কাছে শুধু গুরুদেব নন, তার অনেক বেশি: বন্ধু, নর্মসখ, প্রণয়ী, দেবতা—হয়তো বা প্রেমিকই। না, তাদের এই সম্পর্ক কাদুর চোখে ধরা পড়েনি'—মৈত্রেয়ীর নিজেরই স্বীকারোক্তি।'

'আজ রাতের কথাবার্তাও ঘুরেফিরে ঐ একই প্রসঙ্গে এসে ঠেকল: মৈত্রেয়ীর বিয়ে। আমি বললাম, তার নিশ্চয়ই বিয়ে হবে এমন এক বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে তাকে যে সুখী করতে পারবে না। ও তা মেনে নিল। আর তখনই আমি সেই প্রশ্নটা বিস্ফারিত করে বসলাম: 'আমাদের পরিণয় নিষিদ্ধ কেন?' অনেকক্ষণ ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকল—নিষ্পলক, নিস্তব্ধ—তারপর যেন কেউ আমার কথা শুনে ফেলেছে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি চারদিকে চোখ বুলিয়ে দিয়ে বলল: 'নিয়তির, কিংবা ঈশ্বরের, লিখন সেটাই।' আমি জিগ্যেস করলাম: 'আসলে কি সংস্কারই এর মূলে নয়?' ও বলল: 'সংস্কারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপন ইচ্ছাই প্রকাশ করে থাকেন…আর তাছাড়া আমার এই ভালোবাসা খুব সম্ভবত এক ক্ষণিক সম্মোহন…।' আমি এদিকে বিয়ের কথা গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি।'

'সেদিন থেকে মৈত্রেয়ী জ্বরের ঘোরে। সর্বদা সে ঘরেই থাকে। লীলুর হাতে দিয়ে তাকে নির্দোষ কয়েকটি চিরকুট পাঠিয়েও কোনো উত্তর পাইনি। কত কিছুই ভাবতে থাকলাম। তারপরে আর কোনো ভাবনা রইল না। বেশ বুঝতে পারছি মৈত্রেয়ীকে ছাড়াও দিব্যি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি।'

অজেনা প্রেমের চমক লেগে

কিছু দিন বাদে হ্যারল্ডের সঙ্গে অ্যালানের দেখা। হ্যারল্ডের ব্যবহারে আড়ষ্টতা ও বৈরীভাব স্পষ্ট, আগের থেকেও বিরূপ ঠেকল তাকে। সরাসরি সে জিগ্যেস করে বসল: 'ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের নন্দনীর পাণিগ্রহণ নাকি ঠিকঠাক শুনলাম?' শুধু কি তাই, আরো একটা খবর তার কানে এসেছে: অ্যালান নাকি স্বধর্ম ছেড়ে হিন্দু হতে চলেছে…হা ঈশ্বর, ঐ হ্যারল্ড কস্মিন-কালে যে চার্চের চৌকাঠ মাড়ায় না, ধর্মাধর্ম বিচারের পরোয়া রাখে থোড়াই—সেই কিনা অ্যালানের ধর্মত্যাগের কথা শুনে চোখ কপালে তুলছে। সাফ অভিমত জানিয়ে গেল হ্যারল্ড, নরেন্দ্রনাথ একটা নরপিশাচ।

অ্যালান ইতিমধ্যে অবশ্য কিছু কিছু ভারতীয়তা অর্জনে মনোনিবেশ করেছে, যেমন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম…। পায়ের আরেক ব্যবহার তাকে এক দিন শেখায় মৈত্রেয়ী নিজে: পায়ে পায়ে অনুরাগ জানানো। লীসুর পায়ে সে নিজের পা বুলিয়েছে সেদিন, হ্যাঁ, খোকার সঙ্গেও এই পায়ে পায়ে মিলনের খেলা সে খেলেছে। খোকার উপর অ্যালানের হিংসে হয়।

হিংসে হয় মন্টুকেও। খুড়ো সুবাদে দেখুন না, কতদূর পর্যন্ত অধিকার তার! মৈত্রেয়ীর হাত সে ধরতে পারে, কাঁধ চাপড়াতে পারে, টানতে পারে চুল। মূল ঈর্ষাটা অবশ্য মৈত্রেয়ীর মানস-নায়কদের প্রতি: সেই তরুণ অচিন্ত্য, কবিযুবক, মৈত্রেয়ী যাকে একবার মাত্র চোখে দেখেছে কিন্তু ফোনে রেখেছে নিরন্তর যোগাযোগ এবং যার কাছে সে নিয়মিত কবিতা পাঠায় 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য, কিংবা সেই গণিতজ্ঞ, যার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর মুখোমুখি দেখা ঘটে কদাচিৎ, কিন্তু উৎসাহে মুখর হয়ে ওঠে যার উল্লেখে, অথবা সর্বোপরি স্বয়ং রবিঠাকুর, তার গুরু, যাঁর প্রতি অ্যালানের বিদ্বেষ সীমাহীন: এঁরা খ্যাতিমান, যাঁরা বিরাট, মৈত্রেয়ী তাঁদের ভাল না বেসে পারে না— তার নিজের স্বীকারোক্তি।

নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক গ্রন্থাগারে হাজার চারেক বই, সেগুলির শ্রেণী-বিভাগ ও তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে দুজনে মিলে—অ্যালান ও মৈত্রেয়ী। অ্যালান প্রেমতত্ত্বের কথা পাড়ে, আবেগ-বশে চুমো খায় মৈত্রেয়ীর হাতে, নিজের হাতে ওর হাত চেপে ধরে বারবার। তারপর এক সময় মৈত্রেয়ী তাকে বলে পায়ের চটি খুলে ফেলে পায়ে পা ঠেকাতে। গোপনতার অন্তরালে সেই প্রথম রোমাঞ্চকর পারস্পরিক দেহ-সংস্পর্শ, অবিস্মরণীয় শিহরণ:

অ্যালানের এত দিনকার ঈর্ষালুতা ডুবে গেল এই অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতায়।

কিন্তু পরের দিনই এক ধাক্কা খেল অ্যালান। মৈত্রেয়ী এসে বলল, তাদের সম্পর্ক যেভাবে মোড় নিচ্ছে, তাতে যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে। অ্যালান যেভাবে চাচ্ছে তাকে, সে অ্যালানকে সেভাবে কোনো দিন ভালোবাসে নি…।

আরো একটা কথা মৈত্রেয়ী জানায়: দীর্ঘকাল যাবৎ সে একজনকেই ভালোবেসে এসেছে—তিনি রবিঠাকুর। সেই তেরো বছর বয়স থেকে, যখন থেকে তাঁর বই সে পড়তে শুরু করেছে। শুধু গতবছর বাদে সমস্ত বছরই তারা গ্রীষ্মযাপন করে এসেছে শান্তিনিকেতনে, কবির সাহচর্যে, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। কত কত দিন সে বারান্দায় কাটিয়েছে বৃদ্ধ কবির পায়ের কাছে, তাঁর মুখের কথা শুনতে, শুনতে। একলা তারা, শুধু কবি আর মৈত্রেয়ী, কবি তার চুলে হাত বুলোচ্ছেন, আর সে—তার মনের মধ্যে কি যেন একটা ঘটে চলেছে নিরন্তর, এক বিচিত্রসুন্দর স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে সে যেন স্থিত হয়ে আছে, অবিশ্বাস্য এক মাধুর্যে দ্রবীভূত। এই অভিজ্ঞতার মূলে কি, তা সে প্রথমটায় বিশ্লেষণ করতে পারে নি, অনুমান করেছে, এই অনুভূতির উৎস কবির প্রতি তার গুরু-ভাব ও পিতৃভাবের সমন্বয়। কিন্তু তারপর একদিন, এক সন্ধ্যাকালে, কবি নিজেই তাকে বুঝিয়ে দিলেন: আসলে উপলব্ধিটা ভালোবাসার। এই আবিষ্কারের অভিজ্ঞতাটা মৈত্রেয়ী সামলাতে পারে নি, সংজ্ঞা হারিয়েছে। কতক্ষণ সে লুপ্তচেতন হয়ে ছিল, তা সে জানে না, জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখে সে শুয়ে আছে কবির নিজের ঘরটিতে, তাঁরই শয্যায় সিক্তমুখে…। ঘরের বাতাসে ভাসছে সদ্যশ্বসিত মধুর সৌরভ… তার গুরু তাকে তখনো আদর করে চলেছেন। গুরুর কাছ থেকে এক মন্ত্র পেয়েছে মৈত্রেয়ী, যা পাপের সংক্রাম প্রতিহত করে, উপদেশ পেয়েছে, সে যেন আজীবন পবিত্র রাখে তার দেহমন, কবিতা লেখে, ভালোবাসে, বিশ্বস্ত থাকে তাঁর প্রতি, তাঁকে যেন কখনো না ভোলে।

না, সে ভোলে নি। এক সুরভিত চন্দনকাঠের বাক্সে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লেখা তাঁর সমস্ত চিঠি সে সযত্নে সংরক্ষণ করেছে মূল্যবান স্মৃতিসম্পদের মতো। বাক্সটিও তাঁরই দেওয়া, তাঁর একগুচ্ছ কেশপাশসমেত প্রদত্ত স্নেহোপহার।

আর তবু, মৈত্রেয়ী জানায়, তার গুরু তাকে কোনোদিন আলিঙ্গন পর্যন্ত করেন নি, শুধুই চুলে হাত বুলিয়ে আদর করেছেন। কিন্তু মৈত্রেয়ীর নিজের আচরণে হাবে-ভাবে আবেগজনিত অনুরাগ কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকবে,

মিসেস্ সেন তাই নাকি সতর্ক হয়ে গিয়েছেন, কাবসাবধানে কন্যার অবারিত গতির উপর তিনি নষেধের বেড়া তুলে দিয়েছেন। তাছাড়া বহুদিন হল কবি তো দেশের বাইরে বাইরেই কাটাচ্ছেন, তিনি নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। সব সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী তাকে ভোলে না এক মুহূর্তের জনাও : অ্যালানও এগিয়ে আসুক না; যোগ দিক না এই অতীন্দ্রিয় সম্পর্কের বন্ধনে...তারা দুজনে মিলে কবিকে ভালোবাসবে। অ্যালানকে মৈত্রেয়ী অর কিছু ভাবে নি বন্ধু ছাড়া, প্রিয় বন্ধু, কিন্তু নেহক বন্ধু। বন্ধুপ্রীতি ছাড়া প্রেমের আর কোনো প্রকরণের কথা তার মনে উদয় হয়নি, অ্যালান সেটা ভালো করে বুঝুক। দুজনে যা করেছে, সেটা খেলা— আর খেলা থাকা-ই ভালো। চুম্বন আর আশ্লেষ সেই খেলার আঙিনার বাইরেই থাকুক।

কাকে বোঝাচ্ছিল মৈত্রেয়ী? বোঝাচ্ছিল নিজেকেই। দুই প্রায় সমবয়সী তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে, দীর্ঘদিন পরস্পরের কাছাকাছি থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই যে-প্রেমের স্ফুরণ ঘটে, তাকে সে অস্বীকার করতে চাইছিল, সংকল্প নিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে। ডুবে থাকতে চাইছিল তার কিশোরী-সুলভ উচ্ছ্বাস-বাষ্পময় বীরপূজায়।

কিন্তু বৃথা। অ্যালানের দেহস্পর্শের রোমাঞ্চ-অনুভূতির জন্য উৎসুক হয়ে উঠল মৈত্রেয়ী। পা থেকে শাড়ি কিছুটা তুলে অ্যালানের পায়ে পা ঠেকিয়ে সে বসে থাকত। একদিন ব্যালকনি থেকে তার আহ্বান শুনে অ্যালান কাছে যেতেই উপহার পেল এক যূথীর মুকুট : আঁচলের তলায় বুকে চেপে-রাখা পুষ্পোপহার অ্যালানের হাতে তুলে দিল মৈত্রেয়ী। পরে জেনেছিল অ্যালান, ওটা পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির অভিজ্ঞান।

পরের দিন অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন : 'আমার কথা আজ ভেবেছ তুমি?' (বাংলায় কথা বলছিল মৈত্রেয়ী— 'আপনি' থেকে 'তুমি' পৌঁছোবার জন্য) বন্ধ চোখের কোলে দু ফোঁটা অশ্রু তিরতির করে কেঁপে উঠল। অ্যালানকে আরো চমকে দিয়ে মৈত্রেয়ী তার সামনে তুলে ধরল রবীন্দ্রনাথের চিঠিভরা সেই বাক্সখানা : নাও, এটা নিয়ে তোমার যা খুশি কর, দরকার হলে পুড়িয়ে দাও, আমি আমার কাছে এটাকে আর পুষে রাখব না। কবিকে আমি ভালোবাসিনি, তাঁর প্রতি আমার আবেগ শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঁকে শুধু গুরুর মতো দেখাই আমার উচিত ছিল। আমার ধারণা ছিল, এ বুঝি এক বিশেষ ধরনের ভালোবাসা। কিন্তু আ... অ্যালানের বুকের উপর বাঁ পায়ে পড়ে ... মৈত্রেয়ী. 'তোমাকে ছাড়া [illegible]

সেই মুহূর্তে প্রণয়ের চুম্বন এঁকে দিল অ্যালান।

'কিন্তু এটা পাপ হচ্ছেনা—বাবা-মাকে লুকিয়ে এই ভালোবাসা?' মৈত্রেয়ীর মনে সংশয়।

অ্যালান তাকে নিশ্চিত দিল : আমি নিজে গিয়ে তোমার বাবাকে বলব। আমাকে তিনি ভালবাসেন খুব। তোমার-আমার মধ্যে বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনিই তো উৎসাহ জুগিয়েছেন...।'

তার ভুলটা ধরিয়ে দিল মৈত্রেয়ী : হ্যাঁ, তাঁরা তোমাকে ভালোবাসেন ঠিকই কিন্তু সে শুধু এইজন্য যে তাঁরা চান তুমি তাঁদের ছেলের মত হয়ে ওঠ। বাবা-মা আমাকে বলেছেন : 'এবার এক ভাই পেলে তুমি, আমরা ওকে ছেলে বলে গ্রহণ করেছি, তুমিও ওকে ভালবাসবে। তারপর যখন তোমার বাবা কাজ থেকে অবসর নেবেন, আমরা সবাই মিলে অ্যালানের সঙ্গে চলে যাব তার দেশে, আমাদের জমানো টাকায় সেখানে থাকব রাজার মতো। সে-দেশে আবহাওয়া এত উষ্ণ নয়, আন্দোলন-বিদ্রোহের অস্তিত্ব নেই, সেখানকার শ্বেতাঙ্গেরা এখানকার ইংরেজদের মতো এমন অমানুষ নয়। তাঁরা নিজেরা কি বলেছেন, শুনলে তো। এখন দেখ, তাঁদের কথা অমান্য করে কভাবে তোমাকে আমি ভালোবাসলাম।

...মৈত্রেয়ী তাকে বলে তার প্রথম প্রেমের কথা। এর আগে তারা থাকত আলিপুরে। সেখানে এক ছাতিম গাছকে সে ভালোবেসেছিল : তাকে চুমো খেত, তাকে কবিতা পড়ে শোনাত, কখনো কখনো রাত কাটাত তার শাখাশ্রয়ে। এসব শুনে অ্যালান বেশ একটু দমে গেল বৈ কি : কি অদ্ভুত মেয়ে...যা-হোক-কিছুকে ভালোবাসতে পারে, একই রকম আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু কেন্ প্রেমিকের তা সহ্য হয়, বলুন? অ্যালান তো চায়, মৈত্রেয়ী শুধু তাকেই ভালোবাসুক— শুধু তাকে। মৈত্রেয়ীর উত্তর অবশ্য এর জন্যও প্রস্তুত ছিল : 'তোমাকেই একমাত্র যদি না আমি ভালোবাসতাম, এত সহজে তোমার কাছে স্বীকার করতে পারতাম সবকিছু?'

একদিন বেলুড় মঠে বেড়াতে গেছে সবাই মিলে, অ্যালান ঘোষণা করে বসল, সে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হতে মনস্থ করেছে। একটা অনুক্ত উদ্দেশ্য অবশ্য : একবার হিন্দু হয়ে যেতে পারলে, ওকে আর মৈত্রেয়ীকে আলাদা করে কে?... মিসেস সেন এবং তাবৎ মহিলবর্গ তো অ্যালানের প্রস্তাবে খুশিতে ডগমগ। বাদ সাধলেন নরেন্দ্রনাথ নিজে : 'আগে

না, না...হিন্দু হতে যাবে কোন দুঃখে? আসলে যা তোমাকে টানছে, তা নূতনত্বের একটা আস্বাদ—তোমার বিদেশী চোখে দেখা অভিনব আচার-অনুষ্ঠান। আসলে তোমাদের ধর্মটাই অনেক বেশি ভালো। এই ধর না আমার নিজের কথা : আমি হিন্দু হয়ে আছি কেন, জান? সমাজচ্যুতির ভয়ে। তোমার তো আর সে ভয় নেই, তবে?”

অ্যালান মুষড়ে পড়ল, কিন্তু মনে মনে স্থির করল, অক্টোবরে মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে একবার পুরী যাবে, ফিরে আসবে একেবারে দীক্ষা-টীক্ষা নিয়ে।

অতল জলের আহ্বান

এদিকে অ্যালান যখন এমনিভাবে মৈত্রেয়ীকে ও নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত, দেশময় ঘটে চলেছে নানান ঘটনা : রাজনৈতিক আন্দোলন ফুঁসে উঠছে চারদিকে, পঞ্চাশ হাজার দেশ-প্রেমিক কারারুদ্ধ। অ্যালান স্বচক্ষে দেখল জনতার উপর অশ্বারোহী পুলিশের ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণ, ভবানীপুরের শত বস্তির উপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন, নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন। ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল অ্যালান। পথে শ্বেতাঙ্গদের দেখলে সে আত্মীয়তার বদলে অনুভব করত পুঞ্জিত তিক্ততা। বিদেশী তামাক ও বিদেশী টুথপেস্ট কেনা সে ছেড়ে দিল. সেন-ভবনের উদার আতিথ্যের ফলে তার কেনাকাটার উপলক্ষ্য ছিল যৎসামান্যই, তবু যেটুকু সে নিজ হাতে কিনত, দেশজ দ্রব্যই কিনত। হ্যারল্ডের সঙ্গে তার রীতিমতো ঝগড়া হয়ে গেল : ভারতীয় সমাজের পক্ষ নিয়ে তার উত্তেজিত উক্তিগুলি চমকে দিল হ্যারল্ডকে।

একদিন বাড়ি ফিরতেই টেবিলের উপর মৈত্রেয়ীর চিরকুট : 'লাইব্রেরীতে চলে এস'। মৈত্রেয়ী অপেক্ষা করছিল অধীরভাবে, তার চোখেমুখে সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। ব্যাপার কি?...খোকা সব কিছু জানে... আমাদের এবার সত্যি সত্যি সম্পর্কটা পাকা করে নেওয়া দরকার, নইলে বিপদ ঘটবে।' দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ল লেকের অভিমুখে। সেখানে অ্যালানের হাতে সোনা ও লোহার তার জড়িয়ে তৈরি, সবুজমণি-বসানো এক আংটি পরিয়ে দিল মৈত্রেয়ী। আসলে বাগদানের রীতি হিসেবে সোনায়-লোহায় গড়া চুড়ি মৈত্রেয়ীরই পরার কথা, কিন্তু তাতে সে ধরা পড়ে যাবে।

আংটি পরাতে পরাতে লেকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে শপথ-গ্রহণের ভঙ্গিতে গাঢ়স্বরে উচ্চারণ করল মৈত্রেয়ী : 'হে পৃথিবী, তোমার নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আমি শুধু অ্যালানের—আর কারও নয়। তোমার মধ্যে যেমন ঘাসের, তার মধ্যে তেমনই আমার উন্মেষ, বৃষ্টির জন্য তুমি যেমন প্রতীক্ষা কর, আমিও তেমনই প্রতীক্ষা করব তার জন্য, তোমার কাছে যেমন সূর্যকর, আমার কাছে তার দেহ-ও হবে তা-ই...।' সেই মুহূর্তেই তার মন থেকে লুপ্ত হল সব আশঙ্কা ও পাপবোধ।

সেই রাত্রে আকস্মিক অসুস্থতা-বশত ছবু মৈত্রেয়ীর ঘরে শুল না, আর মৈত্রেয়ী শুতে এল অ্যালানের ঘরে। সেই রাত্রেই মৈত্রেয়ীর স্বেচ্ছপ্রণোদিত দ্বিধা-হীন আত্মসমর্পণ ঘটল প্রথম : 'এ-মিলন, জান, ভগবানেরই আদিষ্ট। নইলে আজ এই অঙ্গুরীয়দানের দিন-টিতেই, ছবু আমার ঘরে শুতে আসবে না কেন?' তারপর থেকে দুজনে রোজ একত্রেই রাত্রিযাপন করতে থাকল।

...ছবুর অসুখ বেড়ে চলে। বাড়িতে দেশী-বিদেশী বড় বড় ডাক্তারদের আনাগোনা, টোটকা-চিকিৎসা, কীর্তন। নরেন্দ্রনাথও চক্ষুপীড়ায় শয্যাশায়ী। এই সুযোগে মৈত্রেয়ী কৌশলে মা-কে একবার বাজিয়ে দেখতে যায়। এক কাল্পনিক গল্প ফাঁদে : অ্যালান অনুসূয়া নামে কোনো এক বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, সমস্যা এই—কিভাবে তার পাণিপ্রার্থনা করবে। হতাশ করা জবাব এল মিসেস্ সেনের কাছ থেকে : 'এসব নিয়ে কখনোই শুভ হয় না। পরিবারের গুরুজন বাবা—মারা জানেন বিয়ে কোনো ছেলেখেলা নয়, যাঁরা জীবনের স্বরূপ চেনেন তরুণ-তরুণীদের চেয়ে ঢের বেশি—তাঁদের সম্মতি, সমর্থন ও অভিভাবকত্ব ছাড়া, শুধু বাঁধনহারা আবেগের উপর শক্ত কিছু গড়ে ওঠে না কখনো...।'

বুঝল মৈত্রেয়ী। বুঝল যে, অ্যালান হিন্দু হলেও, সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। নানা অসম্ভব পরিকল্পনা ঘোরে তাদের মাথায়। মৈত্রেয়ী এমন পর্যন্ত প্রস্তাব করে বসে একদিন : 'ধর, আমায় যদি ধর্ষণ করে কেউ—জোর করে? তাহলে তো ওঁরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেনই, নইলে অভিশাপ নামবে সারা পরিবারের উপর। তখন তোমার বৌ হতে আর বাধা কোথায়? আমি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হব, খৃস্টানদের কাছে তো আর বল-প্রয়োগে ধর্ষিত হওয়াটা পাপ নয়...।'

ইতিমধ্যে মৈত্রেয়ীর সতেরো বছর পূর্ণ করে এসে পৌঁছোল তার জন্ম-বার্ষিকী, আর ঠিক এই সময়েই তার একটি কবিতার বই 'উদ্ধতা' প্রকাশিত হয়ে সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত হল। জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন বঙ্গদেশের তাবৎ জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায়—অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাদে, তিনি তখন য়ুরোপে। এলেন 'শ্রীকান্তের' রচয়িতা শরৎচন্দ্র, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সমস্ত লেখক, তখনকার দিনের উদীয়মান ও বহু-আলোচিত তরুণ কবি 'অচিন্ত্য', জেম্স জয়েসের য়ুলিসিস্-এর ধরনে রচিত যাঁর সদ্য-প্রকাশমান উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনপন্থী লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতি-বাদ ও আক্রমণের ঝড় জাগিয়ে তুলেছে, আর এলেন রঙিন ব্যক্তি উদয়শঙ্কর, নৃত্যের গূঢ়তত্ত্ব শেখার আশা নিয়ে যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করে ছিল মৈত্রেয়ী—সাগ্রহে।

অ্যালান শুনেছিল, তিনি রূপবান। খুব কাছে থেকে দেখলে তাকে তত সুন্দর ঠেকে না অবশ্য, কিন্তু অ্যালানকে মানতে হল তাঁর সম্মোহন, তাকে স্বীকার করতে হল, তার জানাশোনার মধ্যে তিনি সবচেয়ে মুগ্ধতা-জাগানো পুরুষ। তাঁর দেহ শক্তসমর্থ, আর তবু ভঙ্গিতে আশ্চর্য কমনীয়তা, চেহারায় নারীসুলভ লাবণ্য ও স্নিগ্ধতা জড়িয়ে আছে। মৈত্রেয়ী তাঁকে নিয়ে দল থেকে আলাদা হয়ে গেল, চা-পানের আমন্ত্রণ জানাল ব্যালকনিতে। অ্যালানের মনে দেখা দিল নৈরাশ্য—উদয়শঙ্করের প্রতি ঈর্ষা; অমন চিত্তাকর্ষক পুরুষের মনো-হরণশক্তি নিশ্চয়ই অপ্রতিরোধ্য। তবে তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হতে সে পারল না, বরং এই ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেল : মৈত্রেয়ীর চোখে ঐ নৃত্য-সম্রাটের প্রতি দেখা দিক প্রেমের ঝলক, তাহলেই মুহূর্তে সে মুক্ত, সব সমস্যার ও দুর্ভাবনার অবসান। কিন্তু না, নৃত্য-সম্রাট মৈত্রেয়ীর মন কাড়তে পারলেন না, অ্যালানকে সে বলল : 'আমাকে উনি নৃত্য-রহস্য শেখাতে পারলেন না। ছন্দের তিনি কিছুই বোঝেন না...বইয়ের মতো কথা বলে যান। শুধু ভাবি, এটাও কি সম্ভব, নৃত্য লোকটিকে বুদ্ধিমান করে তুলতে পারল না?'

...নরেন্দ্রনাথের হাওয়া-গাড়ি চড়ে রোজ বেড়াতে যেত অ্যালান আর মৈত্রেয়ী—ছবুকে নিয়ে লেকে। একদিন চুম্বনরত অবস্থায় ছবুর চোখে ওরা ধরা পড়ে যায়। পরের দিন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ডাকতে এল না। ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে অ্যালান জানতে পারল : গৃহকর্ত্রীর নির্দেশ। বুঝতে বাকি রইল না, ছবু তার মাকে সবই জানিয়েছে। মৈত্রেয়ী—নীলু বলল—প্রথমটায় অস্বী-কার করেছিল, শেষে স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ, সে চুমো খেয়েছে বটে, তবে তা ঠাট্টার ছলে, আর অ্যালান তাকে কপালে চুমো খেয়েছে। বাবাকে কিছু না বলার জন্য মা-কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানি-য়েছে মৈত্রেয়ী। আসলে ভয়, বাবা যদি তাকে ঘরে তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ তালাবন্ধ করে রেখে অ্যালানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার সুযোগটুকু পর্যন্ত না দেন।

শহর-ত্যাগের মতো সাধারণ বোধশক্তিটুকু আপনার আছে। আপনাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ আমি দিয়েছি। আপনার বেতন বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আপনি আপনার অন্যত্র গমনের ব্যবস্থা করবেন, আশা করি। কৃতঘ্নতারও একটা সীমা আছে।'

...অ্যালান বেরিয়ে পড়ে হোটেল থেকে। ক্লাইভ স্ট্রীটে তার ব্যাংক। সেখানে কিছু টাকা তোলে। তারপর হাঁটতে থাকে। বৃষ্টি পড়ে চলেছে, ভিজতে ভিজতে অ্যালান হেঁটেই পৌঁছোয় বেলুড় মঠে। সেখানে এক পরিচিত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা। অ্যালানকে এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন? তিনি জানতে চান সব কথা। তারপর গভীর আবেগের সুরে পাগলামি ভুলে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেন। এই হিন্দু সন্ন্যাসীরা—এঁরা কাউকে কখনো প্রকৃত সান্ত্বনা দিতে পারেন না। যন্ত্রণায় যে-মানুষ নুয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে তাঁকে ওঁরা করুণার অযোগ্য মনে করেন। ওঁদের সেই অমানবিক স্থৈর্যের নির্লিপ্তির আদর্শ ওঁদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে দুর্বল ক্লেশভোগী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।' আর তাছাড়া সে তো বেলুড়ে যায় নি সান্ত্বনার সন্ধানে, গিয়েছিল তাদের সেই একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া জায়গাটিতে আরেকবার মৈত্রেয়ীকে ফিরে পাওয়ার আশায়...। পায়ে হেঁটে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমান। আরো বিধ্বস্ত চেহারায়, ছিন্ন-ভিন্ন বেশবাসে, কিছু দিন পর কলকাতায় প্রত্যাগমন।

খোকা এল আবার খবর নিয়ে। মৈত্রেয়ীকে তাঁরা জোর করে বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী এতটুকু টলে নি, সোজা বলে দিয়েছে বিয়ের রাত্রেই স্বামীকে সে জানিয়ে দেবে অ্যালানের সঙ্গে তার মিলনের কথা। নরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীকে মুখের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন পরে মিসেস সেনের আদেশে ড্রাইভারের হাতেও প্রহার সহ্য করতে হয়েছে মৈত্রেয়ীকে। খোকার হাতে মৈত্রেয়ী পাঠিয়েছে একটি করবী ফুল, সঙ্গে ছোট একটি লিপি : 'অ্যালান, তোমার কাছে আমার শেষ উপহার'। খোকা অ্যালানকে অনুরোধ করল উত্তরে কয়েক ছত্র লিখে দিতে। অ্যালান বলল, 'না'। নরেন্দ্রনাথের কাছে তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি কি সে সত্যিই দিয়েছিল?

কয়েক দিন বাদে আবার মৈত্রেয়ীর ফোন : 'অ্যালান, প্রিয়তম বিদায়; আরেক জন্মে আমাদের দেখা হবে। হবেই। তখন কি তুমি আমাকে চিনতে পারবে? আমার জন্য অপেক্ষা করবে তুমি? ...আমাকে ভুলো না। আমি নিজে তোমার অপেক্ষায় আছি। আর কেউই কোনো দিন আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

সেন-ভবন থেকে বেরিয়ে আসার দিন সাতেক পর অ্যালান কলকাতা থেকে বিদায় নিল হিমালয় অভিমুখে। শেষ দুটি রাত সে কাটিয়েছিল মৈত্রেয়ীদের বাড়ির সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে, মৈত্রেয়ীর জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সে জানালা অন্ধকারই থেকেছিল সর্বক্ষণ।

হিমালয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে আসতেই আবার খোকার আবির্ভাব। মৈত্রেয়ীর চিঠি নিয়ে এসেছে তাতে কোনো পার্কে বা সিনেমায় একবার দেখা করার জন্য অনুরোধ। অ্যালান এবারও বলল 'না'। সারা দিন অবিশ্রান্ত ফোন আসতে থাকল মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে। মৈত্রেয়ী আঁকড়ে ধরতে চাইছে যত, ততই বাড়ছে অ্যালানের যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এমন একটা কিছু করে ফেলে, যাতে মৈত্রেয়ীর প্রেমে ফাটল ধরে, ঘৃণা জন্মে। কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে গিয়ে বসবাস করলে কেমন হয়?...তারপর খোকার মারফৎ সে খবরটা মৈত্রেয়ীকে...?

খোকা বারবার আসে চিঠি নিয়ে। অ্যালান সেগুলো খোলে না পর্যন্ত। খোকা জানায়, মৈত্রেয়ী ভারি লজ্জাকর একটা কাজ করে ফেলবে বলে স্থির করেছে। যে-কারও কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সে প্রস্তুত। তাহলে বাবা-মা তাকে দূর করে দিতে বাধ্য হবেন। তখন সে অ্যালানের সঙ্গে মিলিত হবে আবার।

......সিঙ্গাপুরে একটা চাকরি জুটে যায় অ্যালানের। তারপর একদিন মিসেস সেনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে অ্যালান শোনে সেই হৃদয়বিদারক সমাচার। এক ফল-ব্যবসায়ীর কাছে মৈত্রেয়ী আত্ম-নিবেদন করেছে...গর্ভিণী অবস্থায় তাকে মেদিনীপুরে পাঠানো হয়েছে। লোকটাকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, মোকদ্দমাও চলেছে কিন্তু না মৈত্রেয়ীর উদ্দেশ্য সফল হয় নি, নরেন্দ্রনাথ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেননি : যদি মৈত্রেয়ী মরেই, তবে তাঁদেরই হাতে মরুক, এই তাঁরা চান। ভগ্নমনোরথ মৈত্রেয়ী শুধু বিরামহীনভাবে বলে চলেছে, 'আমায় কেন তাড়িয়ে দিচ্ছ না?'...ভদ্রলোকের ধারণা, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আমি বসে বসে ভাবি

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বসে বসে ভাবি। কিছু স্থির করে উঠতে পারি না। তার কথা নরেন্দ্রনাথকে? মৈত্রেয়ীকে চিঠি লিখব? বুঝি, আমারই জন্য ও এই বোধবুদ্ধিহীন পথে ঝাঁপ দিল। খোকার আনা চিঠিগুলো তখন পড়িনি কেন?...'

তুমি নাই প্রিয়া

'বঙ্গযামিনী'র লেখক— মির্চা এলিয়াদ—একজন রুমানীয় দার্শনিক। ফ্রান্সে অনেক দিন থাকার দরুন তাঁর বহু গ্রন্থ ফরাসিতে রচিত। বর্তমানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

'বঙ্গযামিনী'র লেখক 'বঙ্গযামিনী'র নায়কের সমবয়সী। অ্যালান যে সময়ে কলকাতায় (ওয়েলেসলি স্ট্রীটের রিপন ম্যানসনে) বাস করত, সে-সময়েই এলিয়াদ কলকাতায় (রিপন স্ট্রীটে) বাস করতে এসেছিলেন, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গবেষক ছাত্র হিসেবে। শুধু তাই নয়। 'শ্রীরামপুরে মধ্যরাত' নামক তাঁর আরেকখানি গ্রন্থের শেষভাগে আমরা পড়ি : বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো ঘটনাচক্রে কলকাতা ছেড়ে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল হরিদ্বারের অদূরবর্তী হিমালয় অঞ্চলের এক মঠে—হারানো শান্তির অন্বেষণে...।' কলকাতা ত্যাগ, হিমালয়-প্রবাস, অপহৃত মানসিক শান্তি- এই সুস্পষ্ট সূত্রগুলি তবে কি এই অনুমানের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যে 'বঙ্গযামিনী'তে এলিয়াদ-এর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে?'

জানি না। প্রশ্ন জাগে : 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে কোনো বাংলা সাহিত্যপত্র সত্যিই ছিল কি?...আর ষোড়শী যুবতীর মুখে 'রবি ঠাকুর' কথাটা কি একটু কৃত্রিম ঠেকে না?... তবে স্বীকার করতে হবে 'বঙ্গযামিনী'র বহির্জগৎ ও চরিত্রগুলি সম্ভাবনারহিত নয়। উপন্যাসের নামপত্রে লেখক দীর্ঘশ্বাসবিধুর এই উদ্ধৃতি বাংলা ভাষায়ই মুদ্রিত করেছেন 'তোমার কি মনে আছে?.. যদি থাকে, তাহলে কি ক্ষমা করতে পার?' স্মৃতিমেদুর বেদনায় সাগ্রহ উচ্চারিত এই প্রশ্নটা কি কোনো বাস্তব মূর্তির উদ্দেশে জিজ্ঞাসিত হয়েছে?

অ্যালানের প্রেমিকার বয়স আজ ষাটের কাছাকাছি।

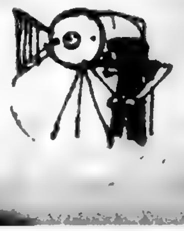

আত্মহত্যার পর

দেবল দেববর্মা

চোখ বুজলেই কেমন অস্বস্তি লাগে। ভয় ভয় করে। পাহাড়ের মাথায় বন বিভাগের একটা বাংলো শুধু। মানুষজন বলতে দুটি ফরেস্ট গার্ড আর চৌকিদার। তাছাড়া আশে-পাশের গাঁয়ের দেহাতী মানুষ। বনের মধ্যে প্রায় ওরা এদিকে সেদিকে যায় আসে।

কিন্তু এই অবেলায় কে আবার নির্জন পাহাড়ে উঠল? নিশ্চয় বাংলোতে রাত্তির কাটাবে। অবশ্য অসুবিধের কিছু নেই। বাড়তি একটি কামরা আছে। সুমিতারা সেটা দখল করেনি। তার খেয়াল ছিল না। নইলে চৌকিদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত। বিকেল-বেলায় আজ কার আসবার কথা আছে?

জিপ এসে খানিকটা দূরে থামল, সুমিতা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। মানুষটা একা। সঙ্গে কেউ নেই। একটা পিওন নেই। এমনকি ড্রাইভার পর্যন্ত আনেনি। কে জানে লোকটা সরকারী অফিসার কিনা। গাড়িটা তো নিজেই চালিয়ে এসেছে। সুমিতা আড়চোখে দেখল, কয়েকবার। ওর বয়স কম। সুরঞ্জনের চেয়ে ছোট হবে। বেশ লম্বা, পাতলা গড়ন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। সে জিপের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা চামড়ার সুটকেস আর ছোট্ট মতন বিছানা বের করল। তারপর সেগুলি হাতে ঝুলিয়ে লম্বা পা ফেলে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

মানুষটা কাছে আসতেই সুমিতা ভীষণ অবাক হল। ঝোপের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য দেখা সরীসৃপের মত একটা অস্পষ্ট সন্দেহ তার মনে একটু আগেই উঁকি দিয়েছে। ওর চলার ভঙ্গি, তাকানোর ধরণটা অবিকল সেই রকম। কিন্তু তাই কী সম্ভব? ভূ-ভারতে আর জায়গা নেই। এই পাহাড়ের চূড়োয় পাণ্ডব-বর্জিত দেশে সে আসতে যাবে কোন দুঃখে?

আবছা অন্ধকার হলেও কাছের মানুষকে চেনা যায়। আর চোখ দুটোকে অবিশ্বাস করবে কেমন করে? তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্ণেন্দু। জলজ্যান্ত মানুষটা। সুমিতার পা দুটো ঈষৎ কাঁপছিল। গলাটা কেমন শুকনো লাগছে। তার বুকের ভিতরটা এমন টিপ টিপ করছে কেন? এই ভর সন্ধেবেলায় ওকে দেখে সে ভয় পেল নাকি?

স্বর্ণেন্দু নিজেও হতবাক। চোখের পলক পড়ে না। এই অজানা অচেনা অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় বাংলোর সামনে সুমিতা দাঁড়িয়ে আছে। তাই কী সে ভাবতে পেরেছিল? অনেকক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল—'সুমিতা না?' ফের ভুরু কুঁচকে যেন একটু মজা করে বলল—'আমাকে দেখে অমন চমকে উঠলে কেন? মনে হচ্ছে একটুও খুশী হওনি?'

খুশী! সুমিতা কী উত্তর দেবে ভাবছিল। দেখা হলে সে আহ্লাদে আট-খানা হবে এমন কোনো কারণ নেই। স্বর্ণেন্দু তা জানে। অথচ কী নির্লজ্জ,

বেহায়া মানুষ। তাকেই ফের সে প্রশ্ন করছে। বরং সুমিতা যে এখনও মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, তাই ঢের। মানুষটাকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। মিথ্যেবাদী, প্রতারক, ভণ্ড। ভাগ্যিস সময় মতো সব এক্কেবারে ফাঁস হয়ে গেল। নইলে সুমিতার কী সর্বনাশ হত, তা ভাবলে সে এখনও শিউরে ওঠে।

স্বর্ণেন্দু নিজেই বলল,—'কথায় আছে ভাদরের রোদ্দুর। [illegible] থেকে বেরিয়েছি সেই দুপুরবেলায়। গরমে, খান্‌ন কী দুর্ভোগ!' এদিক ওদিক তাকিয়ে সে মুচকি হাসল। শুধোল,—'তোমার উনি মানে মিস্টার কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছিনে।'

—'আসবে এখুনি।' সুমিতা ইতস্তত করে জবাব দিল। বলল, 'পাহাড়ের নীচে একটা ফরেস্ট ব্লক আছে। আজ দুপুরে সেটা ইন্সপেকশন করবার কথা। বোধহয় সেখানেই আছে।'

—'তাই নাকি?' স্বর্ণেন্দু মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকাল। ফের গাছপালায় ঢাকা টাটকু পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,—'সেই দুপুরবেলায় বেরিয়েছেন বলছ। কিন্তু এখন তো সন্ধ্যে হতে চলল। এতক্ষণ ভদ্রলোকের ফেরা উচিত ছিল। সমস্ত দুপুর বনের মধ্যে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া কখনও উচিত হয়নি।'

অন্য কারো মুখে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার কথা শুনলে সুমিতার অনেক ভালো লাগত। বিশেষ করে সহানুভূতির প্রলেপ মাখানো এমনি ছোটখাটো উদ্বেগ। সুমিতা নিশ্চয় হেসে উত্তর দিত,—'আর বলবেন না। আমার জন্যে কী মানুষটার এতটুকু দুশ্চিন্তা আছে? উনি নিজের কাজকর্ম নিয়ে মত্ত। বনের মধ্যে পড়ে রইলাম কিম্বা বাঘের পেটে গেলাম কে তার খোঁজ রাখছে?'

বাড়ির পিছন দিকে ছোট কিচেন রুম। ফরেস্ট বাংলোগুলি খুব সুন্দর হয়। বেশ কায়দামাফিক তৈরি। কিচেনে শুধু চা কেন, রান্নাবান্না সব কিছু সেরে নেবার সুবন্দোবস্ত। স্টোভে জল বসিয়ে চুপ করে ভাবছিল সুমিতা। স্বর্ণেন্দুর কথা তার বহুদিন মনে হয়নি। প্রায় ভুলতে বসেছিল।

কেটলীতে সোঁ সোঁ করে জল গরম হবার শব্দ শোনা গেল। চায়ের কৌটো কিম্বা চিনির শিশি কি একটা জিনিস খুঁজবার জন্য পিছন ফিরতে গিয়ে সুমিতা প্রায় চমকে উঠল। একেবারে কাছে স্বর্ণেন্দু চুপ করে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ নিশ্চয় তাকে দেখছিল। মানুষটা শুধু স্পেক্টা নয় ভীষণ আদেখলে। আশ্চর্য! এর আগে কী সুমিতাকে কোনোদিন দেখেনি?

তার চোখের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণেন্দু বলল,—'জানো, পথে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে। ঠা-ঠা রোদ্দুর। তারপর সমস্ত রাস্তা একা মুখ বুজে আসা: একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু এখন দেখছি না এলে ঠকতাম।

স্বর্ণেন্দু কণ্ঠস্বর ঈষৎ খাটো করে বলল,—'গড়বেতার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তোমার?'

কেটলীর ঢাকনীটা বন্ধ করে পিছন ফিরল সুমিতা। এবার স্বর্ণেন্দুর মুখোমুখী। সে ভুরু কুঁচকে ব্যঙ্গের সুরে কথা কইল,—'গড়বেতার দিনগুলো মনে পড়ে বৈকি। একদিন রাত্তির বেলায় তুমি হঠাৎ চোরের মত পালিয়ে গেলে। পরে শুনলাম থানার বড় দারোগা তোমার খোঁজ করছিল। কারা যেন প্রিন্সিপ্যালকে বলেছে, তুমি নাকি স্বর্ণেন্দু নও। একটা জাল লোক। অন্যের নাম, সার্টিফিকেট নিজের বলে চালিয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছিলে।' এক মুহূর্ত থামল সুমিতা। ফের মুচকি হেসে নিপুণ অভিনেত্রীর মত ঢঙ করে বলল,—'সেদিন পালিয়ে গিয়ে কিন্তু ভালই করেছিলে। নইলে রাত্তিরে হাজতবাস। তারপর বলা যায় না। বিচারে সাজা,—মানে কিছুদিন শ্রীঘর বাস করতে হত।'

কাছে এসে সে কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'আমার বাকসে অনেকগুলো চিঠি আছে সুমিতা। এক-আধটা দেখবে নাকি? গড়বেতার কথা হয়তো মনে পড়তে পারে।'

চিঠি! সুমিতা প্রায় চমকে উঠল। মনে মনে সে আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজছিল। লোকটা ফের তাকে কোণঠাসা করতে চাইছে। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল সুমিতা। ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল,—'চিঠিগুলো নিশ্চয় তোমাকে লিখিনি। আমি জানতাম স্বর্ণেন্দু রায় নামে এক ভদ্রলোককে। তিনি ইংলিশ-এর এম-এ, ভালো ছাত্র। তুমি একটা জাল,—ইম্পস্টার। তার নাম ভাঁড়িয়ে অনেককে ঠকিয়েছ।'

কিন্তু লোকটা রাগল না। আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠল না। বরং সে হাসল। শান্তকণ্ঠে বলল,—'তুমি মিছিমিছি চটছ সুমিতা। জানি, চিঠিগুলো আমার নয়। ওগুলো আমাকে লেখনি। যাকে লিখেছিলে; এই পৃথিবী ছেড়ে সে অনেকদিন আগে চলে গেছে। স্বর্ণেন্দু বেঁচে থাকলে পত্রগুলো নিশ্চয় আমি তাকে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু উপায় নেই। তাই বাকস-বন্দী চিঠির বাণ্ডিল নিয়ে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

চিঠির বাণ্ডিলটার কথা ভাবছিল সুমিতা। কতগুলো চিঠি আছে ওর কাছে? বিশ-ত্রিশটি তো নির্ঘাৎ হবে। বরং আরো বেশী হতে পারে। আশ্চর্য মানুষ! এতদিন ধরে সুমিতার প্রেমপত্রগুলি সযত্নে রেখেছে। একটাও নষ্ট করেনি। নির্বিবাদে সেগুলি বাকস-বন্দী করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চায়ের পেয়ালা হাতে দুজনে ফের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। টাটকু পাহাড়টা এখন অন্ধকারে ঢাকা। দূরের গাছপালা, বনজঙ্গল, চোখের সামনে অস্পষ্ট নয়। বরং অদৃশ্য বলা চলে।

সুরঞ্জনের ফেরবার সময় হল। সুমিতা ভাবছিল কেমন করে ওর কাছে চিঠির বাণ্ডিলটা চাইবে। শুধু প্রেমপত্র নয়। তার ছবিটাও নিশ্চয় ওর কাছে রয়েছে। কিন্তু জিনিসগুলো ফেরত দিতে যদি সে অস্বীকার করে। কোনো ওজর-আপত্তি কিম্বা অজুহাত তোলে।

সুমিতা মৃদুস্বরে বলল,—'চিঠির বাণ্ডিলটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ কেন? হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তারপর কারো হাতে গিয়ে পড়লে—'

—'এখন আর সে ভয় নেই। আসল মানুষকে পেয়ে গেছি। যার জিনিস তার হাতে তুলে দেব। তারপর চিঠিপত্র, ছবি-টবি দেখে সে যা ইচ্ছে করবে।'

অন্ধকারে হাসল সুমিতা। তবু ভালো। লোকটার সুবুদ্ধি হয়েছে। চিঠির মালিক তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাপু। তাহলে দেরি কেন? এবার সুড়সুড় করে আমার প্রেমপত্রের বাণ্ডিলটা বের করে দিলেই পার।—

হঠাৎ দূর থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। এক মুহূর্ত কান পাতল সুমিতা। ঈষৎ উৎফুল্ল গলায় বলল,—'সুরঞ্জন আসছে।'

—'ভালোই হল।' লোকটা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে হাসল। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—'আসল মানুষকে এখুনি সামনে পাব। চিঠির বাণ্ডিল আর তোমার ছবিটা ওর হাতে তুলে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

—'শোনো।' সুমিতা প্রায় মিনতি করে বলল, 'চিঠিগুলো আমাকে ফেরত দিতে পার না?'

লোকটা ফের হাসল। এমন গা-জ্বলানো হাসি। বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে বলল,—'দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে।'

ফের শর্ত! সুমিতা ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ঈষৎ গলা খাটো করে লোকটা বলল,—'আজ রাত্তিরে আমার ঘরে আসবে?'

—'তোমার ঘরে?'

—'হ্যাঁ। সুরঞ্জনবাবু ঘুমিয়ে পড়লে। এই ধর রাত বারোটা কিম্বা তার পরে।—'

সুমিতা সব বুঝতে পারল। নিখুঁত প্ল্যান। চমৎকার ফাঁদ পেতেছে লোকটা। রাতদুপুরে ওর ঘরে ঢুকলে

আবরণ

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

শান্ত পায়ে মিষ্টি একমুখ হাসি নিয়ে ভীমা দুটি চোখের পাতা নামিয়ে নত সন্ধ্যার মত যে এসেছিলো রায়-বাড়ীর প্রথম বধূ হ'য়ে সেই ঊর্মিমালাকে যে কথা বলেছিলো নিভৃত নির্জনে—সে কথা তো চিরদিনের মত জিভ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সন্দীপনের। শুধু মাত্র শূন্যতার মধ্যে সে কুড়িয়ে পেয়েছে মিতাকে — পারমিতা — ঊর্মির এক-টুকরো স্মৃতি।

ঠিক তিন বছর আগে মিতাকে পৃথিবীর আলোয় দেখে সেই মুহূর্তে আঁধারে ডুবে গেছে ঊর্মিমালা।

মিতার জন্য মন - চুরমার শুধু মিতার জনাই আবার বিয়ে করতে হ'লো সন্দীপনকে।

হ্যাঁ—মিতার জন্য বৈকি মাচেং প্রফেসর সন্দীপন রায় কোলকাতার প্রতি-ষ্ঠিত পরিবারের সুপুরুষ ছেলে হয়েও বিয়ে করে আনলো পাড়াগাঁয়ের নিকষ কালো এক অশিক্ষিতা মেয়েকে। সন্দীপনের ধারণা ছিল ওর কিছুই না থাকুক থাকবে গ্রাম্য সরলতায় ভরা মন, থাকবে অন্তরভরা ভালোবাসা। অবশ্য তার পরিচিত সবাই বলেছিল—একি করেছো সন্দীপন, কোলকাতায় কি এতই সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের অভাব ছিলো যে দূর পাড়াগাঁ থেকে একটা অশিক্ষিতা কালো রোগা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসছো?

না—সে কথার উত্তর দেয়নি সন্দীপন—হেসেছিলো, আত্মবিশ্বাসের হাসি।

আজকে কোথায় মিলিয়ে গেল তার সে হাসি। সেই দৃঢ়তায় ভরা আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর সন্দীপন মিতাকে মায়ের স্নেহ দিতে পারবে বলে যে মেয়ে-টাকে বিয়ে করে নিয়ে এলো—সেই গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে বোবা-বোবা হ'য়ে। রোমন্থন করছে কি কথা সে প্রথমক্ষণে বলেছিল ঐ মেয়ে-টিকে—অর্থাৎ তার নব-বিবাহিতা বধূকে। বলেছিলো—মনে করো না—এ আমার আবেদন অপরাজিতা তোমার কাছে জীবনে আমার প্রথম অনুরোধ মিতা আমার মেয়ে—পারমিতা যেন তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

সন্দীপনের সেই করুণ আবেদনের উত্তরে নীচু হ'য়ে থাকা মাথাটা উঁচু করলো অপরাজিতা।

চমকে উঠলো সন্দীপন। তার মনে হ'লো বিষধর একটা সাপ বুঝি মাথা তুললো আচম্বিতে। তারপর বুঝি ওর জিভ থেকে বিষ নির্গত হ'লো স্বর-ধারায়। এমনি করে সে বললে—আমার উপরই বা এতটা আশা করবার সাহস পেলে কি করে? নির্লজ্জের মত বিয়ে করতে পারলেই বা কেন? সতীনের মেয়েকে স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলছে কজন সংমা? বইতেই লেখা থাকে শুনেছি। বোঝা—একটা বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে দ্বিধা হ'লো না? অনেক বছর তো পার করে এসেছো। বাকী কটা দিন মেয়েকে মানুষ করে কাটাতে পারতে না?

জ্ঞান দিতে এসেছো বুড়ো। মাষ্টারী করতে এসেছেন—

অপরাজিতার একথার পর আর সব কথা যেন হারিয়ে গেল সন্দীপনের জিভ থেকে। নিশ্চল পাথর হ'য়ে গেছে সে। ধৈর্যের রাশ দিয়ে নিজের মনকে আয়ত্তর মধ্যে রেখে পর পর কয়েকটা সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লো সে।

ঊর্মিমালার যে গহনার বাক্স থেকে অপরাজিতাকে পরিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল সব একে একে খুলে আলমারীতে রেখে সন্দীপনের পাশে রাখা বালিশে শুয়ে পড়লো অপরাজিতা। ঠোঁটের রেখায় রেখায় তার বিদ্রূপের রেশ। কঠিন কঠোর তার চোখের দৃষ্টি, সীমাহীন চিন্তায় বিভোর সন্দীপন ঘুমের কোলে আশ্রয় নিলো নিজের অজানায়।

মাঝরাতে মিতার কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল সন্দীপনের। বুঝতে পারছে অন্যদিনের মত আজও শান্ত করবার জন্যে অনেক চেষ্টাই ব্যর্থ হ'চ্ছে মিতার দিদিমার—অর্থাৎ ঊর্মিমালার মায়ের।

জীবনের একমাত্র অবলম্বন মেয়ে-টিকে সন্দীপনের সংগে বিয়ে দিয়ে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একমাত্র ছেলে সন্দীপনকে নিয়েই বালীগঞ্জের এই বাড়ীতে ছিলেন মা। এ বাড়ী তার বাপের বাড়ীর পাওয়া।

মমতাময়ী মা বোনের স্নেহে সাদরে ডেকে নিয়েছিলেন ঊর্মির মাকে। আজ সন্দীপনের মা বেঁচে নেই, কিন্তু ঊর্মির মাকে থাকতেই হলো মিতার জন্যে আর তাঁরই আগ্রহে বিয়ে করতে হ'লো সন্দীপনকে।

তবু কিন্তু বিয়ের পর থেকে ঐ মহিলার মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন যেন দ্বিধা হ'লো সন্দীপনের। ও যেন চুরির অপরাধে অপরাধী আসামী এমন কি মাত্র তিন বছরের মেয়ে মিতার কাছেও বুঝি তার অপরাধের শেষ নেই। একদিনের মধ্যে তাকে একবারও কাছে ডাকতে পারেনি সন্দীপন, আত্মীয়-স্বজনের চাপা গুঞ্জন তার কানে এসেছে। ওরা বলছে—একজন এলো আর দুজন পথে নামলো।

সব শুনে সন্দীপন হেসেছিল আত্ম-বিশ্বাসের হাসি, সেই হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার ঠোঁট থেকে। এখুনি তার মনে হ'লো যে সানাই আগমনী গানে সারাদিন মুখর হ'য়ে ছিল সে সানাই যেন থামলো বিসর্জনের গান গেয়ে। থেমে গেল চির-দিনের মত—থেমে গেল যেন শক্তিমান কর্মঠ সন্দীপন। সন্দীপনের এলোমেলো চিন্তার মাঝে মিতার কান্না সমানভাবে চলছে তখনও। কাঠের মত শক্ত হ'য়ে শুয়ে আছে সে।

অনুভব করছে তারই পাশে ঘুমিয়ে থাকা মহিলা ছটফট করছে যেন, অজানা ভয়ে শিউরে উঠলো সন্দীপন।

এখুনি হয়তো সদ্য ঘুম ভাঙা বিরক্তিতে ও বলবে, ডাকো কাকে ঘুমোবার উপায় নেই যেখানে সেখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। না কিছুই বললো না অপরাজিতা, উঠে বসলো খাটের উপর। তারপর খাট থেকে নামলো। আলোর

সুইচ টিপলো। তারপর দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। কোথায় গেল অপরাজিতা। এ-বাড়ির কতটুকু বা চেনে ও।

তার পিছনে একটু আড়ালে চললো সন্দীপন। দাঁড়ালো একটা থামের আড়ালে। কিন্তু এ-কি, জেগে কি স্বপ্ন দেখছে সে?—দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে যেখানে নাতনীকে নানা উপায়ে ভোলাবার চেষ্টা করছেন তার দিদিমা—তারই পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো অপরাজিতা। ভদ্রমহিলার আসন্ন দুর্গতির কথা চিন্তা করে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো সকর্ণ সন্দীপন। কিন্তু সন্দীপনের সব ধারণাই কি ভুল হ'লো? পরম একটা বিস্ময় ছুটে এলো তার কানে। চোখের তারা বড় করে কান দুটোকে তীক্ষ্ণ করে সে শুনলো অপরাজিতা তার সেই কঠিন স্বরে বললে,—

দাও—ওকে আমার কাছে দাও—

অ্যাঁ, আচম্বিতে মিতার দিদিমার চোখ অপরাজিতার চোখে আটকে গেল। বোবা একটা অনুভূতিতে ভরে গেল!

সে দিকে চেয়ে অপরাজিতা বললে—অমন করে চেয়ে দেখছো কি? আমার কাছে দাও, রাত জেগে জেগে মরতে তোমার দেরী নেই দেখছি। ওকে আমার কাছে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।

অয়—চির পরিচিতের মত দু'হাত বাড়ালো মিতার দিকে। আর কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিতার দিদিমার কাছ থেকে কান্নারতা মিতা ঝাঁপিয়ে পড়লো অপরাজিতার কোলে। পথ চলতে কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের মত ওকে বুকে আঁকড়ে ঘরে চলে গেল অপরাজিতা।

শান্তির হাসিতে, নিশ্চিন্তের হাসিতে মুখ ভরিয়ে অপরাজিতার আগে নিজের জায়গায় এসে ঘুমের মত করে রইলো সন্দীপন। একটু পরে সে অনুভব করলো মিতাকে মাঝখানে রেখে শুয়ে পড়লো অপরাজিতা। বাকী রাতটুকু জেগে কাটালো সন্দীপন। বাইরের একছড়া চাঁদের আলো তাদের বিছানায় ছড়িয়ে পড়লো, সে আলোয় সন্দীপন পলকহারা চোখে দেখলো।

অপরাজিতার কালো জিকজিকে হাতের উপর মাথা রেখে তার শুকনো বুকে মুখ রেখে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে পারমিতা। ঘুমিয়েছে অপরাজিতা।

পরের দিন থেকে অপরাজিতার অন্যরূপ। বহুদিনের পরিচিতা এক গৃহিণীর মত মিশে গেল সংসারের মাঝে। সংসারের পড়ে থাকা জোয়াল নিজে হাতে তুলে নিলো সে। ক্রমে সন্দীপন থেকে বাড়ীর ঠাকুর, ঝি, চাকর পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেল অপরাজিতার কঠিন কথা শুনতে। ওরা বুঝতে পেরেছে ঐ কঠিন আবরণের নীচে আছে স্নেহের ভাণ্ডার যা সে উজাড় করে দিয়েছে ওদের মাঝে।

এমনকি প্রথমবার মেয়েকে নিতে এসে বিফল মনে ফিরে যেতে হ'লো অপরাজিতার বাবাকে।

ফটো : বিন্দুশেখর বিশ্বাস

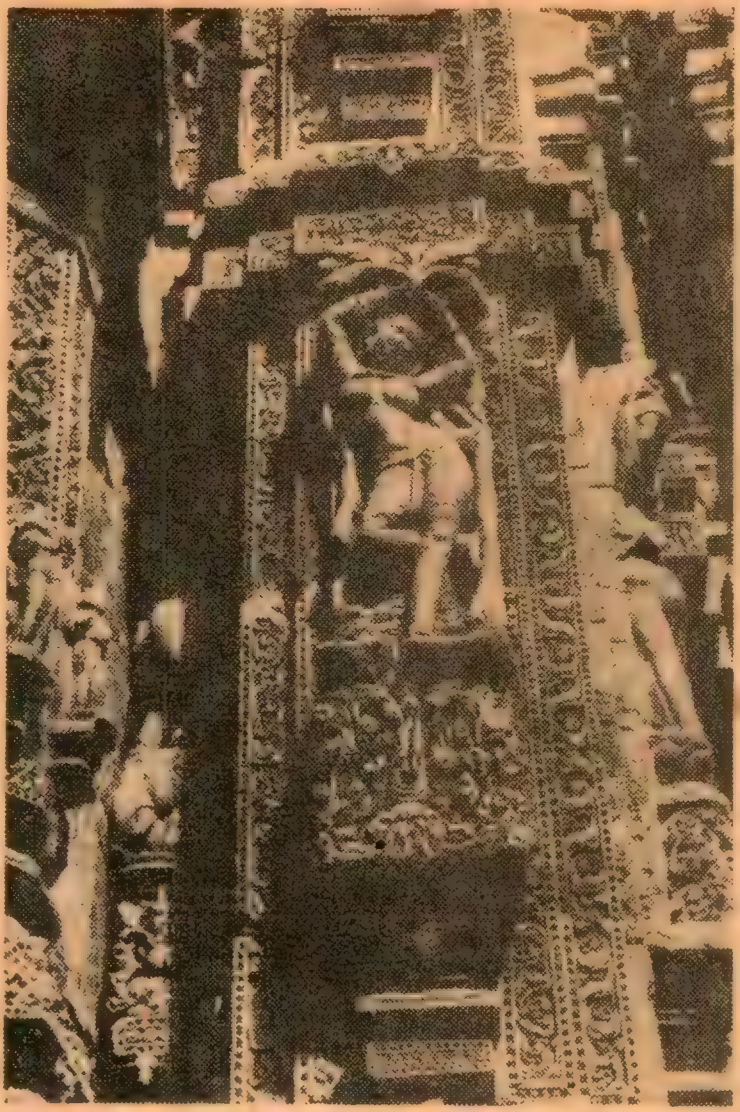

সে বলেছে—

একটা মাহারা মেয়েকে কেলে আমাকে নিয়ে আনন্দ করতে তোমার ভাল লাগবে? তার উত্তরে ওর বাবা বললে, তবে মেয়েটাকে নিয়েই চল্।

তা যাবো বৈকি?

কঠিন হেসে অপরাজিতা বলেছে—বাড়ীশুদ্ধ লোক ওকে অবহেলার চোখে দেখে, আমার ওপর দয়া দেখাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না। তুমি এখন বাড়ী যাও। মেয়েটা বড় না হ'লে আমার যাওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই।

ম্লান মুখে ওর বাবাকে ফিরে যেতে দেখেও দুঃখ পায়নি অপরাজিতা। পারমিতাকে বুকে জড়িয়ে বসেছিল সে।

এর পরেও কিন্তু ও বাড়ীতে থাকতে চাইলেন না ওর দিদিমা। বড় যেন অধিকার শূন্য মনে হ'লো, তাই এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে বিদায় নিতে গেলেন সন্দীপনের কাছে।

কার মুখে খবর শুনে হঠাৎ পাশে কোথা থেকে এলো অপরাজিতা। তার সেই রুক্ষ স্বরে দাবী নিয়ে বললে, ভেবেছো কি তুমি ঝিয়ের মতো পরের বাড়ী খেটে জীবন কাটাবে?

মেয়েব সতীনকে পছন্দ করেন না মিতার দিদিমা। বিপরীতমুখী দিদিমার কান্নাঝরা স্বর—উপায় কি?

কেন উপায় নেই?

জামাইয়ের বাড়ীতে তার থাকবার অধিকার কি? যাঁর মেয়ে নেই!

কে বলেছে তোমার মেয়ে নেই। কেন আমি কি তোমার পর?

রূঢ় অপরাজিতার চোখে জলের ধারা। সামনে চলতে পিছন ফিরে থমকে দাঁড়ালেন মিতার দিদিমা আর তাকে দু-হাতে জড়িয়ে অপরাজিতা বললে—যেতে তুমি পার না মা, যাওয়া তোমার হবে না।

না আর এগিয়ে যেতে পারলেন না মিতার দিদিমা। মনে হলো এ ডাক বুঝি ঊর্মিমালার ডাক। এ বাঁধন বুঝি ঊর্মিমালার বাঁধন—তাই বুঝি দীর্ঘদিন পরে একমুখ হাসি নিয়ে বললেন,—ওরে, যেতে আমি পারলাম কই!

মাসিমা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছিলেন। আমাকে ত সারাক্ষণই প্রায় কাছে পেতেন, মানে যখনই তিনি বাড়ীতে থাকতেন। ঘুরে বেড়াতেন খুব। একা ঘরে হাঁপিয়ে উঠতেন। বই পড়ে, কাগজ পড়ে, রেডিও শুনে কতই বা আর ভাল লাগে। তাই পরিচিত জনের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন কখনো। সিনেমা দেখতে ভালবাসতেন। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী সবই তাঁর দেখা চাই। যখন যেটা মন চায় একাই গিয়ে দেখে আসবেন।

সেদিন আমার ছেলে পুলক এসে বলে, 'ঠাকুমাকে দেখে এলাম মে ফেয়ারে ঢুকে দেয়ালে সিনেমার ছবি দেখছেন একমনে।'

পুলক বলেছিল, 'ঠাকুমা দেখবেন ছবি, টিকিট কিনবো আপনার জন্য?'

—'নারে ভাই, এ আমার দেখা ছবি। কি সুন্দর ছবি দ্যাখ না, মেম সাহেব কেমন সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আবার কখনো মাসিমা পার্কে গিয়ে বসে থাকতেন, গল্প করতেন ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের হাতে দিতেন টফি লজেন্স বিস্কুট।

শহরে কোন একজিবিশন হলে মাসিমা আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন। কখনো আমাদের সঙ্গে যেতেন, কখনো একা। গোমতী তীরের মন্দিরে কোন সাধু এলে মাসিমা সেখানেও যেতেন। ডাকতেন, 'নীলা, পুষ্প, সুনীতা, তোমরাও চলো।'

নীলা আর পুষ্পর বিয়ে দেবার জন্য উনি যে কত ব্যগ্র ছিলেন, প্রায়ই বলতেন, 'কালীবাড়ি গেলেই তোমাদের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি। বেশি বয়সের মেয়েদের কি বিয়ে হয় না? আকছার হচ্ছে। দুটি বলিষ্ঠ বাহুর ঘেরে থেকে দুনিয়া জয় করা, একলা জীবন বড় দুঃসহ।

মাসিমা কথাবার্তায় তাঁর স্বচ্ছন্দ ছিলেন। পুষ্প হেসে বলত, 'আর বিয়ের দরকার নেই। বেশ আছি।'

'বেশ ত এখন আছ, কিন্তু পরে বুড়ো বয়সে কে দেখবে? তখন ছেলেপিলেরা দ্যাখে।'

নীলা হেসে ফেলত।

'ছেলেপুলেরা আপনাকে ত খুব দেখছে মাসিমা। তিন ছেলে দু মেয়ে আপনাকে দেখে আর রাখছে না।'

মাসিমার মুখে এবার শ্রাবণের মেঘ জমে। আর কিছু বলার নেই তাঁর।

বড় ছেলের বদলির চাকরি। মাকে নিয়ে ঘুরতে পারে না দেশে দেশে, বড় অসুবিধে। যেন মা একটা লটবহরের সামিল। কোথায় নিয়ে ফেলবে।

মেজ থাকে কলকাতা। তার ছোট ফ্ল্যাটে স্থান নেই। ছোট গেছে বিদেশে।

ছোট ছেলেকে ছেড়ে মা থাকতে পারতেন না। আমরাই দেখেছি। সে বিয়ে করল, দুটি ছেলেমেয়ে হল এখানে এই বাড়ীতে। মাসিমা বৌএর যা সেবাযত্ন করলেন দেখবার মত।

'তুমি ত বোঝ সুনীতা পোয়াতি বৌএর কত যত্ন চাই।' আমাকে বলতেন।

প্রায় দিনই বিকেলে নীলা পুষ্প আর আমি একসঙ্গে বসে চা খেতাম বাগানে, গাছের নীচে। মাসিমার বাড়ীর ভেতর অনেক জায়গা, গাছপালা ফুল লতাপাতা কোন কিছুরই অভাব নেই! আমরা ভারি আনন্দে ছিলাম।

মাসিমা কোন কোনদিন আমাদের এই চায়ের আসরে এসে যোগ দিতেন, তাঁর প্রাণোচ্ছলতা বয়সকে অতিক্রম করে যেতো, অনায়াসে উনি আমাদেরই এক-বয়সী হয়ে যেতেন।

মাসিমা বৌকে ফেলে এলেন যে?

সমীর আছে, 'দুটিতে জমিয়ে গল্প করছে এখন আমার উপস্থিতি না হলেও চলবে।' মাসিমা ঠোঁট টিপে হাসতেন, ঠোঁটের ওপরের কালো তিলটিও যেন কৌতুকে হাসতে থাকত। 'আর তোমাদের সঙ্গে সারাদিনে একবার দেখা না হলে মন ভাল লাগে না, সরো আমি চা ঢালি। তোমাদের মেসোর কিন্তু আমার হাতের চা ছাড়া রুচতো না কখনো। সমীরেরও সেই অবস্থা। মায়ের হাতের চা চাই।' মাসিমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

'সমীরকে আপনি খুব ভালবাসেন না মাসিমা?'

পুষ্প বলে, 'ওকে ছাড়া থাকতে পারেন না, না?'

'ও যে আমার কোলের ছেলে। সমীরও আমাকে কখনো ছেড়ে থাকতে পারতো না।'

'এখন?' নীলা জিজ্ঞেস করে।

'এখন প্রিয়া এসেছে, পরিবর্তন হয়ই। আমিও চাইও প্রিয়ার মধ্যেই আমাকে পাক। তবে কি জানো নীলা, মা বড় জঞ্জাল! গেলেই ছেলেদের মুক্তি।'

কিন্তু সেই সমীরও চলে গেল।

বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে উড়ে গেল কানাডায়। মাসিমা যেতে চেয়েছিলেন সঙ্গে, 'আমাকেও নিয়ে যা সঙ্গে। আমি কি করে তোকে ছেড়ে থাকবো।' বুক ভাঙা হাহাকারে ভেঙে পড়েন মাসিমা।

'ওই দূর বিদেশে কি করে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো?'

'বুড়ো মা বাপকেও সঙ্গে নিয়ে যায়, আমি জানি।'

'তুমি দাদা মেজদার কাছে থাকো না গিয়ে।'

জলভরা চোখে থেমে যান মাসিমা।

দাদা মেজদার দায় পড়েছে মাকে নিতে।

এখানে বড় বাড়ি, ভাল ভাড়াটে, অসুবিধে কিসের?

বিধবা মা বড় জঞ্জাল।

মাসিমার কাছে দিন কয়েকের জন্য বড় ছেলে সপরিবারে এল।

বিনায়কের বৌকে আমরাই বললাম, 'মাসিমাকে কিছুদিনের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান।'

মীরা, বিনায়কের বৌ কথা বলে প্রায় মুখ বুজেই। ঠোঁট ফাঁক হয় কি

হয় না। চেপে চেপে বলল, ‘আর ওখানে ভাল লাগে না। আমাদের ত অন্যরকম লাইফ। আজ পার্টি, কাল ডিনার, পরশু পিকনিক, এ সবে উনি মানিয়ে নিতে পারবেন না।’

পুষ্প বলল, ‘আপনার শাশুড়িও যথেষ্ট আধুনিকা এবং শিক্ষিতা, নানা-রকম লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অভ্যেস ওঁরও আছে। আপনি হয়ত তার পরিচয় পান নি কখনো। যদি কিছুদিন একসঙ্গে থাকেন তখন দেখবেন।’

বিরক্ত বৌ চুপ করে রইল।

শেষ পর্যন্ত বিনায়ক মাকে নিয়েই গেল কিছুদিনের জন্য। যাবার সময়ে মাসিমা বললেন আমাকে, ‘তুমি পুষ্প আর নীলাকে দেখবে।’

সেখানে তার বৌমার সঙ্গে বনি-বনা হল না। ক্ষুব্ধ ব্যথিত শাশুড়ি বললেন, ‘টিকিট কেটে দে বাবা, লছমন-পুরীতে তোর বাবার স্মৃতি, ওখানেই যাই!’

এরপর মাসিমা বড় তাড়াতাড়ি যেন বুড়ো হতে লাগলেন। শরীর ক্রমে খারাপ হতে লাগল আর আমাদের আঁকড়ে ধরলেন আরো বেশি করে।

আমরা অসুবিধে বোধ করতে লাগলাম।

কোথাও গেলে আমাদের সঙ্গে নেবেন। কোন বাড়ি, পুজো হলে সেখানে যেতেও আমাদের চাই। মাসিমা যাবেনই পুজোর নামে।

পুষ্পর কাটা কাটা কথা। বলত, ‘পুজো না লোক্যাল গ্যাদারিং, কত লোক সমাগম হবে মাসিমা ত যাবেনই।’ প্রবাসী পুত্রের কল্যাণ কামনায় নিজের ঘরেও পুজোর আয়োজন করতেন মাঝে মাঝে। তাতেও আমায় সব করতে হত, আমি বিরক্ত হতাম।

সবচেয়ে মুস্কিল হত, মাসিমা রাত্রেও একা থাকতে চাইতেন না। বিশেষ শরীর একটু খারাপ হলেই রাত্রে তাঁর ঘরে আমাদের একজনকে শুতে হত।

ভালবাসার বিড়ম্বনা বলেই এক এক সময় মনে হয়েছে। ভুলে গেলাম এমন দিন আমাদেরও আসতে পারে। পুষ্প ভুলে গেল রিটায়ার করার পর কি দশা হবে তার, নীলা ভুলে গেল যৌবন চির-দিন থাকবে না। আমিও ভুলে গেলাম সব কিছুই পদ্মপত্রে জলের মত টলটলায়মান।

আমরা ভাবলাম মাসিমার আর এখানে থাকা ঠিক নয়। বড় মেজ কোন ছেলের কাছে চলে যান।

মাসিমার কাছে একদিন সন্ধ্যায় বাগানে বসে আমরা প্রস্তাবটি মিঠে ভাষায় উত্থাপন করলুম।

চারদিকে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, মাসিমা বুঝলেন আমরা সত্যিই পর। আমাদের ওপর তাঁর কোন দাবী নেই।

নরম মৃদু গলায় বললেন, ‘তাই হবে, ছেলেদের লিখবো, যে নিয়ে যায় তার কাছেই যাবো। সুনীতা, ইচ্ছা-মৃত্যু হত যদি তাহলে এই বাড়ীতে ফুলবাগানে শুয়ে আমি মরতাম। নীলা গান গাইত, তুমি মাস করতে। পুষ্প দিত মুখে গঙ্গাজল, বেশ হত। কর্তা রইলেন এখানে, আমি যে কোথায় যাবো।’

মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর হয়ত উনি এখানে কখনো ফিরবেন না, ওঁর যা শরীরের অবস্থা। আর দেখা হবে না।

সেদিন হজরতগঞ্জে বিকেলে আমরা তিন সখী গেছি। দেখি মাসিমা হেঁটে যাচ্ছেন প্রতিটি দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে পড়তে যাচ্ছেন আপন মনে।

আমাদের দেখেই হেসে ফেললেন।

‘গাঞ্জিং করতে? বেশ।’

‘আপনিও বুঝি শপিং-এ এসেছেন।’

‘ছেলের কাছে যাবো, বৌমাদের জন্য একটু মালা, দুল, চুড়ি এই সব কিনবো। এস না সঙ্গে, পছন্দ করে দেবে।’

মালা চুড়ি পছন্দ করছিলেন একমনে, কোনটা কোন বৌকে মানাবে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। পুনীত আর তেওয়ারী কোথা থেকে উদয় হল সেখানে। মাসিমা গলে এসেছেন সন্ধ্যায় হজরতগঞ্জ দেখতে?

‘আরে মাসিমাকা জিন্দা দিল।’ তেওয়ারী হেসে বলল।

হজরতগঞ্জেও মাসিমা, ক্যানিকসএ মাসিমা, ইমামবাড়ির ভুল ভুলাইয়াতে মাসিমা, যেখানে যাই, সেখানেই মাসিমা। সেদিন দেখি মাসিমা পার্কে বড় গেলাবটর সামনে দাঁড়িয়ে কাকে ম্যাপ দেখাচ্ছেন। তারপরই দেখা গেল নদীর তীরে ছোট পার্কটায় বসে আছেন। দেখছেন নদীতে নৌকো।’

‘সত্যি মাসিমার মত এমন সজীব প্রাণবন্ত মানুষ এ শহরে আর একজনও নেই।’ পুনীত হেসে বলল।

‘হ্যাঁরে পুনীত, তোরা আমাকে গোমতী তীরেই যদি রেখে দিতে পারতিস বেশ হত।’

আমরা সবাই একসঙ্গে হাঁটছিলাম।

পুনীত চমকে তাকাল মাসিমার দিকে। তার তরুণ সঙ্গী তেওয়ারী একটা আফশোসের আওয়াজ বার করল মুখ দিয়ে। তারও চোখে জিজ্ঞাসা।

আমি বললাম, ‘মাসিমা ছেলেদের কারো কাছে চলে যাচ্ছেন, সেজন্য মনটা ভাল নেই। লছমনপুরী ত ছাড়তে চান না উনি।’

ব্যাপারটা ঘটল দুদিন পরই।

সকালে আমি তরকারি কাটছিলাম, পুষ্প ও নীলারও ছুটি ছিল, ওরাও কাছে বসে ছিল। মাসিমা এসে চিঠি দুখানা রাখলেন।

দু ছেলেই লিখেছে বাড়ীতে থাকা-কাল, তুমি ত ভালই আছ ওখানে প্রতি-বেশীরা ভাল। নিজের এত বড় বাড়ী, বিদেশে এসে হাঁফিয়ে উঠবে। তবে নিতান্তই যদি আসতে চাও, বাড়ীর কাছাকাছি ছোট ফ্ল্যাট দেখবো, যাতে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারি। কি চাকর অবশ্য রেখে দেব।

শুনে আমরা থ।

‘মাসিমা, তবে মেয়েদের কাছে লিখুন।’ নীলা বলল।

‘আরে রাম, ছেলেরা স্থান দিল না, তারা ত পরের ঘর করে, সেখানে উৎপাত করব তাও কি হয়। তাইত বলি মা বড় জঞ্জাল!’

আমাদের মুখে মাসিমা আশ্রয় খুঁজলেন, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তিনি বোধহয় আমাদের মুখের বদলে দেখেছিলেন গোমতীতে রাত এসেছে, জলে জলময়, কোথাও কোন আশ্রয় নেই!

বললেন, ‘আচ্ছা আসি এখন। কাজের সময়, কাজ করো।’

উঠে চলে গেলেন।

অন্য কোথাও খোঁজা খুঁজি করে সময় নষ্ট করবেন না
যা আপনার প্রয়োজন এখানেই সব পাবেন।

স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র ও অফিসের জন্য স্টেশনারী, কাগজ, সার্ভে, ড্রইং ইঞ্জিনীয়ারিং ও যাবতীয় উৎকৃষ্ট কাগজ কালের নামী প্রতিষ্ঠান,

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬০ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ফোন—২২-৮৫৮৪, ৬৭-৪৬৬৪;

গ্রাম : অরাজীপন—হাওড়া।

পোষ্ট বক্স-৩৮, হাওড়া

গৃহিণীদের মনের মত

অঞ্জলি চৌধুরী

নির্জনে, একান্ত আপন মনে হাতা-খুন্তি নাড়তেন সেকালের মেয়েরা। রান্নার কলাকৌশলে পারদর্শিতা দেখানো ছিল তাঁদের চোখে গৌরব। আজও তাঁদের যাঁরা অবশিষ্ট আছেন পক্ককেশে হাত ডুবিয়ে মনে মনে নিজের বয়সটাকে হিসেব করে নেন। তারপর কুঁচকে যাওয়া চোখের চামড়াকে টেনে টেনে সোজা করে খুশিতে ডগমগ হয়ে একালের কোন যুবক-যুবতীকে সস্নেহে বলেন, 'তোমার দাদু আমার হাতের রান্না খেতে খুব ভালবাসতেন।' এ-কথাটার মধ্যে পরম তৃপ্তি থাকলেও প্রচ্ছন্ন গর্বও আছে। সেযুগে রন্ধন-পটিয়সীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাবও থাকতো। কার হাতের খিচুড়ি অমৃত, আর কে পায়েস রান্নায় অদ্বিতীয়া বা কার হাতের রান্না খেলে জীবনে ভোলা যাবে না এমনতর গল্প হামেশাই শোনা যেত। কিন্তু সেদিন আর নেই। অপরকে খাইয়ে অপার আনন্দ পাবার সৌভাগ্যের দিন লুপ্ত হয়েছে। রান্নার জন্য আজকালকার মেয়েরা আর অফুরন্ত সময় অতিবাহিত করতে পারেন না বা রাজি নন। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক নানা ক্ষেত্রে এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে, মাত্র পঁচিশ, ত্রিশ বছর আগের সংসারজীবনের ঘটনাকেও গল্প বলে মনে হয়।

ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম রাখতে আজকের দিনে সব মানুষই ভালবাসে। দিনকে দিন নানা কারণে বাতাস দূষিত হচ্ছে, শান্তির স্থান বা একটু নীরবে বসার স্থানও অবলুপ্ত হচ্ছে। শুধু কোলাহল আর বাস-ট্রামের অবিরাম শব্দ। তাই বোধহয় মানুষ শান্তি খোঁজে গৃহে। গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে একটা সুন্দর, শান্ত পরিবেশ রচনার দিকে সকলের প্রবণতা। ঘর যাতে ঝুলকালিতে নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য অনেক গৃহিণী কয়লার আঁচকে বিদায় দিয়েছেন। শুধু ঝুল-কালি নয় সময় সংক্ষেপ করতে ঘরে ঘরে গ্যাসের চলন হয়েছে। এতে যেমন ঘুঁটে-কয়লা রাখার জায়গার জন্য চিন্তা করতে হয় না তেমনি দরকার মত গ্যাসের দুটো মুখ ব্যবহার করে—তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নেওয়া যায়। তবে রান্না চাপাবার আগেই রান্নার সব জোগান ঠিক না রাখলে অনাবশ্যক গ্যাস পুড়িয়ে বিলাসিতা হবে। আর নয়তো বারবার গ্যাস নিভিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে। তাছাড়া জায়গার সংকট অনেকেই ভোগ করে থাকেন। সেজন্য রান্নার কাজটাকে এমন জায়গায় ব্যবস্থা করেন যাতে ডাইনিং স্পেসটা ঠিক থাকে। গ্যাসকে ঝেড়েপুঁছে জায়গার অভাবে ঘরের কাছাকাছি আটকানো বারান্দায় একটু উঁচু বা [illegible] ওপর রাখলে [illegible] মোটেই অশোভন লাগবে

ফ্রুট মিকসার

কুকিং রেঞ্জ

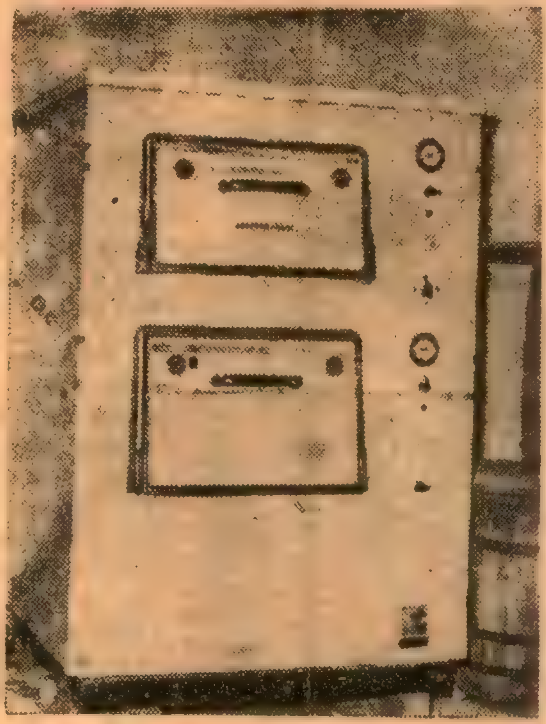

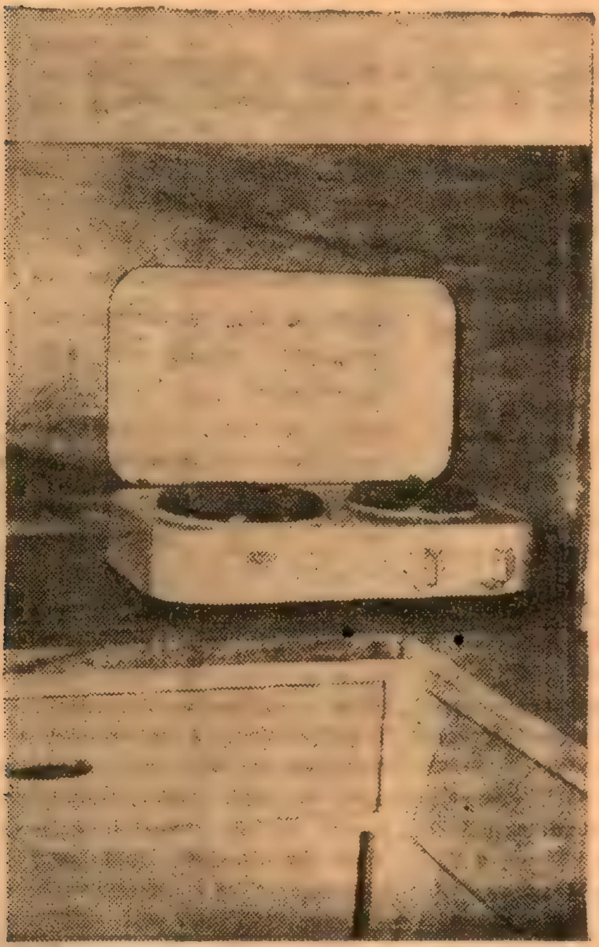

হট্ প্লেট

গ্যাস (ওভেনসহ)

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
বিজয়িনী
শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী
নীরা মালিয়া
অভিনীত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রাণুর প্রথম ভাগ

পরিচালনা/নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত/নিখিল চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য চরিত্রে : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনিল চক্রবর্তী - কণিকা মজুমদার - গীতা দে - বঙ্কিম ঘোষ - দ্বিজু ভাওয়াল প্রভৃতি

[illegible] চিত্রম নিবেদিত
[illegible] পরিবেশিত

শুভমুক্তি সমাসন্ন

না বা ঝুল-কালিতে ঘর নষ্ট হয়ে যাবারও আশঙ্কা থাকবে না। সেরকম কোন জিনিসকে বসার ঘরের কাছাকাছি রাখতেও ভাবনার কিছু নেই। গ্যাস যদি সেলফের ওপরে থাকে আর সেই সেলফের সামনে একটা পর্দা লাগানো থাকে তবে অনায়াসেই খাবার দ্রব্য সেই পর্দার নীচে রাখতেও ভাবনা কিছু নেই। তবে রান্নার তেলে বা মসলায় দেওয়াল নষ্ট না হয়ে যায় সে জন্য সে জায়গায় এমন জিনিস রাখতে হবে যা মাঝে মাঝে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা যায়।

অতিথি এলে তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করতে পারলেই গৃহিণী আর অতিথি দুজনেই খুশী হবেন। কিন্তু গৃহিণী সব সময় অতিথির সঙ্গে হাত-পা ছড়িয়ে নির্ভাবনায় গল্প করতে পারেন না। একটা-না-একটা কাজের তাড়ায় একটানা তাঁর পক্ষে অতিথির সঙ্গে বসে গল্প করা সম্ভব নয়। 'বসুন, আসছি' বলে বার বার অতিথির সামনে থেকে গৃহকর্ত্রীকে উঠে যেতে হয় কখনো কেটলি বসাতে, সরবত করতে, ভাতের হাঁড়ি চড়াতে বা এটা-ওটা গরম করতে। এ-রকম কাজের তাগিদে বার বার হাঁটা-চলায় দুজনেই বিব্রত বোধ করেন। অতিথি ভাবেন তিনি অসময়ে এসেছেন আর গিন্নী ভাবেন অতিথির সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করারও ফুরসুত নেই, এমনি ভাগ্য। অথচ ভাগ্যকে শুধু গালাগাল দেবার দিন আর নেই। হাতের কাছেই রয়েছে নানা রকম জিনিস—যা ব্যবহার করলে ফুরসত মিলে যায় অনেক। বার-বার 'আসছি ভাই' না বলে বসার ঘরের কাছাকাছি চওড়া একটু দেওয়াল বেছে নিয়ে তাতে সেলফের আকারেই হোক বা ছোট টেবিলের ওপরে ফ্রুটস মিকসারটা বসিয়ে তার পাশাপাশি কাঁচের কাপ-ডিশ, গ্লাস সাজিয়ে রাখা যায়। অতিথি প্রচণ্ড গরমের দিনে এলে তাঁকে চা না দিয়ে সরবত দিলে মন্দ হয় না। ঘরে লেবু জাতীয় ফল থাকলে সেটাকে ছুরি দিয়ে টেবিলের একপাশে ছাড়িয়ে ফ্রুটস মিকসারের মুখ খুলে ফলটা দিয়ে ইলেকট্রিক সুইচটা অন করে দিলে নিমেষেই ফলের রস তৈরি হবে। এবার সেই রসটাকে ঢেলে সরবত তৈরি করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিথির সামনে হাজির করা চলে। ফ্রুটস মিকসারের দৌলতে গৃহিণীকে হাতে নিংড়ে সময় নষ্ট করে আর ফলের রস তৈরি করতে হয় না, শুধু অতিথি-অভ্যাগত কেন রোগীকে বা গরমের দিনে নিজেদের ক্লান্তি দূর করতে ফলের রসের সরবত কত সহজেই তৈরী করা যায় ফ্রুটস মিকসারের সাহায্যে, আর 'কাটার'-এর সাহায্যে গল্প করতে করতেই তরকারি কাটার কাজটা সমাধা করা যায়।

প্রত্যেক দিনের রান্না বা বাজার করার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ফ্রিজ। একদিন বাজার বা রান্না করে তিনদিন চালিয়ে দেওয়া যায়। খাবার আগে তরকারী, মাছ, মাংস গরম করে নিলেই যথেষ্ট। কাঁচা বাজার অর্থাৎ সব্জী, মাছ, মাংস প্লাস্টিকের ঠোঙায় ঢুকিয়ে রেখে দিলে তারপর দিন কয়েক বাদে রান্না করলে তার স্বাদ থাকে অপরিবর্তনীয়।

কুকিং রেঞ্জ ওভেনও গৃহিণীর সময় ও পরিশ্রমকে লাঘব করেছে অনেকখানি। এর মধ্যে গ্যাসের কোন প্রয়োজন নেই। তাই হঠাৎ হঠাৎ ফুরিয়ে যাবারও আশঙ্কা নেই। কুকিং রেঞ্জ ওভেন-এর বক্স-এ কেক তৈরীর আয়োজন রেখে ওপরে ভাত বা ডাল চাপিয়ে দিলে সব ফুটতে মিনিট কুড়ি পঁচিশ লাগবে। এই ওভেন-এর সবচেয়ে সুবিধা আঁচকে বিশেষভাবে কন্ট্রোল করা যায় আর ইলেকট্রিক সুইচ অন করে দিলেই আর কোন ঝামেলা নেই।

ইলেকট্রিক ওভেনে সহজেই কেক, তন্দুরের রুটি আর স্টীম-হিটএ ইডলী'র মতো মুখরোচক খাবার তৈরী করা যায়।

জানলা-দরজার পর্দা, বিছানার চাদর, সোফার ঢাকা, বালিশ, লেপ-তোষকের ওয়াড়, নিজেদের জামাকাপড় অর্থাৎ সব-কিছু পরিষ্কার রাখলে তবেই গৃহ হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর। মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কাপড় কাচার লাঠি দিয়েই ময়লা কাপড়-চোপড় কাচা হয়। তাতে শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হয়। কিন্তু খাস কলকাতা বা পাশাপাশি গ্রামে-গঞ্জে ময়লা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে শারীরিক পরিশ্রমকেই প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই নিয়ে ছুটির দিনেও তাঁদের অবসর বা বিশ্রাম হয় সামান্যই। সেজন্য দেশে দেশে এখন ওয়াশিং মেসিনের এত কদর হয়েছে যাতে বিনা পরিশ্রমে একসঙ্গে অনেক জামা-কাপড় পরিষ্কার করা যায়।

ঘরকে সুন্দর আর রান্নাকে মুখরোচক করা মেয়েদের স্বাভাবিক গুণ। তাছাড়া বাঙালীরা খাবার প্রস্তুত করতে কখনোই পশ্চাদপদ নন। কখনো শুকনো, কখনো রসালো, কখনো নোনতা আবার কখনো টক জাতীয় খাবার তৈরী করতে বাঙালী মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। তবুও সময়ের স্বল্পতায় তাঁদের অনেক কিছুই বর্জন করতে হয়েছে। এখনকার মেয়েরা শুধু আর গৃহেই বন্দী নন। তাছাড়া আধুনিক সরঞ্জাম রাখার মত স্থানের স্বল্পতাও তাঁদের মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। তবুও সকলের লক্ষ্য কত সহজে, স্বল্প পরিশ্রমে আহার্যের ব্যবস্থা করা যায়।

বিশু মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ মহিমা

সামাজিক প্রথা হিসাবে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে বিবাহ, উপনয়ন ও জন্মদিন উপলক্ষে কিছু উপহার দেওয়ার রীতি বহুদিন ধরে আমাদের মধ্যে যেমন চলে আসছে তেমনি সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, শ্রদ্ধেয় আত্মীয়স্বজন ও পূজ্যপাদ ব্যক্তিবর্গকে স্বরচিত গ্রন্থাদি উৎসর্গ করার প্রথা চলে আসছে।

এই ধরনের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত উৎসর্গীকরণ প্রথা কবে থেকে এবং কিভাবে যে উদ্ভূত হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন হলেও, এ-কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপলক্ষ নাকিগণ তাঁদের ঋণ-স্বীকারের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে, কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের সার্থক অভিব্যক্তি হিসাবে এই উৎসর্গ প্রথার প্রচলন করেন এবং ক্রমশ তা প্রকাশিত হয় স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেও স্মারক-সওগাত হিসাবে।

এখানে উদ্দেশ্য সাধু এবং বক্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু এই বিশেষ উপঢৌকন যিনি দান করেন, সেই দাতা এবং যিনি গ্রহণ করেন, সেই গ্রহীতা—উভয়ের মধ্যেই কিছু মর্যাদার প্রশ্ন থাকে। এ-মর্যাদার মূল্যায়ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যানুবর্তন। অর্থাৎ আপনি দিয়েও এখানে যেমন স্বস্তিবোধ করলেন, তেমনি অপরজন গ্রহণ করে অবশ্যই স্বস্তিবোধ করবেন। কিন্তু এই উৎসর্গ পরিচিত স্বজন ছাড়াও জীবজন্তু এবং অচেতন বস্তু ও বিষয়ের উদ্দেশ্যেও উৎসর্গীত হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্যের বিখ্যাত লেখক জেরম কে জেরম তার 'দি আইডল থটস অফ এন আইডল ফেলো' গ্রন্থখানি 'পুর পাইপ'কে এবং অপর আর একখানি বই 'টাইম'কে যে উৎসর্গ করেছিলেন, তা সাহিত্যিক মাত্রেই অবগত আছেন। এমনি ওদেশে কুকুরকে, দস্তানাকে, সুরাকে, কুসমকে ও ছাড়কে উৎসর্গ করা বই অনেক আছে। এখানে দাতার একমাত্র ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেখানে গ্রহীতা কোন মানুষ, সেখানে আনন্দের প্রশ্ন, মর্যাদার প্রশ্ন আসে বইকি! ধরুন, কবিগুরু, আত্মীয়স্বজন যাঁদের তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন, তা প্রীতির বশেই হোক অথবা শ্রদ্ধার তাগিদেই হোক,—প্রত্যেকেই যে কৃতার্থ বা সম্মানিত বোধ করেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। আবার পিতামাতা ও অগ্রজদের দিয়ে তিনি নিজেই গৌরববোধ করেছেন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই উৎসর্গের মাধ্যমে প্রধানতঃ দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধও স্বীকৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা স্পষ্ট বোধগম্য হয় গ্রন্থকারের ভাষার ছটায় ও বক্তব্যের বাঞ্জনায়। অতীতে এই উৎসর্গের মধ্যে প্রাণের আকুতি, হৃদয়ের গভীর স্পর্শ ব্যক্ত হত গদ্য-পদ্যে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি পরম্পরায় এক পাতা জুড়ে। বর্তমানে তা অত্যন্ত সংক্ষেপিত হয়েছে এবং কদাচিৎ তা বহু-বাক্য শোভিত হয়ে থাকে। একালের সাহিত্যিকদের সময়ের অভাবই যে এর কারণ তা নয়, সম্ভবতঃ এ বিষয়ে উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে সংযত ও সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসই তাঁরা পছন্দ করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথও উৎসর্গ-প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থগুলিতে কদাচিৎ খুব বেশী বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং অলংকারবহুল বাক্য ব্যবহারেও সংযমিত ভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর একেবারে প্রথম দিকের একখানি বইয়ের নাম করতে পারি। বইখানির নাম 'আলোচনা' এবং এটি তিনি তাঁর পিতাকে উৎসর্গ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। গ্রন্থকার।'

তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতি একালের খ্যাতিমান লেখকরাও প্রচুর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন বহু প্রিয়জনকে, ভক্তিভাজনেষুদের, কিন্তু সে লেখা সংক্ষিপ্ত এবং অতিশয়োক্তি বর্জিত। তবে পরিমল গোস্বামী এঁদের থেকে কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন তাঁর একখানি গ্রন্থে। সেই গ্রন্থখানির নাম 'দন্তপ্রলয়'। এটি তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর সুহৃদ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে, এবং সরস কথায় ব্যয় করেছেন পুরো একটি পাতা। ইদানীন্তনকালের লেখকদের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম। তারাশঙ্কর তাঁর 'ইমারত' উপন্যাস উৎসর্গ করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এবং সম্ভবতঃ বন্ধু সাহিত্যিককে উৎসর্গীত গ্রন্থগুলির মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তিনি কয়েক ছত্র লিখেছিলেন প্রাণখুলে।

এবার কিছু বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন উৎসর্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন এখানে উপস্থাপন করছি। এগুলি আকারে-প্রকারে সংক্ষিপ্ত তো নয়ই পরন্তু এদের বাক্যচ্ছটা ও প্রকাশভঙ্গী বর্তমান কালের যেমন বিপরীত, তেমনি উৎসর্গের মহিমাকে ব্যক্ত করতে যেন পঞ্চমুখে মুখর।

প্রথমেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি উৎসর্গের কথা বলি। এই উৎসর্গটি 'মঙ্গলাচরণ' নামে মুদ্রিত হয় তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সঙ্গে ১২৬৫ সালের ১৫ই পৌষ। 'শর্মিষ্ঠা' তিনি উৎসর্গ করেন একত্রে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে।

মঙ্গলাচরণটি নিম্নরূপ—

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর সদস্যবর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র

সিংহ বাহাদুর

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র

সিংহ বাহাদুর

মহোদয়েষু

নমস্কারপুরঃসরনিবেদনমিদং

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আমাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের

দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমে যে বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।

কলিকাতা।
১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।

*

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক নাটকখানি ১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর 'বীণা রঙ্গভূমি' নামক মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় বেশ কিছুকাল। এই নাটকটি রাজকৃষ্ণ উৎসর্গ করেন সাতক্ষীরার খ্যাতনামা জমিদার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীকে। উক্ত গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রের বয়ানটি এখানে প্রকাশ করা হল—

উৎসর্গ
যিনি
আমার দুস্তরণীয় ঋণসমুদ্র হইতে
উদ্ধার করিবার জন্য মুক্তকণ্ঠে
বলিয়াছেন,
'ভগবানের কৃপায় আমি থাকিতে
আপনার
কোন বিপদ থাকিবে না',
এবং
যিনি আমাকে অকাতরে
বহুল অর্থদান করিয়াছেন
সেই
সজ্জনপূজনীয়, পরদুঃখকাতর,
বিপন্নজনসহায়
পরমদয়ালু, সাতক্ষীরার
সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ রায়চৌধুরী
মহাশয়ের পরম পবিত্র নামে আন্তরিক
ভক্তিকৃতজ্ঞতাসহ
প্রহ্লাদ-মহিমা
উৎসর্গ করিলাম।
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

বীণা রঙ্গভূমি।
কলিকাতা ৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৭
মহাষ্টমী।

*

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' নামক কাব্যগ্রন্থ পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এর পরিষ্কার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৫১, ১৩৫৯ প্রভৃতি বংসরের সালগুলিতে। 'দ্বাদশ কবিতা'র উৎসর্গ-পত্রে দীনবন্ধু ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ঈশ্বরচন্দ্রকে যা লিখেছেন, তার ভাব-সম্পদ ও উৎসর্গ-মহিমা বিশেষ লক্ষণীয়।

সকলগুণানুরাগী দীনপালক
বিদ্যাবিশারদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয়
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহাশয়,

কল্পনা কাননে প্রবেশপূর্ব্বক যত্ন-সহকারে কয়েকটি কবিতাকুসুম চয়ন করিয়া 'দ্বাদশ কবিতা' নামে এক ছড়া মালা সংকলন করিয়াছি। আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম, যদি যোগ্য বিবেচনা করেন আপন তনয়ার কণ্ঠে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি।

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

*

দীনবন্ধু তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' যেমন ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন, তেমনি 'নবীন তপস্বিনী' নাটক উৎসর্গ করেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। 'নবীন তপস্বিনী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৮৭৪ সালে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব ছিল গভীর এবং তাঁরা হরিহরআত্মা হিসেবে আখ্যাত হয় নয়। এই উৎসর্গ-পত্রটি তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

ফটো : ডি সেন

উৎসর্গ
অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
একাত্মবরেষু।

সোদরসদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশু-কালাবধি আমার রচনায় অমোদিত হও। আমার 'নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী—বসন ভূষণ বিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি নবীন তপস্বিনীর সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু নবীন তপস্বিনী সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন, তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই: অতএব, প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি।

অভিন্নহৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

*

কলিকাতা রামবাগান অঞ্চলের দত্ত-বংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজদূত-

জীবন-সন্ধ্যা', 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত, তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র'-র ১ম খণ্ড উৎসর্গ করেন তাঁর ভগ্নী-দ্বয়কে স্নেহ-ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালে। হিন্দুশাস্ত্রসমূহের পবিত্র বিষয়ে এমন প্রামাণ এবং সহজবোধ্য গ্রন্থ সম্ভবতঃ আজও প্রকাশিত হয়নি।

উৎসর্গ-পত্রে রমেশচন্দ্র লেখেন—

উৎসর্গ

স্নেহময়ী ভগিনী

চন্দ্রকালমোহিনী ও অপরাজসুন্দরী

হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করাই তোমাদের পরম সুখ, হিন্দুধর্ম পালন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত। তোমাদের স্নেহ, তোমাদের ভালবাসা, তোমাদের যত্ন, আমি এ-জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি না; তবে এ পুস্তকখানি হাতে করিয়া তোমরা আনন্দলাভ করিবে, শাস্ত্রকথাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবে, কেবল এই ভরসায় আমার এই কার্যফল তোমাদিগকেই উৎসর্গ করিলাম।

যে ভগিনীকে এ জীবনে হারাইয়াছি, অদ্য তাঁহারও নাম স্মরণ করিয়া এই উৎসর্গ করিলাম।

তোমাদের স্নেহের মেজদাদা
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

•

অনেক সময় কবিতার মাধ্যমেও গ্রন্থাদি উৎসর্গ করার নিদর্শন আছে প্রচুর। আমরা ভাওয়ালের কবি হিসাবে খ্যাত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় লেখা একটি উৎসর্গের নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করছি। গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নানা কারণে বিপর্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই বিপর্যয় ও মানসিক অশান্তির মধ্যেও প্রচুর আশ্চর্য-সুন্দর কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর 'চন্দন' নামক কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীকে। 'চন্দন' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০৩ সনের আশ্বিন মাসে। ঐ কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রটির নাম পরিবর্তন করে তিনি 'উপহার' রাখেন। এই 'উপহার' নামাঙ্কিত উৎসর্গ-পত্রের ভাষাটি যে কি পরিমাণ হৃদয়স্পর্শী ও স্বতঃস্ফূর্ত তা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

উপহার

সহৃদয়বর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তাহে আরো [illegible]
নাহি কুঁচ নাহি ঠাঁই,
জমাট কুরুচি যেন বিকটদর্শন!
নাহিক আধার পাত্র, উলঙ্গ উন্মুক্ত গাত্র,
ভিখেরে পশুর মত পশু-আচরণ,
এ সংসার দেশে ভাই,
কারে ইহা দিতে যাই,
দানিলে সবাই ঘৃণে করে পলায়ন!

তুমি হে শিবের মত, কালকূটকণ্ঠগত,
নির্ভীক নির্মলচিত্ত মহা মহত্তর,
নিঃসহায়, নিরাশ্রিত,
উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সবারে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয়!
তাই হে তোমারে ভাই,
এ চন্দন দিতে চাই,
তুমি না করিবে ঘৃণা নিশ্চয়—নিশ্চয়;
স্নেহের নয়ন জলে, ধরিও হৃদয়তলে,
কুরুচি-কালিমা মোর এতে দূর হয়।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন;
কালিকাতা।

•

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একসময় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে সে অনুরাগ প্রচ্ছন্ন বিরাগে পরিণত হয়। কিন্তু যে সময় অনুরাগে ভাটা পড়েনি, সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর [illegible] 'বিরহ' নাটকটি উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গ-পত্রটি দীর্ঘ এবং এর মধ্যে সমসাময়িককালের দুই অভিজাত পরিবারের (জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশ) দুই কবির একজন কিভাবে আর একজনের কাছে হৃদয় উজাড় করে দিয়েছেন গ্রন্থের উৎসর্গটির মধ্যে বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য। 'বিরহ' নাটকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩০৪। এই নাটকটি ইংরেজী ১৮৯৯ সনের নভেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

উৎসর্গ-পত্রটি নিম্নরূপ—

উৎসর্গ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় করকমলেষু।

বন্ধুবর!

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতি। তাই রহস্যগীতি পূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়েরই দুটি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পরবর্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি স্বল্প-কবিযশপ্রার্থী হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রকৃত পরিমাপে বিকৃত করিয়া, অন্য এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক তাহাকে একটু অধিক মাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। আর-বিশেষের উত্তেজনার আশা হাস্যরসের সভায় কথা ও দিনটি কাটিয়া করুণ রসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর! হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসায় নাম ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গান মাত্রই ন্যাকামি নহে! স্থান বিশেষে উভয়েই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অংগমাত্র। আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পমাত্রার মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমতিবিস্তরেণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

•

গুরুভক্তি তথা সাহিত্য-গুরুর কাছে ঋণ স্বীকার অধুনা সম্পূর্ণ দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান যুগ সম্পূর্ণভাবে পুরাতন মূল্যবোধকে অস্বীকার করার যুগ। শিক্ষা-গুরুর কাছে কৃতজ্ঞতা, তা সে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক, আজ কদাচিৎ মানুষ স্বীকার করে থাকে। অথচ এই ঋণ-স্বীকারের দ্বারাই মানুষ সম্মানিত করে নিজেকে। বিহারীলাল সরকার উনবিংশ শতাব্দীর একজন শক্তিধর লেখক ছিলেন। তিনি 'বিদ্যাসাগর', 'তিতুমীর', 'অশোকবনী', 'মহারাণী স্বর্ণময়ী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে যান। 'ইংরেজের জয়' তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বিহারীলাল এই গ্রন্থখানি তাঁর সাহিত্য-গুরু সুপণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করেন।

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা ভূমিকা এমন উৎসর্গ-পত্র সচরাচর দেখা যায় না। নিম্নে সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় পরমারাধ্য সাহিত্য-গুরু
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত
গুরুদেব!

'প্রভাতী'র পুণ্য কুটীরে এ দীন হীন অকৃতি অধমকে সাহিত্যের সাধন-মন্ত্র দিয়াছিলেন। সাধনা ভুলি নাই, কিন্তু সিদ্ধি বহুদূরে, বোধহয় এ জনমে আর হইল না। তবে গুরুদেবের কৃপায় সে সাধনার কিঞ্চিৎ ফল পাইয়াছি। আমার এই 'ইংরেজের জয়' সেই সাধনার ফল! আপনারই কৃপায় পাইয়াছি, আপনার

শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। আমার আর কি আছে দেখ।

প্রণত
শ্রীবিহারী

•

ইদানীন্তনকালেও এই উৎসর্গের মধ্যে কবিতায় ভক্তির অপূর্ব একটি নিদর্শন এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি। সংগীত-সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে এবং এই উৎসর্গ-পত্রটি দিলীপকুমার কবিতায় রচনা করেন।

উৎসর্গ

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
যোগিবরেষু

জ্ঞানের অগাধ সিন্ধু জলে
যার চিত্ত মীন সম
সন্তরে সহজে নিত্য;
জেগেছে যে প্রাণে প্রিয়তম
শুধু তাঁরে—যাঁর দিব্য আলোয়
নিখিল বিশ্ব আলো,
ধন মান প্রতিষ্ঠার নহে
যে প্রত্যাশী, বেসে ভালো
হে মহাগ্রহে যোগী যতি
ধ্যানী মুনি ঋষির চরণে
চণ্ড নর নিরন্তর সরল বিনম্র পিপাসায়
পার্থিব বিলাস, অল্প সুখ
ছাড়ি ভূমার বরণে
যে-উদাসী অপার্থিব স্পর্শমণি আশে—
সঁপি তার
শ্রী করে স্মৃতিচারণ অন্তরের
চির ভিক্ষাদার।
স্নেহাশীর্বাদার্থী
দিলীপ

পুনে-পূর্ণিমা
২৪ আষাঢ়, ১৩৬৩

•

এর পরের উৎসর্গ-পত্রটির মধ্যে কিছুটা কৌতুকরসের পরশ আছে, এটি নন্দি শর্মা ছদ্মনামে রচিত 'কাশীর কিঞ্চিৎ' গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র। এই 'নন্দি শর্মা' রসিকপ্রবর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ছদ্মনামে লেখা এই সরস কবিতায় বইখানি উৎসর্গ করেন বাবা বিশ্বনাথকে। এই কাব্যগ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয় ১০৪৭ সাল পর্যন্ত, কিন্তু বর্তমানে এর আর কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। কাশী অর্থাৎ বারাণসী সম্বন্ধে এমন একটি কবিতায় ও গানে উপভোগ্য বই আর লিখিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

উৎসর্গ-পত্রটি হল—
শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথ
শ্রীপাদপদ্মেষু,—

যে দেশে আর এমন জিনিষ,
যার চড়ে না হাঁড়ি
কোথাও কোথাও জ্যোতিষ—
চাল-চুলো না বাড়ী;
যা কিছু অস্পৃশ্য আর—
যা কিছু জঞ্জাল,—
ছাই ভস্ম মড়ার মাথা,
অস্থি হাড়-মাল,
গলায় ফণী, কণ্ঠে গরল,—
বেড়াও ঘুরে-ফিরে,
গাঁজার গরম কাটবে বলে
গঙ্গা ধরে শিরে
কপালেতে আগুন ধর—
দুনিয়ার বাপ,—
এমন পাত্র—অনেক ধরে ছিল শুধু মায়।
এতেই যদি বিশ্বনাথ, হয় বিশ্ব হিত,
পাত্র বটে পেতে ভুক্তি—'কাশীর-কিঞ্চিৎ।'
চির-সেবক
নন্দি শর্মা

আপাততঃ এইখানেই উৎসর্গ-মহিমা রচনাটি শেষ হল। উৎসর্গ সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে তার বাইরে আরও যে বহুশত কৌতূহলোদ্দীপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসর্গের উদাহরণ আছে তা বলাই বাহুল্য। একজভাবে কেবলমাত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ-কৃত গ্রন্থের পরিচয় দিয়েই একটি স্বতন্ত্র এর চেয়েও বড় প্রবন্ধ রচনা করা অসম্ভব নয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সামান্য মাত্র উল্লেখ করেই যে সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করা হয়েছে, আশা করি বিদগ্ধ পাঠক সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন।

HMV

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

পুজোর রেকর্ড

উৎসবের
অপরিহার্য অঙ্গ

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

অনুপ ঘোষাল
অমিতকুমার
আশা ভোঁসলে
আরতি মুখোপাধ্যায়
ইলা বসু
উষা মঙ্গেশকর
কিশোরকুমার
চম্পাণী মুখোপাধ্যায়
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তালাত মামুদ
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
নির্মল মুখোপাধ্যায়
নির্মলেন্দু চৌধুরী
নির্মলা মিশ্র
পিন্টু ভট্টাচার্য
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত
বিশ্বজিত
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মান্না দে
মিন্টু দাশগুপ্ত
রাণু মুখোপাধ্যায়
রাহুল দেব বর্মণ
ললিতা ধরচৌধুরী
শচীন দেব বর্মণ
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শ্রাবন্তী মজুমদার
শ্যামল মিত্র
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
সবিতাব্রত দত্ত
সবিতা চৌধুরী
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
হেমা মালিনী

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ড

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও মাধুরী মুখোপাধ্যায় (ভক্তিমূলক)
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
(অতুলপ্রসাদের গান)
আগমনী গান (ভক্তিমূলক)
রঞ্জিত মল্লিক এবং
সহশিল্পীবৃন্দ (ছড়া গান)

'সুপার সেভেন'
৩৩⅓ আর-পি-এম রেকর্ড

কাজী সব্যসাচী
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র (আবৃত্তি)

এল পি রেকর্ড

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
(পদাবলী কীর্তন)
ফিরোজা বেগম (নজরুল গীতি)
কাজী অনিরুদ্ধ ও
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গীটার)
আলিবাবা (দু'খণ্ড)

গানগুলির পূর্ণ তালিকার জন্য
আজই এইচ-এম-ভি ডীলারের দোকানে আসুন।

75 years of the world's greatest recording organisation 1898-1973 EMI

দি গ্রামোফোন কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ই এম আই প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। ইলেকট্রনিক, রেকর্ড
ও জনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী।

এবার পূজার অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা 'জনপ্রিয় পূজার গান নির্বাচন'
প্রথম পুরস্কার — এইচ এম ভি 'সুপার স্টিরিও'
দ্বিতীয় পুরস্কার — এইচ এম ভি 'সফারি রেডিওগ্রাম'
তৃতীয় পুরস্কার — এইচ এম ভি 'সোপ্রানো ট্রানজিস্টর রেডিও'
নিয়মাবলীর জন্য আপনার এইচ এম ভি ডীলারের দোকানে খবর নিন।

প্রতি শনিবার রাত ৯॥৹ টায় কলকাতা 'বিবিধ ভারতী' থেকে প্রচারিত হচ্ছে এইচ এম ভি'র পুজোর 'নতুন গানের আসর'। শুনতে ভুলবেন না। এছাড়া, এবারের 'রেকর্ড সঙ্গীতের' শারদীয়া সংখ্যাও পড়ে দেখুন।

GC 7788A

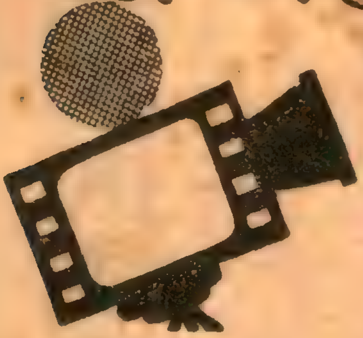

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রসঙ্গে

(পূর্ব-প্র-ক্র)

নির্মল কুমার ঘোষ

ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের শৈল্পিক মান ও চরিত্রের ভাবমূর্তিগত উন্নয়নকল্পে জাতীয় সরকার বহু বৎসর ধরে জাতীয় এ্যাওয়ার্ড কমিটি সংগঠিত করে আসছেন, এ তথ্য শিল্পের অনুরাগী মাত্রেই অবহিত আছেন। এই কমিটির কার্যকলাপ ও পুরস্কারবিতরণে ছবির যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য নানা নিয়মকানুনও সরকার বিধিবদ্ধভাবে বাতলে দিয়েছেন—যার কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক কমিটিকে তাদের সুপারিশ পেশ করতে হবে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এমন বিস্তৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে যার প্রয়োগে তাঁরা আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশ না মেনে তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—শুধু 'আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ চিত্র' নির্বাচন করা ছাড়া। যাই হোক, সরকারের উদ্দেশ্য যে এই ব্যাপারে সংশিল্পের পরিপোষণ করা একথা সন্দেহ করবার মত কোন জোরালো যুক্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বরং তাঁরা উৎসাহদানের গণ্ডী পূর্বের চেয়ে এখন ঢের বিস্তৃত করেছেন।

এই যে কেন্দ্রীয় এ্যাওয়ার্ড কমিটি, এঁদের চূড়ান্ত বিচারগুলি সম্বন্ধে এমন আশা পোষণ করা অবাস্তব হবে যে সে বিচার কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। সকল গণতান্ত্রিক ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও তাঁরা জনসাধারণের ও জাতীয় প্রেস-এর সমালোচনার সুযোগ-স্বাধীনতাকে নিশ্চয় স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং নীরবে তাঁদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে গেছেন প্রতি বছর, একজন সভাপতির নেতৃত্বাধীনে। দুইবার আঞ্চলিক কমিটির সভ্যরূপে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে লেখকের এ সম্বন্ধে বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মেছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমার নিশ্চয় এই ব্যাপারটির একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ও প্রত্যয়ের সুযোগ ঘটেছে। সেদিক থেকে বিচার করে অনেক প্রেসের প্রতিনিধির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে এ বছরের কেন্দ্রীয় এ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীরমেশ থাপার কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরালের কাছে যে মন্তব্য পাঠিয়েছেন কমিটির সুপারিশ ঘোষণার সঙ্গে তার মধ্যে একটি কার্য অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক ও অনুচিত প্রতীয়মান হবে ও হয়েছে। এর সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা আমি কর্তব্য বলে জ্ঞান করি।

শ্রীথাপার ধান ভানতে গিয়ে শুধু শিবের গীত গান নি, চেয়ারম্যানরূপে নিজের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে অনেকদূর চলে গিয়ে আঞ্চলিক কমিটিগুলির উপর অযাচিতভাবে অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর সেই কার্যের পদ্ধতির মধ্যে অধিকারভঙ্গের কথা না তুলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুস্পষ্ট আভাস দেখা যায়, অতীব দুঃখের সঙ্গে এ কথা জানাই। অবশ্য এই সমালোচনা সংবাদপত্রে যতোটুকু তাঁর অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে তারি উপর ভিত্তি করে রচিত। তার থেকে বলা যায়, আঞ্চলিক কমিটিগুলির উপর তাঁর বক্র কটাক্ষপাত শুধু বিতর্কের যোগ্য নয় অনেকাংশে হাস্যকরও বটে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে খোলাখুলি আলোচনার যোগ্যতা দাবী করে।

থাপার সাহেব বলেছেন, আঞ্চলিক কমিটিগুলি নাকি ছবির শিল্পগুণাগুণের বিচারের কথা ভুলে গিয়ে প্রধানত বক্স-অফিসের সাফল্যের সস্তা ছাপমারা ছবিকেই সুপারিশ করে পাঠান। তিনি যদি আর একটু সংযত হয়ে বলতেন যে এই বছরের আঞ্চলিক কমিটিগুলিই এই দোষে দুষ্ট হয়ে কাজ করেছেন তা হলে অবশ্য তাঁর অভিযোগের একটা সীমিত চরিত্র অনুমান করা

হারায়ে খুঁজি : সোমা দে ও মাধবী চক্রবর্তী। পরিচালনা—স্বদেশ সরকার।

যেত। কিন্তু তিনি যেভাবে ক্রোধের বা অসহিষ্ণুতাবোধের আধিক্যবশত ঢালাও অভিযোগ এনেছেন বলে অনুমিত হয় সাধারণভাবে প্রতি বৎসরের নির্বাচিত আঞ্চলিক কমিটির কার্যবিধি সম্পর্কে তাতে মাত্রাজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তার একটা প্রমাণস্বরূপ এ কথা নিশ্চয় যুক্তিপূর্ণভাবেই বলা যায় যে পূর্ব-পূর্ব বৎসরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিরা যখন তাঁদের অধীনের আঞ্চলিক কমিটির কার্যধারার বিপক্ষে কোন নালিশ জানানো প্রয়োজন বোধ করেননি তখন বর্তমান সভাপতির এমন বেপরোয়াভাবে পূর্বের সকল কমিটিকে জড়িয়ে সাধারণ অভিযোগকে অসাধারণরূপে ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলে অভিহিত করা যেতে পারে সহজেই। সস্তা বাজার-চলতি হাওয়ার প্রতি আনুগত্যরক্ষার যে প্রবণতার নালিশ তিনি রেখেছেন আঞ্চলিক কমিটিদের বিরুদ্ধে সেটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত বিচারপ্রসূত পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবিগুলির সঙ্গে তুলনা করে, যাতে সহজেই বোঝা যাবে বিচারক স্বয়ং বিচার্য কি না।

প্রথমেই আসা যাক এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বের কয়েকটি 'শ্রেষ্ঠ জাতীয় চলচ্চিত্র' পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির প্রসঙ্গে। অন্তত তিনখানি এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের গৌরবে ভূষিত ছবির নাম করছি যাদের নিতান্ত গলাবাজিসম্পন্ন লোক ভিন্ন কেউ বলবেন না বক্স-অফিসের উত্তাল সাফল্যে মণ্ডিত বলে। একটি হল পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দেবকী বসুর সুন্দর পরিচালনায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সুবিখ্যাত কাহিনী 'সাগর-সঙ্গমে'-র চিত্ররূপ। দ্বিতীয়টি হল বহু বছর আগেকার হিন্দী ছবি শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ও স্বর্গত বলরাজ সাহনির অভিনয়ধন্য এক সমাজহিতব্রতী নিঃস্বার্থ ও নিরলস চিকিৎসকের আদর্শবাদী জীবনের চলচ্চিত্রণ : নাম 'অনুরাধা'। তৃতীয়টি কয়েক বছর আগের ছবি, শ্রীবাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত ও পরলোকগত সুখ্যাত লেখক-গীতিকার শৈলেন্দ্র-প্রযোজিত 'তিস্‌রী কসম্‌'—যা প্রত্যেক সমালোচক ও সূক্ষ্ম রসিক দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েও, রাজ কাপুর ও ওয়াহিদা রহমান-এর মতো একটি সর্বজনপ্রিয় তারকাজুটিসম্বলিত হয়েও জনসাধারণের প্রীতিপুষ্ট হতে পারল না। মালয়ালম্‌ ও তামিল ছবির কথা (একখানি ছাড়া) বলতে পারি না। কিন্তু হিন্দী ও বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এমন উদাহরণ আরো কয়েকটি দেখানো সম্ভব। এমনকি শ্রীমৃণাল সেনের আশ্চর্য-মৌলিক পরিচালনগুণে মহৎ 'ভুবন সোম'-এর মতো অসাধারণ ছবিও বলা যায়, তেমন কিছু রোমাঞ্চকর সাড়া জাগাতে পারেনি বক্স-অফিসে। আর ভারতগৌরব সত্যজিত রায়ের 'সীমাবদ্ধ'-র মতো ছবি? এতেগুলি দৃষ্টান্তের পরেও কেউ মানবেন শ্রীথাপার-এর অভিযোগের মূলে বিষয়ে যৌক্তিকতা?

এর চেয়েও বড়ো যুক্তি আছে। বিপরীত দিক থেকে বিচারেও দেখা যায় এমন এমন ছবি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে যেগুলি যেমন শৈল্পিক সৌন্দর্যে তেমন দর্শকমাল্য-চন্দনে ভূষিত। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধ করি সত্যজিত-প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল চিত্র 'পথের পাঁচালী' যা ঘরে-বাইরে ও বক্স-অফিসে সবত্র সমান পুষ্ট। এ দৃষ্টান্ত আরো আছে। অতএব টিকেট ঘরে সাধারণের উচ্চ পৃষ্ঠ-পোষকতার ছাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহৎ কোন চিত্রসৃষ্টির অক্ষয় সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে এমন কথাও পাগল ছাড়া কেউ বলবেন না।

এবারে আসি সোজাসুজি শ্রীথাপার-এর নেতৃত্বে গঠিত এবারকার কেন্দ্রীয় কমিটির বিচারে 'সর্বশ্রেষ্ঠ'রূপে জাতীয় পুরস্কার-সম্মানে সম্মানিত মালয়ালম্‌ চিত্র 'স্বয়ম্বরম' ছবির কথায়। পুণা ফিল্ম ও টেলিভিশান ইনস্টিটিউট-এর এক প্রতিভাবান ছাত্র আদুর্‌ গোপাল কৃষ্ণন-এর পরিচালিত এই ছবিটিকে, জানা গেছে, প্রচলিত পন্থা অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার অর্পণ করা হয়েছে। ছবিটি নাকি এর নিজস্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক এ্যাওয়ার্ড কমিটির সুপারিশলাভে বঞ্চিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সমক্ষে। তা সত্ত্বেও শেষোক্ত কমিটি নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ছবিটিকে চেয়ে আনেন দেখতে। এবং দেখবার পর তিনটি আঞ্চলিক কমিটি (বোম্বাই-কলকাতা-মাদ্রাজ)-র বিভিন্ন সুপারিশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বয়ম্বরম-কে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবার। জানিনা, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবে অগ্রিমরূপে প্রভাবান্বিত হয়েই কিনা ভারত সরকার এই ছবিটিকে এবার মস্‌কো-র অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় 'এন্‌ট্রি'রূপে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে

ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশান-এর অন্যতম সভ্যরূপে উপস্থিত থাকবার এবং উৎসবে আগাগোড়া যোগদান করবার সৌভাগ্য লেখকের ঘটেছিল। সেখানে যেদিন এই ছবি দেখানো হয় সেইদিন ছবিটিকে, ছবিটির পরিচালককে ও ছবির নায়ক মধু-কে স্টেজ-এ বিপুল জনসম্বর্ধনার মধ্যে জনতার সামনে উপস্থাপিত করেন ভারতীয় ডেলিগেশান-এর নেতা সর্বজনপ্রিয় ও সুধী শ্রী আই কে গুজরাল মহোদয়, যিনি আমাদের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী। জনতার সেই গোড়াকার সহর্ষ অভিনন্দনের সরব প্রতিধ্বনি এখনো যেন কানে লেগে আছে। আর সেই ছবির প্রদর্শন-অন্তে হল-এ আলো জ্বলে উঠলে দেখা গেল শুধু হল অর্ধেক খালি নয়, পাশ্চাত্য সমস্তরকম সামাজিক সৌজন্যবোধ উপেক্ষা করেও প্রেক্ষাগৃহে একটি দর্শকেরও একটি ক্ষীণ করতালি পড়ল না। শুধু তাই নয় পরে আমাদের হোটেল-এ সমাগত অন্যদেশের অনেক ডেলিগেট, এবং এমনকি উৎসব-আয়োজনকারী কমিটিরও কোন কোন বিশিষ্ট সভ্য গোপনে এসে আমাদের কাছে দুঃখ জানিয়ে গিয়েছিলেন এই বলে : 'ভারতবর্ষ থেকে কি মনে করেন এর চাইতে ভাল একখানা ছবিও পাঠানো যেত না?' শুধু দর্শকমণ্ডলী নন, রসিক সমালোচক ও আয়োজকমণ্ডলীর সভ্যরাও যখন এ ছবির সম্বন্ধে এই মত দিয়েছেন তখন তাকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা—আঞ্চলিক কমিটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও তাঁদের সম্বন্ধে অপমানসূচক মন্তব্য পাশ করার পর,—এতে কি কাচের ঘরে বাস করে বাইরের জগতের প্রতি ঢিল মারার চিরন্তন সত্যটাই নির্মমরূপে প্রকট হয়ে ওঠে না? আমি এখানে ছবির পরিচালক শ্রীগোপাল কৃষ্ণনের নিহিত প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না। শুধু বলব, তাঁর সেই প্রতিভাকে সময় দেওয়া উচিত ছিল সম্যক পূর্ণতা ও অধিকতর ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগশক্তিলাভের জন্য। কিল মারলেই ফল পাকে না, পাকে উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশ-গুণে।

একজন সমালোচক পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন সেকথা এবার উল্লেখ করি আমার পূর্ণ অনুমোদনসহ। এখান থেকে তিনটি ছবির সুপারিশ গিয়েছিল এখন এ কথা বলা যায়। 'স্ত্রীর পত্র', 'বিলাত-ফেরত' ও 'কলকাতা ৭১'। শেষোক্তটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার-এর সম্মানও অর্জন করেছে, প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চিত্রের। এর প্রথম ও শেষোক্ত দুটি ছবির কোনটিই উল্লেখযোগ্য কোন বক্স-অফিস সাফল্যের অধিকারী হয়নি।

রৌদ্রছায়া / উত্তমকুমার

অচেনা অতিথি : জ্ঞানেশ, জয়শ্রী ও সুখেন দাশ।

(লেখবার সময়) দ্বিতীয়টি চলছে বলে এর বকস অফিসের সাফল্য-অসাফল্য সম্বন্ধে কোন উক্তিই অশোভন হবে বলে মনে করি। যাই হোক, শ্রীথাপর কি এর পরেও গোঁ ধরে থাকবেন আঞ্চলিক কমিটি শুধু বক্স-অফিসের তাপমানেরই অনুগামী শিষ্য? তাঁর কমিটি নিজেরাও কি এই ছবিগুলির শিল্পসৌকর্য ও মানবিক গুণের জন্যই তাদের সম্বন্ধে সুপারিশ মেনে নেননি? বোম্বাই-এর কমিটি যেসব সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ঐ আঞ্চলিক কমিটি নিজেই নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য করেছিলেন যে এর কোনটাই জাতীয় পুরস্কারের অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকের যোগ্য বলে বিবেচিত হবার মতো নয়। এবং এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, প্রতিটি পুরস্কার-প্রদানের বেলাতেই কেন্দ্রীয় কমিটির মতামত-ই চূড়ান্ত। এবং তাঁদের কাছে আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশ-এর বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগ ইচ্ছা করলেই সম্পর্কিত ছবির নির্মাতা আনতে পারেন।

বোম্বাই-এর কমিটির উপরোক্ত অভিমত-প্রকাশের [illegible] বিচার করা যাক কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক

'কোশিস' নামক হিন্দী ছবিটির পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার শ্রীগুলজারকে বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার প্রদান। কি করে এ কার্য সম্ভব হতে পারে, যখন একথা সর্বজনাবাদিত যে ছবিটির অনেক গুণ সত্ত্বেও এর কাহিনীটি আদৌ মৌলিক নয়, কেনন এর কাহিনী বিখ্যাত জাপানী চিত্র 'দি হ্যাপিনেস অব আস এ্যালোন-এর কাহিনীরই হিন্দী রূপান্তর? কাজেই আঞ্চলিক কমিটিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে থাপ্পড় মারার আগে থাপার মহাশয় একটু ভেবে দেখলে ভাল হত না তাঁর নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটিকে বললে, যে নিজের কাজটা ঠিকমতো করো, নইলে বিচার করতে গিয়ে স্বয়ং বিচারের 'কেস' হয়ে দাঁড়াবে?

এই ধরনের নানা অনুচিত ও প্রয়োজনবহির্ভূত অভিযোগের পর শ্রীথাপার 'সেন্সার বোর্ড' সম্পর্কেও অনেক অসংলগ্ন উক্তি করেছেন যা কেন্দ্রীয় এ্যাওয়ার্ড কমিটির আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। হিন্দী ছবির মারপিট-মূলক দৃশ্যগুলির দর্শকমনে ভয়াবহ পরিণতি-সম্পর্কে শ্রীথাপার সমাজ-বিজ্ঞানীর কায়দায় যে আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন তা আমার মতে বাড়াবাড়ি। হিন্দী ছবির অবাস্তব কাণ্ডকারখানাগুলি সাধারণ দর্শক তাৎক্ষণিক উত্তেজনাপ্রদ সুখ-সুড়সুড়ির অংগমাত্র বলেই গ্রহণ করেন, তার নাচ, গান, মেলোড্রামাসুলভ অভিনয় ও অনুচ্চাংগ রস-রসিকতার নানা কৌতুকপ্রদ উপাদানের সঙ্গে। সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার মতোই দর্শক তা উপভোগ করেন কোন গুরুত্ব না দিয়ে। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেন তাঁরা নানা কৌতুককর মন্তব্য করতে করতে বাড়ী ফেরার পথে। মনে রাখার চেষ্টা থাকে তাঁদের শুধু ছবির গানগুলি ঠোঁটে ও কণ্ঠে তুলে রাখার জন্য। অবশ্য ছবি দেখে যৌন-আবেদন সঞ্চার ব্যাপারটা, যা নিয়েও শ্রীথাপার চিন্তিত, তা নিয়ে আমি কোন স্থির মত প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। এ ব্যাপারটাতে বাড়াবাড়ি থাকে কিনা, আর্ট-এর মাধ্যমে যৌন আবেদনের প্রকাশভঙ্গী অশ্লীলতায় পড়ে কিনা কোন কোন ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় দুশ্চিন্তা হতে পারে, নালিশ থাকতেই পারে। কিন্তু আমি মনে করি এ ব্যাপারে বিলিতি ছবির প্রভাব অনেক বেশী মারাত্মক, কেননা 'সেকস' ভাণ্ডারে খেতে তারা অনেক বেশী যান। হিন্দী ছবির 'সেকস' প্রচেষ্টা শুধু মেয়েদের অদ্ভুত পোশাকে ও ভাবভঙ্গীতে। বিষয়টি বহু বিতর্কের অবকাশ রাখে। যেমন খুব জোরালো যুক্তিস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান যুগের নরনারী অনেকখানি বে-আবরু হয়েছে। তারই অনুসরণে বা সেই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে চলচ্চিত্রে কেউ কেউ যদি দর্শকের অর্থাৎ পুরুষ দর্শকের উক্ত আনুকূল্য লাভ করতে সচেষ্ট হন তবে সে প্রয়াস মোটেই প্রশংসাযোগ্য না হলেও তাকে বিচার করে সমাজকর্তব্যজ্ঞানের ব্যাপারে দায়ী করার আগে এ যুগের নরনারীর অনেকখানি যৌন আবেদনে বেপরোয়া প্রবণতার ব্যাপারেও অবহিত হতে হবে বই কি! চলচ্চিত্র তো বর্তমান কালের নরনারীরই মানসিকতার প্রতিচ্ছায়া মাত্র! তাকে শাসন করুন, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো অনেক মানবমনোবিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নকে বাস্তবের তীব্র আলোকে ফেলে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। নগ্নতা-প্রবণতা তার একটি মাত্র দিকের বিস্ফোরণ-চিহ্ন শুধু। দেহের নগ্নতাকে পোশাক দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেও মনের নগ্নতার বিশ্লেষণের চিত্রায়িত বা নাট্যায়িত রূপায়ণ কি সেন্সার-এর কাঁচি চালিয়ে প্রতিহত করা সম্ভব? এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে একথা স্মর্তব্য যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের কর্তৃপক্ষই এখন জনদাবীকে মেনে নিয়ে সেন্সার প্রথা বিলোপ করার কথা গুরুত্বসহকারে চিন্তা করছেন।

'অন্ধকারের মানুষ আমি—আলোয় আসতে চাইলেও অন্ধকার আমায় রেহাই দেবে না—'

শুক্রবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ঃ বসুশ্রী ঃ বাণী ঃ আলোছায়া এবং অন্যত্র।

দাবী : সন্ধ্যারাণী ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা—কনক মুখোপাধ্যায়।

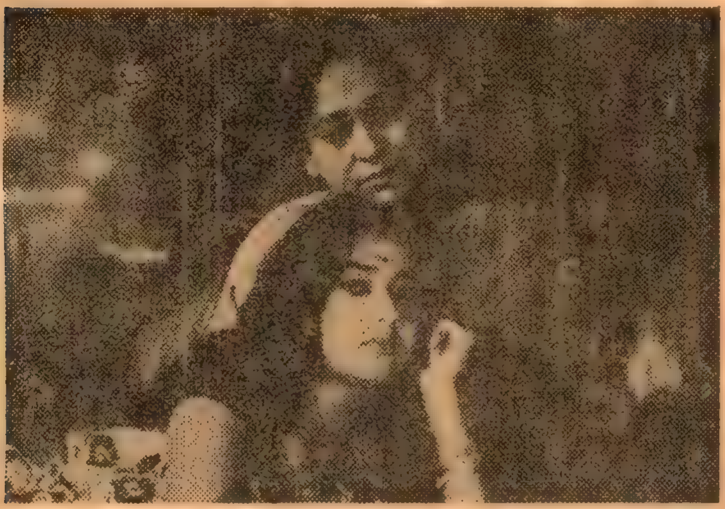

বভ্রুবাহন : লোলিতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা—অসীম পাল।

বাঙলা রঙ্গালয়ে মঞ্চরীতির বিবর্তন

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে মঞ্চশিল্পীরূপে ধর্মদাস সুর ও জহরলাল ধর যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, মধ্য যুগে তেমনই খ্যাতিলাভ করেন মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু) এবং পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)। দীর্ঘকাল ধরে স্টেজ ম্যানেজারের পদে (সে-যুগে শিল্প-নির্দেশক নাম বা পদের সৃষ্টি হয়নি) যুক্ত থাকায় ধর্মদাস মঞ্চকলাকৌশল ও স্টেজ প্রোডাকসান সম্পর্কে বহু বিদেশী পুস্তক পাঠ করেছিলেন এবং নাটকের প্রয়োজন বোধে অর্জিত বিদ্যার কিছু কিছু সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগও করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত "শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকে তাঁরই চেষ্টায় সমুদ্রের অরণ্যে রূপান্তরের ডায়ারমা প্রদর্শিত হয়।' ১৮৮৫র ২৭ আগস্ট তারিখে অভিনীত 'কুমারসম্ভব'-এ মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাব মেকানিক্যাল ডায়রামার সাহায্যে দেখানো হয় ধর্মদাসেরই কৌশলী বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে। এরও অনেক আগে ১৮৭৭ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যখন 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' নাটকটি অভিনীত হয় তখন ধর্মদাসবাবু শূন্যে কালীর আবির্ভাব দেখিয়ে দর্শকদের চমকিত করেন। মঞ্চকুশলী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র অনেক ব্যাপারে ধর্মদাসের সহায়তা করেন।

১৮৮৩র ২১ জুলাই বিডন স্ট্রীটে নবগঠিত স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয় গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে। এই নাটকে স্টারের মঞ্চশিল্পী জহরলাল ধর কাচের উপর আলো ফেলে দশমহাবিদ্যার চমকপ্রদ আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ঐ বছরেরই ২২ ডিসেম্বরে প্রথম অভিনীত 'নলদময়ন্তী' নাটকে গিরিশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কমলকোরক প্রস্ফুটিত হয়ে অপ্সরাগণের আবির্ভাব, বস্ত্র মুখে করে সহসা পক্ষীর আকাশে উড্ডয়ন প্রভৃতি কয়েকটি চমকপ্রদ দৃশ্য যোজনা করেন। মঞ্চশিল্পী জহরলালের দক্ষতায় প্রতিটি দৃশ্যই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র বিরচিত 'কমলে কামিনী' নাটকেও কালীদহে কমলে কামিনী প্রভৃতি দৃশ্য তিনি সুকৌশলে দেখাতেন। গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' নাটকে জহরলালবাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ দেখিয়ে দর্শকদের করতেন বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি স্টারের জমি ও বাড়ী কিনে নেন মতিলাল শীলের বংশধর গোপাললাল শীল। এমারেল্ড থিয়েটার নাম দিয়ে তাঁর থিয়েটারটি যখন উদ্বোধন হয়, তখন তিনি ডাইনামো বসিয়ে বাড়ীটিকে ইলেকট্রিক আলো দ্বারা আলোকিত করেন। মঞ্চশিল্পী জহরলাল ধর এই ইলেকট্রিকের সাহায্যে নানা রকম মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করেন

১৮৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধিনায়কত্বে ক্লাসিক থিয়েটার তার বিজয়যাত্রা শুরু করে এই এমারেল্ডেরই বা পুরাতন স্টারের বাড়ীতে। আমরা জানি যে মঞ্চের ওপর সরু সরু কাঠের পাটির সাহায্যে গড়া বা চাকাওয়ালা ভিতর দিয়ে চালিত সিনের

ব্যবহারের কথা বলেছি, তার প্রচলন এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই হয়। এছাড়া প্রয়োজনে কাটা সিন—যা হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তনের জন্যে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত—বক্সসিন পরিবর্তনকল্পে উইংস ও প্রোসিনিয়ম এবং যবনিকা হিসেবে 'কার্টেন'-এর ব্যবহার এই ক্লাসিকের সময় থেকেই শুরু। ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক চালু হয়ে যাওয়ায় ফুটলাইট হিসেবে ইলেকট্রিকের ব্যবহার করা হচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে। অমরেন্দ্রনাথ চন্দ্রবদনের সহায়তায় নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে রঙীন আলো এবং স্পট লাইট ব্যবহার করতেন।

ক্লাসিকের পরে ওখানে যখন ১৯০৭ থেকে শরৎকুমার রায় পরিচালিত 'কোহিনুর থিয়েটার' চালু হয়, সেই সময়ের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লন্ডন রেপার্টরি কোম্পানী ১৯১১তে কলকাতায় এসেছিলেন ম্যাকবেথ ওথেলো প্রভৃতি ইংরেজী নাটক পরিবেশনের জন্যে। এই সংস্থার অভিনেতা-প্রযোজক অ্যালান উইলকিকে ক্লাসিকের কর্তৃপক্ষ (শরৎকুমার রায়ের ভ্রাতা শিশিরকুমার রায়) নিয়োগ করেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র লিখিত 'মোহিনী মায়ার' (সী স্টুপস টু কনকার-এর অনুসরণে লিখিত) নাট্যনির্দেশনা দেবার জন্য। তাঁর নির্দেশিত নাটকটি কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

মঞ্চরীতিতে বৈপ্লবিক নতুনত্বের আমদানী করেন ১৯২৪ সালে শিশির কুমার ভাদুড়ী তাঁর নবগঠিত মনোমোহন নাট্যমন্দিরের উদ্বোধনী নাটক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সীতা' অভিনয়ে। তিনি মঞ্চ থেকে ফুট-লাইট অপসারিত করেন, উইংসের অবলুপ্তি ঘটান এবং সম্ভবমত ক্ষেত্রে মঞ্চের পশ্চাদপটে মুক্ত আকাশ দেখান। পৌরাণিক নাটকের দৃশ্যসজ্জায় অজন্তা-ইলোরার অঙ্কনপদ্ধতির অনুসরণ করেন। তোরণ বা অন্য প্রবেশপথকে মানুষের উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ করান। মঞ্চশিল্পী চারু রায় পুরো এক ঘন্টাব্যাপী প্রথম দৃশ্যের জন্যে বক্স-সিনের ব্যাপক প্রবর্তন করেন। 'জনা' নাটকে মঞ্চশিল্পী অনাথনাথ মৈত্র ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প অনুসরণে দৃশ্যাদির পরিকল্পনা করেন। 'দিগ্বিজয়ী'তে মুঘল ভাস্কর্য প্রতিফলিত হয়। মঞ্চ আলোকিত করা হত সব সময়েই ওপর থেকে।

শিশিরকুমারের পরে যিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একটি বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করেন তিনি হচ্ছেন মঞ্চজাদুকর সতু সেন। আমেরিকা থেকে ১৯৩১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি রঙমহলে ঘূর্ণায় মঞ্চ (রিভলভিং স্টেজ) স্থাপন করেন। এই ঘূর্ণায় মঞ্চে আভ্যন্তরীণ যথেষ্ট কমে গেলেও নাট্যাভিনয় অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয় এবং সেই কারণে সামগ্রিক রসস্ফূর্তিতে বাধা পড়ে না। কিন্তু এই মঞ্চ পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাট্যপ্রযোজনায় কতখানি সহায়ক, তা আজও পরীক্ষিত হয়নি। আলোকের মায়া বিভ্রম সৃষ্টিতেও শ্রীসেনই পথপ্রদর্শক।

পরবর্তী যুগে মঞ্চশিল্পে বা দৃশ্যসংস্থাপনায় প্রচুর নূতনত্ব আনয়ন করেন লিটল থিয়েটার গ্রুপের উৎপল দত্ত। তাপস সেনের সহায়তায় প্লাস্টিক শীটের সুকৌশল প্রয়োগে 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্যে খনির মধ্যে শিল্পীদের জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য, 'কল্লোল' নাটকে জাহাজের অংশের দৃশ্য প্রভৃতি স্মরণীয়।

বিশ্বরূপাতেও তাপস সেন 'সেতু' নাটকে সেতুর ওপর অগ্রগামী ট্রেনের পরিকল্পনায় যথেষ্ট অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। রাসবিহারী সরকারের চতুর্দিক খোলা মঞ্চে থিয়েটারস্কোপ প্রকল্পই অভিনব চিন্তাধারার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রসংগীত-নাটক-নৃত্য

জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধানে

সন্ধ্যা সেন

রবীন্দ্রনাথের মনের নিভৃতলোকে যে বাসনা একটি গোপন কথার মতই লুকনো ছিলো—তারই এমন উচ্ছল, উত্তাল প্রকাশ ঘটালেন যেসব শক্তিমান শিল্পীরা এই প্রসঙ্গে তাঁদের স্মরণ করাটা শুধু সাংস্কৃতিক নয়, জাতীয় কর্তব্যও।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম যুগ ছিলো একেবারে মহিলাশিল্পীদের যুগ। কবি গান বেঁধে সঙ্গে সঙ্গেই কাছাকাছি স্নেহের পাত্রীদের শিখিয়ে নিতেন, আর তাঁরাই হয়ে উঠতেন কবির গানের জীবন্ত স্বরলিপি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী (রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আগের যুগে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন), সাহানা দেবী, অমলা দেবী, অমিয়া ঠাকুর, মালতী ঘোষাল, অমিতা দেবী—আরও অনেকে। কিন্তু সে গান সমাজের ওপরের মহলে এক বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এ গান এখন ছিলো 'রবিঠাকুরের গান', জনসাধারণের রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠতে পারে নি।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, ছায়াছবি ও তারই মাধ্যমে পংকজ মল্লিক, সায়গল ও কানন দেবীর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। 'চণ্ডালিকা'য় আনন্দের 'শুধু একটী গণ্ডূষ জল' চাওয়ায় প্রকৃতির জীবনে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলো—এঁদের গাওয়া মাত্র তিনখানি গান 'দিনের শেষে' (যাতে রবীন্দ্রবাণীতে পংকজ মল্লিকের সুর আরোপিত), 'আমি তোমায় যত' ও 'সবার রঙে রং মেশাতে হবে'—সারা দেশে যে আলোড়ন তুলেছিলো সে কাহিনী বিদগ্ধ অ-বিদগ্ধ সকল শ্রেণীর চিত্ত এবং সংগীত রসিকদের স্মরণপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ-গান ছাড়াও কানন দেবী ও সায়গল আরো রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, 'এদিন আজি কোন ঘরে গো', 'তোমার বীণায়' (সায়গল), 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'আমার বেলা যে যায়', 'সেদিন দুজনে' 'একদিন চিনে নেবে তারে', 'তিমির দুয়ার খোলো', 'এতদিন যে বসেছিলাম', 'কাছে যবে ছিলো' এবং আরো গান (কানন) এবং সে গান—জনসাধারণ যেন লুফে নিয়েছেন। শুধু 'আজ সবার রঙে' এবং 'তোমার বীণায়' গানটির অন্তরা অংশে 'ফাগুনে যেমন মধুর খেলায় যে রং, যে মধুর আবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো—সে রং আর কারো গানে ফুটলো না, সে রসে মনকে ভিজিয়ে দিতে পারলেন না আর কোনো শিল্পী। ঐ গানগুলি উত্তরকালে আরো অনেক শিল্পীর কণ্ঠেই ত শুনলাম।

রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার ইতিহাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও একটি বিশেষ স্থান অনস্বীকার্য যদিও তিনি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁর গাওয়া 'পথের শেষ কোথায়', প্রাংগণে মোর শিরীষ শাখে', 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'—রসিকচিত্তে যে দোলা জাগিয়েছিলো তা ভোলার নয়।—সন্তোষ সেনগুপ্তর 'কেন বাজাও' এবং আরো কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পরেই কণিকা সুচিত্রা, রাজেশ্বরী দত্তর মত প্রতিভাময়ী শিল্পীরা এসে রবীন্দ্রসংগীতের নানা দিকে আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। টপ্পা অঙ্গের 'বঁধু রহ সাথে'—উচ্চাঙ্গ সংগীতে ধ্রুপদাংগের ভিত্তিতে 'এ পরবাসে রবে কে' অথবা স্তব্ধ প্রাণের গম্ভীর জিজ্ঞাসা 'কার মিলন চাও বিরহী?'—আরো অনেক অনেক ফুলে ফুলে এঁরা গানের ডালি ভরে দিয়েছেন। দেবব্রত বিশ্বাস বিতর্কিত, কিন্তু শক্তিমান শিল্পী। তাঁর জলমন্দ্র স্বরটুকু নিয়েই একটি বিশেষ সম্মানের আসন তাঁর আছে। কারণ প্রকাশভঙ্গীর অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্ব। সুবিনয় রায়ের অবদানও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

দ্বিজেন, চিন্ময়—গাম্ভীর্য ও মধুরতার কারণে জনপ্রিয়। অধ্যাসহ একক আসরের অবতারণা করে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে প্রবেশের যে পন্থা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন, মাত্র ৩ বছর আগে তা শুধু জনপ্রিয়ই হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন শিল্পীদের গায়নশৈলী ও মানসধারা অধ্যয়ন করার প্রশস্ত অবকাশ এই আসরগুলিতে মেলে। তরুণেদের শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিভা ও সুকণ্ঠের অভাব নেই। এঁদের মধ্যে (মহিলা) কেউ কণিকা কেউ বা সুচিত্রার অনুসারী জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে। তিন সেনের মধ্যে দুই সেন (সুমিত্রা ও সাগর) কোনো বিশেষ ভংগীতে প্রভাবিত নন। নিজস্ব মুক্ত-ভংগীতে পরিবেশনার কারণেই হয়ত এঁদের গান অনেকের অনেক বেশী ভালো লাগে। আর্য সেনের কণ্ঠে সন্তোষ সেনগুপ্তর ছায়া থাকলেও সেটা তাঁর গানকে সমৃদ্ধই করেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্য গান ও নাটক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলেই এই প্রসঙ্গে নাটকের কথাও আসে। রবীন্দ্রনাট্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক যুগস্রষ্টা শ্রী ও শ্রীমতী শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্র। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'রাজা' ভাবনারএর এমন রূপসৃষ্টি কল্পনাই করা যেতো না যদি না এঁদের মত সৃষ্টিশীল প্রতিভার আবির্ভাব ঘটত।

নৃত্যনাট্যের প্রসঙ্গে শোনা যায় বহু দিন আগে এখনকার 'ছায়া'তে শান্তিনিকেতন থেকে শিল্পীর দল অপূর্ব অনুষ্ঠান করেছিলেন। মঞ্চের একদিকে বসেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী। সে দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। যাদের হয়েছে তাঁরা ধন্য।

আমাদের কালে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দেখলাম উদয়শংকর পরিকল্পিত এবং পরিচালিত 'প্রকৃতি-আনন্দ' ও 'সামান্য ক্ষতি'—তারই তুলনাবিহীন ভঙ্গীতে। কোনো বিশেষ আংগিকে বাঁধা নয় বলেই মহাশিল্পীর মুক্ত মনের প্রকাশ এমন হৃদয়গ্রাহী। এ যেন রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শংকরের এক মহামিলনের ছবি।

অসামান্য জনপ্রিয় নৃত্যের মধ্যে 'শ্যামা'র যে ইম্প্রেশন মঞ্জুশ্রী চাকী ও বালকৃষ্ণ মেনন সৃষ্টি করেছেন আজ অবধি কেউ তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

এখন নৃত্যনাট্যের ধারা যাঁরা প্রবাহিত রেখেছেন—অসিত চ্যাটার্জি, সাধন গুহ, নরেশকুমার, বটু পাল, হিমাংশু, ভানু দত্ত, সুমিত্রা মিত্র, অলকানন্দা, পার্থ গুহ, আরতি মজুমদার এবং অন্যান্যরা। সকল সমালোচনার ঝড় মাথায় নিয়েও এঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সকল ত্রুটি নিয়েই একদিন সার্থকতায় পৌঁছবে এই আশাই করব।

ইদানীংকালে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে তরুণ সংগঠক বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টাও অভিনন্দনের দাবী রাখে।

একথা অনায়াসেই বলা যায় শান্তিনিকেতনে কবির সংস্কৃতির কেন্দ্র হলেও রবীন্দ্রসংগীত নৃত্যনাট্যের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে কোলকাতার শিল্পীদের অবদান যথেষ্ট তো বটেই শুধু নয়—বিস্ময়করও বটে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিকারশিল্পী জিম করবেট

বিশ্বনাথ বসু

একথা অনস্বীকার্য যে শিকার একটি উচ্চস্তরের শিল্পকলা, আর তা সম্পূর্ণভাবেই বিজ্ঞান-ভিত্তিক। প্রকৃতির পাঠই হচ্ছে সেই বিজ্ঞান সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম। তাই মনে হয় জিম করবেটকে নিছক একজন শিকার-বিশেষজ্ঞ বললে কম বলা হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায় তাঁর পরিচিতি ব্যক্ত করা যায় 'প্রকৃতিবিদ' রূপে।

করবেট নিজেকে কিন্তু বলতেন 'প্রকৃতির ছাত্র'। তাঁর এই উক্তির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও ছিল। তাঁর মতে প্রকৃতিপাঠের কোন সুরু বা শেষ নেই, এবং এই পাঠের পঠন পদ্ধতির কোন বাঁধা-ধরা নিয়মও নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের যে কোন অংশ থেকে জীবনের যে কোন অধ্যায়ে এই পাঠ সুরু করা যায়। অফুরন্ত তার উপাদান। কাজেই সে জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হওয়ার দাবী করা যায় না, এবং সে অহমিকা কারো থাকাও উচিত নয়।

প্রকৃতি চিরপরিবর্তনশীল। কাজেই তা অধ্যয়নের কোন নির্দিষ্ট সিলেবাসও নেই। চোখ কান খোলা রাখলে এবং আগ্রহ ও একাগ্রতা থাকলে প্রতিনিয়ত [illegible] জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব। এই পৃথিবীর উদ্ভিদ ও জীবজগৎ তথা চতুর্দিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অহরহ সেই জ্ঞানচর্চার উপাদান পরিবেশন করে চলেছে।

চিরদিন জিম করবেট আরণ্যক পরিবেশের পরম প্রশান্তির মধ্যেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্বভাবজাত কৌতূহলপ্রবণতা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিল।

বন-পরিক্রমায় কখনও কোথাও কোন শব্দ শুনলে বা চিহ্ন দেখলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার কারণ বা উৎপত্তি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হতেন। এই কৌতূহলপ্রবণতার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বন্য পশু পাখীর ডাকের কারণগত পার্থক্য বুঝতে পারতেন, তেমনি নিজেও তাদের ডাক অনুকরণের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে সেইরকম শব্দ ও চিহ্নের উৎপত্তি অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে নিজের ধ্যান ধারণায় বাস্তবভিত্তিক পরিপক্বতা এনেছিলেন। উদাহরণ

হিসাবে বহুর মধ্যের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়:—

কালাধুঙ্গির পার্শ্ববর্তী একটি অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি অন্ধবিশ্বাস চালু ছিল যে কোন একটি নির্দিষ্ট বনপথের ধারে একটি করুণ ভৌতিক বংশীধ্বনি বাতাসে ভর করে ঘুরে বেড়ায়। কোন পথিকের কানে যদি এই ধ্বনি ধরা পড়ে, তবে তার অলৌকিক প্রভাবে সেই ব্যক্তি এবং তার সংসারের ওপর নাকি মহা অমঙ্গল নেমে আসে। জিম করবেটও শৈশব থেকে এই কিম্বদন্তির কথা দনশয় নামে এক ব্যক্তির কাছে বহুবার শুনেছেন—যদিও কেউ কখনও তার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছে বলে শোনা যায়নি।

করবেট তখনও অল্পবয়স্ক বালক। একদিন একাকী পাখী শিকার থেকে উল্লিখিত বনপথ ধরে ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে পড়ে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেন। ঠিক সেইসময় দনশয় বর্ণিত সেই বংশীধ্বনি করবেটের কানে এসে পৌঁছয়। ভয়ে না হলেও বালসুলভ সংস্কারবশে তিনি তখন ঝড়জল অগ্রাহ্য করে ছুটে বাড়ীতে ফিরে আসেন। বংশীধ্বনির কথাটা তিনি দনশয় ও বাড়ীর লোকের কাছে চেপে যান। মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অস্বস্তিও পোষণ করেছিলেন তিনি, বাড়ীর ওপর বংশীধ্বনির ভাবী প্রভাবের কথা চিন্তা করে। ফলে সেই জঙ্গল এলাকাটা তিনি বহুদিন পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন।

[illegible]

বিকেলের দিকে ঐ বনে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে একটা গাছে পিঠ ঠেকিয়ে যখন তিনি অপেক্ষা করছেন তখন হঠাৎ সেই বংশীধ্বনির আওয়াজে তিনি আবার চমকে উঠলেন। গতবারের ধ্বনি শোনার কোন খারাপ প্রভাব আজও তাঁদের ওপর বর্তায়নি, এবং বালক মনে করে সেই অশরীরী শক্তি হয়ত সহানুভূতি-বশত তাকে সেবার রেহাই দিয়েছে ও এবারও দেবে—এই কথা ভেবে করবেট এবার না পালিয়ে কিছু সময় আড়ষ্ট হয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

বংশীধ্বনি বেজেই চললো। কৌতূহলী বালক একটু পরে সাহস সঞ্চয় করে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন হাওয়ার দাপটে দুটো মরা গাছের শুকনো কাণ্ডের পারস্পারিক ঘর্ষণই হচ্ছে সেই ধ্বনির উৎস। করবেট তৎক্ষণাৎ গাছে চড়ে উৎসস্থলটি স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হলেন। সেই দিন থেকে অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখলে বা শুনলে তার উৎস সন্ধানের ঝোঁক করবেটের স্বভাবে বেড়ে যায়, যা কিনা ভবিষ্যৎ জীবন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে তথ্য-সিদ্ধ বহু রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে।

একদিন ভোরে পাখী শিকারে বেরিয়ে করবেট বনপথের ধুলোয় একটা পূর্ণবয়স্ক লেপার্ডের পায়ের দাগ পেলেন। জানোয়ারটা পাশের পাহাড় থেকে এসে রাস্তায় নেমেছিল। পথের বাঁ দিকটা ঘেঁসে কিছুদূর এগিয়ে সে রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে ডান-কিনারে গিয়েছে এবং দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে—সে যে কোন কারণেই হোক জঙ্গলের দিকে মুখ করে একটা ঝোপের পাশে কিছু সময় ওত পেতে বসেছিল এবং পরে জঙ্গলের দিকেই নেমে গেছে। কি সে কারণ যার জন্য লেপার্ড ওখানে ওত পেতে বসেছিল? করবেটের মনে কৌতূহল বাড়লো।

লেপার্ড যেখানে ওত পেতে বসেছিল সেখানে নিজে বসে উঁকি দিয়ে করবেট লক্ষ্য করলেন, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা দূরে একটা ঘাসবনের ফাঁক দেখা যাচ্ছে। লেপার্ডের পায়ের দাগ ধরে সেদিকে গিয়ে বোঝা গেল ঘাসবনে বিচরণরত কোন একটা হরিণকে লক্ষ্য করেই সে এগিয়েছিল। কিন্তু তারপর কি ঘটনা ঘটলো ঘাসবনে, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাইরে আশ-পাশে খোঁজাখুঁজির পর একটা বৃহৎ মাদী শম্বর হরিণের খুরের দাগ আবিষ্কৃত হোল এবং মাটির ওপর সে দাগ যথেষ্টই গভীর। করবেটের বিবেচনায় শম্বরটির সাইজ ও আনুমানিক ওজনের বিচারে তার খুরের দাগের গভীরতা তুলনামূলক হিসাবে অনেক বেশী। মৃত্তিকার কাঠিন্যের বিচারে খুরের দাগের এরূপ গভীরতা ইঙ্গিত দিচ্ছে—ঘটনা-স্থলে যে কোন কারণেই হোক শম্বরটার

ওজন যথেষ্টই বেড়ে গিয়েছিল। কি সে কারণ? করবেটের বিশ্লেষণ সুরু হোল।

ঘাসবন থেকে শম্বরের খুরের দাগ বড় জঙ্গলমুখো। মাঝে মাঝে সে দৃঢ়-ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে দু-জোড়া পা ঈষৎ ফাঁক করে গা ঝাড়া দিয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, তার পিঠে কোন বৃহৎ ওজনের অবাঞ্ছিত আরোহী আঁকড়ে বসেছিল, যাকে সে গা ঝাড়া দিয়ে নামা-বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। কোন্ সে অবাঞ্ছিত আরোহী? করবেটের অনুমানে, পূর্বোক্ত লেপার্ডটাই হয়ত লাফ দিয়ে বেচারার পিঠে চড়ে বসেছে।

কিছুদূর গিয়ে শম্বর পরপর কয়েকটি গাছে গা ঘসেছে। গাছের ছালে তার লোমও লেগে আছে। অর্থাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে না পেরে গাছে ঘসে লেপার্ডকে সে নামাতে চেয়েছে। চার থাবার সুতীক্ষ্ণ বক্রমুখী নখরাঘাতে আঁকড়ে থাকা মাংসাশী জানোয়ারটিকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। নিরুপায় হয়ে শম্বরটি তখন ঘন ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে ঢুকে এলোপাতাড়ি ঘোরাঘুরি করেছে এই আশায় যে গাছের নীচু ডাল-পালায় আটকিয়ে যদি লেপার্ডকে ঝেঁটিয়ে নামানো যায়। ব্যর্থ হয়েছে সে চেষ্টাও। কিন্তু এবার লেপার্ড আর নিশ্চেষ্ট বসে না থেকে পিঠে বসেই ঘাড় কামড়ে ধরে নিজের দেহের ভারে বেমোড়ে ঝোঁক দিয়ে শম্বরকে মাটিতে ফেলে মেরেছে।

লেপার্ডটি কেন আলোচ্য ক্ষেত্রে শিকারে এই পন্থা অবলম্বন করলো এবং কেনই বা সে ঘাসবন ও বড়গাছের জঙ্গল বাদ দিয়ে ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে এসে শম্বরটিকে মারলো?

সতর্ক বিশ্লেষণে করবেট যে ব্যাখ্যা পেলেন তা নিম্নোক্তরূপঃ—

শম্বরটি খুবই বড় ও ওজনে ভারী ছিল। তাকে ঘাসবনে মেরে স্বস্তিতে বসে খাবার জন্য নিরাপদ দূরত্বে বয়ে নিয়ে যাওয়া লেপার্ডের পক্ষে খুবই কষ্টকর হোত। উন্মুক্ত ঘাসবনে বসে খেতে গেলে মানুষের চোখে পড়তে পারতো, এবং কাছাকাছি নিজের বিশ্রাম-স্থল না থাকায় আধখাওয়া দেহ শেয়াল, শকুন, হায়নার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হোত না। তাই লেপার্ড মতলব করেছিল—ঘোড়ার মত পিঠে চেপে বসতে পারলে আত্মরক্ষার অপরিহার্য তাগিদে শম্বর নিশ্চয়ই ঘন-জঙ্গলের দিকেই পালাতে চাইবে। তখন সুবিধা-মত স্থানে তাকে মেরে আড়ালে বসে রয়ে-সয়ে খাওয়া যাবে। কার্যক্ষেত্রে ঘটনাটা তার বুদ্ধিপ্রসূত হিসেব অনু-যায়ীই ঘটলো।

শম্বরের সোয়ারী হয়ে ঘাসবন ছেড়ে বড়গাছের জঙ্গলে এসেও আগাছার ঝোপঝাড় না দেখে জায়গাটা লেপার্ডের কাছে বধ্যভূমির উপযোগী বলে মনে হোল না। তাই তাড়াহুড়ো না করে সে বাহনের পিঠেই গ্যাঁট হয়ে বসে রইল যতক্ষণ না শম্বর লেপার্ডকে তার পছন্দসই বন তথা আপন বধ্যভূমিতে এনে পৌঁছে দিল। স্বর্গত জিম করবেটের স্মরণে একথা সশ্রদ্ধায় স্বীকার্য যে, জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-সংগ্রহের অপরিহার্য প্রয়োজনে অরণ্যচারী জীবজগতের সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রসূত এই কলাকৌশল প্রয়োগের ঘটনার আবিষ্কার নিশ্চতই তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, শিকারের উদ্দেশ্যে লেপার্ড কর্তৃক শম্বর ও চিতল হরিণ, এমন কি কোন একটি ক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে পর্যন্ত আরোহী হওয়ার ঘটনা জিম করবেটের আরো জানা ছিল। কিন্তু বাঘ কর্তৃক এই ধরণের পন্থা অবলম্বনের একটি মাত্র ঘটনাই তিনি জানতেন। সেটা একটা মোষকে নিয়ে।

প্রায় দেড়শো মোষের একটি পাল চরছিল জঙ্গলের মধ্যে ঘাসবনে। বেলা তখন দশটা। হঠাৎ সেখানে দুটো পূর্ণ-বয়স্ক বাঘের আবির্ভাব ঘটে। মোষ-গুলো ভয়ে হুড়মুড় করে ছুট দেয় লোকালয়ের দিকে, তাদের বাথানের উদ্দেশ্যে। একটি বাঘ ঝাঁপ দিয়ে একটি ছুটন্ত মোষের পিঠে ওঠে এবং আঁকড়ে বসে মাংস ছিঁড়ে খেতে খেতে হুঙ্কার দিতে থাকে। ভীতবিহ্বল মোষ তো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে আহার-রত শয়তান বাঘটাকে পিঠে নিয়েই দলের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে গ্রামের দিকে। অতগুলো পলায়নপর মোষের গলার ঘণ্টার শব্দ এবং আক্রান্ত মোষটির আর্তনাদ কানে যেতেই বাথানের লোকেরা সোরগোল সুরু করে দিলে। ফলে তখন বাঘটা মোষটাকে রেহাই দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল।

জিম করবেট কাছেই ক্যাম্প করে-ছিলেন। হৈ-হল্লা এবং দুটো গুলির শব্দ শুনে তিনি গিয়ে দেখেন একটি মোষ রক্তাক্ত অবস্থায় বাথানের মাঠে পড়ে আছে। গুরুতর আহত মোষটার বাঁচার সম্ভাবনা নেই বুঝে বাথানওয়ালাদের অনুরোধে একজন বন্দুকধারী তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।

যাই হোক, মৃত মোষটা পরীক্ষা করে জিম করবেট দেখলেন মোষটা মারবার উদ্দেশ্যে বাঘ তার ঘাড় বা গলায় দাঁত বসাবার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু পিঠে বসেই সে মোষটির গর্দানের নিম্নাংশ থেকে প্রায় পাঁচ পাউন্ড এবং পশ্চাদদেশ থেকে দশ-পনেরো পাউন্ড মাংস খেয়ে ফেলেছে। ছুটন্ত মোষের পিঠে বসে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে খাবার সুবিধার জন্য বাঘ তার তীক্ষ্ম নখের গভীর আঁচড়ে হতভাগ্য পশুটির পিঠের মাংস ফালা ফালা করে ফেলেছে। বোঝা গেল এটা একটি দুর্ধর্ষ শেয়ানা বাঘ। নইলে মোষের দলের ধারে এগুবার সাহস সে পেত না। জিম করবেটের অভিজ্ঞতায় এটা একটি বিরল ঘটনা। এরকম দ্বিতীয় কোন ঘটনা তাঁর জানা ছিল না।

তবে এমন যদি কোন বৃহৎ ও বলশালী বন্য বা গৃহপালিত পশু হয়, যাকে শিকার উদ্দেশ্যে ঘাড় বা গলা কামড়িয়ে সামলানো কঠিন, সেক্ষেত্রে বাঘ বা লেপার্ডকে কখনো কখনো অন্য আর একটি কৌশল গ্রহণ করতে দেখা গেছে। সে কৌশলটি হচ্ছে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে দন্তাঘাতে শিকার প্রাণীটির পায়ের প্রধান ধমনীটি ছিন্ন করে দিয়ে তাকে খোঁড়া ও চলৎ-শক্তিহীন করে দেওয়া, যাতে সে দাপাদাপি, ছুটোছুটি করে আক্রমণ প্রতিরোধের বা পালাবার শক্তি হারিয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ হারায়। এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা জিম করবেট প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শিকার নিয়ে লোক চলাচলের রাস্তা পেরোবার সময় বাঘ বা লেপার্ড যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে তার গমনচিহ্ন লুকোবার জন্য। শিকার টেনে আনতে থাকলেও রাস্তার ধারে এসে বোঝাটা তারা শূন্যভরে ঝুলিয়ে নিয়ে খুব সাবধানে রাস্তা পেরোয় যাতে ধুলোবালিতে কোন টানা দাগ না পড়ে। এটা করে তারা মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য। আর হায়না, শেয়াল, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি মাংসাশী জানোয়াররা যাতে তাদের শিকারলব্ধ মৃতদেহের সন্ধান না পায় সেই উদ্দেশ্যে।

একদিন খুব ভোরে করবেট বেরিয়েছেন লাগির মাথায় ঝোলানো প্রজাপতি-ধরা জালের ঝাঁপি নিয়ে। উড়ন্ত প্রজাপতি খোঁজার মধ্যেও কৌতূহলী চোখ তাঁর পথের ধুলোয় সর্বক্ষণ নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের পদচিহ্ন পর্যবেক্ষণ-রত। পথের এক জায়গার মাটি এত শক্ত যে স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর কোন পায়ের দাগ পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে মাটির বুকে আড়াআড়িভাবে তিন ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি দুই গভীর কাটা দাগ করবেটের নজরে পড়লো। এত ভোরে লোকজন চলাচল করেনি যে কোন অস্ত্রের দাগ রেখে যাবে। গৃহপালিত পশুও চরতে বেরোয়নি যে খোঁটা, খুর বা শিঙের দাগ পড়বে। আর সে কারণে দাগ পড়লেও সে দাগ পথের গতিমুখের সমান্তরালে থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

পথের এই অংশটা প্রায় চোদ্দ ফুটের মত চওড়া। ডান দিকটায় দশফুট চড়াই খাড়াভাবে উপরে উঠেছে। বাঁদিকে জঙ্গলমুখী ঢালু খাদ।

করবেট মনে করলেন, ডান দিকের উঁচু জায়গা থেকে হয়ত কোন শিংওয়ালা জানোয়ার অসতর্কভাবে লাফ দিয়ে নীচে নেমেছে যার শিংয়ের সূচালো মুখের আঘাতে ঐভাবে মাটি খুঁড়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র খুরওয়ালা জানোয়ারেরই তো শিঙ থাকে। লাফ দিয়ে নামলে

খুরেরও কিছুটা অন্তত দাগ মাটিতে থাকা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন দাগ অনুপস্থিত। তাহলে এও তো হওয়া সম্ভব, কোন বাঘ বা লেপার্ড শিকার করা হরিণ মুখে করে রাস্তা পেরোবার জন্য উপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমেছে, এবং যথেষ্ট দক্ষতা নিয়ে লাফ দিলেও দশ ফুট উঁচু থেকে পতন-জনিত ঝাঁকুনিতে হরিণের মাথার শিঙ মাটিতে ঠুকে গিয়ে ঐ রকম দাগ কেটেছে। তাছাড়া কঠিন মাটির বুকে নরম থাবাওয়ালা বাঘ বা লেপার্ডের পায়ের দাগ নাও পড়তে পারে।

কথাটা মনে হতেই করবেটের কৌতূহলী মন চঞ্চল হয়ে উঠলো, এবং সত্যতা নির্ধারণের জন্য তিনি বাঁদিকে নেমে গিয়ে রক্তের চিহ্ন ও একটি বাঘের পায়ের দাগ আবিষ্কার করলেন। আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে লতাপাতায় ঢাকা হরিণটার অর্ধভুক্ত দেহটারও হদিস পাওয়া গেল। রাস্তার মাটির গায়ে গ্রথিত একটা সামান্য কাটা দাগ থেকে উদ্ভূত করবেটের মনের এই কৌতূহল তাঁর পর্যবেক্ষণ-প্রবণতার গুণে তৃপ্ত হোল।

অন্যমনস্ক ও অসতর্ক পথ চলায় বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু আজীবন অরণ্যপথিক কোন ব্যক্তির পক্ষে শক্তি-শালী অবচেতন মনের নির্দেশে নিজের অজ্ঞাতেই যে কি করে বিপদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, জিম করবেটের জীবনের একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যে মধ্যে কালাধুঙ্গির প্রতিবেশী গরীব বাসিন্দাদের হরিণের মাংস সংগ্রহ করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল জিম করবেটের। সেই উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যার মুখে তিনি দূরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি হরিণ মেরে লতাপাতায় ভাল করে ঢেকে রেখে গ্রামে ফিরে এলেন এই ভেবে—বইবার লোক নিয়ে এসে পরদিন সকালে হরিণটাকে নিয়ে যাবেন। কারণ তখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

পরদিন পাড়ায় একটা ভোজের ব্যাপার ছিল এবং আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই তার প্রস্তুতি চলছিল। মাংস জোগান দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন করবেট। তিনি যে সেই উদ্দেশ্যেই রাইফেল হাতে শিকারে বেরিয়েছেন পাড়ার লোকরা তা জানতো। গুলির শব্দ কানে যেতেই তারা প্রস্তুত হয়েই রইল হরিণ আনতে যাবে বলে।

করবেট ফিরে এসে বললেন, হরিণ মিলেছে। পরদিন সকালেই আনা যাবে। কিন্তু প্রতিবেশীরা নাছোড়বান্দা। রাতেই হরিণ এনে তারা কেটেকুটে কাজ গুছিয়ে রাখতে চায়। অগত্যা করবেট রাজি হলেন এবং বাসায় এক কাপ চা খেতে বসে ওদের নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। রাত তখন অনেক। পথঘাট অন্ধকার। সুপরিচিত এলাকা বলে ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণ খুঁজে নিয়ে ফিরতে অসুবিধা হোল না।

বাসায় ফিরে পায়ের জুতো খুলতে গিয়ে করবেট দেখেন তাঁর পা দুটো ও জুতো লাল রঙের ধুলোয় মাখামাখি। তাজ্জব ব্যাপার তো। লাল ধুলো? কোত্থেকে এল? যে পথে যাওয়া আসা করলেন, অতি সুপরিচিত সে পথের অন্দিসন্ধি করবেটের নখদর্পণে, এবং পথের কোন্ অংশের কোথা দিয়ে পা চালাতে হবে তা তাঁর মুখস্থ। তাছাড়া পা জোড়াকে সুস্থ রাখবার চেষ্টায় পথের ধুলো কাদার বিষয়ে তিনি বিন্দু-মাত্র উদাসীন নন। তবে? রাতে শোবার আগ পর্যন্ত প্রশ্নটা তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে রইল।

কৌতূহলী মনের অস্বস্তি নিয়ে ভোর রাতে শয্যাত্যাগ করে করবেট বেরিয়ে পড়লেন তাঁর পা-রাঙানো—লাল

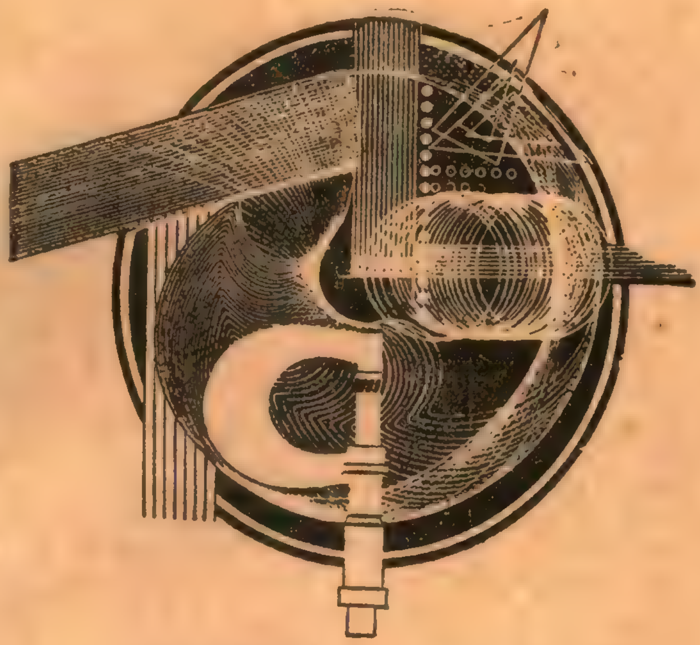

Building up a cadre of technicians

A nation's task force is its technical manpower. Without skilled workers, the finest machines will rust and raw materials will remain unutilised.

Right from the inception thirty years ago, Hindustan Motors realised that it was not enough to put up a modern automobile plant. They knew that they had to build up a balanced cadre of technicians—fitters, welders, electricians, draughtsmen, engineers, foremen, supervisors, researchmen and technologists—not merely to run their own industry but also to provide the manpower required by others.

During the past thirty years, Hindustan Motors have helped to train no less than 1,50,000 men to acquire a high degree of skill and precision. As the industry develops, thousands of others are being trained every year.

Building up a vast pool of technical manpower—this is one of the many ways in which Hindustan Motors keep India's economy moving and growing.

Hindustan Motors Limited
Keeping India's economy moving and growing

CC/HM/I-2/72

ধুলোর উৎস সন্ধানে। সতর্ক পর্যবেক্ষণে সন্তোষজনক সন্ধানই করবেট পেলেন।

তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য এইরকমঃ

ধুলোর ওপর পথ। মানুষে চলাচলের জন্য জঙ্গলের গা ঘেঁসে পায়ে হাঁটা পথ আছে। ট্রাঙ্ক রোড বেশ খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে মোরাদাবাদের দিকে মোড় নিয়েছে। ডাইনে বনের দিকে হচ্ছে পাওয়ালগড় ফায়ার লাইন, যেদিকে হরিণ শিকার হয়েছিল। এদিকে বোর নদীর পুল পেরিয়ে গেলে ডান দিক থেকে কোটা রোড এসে ট্রাঙ্ক রোডে পড়েছে। এখান থেকে সামনে মোরাদাবাদমুখী মোড়ের কিছুটা আগে রাস্তা খুব নীচু এবং অনবরত গরু-মোষের গাড়ী চলাচলে এলাকার লালমাটি গুঁড়িয়ে উপরে উঠে মসৃণ ধুলোয় পরিণত হয়েছে। এই জায়গায় একটি কালভার্টও আছে।

আগের দিন রাতে মৃত হরিণের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বোর ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে ধুলো এড়াবার জন্য করবেট বাঁদিকের হাঁটাপথই ধরেছিলেন। তার আগে হরিণ বয়ে আনবার দলটাও ঐ হাঁটাপথ ধরেই এগিয়েছে। তাদের পায়ের ছাপও আছে। লক্ষ্য করে দেখা গেল, তারা চলে যাবার পর ও করবেট পৌঁছনোর আগে একটা প্রকাণ্ড বাঘ কোটা রোড থেকে বেরিয়ে এসে লোকগুলোর পায়ের দাগ মাড়িয়েই পথ ধরে সামনের দিকে হেঁটে গেছে। করবেট যখন কোটা রোডের মোড়ে পৌঁছেছেন তখন বাঘটা প্রায় তাঁর ত্রিশ গজ আগে ছিল।

রাতের অন্ধকারে চোখ চালিয়ে পর্যবেক্ষণের কিছু নেই। কাজেই করবেট নিঃশব্দে চলার প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে বাঘ পেছনে তাকিয়ে তাঁকে দেখে নিয়েছে। তিনি লোকগুলোকে ধরবার জন্য বেশ জোর পায়েই চলছিলেন। মানুষকে সব জানোয়ারই সমীহ করে। বাঘ ভাবলে ভদ্রলোককে পথ দেওয়া দরকার। সামনে কালভার্টের বাঁদিকে একটু নীচে খোলা মেলা জায়গা আছে। বাঘটা সেখানে নেমে গিয়ে বুক পেট মাটিতে সেঁটে বেশ আয়েস করে বসে রইল করবেটের প্রতীক্ষায়।

দেখা গেল অন্যমনস্ক করবেট কালভার্টের ধারে পৌঁছেই আড়াআড়িভাবে রাস্তার ডানদিকে এসে কালভার্টটি পেরিয়ে আবার রাস্তার বাঁদিকে গেছেন। প্রায় ছয় ইঞ্চি পুরু লাল ধুলোয় ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড দুবার পেরোনোয় তাঁর পা ও জুতো লাল মাটিতে ভরে গিয়েছিল।

বাকীটা [illegible] ছিল না সত্য। সোজা এগিয়ে করবেটকে বাঘের প্রায় এক গজ দূর দিয়েই যেতে হোত। স্বাভাবিক পদক্ষেপে নির্বিকারভাবে এগুলো এতে কোনই বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কোন কারণে ওখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালে, রাইফেল হাত বদল করলে বা হাঁচি কাশির কোন শব্দ করলেই বাঘ সন্ত্রস্ত হোত এবং আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতায় আচমকা আক্রমণ করে বসতে পারতো। অবচেতন মনের কোন প্রবণতায় করবেট সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার জন্যে কালভার্টের ধারে পৌঁছেই অন্যমনস্কভাবে স্থান পরিবর্তন করেছিলেন তা এমনই রহস্যজনক ঘটনা, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

জিম করবেট কৃতী ও যশস্বী শিকারী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সজনা কোন অহমিকা, গোঁড়ামি ও স্বার্থপরতার বিন্দুমাত্র লেশ ছিল না তাঁর প্রকৃতিতে। লর্ড লিনলিথগোর পরিবারের সফল শিকারের জন্য আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় তার প্রমাণ মিলেছে। উত্তর প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিকার প্রোগ্রামে যিনি বরাবর অগ্রণী নায়ক হিসেবে সক্রিয় থেকেছেন, অন্য নিষ্ঠাবান শিকারীর কার্যক্রমে তাঁকেই যে আবার কখন কখনও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসাহী সহযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছে, তার প্রমাণ আরো আছে।

ঝিন্দের রাজপ্রাসাদে আজো একটা বিরাট বাঘের চামড়া টাঙানো আছে যেটি 'জিমস টাইগার' নামে খ্যাত।

সমসাময়িক কালে ঝিন্দের মহারাজা একজন নিষ্ঠাবান সৎ শিকারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। করবেটের সঙ্গে তাঁর মধুর সৌহার্দ্য ছিল। তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

মহারাজা যখন মোহনে ক্যাম্প করেছিলেন তখন একদিন সে অঞ্চলে একটি বিরাট বুড়ো বাঘ শিকারের প্রোগ্রামে জিম করবেটকে তিনি সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। করবেট জানতেন, মহারাজা বিগত তিন বছর ধরে পাঁচ-পাঁচবার এই বাঘটাকে শিকার করবার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। করবেট ধন্যবাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সবিনয়ে জানালেন যে, তিনি প্রোগ্রামে নিছক দর্শক হিসেবেই উপস্থিত থাকতে চান।

প্রস্তাবিত শিকার ক্ষেত্রটি ছিল একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী উপত্যকা। মহারাজা সপরিবারে শিকারে গেলেন। তিনটি মঞ্চ তৈরী হয়েছিল। প্রথমটিতে করবেট বসলেন দুই রাজকন্যার সঙ্গে। দ্বিতীয়টিতে মহারাণী ও তাঁদের এক বালিকা বধূ। তৃতীয়টিতে মহারাজা স্বয়ং ও তাঁর একজন বন্দুকবাহক। দুর্ভাগ্যবশত মহারাজা ছিলেন সম্পূর্ণই বধির। ফলে শিকারে সবসময় পাশে একজন সঙ্গী রাখতেন তিনি, যে ব্যক্তি জঙ্গলে কোন সাড়াশব্দ পেলেই ইসারায় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বলা বাহুল্য এ প্রোগ্রামে মহারাজাই মুখ্য ও একমাত্র শিকারী ছিলেন।

প্রায় দুশো লোকের হাততালি ও হৈ-হল্লা দিয়ে জঙ্গল খেদানো সুরু হোল। বিভিন্ন জাতীয় পশুপাখী জঙ্গল ছেড়ে পালালো। কিন্তু বাঘ বেরুলো না। করবেট সবক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিটারদের অগ্রগতি ও জঙ্গলের পরিস্থিতির ওপর লক্ষ্য রাখছিলেন। ত্রুটি কিছু ছিল বলে মনে হোল না। তবুও বাঘ বেরুলো না কেন?

এই জঙ্গলে বাঘ একটা মোষ মেরেছিল এবং সংগৃহীত খবর সত্য হলে মড়ির ধারেই সে বিশ্রাম করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও করবেটের মতে বিটে তার হদিস না পাওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে। হয়ত নিছক একটি বাঘশূন্য জঙ্গলই বিট করা হয়েছিল। অথবা পূর্ব থেকেই সাড়া পেয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাঘ শিকার পার্টি ঘাঁটি নেবার আগেই সটকে পড়েছিল।

করবেটের অনুমানে দ্বিতীয় কারণটার সম্ভাবনাই বেশী। তাঁর এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, তাঁরা যখন জঙ্গলের পেছনে এসে মোটর থেকে নামছিলেন, তখন মাচানগুলির পেছনের পাহাড়ের ওপরের দিকে একটি কাকর হরিণের সাবধানী ডাক শোনা গিয়েছিল। তাছাড়া বিটে তাড়া খেয়ে বাঘ চলতে সুরু করলে সেই জঙ্গলের অন্যান্য পশুপাখীরা স্বভাবতই শঙ্কাসূচক সাড়া দেয়। আলোচ্য বিটে তা শোনা যায়নি। এ থেকেই উপরোক্ত অনুমান দৃঢ়তর হয় যে, শিকার পার্টি জঙ্গলে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বেই বাঘ মাচানকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গল ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

সন্দেহটা মনে হতেই করবেট মাচানে বসেই চারিদিকটা লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন—মাচানের পেছন দিকের পাহাড়ের মাথায় যেখানে কাকর হরিণের ডাক শোনা গিয়েছিল সেখান থেকে একটা ধস নেমে নীচের দিক পাহাড়তলী পর্যন্ত গেছে। পাহাড়তলীটি জঙ্গলাকীর্ণ যে উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত, তার পাশেই একটি সরু নালা আছে, এবং উপত্যকাটা আধ মাইলের মধ্যেই দুই মাথায় পঞ্চাশ গজ ও মাঝখানটায় তিন চারশো গজ চওড়া। এই জঙ্গলেই বাঘে মোষ মেরেছিল।

করবেট সন্দেহ করলেন, নীচের জঙ্গল থেকে আরম্ভ করে ধসের গা ঘেঁসে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত হয়ত একটা গেমট্র্যাক থাকতে পারে যে পথে বাঘ পালিয়েছিল, এবং উপরে পৌঁছে কাকর হরিণকে সন্ত্রস্ত করেছিল। তাছাড়া মাচানগুলোর অবস্থান এমন ছিল, বাঘের অজান্তে সেখানে পৌঁছনো মুস্কিল। যাই হোক, বিট শেষ হলে পর যেটুকু সময় পাওয়া গেল তার মধ্যেই পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক বিশ্লেষণ করে করবেট নিজস্ব একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। কিন্তু কারো কাছে কোন মন্তব্য করলেন না। ব্যর্থ মনোরথে সবাই আস্তানায় ফিরে গেলেন।

সেইদিন রাতে ডিনার টেবিলে বসে সবাই দিনের প্রোগ্রামের ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে দেখছিলেন। করবেট নীরবে সব শুনছিলেন। তিন বছর ধরে বার বার এই বাঘটার পেছনে মহারাজার আশাভঙ্গের কথা ভেবে করবেটের খুব দুঃখ হচ্ছিল। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল—বাঘ যদি সেই রাতে ঐ মড়িতে আবার ফিরে আসে তবে পরদিন সকালে সামান্য চেষ্টাতেই বাঘটাকে শিকার করিয়ে দেওয়া যায়।

তাই শেষ পর্যন্ত তিনি মহারাজার কাছে নিবেদন করলেন—তিনি যদি সম্মত থাকেন, পরদিন সকালে ঐ জঙ্গলেই একটি একক বিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে মহারাজা থাকবেন একক শিকারী এবং করবেট নিজেই হবেন একক বিটার।

করবেটের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর মহারাজার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তাই উপস্থিত পাত্রমিত্রদের বিস্ময়ব্যাকুল মুখ-চাওয়াচাওয়ির মধ্যে মহারাজা করবেটের প্রস্তাবেই সম্মতি দিলেন।

পরদিন ভোর পাঁচটায় মহারাজা ও তাঁর দুজন বন্দুকবাহককে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব ব্যবস্থামত মাইল তিনেক মোটরে ও পরবর্তী পথ হাতীর পিঠে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় যেখান থেকে ধস নেমেছিল সেখানে পৌঁছে গেলেন। করবেট দেখে উৎফুল্ল হলেন যে, এখান থেকেই একটি পরিষ্কার গেমট্র্যাক সোজা নীচের জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে।

সঙ্গে একটি ছোট ও হালকা ধরনের তৈরী মঞ্চ আনা হয়েছিল। সেটিকে সেখানেই একটি গাছে বেঁধে করবেট মহারাজা ও একজন বন্দুকবাহককে তাতে বসিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বন্দুকবাহককে বেশ খানিকটা দূরে সরে যেতে বললেন। তারপর খুব সন্তর্পণে নিজে খালি হাতে নিরস্ত্র অবস্থায় পূর্বদিনের মাচানগুলোর পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

যে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাঘ শুয়ে থাকতে পারে বলে মনে হয়েছিল, প্রায় দুশো গজ দূরে থেকে সেটাকে বেড় দিয়ে নীচু স্বরে আপন মনে কথা বলার অভিনয় করতে করতে করবেট এগিয়ে গেলেন এবং মরা মোষটাকে বাঘ যেখানে টেনে এনে রেখেছিল তা থেকে কিছুটা দূরে একটা পোড়ো শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর এসে বসলেন। একটি সিগরেট ধরিয়ে তিনি কিছু সময় অপেক্ষা করলেন বাঘ চলাচলজনিত জঙ্গলের সাড়া শুনবার জন্য।

চারিদিক শান্ত মনে হোল। কয়েকবার কৃত্রিম গলা খাঁকারি দিয়ে এবং মরা গাছের কাণ্ডটার ওপর গোড়ালি ঠুকে করবেট এগিয়ে গেলেন বাঘ মড়িতে ফিরেছিল কিনা দেখতে।

তিনি খুবই উৎফুল্ল হলেন দেখে [illegible] ফিরেছে তাই নয়, মড়িটাকে আরো ঠাসা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে, এবং একটু আগেই তা থেকে মাংস খেয়েছে। এমন কি বাঘটা যেখানে শুয়েছিল সেখানটা তখনও গরম। তার মানে এখুনি সে সেখান থেকে উঠে গেছে।

করবেট ছুটে ফিরে এলেন গাছটার ধারে এবং একটা পাথর ঠুকে শব্দ করতে ও উঁচু গলায় চেঁচাতে সুরু করলেন যাতে মহারাজার সঙ্গী লোকটা বাঘ এগুচ্ছে বুঝে শ্রবণশক্তিহীন মহারাজাকে সতর্ক করতে পারে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই উপরের দিক থেকে একটা রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল। যথাস্থানে পৌঁছে করবেট দেখলেন মহারাজা গেমট্র্যাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আজকের সফল শিকার একটি চমৎকার বাঘের দিকে তাকিয়ে।

করবেটের এই মূল্যবান সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ঝিন্দের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে টাঙানো সেই বাঘের চামড়াটির গায়ে লেখা ছিল 'জিমস টাইগার'।

জিম করবেটের ঘটনাবহুল জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সমগ্র তথ্যাদি পরিবেশন

'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা ॥'

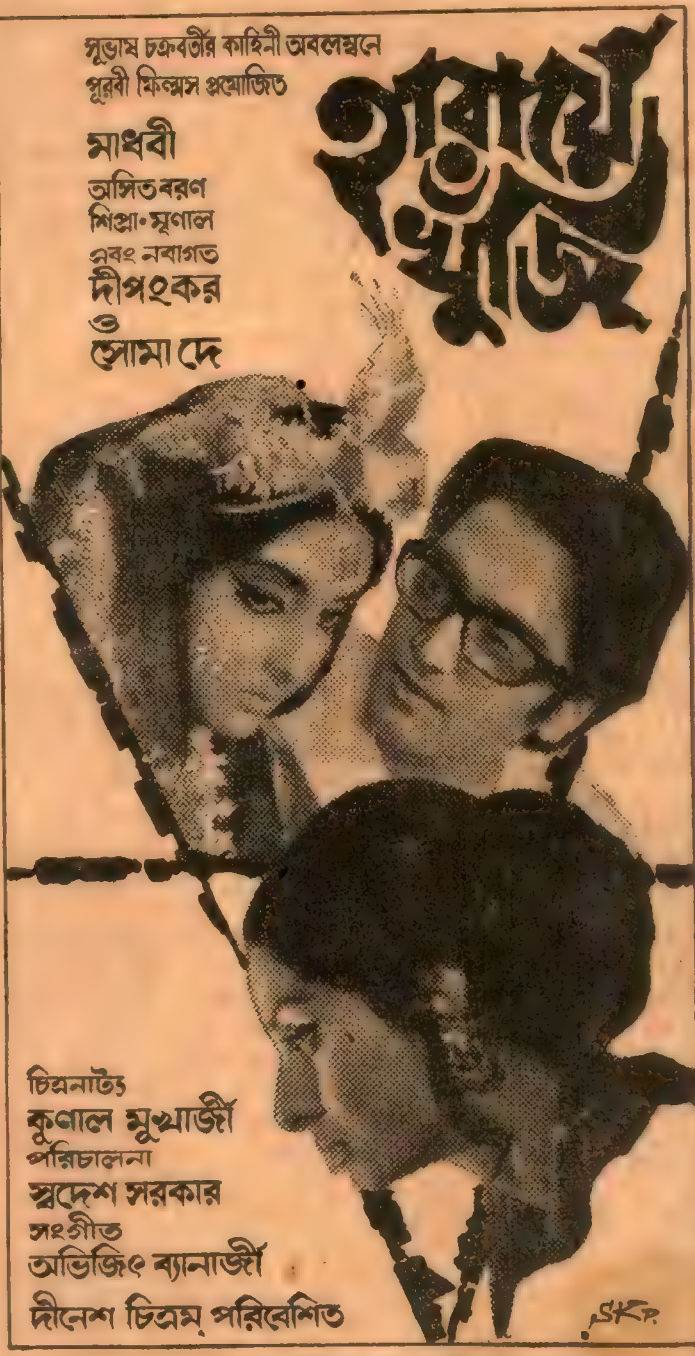

।। মুক্তি আসন্ন ।।

একটি মাত্র স্বল্প পরিসর রচনার মাধ্যমে পাঠকমহলের সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা থেকে আমি বিরত থাকছি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তিনি যেটুকু আত্মকাহিনী কালজয়ের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রকাশ করে গিয়েছেন তা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করলে এমন বহু মূল্যবান শিক্ষণীয় টেকনিক্যাল বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে, যা কিনা নীতিজ্ঞানসম্পন্ন শিকারী তথা উৎসাহী বন ও বন্যপ্রাণী গবেষকদের উপকারে আসবে এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বা তথ্য সংগ্রহের কাজেও লাগবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য--

করবেট নির্দেশিত পদ্ধতির মাধ্যমে যে জন্তুর পদচিহ্ন পর্যালোচনা করে সেই পথে পদচারণাকারী বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের শ্রেণী বিভাগ, প্রকৃত সংখ্যা, সাইজ, বয়স ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়। এমন কি বাঘ লেপার্ড প্রভৃতি থাবাযুক্ত জানোয়ার মাদী না মদ্দা, তাদের চলাচলের গতি ধীর না দ্রুত, অনুসন্ধানরত না অনুসরণরত, অথবা পদক্ষেপ স্বাভাবিক না উত্তেজনাগ্রস্ত; সাপের ক্ষেত্রে ধুলোবালি বা ঘাসের ওপর তাদের চলাচলের দাগ পরীক্ষা করে বিষাক্ত না নির্বিষ, কোন্ দিকে গিয়েছে এবং আকারে কত বড় ইত্যাদি বহু তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

জংলী কোন্ লতাপাতা ঔষধি এবং দুর্ভিক্ষে খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং চা কফির বিকল্প পানীয়রূপে ব্যবহারযোগ্য, কোন্ লতা ও গাছের ছালে শক্ত দড়ি তৈরী করা যায়, কি করে দেশলাই ছাড়াই আগুন জ্বালানো যায়, ভিজে জঙ্গলে কি উপায়ে শুকনো জ্বালানি সংগ্রহ সম্ভব, এবং সর্বোপরি গভীর ও বিপজ্জনক জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মিলেমিশে সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করা যায়, সে সংক্রান্ত অসংখ্য মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশাবলি জিম করবেট তাঁর রচনায় রেখে গিয়েছেন।

কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ-শিকারী হিসেবেই করবেট অধিক স্মরণীয় একথা তর্কাতীতভাবে সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিসেবে তাঁর চারিত্রিক আন্তর্জাতিক গুণাবলীর গুরুত্ব না দিলে সামগ্রিকভাবে তাঁর মানবিক অবদানের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জিম করবেটের জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনায় 'ব্যালান্স অব নেচার' এবং 'নেচারস ল' কথার বাস্তব তাৎপর্য কৌতূহলী অরণ্যপ্রিয় মহলে দৃঢ়তর হয়েছে।

হিংস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত অরণ্য অঞ্চলবাসীদের কাছে ভীতির কারণ। কিন্তু একথা অনেকেই ভেবে দেখেন না যে শহরে বা লোকালয়ে যত দুর্ঘটনা ঘটে তার এক ক্ষুদ্রাংশও বনাঞ্চলে ঘটে না। কিন্তু একথাও সত্য যে মনুষ্যেতর জীবজগতে প্রাণঘাতী রক্তাক্ত ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে, যা কিনা প্রধানত জীবনধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনভিত্তিক তথা খাদ্য-খাদক সম্পর্কজনিত।

মাংসাশী বলশালী প্রাণীরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ক্ষীণজীবী বন্যপ্রাণীর মাংসের ওপর নির্ভরশীল। যেমন বাঘ হরিণ খায়। হরিণ খাওয়াটা তার সখ বা নেশা নয়, বাঁচবার প্রয়োজনে। সেক্ষেত্রে বাঘের মুখ থেকে হরিণকে বাঁচাতে গেলে বাঘও তার বাঁচবার প্রয়োজনে মাংস সংগ্রহে নিশ্চয়ই বিকল্প হত্যার উদ্যোগ নেবে। মাংস ত্যাগ করে নিরামিষাশী হবে না সে কখনও।

তাই বাঘের স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব ঘটলে সে যেমন মানুষ বা গৃহপালিত পশু হত্যায় প্রবৃত্ত হবে, সেই রকম হরিণের বংশ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে বিচরণযোগ্য তৃণভূমির অভাব ঘটবে এবং শস্যক্ষেত্রের উপর হামলা হবে।

তাই বলছিলাম, পশু, পাখী, কীটপতঙ্গ অর্থাৎ সমগ্র প্রাণীজগত জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম-বেশী পারস্পরিক সম্পর্কে সংযুক্ত। এইভাবেই স্বাভাবিক নিয়মে জীবজগতের ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং একেই 'ব্যালান্স অব নেচারের' প্রয়োজনে 'নেচারস ল' বলা যায়।

প্রকৃতির এই নিজস্ব আইন সম্বন্ধে জিম করবেটের একটা বৃহত্তর ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল।

করবেটের উপলব্ধিতে ও অভিমতে মানুষ জীবজগতের বৃহত্তর স্বার্থে প্রকৃতির নিয়মকে বড়জোর সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে; ব্যাহত করতে পারে না। তা উচিতও নয়। তবে মানুষের নিরাপত্তা বা স্বার্থের পরিপন্থী বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। এই মানবিক প্রয়োজনেই তিনি নরখাদক বাঘ শিকারে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যদিও তিনি জানতেন বিশেষ কোন অবস্থার গতিকে পড়েই বাঘ বা লেপার্ড মানুষখেকো হয় এবং হলে পর সমাজের অপরিহার্য বৃহত্তর স্বার্থে তাকে নিধন না করে উপায় থাকে না।

জিম করবেটের স্বয়ং সে কাজে আত্মনিয়োগ করার একমাত্র যুক্তি এই ছিল যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এবং এই আদর্শে তিনি যতটা প্রাণীদরদী ততোধিক মানব-দরদীও ছিলেন।

বাঘ-বিশারদ জিম করবেট বাঘের চালচলন স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য-ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যা কিনা এতদিনকার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি —

বারো বছরের মেয়েকে নিয়ে একটি কৃষক বধূ তাদের বস্তির লাগোয়া ক্ষেতে মড়াই কাটছিল। বেলা তখন দুপুর। হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে একটা বাঘ তেড়ে আসে মেয়েটার দিকে। মেয়েটা ভয়ে মায়ের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু মায়ের কাছে পৌঁছনর আগেই বাঘ থাবার প্রচণ্ড আঘাতে দেহ থেকে মেয়েটার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তার ধড়টা নিয়ে পালিয়ে যায়। মাথাটা ছিটকে এসে পড়ে তার মায়ের পায়ের ধারে।

গ্রামটা নৈনিতালে জিম করবেটের বাড়ীর ধারে এবং এই ধরনের বিপদে জিম করবেটই তাদের একমাত্র ভরসা বলে তারা মনে করতো। কিন্তু করবেট তখন মোকামাঘাটে তাঁর কর্মস্থলে। গ্রামবাসীরা চাঁদা করে তাঁকে আসবার জন্য একটি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠালো।

টেলিগ্রাম পাঠানো ও করবেটের পৌঁছনোর মধ্যে প্রায় এক সপ্তাহ চলে গেল এবং দুর্ভাগ্যবশত তার মধ্যে আরও একটি মেয়ে ঐ বাঘটির হাতে মারা পড়লো। এক্ষেত্রে মেয়েটি কয়েকটি সঙ্গিনীসহ গ্রামের লাগোয়া উপরের পাহাড়ে ঘাস কাটছিল। এমন সময় বাঘ এসে সঙ্গিনীদের সামনেই তাকে মেরে মৃতদেহটি মুখে করে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়।

খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা দল বেঁধে গিয়ে বাঘকে হটিয়ে দিয়ে লাসের দখল নেয়। জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে করবেট নিশ্চয়ই দু-এক দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন, এবং মৃতদেহটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে শয়তানটাকে শিকারে তাঁর সুবিধে হবে মনে করে ওরা মৃতদেহটিকে যেখানে পেয়েছিল কম্বলে জড়িয়ে সেখানকারই একটি গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রাখলো শিকারী-সাহেবের অপেক্ষায়।

মৃতা মেয়েটির স্বামী করবেটের বাড়িতে এলো করবেটের বোনকে এই দুর্ঘটনার খবর দিতে। করবেটের বোন

অনুমান করেছিলেন যে তিনি অল্পকালের মধ্যে পেঁৗছে যাবেন। তাই আগে থেকে ঐ গাছে একটা মাচান বেঁধে রাখবার জন্য তার লোকদের নির্দেশ দিলেন। মাচান বাঁধার জন্য করবেটের লোকেরা পরদিন ভোরে গ্রামবাসীদের নিয়ে ঘটনা-স্থলে গিয়ে অবাক হয়ে দেখে ইতিমধ্যে বাঘ সেই গাছে উঠে কম্বল ছিঁড়ে লাসটা পেড়ে নিয়ে পালিয়েছে। আবার তারা দল বেঁধে প্রায় আধ মাইল গিয়ে অর্ধভুক্ত লাসটা উদ্ধার করে তার ওপরে আর একটি মাচান তৈরী করে রাখলো। অবশ্য করবেট পেঁৗছনোর আগেই অন্য একজন দুর্বলচিত্ত নির্বোধ সখের শিকারী গ্রামবাসীদের বড় কথায় পটিয়ে রাত্রিকালে হেরিকেন নিয়ে বাঘ শিকারে বসে শুধু যে সব ব্যবস্থাই ভণ্ডুল করে দিলে তাই নয়, হেরিকেনের আগুনে গোটা স্থানীয় জঙ্গলটাতেই আগুন ধরিয়ে ফেললে। যাক—সেটা অন্য ঘটনা।

করবেট নৈনীতালে পেঁৗছে সব বৃত্তান্ত শুনলেন, এবং অবিলম্বে জঙ্গলে গিয়ে প্রথম গাছটি পরীক্ষা করে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সত্যিই বাঘটা মাটি থেকে প্রায় পাঁচিশ ফুট উঁচু মগ-ডালে উঠে মৃতদেহটি নামিয়ে নিয়ে গেছে। গাছের ছালে অসংখ্য নখের আঁচড় এবং নীচের মাটি ও ঝোপঝাড়ের দলাইমলাই অবস্থা দেখে বোঝা গেল একরোখা বাঘটা গাছে উঠতে সক্ষম হওয়ার আগে অন্তত বিশবার চেষ্টা করেছে এবং হাঁচড় পাঁচড় করে কিছুদূর উঠে গিয়ে প্রতিবারই হড়কে এসে মাটিতে পড়েছে। বাঘের ক্ষেত্রে অত উঁচুতে ওঠার ব্যাপারটা একটা বিশেষ ধরনের ঘটনা বলে করবেটের কাছে মনে হয়েছিল। লাসটার হদিস পাবার কারণ হচ্ছে বাঘটা নিশ্চয়ই আড়ালে বসে গাছে লাস ঝোলা-বার কাজটা দেখেছিল; নইলে ঘ্রাণশক্তির অভাবে সে লাস খুঁজে পেত না।

বন্যজন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলে শিকার কার্যকলাপের তত্ত্বতালাশীতে সব চাইতে বিশ্বস্ত ও করিৎকর্মা সহযোগী হচ্ছে পোষা ও শিক্ষিত কুকুর। রবিন যখন প্রথম করবেটের কাছে এসেছিল তখন সে বেশ ছোট ও বন-পরিক্রমায় একেবারেই আনাড়ি। তাকে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে করবেটকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। কারণ নৈনিতালের সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চল তো নিছক নিরামিষাশী জন্তু-জানোয়ারদের বিচরণক্ষেত্র ছিল না। তাই হিংস্রদের খপ্পর থেকে দূরে রেখে রবিনকে জঙ্গলের হালচাল চিনিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার পর সে বেশ ওস্তাদ খেলোয়াড় হয়েই উঠেছিল। অবশ্য কুকুরদের অতি প্রবল ঘ্রাণশক্তি দক্ষতা অর্জনের পক্ষে খুবই সহায়ক।

প্রকৃতপক্ষে পোষা কুকুরদের নিজে-দের যতটা মুরোদ সাধারণত প্রভুভক্তির আতিশয্যে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ও সাহসের ভড়ং দেখাবার চেষ্টা করে তারা— যা কিনা কখন কখন তাদের মৃত্যুরও কারণ হয়। নৈনীতালের মত জঙ্গলে রবিনের ক্ষেত্রে সে ভয়টা আরও বেশী ছিল। তাৎক্ষণাৎ বিপদ না ঘটলেও একদিন এক আক্রমণমুখী লেপার্ডের সামনে পড়ে ক্ষুদ্রদেহী রবিনকে ন্যাজ গুটিয়ে পলাতেও হয়েছিল। সেদিন সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল সব জানোয়ার-দের সামনে তার বেশী ফুটানি দেখাতে যাওয়া উচিত নয়। তার প্রভু করবেটের কাছে সে এমন হাবভাব প্রকাশ করেছিল সেদিন যেন লেপার্ডের সামনে থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার জন্য সে খুবই লজ্জিত। আক্রমণমুখী বিদ্যুৎগতি লেপার্ডের সামনে অনেক ধুরন্ধর শিকারীই কখন কখন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েন—সে তুলনায় ক্ষুদ্রদেহী কুকুর তো কোন ছার।

অন্যান্য বহু গুণের জন্য রবিন করবেটের খুবই প্রিয় ছিল। তাই তার মৃত্যুর পর করবেট তাঁর বিখ্যাত 'ম্যান-ইটারস অব কুমায়ুন' শীর্ষক পুস্তকে রবিনের স্মরণে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করে গিয়েছেন।

ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন রুচির ছবি—

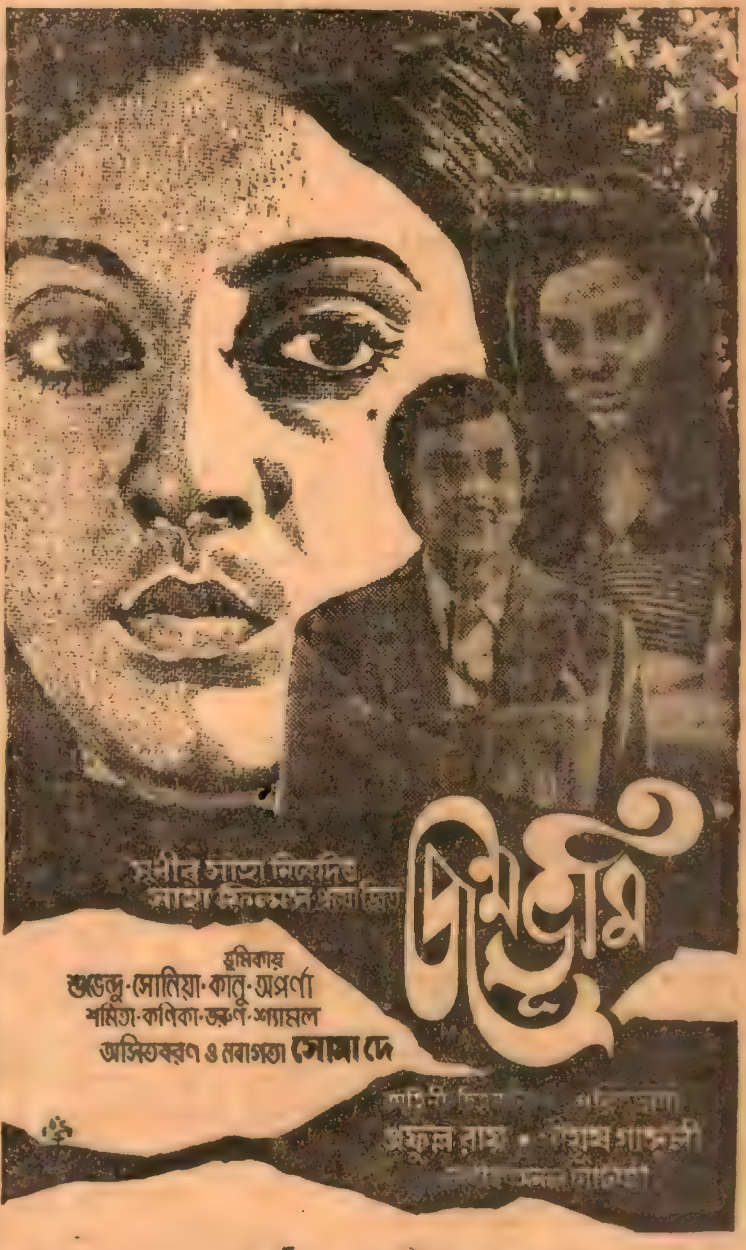

॥ মুক্তি প্রতীক্ষায় ॥

খেলাধূলায় ছোট ও বড়দের ভূমিকা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কয়েকটি উন্নত-দেশের কম বয়সের ছেলে-মেয়েরা আজ বড়দের আন্তর্জাতিক আসরেও ব্যাপক-হারে পদক জয় করে চলেছে। তবে তাদের এই ব্যাপক সাফল্য বর্তমানে বড়দের আন্তর্জাতিক জিমন্যাষ্টিকস এবং সাঁতারের আসরেই সীমাবদ্ধ। বড়দের সাঁতারের আসরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার যে হিড়িক লাগিয়ে দিয়েছেন তা আন্তর্জাতিক খেলাধূলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির।

বড়দের আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স বক্সিং, কুস্তি, রোয়িং, ভারোত্তোলন ফেন্সিং, সাইক্লিং প্রভৃতি খেলায় বড়দেরই আধিপত্য এখনও অক্ষুন্ন আছে এই কারণে যে, এইসব খেলায় যে পরিমাণ দৈহিক শক্তি-সামর্থ, অনুশীলন দক্ষতা, ধৈর্য ইচ্ছাশক্তি, আত্মপ্রত্যয় প্রয়োজন তা পরিণত বয়স ভিন্ন আয়ত্ব করা সম্ভব নয়।

১৯৬০ সালে অলিম্পিকে লাইট-হেভীওয়েট বিভাগে আমেরিকার সতেরো বছরের নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে-র স্বর্ণপদক জয় এবং ১৯৫৬ সালে উপর্যুপরি তিনবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার ইভানভের ১৮ বছর বয়সে রোয়িংয়ের সিঙ্গল স্কালসে প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয় নিশ্চয়ই বিরল ঘটনা।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের টেক্কা দিয়ে আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করছেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত —অলিম্পিক গেমসের আসরে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার বিরাট সাফল্য।

অলিম্পিক গেমসে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে এবং এই সময় থেকে আজও অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয় এবং পয়েন্ট সংগ্রহের বে-সরকারী তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানটি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা—এই দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অলিম্পিক গেমসের বিগত ছটি আসরে (১৯৫২—৭২) সোভিয়েত ইউনিয়নের এককভাবে প্রথম স্থান ৪বার এবং আমেরিকার এককভাবে প্রথম স্থান মাত্র একবার। সমান পয়েন্টের ফলে এই দুই দেশ যুগ্মভাবে প্রথম স্থান পেয়েছিল একবার (১৯৫২ সালে)। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে একবার এবং আমেরিকা চারবার।

অলিম্পিক গেমসের আসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিরাট সাফল্যের মূলে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান যে কি বিরাট তা ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসে প্রথম স্থান অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের সমীক্ষাই যথেষ্ট হবে। ১৯৭২ সালের রাশিয়ান অলিম্পিক দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে শতকরা আশিজন ছিলেন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার মোট পদক সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৯টি (স্বর্ণ ৫০, রৌপ্য ২৭ ও ব্রোঞ্জ ২২)। রাশিয়ার এই মোট ৯৯টি পদকের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরাই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন মোট ৬৭টি পদক (স্বর্ণ ৩৮, রৌপ্য ১৬ ও ব্রোঞ্জ ১৩)। রাশিয়ার মোট ৫০টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত স্বর্ণপদক ছিল ৩৮টি। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা অর্ধেকেরও বেশী পদক সংগ্রহ করে স্বদেশকে পদকজয়ের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থানে তুলে দিয়েছিলেন।

অলিম্পিক গেমসে ছাত্রছাত্রীদের হাত দিয়ে রাশিয়ার পদক জয়ের অন্যতম উৎস জিমন্যাষ্টিকস। অলিম্পিক জিমন্যাস্টিকসে রাশিয়া ১৯৫২ সাল থেকে উপর্যুপরি ছয়বার মেয়েদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে রেকর্ড করেছে। ১৯৭০ সালের ব্যক্তিগত বিভাগের বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়ান কুমারী লুডমিলা তুরিসশ্চেভা গত ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের জিমন্যাস্টিকসে মেয়েদের ব্যক্তিগত খেতাব জয়ের সূত্রে রাশিয়াকে মেয়েদের বিভাগে দলগত এবং ব্যক্তিগত খেতাব জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করেন।

অলিম্পিক গেমসের আসরে আমেরিকার বিরাট সাফল্যের আজ প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের তরুণ সাঁতারু দল। গত তিনটি (১৯৬৪, ১৯৬৮ ও ১৯৭২) অলিম্পিক গেমসের সাঁতারে আমেরিকার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের এক অসাধারণ নজির গড়েছেন। অলিম্পিক

মার্ক স্পিজ এবং শেন গোল্ড : ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে মার্ক স্পিজ (আমেরিক) ৭টি স্বর্ণ পদক এবং কুমারী শেন গোল্ড (অষ্ট্রেলিয়া) ৩টি স্বর্ণ পদক জয় করেন।

গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা ১৯৬৪ সালে ২য় স্থান, ১৯৬৮ সালে ১ম স্থান এবং ১৯৭২ সালে ২য় স্থান পেয়েছিল। এই তিনবারের অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার পদক জয়ের সংখ্যা ছিল এই রকম : ১৯৬৪ সালে মোট পদক ৯০ (স্বর্ণ ৩৬, রৌপ্য ২৬ ও ব্রোঞ্জ ২৮), ১৯৬৮ সালের মোট পদক ১০৭ (স্বর্ণ ৪৫, রৌপ্য ২৮ ও ব্রোঞ্জ ৩৪) এবং ১৯৭২ সালে মোট পদক ৯৩ (স্বর্ণ ৩৩, রৌপ্য ৩১ ও ব্রোঞ্জ ২৯)। এই তিনবারের অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার তরুণ সাঁতারু দল (পুরুষ ও মহিলা) কি পরিমাণ পদক সংগ্রহ করে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন তার হিসাব : ১৯৬৪ সালে মোট পদক ৩৭ (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১০ ও ব্রোঞ্জ ১১), ১৯৬৮ সালে মোট পদক ৫৮ (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ২০) এবং ১৯৭২ সালে মোট পদক ৪৫ (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ১২)। আমেরিকার তরুণ অলিম্পিক সাঁতারু দলের এই বিরাট অবদান আমেরিকার জাতীয় খেলাধুলার ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এখানে আরও উল্লেখ্য: গত তিনবারের অলিম্পিক গেমসের সাঁতার প্রতিযোগিতায় (সুইমিং এবং ডাইভিং) আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণপদক এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ের সূত্রে শুধু শীর্ষস্থানই পায় নি সেইসঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গেচুরে সারা পৃথিবীর লোককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে আমেরিকার খোকা-খুকীরা আজ রীতিমত বড়দের কাছে জুজু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার মেয়ে সাঁতারুদের গড় বয়স ছিল সাড়ে ষোল বছর। এই দলে ১৪ বছর বয়সের বালিকা সাঁতারু ছিল তিনজন। আমেরিকার শ্যারণ স্টাউডার (বয়স ১৫ বছর) মেয়েদের সাঁতারে সর্বাধিক পদক (স্বর্ণ ৩ ও রৌপ্য ১) জয় করেন।

তিনি ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড করেন (সময় ১ মিনিট ০৪·৭ সেকেন্ড) এবং ১০০ মিটার সাঁতারে স্বর্ণপদক বিজয়িনী প্রখ্যাতা ডন ফ্রেজারের মতই এক মিনিটের বেড়া ভেঙ্গেছিলেন। অপরদিকে এই আসরেই আমেরিকার আঠারো বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ডন স্কোল্যান্ডার ৪টি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে একই অলিম্পিক আসরে মেয়ে ও পুরুষ সাঁতারুদের পক্ষে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন। টোকিও অলিম্পিকের সাঁতার আসর আমেরিকার খোকা-খুকীদের পদক জয়ে এবং অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গার দাপটে

লেসলী বুশ (আমেরিকা)
১৭ বছরের হাই স্কুল-ছাত্রী আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাঁর ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হাই-ডাইভিংয়ের স্বর্ণ পদকটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

যখন সরগরম তখন বড়দের মুখ রাখলেন অস্ট্রেলিয়ার ২৭ বছরের বর্ষীয়সী মহিলা সাঁতারু ডন ফ্রেজার। কুমারী ফ্রেজার ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করলেন। এখানে উল্লেখ্য, অলিম্পিক সাঁতারের কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ের নজির ফ্রেজারের ছাড়া অপর কোন পুরুষ বা মেয়ে সাঁতারুর নেই। এইখানেই শেষ নয়। তিনি এই আসরেই ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে মেয়েদের পক্ষে সর্বপ্রথম এক মিনিটের বেড়া ভাঙ্গলেন এবং দুবার এক মিনিটের কম সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করে (সেমি-ফাইনালে ৫৯·৯ সেঃ এবং ফাইনালে ৫৯·৫ সেঃ) নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয় করেন।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা মোট ১০৭টি পদক জয়ের সূত্রে যে প্রথম স্থান পেয়েছিল তার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব সাঁতার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের। তাঁরা অর্থাৎ সাঁতারুরা আমেরিকার মোট পদকের (১০৭টি) মধ্যে ৫৮টি পদক সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এই আসরেই আমেরিকার মোট ৪৫টি স্বর্ণপদকের মধ্যে সাঁতারেরই ছিল ২৩টি স্বর্ণপদক অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে আমেরিকার ষোল বছরের স্কুল-ছাত্রী ডেবি মেয়ার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে তিনটি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক সাঁতারের ইতিহাসে একই বছরে মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন।

১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের সাঁতারেও আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আমেরিকার মোট ৯৩টি পদকের মধ্যে সাঁতারুরা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন মোট ৪৫টি পদক এবং আমেরিকার মোট ৩৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে সাঁতারের ছিল ১৮টি। মিউনিখ অলিম্পিকের সাঁতার আসরে বিরাট সাফল্যের সূত্রে আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা সারা পৃথিবী তোলপাড় করে তুলেছিলেন। মেয়ে ও পুরুষদের সাঁতারে যেখানে মোট পদক সংখ্যা ছিল ৮৭টি, সেখানে আমেরিকা একাই ৪৫টি পদক সংগ্রহ করেছিল (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ১২)। এই দুই বিভাগের ২৯টি স্বর্ণপদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছিল ১৮টি স্বর্ণপদক অর্থাৎ মোট স্বর্ণপদকের অর্ধেকেরও অনেক বেশী। পুরুষদের সাঁতারে প্রতিষ্ঠিত ১২টি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে আমেরিকার ছিল ৯টি এবং মেয়েদের ১১টি বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে আমেরিকার ৭টি। বিরাট ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন আমেরিকার ২২ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মার্ক স্পিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী শেন গোল্ড।

মার্ক স্পিজ সাঁতারের সাতটি স্বর্ণপদক (ব্যক্তিগত বিভাগে ৪ ও রিলেতে ৩) জয়ের সূত্রে অলিম্পিক সাঁতারের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। তাঁর আগে অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে কোন পুরুষ বা মেয়ের পক্ষে কোন একটা খেলা থেকে সাতটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মার্ক স্পিজ সাঁতারের চারটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের ফাইনালে নতুন অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী শেন গোল্ড ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের মোট ছয়টি পদক পেয়েছিলেন (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)। মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে যোগদানের আগে অস্ট্রেলিয়ার এই 'গোল্ডেন গার্ল' কুমারী শেন গোল্ড মাত্র নয় মাসের মধ্যে ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার এবং হাজার মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীর লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে এই খুদে মেয়েটির এই কাণ্ডকারখানা রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার —এক অভূতপূর্ব নজির।

জটিল জলস্রোত

উপন্যাস

সমীর রক্ষিত

এখানে নদী প্রবল হয়ে ওঠে, তিস্তায় পাহাড়ী ঢল নামলে গেরুয়া ঘোলাজলের শীতল স্রোত এ-নদীতেও ঢুকে পড়ে। বন্যাও হয় কোন কোন বছর। তখন এই শান্ত নিস্তরঙ্গ নদী উন্মাদ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, চেনাই যায় না।

ডানদিকে কাঠলগুড়ি চাবাগানের ম্যানেজারের হলুদ পোড়ো বাড়ি। এরপরেই ক্রমে ডানদিকে ধোপাদের ঘাট এগিয়ে আসে। বকের মত সাদা ডানার অসংখ্য কাপড় জামা উড়ছে টাঙানো দড়িতে। সে ওড়াওড়ির ভেতর দিয়ে ধাঙড়দের নোংরা বস্তী দেখা যায়। সে বস্তী দ্রুত পেরিয়ে গেলে নদী সামান্য সরু হয়ে আসে বাজারের কংক্রীটের ব্রিজের কাছে। ডানদিকেই বাজারের বাঁধানো ঘাট।

ঘাটের পাশেই সন্তৃপ্ত হোটেল। বিভু লক্ষ্য করে হোটেলের সামনে ছোটখাট একটা ভীড় জমেছে এবং প্রচণ্ড হৈ-হল্লা হচ্ছে। সহসা তার পল্টুর কথা মনে পড়ে যায়। বুক কেঁপে ওঠে। ফুলের বুড়ি নৌকোয় রেখে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে পড়ে। এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ভীড়ের দিকে এগোতে থাকে।

দূরে থেকেই চোখে পড়ে পুলকদাকে চার পাঁচজন লোক পেছন থেকে জাপটে ধরে আছে। পুলকদা উত্তেজিত-চীৎকার করছে। ছুটে যেতে চেষ্টা করছে প্রবলভাবে। তার গৌরবর্ণ সুন্দর মুখটা রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দুচোখ হিংস্র। সমস্ত শরীরটা সার্কাসের বন্দী বাঘের মত। শরীরের দৃশ্যমান পেশীগুলো চকচকে।

বিভু ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে যায় ত্রস্তভাবে, সামনের একজনের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে—'আচ্ছা, পল্টু আছে এখানে?'

'পল্টু? কে পল্টু?'—লোকটা বিরক্ত গলায় বলে ওঠে—'পল্টু ফল্টু এখানে কোথায়?'

বিভু বলে—'কী হয়েছে বলুন তো?'

লোকটা নিবিষ্ট চোখে পুলককে দেখছিল—মুখ না ঘুরিয়েই বলে—'জানেন না? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, কত কাণ্ড হয়ে গেল!' লোকটা ফিকফিক করে হাসে।

'কী কাণ্ড!'—বিভু ঝোঁকের মাথায় বলে যায়।

লোকটা এবারে আস্তে কথা বলার ইঙ্গিত করে, তারপর মাথা সামান্য নীচু করে ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে বলে—'হারকুলিস পানের দোকানদারটাকে মেরেছে।' হারকুলিস মানে হারকিউলিস—অর্থাৎ পুলক। ব্যায়াম করে শরীর তৈরী করেছে পুলক আর প্রতিযোগিতা করে পেয়েছে হারকিউলিস খেতাব।

এতক্ষণে বিভুর আতঙ্কিত দৃষ্টি ঘুরে যায়। একটু দূরেই মেড়োর পান-সিগারেটের দোকানী পানুকে নিয়ে কয়েকজন রিকসায় ওঠাচ্ছে। / তার মুখে হাতে রক্ত লেগে আছে; ঠোঁট ফেটে গেছে সম্ভবতঃ, সে দুহাতে মুখ চেপে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিভুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে ওঠে, একটা বোবা যন্ত্রণা অসংখ্য জ্বলন্ত বুদবুদের মত তার শরীরে ক্রমাগত ফুলে উঠে ফেটে যেতে থাকে, তার মাথার ভেতরটা হাল্কা-শূন্য হয়ে যায়। রক্ত দেখলে বিভু এরকম উদভ্রান্ত হয়ে যায়।

অথচ পানুর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে বিভুর, গিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—কীরে পানু, কী হয়েছে তোর? কী করেছিলি তুই? পুলকদা তোকে এমন করে মারল কেন? —অথচ সে নড়তে পারে না এক ইঞ্চিও, তার সর্বাঙ্গ শিথিল শক্তিহীন হয়ে যায়।

এ সময় রিকসা চলতে শুরু করলে—পুলক বাঘের মত গর্জে ওঠে—'খানকীর বাচ্চা, পালাবি কোথায়—তোকে আমি খতম করে দেব—' পুলককে যারা ধরেছিল তারা তাকে নিয়ে সন্তৃপ্ত হোটেলের ভেতরে চলে যায়। পুলকদা কী এর মধ্যেই নেশা করেছে-এই ভর সন্ধ্যাবেলায়?

পানুর মুখে যে রক্ত গড়াচ্ছে তার ছিটেফোঁটা এখনো কী পুলকদার হাতে লেগে রয়েছে? নাকি এতক্ষণে সে রক্ত শুকিয়ে মেয়েদের কপালের সিঁদুরের টিপের মত হয়ে গেছে?

বিভুর গা গুলিয়ে ওঠে, বমি বমি পায়। বাতাস যেন তার ভেতরে ঢুকতে পারছে না--ভেতরটা এত গুমোট এত লোকজন অথচ কাউকে সে স্পষ্ট করে দেখতে পায় না। ঝাপসা অন্ধকারে লোকজন কিলবিল করে। তার অসুখের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বিভুর চোখে এমন অন্ধকার ভাসে। তার ডান পা-টা কাঁপতে থাকে, সে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে এমন ভয় হয় তার। এ সময় ঠিক তার সামনে দিয়ে ধীরেশ চলে যাচ্ছিল। ধীরেশের মুখটা স্পষ্ট হতেই সে ধীরেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে—'ধীরেশ একটু ধর আমাকে।' তার কথাও অস্পষ্ট হয়ে যায় গোঙানির মত।

ধীরেশ চমকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—'কীরে শালা ল্যাংড়া, নকসা দিচ্ছিস কেন? তুই কী ফিট হয়ে যাবি নাকি?' এর আগেও দু-একদিন ফিটের মত হয়েছে বিভুর। একদিন ধীরেশই মাতাল হয়ে জাপটে ধরেছিল তাকে, সেদিনও এমনি হয়েছিল বিভুর।

ধীরেশের কাঁধে তার শরীরের সব ভার। ধীরেশ তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলে—'উহু, লাগছে শালা, তুই কী হারকুলিস হয়ে গেলি নাকি?'

'আমার গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল রে—' বিভু ধীরেশের কাঁধে হাত রেখে স্তিমিত গলায় বলে।

'জানি শালা, তুমি যেবতক আমার ঘাড়েই চাপবে। চল তোকে আমি কোলে তুলে নিয়ে যাই।' বলে সত্যি সত্যি ধীরেশ তাকে পাঁজাকোলা করবার চেষ্টা করে। চোখের সামনে উত্তেজক ঘটনা দেখলে সব মানুষই বোধহয় নিজেকে শক্তিমান মনে করে। ধীরেশ চেষ্টা করে কিন্তু বিভুকে সে তুলতে পারে না।

সে বলে ওঠে—'তোর ওজন ত কম নারে বিভে?' ধীরেশ সাধারণতঃ তাকে ল্যাংড়া কিংবা বিভে বলে ডাকে।

'তুই আমাকে নিয়ে চল ধীরেশ।' বিভুর কাতর অনুরোধ। তার শরীরের ভার বাড়ে।

'তোকে তো নিয়ে যেতেই চাই রে বিভে, কিন্তু তুইও তো যাস না'— ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ধীরেশ বিভুকে ধরে নিয়ে তার দোকানের দিকে এগিয়ে যায়।

ধীরেশের দোকানে এসে এককোণে শুয়ে পড়ে বিভু। শুয়ে শুয়ে সে ধীরেশের অস্পষ্ট কথা শোনে। আর ভাবে সত্যি সত্যি ধীরেশ তাকে যেন কোথায় নিয়ে যেতে চায় প্রায়ই, সেখানে গেলে নাকি মনের সব দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা কেটে যায়। সেখানে নাকি শুধু সুখ আর আনন্দ। মাঝে মধ্যে বিভুর কৌতূহল হয়ও, দেখতে সাধ হয়— কীসে এত সুখ মানুষের, কীসে মানুষের সব দুঃখ যন্ত্রণা কেটে যায়? সত্যি সত্যি কী মানুষ দুঃখের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে?

কৌতূহলের সঙ্গে ভয়ও হয় তার ধীরেশের চোখ-মুখ দেখে। আর তাছাড়া বাজারের ভেতরের গিঁটে জটিল অলিগলিতে ঢুকলেই তার মুখ শুকিয়ে যায়। যদিও সে বেলাদিন এখানে থাকে না, বাজারের ভেতরেও সব একটা যায় না সে, কবে কোথায় কী আছে তারও সবিশেষ খবর সে জানে না। শুধু এই

দোকানগুলিরর উল্টো দিকেই—নীচু চাতালের ওপাশে একটা কালিবাড়ি আছে সেটা চোখে পড়ে। সেখানে বছরে একবার বলি হয়। শানবাঁধানো চত্বরে হাঁড়িকাঠ বসানো আছে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে তুমুল শব্দে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা বাজতে থাকে। সে শব্দ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

ওদিক দিয়েই মাঝেমধ্যে বিভু একা একা বাজারের ভেতরের দিকে গেছে কৌতূহলী চোখ নিয়ে, খোয়াওঠা নোংরা চাপা রাস্তা—দুদিকে অসংখ্য চাপা খুপরীর মত দোকানঘর শুধু। এই বাজারের এই শহরের অনেক কিছুই চেনে না সে আর এই অচেনা রাজ্যে যেন প্রতিমুহূর্তে তার পথ হারানোর ভয়: সে ভাবে পথ হারালে কোনদিন আর তার নৌকোয় ফিরে যেতে পারবে না সে। পারবে না তার বাড়ি ফিরতে। আর তখনই তার রাখীর কথা মনে পড়ে।

আর মনে পড়তেই ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বিভু, পল্টুর খোঁজ এখনো মেলে নি। তাছাড়া নৌকোয় রয়ে গেছে ফুলের ঝাঁড়ি।

চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে। উঠে বসতেই মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে যায় বিভু। ধীরেশের দিকে সে তাকিয়ে দেখে। দোকানের সামনে একটি বয়স্কা মহিলা ও একটি তরুণী দাঁড়িয়ে ধীরেশের সঙ্গে দরদাম করছে ফুলের মালা নাড়াচাড়া করছে। এরা প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে ধীরেশের দোকানে আসে। হাল্কা সেন্টের গন্ধ চারিদিকে ভুর ভুর করে। 'গোড়ের মালা নেই?' —তরুণীটি জানতে চায়। তার দুচোখে গাঢ় কাজল যত্নে চুল বাঁধা শরীর আঁটোসাটো।

'গোড়ের কেন সবই পাবে মাসীমা তোমার কোনটা পছন্দ।' —বলে ধীরেশ ব্যস্ত হয়ে সব এগিয়ে দেয়।

'তোমার দোকানে দাম বড় বেশী'—বয়স্কা মহিলাটি পান চিবোয় তার দুঠোঁট যেন বেঁকে বয়। 'সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে তোমরা কী সস্তায় কিছু ছাড়ো নাকি মাসি?' —ধীরেশ ফিক ফিক করে হাসে।

'ভাল মালের ভাল দাম'—তরুণীটি শরীরে ঢেউ তুলে আড়চোখে ধীরেশের দিকে তাকিয়ে হাসে—'তোমার মাল ভাল না দামও বেশী। কি বলো মাসি?' মাসির গায়ে ঢলে পড়ে মেয়েটি—দুজনেই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

এ সময় বিভু চোরাপায়ে ধীরে ধীরে দোকানের পিছন দিক দিয়ে নদীর দিকে হেঁটে যায়। এ দৃশ্য তরুণীটির চোখে পড়ে। ধীরেশকে বলে—'ওটি কে গো তোমার ইয়ার নাকি? কেটে পড়ছে কেন ভয় পেয়েছে?' আবার হাসির শব্দ।

ধীরেশ মুখ ফিরিয়ে বিভুকে দেখেই উঁচুগলায় ডাকে—কিরে বিভু কোথায় যাচ্ছিস শোন—বিভু বলে 'নৌকোয় যাচ্ছি' —বলেই সে এক মুহূর্ত দেরী করে না, ঘাটের কাছে এসে পড়ে। পেছনে হাসির শব্দ তুবড়ির মত ফুঁসতে থাকে। বিভু অনেকক্ষণ নৌকোয় বসে বসে ব্রিজের দিকে হাপুস নয়নে তাকিয়ে থাকে—অনেক লোক যাতায়াত করছে যদি পল্টুকে তার চোখে পড়ে। ব্রিজের ওপারেই হাসপাতালের কাছে হাকিমপাড়া।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে বিভু আবার ধীরেশের দোকানে এল। এর মধ্যে সে তার নির্দিষ্ট দোকানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ফুল দিয়ে এসেছে।

ধীরেশের দোকানে একটা মোটাসোটা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরা লোক ফুলের মালা কিনছিল। বিভুকে চোখে পড়তেই ধীরেশ বলে ওঠে—কীরে শালা, তখন অমন পালিয়ে গেলি কেন?'

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বিভু ধীরেশের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, তারপর বিমর্ষ গলায় বলে—'ধীরেশ ভাই, আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।'

ধীরেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত তুলে বলে—বলে ফেল কী করতে হবে, আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি।'

'ইয়ার্কি না, সত্যি খুব বিপদ হয়েছে; কাজটা করে দিবি বল?'— বলে বিভু ধীরেশের একটা হাত ধরে ফেলে।

ধীরেশ বলে—ইয়ার্কি মারছি না, সত্যি আমি তোকে ভালবাসি, বল কী করতে হবে—' বলে সে বিভুর চিবুক ধরে নাড়িয়ে দেয় আর হাসে।

'আমি তোর দোকান দেখি, তুই একটু হাকিমপাড়ার দিকে ঘুরে পল্টুর খোঁজ করে আয়—সারাদিন ছেলেটা বাড়ি যায় নি, কাকিমা কান্নাকাটি করছে—' অনুনয়ের গলায় বলে বিভু।

সহসা ধীরেশের চোখ দুটো গোল আর মুখটা হাঁ হয়ে যায়, তার ভেতরে যেন প্রচণ্ড হাসির একটা ফানুস ফেটে যায়—চকচকে মুখে হাসতে হাসতে সে বলে—'ও চাঁদু, তুমি কোন খবরই রাখো না, পল্টুর খবর নিবি কী রে, ওর তো তোফা খবর, আজ দুপুরে ও চুপেচাপে রেজিস্টারী করেছে কোর্টে—'

বিস্ময়ে আতঙ্কে ওঠে বিভু—'সত্যি তুই ঠিক জানিস। কোন পল্টু বলতো?'

ধীরেশ কুণ্ড কথনো ব্যঙ্গে খবর দেয় না বুঝেছ, তোর রাখীর দাদা তো হাকিমপাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে ইয়ে করেছে। আরে মারপিটের আগে তো ঐ নিয়েই হৈচৈ হচ্ছিল—

ধীরেশের কথায় সব সংশয় নিঃশেষে উবে যায়, বিভু তবু কিছুক্ষণ এমন নির্বাক স্থির হয়ে বসে থাকে যেন সঠিক কিছু তার বোধগম্য হচ্ছে না। খানিক বাদে ঘোর কেটে গেলে বরং তার মনটা হাল্কাই লাগে। সে ধীরেশকে বলে—'ভালই করেছে, কী বলিস?

'আলবাৎ, ভাল মানে, একটা বৌ পুষতে চলে নাকি?' —বলে সে বিভুর হাতের ওপর আলতো একটা চাঁটি মারে।

॥ ২ ॥

সামনে ধীরেশ, পেছনে তাকে অনুসরণ করে বিভু; সরু খোয়া-ওঠা রাস্তা, লোকজন কমে এসেছে। রাস্তায় বিজলী বাতিতে টিমটিমে লণ্ঠনের মত অপরিচ্ছন্ন লালচে অতাল্প আলো। ছায়া বেশী। চারিদিকে নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ধীরেশকে আজ কথায় পেয়েছে, সে পূর্ব প্রসঙ্গ কিছুতেই ভুলতে পারছে না। 'তোর কী মনে হয় বিভু ভালবাসা ফালবাসা বলে কিছু সত্যি আছে রে?' —ধীরেশ কম করেও তিনবার নানাভাবে এই একই প্রশ্ন করে বিভুকে।

বার বার নিরুত্তর ছিল সে, এখন কিছু একটা তাকে বলতেই হয়, নেই? নাহলে পল্টুটা এত কাণ্ড করে রেজেস্টারী করে?'

হা হা করে হেসে ওঠে ধীরেশ—'ওসব বয়েসের দোষ বুঝেছ, দু দিন বাদে ওসব সুড়সুড়ি রোগ কেটে যাবে।'

বিভু প্রতিবাদ করে—'কেটে যাবে কেন? ভালবাসা কী কেটে যাবার জিনিস? দুজনের মধ্যে যখন ভালবাসা হয় তখন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না, দূরে গেলেও সব সময় তার কথাই মনে হয়।'

'দ্যাখ শালা, ভালবাসার ব্যাপারে তুই আর আমাকে জ্ঞান দিস না। মনে হয় কেন জানিস—মাংসের জন্য —স্রেফ কষা-কারীর নেশা বুঝেছ?' —বলে গুনগুনিয়ে গান ধরে ধীরেশ—'ও দে আমায় সাজায়ে দে গো—আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হয়ে'—

বিভু বলে—'গান গাইছিস, মেজাজ আজ খুব ভাল আছে তোর?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেশ বলে, নারে মেজাজ ভাল নেই। কিছুই ভাল লাগে না বুঝলি'—

বিকৃত হয়ে যায় ধীরেশের মুখটা হঠাৎ—'শালা, সব কীরকম কিচাইন হয়ে গেলরে'—

'কী হল?' —সমবেদনায় মৃদু অন্তরঙ্গ স্বরে বিভু বলে ওঠে।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে—হাঁটতে হাঁটতেই—ধীরেশ বলে—'আমিও একটা প্রেম করেছিলাম রে বুঝলি?'

এতক্ষণে বিভু স্বস্তি বোধ করে—'ভালই তো, জীবনে ভালবাসা পাওয়া সেত'—

তাকে বাধা দিয়ে ধীরেশ বলে—'একটা লোন আছে; একটা বৌকে ভাল-

বেসেছিলাম—অন্যের বিয়ে করা বৌ—জানিস?'

বিভুর দু কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। সে অনেক প্রেমের কথা শুনেছে কিন্তু এরকম প্রেমের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে গুম হয়ে থাকে।

ধীরেশ বলে—'খুব খাপ্পাই দেখতে ছিল বুঝলি, তুই দেখলে ট্যারা হয়ে যাবি। তো কিছুদিন খুব মাখো মাখো হল—সিনেমায় যায় আমার সঙ্গে—রেস্টুরেন্টে বসে খায়—অন্ধকারে তিস্তা নদীর পাড়ে বেড়াতে যায় বাড়ি থেকে পালিয়ে। এদিকে আমার তো পেটভরা খিদে, শালা শুধু ইয়েতে কী আমার চলে?'

বিভু দম বন্ধ করে প্রশ্ন করে গম্ভীর গলায়—'বৌটার স্বামী ছিল না?'

'ছিল রে শালা, ছিল' সেই সোয়ামীটাই তো শেষতক বাগড়া দিল। হাতের মুঠোয় পেয়ে মুখে তুলতে পারলাম না'—

বিভু এসময় শুধু থুথু ফেলল একগাদা মাটির ওপরে। ফিক ফিক করে হেসে যেন নিজেকে শুধরে নেয় ধীরেশ. তারপর পেছিয়ে বিভুর কাছে এসে বলে—'একটু ভুল বললাম রে। আসলে সোয়ামীটা যখন তোড়জোড় শুরু করল, তখন দেখি বৌটা সতীলক্ষ্মী হয়ে যায়। তখন বেগতিক বুঝে কী করলাম জানিস?'

'কী করলি?'—ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে বিভু।

'তখন একদিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে তিস্তার পাড়ে উঁচু টিলাটা দেখেছিস তো?—ওখানেই সেই প্রথম, আহ্‌ কী ইয়ে রে ভাই। এখনো ভাবলে—জিভ দিয়ে টাকরায় শব্দ করে ধীরেশ। তারপর মুখ গোমড়া করে বলে, —'কিন্তু জানিস, তারপর থেকেই' —থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিভু।

দেখতে পেয়ে ধীরেশ ঘুরে দাঁড়ায় —বলে—'কী হল বাপ্‌?'

স্থির জ্বলজ্বলে চোখে ধীরেশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে বিভু' তারপর বিষন্ন অথচ শান্ত গলায় বলে—'তুই ভাল করিসনি ধীরেশ'

হা-হা করে হেসে ওঠে ধীরেশ, বিভুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে—'খারাপ ভাল কী জানিসরে শালা?'

'খারাপ ভাল কিছু নেই? এর ফল কী ভাল হবে?' বিভুর দুঃখিত কণ্ঠস্বর।

'কী? কী হবে? আমি শালা ধীরেশ কুণ্ডু আর দুনিয়ার সব ব্যাটাকে আমার জানা আছে, চল'—বলে তার কাঁধে হাত রেখে আকর্ষণ করে ধীরেশ।

আপনমনে স্তিমিত গলায় বিভু বলে—'তুই সত্যি বলতো ধীরেশ, পাপ করিসনি তুই?'

মুখ বিকৃত করে উত্তেজনায় হঠাৎ ফুঁসে ওঠে ধীরেশ—'জ্ঞান দিচ্ছিস রে ল্যাংড়া? অভিসম্পাত দিচ্ছিস?'—রীতিমত চীৎকার করে ওঠে ধীরেশ। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন কথা উচ্চারণ করে সে হিংস্র মুখে—'তুই কী পাপ করেছিলি বলতো, এই যে ঠুঁটো ল্যাংড়া হয়ে গেছিস কেন? বল দেখি?'

বিভু স্তব্ধ নির্বাক। তার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যায়। কিছু ভাবতে পারে না সে। শুধু তার মাথার মধ্যে কালো গর্তের মত অসুখের দিনগুলো পাক খেয়ে যায়। তার রক্তস্রোতে অসংখ্য রোগ-জীবাণুর কিলবিলানি যেন সে অনুভব করতে পারে। তার সমস্ত শরীরের মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। আতঙ্কে ভয়ে যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। বিস্ফারিত উদভ্রান্ত চোখে সে ধীরেশের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে।

ধীরেশ ততক্ষণে শক্ত রুক্ষ হাতে তার একটা হাত ধরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা ফ্যাসফ্যাসে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—'চল শালা দেখি তোর কত পুণ্য আছে।'—বলে হিড়হিড় করে

তাকে টানতে থাকে ধীরেশ—'আমি তো শালা গোল্লায় গেছিই—চল'—

হোঁচট খেতে খেতে উল্টেপাল্টে বেসামাল হয়ে পড়ে বিভু। অসহায় গলায় বলে ওঠে—'কী করছিস ধীরেশ, ছাড়!'

সামনেই চাপা গলি; গলির প্রান্তে অদূরে কিছু টেমি জ্বলতে দেখে বিভু। তার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে যায় আশঙ্কায়। গলিটা ভেতরে আরো অন্ধকারে ঢুকে গেছে। এসব তল্লাট সে ভাল করে চেনে না। কোনদিন দেখেনি সে। সামনেই একটা চায়ের দোকান থেকে উগ্র পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ আসছে। একটা মস্ত লোক তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় টালমাটাল পায়।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বিভু বলে ওঠে—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ধীরেশ?'

তার হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে ধীরেশ বলে—'চল না শালা গেলেই দেখতে পাবি'—

'পল্টুর কাছে তো? ঠিক বলছিস, সত্যি কথা বল?'—নিরুপায় আর্তস্বরে চেঁচায় বিভু।

ততক্ষণে তাকে টানতে টানতে ধীরেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে—যেতে যেতে সে বলে—'হ্যাঁ রে, তোর শালা আর শালার বৌয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি—বাসরঘরে'—

ধীরেশের মুখ দেখতে পায় না বিভু পেছন থেকে, কিন্তু তার কথা শুনে বুকের রক্ত কেন যেন হিম হয়ে আসে। আশঙ্কায় ভয়ে তার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে ওঠে। পায়ের নীচে অসংখ্য ঝরাপাতা, কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে। পায়ের শব্দ উঠছে পাতার মধ্যে, বাঁদিকে মদের দোকান, ছোটখাট ভীড়—হৈ-হল্লা, টেমিগুলো আরো সামনে চলে আসে, এখানে আলো প্রায় নেই বললেই চলে, হারমোনিয়ামের বাজনার শব্দ আসছে কোথা থেকে, হাওয়ায় মদের ঝাঁঝালো গন্ধ। রাস্তার দুদিকে নীচু নীচু টালির ঘর, কিছু মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় দরজায়। কিছু লোক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনটে কুকুর তুমুল ঝগড়ায় মেতেছে, খেয়োখেয়ি চলছে।

বিভুর মনে হয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, আতঙ্কে সহসা সে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে সে বলে—'আমি যাব না ধীরেশ, পল্টুর সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই আমার।'

চকিতে মুখ ফেরায় ধীরেশ, তার কঠিন পাথরের মত মুখটা দেখে চমকে ওঠে বিভু। চাপা গর্জনের মত ধীরেশ বলে—'তবে আমায় বলেছিলি কেন? মিথ্যে কথা বলেছিস? পট্টি-বাজি? শালা ভণ্ড, চল'—বলে সে আরো প্রবলভাবে তাকে টেনে নিয়ে যায়। যেন একটা বিরাট কালো গহ্বরের দিকে তাকে হিংস্র দাঁতে চেপে ধরে ধীরেশ ছুটছে।

কান্না ঠেলে ওঠে বিভুর বুকের মধ্যে, জীবনে সে কখনো এমন বিপদে পড়েনি; কান্না জড়ানো গলায় শেষ চেষ্টার মত বিভু ককিয়ে ওঠে—'তোর পায়ে পড়ি ধীরেশ, তুই আমাকে ছেড়ে দে'—

ততক্ষণে ধীরেশ তাকে টেনে-হিঁচড়ে ছোটখাট দরজা দিয়ে একটা চাপা খুপরীর মত ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছে। দুজনেই তারা তখন শ্রান্ত পশুর মত হাঁপাচ্ছে। ঘরে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে একটা, একটা ছোট্ট তক্তপোষ একপাশে দেয়ালের দিকে দড়িতে টাঙানো কয়েকটা শাড়ি।

ধীরেশ উৎসাহে মুখ ছড়িয়ে হাসে—'এই যে সোনালী দেখ তোমার নাভারকে নিয়ে এসেছি?'

'ওমা, কী ভাগ্য আমার',—বলে ধীরেশের দোকানে-দেখা তরুণীটি এগিয়ে আসে; বিভু যেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে, সে কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার মধ্যে শুধু অবিরল একটা গোঁ গোঁ গোঙানির শব্দ বয়ে যাচ্ছে একটানা। সামান্য আলোতেও বোঝা যায় মেয়েটি আরো সেজেছে—কমলা রঙের একটা শাড়ি পড়েছে—শাড়ির আঁচল শিথিল, উঁচু বুকের এক দিকটা অনাবৃত, কপালে চকচকে টিপ, চোখে কাজল, সারা পাউডার মুখময়—দুঠোঁট লাল পানের রসে।

বাঁ হাতে ধীরেশ বিভুকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলে—'তোকে সোনালী ভালবাসে রে শালা, ওর কাছে তুই যা চাবি তাই পাবি। ওকে দেখতে কেমন রে?'

বিভু যেন বধির, অন্ধ, বোবা। সে কিছু বলে না। বজ্রপাতে নিহত স্থির শবের মত দাঁড়িয়ে থাকে অপলক চোখে। রাখীর ছবিও আর তার মনে আসে না।

'আজ সারা রাত তুই সোনালীর কাছে থাকতে পারিস, বুঝলি রে শালা? কী কলা সোনালী?' ধীরেশের কথা শেষ হলে বিভু যেন বহুদূর থেকে বলে—'পল্টু কোথায়?'

'পল্টু! এখনো মনে আছে দেখছি'—হো হো করে ধীরেশ হাসে জান্তব গলায়। 'এখনো তুই পল্টুর কথা ভাবছিস? লে শালা'—

'তুই আমাকে ভাঁওতা দিয়ে কেন এখানে আনলি ধীরেশ?'—সে একটুও নড়ে না, ধীরেশের চোখেও তাকায় না।

ধীরেশ বলে—'তোর ভালর জন্যই এনেছি রে ব্যাটা, রাখীর লাথি খেয়ে তো একদিন আসতেই হত।'

এ-সময় মেয়েটি এগিয়ে এসে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়, বিভুর বুকে হাত রাখে, তারপর হাতটাকে ম্যাজিসিয়ানের মত তুক করার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বিভুর গলার কাছ দিয়ে কাঁধে তুলে দিয়ে মেয়েটি বলে—'মাইরি, আমি তোমায় ভালবাসি গো, বিশ্বাস কর, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না?' মেয়েটির পুষ্ট স্তন বিভুর বুকের কাছে গেঁথে যায়, তার চোখে সম্মোহনী রশ্মি খেলা করে। বিভুর ইচ্ছা হয় মেয়েটির হাতটাকে কাঁধ থেকে সরিয়ে দিতে, তাকে ঠেলে দিতে, কিন্তু কিছুই করতে পারে না সে। শুধু অনুভব করে তার কাঁধে বুকে যেন পুঁজের ধারা গলে পড়ছে। চারিদিকে মাতালের অট্টহাসি চীৎকার, কোথায় যেন ঘুঙুর বাজছে, হারমোনিয়াম বাজছে। উগ্র সেন্টের গন্ধে বমি পায়।

ধীরেশ হেসে মেয়েটিকে বলে—'তুমি ওকে দেখো সোনালী, আমি মাল নিয়ে আসি'—বলে ধীরেশ বেরিয়ে যায়। যাবার আগে ধীরেশ ফিসফিসিয়ে বলে যায় বিভুকে—'কষা মাংস আনব খুব ভাল, একবার খেলেই নেশা ধরে যাবে।'

মেয়েটি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে—'কীগো বললে না—আমাকে তোমার মনে ধরে না?'

খিলখিলিয়ে হাসে মেয়েটি, কলসীর থেকে জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে বলে—'কেন গো আমাকে দেখতে খারাপ?' দুহাতে ম্যাজিসিয়ানের মত তাকে আরো কাছে টানে মেয়েটি।

বিভু বলে—'না তোমরা খারাপ মেয়ে।'

'আহা খারাপ কিসে? কোন্ ছেনাল আমার থেকে ভাল?'—মেয়েটি অভিমানে ফুঁসে ওঠে।

বিভুর গলা কাঁপে, সে বলে—'নোংরা কাজ তোমাদের'—

'আহ, আমার গরমেন্টের লাইসেন আছে'—বলে চোখ পাকায় মেয়েটি কৃত্রিম ক্রোধে, তারপর তাকে সবলে সর্বাঙ্গে জাপটে ধরে তক্তপোষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিভুর সারা শরীর থরথরিয়ে ওঠে, তার মাথার মধ্যে 'লাইসেন আছে' কথাটা ঠোকর খেতে থাকে। সে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারে না। তার মনে হয় মেয়েটি তাকে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছে। সে বলে ওঠে—'গভমেন্টের লাইসেন্স আছে?'

মেয়েটি [illegible] বলে—'হ্যাঁগো, বিশ্বাস হয় না, দেখবে?'

কিন্তু বিভু কিছু ভাবতে পারে না। তার গোলমাল হয়ে যায়।

এ-সময় সহসা সে মেয়েটিকে বলে—'তুমি ধীরেশকে ভালবাস না?'

মেয়েটি হাসে—'কেন হিংসে হচ্ছে? তবে তার থেকে তোমাকে বেশী ভালবাসি।'

'দূর দুজনকে কী একসঙ্গে ভাল-বাসা যায় নাকি?'—বিভুর দুচোখে সন্দেহ।

মেয়েটি হাসিতে উথলে ওঠে। বলে—'সে কী গো, দুজন কেন, একশজনকে ভালবাসা যায়। আমার কত ভালবাসা তা জানো?'—মেয়েটি ভ্রূভঙ্গিতে বিদ্যুৎ হানে। বিভুর মুখ শরীর ঝলসে যাবে মনে হয়। মেয়েটি হাসে, হাসির ওপরে হাসি চাপায়। তার ঠোঁটের রঙের পেছনে মাঝে মাঝে রং-না-লাগা অংশ ঝলসে ওঠে।

এবারে মেয়েটি বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকায়, চোখ বাঁকায়। তীব্র দৃষ্টিতে স্থির বিভুকে লক্ষ্য করে। তারপর ক্রমে ধীরে ধীরে মেয়েটা নিজের মুখে কী রকম যন্ত্রণার ছায়া ঘনিয়ে তোলে, তারপর সহসা ত্রস্তভাবে বলে ওঠে—'উহ্ কী পোকাগো বাবা।'

তক্তপোষে বসে মেয়েটি চোখ নীচু করে নিজের বুকের দিকে তাকায়। তারপর বিভুকে রীতিমত ধমক দিয়ে বলে—'তুমি কেমন লোক গো, দেখ ত আমার বুকে পোকা ঢুকে পড়েছে, কামড়াচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একটু বের করে দাও তো'—বলেই বুকের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দেয় মেয়েটি।

ফের বলে 'কী হল—বার কর?'—বলতে বলতে মেয়েটি তক্তপোষে কাত হয়।

বিভুর হাত পায়ে বিদ্যুৎ ছুটে যায়। সে কখনো কোন তরুণীর এমন শরীর দেখেনি, পুষ্ট উদ্ধত, মোহময়। ছোট্ট একটা ব্লাউজ যেন নির্লজ্জ বুকের সবটা ধরে রাখতে পারছে না। গলার নীচে, পেটের কাছে মাংসল শরীর ঝলসে উঠছে। তীব্র মাদক গন্ধ শরীরে, বাতাসে। দম আটকে আসে। হৃৎপিন্ড থেকে পিচকিরির মুখে ছলাৎ করে সর্বাঙ্গে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে বিভুর। তার মাথা ঘুরতে থাকে। পা টলে যায়। তার চৈতন্য লুপ্ত হতে চলেছে এমন মনে হয় তার। সে দু চোখ বোজে।

আর ঠিক সে মুহূর্তে একট গাঢ় সবুজ বিশাল প্রান্তর তার দু চোখে জ্বলে ওঠে। আর প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া অবনত বনভূমি থেকে উন্মাদের মত ছুটে আসে। আর সেই দমকা হাওয়ায় সনসনিয়ে একটা ধ্বনিতরঙ্গ বয়ে যায়, কার যেন আর্ত-কণ্ঠের একটা ডাক বহু দূর দুরান্ত বেগে ছুটে আসে—'বিভু ফিরে এসো।'

বিদ্যুত স্পৃষ্টের মত সে মুহূর্তে একটা তীব্র ঘোরের মধ্যে বিভু সহসা ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর দরজা পেরিয়ে মরীয়া উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটতে থাকে। কোন্‌দিকে কোথায় সে জানে না। তার পেছনে অসংখ্য মরা পাতা হাসির শব্দে উত্তাল হয়ে যেন তার পিছু নেয়। সে থামে না। তার খোঁড়া পায়ে এত শক্তি আছে আগে তার জানা ছিল না।

ত্রিভুবন জুড়ে অন্ধকার। অন্ধের মত অসংখ্য মরা পাতার ওপর দিয়ে ছোটে বিভু। তার বুঝি দিকভ্রম হয়ে যায়। চেনা অচেনা সবকিছু সে গুলিয়ে ফেলে। ছুটতে ছুটতে কার গায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। লোকটা ধমকে ওঠে—'কী হচ্ছে?'

আরেকজন তৎক্ষণাৎ পাশ থেকে ছুটে এসে বলে—'দাঁড়াও।' পেছন থেকে আরেকজন চীৎকার করে ওঠে—'নড়বে না একদম, টুঁ শব্দ করবে না।' সামনে থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে আরেকজন তার খুব কাছে ছুটে আসে—'হ্যান্ডস আপ। ওপরে হাত তোলো।'

বিস্ময়ে হতবাক বিভু হাঁপাতে হাঁপাতে দু হাত ওপরে তোলে। অন্ধ-কারে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে চার-পাঁচটি ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে ফেলেছে। হঠাৎ তীব্র টর্চের আলো মুখে এসে পড়ে তার। বিভুর সন্ত্রস্ত চোখে একটা ভোজালি ঝলসে ওঠে। সামনের ছেলেটি তার পেটের ওপরে ভোজালিটা ঠেকিয়ে রাখে। যতদূর বোঝা যায়—সবগুলোই তরুণ ছেলে। একজন আরেকজনকে ফিসফিসিয়ে বলে— 'চটপট পকেটে যা আছে বের করে ফ্যাল ফটকে'—

ঠিক এসময়—একজন অবাক গলায় বলে ওঠে—'আরে এটা সেই ল্যাংড়াটা দেখছি।'

অন্ধকারে আরেকজনের প্রশ্ন—'পল্টার পাশের বাড়ির না? জগা বলে-

আসন্ন মুক্তি পথে!

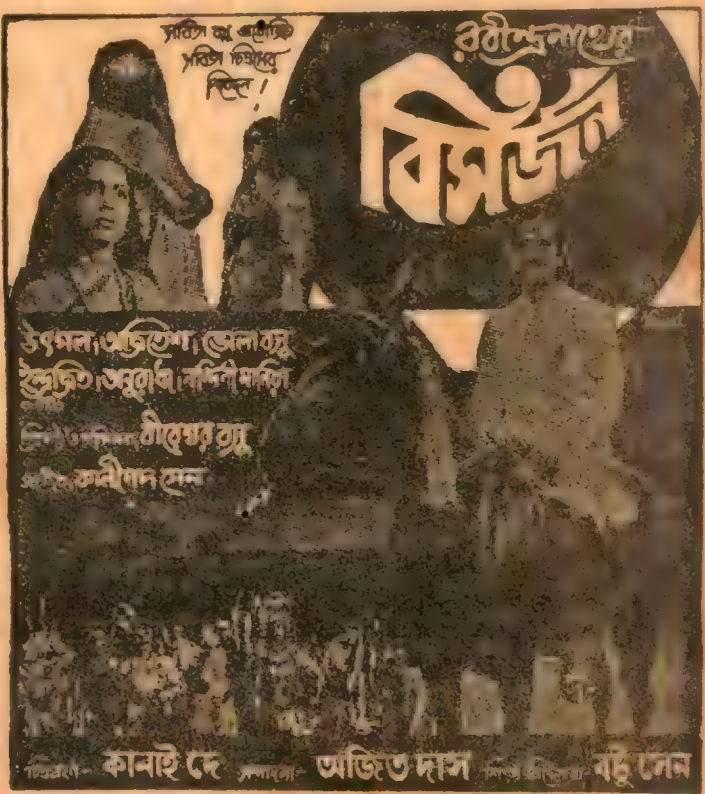

পরিবেশনা- চন্দ্রিমা পিকচার্স
৯, ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-১

প্রস্তুতির পথে জয়ন্তের মল্লিকা
চিত্র-পরিচালনা বীরেশ্বর বসু

ছিল কাল নাকি পল্টা এই শালার বাড়িতেই ঢুকে পড়েছিল—'

'কী রে, কাল পল্টা তোর বাড়িতে সেল্টার নিয়েছিল?'—একজন তার ঘাড়তান চেপে ধরে মুঠো করে।

বিজু দৃঢ় গলায় বলে—'হ্যাঁ'।

'হ্যাঁ—উ শালা তোমার ভয়ডর নেই?'—পেটের ওপরকার ভোজালিতে চাপ পড়ে—শোনো, পল্টুকে আমরা ছাড়ব না, ভবিষ্যতে কোন দিন যদি ওকে সেল্টার দাও, তোমাকে সুদ্ধু শালা নিকেশ করে দেব, বুঝেছ? এবারে দেখি মালকড়ি কী আছে?'—বলে ছেলেটা তার জামার পাশের দু-পকেটে হাত ঢোকায়। যা পায় তাই বের করে নেয়। তার বুক পকেট খোঁজে, কিছু নেই, তার পাজামার পকেট দেখতে যায়—তার পাজামার কোন পকেট নেই। ছেলেটা রেগে গিয়ে বলে—'খুব তো ন্যাকাচৈতন সেজে ঘুরে বেড়াও আর চুপি চুপি বেশ্যা বাড়ি ঢোকো, এ্যাঁ?'

হঠাৎ আরেকটি ছেলে তার হাত লক্ষ করে বলে—'ঘাড় পরনি কেন চাঁদু?' হাতে টর্চের বাড়ি পড়ে। ইতিমধ্যে টর্চের আলোয় আরেকজন টাকা পয়সা গুনে ফেলেছে, মাত্র দু টাকা আঠার পয়সা। হঠাৎ তার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়—সে ক্ষেপে গিয়ে বলে—'মাগীবাড়ী আসবে শালা, বেশী করে টাকাকড়ি আনতে পার না—ভিক্ষুকের মত মাত্র দু টাকা আঠার পয়সা পকেটে'—সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় এসে পড়ে বিজুর গালে।

চমকে ওঠার সময় পায় না বিজু, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন ধাক্কা মারে তাকে,—যাও শালা, এর পরের দিন হাতে ঘাড় পরে আসবে, আর বেশী করে মালকড়ি আনবে পকেটে'—সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিজু। কিন্তু সে আর ছোটে না। কুকুরের মত ক্লান্ত লাগে শরীরটা। ধীরে সুস্থে উঠে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সে এগিয়ে যায়। একটুও শব্দ করে না। পেছনে অন্ধকারে কিছু হাসির শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে। ফিরেও তাকায় না বিজু।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে চোখের পলকে ঘটে যায়। বিজু কোনটা ছেড়ে কোনটা ভাববে? অগোছালো সুতোর মত সব ঘটনা তার মাথায় জট পাকিয়ে যায়। এই মুহূর্তে তার মনে কোন দুঃখ নেই, ভয় নেই ত্রাস নেই—সে কেবল একটা জীবন্ত পাথরের মূর্তির মত হেঁটে চলে অনামনস্কভাবে। কোনদিকে সে তাকায় না। কোন কিছুর প্রতি তার কোন মায়া নেই, কৌতূহল নেই, তাকে এখন বিজু বলেও কেউ ডাকতে পারে, অন্য কোন নামেও ডাকতে পারে। তার যেন কোন পরিচয় নেই, নাম নেই, সে যেন এখানকার কেউ নয়।

। ৩ ।

রাখীর কথা ভাবতে ভাবতে বাগানে চলে আসে বিজু, আমগাছটার তলায় এসে দাঁড়ায়। বোলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। কাঞ্চন ফুল গাছটার দিকে সে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে। এখন বেশ রাত হয়েছে, দশটার কাছাকাছি। তবু মনে হয় রাখী একবার আসবেই, না এসে পারে না। আজ রাখীর আসা নিতান্তই প্রয়োজন। বিজুর সঙ্গে সমস্ত বাগানটাই যেন প্রতি রাতে রাখীর জন্য অপেক্ষা করে।

রাখীদের বাড়ি থেকে উঁচু গলায় কথা কাটাকাটির শব্দ আসে। বিজু উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করে। সম্ভবত, কাকাবাবুর সঙ্গে পল্টুর লেগেছে। দুজনের সম্পর্ক তো কেদার রায় ঈশা খাঁর মত।

দুজনের মধ্যে যেন অফুরন্ত বারুদ জমা আছে। সে বারুদ যেন কথা হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ ছোটা গুলির মত দুজনের মুখ থেকে ছুটে আসে। হয়তো রক্তপাতও হয় কিন্তু তা চোখে দেখা যায় না। অথচ ইদানীং কাকাবাবু কিংবা পল্টুকে দেখলেই ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত হেরে যাওয়া যোদ্ধার মত মনে হয়। কাকাবাবু তো হাঁটতে গিয়ে এখন সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়ে। বিজু ভাবে তার বাবার ইতিহাস বই-এর কয়েকটা পাতা যেন উড়ে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র।

সহসা ওবাড়ি থেকে কথা কাটাকাটি হট্টগোলের শব্দ শোনা যায়। একবার ছুটে যাবে কিনা ভাবে বিজু, পরমুহূর্তেই তার মনে হয় ওদের নিজেদের সংসারের ব্যাপার, তার বোধ হয় যাওয়া উচিত হবে না। কিন্তু সে স্থিরও থাকতে পারে না। আর যা হক, রাখীর জন্য সে খুব বেশী উতলা বোধ করে। পল্টু যেমন মা বাবাকে তেমনি রাখীকেও সহ্য করতে পারে না। অথচ রাখীকে কেউ গালমন্দ করুক—এটা বিজু মেনে নিতে পারে না। রাখীর মনোবেদনা তারও বুকে বাজে।

বিজু স্থির হয়ে দাঁড়ায় এই প্রতীক্ষায় যে রাখী আসুক এই নির্জনে, প্রতিদিনকার মত তার পুষ্পিত উদ্যানে। তাদের দুজনের মধ্যে আজ নতুন করে দেখা হোক।

সহসা এসময় ঝোপে কারো দ্রুত পদশব্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে বিজু। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে রাখী তার বাগানে ঢুকছে। যেন সোজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত ছুটে আসছে দুঃসংবাদ নিয়ে এমন তার উদভ্রান্ত ভঙ্গি।

বিজুও দুকদম এগিয়ে যায়, রঙ্গনগাছের সামনে দুজন মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়। 'কী হল রাখী?'—বিজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, রাখী বাহ্যজ্ঞানহীনের মত বিজুর দু হাত হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে—'ও তুমি এখানেই? শীগগির আমাদের বাড়ি চল বিজুদা।'

'ব্যাপার কী? কাকাবাবুর সঙ্গে পল্টুর লেগেছে নাকি?'

'না, তুমি আগে চল'—হাঁপাতে হাঁপাতে রাখী বলে—'যেতে যেতে বলছি চল।' বলেই সে হাঁটতে শুরু করে। তার কাছ থেকে, যেতে যেতে বিজু যা শুনতে পায় তা হল এই: কিছুক্ষণ আগে পল্টুর বিয়ে করা বৌটির বাবা এসেছে, বলছে তার মেয়ে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। তাকে ফুসলিয়ে এনে পল্টু বিয়ে করেছে। ভদ্রলোক সঙ্গে কয়েকটি গুণ্ডামার্কা ছেলেকেও নিয়ে এসেছে। পুলিশেও নাকি ডায়েরী করেছে। কাকাবাবুও চাইছে মেয়েটি চলে যাক। এদিকে পল্টু মেয়েটিকে বাড়িতে রেখেই কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। মেয়েটি ঘরের দরজা আটকে ভেতরে বসে আছে। ছেলেগুলো ঘরে চড়াও হতে চেষ্টা করছে।

'পল্টুটা গেল কোথায়?'—বিজু উদ্বিগ্ন।

'কী জানি? এসেই আমার সঙ্গে বৌদির পরিচয় করিয়ে দিল ঘণ্টাখানেক আগে, তারপরই বলল, আমি এক্ষুনি একটু ঘুরে আসছি'—রাখী দ্রুত বলে যায়, আর তাড়া লাগায়—'তাড়াতাড়ি এসো—ঐ শোনো, দরজায় ধাক্কা মারছে।' সত্যি সত্যি দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

একটা পাতি লেবুর ঝাড় পেরিয়ে উঠোনে ঢোকার মুহূর্তে বিজু অবাক হয়ে ভাবে কিছু গুণ্ডামার্কা ছেলে বাড়িতে চড়াও হয়েছে, তবু রাখী তার মত একটা খোঁড়া ছেলেকেই ভরসা করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। বিপদে নাকি সবচেয়ে প্রিয়জনের কথাই মনে আসে প্রথমে?

উঠোনে এসে বিজু হতবাক বিমূঢ় হয়ে যায়। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ক্ষিপ্ত গলায় হাত নেড়ে চীৎকার করছে, 'আপনার মেয়ে আপনি নিয়ে যান আমি তো বলেইছি, কিন্তু ওদের আপনি থামান, দরজা যেন না ভাঙে, আমি পুলিশ ডাকব।'

ভদ্রলোকের গলার জোরও কম নয়। সেও হাত-পা ছুঁড়ছে; দু-তিনটে ছেলে ভেতরের বারান্দায় উঠে দরজায় আঘাত করছে—'বেরিয়ে আয় মিনু', 'দরজা খুলে দে'—ইত্যাদি বলে।

বর্গী ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মত দক্ষিণ আর পুব জুড়ে। রাখীর ভাইবোনরাও হল্লা জুড়েছে, কাকিমা কাঁদছে বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে। কিছু কৌতূহলী প্রতিবেশী বাদরনাচ দেখার ভঙ্গিতে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ উত্তেজিত রাখী দরজার কাছে ছুটে যায়— চেঁচিয়ে বলে— 'নেমে যান আপনারা—এক্ষুনি নেমে যান' নয়তো পুলিশ ডাকব।' তার আদেশের তীব্রতা আর উত্তাপ দেখে ছেলেগুলো ক্যাবলার হাসি হাসে ফ্যাক ফ্যাক করে— 'পুলিশ এখনি আসছে, খবর দিতে হবে না।'

একজন বলে ওঠে—'আপনি মেয়েছেলে, আপনি এখান থেকে সরে যান—'

'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে জানো না ছোটলোক।'— রাখী আরো উত্তেজিত

হয়ে ওঠে। এসময় একটি ছেলে খুব একটা অশ্লীল গাল দেয় তাকে।

এসময় সবাইকে চমকে দিয়ে একটা ক্ষিপ্র 'চিতাবাঘের মত উদভ্রান্ত পল্টু, কোথা থেকে ছুটে এসে উঠোন পেরিয়ে বিদ্যুতের মত বারান্দায় লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচায় 'শালা'—

সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের দক্ষ সব খেলোয়াড়ের মত সবকটি ছেলে পল্টুকে ঝাপটে ধরে এবং অসম্ভব দ্রুত টেনে হিঁচড়ে মুহূর্তে তাকে উঠোনে নামিয়ে নিয়ে যায় আর কিল চড় ঘুঁষি লাথি চালাতে চেষ্টা করে উন্মাদ শিকারীদের মত। পল্টু তবু একাই যেন একশ। সে মৃগীরোগীর মত খেপে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

আর একটা কালবৈশাখী যেন উঠোনে থমকে ছিল এতক্ষণ, এবারে তা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। পল্টুর ছোট ছোট তিন চারটে ভাইবোন ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দেয়, পল্টুর মা শোকার্ত মায়ের মত ছুটে আসেন, তার আঁচল খসে পড়ে, এমনকি পল্টুর বাবাও স্থির থাকতে পারে না, সেও আক্রমণকারী ছেলেগুলোর দিকে তেড়ে যায়। এবং তখন দরজা খুলে সহসা নবোঢ়া তরুণীটিও ছুটে আসে উন্মাদের মত। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে দু-একজন যারা সাহসী তারা শান্তি প্রচেষ্টায় তেড়ে আসে। হৈ চৈ চীৎকার কান্না শাসনতর্জনের সঙ্গে পানিপথ কিংবা হলদিঘাটের ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা পায় উঠোনটা। এর মধ্যে একমাত্র দুটি প্রাণী সম্পূর্ণ স্থির স্তব্ধ পাষাণ মূর্তির মত—মিনু আর রাখী।

মেয়েটি পল্টুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া-মাত্র মেয়ের বাবা তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। মেয়েটিও ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ঘৃণায় নিজের বাবার হাতটা সজোরে কামড়ে দেয়। মেয়ের বাবা আর্তনাদ করে ওঠে। ততক্ষণে ছেলেরা পল্টুকে আবার টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, পেছন থেকে তার দুহাত ধরে তাকে কিল-ঘুষি মারছে তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত।

আজই এদের বিয়ে হয়েছে— দুটি তরুণ-তরুণীর; পরস্পরকে ভালবেসে। তারা সই করেছে এক চুক্তিপত্রে চিরকাল তারা পরস্পরের দায়দায়িত্ব বইবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে। তাদের অন্তরে সই আছে অবশ্য ভালবাসার—প্রেমের। আজ হয়তো তাদের অনবদ্য একটা রাত্রি হতে পারত, হয়তো আত্মীয় বন্ধুরা সাজিয়ে দিতে পারত রজনীগন্ধার স্তবকে তাদের বাসর হয়তো সানাই বাজতে পারত মিলনবিরহের সুরে, হয়তো আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আশীর্বাদ প্রীতিশুভেচ্ছায় দুটি তরুণ-তরুণী অভিষিক্ত হতে পারত, তরুণীটির সর্বাঙ্গে শোভা পেতে পারত মিলনা-কাঙ্ক্ষার মত উজ্জ্বল অলংকার—লজ্জা ভয় উত্তেজনা প্রেমে তার দৃষ্টি হতে পারে উন্মুখ। তারপর উৎসবের সব শব্দ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলে, কোমল পাখির ডানার মত নৈঃশব্দ্যের ভিতরে দুটি মানব মানবী মনোরম অন্ধকারে পৃথিবীর দুর্লভতম অভিজ্ঞতায় প্লাবিত হতে পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে—তরুণীটি দংশন করল তার জন্মদাতাকে— তরুণটি রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠোনের মাঝখানে। এ কিরকম মিলন-রাত্রি?

হট্টগোল যখন চরমে— যখন উন্মাদনা বিশৃঙ্খলা অত্যুচ্চ শীর্ষবিন্দুতে কম্পমান ঠিক তেমনি সময়ে মঞ্চের সমস্ত কুশীলব আচম্বিতে চমকে ওঠে। যেন রাজা এসে দাঁড়ায়। পুলক তার সবুজ সাইকেলটা নিয়ে ঢুকে পড়ে প্রায় উঠোনের মধ্যে। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে নেমে পড়ে। কাঁঠালগাছে সাইকেল দাঁড় করিয়ে দুপায়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় তার রুদ্র দুচোখ। আগুনের মত জ্বলন্ত। বাঘের মত গর্জন করে ওঠে পুলক—'এই হরি, কী হচ্ছে?'

হরি নামের ছেলেটা তখন পল্টুর জামার কলার আরো জোরে চেপে ধরেছিল পল্টুর মুখে গোঁ গোঁ শব্দ উঠছে। হরিও প্রতিধ্বনির মত রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—আপনি এর মধ্যে নাক গলাবেন না পুলকদা, আপনি চলে যান'—

ছেড়ে দে বলছি।— পুলকের গলায় যেন বাজ পড়ল। দশদিক্কুল সম্মোহিত আতঙ্কিত স্তব্ধ।

কিন্তু এ-আদেশের প্রতিবাদ ছিলেবেই যেন সেই মুহূর্তে হরির হাতের একটি সজোর চপেটাঘাত গিয়ে পড়ে পল্টুর গালে—'শালা, বাজার ধরে এনেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র উল্লম্ফনে পুলক হরির একেবারে সামনে, এবং তার তীব্র পায়ের চকিত লাথি গিয়ে পড়ে হরির তলপেটে। হরি উল্টে পড়বারও সুযোগ পায় না। পুলক তার কলার চেপে ধরে টান করে দাঁড় করায়, সঙ্গে সঙ্গে একটি মুষ্ট্যাঘাত গিয়ে পড়ে হরির নাকের ওপর। তার সাকরেদরা চোখের পলক ফেলার আগেই আক্রমণের আশংকায় উদভ্রান্ত হরিণের পায়ে ছুটে পালায়। পল্টু প্রাণ ফিরে পেয়েই হরির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করে পুলক তাকে বাঁহাতের রাজকীয় ভঙ্গিতে নিরস্ত করে। হরি তবু ফুঁসে ওঠে—'এটা কী ভাল হল পুলকদা?'

হরির মুখে রক্তাক্ত। তার দুহাত সর্ব শরীর যেন অসাড়। মুহূর্তে এত পরিবর্তন মানুষেরই সম্ভব বোধহয়। পুলকের হাতে সে এখন বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মত কাঁপছে। পুলক সাবধান করে দেয়— 'খুব ভালো হয়েছে। অনেকদিন থেকেই তোর বাড় বেড়েছে হরি, আর কখনো যদি এদিকে পা বাড়িয়েছিস তাহলে তোর জান আমি কয়লা করে দেব। পল্টুর গায়ে যদি হাত পড়ে, সে যেই হোক আমি তাকে ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।—যাহ—' বলে সজোরে তাকে যেন মুখ থেকে উগড়ে দেয় পুলক। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন একটা স্বপ্ন চাক্ষুষ করতে থাকে রাখী। টলতে টলতে একবার জ্বলন্ত চোখে পল্টুকে দেখে হরি চলে যায়। এসময়ে মেয়ের বাবা ছুটে এসে পুলকের দুহাত জড়িয়ে ধরেন, কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন —পুলকবাবু আপনি এর একটা বিহিত করে দিন আমার মেয়ে মিনু নাবালিকা, তাকে ফুসলিয়ে এই পশুটা রেজিস্ট্রি করেছে—আপনি বিচার করুন—'

হাতের থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে পুলক—'বাজে কথা ছাড়ুন অবিনাশবাবু, নিজের মেয়েকে আগে সামলাতে পারেন নি? এখন কাঁদুনি গাইলে কী লাভ?'

এ সময় মিনু ফুঁসে ওঠে—বাবার দিকে তীব্রচোখে তাকিয়ে বলে—'আমার বয়েস হয়ে গেছে—'

সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ বিকৃতমুখে তেড়ে ওঠেন— 'চুপ কর হারামজাদী—'

পুলক তাকে সাবধান করে দেয়— 'মেয়েদের সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলতে নেই অবিনাশবাবু। দিন পাল্টে গেছে, আপনাদের দিন আর নেই—'

এবারে উত্তেজিত হয়ে অবিনাশ বলেন— "আমি পুলিশে খবর দিয়েছি — এর হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব আমি"—

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে পুলক— 'ওসব পুলিশ ফুলিশ দেখাবেন না অবিনাশবাবু, পুলিশের আটঘাট আমার জানা আছে। ও নিয়ে হুজ্জুৎ করতে গেলে কিন্তু মারা পড়বেন আপনি বলে দিচ্ছি—'

'গায়ের জোরে যা খুশি তাই হবে? আচার বিচার বলে, ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই?'—অবিনাশ যতটা রুষ্ট হতে চান ততটা যেন হতে পারেন না। তার চোখমুখ আগাগোড়াই রক্তবর্ণ।

পুলক বেপরোয়াভাবে বলে—'তা তাই হবে। আপনার মেয়েকে জিগ্যেস করেছেন সে যেতে চায় কিনা।'

মিনু পল্টুর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে দৃঢ়ভাবে বলে—'আমি যাব না।'

'যাবি না। এত তেজ, বুঝবি একদিন বাবা মা যে কী জিনিস একদিন বুঝবি, কিন্তু সেদিন আর সময় থাকবে না বলে দিচ্ছি, নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হবে—' বলতে বলতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অবিনাশ একবার অসহায়

চোখে সবার দিকে তাকিয়ে দেখে, যেন কোন না কোন মানুষের সহানুভূতি তিনি চান এই মুহূর্তে; কিন্তু সকলে উদাসীন। অবসন্ন কণ্ঠে অবিনাশ বলেন—'একটা অপোগণ্ড বেকার বখাটে ছেলে—কী আছে ওর ভেবে দেখে-ছিল?' কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই, একজন প্রৌঢ়ের এরকম আক্ষেপ হতাশায় মেশানো বিষণ্ণ মূর্তি এবং হয়তো সে মুহূর্তে সকলেই করুণার চোখেই তাকিয়ে তাকে দেখে। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি—তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর—' অপ্রস্তুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেই দ্রুত পায়ে হনহনিয়ে চলে যান অবিনাশ। উঠোনের ভেতর দিয়ে বাড়ির বাইরে।

লোকজন কমতে শুরু করেছে। আহত পল্টুকে তার মা এবং মিনু ও ভাইবোনেরা ধরাধরি করে নিয়ে যায় বারান্দার দিকে। প্রায়-শূন্য উঠোন থেকে রাজার ভঙ্গিতে চারদিকে তাকায় পুলক। বস্তুতঃ কৌতূহলী দর্শকরা এখন এই সুপুরুষ বীরকেই দুচোখ ভরে দেখছিল। রাখীও দেখছিল। সে উঠোনের আলো-আঁধারে দাঁড়ানো তার দাদার উদ্ধারকারীর দিকে এতক্ষণ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বিভুর পাশ কাটিয়ে রাখী এগিয়ে গিয়ে বলে—'ভাগ্যি আপনি এসে পড়েছিলেন, নাহলে কী যে হত দাদার, ওকে হয়তো মেরেই ফেলত আজ!'

পুলকের দুঠোঁটে যুদ্ধজয়ের মৃদু হাসি—'পল্টুটা যদি আরেকটু আগে গিয়ে আমায় খবর দিত তাহলে এত কাণ্ড হত না।' —পুলক যেন আরো খানিকটা আগে না আসার জন্য অনু-তপ্তও বোধ করে।

রাখী অবাক হয়ে বলে—'দাদাই আপনাকে খবর দিয়েছে?'

'হ্যাঁ'—পুলক রাখীর দিকে তার সুন্দর চোখে তাকিয়ে বলে—'অবশ্য অবিনাশবাবু যে হরিদের নিয়ে আসছে সে খবর আমি আগেই জানতাম।'

কৃতজ্ঞতায় রাখীর দুচোখ ভারী হয়ে আসে। সে কী বলে এই যুবককে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারে না।

'আপনারা খুব ভয় পেয়ে গেছলেন তাই না?'—পুলক মৃদু হাসে। তারপর পল্টুর দিকে তাকিয়ে বলে—'ওকে এক-বার কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত বোধহয়।'

পল্টুর বাবা হিতেন বলে ওঠেন—'না না আর ডাক্তার ফাক্তারের দরকার নেই। ডেটল-টেটল লাগিয়ে দিলেই হবে। ওর কিছু শিক্ষা পাওয়াই উচিত—' হিতেনের কণ্ঠভরা ক্ষোভ বিরক্তি। কিন্তু হাজার হলেও তিনি যে পল্টুর জন্মদাতা একথা হয়তো ভুলতে পারেন না। ফলে তার মুখেও প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতা পুলকের প্রতি। এছাড়া পুলকের পরিচয় তার অজানা নয়, এ শহরের অবস্থাপন্ন লোক দিবাকর ঘোষের ছেলে সে। শুধু তাই নয়, পুলক নিজগুণেই খ্যাতিমান! সে খ্যাতির সঙ্গে সুনাম দুর্নাম মেশানো। ফলে একই সঙ্গে ভয় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি ব্যস্ত হয়ে বলেন—'আপনি গিয়ে বারান্দায় বসুন না, আপনার আরেকটু থাকা দরকার। বজ্জাৎ ছেলে-গুলো—'

পুলক তার সুগঠিত দেহের দৃপ্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে খাপ-খাওয়া সুরেলা নম্র গলায় বলে—'আপনি, আমাকে মেসোমশাই আজ্ঞে আপনি করবেন না, তুমিই বলবেন—'

হিতেন সম্মানিত বোধ করেন, বেশ আপ্লুত গলায় বলেন—'ভয় পাই বুঝলে—যা দেখছি চারদিকে—'

পুলকের কণ্ঠে অভয়ের পরিমিত হাসি।

রাখীর অস্থিরতা স্পষ্ট ধরা পড়ে, সে কী বলবে, কী করবে যেন ভেবে উঠতে পারছে না। এতক্ষণ দমবন্ধ উত্তেজনা ভয় ত্রাসে তার মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ ফুলের মত কুঁকড়ে গিয়েছিল। অথচ এখন সহসা যেন নির্ভয়তার মত ভরসার মত সুবাতাস পেয়ে তার সমস্ত শরীর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ মৃদু লজ্জা সংশয় এখনো তার শরীরে ছায়া বিস্তার করে আছে। বারান্দায় স্থির দাঁড়িয়ে এসব নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে যায় বিভু। মানুষের ভেতরে যে আলো জ্বলে হাড়মাংসখাকের সাধ্য নেই তাকে আড়াল করে, রাখীর ভেতরে কে যেন আজ আলো জ্বেলে দিয়েছে—এরকম ভাবতে বিভুর একটুও সময় লাগে না। রাখী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার দুচোখের দৃষ্টি আজ একেবারে অন্যরকম। কীরকম তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। রহস্যময় লাগে রাখীকে, সে অস্থির, চঞ্চল। একটা কোন নতুন অজানা রাস্তার মুখে এসে পড়লে বোধহয় মানুষকে এরকম লাগে।

এসময় দূর থেকে পল্টু চেঁচিয়ে বলে—'পুলকদাকে বসতে দে রাখী।'

সঙ্গে সঙ্গে পুলক বলে—'ও তুমি পল্টুর ছোট বুঝি?'

রাখী হেসে বলে—'কেন আমাকে বড় দেখায় নাকি?'

'না, তাহলে তো তোমাকে তুমি করে বলতে পারি—' পুলক খুব সপ্রতিভতার সঙ্গে বলে।

'তাই বলবেন'—রাখীর মুখের ওপর যেন একটা অদৃশ্য স্বচ্ছ ঘোমটার মত লজ্জা। সে আরো বলে—'চলুন বারান্দায় বসবেন।' রাখী আগে আগে আসে যেন একটা পথভ্রষ্ট অন্ধকে রাস্তা পার করে দিচ্ছে সে। অনুগামী পুলক নিশ্চিন্ত আস্থায় উজ্জ্বল। হঠাৎ বিভুর মনে হয় এ দুজনকে বেশ লাগছে একসঙ্গে।

'বসুন'—চেয়ার দেখিয়ে দেয় রাখী, বলে, 'আমি চা করে আনছি।'

'না না আবার চায়ের কী দরকার?' —পুলকের কথায় নিষেধ নেই—বরং উৎসাহই রয়েছে।

'একটু তো চা খান না, কতক্ষণ লাগবে?' মৃদু হাসে রাখী নত চোখে তাকিয়ে। হাসির বিনিময়ে পুলক এ দাবী মেনে নেয়।

ঘরে চলে যাবার আগে বারান্দায় বিজলী আলোয় বিভুকে চোখে পড়ে রাখীর। কিন্তু খানিক আগে তার মুখ যেরকম অভিব্যক্তিহীন পাথরের টুকরোর মত হয়ে গিয়েছিল এবার তাতে করুণ বিষাদের ছায়া বোঝা যায় আর কিছু না। কোন কথাও সে উচ্চারণ করে না। তার নির্বাক চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ স্পষ্ট হয়, শাড়ির সঙ্গে পায়ের ঘর্ষণজনিত শব্দে তাচ্ছিল্য বিষের মত ছুটে আসে। বিভুর বুকের ভেতর তরঙ্গহীন সরোবরে অজস্র বুদ্বুদ ফুলে ওঠে ফেটে পড়ে।

'আমাকে ভুল বুঝো না রাখী—একথা তার কণ্ঠার কাছে পাক খেয়ে ওঠে, সে পা বাড়াতে যায়, আর তখনই পুলক হাত বাড়িয়ে দেয়—'আরে তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী করছিস, দেখিইনি এতক্ষণ?' ঘোর কাটিয়ে কিছু বলার আগেই পুলক খিকখিক করে হাসে—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলি?'

কথাটা তার কানে যায় না, কারণ আলোতে তখন বিভু পুলকের হাতে রক্তের দাগ খুঁজছে, বিকেলে পানুর মুখ ফাটিয়ে তার হাতে যে রক্ত লেগে-ছিল সে রক্ত কী এখনো সিঁদুরের টিপের মত লেগে নেই?' রোমশ পেশী-ময় মুগুরভাঁজা হাত পুলকের যেকেউ মুগ্ধ হতে পারে, কিন্তু বিভুর ভুরু বেঁকে যায়। রাখীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে গিয়ে রাখীর হাত ছুঁয়ো তোমার এহাতে ছুঁয়ো দিও না পুলকদা'—একথা শব্দহীনভাবে তার ভেতরে উচ্চারিত হয়। আর তার দুচোখে সকাতর অনুনয় ফুটে ওঠে।

॥ ৪ ॥

দুদিনেও বৃষ্টির বিরাম হল না। পাহাড়ী বর্ষা বিরামহীন ঝরে যাচ্ছে, ঘনঘোর মেঘের জ্বালায় কালচে হয়ে উঠছে সমস্ত দৃশ্যাবলী। ঘর বার করতে বিভু বার বার, জানলা দিয়ে দূরের উচ্ছৃঙ্খল নদী দেখে। শূন্য ঘর

আলো শূন্য মনে হল তার। এরকম বাদলার দিনে আগে কতবার রাখী এসেছে। তার ঘর তখন যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে রাখীর উজ্জ্বল হাসির শব্দ একাকার হয়ে দুরন্ত তরঙ্গ তুলেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিভু বার বার কল্পনা করে—এখনই রাখী আসবে, তার পায়ে জল মাড়ানোর শব্দ, বৃষ্টি আড়াল করবার জন্য সে হয়তো শাড়ির আঁচল দু'হাতে তুলে ধরবে মাথার ওপরে ঘোমটার মত, শুধু বৃষ্টির ফোঁটা সাদা পুঁতির মত লেগে থাকবে তার ভুরুতে, নাকের ডগায়—তার মুখে খুশির হাসি।

কিন্তু রাখী আসে না। প্রতারক কল্পনা বিভুকে বাধ্য করে। ভোর থেকে হাওয়া শীতল বলে বিভু রাখীর সোয়েটারটা পরে আছে। যদি রাখী এসে পড়ে তাহলে কী খুশি হবে না রাখী? বিভু এগিয়ে গিয়ে বলবে—'দেখ রাখী, তোমার সোয়েটার পরেছি।'

রাখীও কী এমনি ঘর বার করছে? কী ভাবছে সে এখন? কার কথা? নাকি সে এমন বাদলায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে? এ বৃষ্টি না থামলে কী তার ঘুম ভাঙবে না?

কে জাগাবে তাকে তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে? পুলকদা? পুলকদা কী জানে কী করে জাগাতে হয়? যদি পুলকদা পারে তো জাগিয়ে দিক রাখীকে; রাখী যদি পুলকদাকে ভালবাসে তো বাসুক। রাখী যদি এতে সুখী হয় তো বিভুরও তাতেই সুখ। কিন্তু আর যা হও রাখী, তুমি যেন কাকিমার মত হয়ে যেও না—সিঁদুর মত যেন তোমাকে না হতে দেখি—সে নারীর মত যেন তোমাকে না হতে হয়। পুলকদাকে আমার ভয় হয় রাখী—অনুমানে কত কথাই বিভু বলে যায়। ওদিকে তার বাগান ধরে যাচ্ছে বৃষ্টি-ধারায়—ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে, ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে, রজনীগন্ধার ঝাড় পড়েছে নুয়ে—

মমতায় টনটন করে বিভু: কাছে গিয়ে সঠিক ঝাড় দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার ক্লান্ত লাগে, কোন উদ্যম সে অনুভব করে না। যেমন সে যাই যাই করেও রাখীর কাছে যায় নি। যে রাখী নিজেই আসে, আসত প্রতিদিন, সে যেন ডেকে বলেছে—'পরে এক সময় এসো বিভুদা—এ তো ডাকা নয়, একথা বলে তাকে কী তাড়িয়ে দেয় নি রাখী? সে যাবে না। বরং এমনি বৃষ্টি ঝরে যাক, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—দীর্ঘকাল ধরে অবিশ্রান্ত—

কিন্তু তবু এক সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃষ্টি থামে; তখন অপরাহ্ন। পৃথিবীর মাটি থেকে সিক্ত শরীরের গন্ধের মত গন্ধ আসে। গাছপালা বিবর্ণ বেদনাতে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে কোদাল নিয়ে বিভু বাগানের মাটি কেটে দেয়—সঞ্চিত জল বেরুবার পথ। তখন পশ্চিম আকাশে অদ্ভুত মেঘের পাড় উজ্জ্বল রূপালি হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রবাসের পর যেন পৃথিবীতে ফিরে আসে সূর্যালোক।

মৃদু উষ্ণ সে রোদ গায়ে মেখে পাখি ওড়ে, মানুষ বেরিয়ে পড়ে পথে, সবুজ পাতা টান করে দেয় নিজের শরীর, পিঁপড়েরা নবোদ্গত ডানায় প্রথম পৃথিবীর মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে ওঠে।

একটা অবিশ্বাস্য শব্দে সহসা বিভু উৎকর্ণ, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়, তার অনুমান, মোটর গাড়ির হর্ণের শব্দ। কোদাল হাতে সে স্থির, ক্রমে তার শরীর ঘর্মাক্ত, হাতে পায়ে কাদা, বুকের ভেতরে বেশী হাওয়া টেনে নেয় সে। ফের যান্ত্রিক শব্দ—ফের হর্ণের আওয়াজ। সে ফের কোদাল ঊর্ধ্বে উদ্যত করে।

ঠিক এসময় বিভু অবাক হয়ে দেখে রাখী আসছে, তারই ঘরের পাশ কাটিয়ে, বকের মত পা ফেলে ফেলে। 'এই বিভুদা—' রাখী ডাকে আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। রাখীর শরীরে আকাশী রঙের শাড়ি, তার চোখমুখে খুশীও নয় গাম্ভীর্যও নয়। তবে তার সাজটা নতুন। কেমন আলো সারা শরীরে।

বিভু বিনাবাক্যে এগিয়ে আসে। সে শুধু রাখীকে দেখে—রাখীকে অন্যরকম লাগে।

'কী ব্যাপার, যেতে বলেছিলাম গেলে না যে?' রাখী সোজাসুজি তাকায়।

'তুমিও তো একবার আসতে পারতে—' বিভু কোদাল নামিয়ে রাখে।

'এখন চল—'

'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে—আমি যেখানে যাব'—

'কোথায় যাবে?'

'জানি না—স্বর্গেও যেতে পারি পাতালেও'—

বিভু হাসে—'অতদূর?'

'তাড়াতাড়ি চল'—

'বাগানের জল সরিয়ে দেয়া দরকার যে আমার, বেশীক্ষণ জল দাঁড়ালে গাছের গোড়া নরম হয়ে যায়—দেখছ না সব হেলে পড়ছে'—

'পড়ুক। আমার চেয়ে তোমার গাছও বেশী হল?'

'তুমি তো ঠিক দাঁড়িয়ে আছো রাখী, এরা যে পড়ে যাচ্ছে—বেশীক্ষণ জল দাঁড়ালে শেকড় পচে যাবে—একটু দাঁড়াও রাখী—প্রায় শেষ হয়ে এসেছে'—বলেই বিভু কোদাল হাতে তোলে।

রাখীর মুখটা বিষণ্ণ হতে হতে শক্ত হয়ে যায়। সে বলে—'দাঁড়াও বিভুদা, একটা কথা বলবে ঠিক ঠিক?'

'কোনদিন তো মেঠিক কথা, মিথ্যে কথা বলিনি রাখী'—

'তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে বল তো আমাকে তুমি ভালবাস কিনা'—রাখীর দৃষ্টি মলিন মেঘের মত।

বিভু কী বলবে—এতবড় কথার উত্তর কী করে দেবে বিভু? একথা কী এতদিনে রাখীকে প্রশ্ন করে জানতে হবে? রাখীকে ভাল না বাসলে সে কী করে বেঁচে আছে? তবু এই সজল অপরাহ্নে চারিদিক যখন অবসাদে ভার হয়ে আছে, যখন নরম আলো এসে পড়ছে ওপর থেকে তখন বিভু আজ উচ্চারণ করবেই সে কথা যা সে কোনদিন করেনি। সে স্পষ্টস্বরে বলে—'বাসি।'

এসময়ে আবার রাস্তার দিক থেকে হর্ণের শব্দ আসে।

রাখী বলে—'পুলকদা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, তুমি চলো বিভুদা'—

'আমি যাব?'

'হ্যাঁ যাবে, এখন থেকে আমি যেখানে যাব তুমি সঙ্গে যাবে বিভুদা, যাও হাত ধুয়ে এসো'—

'তোমরা বেড়াতে যাবে আমার যাবার কী দরকার রাখী?'

'দরকার আছে, তুমি বুঝবে না বিভুদা, চল—যাও বলছি'—

রাখীর কথা আদেশের মত শুধু নয়, তার বিপন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভু অবাক। তবু বিভু হাত পা ধুতে যায়, বাগানেরই সঞ্চিত জলে।

লালরঙের গাড়ি। যেন একটা চাতক পাখি ডানা বন্ধ করে অপেক্ষায় আছে যেকোন সময়ে উড়ে যাবে। ভেতরে পুলক বসে, অন্যমনস্ক, সিগারেট টানছে; কেমন যেন গম্ভীর, একবার তাদের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। বিশেষ করে যেন বিভুকে ভ্রূ-কুঁচকে লক্ষ্য করল সে। গায়ে একটা গাঢ় বেগুনে রঙের গেঞ্জি, পুলকের কালো চাপা প্যান্ট পরনে, চুল লম্বা হয়ে ঘাড় ছুঁয়েছে, বলিষ্ঠ কাঁধ—সবল শরীর, এমন সুন্দর চেহারা কোন পুরুষ মানুষের চোখে পড়ে নি কখনো বিভুর। শুধু পুলকের চোখ দুটো কেমন, বিভু ভাবতে পারে না মনে হয় চোখের আড়ালে আরেকটা লোক আছে যাকে বিভু চেনে না; অথচ ভয় পায়। গা শিউরোয়।

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিভু রাখী দুজনেরই গা ছম-ছম করে। জীবনে এত কাছের থেকে তারা কেউই গাড়ি দেখেনি। উপরন্তু এ গাড়ির ভেতরে তারা ঢুকবে, এ গাড়ি চলবে, দুজনেই উত্তেজিত। পেছনে বাইরের বারান্দায় কাকিমা দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্মিত; তাঁর তার দৃষ্টি যেন স্বপ্নের মত গাড়িতে আটকে রয়েছে।

রাখী গাড়ির দরজার কাছে আড়ষ্ট; বলে 'পুলকদা দরজা খুলে দাও—'

'খোলাই আছে হাতল ধরে নীচে টানো—'

'দূর বাবা ভয় লাগে—ও আমি পারব না—

'বি স্মার্ট'—বলে পুলক স্টিয়ারিং-এর বাঁ পাশে ঝুঁকে পড়ে বাঁ দরজা খুলতে যায়।

রাখী বলে—'আমি আর বিভুদা পেছনে বসব'—

'কেন?'—পুলকের গলায় বিস্ময় নয় প্রতিবাদ।

'পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাব কে কী ভাববে'—রাখী সংকুচিত।

'পাড়া তো কী আছে—তুমি আমার গাড়িতে যাবে তো কার বাবার কী?'

রাখীর চোখে শাসন—পুলক গ্রাহ্য করে না। রাখী বলে— 'ঠিক আছে খানিকটা গিয়ে তারপর সামনে বসব—এখন পেছনে বসি'—

'না, এখানেই বসবে, এখনি—' বলে সবল হাতে দরজা খুলে দেয় পুলক। 'এসো'—সমস্ত শরীরে অনিচ্ছা, তবু অনন্যোপায় রাখী বিভুকে ঠেলে দেয়—'যাও বিভুদা তুমি আগে ওঠো—'

'বিভু এখানে কেন, বিভু পেছনে বসবে—যারে—' বলে নেমে পড়ে পুলক, পেছনের দরজা খুলে বিভুকে প্রায় ঢুকিয়ে দেয়। রাখীর পিঠেও হাত রাখতে যাচ্ছিল তার আগেই রাখী ভারী বোঝার মত ঝুপ করে সামনের সিটে বসে পড়ে। ঝটাং শব্দে দরজা বন্ধ হয়। তারপর ভেতরে ঢুকে পুলক চাবি ঘোরায়—গরগর করে ওঠে গাড়ি একটা জন্তুর মত। বিভু মুগ্ধ। পাড়ার কচুকাঁচা ভীড় করে আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা এধার ওধার ছিটকে যায় সভয়ে।

বাড়িঘর লোকজন ল্যাম্পপোস্ট গাছ-গাছড়া সব দল বেঁধে পেছনে ছুটেছে হু হু করে। এইসব স্থাবির জিনিস-গুলোকে এমন চলন্ত দেখে বিভু অবাক হয়ে যায়। এরকম অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। ক্রমে শহর ফুরিয়ে আসে, ন্যাশনাল হাইওয়ে—দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে বহুদূরে—গতি বাড়ে—হু-হু করে বাতাস চুল উড়িয়ে দিয়ে যায়—রাখীর ত শাড়ীর প্রান্ত উড়ছে—গতির উল্লাস রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। বেদনায় মন তন্ময় হয়ে যায়। দুপাশে মোড় ফিরতেই মনে সেই ছেলেবেলার ফুটবল মাঠ চোখে পড়ে বিভুর—একদিকের গোলপোস্ট নেই এখন। অন্যমনস্ক বিভুর বুকের মধ্যে একটি ছোট্ট বালক হঠাৎ যেন দীর্ঘকাল পরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সামনে অচেনা নতুন একটা আস্ত পৃথিবী দেখে সদ্য ঘুমভাঙা চোখে।

'কী এত চুপচাপ, কথাটথা বল?'—পুলক আড়চোখে রাখীর দিকে তাকায়। কী কৌশলে সে সিগারেট ধরিয়ে খায়—বিভুকে বলে—'কীরে দামী সিগারেট খাবি নাকি?'

'না, খাই না।'—ঘুমভাঙা গলা বিভুর।

'তোর রাখী যে বোবা হয়ে গেল রে বিভু? বেশ জমেছে শালা গাড়িতে একটা বোবা'— সম্পূর্ণ ঠাট্টা নয়—ঠাট্টার আড়ালে বিরক্তি।

এতক্ষণে রাখী মুখ খোলে—'কী যে আজেবাজে কথা বল সবসময়'—

'এই ত বেশ কথা ফুটেছে—' হা হা করে পুলক হাসে—'মেয়েরা ঝগড়ার কথা পেলে কিছুতে ছাড়বে না—'

'মেয়েদের সম্বন্ধে তো তুমি খুব জানো দেখছি—' রাখীর চোখ বাঁকা।

'জানিই তো, কীরে বিভু ঠিক বলিনি? তুই কী ঘুমুচ্ছিস নাকি রে—' বলে বাঁহাতে হোমজ মারার ভঙ্গিতে পুলক বিভুর হাতে আলতো খোঁচা মারে—

'না ঘুমোব কেন, জানো পুলকদা, খুব ভাল লাগছে—এতজোরে কখনো ছুটিনি—'

'একী তোর নৌকো রে—এ হচ্ছে অটোমোবাইল—কত দাম জানিস?'

বিভু বলে 'কত পুলকদা?'

পুলক হেসে বলে—'বিশ হাজার।'

'আরেকটু আস্তে চালাও'— বিপজ্জনকভাবে একটা গরুর গাড়ির পাশ কাটালে রাখী বলে।

'মেয়েদের সব তাতেই ভয়'—পুলক আসলে একথাটা বললেও সে অন্যকিছু বোঝাতে চায়। আড় চোখে তাকায় রাখীর দিকে।

বিভু হঠাৎ একটা মেয়ের নাম মনে করতে চেষ্টা করে ধীরেশ বলেছিল—কী নাম যেন—বাব—বাবলি? সে মেয়ের কী ভয় ছিল?

রাখী খুব আস্তে বলে—'সবারই একটু ভয়ডর থাকা ভাল।'

'তাই নাকি।' পুলক হাসে। তারপর তার বাঁহাতটা তুলে দেখিয়ে বলে—'এই দেখেছ, ভয়ডর থাকলে আর আজ গাড়ি চাপা হত না—'

এতক্ষণে ওরা দুজনে লক্ষ্য করে পুলকের বাঁহাতের তালু ঘিরে একটা রুমাল বাঁধা।

'কী হয়েছে।'—রাখীর গলায় চাপা উদ্বেগ।

'গ্যারেজের তালা ভাঙতে গিয়ে লেগেছে—ও কিছু না'—পুলক কৌতূহল উড়িয়ে দেয় সহসা পায়রার সামনে খুদ ছেটানোর মত করে।

'তালা ভাঙতে গেলে কেন?'

'তালা ভাঙবে না—বাপ আমার হাতে কিছুতে গাড়ি ছাড়বে না—আমাকে যেন ওর চায়ের গুদোমের মজুর পেয়েছে মাইরি; বলে গাড়ি পাবে না, আমিও ছাড়ব না. তারপর তো রেগেমেগে গিয়ে তালা খোলাল ড্রাইভারকে দিয়ে. আমিও শালা ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে লম্বা করে ফেললাম। আর এটা—' গাড়িতে ঝোলানো চাবিটা দেখিয়ে পুলক বলে—'এটা নিয়ে পালাচ্ছিল সিন্দুকে রাখবে বলে—দৌড়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছি—'

'বাহ্‌, বেশ করেছ!' রাখী ভুরু কুঁচকে তারিফ করে বাঁকা স্বরে।

পুলক ঠোঁটটিপে হেসে বলে—'তোমার জাস্টিস অনুযায়ী—বুঝেছ দেব্‌, আসলে সকাল বেলাই আমার ওপরে খচে গেছে। বলতে গেলাম একটা ছেলেকে চাকরী করে দিতে হবে গুদোমে—অমনই খেপে উঠেছে—'

'কে?' উদ্বিগ্ন গলায় রাখী—'লোকটার চাকরী হবে না?'

'হতেই হবে; কিন্তু বাপ বাগড়া দিচ্ছে. দুঃখেই বলে এটা অফ সিজন, বর্ষাকাল—যারা কাজে আছে তাদেরই বসিয়ে রাখতে হবে এখন, নতুন লোকটোক নেয়া যাবে না—'

একটা রোডের টার্নিং-এ এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে মন্থরগতিতে। সেদিকে তাকিয়ে রাখী বলে—'দাদার চাকরীর জন্য তোমাকে অত ঝামেলা করতে হবে না।'

'ঝামেলা না করলে কোনকিছু হয় না আজকাল। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না রাখী। চাকরী না দিয়ে ও যাবে কোথায়—ওর বাপ দেবে—'

'ছিঃ নিজের বাবার নামে ওরকম করে বলে নাকি কেউ?'—রাখীর মুখের ওপরে যেন [illegible] পড়েছে এমন ভঙ্গিতে সে [illegible]

'দুজন বাপ হ'ল বলতে হয়—' [illegible] গলা—'আমাকে বুড়ো টাকা কামাচ্ছে কিন্তু আমাকে ভয়—যেন আমি সব গিলে খাব—' ফস্‌ করে পুলক লাইটার জ্বালায়, সিগারেট ধরিয়ে নেয়।

'নিশ্চয়ই সে ভয় করেন তোমায় বাবা তোমাকে দিয়ে—তাঁর কথা মত চলতেই পারো—' রাখীর কথায় পুলক সামান্য হাসে। গেট খুলে যায়—ফের গাড়ি ছুটতে থাকে। পুলক বলে 'শোনো রাখী, আমি আছি বলে ওই গুদাম এখনো টিঁকে আছে বুঝেছ? নাহতো এতদিনে উঠে উঠত, কিন্তু বেইমান সেকথা মনে রাখে না—'

'কেন তুমি চালাও নাকি গুদাম?'—রাখী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। বিভু রাস্তার পাশে দিগন্তবিস্তারী মাঠে থইথই জল দেখে। সে ভাবে পৃথিবীটা কত বড় জায়গা।

'চালাই না, কিন্তু আমি না থাকলে অচল হয়ে যেত. ওই মজুরগুলো—ন্যাংটো হাভাতের দল, ওগুলো তো প্রায়ই ঝামেলা লাগায়। তখন বাপটি আমার, জোড় পলিটিসিয়ান, ব্যায়ামাগারের বন্ধু-বান্ধবদের ডাক—'ফিস্ট' খাওয়াবার নাম করে—ইনস্ট্রুমেন্ট কেনার নাম করে ঘুষ দেয় আর বলে ঝামেলা মিটিয়ে দাও—তেমনরা আমার পুলকের বন্ধু—'

'আর তারা তখন গিয়ে ঝামেলা মেটায় ভাণ্ডাবাজি করে তাই না?' রাখীর কণ্ঠস্বর তির্যক। গোড়া থেকেই দুজনের মধ্যে যেন ঠান্ডা লড়াই চলছে।

'না ওদের যেতে হয় না'—সগর্বে পুলক বলে—'আমি একলাই পারি ব্যাটাদের শালাকে ঠান্ডা করতে—'

'গত বছর মোহান্তপাড়ার নরেশ চাকীকে তাহলে তুমিই পিটিয়েছিলে?' রাখী বলে। তার কথায় সহসা মুখ ফিরিয়ে হাসে পুলক।

অবাক হয়ে পুলক শ্লাঘার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?'

'আমি কেন সবাই জানে'—রাখীর কথা শেষ না হতেই উৎকর্ণ বিভু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে—'কই আমি তো কিছু শুনিনি'—

রাখী তাকে ধমক দেয় হঠাৎ রূঢ়ভাবে—'তুমি চুপ করো তো. তুমি কী করে জানবে? তুমি কোন খবর রাখো দুনিয়ার?' বিভু নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাখীর মেজাজ কী আজ ভাল নেই?

পুলক দীর্ঘ টান দেয় সিগারেটে তারপর ধোঁয়া ছাড়ে, তার মুখ ছুঁচলো হয়ে যায়।

পা দিয়ে যেন সে গাড়িতে জোর ঢুকিয়ে ঢুকতে বলে—'শালা চাকীকে [illegible] পিটিয়েছিলাম, ব্যাটার সাহস কত, আমার মুখের সামনে হাত নাচিয়ে বলে—আমরা ভিক্ষে চাইনে—এটা আমাদের দাবী, আজ বাকি বোনাস দিতে হবে, এবারে কত লাভ হয়েছে সে খবর রাখি'—

'তা ওরা কী অন্যায় করেছিল? তোমাদের লাভ হয়নি?' রাখীর নিছক কৌতূহল না প্রশ্ন বোঝা যায় না।

পুলক হা হা করে হেসে ওঠে—গাড়ি আরো জোরে ছোটে—সে বলে—'তা হয়েছে ধরো লাখ খানেকের ওপরে। কিন্তু শালাদের দাবীর শেষ নেই, বোনাস চাই—মজুরী বাড়াও, চিকিৎসার টাকা দাও, ছাঁটাই করা চলবে না, মামার বাড়ি আর কী; লাই দিয়েছ কী কুকুরের মত ঘাড়ে চড়বে—

বিভু সামনের সিটে ঝুঁকে পড়ে শুনছিল, সে গুনগুনে করে বলে ওঠে—'তোমাদের অত টাকা, ওদের দিয়ে দিলেই পায় যা চায়'—

আবার ছোবল মারে পুলক হাত দিয়ে—'তুইও কী শালা কম্যুনিস্ট নাকি রে অ্যাঁ? উপার্জন কর আর সব ওদের ঢেলে দাও—সব সমান হয়ে থাক। ওই নরেশ চাকীও এসব বুলি ঝাড়ে গলার রগ ফুলিয়ে জানিস—ঝান্ডা ওড়ায়—কথগুলো সম্পূর্ণ নতুন বিভুর কাছে, সে স্বপ্ন দেখার মত বিভোর হয়ে শোনে।

পুলক বলে—'শালাকে এমন দিয়েছিলাম না—এক মাস হাসপাতালে ছিল। ওর শাকরেদরা গিয়েছিল থানায় ডায়েরী করতে, তা বাপ আমার ধুরন্ধর লোক, থানায় আগেই ফোন করে রেখেছিল আর ও সি, ব্যাটাদের লক আপে ঢুকিয়ে দিয়েছিল'—

হঠাৎ একটা কুকুর তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে। রাস্তার পাশে নিরিবিলিতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় প্যারেটারে লেগেছে। মুহূর্তে তার যন্ত্রণার কেঁউ কেঁউ শব্দ পেছনে হারিয়ে যায়।

'এটা কী ঠিক হল?'—বিভু বেবুঝের মত প্রশ্ন করে।

পুলক বলে—'কোনটা, ওই নেড়ি কুত্তাটাকে চাপা দেওয়া?' ফিক-ফিক করে হাসে পুলক।

'না আমি বলছিলাম—ওই থানার কথাটা'—

পুলক এবারে সশব্দে হেসে ওঠে—'ও এই কথা, তা বাবা, তোমার মত ল্যাংড়ার বুদ্ধি দিয়ে ব্যবসা চলে না বুঝেছ? ওরকম দাতাকর্ণ হলে সব ন্যাংটা সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে'—

রাখী এতক্ষণ গুম হয়ে কী ভাবছিল সে-ই জানে, আবার রুমালে মুখ মুছে সে বলে—'কিন্তু কিছু লোক সব টাকা ভোগ করবে—আর সবাই তাদের হয়ে খেটে দেবে এটা তো চলে না—'

'তো কী সব দিয়ে দিতে হবে নাকি? তবে আর ব্যবসাটাবসা করে কী হবে?'—পুলক ফের লাইটার জ্বালে ভুরু কুঁচকে।

রাখী বলে—'এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে লাভটা সবাই পায়—একজন দুজন কেন সব পাবে'—

'ও তোমাদের কলেজেও আজকাল খুব পলিটিক্স হচ্ছে, না?' পুলক বাঁকা

চোখে তাকিয়ে হাসে—'মাস্টার টাস্টার শুনলো আজকাল খুব পালিটিকস শেখাচ্ছে'—

'হ্যাঁ হচ্ছে।'—রাখী সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট উত্তর দেয়।

'আমি মাইরি বাপের সঙ্গে এই একটা ব্যাপারে একমত—পালিটিকস করে করে সত্যি আমাদের দেশটা গোল্লায় গেল'—

'ঘরে ঘরে বেকার—খেয়োখেয়ি, আর একদল নুটেপুটে'—রাখী চুল ঠিক করতে করতে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পুলক গাড়ির গতি কমিয়ে থামিয়ে দেয় ঘচ করে।

তারপর বলে, —স্টপ ইট। অনেক হয়েছে। এখন একটু ভাল কথা বলতো—' বলেই দরজা খুলে নেমে যায়। দাঁড়িয়ে বলে—'তোমরা বসো এক মিনিট—আমি আসি।' সে এগিয়ে যায় রাস্তার ধারে, সেখানে জল জমেছে নীচুতে। উঁচুতে দাঁড়িয়ে পুলক গাড়ির দিকে পিছন ফিরে।

ভেতরে রাখী আর বিভু নিঃশব্দে বসে থাকে। বিভু শুধু দেখে—দূরে দূরে গ্রাম— নীল নীল গাছগাছালি—বাঁশঝাড় সুপুরি নারকেল—আর ঘন মেঘের দল যেন ফের বর্ষণের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিচ্ছে. সামনে রাস্তা ক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে খুব উঁচুতে একটা ব্রিজ তার ওপাশে এখন বোধ হয় সূর্য নীচে নেমে পড়েছে কমলা রঙের রোদ—সারা পৃথিবীতে নরম হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ধান ক্ষেতে পাট ক্ষেতে। পৃথিবীটা যে গোল এখান থেকে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে বিভু, সে কোন দিন এদিকে আসে নি, কোন দিন দেখেনি এই উঁচু ব্রিজ, জলময় ধানক্ষেত, নীল নীল গ্রাম, হয়তো সে ভবিষ্যতে আর কোন দিন দেখবেও না। সে তাই গোগ্রাসে এই সব দৃশ্যাবলী গিলে খায় ক্ষুধার্তের মত তার দু-চোখ দিয়ে—মনে মনে বলে— তোমরা আমাকে মনে রেখ—হে দূরের আকাশ—দিগন্তরেখা—গ্রাম গাছগাছালি, হে উড়ে-যাওয়া পাখির দল তোমরা বিভুকে মনে রেখো—সে একদিন এই উঁচু রাজপথ থেকে একটা গাড়িতে বসে তোমাদের দেখেছিল, আর চিরকাল সে তোমাদের স্মৃতি তার বুকে করে রাখবে।'

পেছনের সিটে বসে একপাশ থেকে রাখীকেও দেখে বিভু তার সাজানো কালো খোঁপা, কানের লতির ওপাশে কিছু হাল্কা পাখির পালকের মত চুল আর কমলা রোদের রেণুতে গালের ছোট্ট একটা তিলতে ভরে আছে,—বাইরের বস্তাকার দৃশ্যাবলীর মত গভীর লাগে রাখীর এই অংশটুকু। রাখীকেও তার বলতে ইচ্ছা করে—আমাকে কোন দিন ভুলে যেও না রাখী। তোমাদের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। কেন সে এমন ভাবছে সে জানে না।

হাল্কাশরীরে গম্ভীর মুখে পুলক ফিরে এসে সিটে বসে। একবার রাখীকে আর একবার বিভুকে দেখে,—তারপর বিভুকে বলে—'রাখী আমার ওপর রেগে আছে বিভু. কেন বল দেখি—'

বিভু বলে—'দূর, রাখী কেন রাগ করবে? রাখী রাগ করে না'—

'কিছু না জেনে দালালি করছিস যে—তুই জানিস না রাখী ভীষণ রাগী'—

'সত্যি রাখী?'—বিভু সামনে ঝুঁকতে গিয়ে ফের পেছনে শরীর হেলিয়ে দেয়। সিটের স্প্রিং-এ দুলতে তার বেশ মজা লাগে।

রাখী দূরে তাকিয়ে বলে—'কোথায় যাবে চল তো এখন'—

'বাহ্, সে ত তুমি বলবে—তুমি সেই আমবাড়ির অ্যারোড্রাম দেখবে বলেছিলে'

—'তো এটা কি এ্যারোড্রাম নাকি?'—রাখী সোজাসুজি তাকায় পুলকের দিকে।

বিভু সোৎসাহে বলে—'এ্যারোড্রামে এ্যারোপ্লেন দেখা যাবে পুলকদা?'

'যাবে হয়তো, একটা আধটা'—

'তবে চলো—

'কিন্তু বাবা ওদিকে রাস্তায় বোধ হয় জলটল হয়েছে—তার চেয়ে এদিকে পোকরাঝাড় চা-বাগান—যাবে? চা বাগান দেখেছিস কখনো বিভু?'—পুলক রাখীকে বাদ দিয়ে বিভুকে প্রশ্ন করে।

রাখী এবারে মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বলে—'চলো চা-বাগানই দেখে আসি'—

পুলক গম্ভীর মুখে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ফের বিভুকে বলে—'রাখী রেগে গেছে কেন জানিস বিভু? আমি তোকে সঙ্গে আনতে চাই নি বলে—'

রাখী এবারে পুলকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাসে। ... বিভু নিশ্চুপ।

পুলক বলে—'তোকে ছাড়া রাখী কোথাও যায় টায় না. তাই নারে বিভু?'

বিচ্ছু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে—হ্যাঁ রাখী আর আমি আমার বাগানে বসে গল্প করি—'

রাখী দুষ্টু চোখে বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে, চোখ ফিরিয়ে নেয়। বিচ্ছু হাসবার চেষ্টা করে।

'হুঁ'—বলতে বলতে স্টিয়ারিং ঘোরায় পুলক পেশল হাতে, গাড়ি বড় রাস্তা থেকে ডানদিকের আরেকটা পিচ রাস্তায় পড়ে।

রাখী বার কয়েক অপাঙ্গে তাকায় পুলকের গম্ভীর হয়ে যাওয়া মুখের দিকে। তারপর উচ্ছ্বাসে হেসে বলে—'এই পুলকদা, বাজে বকছ কেন, আমি রাগ করেছি?'

পুলক কোন জবাব দেয় না, মুখও ফেরায় না। তার মুখটা কঠিন দেখায়। বিচ্ছুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত উৎকণ্ঠা ঝিলমিলিয়ে বয়ে যায়।

'সেদিন কে রাগ করেছিল, মনে আছে?'—রাখী রহস্যময় মুখ করে হাসে, যেন দুজনের গোপন প্রসঙ্গ টেনে তুলছে। স্টিয়ারিং আর রাস্তা ছাড়া আর কোন কিছু যেন পুলকের চোখে বা মনে নেই, সে নির্বিকার।

রাখী সামান্য সরে আসে পুলকের কাছে তারপর ডান হাতে পুলকের বাঁ-হাতটা স্পর্শ করে সে নরম গলায় বলে—'এই পুলকদা তাকাও আমার দিকে'—

বিচ্ছুর অন্তর থেকে সব রক্ত যেন একসঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে এ দৃশ্য দেখবার জন্য। বুকটার ভেতরে টিপটিপ শব্দ সে স্বকর্ণে শুনতে পায়। তার গলা শুকিয়ে ওঠে।

'এই আমার ওপরে রাগ করেছ?'—রাখীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

তবু খানিক গুম হয়ে থাকে পুলক অবশেষে মুখ ফেরায়, দৃঢ়স্বরে বলে—'একটা কথা বলি রাখী, ওসব রাগটাগ অভিমানটভিমান আমার আসে না, ন্যাকামো মনে হয়। ছোটবেলা থেকে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি আমি। ভিক্ষে করতে আমার ভাল লাগে না—যা চাই তা কী করে কেড়ে নিতে হয় আমার জানা আছে'— কথাগুলোর সঠিক মানে বিচ্ছু বুঝতে পারে না। এ যেন অন্য ভাষা। অচেনা নদীর জলের শব্দ। কিন্তু পুলকদার ভেতরে যে রাগ আছে বোঝা যায়।

রাখী মিষ্টি মৃদু হাসে, সে বলে—'কিন্তু পুলকদা সব কিছু কী জোর করে পাওয়া যায়?'

'অবশ্য পাওয়া যায়। এমন কিছু নেই দুনিয়ায় যা জোর করে পাওয়া যায় না। সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে, তা আঙুল বাঁকাতে হয়—ব্যস, এই তফাৎ।' —পুলক বিনা কারণে হর্ন বাজায় দুবার। তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ।

'জোর করতে গেলে ফল কী ভাল হয়? এই তো দাদাকে দেখছি—কত কাণ্ড করে বিয়ে করল কিন্তু দুদিন না যেতেই'—

এসময়ে হঠাৎ পুলকের মুখটা কঠিন পাথরের মত হয়ে যায়, তার ফর্সা গালে লালের ছোপ তীব্র হয়—সে উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে—'পল্টুর সঙ্গে তুমি কখনো আমার কম্পেয়ার করবে না রাখী, আমি বলে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই, একটা হন্দ বেকার ছেনতাইবাজ নিজের একটা কাজ যোগাড় করতে পারে না। পুলক ঘোষের সঙ্গে ওর আকাশ পাতাল তফাৎ, বুঝেছ?'

রাখী সহসা চুপ। তবু তার ঠোঁটে বিনীত হাসি ফোটে, পরমুহূর্ত পরে সে বলে—দাদা ছেনতাই করে মদ খায়—ও আগে হিপিদের দলেই ছিল আমি জানি পুলকদা—কিন্তু কেন বলতো। এই ছমাস বছর আগেও দেখেছি দাদা চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, ঘরে বসে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়েছে, বাবা রাগারাগি করলে দেখেছি—দাদার চোখ টসটস করছে'—

'কাওয়ার্ড বুঝলে, সাহসের অভাব। ওসব কথা আমাকে শুনিয়ো না। ব্যাটাছেলের মত একটু সাহস থাকলে'—পুলক ঝপ করে ড্রয়ার খোলে বাঁহাতে—নতুন এক প্যাকেট সিগারেট বের করে।

রাখী বলে—বেশী সাহস দেখাতে গেলে এতদিনে ও জেলে পচত তা জানো? তোমার সঙ্গে ওর তুলনা?'

রাখী এমন পাকা পাকা কথা, এমন নতুন নতুন কথা কোত্থেকে শিখল, বিচ্ছু অবাক হয়ে ভাবে। সে মুগ্ধ চোখে রাখীকে দেখে। রাখীর সমস্ত শরীরে মুখে চোখের দীপ্তিতে অসম্ভব উজ্জ্বলতা। রাখীকে একমাত্র বিচ্ছুর সম্পূর্ণ নীরোগ সুস্থ বলে মনে হয়। আর সবাই এমন কী এত যে স্বাস্থ্যবান পুলকদা তাকে দেখেও মনে হয় তারও যেন কোন একটা অসুখ আছে। কেমন যেন অস্থির। তার মত পল্টু নয়—তবু তার চেয়েও যেন বেশী রুগ্ন। রাখীর আঁচলটা হাওয়ায় দরজার অনেকটা বাইরে চলে গিয়েছিল, রাখী অন্যমনস্ক, বিচ্ছু উঠে আঁচলটা টেনে আনে, রাখী হাত বাড়িয়ে নিজে ঠিকঠাক হয়ে বসে। বিচ্ছু বলে—'হ্যাঁ পুলকদা, পল্টুদা আগে বেশ ভাল ছিল।'

কেন কে জানে পুলক সামান্য শান্ত হয়। ভুরু কুঁচকে কীসব ভাবে। তারপর গাঢ় গলায় বলে—'আমি সোজা স্বভাব মানুষ, ওসব বাঁকা ট্যারা কথা আমি বুঝি না। তবে পল্টুকে নিয়েই তো তোমাদের এখন প্রবলেম? আমি যখন মাসিমাকে পল্টুকে কথা দিয়েছি, তখন ওর চাকরী আমি করে দেবই—কোন চিন্তা নেই।' —বলতে বলতে সে নতুন প্যাকেটটা রাখীর হাতে দেয়—'খোলো তো দেখি'—রাখীর অন্যমনস্কতা ভেঙে যায়। সে যেন ভাবনায় ডুবে ছিল। রাখী আনাড়ী হাতে সোনালী সুতো ছিঁড়ে প্যাকেট খোলে। পুলক মুখ বাড়িয়ে দেয়—দু ঠোঁট ছুঁচলো করে বলে—'একটা বের করে মুখে দিয়ে দাও তো'—

রাখী হাসে, বিচ্ছুর দিকেও তাকায়। তারপর একটা সিগারেট পুলকের মুখে গুঁজে দেয়।

লাইটার এগিয়ে দিয়ে—পুলক বলে—'জ্বালাও।'

'ও বাবা আমি পারি নাকি?'—রাখী শব্দ করে হাসে।

পুলক বলে—'ঠিক পারবে—চেষ্টা করেই দেখ না'—

রাখী দুতিনবার খটখট করে। তারপর একবার আলো জ্বলেই নিভে যায়। পরে আবার জ্বলে ওঠে—সে এগিয়ে ধরে, পুলক আনন্দিত মুখে সিগারেট ধরায়।

সহাস্যমুখে বলে ওঠে—'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম—'

নেভাতে পারে না রাখী, তার তর্জনীতে আঁচ লাগে হঠাৎ, সে 'উহ' করে উঠতেই পুলক ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়। আগুন নিভে গেলেও, বিচ্ছু অনুভব করে আগুনটা তার শরীরের ভেতরেই কোথায় যেন দপদপ করে জ্বলে যাচ্ছে।

'ঐই দেখ চা বাগান।'

রাখী এবং বিচ্ছু দুজনেই গভীরভাবে আত্মমগ্ন ছিল। পুলকের কথায় ওরা একসঙ্গে সামনে তাকায়। দুধারে ছবির মত সবুজের সমারোহ। বড় বড় ঝাঁকালো গাছ অসংখ্য লাইনবন্দী, তাদের পাতা ছোট ছোট, তার নীচে সমান করে ছাঁটা বিস্তৃত নাতিউচ্চ সবুজ ঘন পাতায় আচ্ছন্ন গাছ। পিঠে টুকরী বাঁধা—অনেকে কী যেন তুলছে—মেয়েদেরই সংখ্যা বেশী।

বিচ্ছু লাফিয়ে ওঠে—তার চোখমুখ জ্বলজ্বলে—'ওই বড় গাছগুলিই চাগাছ তাই না পুলকদা?'

'দূর শালা আংখা, ওগুলো চা গাছে ছায়া দেবার জন্য'—পুলক হাসে—'ওই যে পাতা তুলছে ওইগুলোই হচ্ছে আসল মাল, বুঝেছ—চাগাছ।'

আরো খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে জমি সামান্য উঁচু হয়ে ফের সমান। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘ শালগাছ, সবুজ সতেজ ঋজু। দু একটা ইউক্যালিপটাস গাছও দাঁড়িয়ে। নীচে সামান্য ঝোপঝাড় আকন্দ আর শটির।

ওখানে শাল গাছের তলায় গাড়ি থামায় পুলক। হাত দিয়ে দেখায়—ঐ যে কালো চোঙা আর উঁচু টিনের শেড দেখছ, ওটা ফ্যাক্টরী।' ভটভট আওয়াজ আসছে। বাঁ পাশে সুন্দর একটা উঁচু লাল বাংলোর দিকে দেখায় পুলক—'ওটা ম্যানেজারের বাংলো, তার ওপাশে বাবুদের কোয়ার্টার—আর এদিকে'—ডানদিকে খড়ের ছাউনি দীর্ঘ ব্যারাকবাড়ির মত অসংখ্য চালা, সজনে আর সুপুরী গাছের জঙ্গল কিছু মুরগী চরে বেড়াচ্ছে, জীর্ণ ঘরগুলোর দিকে হাত দেখিয়ে পুলক বলে—'ওগুলো হচ্ছে কুলিমজুরদের বস্তি—এরা 'লাইন' বলে।'

পেছনে ঘন গাঢ় কালো মেঘ জমে আছে। সন্ধ্যা হয় হয়। পাখিরা ডাকছে অসংখ্য। টিয়ের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। বিভু মুগ্ধ হয়ে দেখে। পুলক তাকে আবার ঠোকর মেরে বলে—'এই দেখেই ট্যারা? শরৎকালে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দারুণ সুন্দর দেখা যায়।'

এমনভাবে পুলকের দিকে বিভু তাকায় যেন পুলকই কাঞ্চনজঙ্ঘা। পুলক হেসে বলে—'আর কী এখন নেমে পড়—নেমে ভাল করে দেখ?'

পুলক নেমে সামনে পেছনে দুদিকের দরজাই খুলে দেয়। গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কুলি লাইনের দিক থেকে কিছু কাচিকাচা শীর্ণ ন্যাংটো আধাল্যাংটো শিশু ছুটে আসে।

নেমে বিভু আরো মুগ্ধ হয়ে যায়—পুবে ডানদিকে দূরে নদী—নদীর ওপারে ডাঙায় জাল আর ঘাটে নৌকা, কিছু খড়ের বাড়িঘর দেখে তার অনুমান হয় জেলে বস্তী। তার অন্ধকারে কথা বলা—জেলেটা হয়তো এখান থেকেই যায়। বস্তির ওপাশে গভীর বনবন। শালবন ইতস্তত কিছু খয়ের গাছ। বিভু বলে—'আচ্ছা পুলকদা, এই নদীটাই আমাদের ওদিকে গেছে?'

'ইয়েস স্যার—ওই যে নৌকো দেখছিস না—জেলেবস্তি—'।

কিছু লোক মিলে একটা নৌকো সারাচ্ছে ডাঙায়, বিভু ভাবে তার নৌকোটা কত পুরোনো হয়ে গেছে, জল ওঠে, বারে বারে সেঁচতে হয়—এক দিন সে উজিয়ে এখানে চলে আসবে, মেরামত করে নিয়ে যাবে। নদী এই ক'দিনের বৃষ্টিতে কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে—চওড়া হয়ে ছুটে যাচ্ছে পাড়ের দিকে। ভারী বুনো মোষের মত বেপরোয়া।

'কাছাকাছি এত সুন্দর স্পট আছে জানতামই না কোন কিছুই দেখিনি আমরা'—রাখীরও যেন ঘোর লেগে গেছে বোঝা যায়। তার কণ্ঠস্বর সুরেলা—সামান্য ভারী, ঘুম থেকে জেগে কথা বললে এমন হয়।

'আরো কত জায়গা আছে, একদিন গরুবাথান নিয়ে যাব তোমাকে, আর তিস্তার ওপারে লাটাগুড়ি ফরেস্ট দেখলে স্রেফ ঘাবড়ে যাবে, জলঢাকা গেলে তো ট্যারা।'—বলে পুলক ট্যারা হবার ভঙ্গি করে। সবাই হেসে ওঠে। কিছু পায়রা মাটিতে কী সব খুঁটে খাচ্ছিল, তারা সব হঠাৎ উড়ে যায়।

কাচিকাচাগুলোও সেই দেখে হেসে ওঠে। রাখী হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকে। ওরা স্থির অবিশ্বাসী চোখে দেখে নড়ে না। ওদের গায়ে এসে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে জমছে, দেখেই বোঝা যায় চুলে ওদের তেল পড়ে না, এদের কেউ যত্ন নেয় না—আধপেটা খাওয়া চেহারা—শুধু চোখগুলো ঝকঝকে—এখানে ওখানে বেড়ে-ওঠা আগাছার মত। এসময়ে রাখীকে পেছন থেকে পুলক চুম্বকের মত চোখে আগাগোড়া দেখছিল। হাতে চাবির চেন ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলে—'চলো একটু নদীর ধার থেকে ঘুরে আসা যাক—এদ্দূর যখন এলাম—'

রাখী পুলকের দিকে তাকিয়েই—ফের বিভুকে খোঁজে—সে খানিকটা দূরে ঢেঁকিশাকের জঙ্গলে কী খুঁজছে। রাখী গলা চড়িয়ে বলে—'চলো বিভুদা, সবাই নদীর ধার থেকে ঘুরে আসি।'

ফের হাওয়া গুমোট হয়ে যায়, পুলক খরগলায় বলে—'বিভু গেলে গাড়ি কে দেখবে?'

'গাড়ি পাহারা দিতে হবে নাকি আবার? কী হবে এখানে থাকলে?' রাখীর চোখ সরু। পুলক বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে দেয় হাত দিয়ে।

রাখী বলে—'ওরা কী করবে? দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে'—

'ভাল!' —পুলক হাসে —'বিচ্ছু একেকটা, ভিজেবেড়াল সেজে আছে, যেই চোখের আড়ালে যাব হয় পাম্প খুলে দেবে নয়তো কাচ ভেঙে দেবে। বিভু, তুই তো নদী অনেক দেখেছিস—বরং তুই এই গাড়িটা দেখিস, আমরা ঘুরে আসি'—

বিভু কয়েকটা ফুলেভরা শটীর ডাঁটা হাতে নিয়ে কাছে আসে—বলে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি আছি তোমরা যাও—'

চাপা জেদী গলায় রাখী বলে—'তা হয় না একসঙ্গে এসেছি, তুমি এখানে একলা বসে থাকবে আর'—

হঠাৎ মুখ শক্ত করে পুলক বলে—'ঠিক আছে তোমরা দুজনে যাও, আমি গাড়ি পাহারা দিচ্ছি'—বলে সে রুষ্ট পায়ে গাড়ির দিকে এগোয়।

রাখী আর বিভুর মধ্যে কিছু দৃষ্টি বিনিময় হয়। রাখীর জেদী ভঙ্গি। [illegible] বিভু রাখীর কাছে আসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়; এক পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলে—'যাও রাখী।'

খুব সামান্য ছোট্ট কথা—অনুরোধ। রাখী ফেলতে পারে না কিন্তু তার মনটা আকুল হয়ে ওঠে অনেক না-বলা কথা তার কণ্ঠা অবধি উঠে আসে। তবু বলা হয় না বিভুকে।

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে সে এগিয়ে গিয়ে বলে—'চলো পুলকদা বিভুদা থাক।'

'না তোমরা দুজনে যাও।'—পুলক আপাত নির্বিকার।

'এস পুলকদা'—বিভু গিয়ে পুলকের হাত ধরে টানে—'ওঠো, আমাকে বসতে দাও এখানে।'

বিভু পুলককে তুলে দিয়ে সিটে বসে পড়ে।

রাখী ততক্ষণে হাঁটতে সুরু করেছে। পুলক তার পেছনে পেছনে। শালবনের ভেতর দিয়ে গোধূলির সমারোহে হালকা আলো অন্ধকারে ওরা হেঁটে যায়। ক্রমে পুলক আস্তে এগিয়ে গিয়ে রাখীর খুব ঘনিষ্ঠ হয়। বিভুর দুচোখ অপলক। দুটি সুস্থ সবল যুবক যুবতী—তাদের সামনে নদী—মেঘভারে অবনত আকাশ—ঐ তাদে পাখপাখালির ঘরেফেরা কলরব, দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের পরে চরাচরে ব্যাপ্ত সজল বিষণ্ণতা। এমন করে বিভু হাঁটেনি কোন দিন, হাঁটবে না কোনদিন। অসাবধানে রাখী সামান্য হোঁচট খেতে পুলক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও

বিচিত্র কাহিনী

পড়ে আনন্দ

পাবেন

ঝুঁকে তাকে ধরে ফেলে। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা ফের হাঁটতে থাকে। এমন দৃশ্য কখনো বিভু দেখেনি, রাখীকে দ্বিতীয় কোন যুবকের সংগে এমন নির্জনে এই প্রথম দেখল বিভু। ওরা নদীর ঢালুতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলে—গভীর শূন্যতা গ্রাস করে বিভুকে। হঠাৎ তার মনে হয় কেন সে গেল না ওদের সংগে? কেন নিজে থেকে গাড়ি পাহারা দিতে রাজি হল সে? নিজের ওপর রাগ হয় তার—ঘৃণা—আক্রোশ। ডান পায়ের ওপরে সবলে হাত রাখে সে। রক্তের মধ্যে এত জ্বালা ইতিপূর্বে কোনদিন সে অনুভব করেনি। লাইটারের সেই ছোট্ট আগুনটা ক্রমে তার শরীরের ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার মাংসপেশী তন্ত্রী আঁচে থাক হয়ে লাফাচ্ছে। একবার তার ছুটে যেতে ইচ্ছা করে—নদীর দিকে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সে সংযত করে। চোখ বন্ধ করে কল্পনায় ভাসমান দুটি সুন্দর যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠ শরীর তার চোখের সামনেই ঝুলে থাকে ফণাতোলা সাপের মত। নিজেকে বিভুর দুহাতে ধরে ভেঙে চুরে মুচড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এ সময় এক গভীর জ্যোৎস্না রাতে রাখীকে দুহাতে ধরে ... চাঁদের জোয়ারের দৃশ্য সে মনে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে ছবি কিছুতে স্পষ্ট মনে আসে না, ভেঙে ভেঙে যায়। নিজের মাথার চুল দুহাতে আঁকড়ে ধরে বিভু, তার মাথাটা নীচু হয়ে আসে। সে স্পষ্ট অনুভব করে তার দুচোখের অসংখ্য কোন সূক্ষ্ম তন্ত্রী ছিঁড়ে যাচ্ছে আর সেই ছিন্নমুখ থেকে উষ্ণ জলবিন্দু টলমলে টলতে এগিয়ে আসছে চোখের জমিতে।

॥৫॥

একসঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের হাসির শব্দে চমকে ওঠে বিভু। কংকালসার একপাল শিশু তার সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলছে। নিজেদের মধ্যে একজন গাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছিল সে বিভুকে একটা খোঁচা মেরে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই হাসতে হাসতে ছোটে।

উঠে গিয়ে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে 'বিভু—এই শোন—এসো'—দূরে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ জিভ ভ্যাংচায়, হাত-মুঠো করে কিল দেখায়—একটি ছোটো গোছের ছেলে তার ভঙ্গী নকল করে হাঁটতেই আবার সবাই হেসে ওঠে হি হি।

মাথার মধ্যে আগুন দপদপিয়ে ওঠে বিভুর। তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে তীব্র সাধ হয়। তবু সে আরো দুপা এগিয়ে যায়—'শোনো'—বলে ডাকে। ফের ছেলেটি থোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে ঢিল খোঁজে বিভু কোন কিছু না পেয়ে লম্বা ফুলময় শাটির ডাঁটাগুলো পড়েছিল সেগুলোই ছুঁড়ে মারে। সেগুলো খুব বেশী দূরে যায় না। কিন্তু ওদের দুচারজন এগিয়ে এসে ফুলগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়। তারপর তার পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গোড়াগুলো চিবুতে থাকে আর হি হি করে হাসে সবাই।

এর মধ্যে অদূরে চা বাগানের ভেতর দিয়ে তারের জালের বেড়া দেওয়া একটা ট্রাক চলে যায়—জালের ভেতরে ভর্তি সবুজপাতা। বাচ্চাগুলো ড্রাইভারকে হাত নাড়ে চেঁচায়। আর ঠিক এ সময়ে দীর্ঘ সাইরেনের শব্দ আসে ফ্যাকটরীর দিক থেকে। শব্দটা ভয়াল মনে হয় তার। আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে ফ্যাক্টরী থেকে প্রচুর কুলিকামিন বেরিয়ে আসতে থাকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তারা বিভিন্ন দিকে। অচেনা জায়গা—একেবারে নতুন পরিবেশ, দূরের কাছের সব লোকজন অচেনা। নদীর প্রবল জলস্রোতের শব্দ ক্রমে বাড়ছে। পাতলা অন্ধকার ঘন হচ্ছে। গা ছমছম করে বিভুর। আর তখন তার চোখে পুলকদাদের গুদামের একটা কাল্পনিক ছবি ভাসে। এই ফ্যাকটারীর মতই কী সেটাও এত বড়? এত লোক কী সেখানে কাজ করে? নরেশ চাকীর রুক্ষ কাল্পনিক মূর্তি যেন সে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর তার সামনেই পুলকদার বিশাল হারকিউলিসের মত রুক্ষমূখী শরীর। পুলকদার বাড়িটা কেমন? রাজবাড়ির মত কী? পুলকদা যখন গ্যারেজের তালা ভাঙ্গার ঘটনা বলছিল তখন তার মনে কেন কে জানে রাজবাড়ির ছবিটাই ভেসে উঠেছিল।

অন্যমনস্ক বিভু গাড়ির দিকে ফিরে আসছিল। ঠিক এ সময়ে কয়েকটা ছোট খাট ঢিল এসে পড়ে গাড়ির ওপর। বৃষ্টি শুরু হবার আগে শিল পড়ার মত। একটা তার কানের পিঠে এসে লাগতেই তার মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে।

এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্ষণে সংগে উল্টো পাকে ঘুরে বাচ্চাগুলোর দিকে যত জোর সম্ভব ছুটতে থাকে বিভু। ঝোপেঝাড়ে তার পা আটকে যায়। উল্টে পড়ে। ফের উঠে দৌড়য় সে। বাচ্চাগুলো ভয়ার্ত হরিণের মত ছুটতে থাকে। শুধু একটি একেবারে কচি মেয়ে উল্টে পড়ে তারস্বরে কাঁদতে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে দাঁড়ায় বিভু। আবছা অন্ধকারে ন্যাংটো শিশুকে দেখে সে থমকে যায়। তার গায়ে হাড়ের ওপরে পাতলা চামড়ার স্বচ্ছ আবরণ মাত্র। যেন তার শরীরের ভেতরে সব যন্ত্রপাতিগুলো একটু চেষ্টা করলেই চোখে পড়ে। এসময় মেয়ে ডেকে ওঠে দূরে গলা ... করে। বিভু সস্নেহে মেয়েটিকে কোলে তুলে নেয় তার অগোছালো কপালে ছাপিয়ে পড়া চুলগুলো সে উল্টে দেয় মমতার হাতে। বাচ্চাগুলো দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকে 'মার ডালা মার ডালা।'

হঠাৎ বিভু চমকে ওঠে কাঁধে হাতে তীব্র ধমকে পিঠে ছাতা আর হাতে টর্চসহ মাথায় ঝাঁকড়া চুল ভরা একটি ঘনকৃষ্ণ লোক খালি গা, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত, তার সামনে রুক্ষ চোখে দাঁড়িয়ে আছে। সে তীব্র ধমকের সুরে বলে 'মারতা কিউ?' তার লাল চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

অসহায়ভাবে হাত নাড়ে বিভু হেসে বোঝাতে চেষ্টা করে সে আদর করছে সে বলে 'মারিনি'—

লোকটা ধমক দেয়—'ছোড় দোও'— একবার লোকটির ক্ষিপ্ত মুখে তাকায় বিভু তারপর মেয়েটিকে মাটিতে নামিয়ে দেয় দুর্বলহাতে। ছুটে পালায় মেয়েটি। লোকটি গজগজ করে বলে—'শেহরসে ইয়ার ফূর্তি করণে আতা হায়—সালা সব বাবু আছে।'—লোকটা মাটিতে থুথু ফেলে লাইনের দিকে চলে যায়।

হতবাক, অসাড়, —বিভু বজ্রাহত মানুষের মত। এসময় তার সময়ের কোন চেতনা কিংবা চারিদিকের বিস্তৃত প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন অনুভূতি থাকে না। সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে জানে না—সে মাটির ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাকি শূন্যে ঝুলেছে? নরেশ চাকীর চেহারা কী লোকটার মত এরকম?

কতক্ষণ কেটে গেছে তার খেয়াল নেই —এসময়ে সহসা সে যেন ফের তীব্র বিদ্যুতের আঘাতে চেতনা ফিরে পায়। অবাক চোখে সে দেখে নদীর দিক থেকে মরীয়া হয়ে রাখী ছুটে আসছে, ঝোপঝাড়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে তবু ছুটছে। একটু আগে বাচ্চাগুলো তার তাড়া খেয়ে ও কী এমনি দুরন্ত পায়ে ছুটেছিল? রাখীর গাঢ় কালো মূর্তি এক মুহূর্তের জন্যও থামে না, তার শাড়ি অগোছালো—খোঁপা ভেঙে পড়েছে। সোজা গাড়ির কাছে এসে সে দ্রুত দরজা খুলে পেছনের সিটে ঝপ করে ঢুকে পড়ে। সে কুকুরের মত হাঁফাচ্ছে এটা না দেখেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়। তার মাথা হেলে পড়েছে।

পুলকও রাখীর কিছু পেছনে ছুটে আসছিল। খানিকদূর আসার পরে অবশ্য সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দূর থেকেই হয়তো দেখে রাখীকে কিন্তু কেন সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝা মুস্কিল। কয়েকটা জড়াজড়ি-দাঁড়ানো শালগাছের ওপাশে সে কী বিভুকে লক্ষ্য করছে? হয়তো তাকেই দেখছে এখন সে। বিভুর কাছে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা দুর্বোধ্য। অথচ সে উদ্বিগ্ন। তার কৌতূহলের সংগে দুশ্চিন্তা। তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী একটু আগের থেকেই টানটান। আপ-

একটা একটা তীক্ষ্ণ ছড় কে যেন টেনে নিয়ে যায় তার সেসব স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর দিয়ে। সে রাখীর দিকে না 'গয়ে ধরে পুলকের দিকেই এগিয়ে যায়।

দূরত্ব কমছে পুলকের দুটো চোখের মণির তেজ বড়ছে। অন্ধকারে কুকুর বেড়ালের চোখ জ্বলে—মানুষেরও জ্বলে নাকি? অনতিদূরত্বে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটি যুবক; ভয় দমনের চেষ্টার মধ্যে বিভু বলে—'কী হয়েছে পুলকদা?' পুলক নিরুত্তর তার দুচোখ পূর্ববং।

'রাখী অমন করে ছুটে এল কিনা পুলকদা?'

কথা নয় চকিতে ক্ষিপ্র হাতে বিভুর একটা হাত ধরে পুলক হ্যাঁচকা টান মারে—তারপর তাকে শালগাছগুলোর ঘন আড়ালে টানতে টানতে নিয়ে যায়। কিছুই বোঝা যায় না, ফলে ভয় বাড়ে, বিভু বলে 'কী করছ পুলকদা?'

'চোপ্ শালা। যা জিজ্ঞেস করছি ঠিক ঠিক উত্তর দে'—

অবাক হয়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে তাকায় বিভু—'কী বলছ?'

'রাখীর সঙ্গে তোর কতদিনের মেলামেশা? একটাও মিথ্যে কথা বলবি তো খতম করে দেব বল'—

বিভু বলে—'ছেলেবেলা থেকে'—

'একেবারে শৈশব থেকে এ্যাঁ?' ঠোঁট বাঁকে পুলকের—'ওর সঙ্গে মিশিস কেন?'

এর কী জবাব দেবে সহসা ভেবে পায় না বিভু অথচ সে ভাববার চেষ্টা করে প্রাণপণে কেন সে রাখীর সঙ্গে মেশে?—

'কীরে, শালা চুপ করে আছিস কেন বল?' হিসহিস করে পুলকের জ্বলন্ত কণ্ঠস্বর। তার শরীর ক্রমশঃ ফুঁসছে।

'ভাল লাগে—ওর সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে—পুলকদা—'

'ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে?'

এবারও বিভু দ্বিধান্বিত কেন রাখীর সঙ্গে মিশতে তার ভাল লাগে? তাও সে জানে না—সে বলে—'বুঝতে পারি না তবে ভাল লাগে'—

'শালা ন্যাকা চৈতন, কিচ্ছু বোঝো না'—তার নাক টিপে ধরে পুলক দু আঙুলে সাঁড়াশীর মত—নাক টিপলে দুধ গলে? সত্যি কথা বলতো কখনো ওকে জড়িয়ে ধরিসনি? চুমু খাসনি? ওর বুকে হাত দিসনি?'

বিভুর কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে—রাখীর সমস্ত শরীর দপ্ করে চোখের সামনে জ্বলে নিভে যায়।

'বল'—আরো রুক্ষ পুলকের গলা।

'না'—

'শালা সত্যি কথা বল'—বুকের কাছে বিভুর জামাটাকে খাবলে ধরে পুলক—ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—'চোপ গেছ কী অত বড় কেন। বল শালা ওরকম ডবকা মেয়ে পেয়ে তুমি ছেড়ে দিয়েছ একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

গলা আটকে আসে বিভুর, জলে ডুবছে সে, সে বলে—'বিশ্বাস করো পুলকদা এসব আমি কিচ্ছু জানিনে সত্যি বলছি—'

'সত্যি বলছ?'—পুলক মুখ নীচু করে ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে—'তুই ওকে ভালবাসিস না?' জামায় টান বাড়ে দম আটকে আসে, চোখ বড় বড় হয়ে যায় বিভুর সে বাসে, নিশ্চয়ই ভালবাসে কিন্তু সেকথা জানালে রাখীর কোন ক্ষতি হবে নাতো? কিন্তু সত্যি কথা সে ভালবাসে তার গলা মুখ কপালের রগগুলো ফুলে ওঠে—সে বলে—হ্যাঁ ভালবাসি আমি'—সে যেন জলের ভেতর থেকে কথা বলছে, সে নিজেও প্রায় শুনতে পায় না। টেনে টেনে একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করে সে। তার কণ্ঠার রক্তে ভিজে যেন কথাগুলো উঠে আসে।

যেন চোর ধরে ফেলেছে এমনি গলায় পুলক মৃদু হেসে বলে—"পথে এসো বাবা' পরমুহূর্তেই চাপা ধমক দিয়ে বলে—'ভালবাস তবু বুকে হাত দাওনি মামদোবাজী পেয়েছ? আরো কী করেছিস বল—ছাড়ব না কিন্তু—শেষ হয়ে যাবি'—বলতে বলতে আরো চেপে ধরে পুলক বিভুর জামা, তার গলা সরু হয়ে আসে হাঁড়ি কাঠে ঢোকানো বলির পাঁঠার গলার মত। সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে পড়ে, বিভুর মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে—কানে সোঁ সোঁ শব্দ, তীব্র জলস্রোতের শব্দ। সে নীচু হয়ে পড়ছিল, সহসা শরীরের সব বল একত্র করে, অন্তিম চেষ্টায় ঘাড় তুলে ওপরের দিকে উঠে পড়ে সে। তার দুহাতও কম বলিষ্ঠ নয়—সহসা সে দুহাতে সজোরে ধাক্কা মারে পুলককে—কল্পনার অতীত চকিত এরকম প্রতি আক্রমণের বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না পুলকের সে দূরে পৌঁছিয়ে পড়ে জামা হাতছাড়া।

একপায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় সুদৃঢ়ে দাঁড়ায় বিভু। এইমাত্র সে জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছে সে পঙ্গু, সে একলা—সে সবার থেকে দূরে থাকে অন্ধকার ঘরে, তবু বুকে বুভুক্ষু সরোবর টলমল করে তবু সে মৃত্যুর কথা ভাবেনি কোনদিন। সে তার বাগান করেছে সমস্ত শরীরে। সেখানে সে বেঁচে আছে সে বেঁচে থাকতে ভালবাসে বেঁচে থাকার মত গৌরবের আর কিছু নেই তার কাছে। তার শরীরের অনেক নতুন তন্ত্রীতে রক্ত বইছে এখন এই আকস্মিক সংঘর্ষণে এক পায়ে দৃঢ় দাঁড়িয়ে সে বলে—'এটা তোমার অন্যায় পুলকদা'—

'ন্যায় অন্যায় শালা ল্যাংড়ার কাছ থেকে শিখতে হবে?'—পুলকের গলায় তেজ কমেনি, কিন্তু সবল মানুষ দুর্বলের কাছ থেকে কেবলমাত্র আনুগত্য ছাড়া আর কিছু আশা করে না ফলে সামান্য প্রতিবাদে তার অপমান বোধহয়। ফলে সে অপমান গোপন করার চেষ্টাতেই তার পূর্ববং রোষ ঝাঁঝিয়ে ওঠে পুলক—'বল শালা রাখীও তোকে ভালবাসে না। সত্যি কথা বল'—

কোন দুর্বলতাই সম্পূর্ণ গোপন করা যায় না। পুলকের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবে বিভু। তারপর স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বলে—'তোমার কথার আমি উত্তর দেব পুলকদা কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও'—

মনে মনে পুলক অবাক। নিজের কাছে নিজের অপমান গোপন থাকে না ফলে আরো ক্ষিপ্ত—'আমাকে চিনিস না বিভু একটা লাথি মারলে কোক করে মরে যাবি—একুণি'—

'আমার একটা পা খোঁড়া কিন্তু হাত দুটো নুলো নয় পুলকদা'—আর বিভু মনে মনে অবাক এখনো তার হাত কাঁপছে না আজ। সে সাহসের ওপর সাহস এনে বলে—'পুলকদা শুধু সত্যি কথা বলতো—তুমি তিনপাত্তি খেল না? ডাকাতি করনি বানেশ্বরের রাস্তায়? তুমি পান্ডাপাড়ার বাবলি বলে একটা মেয়েকে আটকে রাখনি হোটেলে?'

ঔদ্ধত্য ঔদ্ধত্য ঔদ্ধত্য। চড়াৎ করে রক্ত উঠে যায় পুলকের মাথায় এবং তৎক্ষণাৎ যে ভঙ্গিতে সে নবেল চাকীর ওপরে যে শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—স্বাভাবিক সেই তার স্বভাবজাত ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত কিন্তু ঠিক তক্ষুণি তার মনে হল শালগাছগুলোর পেছনে বুঝি কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় রাখী। হয়তো রাখীর সম্বন্ধে তার মন দুর্বল নয়তো এমন হবে কেন? দুপা এগিয়ে চারদিক তীব্র চোখে দেখে নিশ্চিত হয় পুলক, রাখী নয় বস্তুত কেউই নয়।

বিভুও তো সম্পূর্ণ নির্ভয় নয় ফলে পুলক যখন ফিরল—বিভু বলে নরম গলায়—'বিনাকারণে তুমি রাগ করছ পুলকদা সত্যি বলছি রাখী কোনদিন আমাকে কিছু বলেনি ভালবাসে কিনা জানি না, আমার মত একটা খোঁড়াকে ওর মত মেয়ে'—বিভুর গলায় বিষণ্ণতা, এসব আলোচনা অবান্তর অর্থহীন মনে হয়।

'প্রেম হচ্ছে অন্ধ বুঝলি, ওসব খোঁড়া ফোড়াতে কিছু যায় আসে না। ও যদি কাউকে ভাল না বাসবে তবে এত আড়ষ্টতা আসে কোত্থেকে? আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না'—পুলকের গলার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার্ত অপমান লুকিয়ে আছে বোঝা যায়। তার অস্থিরতা কিছুতে যায় না।

বিভু বলে—'রাখী একটু জেদী পুলকদা কিন্তু ওর মত মেয়ে হয় না। আমার মত পঙ্গু ছেলের সঙ্গে ওকে মানায় না'—

'জেদী? জেদ নারে অহঙ্কার, আমাকে সহ্য করতে পারে না আমি লক্ষ্য করেছি. কিন্তু কেন? পল্টুর মত হন্দ বেকার যদি ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারে, তাহলে আমি করতে পারি না ভেবেছিস? আমি শালা'—

পুলকের তেজী বলিষ্ঠ শরীরটা ফুঁসে ওঠে যেন অপমানে।

'বিয়ে করবে তুমি ওকে?'—বিভুর মাথায় তীব্র জলস্রোতের শব্দ ঘূর্ণি তোলে—অস্ফুটে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—'কিন্তু'—

'কিন্তু-টিন্তু কিসের, এটা ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি'—বলে পুলক বিভুর খুব কাছে চলে আসে, তারপর তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—'তুই শালা বাগড়া দিচ্ছিস, তুই লাগিয়েছিস ওর কাছে আমি মদ খাই, জুয়া খেলি, বাবলির কথা'—

না পুলকদা বিশ্বাস কর'—

'দ্যাখ বিভু ন্যাকামি করিস না, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে তুই বাঁচতে পারবি না। যেসব মিথ্যে গুজব আমার শত্রুরা আমার নামে রটিয়ে বেড়ায় তুমি সেগুলো ওর কানে ঢেলেছ।' হঠাৎ ক্ষিপ্ত গলায় চেঁচায় পুলক 'বাস্টার্ড'—সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতের একটা দুরন্ত থাপ্পড় এসে পড়ে বিভুর বাঁ গালে। বিভুর ডান হাত পুলক বাঁহাতে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে আছে। বিভুর মাথা ঘুরে যায়।

দু' মুহূর্ত ঝিমঝিম করে কেটে যায়। তারপর বিভু বাঁ হাতে নিজের গাল স্পর্শ করে, বলে—মারলে পুলকদা? তোমার গায়ে খুব শক্তি, না?'

চাপা ঘষা গলায় পুলক বলে—'দরকার হলে আমি তোকে শেষ করে দেব ল্যাংড়া, রাখীকে আমার চাই'—

শান্ত দৃঢ় গলায় বিভু বলে—'আগে তুমি ওসব ছেড়ে দাও, আমি রাখীকে বুঝিয়ে বলব।'

পুলক যেন বিশ্বাস করতে পারে না, সে হতবাক। কিছুক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে সে বিভুর চোখে কী খোঁজে—তারপর অবিশ্বাসীর গলায় বলে—'কী বুঝিয়ে বলবি তুই রাখীকে?'—

'তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা। কাকিমা খুশী হবে, ওদের চলে না, কাকাবাবু সংসার ছিঁড়ে পেরে উঠছে না। কিন্তু রাখীর মত মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তো তোমাকে ওসব ছাড়তে হবে, পুলকদা'—

বাঁকা সরু চোখে অনেকক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকে পুলক বিভুর মুখের দিকে, তারপর যেন তার সম্বিৎ ফিরে আসে—সে সহসা জড়িয়ে ধরে বিভুকে—আমি সব ছেড়ে দেব রে বিভু—সব, তুই বললে কাজ হবে, তুই বলবি রাখীকে?'—

কণ্ঠার কাছে ক্ষত-বিক্ষত তন্ত্রীতে এখনো যেন রক্ত লেগে আছে—সে-রক্তের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ বেরিয়ে আসে বিভুর গলা দিয়ে—'বলব।'

'তুই আমাকে চাটিপেটে কর বিভু 'ন'—বলে নিজের পায়ের চটি খুলতে যায় পুলক, রিক্তের মত বিমর্ষ হাতে পুলকের হাতটা ধরে ফেলে। বিহ্বল কণ্ঠে সে বলে—'ছিঃ পুলকদা।'

'আমি তোকে সত্যি বলছি বিভু, একটু-আধটু জুয়া আমি খেলি—তাছাড়া বাবলির ঘটনাটা মিথ্যে না। কিন্তু কী জানিস সব শালা কী রকম হ্যাংলা—বাবলির মত মেয়েরা তু করে ডাক দিলেই চলে আসে। কিন্তু তোর রাখী?'—বিভুর দুহাত জড়িয়ে ধরে পুলক বলে—'একটা কথা তোকে আমি বলি বিভু, কারো অহঙ্কার আমি একদম সহ্য করতে পারি না। কেউ আমাকে হেলাফেলা করছে দেখলে আমার সব জেদগুলি পাকিয়ে ওঠে হাতের মধ্যে'—বলতে বলতে পুলকের মুখের পেশী ফের কঠিন হয়ে ওঠে। সাপের গায়ে আঘাত লাগলে যেমন করে সে ফণা তোলে তেমনি ভঙ্গি।

'মাদলের গম্ভীর আওয়াজ—লাইনের দিক থেকে ডগাড়ুগাং। মেঘের গুরুগুরু বাড়ছে, নদীস্রোতের শব্দও বর্ধমান, অন্ধকার চরাচর থমথমে। শীতল হাওয়ায় গা শিউরোয়। চারিদিকে যেন ভয়ঙ্কর এক উৎসবের আয়োজন চলছে।

ওরা দুজনে সচকিত হয়ে ওঠে, তাদের খুঁজতে খুঁজতে রাখী শালগাছগুলোর পেছনেই এসে পড়েছিল। ওরা এগিয়ে আসতেই রাখী বলে—'বাড়ি ফিরবে না তোমরা?' বিভু উদ্বিগ্ন পায়ে এগিয়ে বলে—'হ্যাঁ হ্যাঁ চলো, আর দেরী করা উচিত না, মাসিমা ভাববে।'

রাখী সবার আগে আগে হেঁটে চলে, গতি মন্থর। ওকে দেখে মনে হয় হাসপাতাল থেকে দীর্ঘকাল পরে ছাড়া পেয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। ঘাসের কাছে ঘাস—গাছের কাছে গাছ চিরকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো অপেক্ষা করে। তারাও নিঃশব্দ নির্বাক। সবাই হয়তো কোন কথা প্রত্যাশা করে। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, রাতে হয়তো আরো বাড়বে। বৃষ্টি মানুষকে অলস করে দেয়—স্বপ্ন দেখতে শেখায়—কাঁদতে শেখায়, স্বপ্ন দেখিয়ে কাঁদায়।

বিভুর ভেতরে বৃষ্টিপাত হয়ে যাচ্ছে—কেন যে তার মনে হয় রাখী তার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সব বৃষ্টিপাত মানুষের চোখে পড়ে না, সব কান্নার শব্দ মানুষ শুনতে পায় না।

রাখী সোজাসুজি গিয়ে পেছনের সিটে কোণে বসে পড়ে। এখন যেন তার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। বিভু সামনের সিটে বসতে যায় পুলকের পাশে। পুলকই তাকে ডাকে—'বিভু তুই পেছনেই বোস, রাখীর কাছে।'

বিভু ইতস্ততঃ করে প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকে রাখী, কিছু বলে কিনা। রাখী কিছুই বলে না। জানলা দিয়ে তার চোখ বাইরে—হয়তো মানুষের দৃষ্টি যতদূরে যায়—তারও চেয়ে দূরে। সে এসব কোন কথাই শুনছে বলে মনে হয় না। এমন চুপ করে আছে কেন রাখী, কী হয়েছে বলবে না আমাকে—এটা বিভুর মনের কথা, মনেই থাকে।

'যাহ্ ঢুকে পড়, দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি'—পুলকের তাড়ায় বিভু ঢুকে এ-পাশের কোণে জড়সড় হয়ে বসে।

গাড়ি স্টার্ট নেবার সময় কাঁপুনি জোরালো হয়ে ওঠে কিন্তু শব্দ তেমন শোনা যায় না। কারণ, মাদলের আওয়াজ তখন উঁচু পর্দায়। গাড়ি চলতে শুরু করলে বিভু বলে—'রাখী, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

রাখী প্রথমবার উত্তর দেয় না। দ্বিতীয়বার বলে—'তোমাকে আমার জন্য বেশী না ভাবলেও চলবে বিভুদা, আমি ঠিক আছি।'

মুখ ঘুরিয়ে পুলক বলে—'জানলার কাচটা কী তুলে দেব?'

রাখী বলে—না, ঠিক আছে।'
এর পরে সবার কথা ফুরিয়ে যায়।

*

বিভু সোজা হয়ে দাঁড়ায় শিরদাঁড়া টান করে। রাখী বোধহয় এদিকেই তাকিয়েছিল, রাখীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। আপনা থেকে বিভুর দুঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। হয়তো রাখীর ম্লান মুখেও—মেঘ সরিয়ে যেন এক দীর্ঘ রৌদ্ররেখা ছুটে আসে। দূরে থেকে চোখে চোখে এমন কথা হয়—প্রাণের যত গোপন নাবলা কথা শুধু দৃষ্টির ভেতর দিয়ে পারাপার করতে পারে একথা কী বিভুর মত আর কেউ জানে? মুখের ভাষায় উচ্চারিত শব্দে কী এমন আনন্দ এমন উত্তেজনা প্রকাশ করা যায়? এখন মনে হচ্ছে রাখী যেন ছল করে জামতলায় দাঁড়িয়ে আছে, আসলে দূরে থেকে বিভুর চোখে পড়াই যেন ছিল তার উদ্দেশ্য।

রাখী কী বাগানে আসবে বলেই দাঁড়িয়ে আছে? হয়তো আসবে এক্ষুণি

পায়ে পায়ে তবু বিভুর ডান হাতটা ওপরে উঠে যায়, হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে বিভু। রাখী প্রত্যুত্তরে হাত তোলে না, কিংবা আগের মত হেসে উঠে চেঁচিয়ে বলে না—আসছি বাবা, আসছি; কিন্তু সে বিনা ভূমিকাতেই হাঁটতে থাকে এদিকে। তার দৃষ্টি নত। পায়ের তলায় খানাখন্দ জলকাদা। রাখী যেন বহুদূর থেকে আসছে; এত মন্থর তার হাঁটা।

বৃষ্টি বিধ্বস্ত গাছে গাছে কাক শালিখ কলরব করছে। এদের দুঃখ-নির্মিত বাসাটাসাগুলো ভেঙেচুরে গেছে, হয়তো কারো কারো দু'একটা সদ্য ডিম থেকে ফোটা বাচ্চাটাচ্চা নিহত হয়েছে। আসলে তাদের কলরব হয়তো বা বিলাপ। তাদের ভাষা না বুঝলেও বিভু সে বেদনা অনুভব করে। আজ সকালেই সে একটি মৃত শালিখ ছানা পড়ে থাকতে দেখেছিল কদমগাছের তলায়।

'ডাকছ বিভুদা?' —বিভু ফের আগাছা তুলতে শুরু করেছিল, রাখীর কথায় সে হেসে মুখ ফেরায়। কিন্তু রাখীর মুখ দেখে তার হাসি নিভে যায়। এমন বিমর্ষ তার মুখ, বৃষ্টিবিধ্বস্ত পাখির বাসার মত।

বিভুর ইচ্ছা হল বলতে যে পন্টু ফিরে আসবেই রাখী, তোমরা অত ভাবছ কেন। কিন্তু বলতে গিয়ে তার মুখে আটকে গেল কথাটা। সে জোর পেল না এতটুকু। শুধু তার মুখ থেকে বের হল—'পন্টুদা'—

'আর ফিরবে না বিভুদা'—রাখীর গলায় কোন দ্বিধা নেই, সে যেন নিশ্চিত।

'কেন ফিরবে না, ঠিক ফিরে আসবে দেখো, দু'চারদিন যাক'—

'তোমার কী ধারণা ও এখানে আছে?'

'কোথায় যাবে?'

'আমার মনে হয় হরি ওকে গুম করে দিয়েছে'— রাখীর কথাটা শুনে ধক্ করে ওঠে বিভুর বুক।

সে এতটা ভাবেনি কখনো। রাখী ফের বলে—'আমি জানতাম এরকম কিছু হবে—তোমাকে আগেই বলেছি'—

বিভুর তবু প্রত্যয় হয় না, সে সন্দেহ প্রকাশ করে কিংবা রাখীকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টায় সে বলে—'না না, হরি অতটা বাড়াবাড়ি করতে পারে না।'

'তুমি কিছু জানো না বিভুদা—ওরা সব পারে। আর দাদা যদি নিজেই একাজ করে থাকে তো—'

'নিজে হাতে পন্টু একাজ করেছে তোর বিশ্বাস হয়?' বিভু কোনদিকে সঠিক কিছু ভাবতে পারে না।

'কেন বিশ্বাস হবে না। খুনও করতে পারত। অন্য বাকীটা বা কী দেখেছে?' রাখীর আগের মুখটা কিছুতে মনে করা যায় না। তার নদী তাজের মত হাসি নেই মুখে। বিভু নিঃশব্দে তাকে দেখে শুধু।

রাখী বলে—'জানতো বিভুদা, বৌদির একটা চোখ বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে, কাল খবর পাওয়া গেল'—

'মিনুর একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাবে?' —বিভু কথাটাকে শুধু পুনরুচ্চারণ করে মাত্র। আর মনে মনে সে মিনুর মুখটা ভাবতে চেষ্টা করে, কিছুতে ঝলসানো মুখ কানা একটা চোখ সে ভাবতে পারে না, দু'হাতের অঞ্জলিতে বেলফুল নিয়ে গন্ধ শুঁকছে এ ছবিটাই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাখী যেন নিজের শরীরের ভার বহনে অক্ষম। বাগানের উঁচু সবুজ জায়গাটায় গিয়ে সে ভেজা ঘাসের ওপরে বসে পড়ে। বলে—'মাকে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি বিভুদা, খাওয়া দাওয়া করছে না। কালরাতে দেখি দাদার ঘরে ঢুকে দাদার জামা প্যান্ট আর বৌদির শাড়িটাড়ি গুছিয়ে আলনায় সাজাচ্ছে, বললাম—খেতে চলো মা; মা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী বলল জানো? বলল, পন্টু খেয়েছে?'

রাখী চুপ করে রইল খানিক। বিভুও।

রাখী বলল—'ভাল লাগে না বিভুদা। মা খালি মাঝেমধ্যে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলছে—পন্টুটাকে আমরা কেউ কোনদিন ভালবাসিনি, ওর বৌটাকেও খালি গঞ্জনা দিয়েছি—তাই নারে রাখী?'

এর আগে কত সহজে বিভু কত কথা বলেছে, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, মিছিমিছি ঘাবড়াচ্ছ' ইত্যাদি নানা কথা। বলতে তার ভালও লেগেছে, হয়তো শুনতেও এরা ভালবেসেছে। কিন্তু এসব কথার একটাও এখন বিভু মুখে আনতে পারে না। অনেক ভেবে সে শুধু বলে—'পন্টু এমন কেন করল বল ত? ও তো এরকম ছিল না।'

'এরকম সেরকম বলে কোন কিছু নেই বিভুদা—রাখী মলিন মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলে—মানুষ খারাপও না ভালও না, শুধু সে কীরকমভাবে বড় হচ্ছে, তার পরিবেশটাই বড় কথা বিভুদা।'

সবাই বলে বিভু মূর্খ সেয় লোককে, আজ বিভুর মনে হয় রাখী তাকে জ্ঞান দিচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো যে রাখীর কতটা ভেতর থেকে আসছে সেটা বিভু বুঝতে পারে অনায়াসে। একটা প্রচ্ছন্ন আবেগে এসময় বিভুর অস্থির লাগে—সে বলে—'তুমি আরো লেখাপড়া করো রাখী—বেশ ভাল করে'—

রাখী এতক্ষণে হাসে, বেশ একটু শব্দই হয়—'সেদিন যা বলেছি সেটা মনে পড়তেও হাসি পায়, লেখাপড়া করেই বা কোন্ স্বর্গে যাব বলতো।' —হরি যথারীতি উপে গেছে সে মৃদু মন্থর স্বরে বলে—'কিছু ভাল লাগে না বিভুদা, ঘরের ভেতরে দম আটকে আসে। বাড়িটা যেন বাড়ি না—একটা কয়েদখানা—মনে হয় কোথাও চলে যাই দূরে কাছে'—

'সব সময় বাড়িতে বসে থাকলে ওরকম হয় রাখী। একটু বেড়িয়ে এলেই পার।'

'কোন্ চুলোয় যাব বল তো—বাইরেও কী ভাল লাগে? ঘরে আছি না বেঁচে আছি তাই বুঝতে পারি না—ঘরে বাইরে সমান।' এসব কথায় আগে বিভু রেগে যেত—কারো মুখে মরার কথা তার সহ্য হত না। সে চুপ করে থাকে।

'তাহলে আর কী করবে?' —বিভুর করুণ গলা।

'সত্যি ভাই, কী করব কী করা উচিত, কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ এসব ভাবতে গেলে সাহস লাগে, মনে হচ্ছে সে সাহসও আমার নেই বিভুদা'—

রাখীর অস্থির মুখভঙ্গি দেখে বিভু, পুলকদার কথাও তার মনে পড়ে। যার সব আছে। স্বাস্থ্য ঐশ্বর্য শক্তি। সে বলে—'পুলকদার কথা ভেবে দেখ রাখী একবার, জানো পুলকদা এখন ভাল হয়ে গেছে?'

'ভাল? নেড়ো একবার তাকিয়ে লোক চিনতে পারে বিভুদা; কতটা ভাল হয়েছে দেখ—মজুরদের ওকে আবার পিটিয়েছে।'

'তা পিটিয়েছে'—বিভু ইতস্তত করে বলে—'কিন্তু আর সব ছেড়ে দিয়েছে—'

'দেখ বিভুদা, আমি একটা কথা বলি, তুমি ভেবেছ আমি তুমি বলে বলে ওকে ভাল করতে পারব? পারব না, দেখো মজুররাই ওকে একদিন উচিত শিক্ষা দেবে।'

বিভুর মুখটা পাংশু হয়ে যায়। তার বুকটাতে ভয় গুরু গুরু করে ওঠে, সে রাখীকে বলে—'পুলকদা সত্যি তোমাকে ভালবাসে রাখী।'

রাখী বলে—'আমি না করেছি?'

'তবে?' —বলে বিভু আর কোন কথা খুঁজে পায় না।

রাখী বলে—'আমার ভয় হয় বিভুদা, দাদার এরকম হবার পরে সত্যি বলছি আমার মনে হচ্ছে আমার ভেতরে একটুও সাহস নেই—'

'ছি রাখী, তুমিও কী কাকীমার মত বুড়িয়ে গেলে নাকি?'

রাখী খানিক অন্যমনস্ক থেকে চুপচাপ। তারপর বলে—খুড়ো হলে

লোক এমনি হয়ে যায়, তাই না বিভূদা? আমি কিছু ভাবতে পারছি না—' তারপর যেন নিজেকে ধমক দেয়—'যাকগে।' বিভূ নিশ্চুপ। সে শুধু রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর থেকে ফের আগাছা ঘাস তোলে হাতের টানে ছুঁড়ে ফেলে একদিকে। একটা হেলে পড়া মিইয়ে যাওয়া গাছ সে উপড়ে তোলে। বিভূ ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, রাখী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নেয়। তারপর নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকে। বলে—'জানো বিভূদা রজনীগন্ধা আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। এরকম গন্ধ আর হয় না—'

বিভূ হেসে বলে—'এখন লাগে না?'

রাখীও হাসে বলে, 'হ্যাঁ এখনো লাগে।' ও রূপরা ডাঁটাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'শুঁকে দেখ কী সুন্দর গন্ধ।'

'তুমি আমাকে গন্ধ চেনাচ্ছ?' বিভূ খুব গর্বের সঙ্গে বলে। কিন্তু এতক্ষণে রাখীর হাসি দেখে খানিকটা সাহসও পায়। ফের সে বলে—'একটু ঘোরাফেরা করলেই মনটা ভাল থাকে—'

রাখী বলে—'ঠিক বলেছ বিভূদা, বেড়াতে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে?'

উৎসাহে বিভূ বলে—' কোথায় যাবে বল।'

একটু ভেবে রাখী বলে—'কতদিন রাজবাড়ির দিকে যাইনি, চলো আজ ওদিক থেকে ঘুরে আসি— বাড়িতে সত্যি আর ভাল লাগে না। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে মরে যাব।'

বিভূ বলে, 'বিকালে যদি বৃষ্টি হয়?'

রাখী হেসে বলে—'তাহলে ভিজব দুজনে।'

বিভূ অন্তরে বাহিরে খুশী হয়ে ওঠে। রাখীকে মালিন্য মানায় না, তার এত দুঃখ হতাশা শোভা পায় না, বিভূর এ রকম ধারণা। রাখীর মুখের দীপ্তি সে যেন এতক্ষণে পুনরুদ্ধার করে আনে। সে উৎসাহে বলে—'তাহলে, দুপুরে বাজারে ফুল দিয়ে এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব রাখী।'

রাখী বলে—'আবার অত কষ্ট করবে আমার জন্য? তোমাকে ফিরে আর এতদূর আসতে হবে না বিভূদা, আমি কাঁঠালগুড়ির ম্যানেজারের বাড়ির ওখানে দাঁড়িয়ে থাকব।' এর আগেও অনেকদিন রাখী ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। বিভূ ফেরার পথে তাকে নিয়ে নৌকোয় ঘুরিয়ে ফিরেছে কোন-কোন জ্যোৎস্না-রাতে।

রাখী উঠতে যাচ্ছে, বিভূ বলে—'একটু দাঁড়াও রাখী।' বলে সে রজনীগন্ধা তুলতে থাকে কয়েকটা।

রাখী অবাক হয়ে বলে—'কী করছ?'

বিভূ রাখীর হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে দিয়ে বলে, 'নিয়ে যাও রাখী, যত্নে রেখে দিও।'

'সন্ধেবেলা দিলে হতো না?' রাখী হাসে।

বিভূ হেসে বলে—'এখুনি ভাল লাগে বললে তো, এখুনি নিয়ে যাও'—

রাখীও হাসে, আপত্তি করে না। ফুল নিয়ে নিঃশব্দে সে চলে যায়।

॥৬॥

বাগানের শেষপ্রান্ত থেকে নৌকো ছাড়তেই নদীস্রোত যেন সহস্র হাতে নৌকো টেনে নেয়, প্রথমেই একটা পাক খায় নৌকোটা। বিভূ হাসে। ধাক্কায়, গতিময় তাই জীবন্ত মনে হয়। নদীস্রোত তার ছোট্ট কলার মোচার মত নৌকোটা নিয়ে যেন খেলছে, সে শুধু বৈঠা নামিয়ে হাল ধরে থাকে, আজ তাকে তেমন মেহনৎ করতে হবে না।

সে শুধু একবার ফিরে তাকায় দুশ্চিন্তায়— নদী প্রায় তার বাগানে ঢুঁ মারছে। লক্ষণ ভাল না। আর বিভূর নৌকোটা যখন পাক খেয়েছিল গোড়াতে তখনই তার চোখে পড়েছিল শ্মশানে আগুন জ্বলছে। বৃষ্টির জন্য অনেক সময় মড়া পোড়ানো হয় না। এখন শ্মশানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সে যখন ঘুরপাক খায়—আগুনের ছবিটাও পাক খেয়েছিল।

সামনেই ত্রিকোণাকার জাল। আশ্চর্য, দিনের বেলায় সে কোনদিন জেলেটাকে দেখেনি। রাতেই সে শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনেছে—রাতেই দেখেছে তার কালো শরীরটা। লোকটা বলেছিল—বানবেরাণ হবে—ভেসেটেসে যাবে সব।

নদীর চেহারা দেখে ভয় লাগে। বাঁদিকে রাজবাড়ির আমবাগান অবধি চলে গেছে। নীচু জমি সব নদীর গর্ভে এখন। নদী অস্থির। স্রোতের জল ঘোলা—সবজে আভা করে আসছে। ছোট খাট গাছপালা ভেসে যাচ্ছে— জল ওথলাচ্ছে গর্ভিণী বিশাল মাছের মত। গোঁ গোঁ শব্দ যে কোথা থেকে উঠে আসছে বোঝা যায় না—মনে হয় নদীর গভীরে কোন অথৈ গহ্বর থেকে আওয়াজ উঠে জলস্রোতে ছুটে যাচ্ছে।

ডানদিকে কাঁঠালগুড়ি চাবাগানের ম্যানেজারের পোড়ো বাড়ি চোখে পড়তেই বিভূর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। হলুদ রঙের বাড়িটার সামনে একটা অমগাছ। ফেরার পথে রাখীকে সে এখান থেকে নৌকোয় তুলে নেবে।

কতদিন বাদে সে আজ রাখীকে নিয়ে বেড়াতে যাবে রাজবাড়ির আমবাগানে? বহু-বহুদিন পর। সে খুশী হয়ে ওঠে কিন্তু পরমুহূর্তে রাখীর বিষণ্ণতার কথা ভেবে সে উন্মনা হয়ে যায়। আর তখনই মনের মধ্যে পল্টু, বিন্দু কাকিমার ভাঙাচোরা মুখগুলো ভেসে যায়। মন বিষাদে ভার হয়।

* *

পুলক মাথা চুলকে বলে—'আজকাল পাশিতেও ডরায় না।'

'চলো পুলকদা'—বিভূ তাড়া লাগায়।

পুলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা ঠোঁটে হাসে—'তোমরা দুটিতে যাচ্ছ, রাজবাড়ি দেখতে—আমার কী সঙ্গে যাওয়া উচিত হবে এ্যাঁ?—আমি বেড়াতে যাবার কথা বললে তখন মাতৃপ্রেম জাগে?'

'কিছু হবে না তুমি চল—আমবাগানটা ভারী সুন্দর—আর রাজবাড়িটা, দেখেছ তো?'

সেকথায় যায় না পুলক, সে বলে—'সামনে পড়ে গেলাম বলে বললি না? বাবি তো আমাকে আগে খবর দিসনি কেন?'

বিভূ অবাক হয়ে বলে—'বারে সে ত এই দুপুরেই ঠিক হল।' তার মনটা ভার হয়ে আছে, ধীরেশের কাণ্ড দেখে, ফলে সে আর বেশী কথা বাড়ায় না—বলে—'চলো।'

'তুই নেমন্তন্ন না করলেও যাব, তুই কী ভাবিস রাখীকে তোর চেয়ে আমি কম ভালবাসি? চল—'

* * *

নৌকো খুলে দিতেই হুটে নৌকো নদীর দিকে চলে যায়। বৈঠা হাতে চিন্তিত মুখে বিভূ অনুতপ্ত গলায় বলে—'খুব বেশী দেরী হয়ে গেল—'

'কটার যাবার কথা ছিল?'

বিভূ বলে—'চারটে'

'সাড়ে চারটে বাজে—মাত্র তো আধ ঘন্টা লেট—' ঘড়ি দেখে পুলক বলে—'তোর ভাবে মনে হচ্ছে ঘন্টা দশেক লেট করে ফেলেছিস। খুব তাড়া না?'

বিভূ দুঃখিত গলায় বলে—'নদীর ভাবগতি ভাল না? আকাশ দেখেছ? রাখী ফিরেই যায় কিনা কে জানে?'

পুলক খিক খিক করে হাসে—'তুমি যাচ্ছো বাবা, রাখী চলে যেতে পারে? এ ত আর আমি না?'

এসব কথা কানে যায় না বিভূর। সে একবার নদী আরেকবার আকাশ দেখে। ওত-পাতা সিংহগুলো ওপারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—ছুটছে দৌড়চ্ছে। পশ্চিমে যে আভাটুকু ছিল তাও মরে গেছে। ঘন গাঢ় কালচে হয়ে নেমে পড়েছে আকাশ। বহু দূরে লকলকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সন্‌সন্ শব্দ শোনা যাচ্ছে গুড় ফিসফিসানির মত। চমকিত ক্ষেতের গাছের গাছগাছালি কেঁপে যাচ্ছে ত্রাসে। আর নদীর স্রোত টলমাটাল। কচুরী পানার ঝাঁক এখন উজানে ছুটেছে।

হঠাৎ পুলক বলে—'আমাকে দেখে তোর রাখী আবার ক্ষেপে যাবে না তো রে? আমি বুঝতে পারি না তোদের মত একটা ল্যাবড়াকে রাখী—'

বিভূর অন্যমনস্কতা ভেঙে যায়—সে হাসে—'পুরো কী যে বল?'

'তুই হাসিস না বিভূ, রাখীটা গভীর জলের মাছ বুঝলি? খুব ল্যাজে খেলাচ্ছে—' এসময় ফস করে সিগারেট ধরায় পুলক। বেন চিবিয়ে চিবিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে—'বেশী চালাকি ভাল না—তাই

রে বিভু?' পুলক ওদিককার গম্বুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে।

কথাগুলো বিভুর ভাল লাগে না। সে বলে—'নদীর জল দেখছ পুলকদা? যদি বড় নদীর জল ঢুকে পড়ে তবে কান-বলা না হয়ে যায় না।' একবার নদীর জল দেখে পুলক তারপর মুখ বাঁকিয়ে বলে—'ঢুকতে দাও, যে যেখান দিয়ে পারে ঢুকে পড়ুক—শালা কেল্লা হয়ে থাক—'

তার রুক্ষ মুখ দেখে বিভু হাসে—'সাঁতার টাঁতার জানো তো পুলকদা, না কি—'

তার মুখটা আরো কঠিন হয়ে ওঠে—'কোটাও ওসব। সাঁতার-কাতারের ধার ধারি না—' এসময় মাথার ওপর থেকে গুমগুম করে একটানা মেঘ ডাকতে ডাকতে যেন দিগন্তে চলে যায়, ক্রমশঃ শব্দ ক্ষীণ হতে থাকে। দূরের বিদ্যুৎ ক্রমশঃ যেন এগিয়ে আসতে থাকে।

ঝোপঝাড়ের ঘাটে এগিয়ে আসা ঝোপ-ঝাড়ের কাছে নৌকো মোড় নিতেই সহসা ম্যানেজারের পোড়ো হলদে বাড়ি চোখে পড়ে, আমগাছ। বাঁধানো ঘাট দেখা যায়। পুলক সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে—'কইরে, তোর রাখীকে তো দেখা যাচ্ছে না বপ?'

উৎকণ্ঠায় বিভুও চোখ ঘুরিয়ে দেখে এদিক ওদিক, বলে—'দেরী দেখে চলেই গেল কিনা কে জানে?'

'চলে যায়নি—আমি সিওর। তবে দেখ কোন খেলা খেলছে, লীলা বোঝা দায়—' সিগারেটের শেষটুকু পুলক দূর-আন্দাজের টোকায় ছুঁড়ে দেয়—পাক খেতে খেতে জ্বলন্ত আগুন শূন্য থেকে জলে পড়ে। অতঃপর ডানহাতে পুলক নিজের বাঁ-কাঁধে একটা জোর চাপড় মারে—'আমায় দেখতে পেয়ে থাকলে অবশ্য পালাতেও পারে—'

* * *

ঘোর ঘোর গোধূলির মত আবছা হয়ে উঠছে চারিদিক—মেঘের গাঢ় ছায়া জলে স্থলে গাছে পাতায় ঘাসে ঘাসে যেন ঢুকে পড়ছে। শরীরের রোমকূপ দিয়ে ছুটে-আসা তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস কালো সূঁচের মত ভেতরে ঢুকে যায়। প্রবল স্রোতের মধ্যে সজোরে বৈঠার চাড় লাগে, নৌকো ঘোরে, স্রোতের মুখ থেকে পাড়ের দিকে আসে, ঘর্মাক্ত বিভু পাড়ে নৌকো ঠেকায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলক লাফিয়ে নেমে পড়ে। নৌকো টাল খেয়ে যায় বিপজ্জনকভাবে।

আমগাছের এপাশে ওপাশে ঝোপে-ঝাড়ের আড়ালে, বাড়িটার দক্ষিণপ্রান্তে নানা জায়গায় দ্রুত পায়ে খুঁজে বেড়ায় পুলক। তারপর হতাশ পায়ে এদিকে এসে বিরস মুখে বলে—'পাখি পালিয়েছে—'

বিভুর যেন কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—'নাহ্, এ হয় না—কথা দিয়ে তো রাখী।'—হঠাৎ পুলক চেঁচিয়ে ওঠে—'তোর রাখী শালা সব পারে। আমিও শালা পুলক ঘোষ—'

হয়তো তার কথায় সন্দেহ কিংবা অন্য কোন শব্দে সে মুহূর্তে পুলক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা শিকারী বাঘের মত সে দ্রুতপায়ে ছুটে যায় বাড়ির উত্তর দিকের পাশ কাটিয়ে পেছনের দিকে। বিভু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আশানিরাশা আর আতঙ্কে তার বুক ঢিপঢিপ শব্দ হতে থাকে। এবং তখনই সে একটা উচ্চরোলের হাসির শব্দে চমকে ওঠে।

চোখ ফিরিয়ে সে দেখে পুলকদা রাখীকে ডানহাতে প্রায় জড়িয়ে ধরে টেনে আনছে আর হাসছে; পুলক বলে—'জানিস বিভু, ঘরের পেছনে অন্য গাছের ঝাড়ে পালিয়ে ছিল—'

'পালাব কেন, তোমাদের চমকে দেবার জন্য আমি লুকিয়ে ছিলাম—' বলতে বলতে রাখী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

বিভুর সমস্ত শরীরে হাসি ছড়িয়ে যায়, সে বলে—'আমি জানতাম—'

'তুমি কচু জানতে—আমাকে দেখে পালাতে চেয়েছিল—'

বিভু হেসে বলে—'তোমাকে দেখে পালাতে যাবে কেন, তুমি কি বাঘ?'

পুলক না হেসে কঠিনমুখে বলে—'চুপ কর তো, তুই দালালি করিস না—'

রাখী বাঁকা মদু চোখে পুলকের দিকে তাকায়।

পুলক নৌকোয় উঠে হাত বাড়িয়ে দেয় রাখীর দিকে বলে—'এসো!'

রাখী ইতস্ততঃ করে বলে—'আমি একলাই উঠতে পারব।' রাখী পা বাড়িয়ে দেয়, ছোট্ট একটা লাফে নৌকোয় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোসুদ্ধ সে টাল খেয়ে যায়। এবং পুলক তাকে তৎক্ষণাৎই জড়িয়ে ধরে। নৌকো স্থির হয়। রাখী বলে—'ছাড়ো'। পুলক হেসে ছেড়ে দেয়। বৈঠায় চাড় লাগে। নৌকোর মুখ এখন উল্টো পাড়ের দিকে।

পুলক কিন্তু গলায় বলে—'কিরে শালা, বাজি খাস নাকি? জোরে চালা—'

'অত সহজ না পুলকদা, কীরকম স্রোত তা দেখবে তো?'

আতঙ্কিত চোখে রাখী জলের ঘূর্ণি দেখে, দূরের লকলকে বিদ্যুৎ কাছে এসে পড়ছে—রাখী বলে—'আজ খুব বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, গিয়ে কাজ নেই বিভুদা ফিরে চল—'

বিভু বলে—'বৃষ্টি কী বলছ—আজ কিছু একটা হবে—'

পুলক ধমক দেয়—'দূর, সব শালা ভীতুর দল, কী হবে? এদ্দূর এসে কেউ ফিরে যায়? ঠিক এসময় চড়াৎ করে বিজলী জ্বলে ওঠে আকাশে-এবং সশব্দে মেঘ গর্জে ওঠে; আর ক্রমাগত সোঁ সোঁ হাওয়ার শব্দ বেড়ে যায়।

আর তক্ষুনি নৌকোর পাশ থেকে ক্ষিপ্র হাতে একটা লগি টেনে তোলে পুলক—হাত উদ্যত করে; সকলে লক্ষ করে একটা সাপ তাদের নৌকোর পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। রাখী বলে ওঠে—'কী করছ পুলকদা, মারছ কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে লগি ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাপটা অকস্মাৎ কিলবিল করে ওঠে। লগি টেনে নিয়ে পুলক বলে—'সাপ মারব তার আবার কেন টেন কিসের?'

কিন্তু সাপটা মরে কিনা বোঝা যায় না, চলন্ত কচুরীপানার স্তূপের মধ্যে হারিয়ে যায়। বিভুর হাতের পেশীগুলো ক্রমশঃ ফুলে ফুলে ওঠে। তার মুখে রক্ত জমা হয়।

রাখী বলে—'ফিরেই চল বিভুদা, বা বৃষ্টি আসছে—'

বিভু বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। আজকের বিকেল নিয়ে অনেক আশা তার মনে মনে ছিল। সারাক্ষণ সে ভেবেছে আজ তারা ওপারে যাবে, বহুদিন পরে। বিস্মৃত ছবির মত আমবাগানে নির্জনে ঘুরে বেড়াবে। তারপর হয়তো পায়ে পায়ে চলে যাবে পুরনো পরিত্যক্ত বিশাল রাজবাড়িতে। উঁচু উঁচু থাম, দীর্ঘ অফুরন্ত বারান্দা— দরবার ঘর—একরাশ ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ঘুরে দেখবে। সহসা হয়তো অসংখ্য হাততালির শব্দের মত অগুনতি পায়রা উড়ে যাবে, নৈঃশব্দ ভেঙে। রাখী চমকে উঠবে। আর বিভু হেসে উঠবে হো হো করে। লোভনীয় আশা স্বপ্ন যায়।

মূল নদীর থেকে নৌকো ডুবে-যাওয়া নীচু জমিতে এসে পড়লে স্রোতের দাপট কমে যায়। নৌকো চলে সর-সরিয়ে, এবারে সামান্য দ্রুত। আরো খানিক এগিয়ে বৈঠা রেখে বিভু লগি তুলে নেয়। ক্রমশঃ গভীরতা কমে আসছে। লগিটা সে জলে খুব ধরে নেয়। সরু দিকটা দিয়ে পুলক সাপটাকে আঘাত করেছিল।

পুলক এসব দেখে খুঁটিয়ে। নৌকোর মাঝখানে পাটাতনে বসা রাখীর দিকে সে বার বার লক্ষ্য করে। বিভু লগি জলে ফেলতেই—পুলক বলে—'তোমার গায়ে শালা চামচিকের বলও নেই—'

রাখী তাকে বলে—'তুমি চালাও না দেখি পুলকদা, তোমার তো—'

পুলক বলে—'আমি এসব জানলে কী আর ওর ভরসা করি—' তার মুখ দেখে বোঝা যায় এসময়ে সে 'ল্যাংড়া' কথাটা বলতে যাচ্ছিল।

বিভু বলে—'খুব কঠিন দাদা—' তারপর সবলে লগি ঠেলতে ঠেলতে সে বলে—'কেমন লাগছে বল তো পুলকদা, তোমার গাড়ির চেয়ে এটা খারাপ?'

পুলক হেসে ওঠে হো হো করে—'কী যে বলিস না শালা, কিসের সঙ্গে কী, চাঁদে আর—' বলতে বলতে সে রাখীর দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। রাখীকে বলে—'তোমার কীরকম লাগছে রাখী, খুব রোমান্টিক ওয়েদার তাই না? অবশ্য আমি আছি বলে হয়তো তোমার—'

রাখী তাড়াতাড়ি মুচকে হেসে বলে—'যা বৃষ্টি আসছে, কাকভেজা হতে হবে সবাইকে। রোমান্স বেরিয়ে যাবে।'

বিন্তু বলে—'কেন, তুমি তো বলেইছ, বৃষ্টি যদি হয়তো ভিজব—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—' পুলক খুব হাত ছড়িয়ে বাঁশিও ভাঁজতে বলে—'কুছ পরোয়া নেই, বৃষ্টিতেই তো জমবে।' ক্রমাগত এগিয়ে আসে আমবাগানের নির্জনতা। দেখতে দেখতে সে বলে—'আড্ডা মুড়ি আর তেলেভাজা হলে আরো জমত।'

বাজারের শব্দের তেজ ক্রমে বাড়ছে, আমবাগানে শব্দ আরো গাঢ় গভীর। আবেগে উত্তেজনায় বিন্তুর মনটা একটু আগেই খুশীতে উপচে পড়তে যাচ্ছিল অথচ ঠিক তখনই দূরে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি উদাসীন রাখীকে দেখেই তার মনটা ফের ভারী হয়ে যায়। তিনরে কথা মনে পড়ে যায়। একদিন তাকে নিয়ে নৌকোয় বেড়ানোর কথা ছিল। সে নিশ্চুপে লগি চালিয়ে যায়।

'আহ্ গ্র্যান্ড'—পুলক আমবাগানের দিকে তাকিয়ে দুহাত ঊর্ধ্বে তোলে। নৌকো পাড়ে ভিড়তেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ে। হাত বাড়িয়ে বলে—'চলে এসো রাখী।'

অনেকদিন বাদে রাখী আবার দেখল এই আমবাগান—একমাত্র বিন্তুর সঙ্গেই সে এসেছে এখানে কোন দৃষ্টিহীন অপরাহ্নে। সে এগিয়ে যায়, পাড়ে জলকাদা, সে গিয়ে পুলকের হাতটা ধরে, লাফিয়ে নামে; পুলক আবার তাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রাখী বলে—'ছাড়ো'। তারপর বিন্তুর দিকে ফিরে বলে—'এসো বিন্তুদা।'

নরম মাটিতে লগি পুঁতে দড়ি বেঁধে বিন্তু নেমে পড়ে।

পায়ের তলায় জলের ছপছপ। পাতায় পাতায় হাওয়ার শব্দ। ঘনিয়ে আসা অন্ধকার চারিদিকে, সামনের একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা শেয়াল, মুখে একটা হাঁস কিংবা অন্য কোন পাখি, তাদের দেখেই দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলক সজোরে হাততালি দেয়।

বাগানটার যেন শেষ সীমানা বলে কিছু নেই। কতটা বড় বোঝা যায় না। ওরা ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে।

ধীরেশের ভাবনা বিন্তুর বুকের সবটা জুড়ে। তার কোন কথা মুখে আসে না।

এসময় হঠাৎ প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আর্তস্বরে পুলক বলে—'এই যাহ্—'

বিন্তু চমকে উঠে বলে—'কী হল, পুলকদা?'

পুলক আরেকটা পকেটে হাত দিয়ে বলে—'এই মরেছে—'

'কী হল বল তো?'—বিন্তু এগিয়ে যায়। রাখীও অবাক।

'সব মাটি হয়ে গেল'—পুলকের যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন নিঃস্ব ভঙ্গীতে সে বলে—'শালা সিগারেট নেই আমার।' —বলেই সে অসহায় মুখে বিন্তুর দিকে তাকায়।

চোখ নামিয়ে বিন্তু বলে—'আগে বলনি কেন?'

পুলক চড়া গলায় বলে—'আগে বলব কী। পানের দোকানে তো আমি সিগারেট কিনতেই যাচ্ছিলাম—হঠাৎ ওই শালাকে চোখে পড়ল—ফিরে এলাম, বাঞ্চোৎ'—কাকে যে গাল দেয় পুলক বোঝা যায় না।

রাখী বিষণ্ণ মুখে বলে—'এখন আর কী হবে?'

'কী হবে মানে?' পুলকের গলা ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে—'এখানে আসাই আমার মাটি হয়ে যাবে, শালা সিগারেট ছাড়া চলে?'

'কতক্ষণই বা থাকবে, এর মধ্যে সিগারেট না খেলে কিছু হবে না—' রাখীর মুখে সামান্য বিরক্তি।

পুলক অসহায় ক্ষুব্ধ গলায় বলে—'নেশা যে কী জিনিস তোমরা বুঝবে না, সিগারেট না হলে যে—' কথাটা সে শেষ না করে বলে—'আমি যদি শালা নৌকো বাইতে পারতাম—'

সবাই চুপচাপ। হঠাৎ প্রায় ভিক্ষার্থীর মত এগিয়ে এসে পুলক বিন্তুর দুহাত জড়িয়ে ধরে—'প্লিজ বিন্তু, তুই আমার ভাই—এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসবি —চট করে? ক'মিনিট আর?'

রাখী হতভম্বের মত বলে—'এই এতটা পরিশ্রম করে এল—আবার?'

'তুমি বুঝছ না রাখী। প্লিজ'—তারপর হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে অভিমানের সুরে বলে—'অবশ্য তোমাকে বলে লাভ নেই—তুমি আমাকে বোঝার কোন চেষ্টাও কখনো কর না, বুঝতেও চাও না।—আমি নৌকোতে আছি বলে তো পালিয়ে বাঁচছ—'

বিন্তুর মনটা কেমন যেন কাদা কাদা হয়ে যায়, পুলকের বেদনাহত মুখটা দেখে তার মমতা হয়। এসময় ধীরেশের কথাও তার মনে পড়ে। দোকানটা এখনো খালি পড়ে রয়েছে কিনা কে জানে? ধীরেশ কি ফিরে এসেছে? বিন্তু হাত বাড়িয়ে দেয়—'টাকা দাও, পুলকদা।' পুলক তাকে জড়িয়ে ধরে—'বিন্তু, তুই গ্র্যান্ড।' বলে সে চটপট পেছনের পকেট থেকে পার্স বের করে বিন্তুর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলে—'গোল্ড ফ্লেক এক প্যাকেট আর মুড়ি তেলেভাজাও নিয়ে আসিস, কী বলো রাখী?'

রাখী যেন কী ভাবছিল নদীর দিকে তাকিয়ে—সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে—'তার চেয়ে সবাই ফিরে গেলেই হয়।'—বলে সে বিন্তুর দিকে তাকায়।

পুলক বলে—'এই এসেছি, আবার কবে আসব তার ঠিক আছে? রাজবাড়িটা একসঙ্গে দেখে যেতাম—'

রাখী তখনো বিন্তুর দিকেই তাকিয়ে যেন বিন্তুর কথাই শেষ কথা।

বিন্তু বলে—'এত কষ্ট করে এসে ফিরে যাবে? আমি এক্ষুনি চলে আসব রাখী, ক'মিনিট লাগবে?' রাখীর চোখ ম্লান—হয়তো অভিমানে—সে বলে—'ঠিক আছে যা ভাল বোঝ—' পুলক সোৎসাহে বলে, 'তুই কুইক চলে আসিস বিন্তু, তুই এলে তবে রাজবাড়ি যাব।'

বাজারে যাবার পথেই মাঝনদীতে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। ফেরার পথে সে বৃষ্টির জোর আরো বাড়ে। বহুদূরে এতক্ষণ যে-লকলকে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছিল বারবার সে বিদ্যুৎমালা এখন মাথার ওপরে ঝলসে উঠছে। গর্জনে ফেটে পড়ছে আকাশ, যেন ক্রুদ্ধ দুর্যোগ নেমে আসছে আকাশ থেকে মাটিতে। মেঘের গতি উচ্ছৃঙ্খল, তার বিশেষ কোন দিক নেই, চারিদিকে উদভ্রান্তের মত তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। হাওয়ার দীর্ঘ সোঁ-সোঁ শব্দ শানায় মত্ত। বাজারে যাবার পথে সে লক্ষ্য করেছে বড় নদীর জল হু-হু করে ঢুকে পড়ছে। বরফের চেয়েও ঠান্ডা। হাত কেটে যায়। এখন নদীর গভীর গহ্বর থেকে তুমুল গুমগুমে শব্দ উঠছে। আক্রোশে ক্ষিপ্ত গেরুয়া জলস্রোত বড় নদীর থেকে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈনিকের মত ছুটে আসছে। কচুরী পানার ভীড় ঘুরপাক। বিন্তুর এতদিনকার দেখা পরিচিত গাছ-গাছালি ঝোপঝাড় আকাশ নদী সবকিছুর চেহারা যেন আজ একেবারে আলাদা। ভয়ঙ্কর। নদীপাড়ের এমন ভয়ঙ্কর রূপ আগে সে কখনো দেখেনি, এত ভয়ে কাঁপেনি তার বুক। তার সারা শরীরে পেশী টান টান বিন্দু বিন্দু ঘাম না বৃষ্টি বোঝা যায় না।

সে আরো দ্রুত নৌকো চালায় বাগানের দিকে, চালানোর চেয়ে দিক ঠিক রাখাই মুস্কিল। তলা থেকে স্রোত সবলে ধাক্কা মারছে। নৌকোর মুখ ঘুরে যায়। মনে হয় নৌকো চৌচির হয়ে যাবে। বিন্তুর দুহাত কঠিন। সে সিগারেট কিনে এনেছে—মুড়ি তেলেভাজাও। কিন্তু ধীরেশের দোকানটা দেখে তার বুক আরো ভার হয়ে গেছে। নকুলদা বলে ধীরেনদাটি তার সামনেই ঘুরে গেল; আরো অনেকে হয়তো খুঁজে যাবে। দোকান শূন্য—বেলফুলের মালা রজনীগন্ধা আরো সব ফুল শূন্য দোকানে খাঁ খাঁ করছে।

জল যেন প্রতি মিনিটে ধা ধা করে বাড়ছে। বাজারের ভেতরে কোথাও কোথাও জল ঢুকে পড়েছে এরই মধ্যে—কিছুক্ষণ আগেও এসব জায়গা শুকনো খটখটে ছিল। ঝড়ের ভেতরে কীরকম যেন ঝটপট পরেশ চলছে। ক্রমে ক্লান্তিতে আরুণার শরীরটা দুর্বল লাগে বিন্তুর

...জলস্রোতই যেন নৌকোটাকে কলার ...র মত ছুটিয়ে নিয়ে চলছে সামনে। ...র পথেই তার যা সময় লেগেছিল। ...ার পথে যেন স্রোতই তাকে দ্রুত ...িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবলে বিভু হাল ...য়—মূল নদী থেকে নৌকো ঢুকে ...ডানদিকে। এখন এখানেও তুমুল ...। একটু আগেই এখানে সে লাগি ...নয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার ...য়াজন নেই।

* * *

হঠাৎ সামনের একটা কচুরীপানার ...গল পাশ কাটাতে গিয়ে চমকে ওঠে ...। একটি শিশুর—বড়জোর ছ'সাত ...কের—মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। স্লিং ...পারের মত সাদা দুটি পা চোখে পড়ে। ...সময় খরস্রোত মৃতদেহটা উথলে ...তেই বিভুর মাথাটা ঝিম-...ম করে ওঠে। খুব চেনা বলে ...ন হয় যেন শরীরটা। সেদিন চা-বাগান ...খতে গিয়ে যে মেয়েটিকে সে কোলে ...নিয়েছিল—তার শব নয় কী? মাথার ...ধ্যে এসময় ডুগডুগাং ডুগডুগাং মাদলের ...দ্রুত শব্দ ঘুরে যায়।

চারিদিকে তরল অন্ধকার। এখন কী ...য অস্ত যাচ্ছে? কিছুই বোঝবার উপায় ...—যেন গোধূলিও নয় রাত্রিও নয় ...ন্ধকারের এমন রঙ কখনো দেখেনি বিভু। ...র মনে হয় রাখী আর পুলকদাকে ...য়ে বলতে হবে—আজ আর রাজবাড়ী ... এক্ষুনি ফিরতে হবে। বড় নদীর ...লও এ নদীতে ঢুকে পড়েছে। আর ...উপায় নেই। হঠাৎ নিজের বাগানটার কথা ...নে পড়ে বিভুর, আচমকা বিদ্যুতের ...তে আশঙ্কা জ্বলে ওঠে।

নদীর জল আরো খানিকটা এগিয়ে ...বাগানে ঢুকে পড়েছে। কাছাকাছি এসে ...বিভু লাগি তুলে নেয়। নৌকো পাড়ে ...ভিড়িয়ে একটা মরা আমগাছের সঙ্গেই ...বাঁধে বিভু। সিগারেটের প্যাকেট তার ...জামার পকেটে, ঢাকা দেওয়া ঝুড়ির ভেতর ...থেকে তেলেভাজা আর মুড়ির ঠোঙা নিয়ে ...সে নেমে পড়ে। পাড়ে নেমে সে হাঁপাতে ...থাকে।

তবু যতটা সম্ভব সে দ্রুত হাঁটতে থাকে। কিন্তু পায়ের নীচে ঘাস জল কাদা। ...র বার সে হোঁচট খেতে থাকে। পায়ের ...লার জমি তার নজরে নেই—সে চারি-...কে চোখ বুলিয়ে রাখী আর পুলকদাকে ...জতে থাকে। পাতায় পাতায় অবিরল ...ষ্টিপতনের শব্দ, হাওয়ার উন্মাদ সাঁই ...সাঁই আওয়াজ, অদূরে নদীর স্রোতের ...আন্দোলন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে ...উঠছে, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ে না ...ভুর।

দুপাশে সে সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি ...রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুতে থাকে। ...চাগাছের অসংখ্য কান্ডগুলোকে সটান ...াড়িয়ে-পড়া ভালুকের শরীরের মত মনে ...হয়। ক্ষণবিদ্যুতে সুনসান নির্জন লাগে

চারিদিক, কোনদিকেই রাখী বা পুলক-দাকে দেখা যায় না। আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে বিভুর। সে চীৎকার করে ডাকবে কিনা ভাবে। নাকি হঠাৎ সামনে পড়ে তাদের চমকে দেবে? ভাবতে ভাবতে সে আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু যত এগুতে থাকে উৎকন্ঠা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এখানে অবশ্য জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই কিন্তু বর্ষার জলে অনেক সময় হিংস্র জন্তু ভেসে আসে। একবার তো একটা বাঘ শহরেই ঢুকে পড়েছিল। ভাবতে গিয়ে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, বৃষ্টিতে হাওয়ায় হি হি করে কেঁপে ওঠে বিভু, আশঙ্কা যেন দুহাতে তার কণ্ঠা চেপে ধরে; বাগানটাকে তার নির্জন অফুরন্ত ভয়ঙ্কর একটা অরণ্য বলে মনে হয়। এসময় আতঙ্কে সে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

আবার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। আর তখন অদূরে একটা ঝোপের পাশে চকিতে দৃষ্টি পড়তেই বিভুর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। [illegible] চোখের [illegible] বিশ্বাস করতে পারে না। তার আপাদমস্তক থর-থর করে কেঁপে যায়।

কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পায় অর্ধনগ্ন পুলকদার শরীরটা। তার গায়ে শুধু জামাটা রয়েছে। আর আর এখানেই রাখীর শরীর। হিংস্র একটা পশুর মত শরীর পুলকের—ক্রমাগত ফুঁসে ফুঁসে সেটা যেন বিরাট বিশাল হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন পুলক রাখীকে গ্রাস করে ফেলেছে। তার শরীরটা একটা কামোন্মত্ত কালো ভালুকের মত চঞ্চল। রাখীর মুখে চাপা আর্ত গোঙানি।

হৃৎপিন্ড থেকে পিচকারির মুখে চড়াৎ করে তীরবেগে রক্ত মাথায় ঢুকে যায় বিভুর। এই মুহূর্তে সে কী করবে ভাবতে পারে না। তার দুচোখে তরল অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়। তার দুহাতের মুষ্টি বজ্রের মত কেঁপে ওঠে। শক্ত হয়ে যায় প্রত্যেকটি শিরা পেশী। শরীরের ভেতরে রক্তের উত্তাপ জ্বলন্ত লাভার চেয়েও উষ্ণ। যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গার সহসা বিস্ফোরণের অন্তিমমুখে। তার মনে হয় হারুর মত তার হাতে যদি ভোজালি থাকত, তার হাতে যদি বোমা থাকত। নাকি সে এমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে? সে হাত থেকে তেলেভাজা মুড়ির ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিয়ে খোঁড়া পায়ে পিষে ফেলে। তারপর তার বিমূঢ় দুচোখে পুলকের শরীরটা ক্রমে স্থির হয়ে যায়। হঠাৎ তার লাগিবৈঠার কথা মনে পড়ে সে দ্রুত পায়ে নৌকোর দিকে ফিরে আসে বিভু। লাগি বৈঠা তেমনি পড়ে থাকে। মাথা হেঁট করে উল্টোদিকের গলুইতে বসে থাকে বিভু। অসাড় চোখে সে তার পুরনো নৌকোটাকে দেখে স্থির হয়ে। কত-দিন সে ভেবেছে উজিয়ে গিয়ে

মেরামত করে নিয়ে আসবে। হয়রান। ক্রুদ্ধ আকাশ ভেঙে পড়ছে বৃষ্টিতে বিদ্যুতে, হাওয়ায় অসংখ্য মানুষের আর্তনাদের শব্দ, নদীর গহ্বর থেকে গুমগুম আওয়াজ উঠছে। হঠাৎ চমকে পাড়ে তাকায় বিভু: ওপাশের গলুইয়ের কাছে পুলক, তার পেছনে বেশ দূরে রাখী স্থির। সবাই যেন বোবা—বধির; অন্ধ। মানুষের নিষ্প্রাণ প্রতি-মূর্তি সব।

দুটি শব্দ—'এসো রাখী।' পুলক ডাকে। রাখী তবু স্থির। তার চোখ কী বিভুর দিকে, নাকি মাটির দিকে, নাকি নদীর দিকে, নাকি আকাশের দিকে, নাকি ওপারে? বিভু স্থির অনড়।

রাখী ক্রমে পায়ে পায়ে নৌকোর কাছে—নৌকো দোলে, রাখী নৌকোর মাঝখানে, পাটাতনে। পাথরের পুতুল। দড়ির বাঁধন খোলে পুলক; নৌকো ঠেলে দেয়। নৌকোর ও-গলুইতে পুলক। নৌকো কাঁপে। বিভু স্থির অনড়। লাগি বৈঠা পড়ে থাকে।

পুলকের কণ্ঠস্বর—'লগি তোল বিভু।' বিভু [illegible]।

'কীরে কথা কানে যাচ্ছে না?'

বিদ্যুৎ ঝলকায়। রাখীকে দেখে বিভু। লগি তুলে জলে নামায়। রাখীর শাড়ীতে কাদা মাখামাখি—তার চুলে কাদা জল, তার দুহাতে কাদা, তার দুপায়ে কাদা—শাড়ি বিস্রস্ত—দৃষ্টি স্থির, তার চিবুকে গালে তাজা নখের অসংখ্য রক্তাক্ত আঁচড়, কালশিরে—তার দু ঠোঁট টসটসে, রাখীর [illegible] ডিগবাজি খেতে খেতে জলজে উঠে ফের নিভে যায়। এই কী সেই রাখী? এ কোন রাখী?

'কীরে ব্যাটা, সিগারেট কই?'

এই মাত্র বিভু প্রথম কথা বলে—'এনেছিলাম, ফেলে দিয়েছি।'

'ফেলে দিয়েছিস! কেন? রাস্কেল—'

বিভু নিরুত্তর। নিস্তেজ হাতে সে লগি ফেলে—লাগ ঠেলে। রুদ্রস্রোতে নৌকো পাক খেয়ে যায়—

'কীরে শালা, চামচিকের মত করছিস কেন, ভাল করে চালা—' পুলকের কণ্ঠ-স্বর ক্রমশঃ কঠিন রুক্ষ।

বিভুর সমস্ত রক্তস্রোত আবার উন্মাদ। যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সহসা অন্তিম বিস্ফোরণের মুখে। বিভু ভাবে এত ক্রোধ এত আক্রোশ এত হিংস্রতা তার শরীরের ভেতরে এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? কোন গহ্বরে? তার শরীরও কী নদীর মত, তার স্নায়ু-তন্ত্রীর ভেতরে নদীর মত কালো গভীর গহ্বর আছে? সে গভীর গহ্বর থেকে রক্ত লাফিয়ে উঠছে বুদবুদে— হাতের

মূর্তি বজ্রের মত। সহসা বিভু চীৎকার করে ওঠে—'তুমি নিজে চালাও—' এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, লগিটা ছুড়ে মারে। কিন্তু হাওয়ার ঝাপটায় লগি পুলকের পাশ কাটিয়ে পড়ে জলে। মুহূর্তে তীব্র স্রোতে ভেসে যায়। নিয়ন্ত্রণহীন নৌকো বিশৃঙ্খল স্রোতের মুখে ঢুকে পড়ে। স্রোত হাওয়া বৃষ্টির দুরন্ত শব্দ একাকার হয়ে যায়।

'শালা —' তীক্ষ্ণ আওয়াজ পুলকের মুখে সহসা; 'তোর সাহস তো কম না? উঠে বস। নয়তো খুন করে ফেলব!'— পুলক দুলে সামনে।

'মুখ সামলে কথা বল পুলকদা।—' বিভুর কণ্ঠে বজ্র ফেটে পড়ে।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পুলক অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে—'শালা ল্যাংড়া, মুখে মুখে কথা। তুই চিনিস না আমাকে? বৈঠা ধর—'

এসময়ে অকস্মাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে রাখী কেঁদে ওঠে। মাথা নীচু করে, করুণ বিলাপের মত তার কান্নার শব্দ। সে কান্নার শব্দ হাওয়ার সঙ্গে মিশে দিগন্ত অবধি ছড়িয়ে যায়। বিভু বৈঠা হাতে নেয়। জলে চাড় লাগে। নৌকো এগোয়। রাখীর কান্না।

'কার সঙ্গে তুই লাগতে এসেছিস— শালা ল্যাংড়া পাড়ে গিয়ে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব—' পুলকের নিজের সঙ্গে সশব্দ আলাপ।—'তাড়াতাড়ি চালা—' আদেশ।

নদীর গহ্বরে যেন ঘূর্ণিস্রোত। রক্ত পাক খেয়ে ওঠে। গুম গুম শব্দ স্নায়ুতন্ত্রীর গভীরে। বিদ্যুতে সকলের মুখ ঝলসে উঠতেই— বিভু বৈঠা তুলে এগিয়ে এসে— 'নাও, তুমি নিজে চালাও।' আর এমন কঠিন হিংস্র মূর্তি কেউ দেখেনি কোনদিন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় ভয়ে সন্ত্রস্ত পুলক। নৌকোর খোলের মধ্যে বৃষ্টির জল জমে ভরাট। নৌকো ক্ষুধার্ত স্রোতের হাঁ-মুখের সামনে কম্পমান। পুলকের চেহারা পাল্টায় মুহূর্তে কণ্ঠস্বর কোমল— 'আচ্ছা বিভু তুই তো এরকম করিস নি কোনদিন, কী শুরু করেছিস, সবাই মিলে— কী বিপদ তুই বুঝতে পারছিস না—' তার কণ্ঠস্বর ভেজা ভেজা।

বিভু আগে কেমন ছিল? সেকথা মনে পড়ে না। সে কিছু বুঝতে পারে না। স্মৃতি জুড়ে রক্তের ঢেউ। তার হাতে বৈঠা। সে আরেকবার রাখীর দিকে তাকায়। তার কাদামাখা চুল হাত পা, তার গালে চিবুকে নখের রক্ত আঁচড় ঝলসে ওঠে। অঝোর বৃষ্টি ধারায় কাদা গলে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার সারা শরীরে। মাথার ভেতরে যেন ফের বজ্রপাত। বিভুর স্নায়ুতন্ত্রীর গূঢ় গহ্বর থেকে জ্বলন্ত স্রোত সহস্র মুখে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সহসা বিস্ফোরিত হয়ে যায়—

হিংস্রমুখে প্রবল হাতে সবলে বৈঠা ছুঁড়ে মারে বিভু। বজ্রের চেয়েও তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে— 'নাও নিজে চালাও।'

বৈঠা পুলকের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ব্যর্থ চেষ্টায় হাত বাড়ায় পুলক।

বৈঠা তখন জলে— তীব্র স্রোতে সঙ্গে সঙ্গে উধাও।

আর সে মুহূর্তে ক্রোধের সমস্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে যেন নিজের শরীরে জমা করে পুলক তার বিশাল শরীর কেঁপে ওঠে আর এক অন্তিম দুর্বার ভঙ্গিতে সে এগিয়ে আসে, তার পায়ের আঘাতে নৌকো টলে। রাখীর কান্না প্রবল হয়ে ওঠে। দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যায়। বিভুর সমগ্র উত্তাল শরীর ওঠে— সেও এগিয়ে যায়। এ সহসা সারা আকাশ একদিকে টাল খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত উন্মাদ স্রোতের হাঁ-মু ভেতরে ঢুকে যায়।

'বিভুদা— বাঁচাও— বাঁচাও'

'বিভু বাঁচা— বাঁচা—'

'রাখী—রাখী—'

কয়েকটা আর্তনাদের শব্দ ক্রমশ হাওয়ার শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত চারদিকে পাক খেতে থাকে। গভীর গহ থেকে উঠে-আসা স্রোত গুম গুম শেষ দিগন্ত শেষ প্রান্ত অবধি কাঁ তোলে। বিভু দুহাতে বিশৃঙ্খল স্রো কাটে। সে শব্দের নিশানা ঠিক করে চেষ্টা করে। দূরে কাছে সব দিক থে 'বাঁচাও বাঁচাও' 'বাঁচা বাঁচা শব্দরাশি উত্তাল হয়ে ওঠে। শহরেও বানের জল ঢুকে পড়েছে এতক্ষণে? সব ভাসছে? এত আর্তনাদ কেন? চারিদিকে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। চকিতে বিভু চোখে তার বাগান ঘর বাজার পর্যন্ত কালিমা মন্দ ধীরেশ রাখী ঘুরে যা আর এসময়ে প্রবল হাওয়ার মুখে ভয়ঙ্কর উৎসবের ডুগ ডুগাং ডুগ ডুগ উন্মাদ শব্দ ভেসে আসে। চারদিকে যতদূর চোখ যায় প্লাবিত অফুরন্ত জলরাশি।

সহসা একটা তীব্র ধ্বনিতরঙ্গ— তার কানের পাশ দিয়ে ভেসে চলে যায়। সে স্পষ্ট শুনতে পায় দীর্ঘস্বর— 'বিভু ফিরে এসো।' আর তখন এক বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর যার চারিদিকে সবুজ অফুরন্ত বনভূমি তার চোখে ঝলসে ওঠে। বিভুর বলিষ্ঠ দুহাতের সমস্ত পেশীতে ভয়ংকর ছন্দ দুলে ওঠে। সবল দুহাতে উন্মাদ তরঙ্গ ভাঙতে থাকে বিভু।

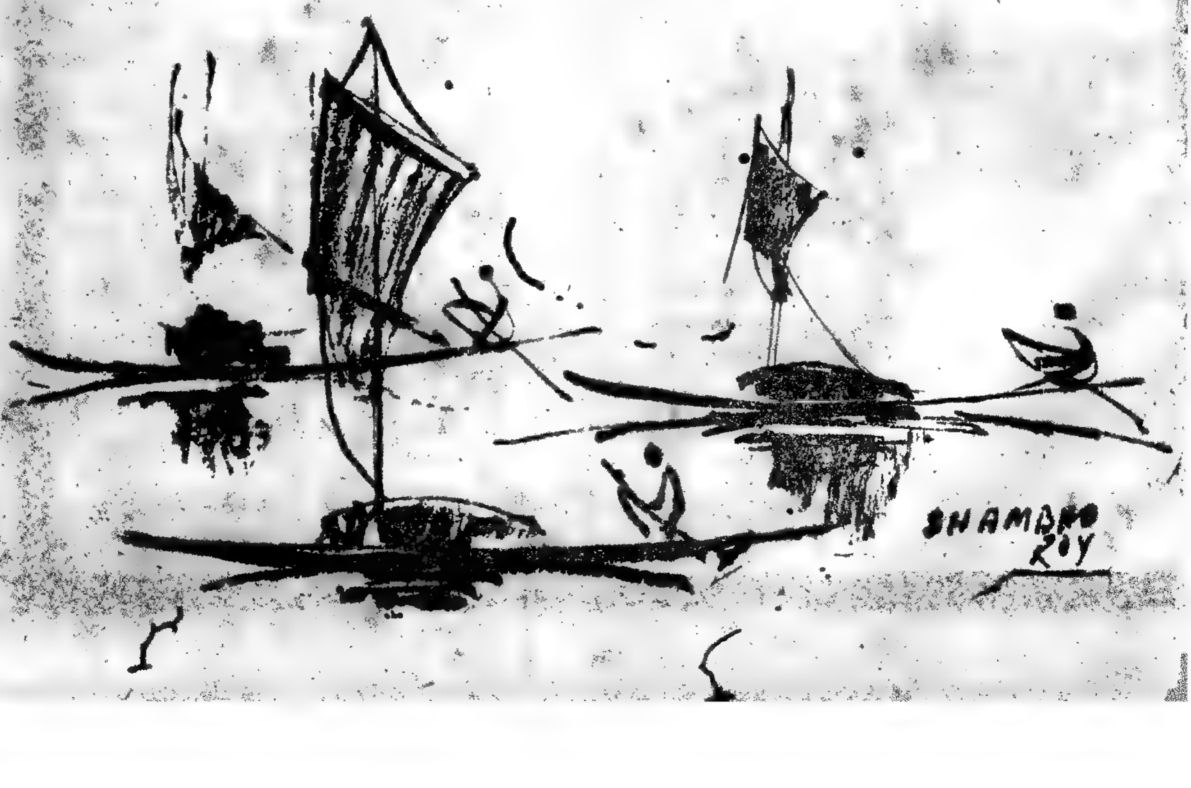

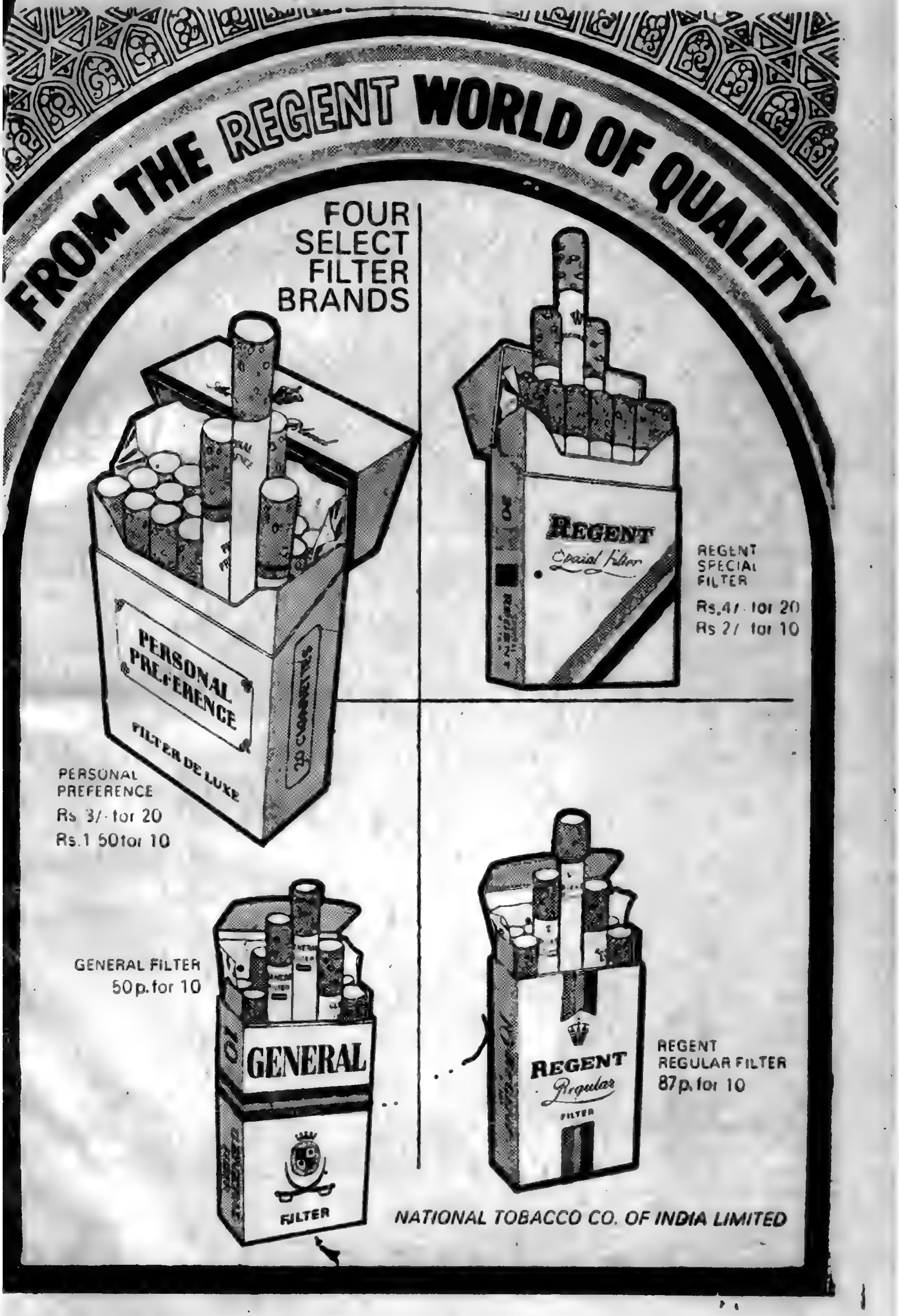
FROM THE REGENT WORLD OF QUALITY
FOUR SELECT FILTER BRANDS
PERSONAL PREFERENCE
FILTER DE LUXE
PERSONAL PREFERENCE
Rs 3/- for 20
Rs.1 50for 10
REGENT
Special Filter
REGENT SPECIAL FILTER
Rs.4/- for 20
Rs 2/- for 10
GENERAL
FILTER
GENERAL FILTER
50p.for 10
REGENT
Regular
FILTER
REGENT REGULAR FILTER
87p. for 10
NATIONAL TOBACCO CO. OF INDIA LIMITED

সোমা এটা কোনদিন ভাবেনি। হয়ত ভেবেছে কিন্তু ভাবনাটাকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ঘৃণাভরে—বারবার। বিয়ে করতে তার ইচ্ছে কোনদিনই ছিল না। হয়ত ছিল কিন্তু সে-ইচ্ছেকে সে দমন করেছে, হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে তাচ্ছিল্যভরে। তাবলে নিজের দেহের দিকে নজর দিতে ভুল হয়নি তার কোনদিন। সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে সোমার। তার জন্য সে নিজেও গর্বিত—অন্তত রূপ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন। সুন্দর সে থাকতে চায়, রূপের খ্যাতি তার ভাঁটায় পড়বার মত নয় তা সে জানে কিন্তু তাকে দেখলে সকলেরই ভাল লাগে বলে সে অনুভব করে—এটা সে বোঝে।

সোমা উঠে দাঁড়াল। অনেকদিন পরে আজ সে চুল শ্যাম্পু করেছে। রেশমের মত দীর্ঘ আর ভ্রমর কালো চুল কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষীণ কটিতটের নিচে। সোমার তম্বী শরীর, দৃপ্ত আর বলিষ্ঠ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা লক্ষ্য করে একটু হাসল সে।

—সোমা, মা ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।

—কি হল? সোমা মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

—কোন বেনারসীটা তোমার পছন্দ বললে না!—মায়ের কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

—যেটা হোক নিয়ে নাও, অন্য দিকে তাকাল সোমা।

—তা কি হয়, তোমার পছন্দ না হলে আমি নিই কি করে?

—তোমার কোনটা পছন্দ? জিজ্ঞেস করল সোমা।

—আমার ওই ম্যাজেণ্টা রং-এর জংলাটা পছন্দ। বেশ বাহার কাপড়টার!

—তাহলে তাই নাও, সংক্ষেপে উত্তর দিল সে। তারপর খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পিছন ফিরে। মেয়ের নির্লিপ্ত ভাব দেখে মা একটু আহত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কথা বাড়িয়ে ফল ভাল হয় না এটা তিনি বিলক্ষণ জানেন। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সোমা। সমুদ্রের মত লাগছে পশ্চিম দিকের আকাশ। ঠিক যেমনটি সে দেখেছিল পুরীতে। একদিকে সোনার মত বেলাভূমি, অপর দিকে গাঢ় নীল জলরাশি। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সোমা সেই দিকে।

শৌনক ফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সোমা রিসিভারটা তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে কোথায় গেল? হাত ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সামান্য দু-একটা কথা এমন কিছু জরুরীও নয়। অথচ ব্যাপার সোমার সঙ্গে একটু কথা ব[illegible]। কিন্তু এখন

ফান করে যেন বিপদে পড়ল। ছেড়ে দিলে সোমা নিশ্চয় বিরক্ত হবে, এমনকি রাগও করতে পারে। সোমার রাগটা আবার বেশী। কারণে-অকারণে রাগ করতে সোমার জুড়ি নেই। শৌনকের চাঞ্চল্য বেড়ে গেল। অপেক্ষা করতে তার দস্তুর মত কষ্ট হয়। ধূমপান করার একটা অদম্য ইচ্ছা হল তার কিন্তু খাওয়ার উপায় নেই। সোমার কাছে সে সিগারেট ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক'দিন সিগারেট খায়নি সে? মনে মনে হিসাব করল শৌনক। দশদিন—পুরো দশদিন। কথাটা ভেবে ধূমপানের স্পৃহাটা আরও বেড়ে গেল। একটা ধরালে ক্ষতি কি? হঠাৎ মনে হল সিগারেট খেলে ফোনের মধ্যে দিয়েও সোমা সিগারেটের গন্ধ পাবে নিশ্চয়। পরমুহূর্তে এই অসম্ভব কথাটা চিন্তা করছে বলে সে একটু আশ্চর্য হয়ে হাসল।

—হ্যালো, সোমার গলা।

—কি এত দেরী হল কেন, জিজ্ঞেস করল শৌনক।

—দেরী আবার কোথায়, এই তো মা ডাকছিলেন বলে যেতে হল।

—আমি আজ বিকেলে আসছি।

—কেন? সোমার স্বরে কৌতুক।

—কেন, জান না?

—না, আজ আর এস না। আমি আজ বাইরে যাচ্ছি মায়ের সঙ্গে।

—তাহলে? হতাশার সুরে বলল শৌনক।

—তাহলে কি?

—মানে সময়টা কাটাব কি করে তাই ভাবছি।

—যেমন কাটাও মানে বন্ধুদের সঙ্গে ভাল করে আড্ডা দাও।

—এ তোমার অন্যায় কথা সোমা। তুমি তো জান আমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই।

—তুমি অফিস যাবে না আজ? জিজ্ঞেস করল সোমা।

—ইস্ বড্ড দেরী হয়ে গেল। চলি কেমন। ফোনটা কেটে গেল।

হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সোমা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। টেবিলের ওপর এক গোছা চিঠি রয়েছে। সোমার বাবার চিঠি। বেশীর ভাগ নাইজিরিয়া থেকে লেখা, আবার কিছু লন্ডনের ছাপও রয়েছে।

বাবার কথা মনে পড়ল সোমার। কতদিন বাবাকে দেখেনি সে। ঠিক বার বছর—এক যুগ।

দীনেশ চ্যাটার্জি বসেছিল সোফার ওপর। সামনের টেবিলে কয়েকটা ফাইল ছড়ান। তারই একটা দেখছিল সে এতক্ষণ। দীনেশ চ্যাটার্জির বয়েস চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মধ্যে। মোড় ঘোরাবার আগে যেমন মোটরের গতি কমাতে হয়, তেমনি দীনেশ চ্যাটার্জির বয়স প্রৌঢ়ত্বের মোড় বাঁকার আগে যেন গতিবেগ স্তিমিত করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল হলেও দীনেশ চ্যাটার্জির মুখে আর কপালে কুঞ্চিত রেখা স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। দরজার কলিং বেলটা বাজল একবার দুবার। দ্বিতীয়বারের আওয়াজটা আরও দীর্ঘ। দীনেশ চ্যাটার্জির মুখের আর কপালের রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হল। হাতের ফাইলটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর সেটা ছুঁড়ে দিল বিরক্তিভরে। একটু পরেই স্যান্ডেলের আওয়াজ শোনা গেল।

—হ্যালো ডার্লিং। উগ্র আধুনিক সাজ পরে দীনেশের স্ত্রী চন্দ্রানী ঢুকল। দীনেশ একবার দেখল তার দিকে। বলল, তুমি আবার ড্রিংক করেছ?

—ইয়েস ডার্লিং, করেছি, হাসল চন্দ্রানী। তুমিই তো আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছ বন্ধু। জোরে হেসে উঠল সে।

—বি কোয়ায়েট, সোমা ঘুমোচ্ছে, চাপা গলায় ধমকে উঠল দীনেশ।

—ঘুমচ্ছে তো কি হয়েছে। জাগবে আবার ঘুমবে, আবার জাগবে।

—যাও নিজের ঘরে, আদেশের স্বরে কথাটা বলল দীনেশ। ইউ আর গোয়িং টু ফার—তুমি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছ চন্দ্রা।

—ব্যালেন্স আমি হারাইনি, অ্পনগড, আই অ্যাম স্টেডি। লুক এ্যাট মি ডার্লিং। একজন বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রীর পোজটা হুবহু নকল করল চন্দ্রানী। সোমা বিছানায় শুয়েছিল তখন চুপ করে। কয়েকদিন ধরেই তার জ্বর হচ্ছে। শুয়ে থাকতে তার সব থেকে কষ্ট হচ্ছে। স্কুলের পড়া, তার বন্ধুদের স্মৃতি তাকে পীড়িত করছে অনেক বেশী।

—বাবা, ডাকল সোমা।

—তুমি এখনও জেগে আছ? মেয়ের কপালে হাত রাখল দীনেশ। দীনেশের হাতে সিগারেটের গন্ধটা পেল সোমা। কিন্তু সে মায়ের সেই নরম আর ঠাণ্ডা হাতটা চায়।

—মা কোথায় বাবা?

—তোমার মায়ের শরীর খারাপ, অন্য দিকে মুখ ফেরাল দীনেশ।

—না, মায়ের হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি। মাকে ডেকে দাও।

—দিচ্ছি, তুমি আগে ওষুধটা খেয়ে নাও। মা কিন্তু এল না। বালিশে মুখ গুঁজে সোমা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘুমিয়ে পড়ল।

শৌনক এসপ্ল্যানেড ট্রামের গুমটির কাছে অপেক্ষা করছিল। আজ শনিবার তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সে গাড়ীটা গ্যারেজে রেখে বাসেই চলে এসেছে। সোমা একটু পরেই একটা দোতলা বাস থেকে ধর্মতলার মোড়ে নেমে রাস্তা পার হওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীর স্রোত বয়েই চলেছে, শেষ আর হয় না। সোমা অস্থির হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে এক দল লোক দাঁড়িয়ে আছে পার হওয়ার জন্যে। শৌনক অপর দিক থেকে লক্ষ্য করছে সোমাকে। বিয়ের আর ক'দিন বাকি? মাত্র তিন দিন। রাস্তাটা পার হতে এত সময় লাগছে কেন? কলকাতার গাড়ীর সংখ্যা কি অকস্মাৎ বেড়ে গিয়েছে। শৌনকের সিগারেটের কথা মনে পড়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত রাখল, না সিগারেট নেই—মানে সিগারেট খাওয়া তো সে ছেড়েই দিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশটা সেই থেকে হাত তুলে কেষ্ট ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার হাত ব্যথাও করছে না।

এতক্ষণে সোমা পার হয়ে পারল রাস্তাটা। শৌনক এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—কি হাসছ যে, সোমা তাকাল তার দিকে।

—হাসছি তোমার কাণ্ড দেখে। বাস থেকে যেই দেখলে রাস্তা বন্ধ তখন মুখটা তোমার যেন কেমন হয়ে গেল।

—কখন বেরিয়েছ জান? ট্যাক্সির পাত্তা নেই কোথাও। একটা যাও বা পাওয়া গেল, তাও বললে উল্টোদিকে যাবে।

—তারপর? শৌনক সোমাকে লক্ষ্য করল ভালভাবে। উত্তেজনায় ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—তারপর আর কি, বাসে কোনরকমে ঝুলতে ঝুলতে চলে এলাম।

—চলো একটু চা খাওয়া যাক—বলল শৌনক।

—না, আপত্তি জানাল সোমা। আমার ওই সব রেস্তোরাঁ ভাল লাগে না।

—কেন তুমি তো যেতে আগে আমার সঙ্গে।

—তখন একটা মোহ ছিল। জায়গাগুলো দেখারও ইচ্ছে ছিল। এখন আর চার্ম নেই আমার কাছে। পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গী এখন আমার ভালই লাগে না। মায়ের কথা মনে পড়ল সোমার।

—তাহলে কি ভাল লাগে? উল্টোডাঙা, না খড়দহ-বেহালা? হাসিমুখে তাকাল শৌনক।

—ঠিক বলেছ, চল বেহালার ট্রাম ধরি।

—তা না হয় ধরলাম, কিন্তু তারপর? অবাক হওয়ার ভঙ্গী করে শৌনক।

—তারপর আবার কি, ফিরতি ট্রামে চলে আসব।

—আমরা ছোটবেলায় তাই করতাম। ট্রামে চড়ে একেবারে ট্রারামিনাস টু টারামিনাস।—হাসল শৌনক।

—মজা লাগত না? জিজ্ঞেস করল সোমা।

—তা লাগত। ওই যে বেহালার ট্রাম এসে পড়েছে।

ওরা দুজনে ট্রামে উঠে পড়ল। সামনের একটা সীটে ওরা দুজনে বসল। জানলাটা তুলে দিয়ে শৌনক বলল একটু হাওয়া আসুক। সোমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল বাবাও খুব খোলামেলা ভালবাসতেন। ঘরের জানলা বন্ধ করার উপায় ছিল না। ওটা কি? মাঠে একটা জায়গায় ভিড় হয়ে রয়েছে বেশ।

—বোধহয় ক্রিকেট কিংবা ম্যাজিক হচ্ছে। উত্তর দিল শৌনক।

—আমি জানতাম মাঠে শুধু ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়। তুমি ক্রিকেট দেখ না? উৎসাহভরে প্রশ্ন করল সোমা।

—তা দেখি, মানে চান্স পেলেই দেখি আর কি।

—বাবা আর আমি ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলাম। আঃ যা মজা লাগত আমার। মাঠে লাঞ্চ খাওয়া, রোদ্দুরে খেলা দেখা—তারপর আমাদের ব্যাটসম্যান যখন সেঞ্চুরী করত, তখন তো আর কথাই নেই। জান বাবা নিজেও ক্রিকেট খেলতেন। দারুণ নাম ছিল। কি হল, ট্রাম যাচ্ছে না কেন? পাশের জানলা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সোমা।

—জ্যাম হয়েছে। ওদিকে। মুখটা শুকিয়ে গেছে শৌনকের। মানে এক-ঘণ্টা নট নড়নচড়ন। পকেটে আবার হাত দিল নিজের অজান্তে।

—তুমি কেমন যেন অস্থির অস্থির হচ্ছ—

—কই না। জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল শৌনক।

—হুঁ নিশ্চয় কি হয়েছে বল—জেদ ধরল সোমা।

—এমন কিছু নয়। তবে সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে স্বীকার করল শৌনক।

—না, সিগারেট খাওয়া চলবে না, অভিজ্ঞ নার্সের ভঙ্গিতে কথাটা বলল সোমা, বাবাও সিগারেট খাওয়া একদম পছন্দ করতেন না—

—ও গড, আর্তনাদ করল শৌনক অস্ফুট স্বরে।

—কি হল? ব্যস্ত হয়ে ওঠে সোমা।

—ইয়ে মানে—ওই যে ট্রামের টিকিট খুলে গেছে দেখছ না? মুখটা রুমাল দিয়ে মুছল সে।

ফুলশয্যার নানা সামগ্রীর সঙ্গে একটি বিরাট অয়েল পেণ্টিং দেখে অবাক হল শৌনক। পরে সে শুনল ওটা সোমার বাবার প্রতিকৃতি। বিয়ের হাঙ্গামা চুকে যাওয়ার পর একদিন শৌনক লক্ষ্য করল ছবিটা খাটের অপর দিকের দেওয়ালে টাঙ্গান হয়েছে। সে-রাতে সোমা বলল, বাবার ছবিটা আজ টাঙ্গান হয়েছে। শৌনক একবার তাকিয়ে দেখল। ভদ্রলোকের মাথাজোড়া টাক, গোঁফটা সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মত নাকের তলায় শোভা পাচ্ছে। চোখদুটো প্রায় গাড়ীর হেডলাইটের মত।

—বাবার রং ঠিক সাহেবের মত ছিল, মন্তব্য করল সোমা।

—তোমার মাও শুনেছি এককালে খুব সুন্দরী ছিলেন।

—হুঁ, কিন্তু বাবার পাশে দাঁড়াবার মত নয়। বাবার হাইট কত ছিল জান?

—কত? আগ্রহ দেখায় শৌনক।

—ছ'ফিট এক ইঞ্চি—গর্বভরে বলল সোমা।

—আশ্চর্য। একটু হাসল শৌনক। ভাগ্যিস তুমি বাবার মত হাইট পাওনি তাহলে খুব মুস্কিল হত।

—মুস্কিল?

—হ্যাঁ আমার হাইট তো পাঁচ এগারো। শৌনক একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল ভদ্রলোকের গোঁফটা যেন নড়ে উঠল।

—আমায় এক গ্লাস জল দাও। বোধহয় অম্বল হয়েছে। গলার কাছে একটা হাত রাখল সে।

—বাইরে কিছু খেয়েছ নিশ্চয়?

—না শুধু চা আর টোস্ট খেয়েছি।

—তাহলে ওই চায়ের জন্যে তোমার অম্বল হয়েছে। বাবা সকালে লিমন-টি খেতেন আর বিকেলে—

—গলাটা জ্বালা করছে যেন। সোমা আর দেরী করল না। ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে লাগল। বেঁচে গেল শৌনক। আর একটু হলেই সে হেসে ফেলত।

ঘুম থেকে উঠেই রোজ ছবিটা শৌনকের চোখে পড়ে। অভিজ্ঞতাটা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। মেজাজটা খিঁচড়ে যায় টাক-মাথা আর সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মত গোঁফ দেখে। প্রথম প্রথম সে নিজের মনকে সংযত করবার চেষ্টা করল। ডাক্তারবন্ধুদের ঘরে তো কত রকমেরই ছবি থাকে, এমনকি কংকালও থাকে—তাতে তাদের কি মেজাজ বিগড়ে যায়? সেদিন শৌনক সকালে উঠে ডাক্তারসুলভ মনোভাব নিয়ে, ছবিটার দিকে তাকাল। ফল তাতে ভাল হল না। তার মনে হল আই-স্পেশালিস্টের কথা। ভদ্রলোকের চোখদুটো অপারেশান করে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল তার।

সোমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল শৌনক মিটমিট করে হাসছে।

—কি হল, হাসছ কেন? চা এগিয়ে দিল সোমা।

—তোমার একটা ভুল ধরেছি, বলল শৌনক।

—কি ভুল, অবাক হয়ে তাকায় সোমা।

—বাবার ছবিটা তুমি কোথায় টাঙিয়েছ?

—কেন ওই তো দেওয়ালে। কথাটা বুঝতে পারে না সোমা।

—তা তো বুঝলাম কিন্তু পায়ের দিকে কেউ গুরুজনদের ছবি রাখে? সোমা জিভের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে ধরে রাখল কয়েক মুহূর্ত।

—ইস, তাহলে কি করব?

—ও আর হাঙ্গামা কি আছে। মাথার দিকে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মাথার দিকেই ছবিটা টাঙ্গান হল। বেঁচে গেল শৌনক। খাটের মশারি ছবিটাকে আড়াল করে দিল একেবারে। এখন সে শরীফ মেজাজে আছে।

—বাবুলির দুধ এনেছ? সেদিন জিজ্ঞেস করে সোমা। বাবুল ওদের দেড় বছরের ছেলে।

—পাওয়া যাবে কাল-পরশু। টাই খুলে গলা থেকে শৌনক।

—বাজারের কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ? হু-হু করে দাম বেড়ে যাচ্ছে জিনিসপত্তরের। সেই ছেঁড়া মোজাটা পরে আজও বেরিয়েছিলে। বললাম ওটা রেখে দাও, তা কথা আর কানে গেল না। আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

—বাবুলি কোথায়? একটা সিগারেট ধরাল শৌনক।

—আছে এখানে কোথাও। তুমি যেন সিগারেটের ছাই ঘরময় ছড়িও না। অ্যাসট্রে আছে চেয়ারের তলায়। শৌনক হেঁট হয়ে অ্যাসট্রে তুলল চেয়ারের নিচ থেকে। কাজটা করতে তার রীতিমত পরিশ্রম হল। কোমরের পরিধি তার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

হঠাৎ বাবুলের আর্তস্বর শোনা গেল সিঁড়ির কাছে। এক দৌড়ে সোমা বেরিয়ে গেল। সোমার গলা শোনা যাচ্ছে। বাবুলিকে কোলে নিয়ে সে ভোলাচ্ছে নানাভাবে।

শৌনক সিগারেটে টান দিয়ে ওপর দিকে ধোঁয়াটা ছাড়ল ধীরে ধীরে। মশারিটা কাচতে দেওয়া হয়েছে। বেশ ফাঁকা লাগছে ঘরটা। সোমার বাবার ছবিটার দিকে নজর পড়ল তার। ঝুল আর মাকড়সার জাল হয়েছে সেটার ওপর। ফ্রেম থেকে উই‍পোকার বা... প্রায় ভদ্রলোকের চোখের কাছে অগ্রস... হয়েছে।

বাবুলিকে নিয়ে সোমা ঘরে ঢুকল।

ভব।
অসম্ভব?
না। এ হতে পারে না।
পারে না?
বেন'র উত্তর থাকে না। উত্তর
না।
উচিত।
উচিতই কি করে মানুষ?
রে।
কর? করেছো?

চলছে। ধুলো উড়ছে। ক চা-
দিকে দিগন্তবিস্তৃত ধবল
মধ্যঋতু শরতের শেষাশেষি।
নীল। বাতাসে মিষ্টি নেশা।
ীন সোনালী রোদ্দুর। পাশা-
জন। দু' দিকে মুখ ঘোরানো।
বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত।

পারবো না।
এমন অসাধ্য কাজ যে পারবে

কাজই কী সবাই পারে?
মত মেয়ের পারা উচিত।
সেই উচিতের প্রশ্ন!
ঈষৎ বেঁকলো। অপর প্রান্তে
দেশলাই জ্বলে উঠলো।
য়া ছড়িয়ে পড়ছে গাড়ির
লা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।
নশা হালকা হয়ে আসে।

উচিত-অনুচিতের কথা থাক। এ-কাজ তোমাকে করতেই হবে। সামান্য একটা কাজ, এমন কিছু মারাত্মক নয় যে ভূমিকম্প হয়ে যাবে বা প্লাবন বা সাংঘাতিক কোন মহামারী!

এ তার চেয়েও মারাত্মক।

না, না। মোটেই মারাত্মক না। বরং অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ছোটকে বড় করে দেখা তোমার এক রোগ। চিরদিনের রোগ।

অরিন্দম!

যা ভাল বোধ কর। আমি আর অনুরোধ করবো না।

সহসা গাড়ি বাঁক ফিরলো। ওদিকের মানুষ এদিকে এসে পড়লো। টাল সামলাতে গিয়ে সবল একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো। ধরে রইলো।

রাগ করো না অরিন্দম। বলো রাগ করবে না।

উত্তর নেই।

বেশ, তোমার কথামত কাজ করবো। কিন্তু এবারই শেষবার। কথা দাও।

দিলাম।

অনেকক্ষণ হলো গাড়ি পৌঁছে গেছে। অনেকটা সময় বারান্দায় তারা বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরে সামনের একটা অস্পষ্ট পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে, কিছুই দেখছে না। নাকি দেখছে। নিজেদের দেখছে। নিজেদের হৃত শ্রীহীন মূর্তি দেখে হতাশ হয়ে পড়ছে।

একটি করুণ কাহিনী

শলেন রায়

এক এক সময় আমার কি মনে হয় জান অরিন্দম?

কি?

মনে হয়, আমি যদি এই পৃথিবীতে না জন্মাতাম, সবচেয়ে কার বেশী লাভ হতো?

আমার?

হ্যাঁ তোমার। তুমি সুখী হতে পারতে।

যদি বলি আমি সুখী হয়েছি—

বিশ্বাস করবো না।

কেন বিশ্বাস করবে না?

তোমার চোখে কোথাও সুখ নেই।

সুখ থাকে মনে, চোখে না।

চোখ তো মনেরই আয়না।

কী জানি। অনেক কিছুই তুমি জানো যা সাধারণ মানুষ জানে না।

উপহাস করো না অরিন্দম।

উপহাস না। মৃদু একটু রসিকতা করার লোভ সামলানো গেল না। আশা করি সে-অধিকার আমার আছে। আছে কিনা বলো?

উত্তর নেই। স্নিগ্ধ বাতাস পাহাড়ের ওদিক থেকে এদিকে আসছে। একটা লতায় বেগুনী রংয়ের ছোট ছোট কুঁড়ি ধরেছে। হাওয়ার স্পর্শে সেই লতাটা কাঁপছে। শির শির করে কাঁপছে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠলো। ঠিক যেন বাচ্চা একটা ছেলে শিস দিল। তীক্ষ্ণ এবং মধুর ধ্বনি।

আর বেশী দেরী নেই। এবার তোমাকে তৈরী হতে হবে। লোকটা গাড়ি নিয়ে আসবে। সেই গাড়িতে তোমাকে যেতে হবে। মাত্র দুটো রাত। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এই দুদিন এখানে—এই বাংলোয় আমি অপেক্ষা করে থাকবো। শুধু তোমার ফেরার পথ চেয়েই বসে থাকবো।

ফটো : সেবাব্র

অরিন্দম—

আঃ, ছেলেমানুষি ছাড়ো। নিজেকে শক্ত কর। অতীতের কথা চিন্তা কর। দিনের পর দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষ বাঁচতে পারে না।

কিন্তু—

বিনিময়ে, সামান্য একটু আপোষের বিনিময়ে কী না আমরা পেতে পারি! পেতে পারি উদ্বেগহীন শান্ত পরিতৃপ্ত জীবন। উজ্জ্বল, অনাবিল, ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যৎ। আমি চাইলে কেউ দেবে না। তুমি না চাইতেই দেবে।

না না না।

নষ্ট করার মত স
হাতে আর অবশিষ্ট নেই।
চিরদিনের কান্না পরে
অবসর কোন মুহূর্তে
সেরে এসো। নিজেকে আ
তোল। লোকটা আসবে।
লোকটা। সে যেন ক্ষুধ হ
যায়!

মাধবী স্নান করছে।
সময় কাঁদতে মাধবীর বড়
নোনা স্বাদটা একটুও জি
মনে হয় তার চোখে বুবি
নেই। অথচ বুকটা হালক
তাই স্নানের সময় মাধবী

আজও কাঁদছিলো।

রোজ কাঁদে। নতুন ক
কারণ ঘটে রোজ, তা না
কোন একটা কথা মনে
কাঁদে। কেঁদে বুক খালি
কিন্তু শূন্য বুক আব
ওঠে। নতুন কান্না এসে
বাঁধে। চোখের মধ্য দিয়ে
পড়ে। কিন্তু নোনা স্বাদ
না একটুও। তাই স্নানের
কাঁদে। নিভৃত এই কা
ছাড়া আর কেউ থাকে না

আজও মাধবী কাঁদ

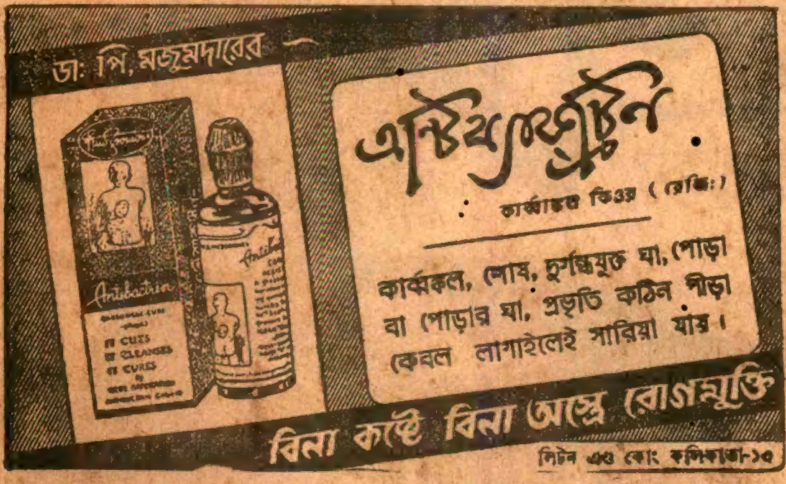

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।